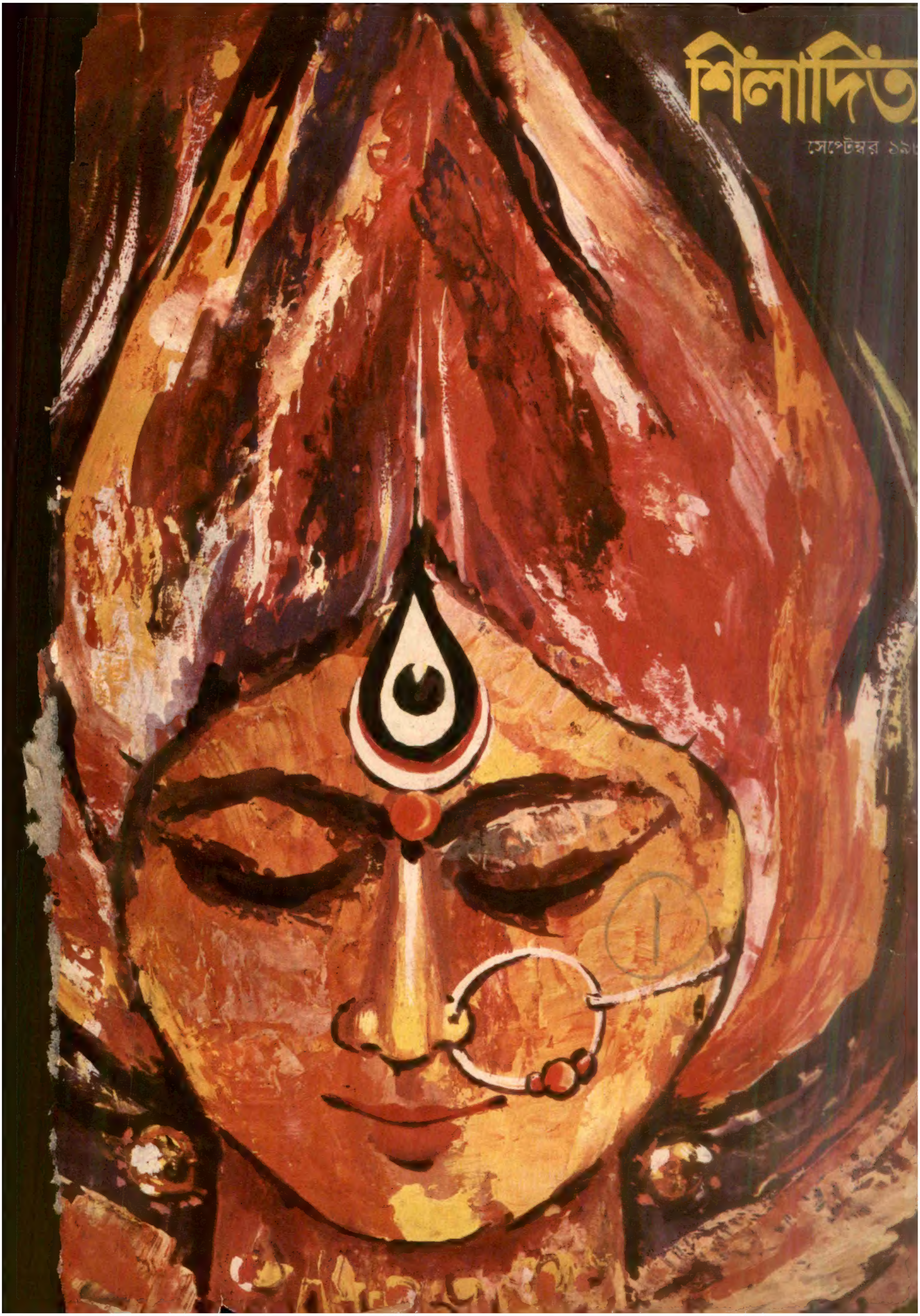
শিলাদিত্য
সেপ্টেম্বর ১৯৮

সবার মুখে হাসি দেখতে আমাদের ভাল লাগে

আজ যারা পড়াশুনা করছে বড় হয়ে সবাই চাইবে রোজগার করতে

আমরা প্রত্যেকের জন্যই সে ব্যবস্থা করতে পারব না। কিন্তু জনসাধারণের আমাদের উপর যে আস্থা আছে, তাকে পাথেয় করে নিশ্চয়ই বেশ কয়েক লক্ষ ভাইবোনের দিকে আমরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারবো।

(স্থাপিত ১৯৩২)

দি পিয়ারলেস জেনারেল ফাইনান্স এণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোং লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস : **পিয়ারলেস ভবন**, ৩, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯

মোট সম্পদের
পরিমাণ ১৫০
টাকার উর্ধ্বে

P/1

cuk-4970-1-[illegible]335 সৌজন্য সংখ্যা

হিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা **শিলাদিত্য** নবপর্যায় প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা সেপ্টেম্বর ১৯৮১ দাম : তিন টাকা

দকীয়

দের দেশে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যা ও সংকট আছে। সেগুলির সমাধান যদিবা সম্ভব সেই সমাধানের আগ্রহ আমাদের অল্প। এর ফলে সৃষ্টি হয় নানা ভুল বোঝাবুঝি এবং অনৈক্য।

র ধরা যাক শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগের অভাব ব্যাপারটি। একজন শিল্পী তাঁর সৃষ্টির জগৎ এবং তার বিপণনের ব্যাপারে একেবারে নিঃসঙ্গ। একজন সাহিত্যিক অসহায়ভাবে বিক্রয় করেন প্রকাশকদের স্বৈর ব্যবহারের কাছে। সংস্কৃতিকর্মী খুব সহজে আটকে পড়েন চটকদার রাজনীতির তচক্রে।

জন্যই এইমুহূর্তে আমাদের দরকার এক উদারনৈতিক, শুদ্ধ ও সচেতন যুক্তমঞ্চ। শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিকর্মী ধ কাঁধ লাগিয়ে সৃষ্টির ফসল ফলাবেন। অনিশ্চিত বাজারের ভ্রূকুটি, প্রকাশকের প্রতারণা কিংবা রাজনীতি সায়ীর ফাঁদ তাঁরা এইভাবে এড়াতে পারবেন।

ন সব অর্থেই বাঁচার অঙ্গীকারকে সমৃদ্ধ করে। সৃজনশীল মানুষের কাছে যে কোনো ধরনের বিচ্ছেদ ও ব্যবধান প্রতারণাকে এগিয়ে দেয়।

সংখ্যায়

প্রচ্ছদশিল্পী : নিতাই ঘোষ

৩৮

সেন এক বিতর্কিত কবি। তির্যক, রিক ও ব্যঙ্গপ্রবণ এই বিখ্যাত কবি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন। র আলোকচিত্র, জীবন পরিচিতি ও একগুচ্ছ সুনির্বাচিত কবিতা।

২৭

বাংলাদেশের গল্পে মাটির গন্ধ আর ছলাচ্ছল জলের শব্দ সেইসঙ্গে অদ্ভুত মানব-মানবী। তাদের অলজ্জ কাম ও নির্মম প্রতারণা। আল মাহমুদের চমকে দেওয়া গল্প 'জলবেশ্যা'।

৩

নপ্রিয় গায়ক ভূপেন হাজারিকা আগে ম.এল.এ.। একসময়ে আমেরিকায় খেটেছেন। চমৎকার ছবি আঁকেন। ভাষার একজন বড় লেখক। জানুন তাঁর অন্যদিকগুলি।

৪৯

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কাহিনী 'মালঞ্চ' চিত্রায়িত করেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী। এই চলচ্চিত্রের নান্দনিক দৃশ্যের আংশিক চিত্রনাট্য ও আকর্ষণীয় আলোকচিত্র।

কবিতা / প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, আলোক সরকার, দেবীদাস আচার্য, শোভন মহাপাত্র, দ্বিজেন আচার্য / ৮
অন্য পদধ্বনি / অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় / ৯
বাঙালী ব্যক্তিত্ব / শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ
সাক্ষাৎকার ঃ সুব্রত রাহা / ২৪
উপন্যাস কাকে বলে ? / শর্মিলা বসু / ৩৫
সাহিত্য ধাঁধা / ৩৭
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গ/তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়/৪০
জলপাইহাটি / জীবনানন্দ দাশ / ৪২
প্রতিবেশী গল্প / কুকুর / এস. কে. পোট্রেক্কাট
অনুবাদ : বোম্মানা বিশ্বনাথন / ৫৪
দুষ্ট গান্ধর্ব / সেইসব সোনালিহৃদয় সন্ধ্যার দ্রৌপদী / ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী / ৫৬
গল্প / দাস সাহেব / আশীষ বর্মণ / ৫৯
সাহিত্যে মেসবাড়ি ও মেসবাড়িতে সাহিত্যিক / বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় / ৬৩
বিষ্ণু দে-র 'ঘোড়সওয়ার' কি ড্রিম পোয়েম / প্রদ্যুম্ন মিত্র / ৬৬
বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদ / রবীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছিলেন / তাপসকুমার ভট্টাচার্য / ৬৮
বইপাড়ার খবর / ৭১
পুরনো বই ঃ নতুন পাঠক / মোহিত রায় / ৭২
সাম্প্রতিক বই / অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় / ৭৫
সাহিত্য বিতর্ক / বঙ্কিমচন্দ্র কি ইসলাম বিরোধী লেখক ছিলেন / মোহম্মদ আশরফ / ৭৭
আপনি ও গ্রহচক্র / বরাহমিহির /৭৯

প্রতিসংখ্যা তিন টাকা
বিমান মাশুল পূর্বাঞ্চলে ৩০ পয়সা
ভারতের অন্যান্য স্থানে ৪০ পয়সা

1

সম্পাদক : অশোক চৌধুরী
শিল্প নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

পাঠকের চিঠি

শিলাদিত্য পড়ে ন্যু ইয়রক থেকে কবি অমিয় চক্রবর্তী লিখেছেন ঃ

আপনাদের পত্রিকা শিলাদিত্য উৎকৃষ্ট হয়েছে। এত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও যে একটি আধুনিক ঐক বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন সেটা খুবই কৃতিত্বের কথা। পাঠক সম্প্রদায় নিশ্চয়ই পড়ে তৃপ্ত হবেন এবং নানাবিধ আনুকূল্য করবেন। …কোনো বড় রকম ছাপার ভুল বা অসঙ্গতি চোখে পড়ল না। ছবিগুলিও ভালো উঠেছে। প্রত্যেকটি লেখায় রচয়িতার সঙ্গতিজ্ঞান এবং সংহতি লক্ষ্যণীয়। বিশেষ করে বোধহয় সত্যজিৎবাবুর বিষয়ে সুন্দর প্রবন্ধটি তথ্য সমৃদ্ধ অথচ অত্যন্ত সুখ-পাঠ্য হয়েছে। প্রত্যেক লেখার সম্বন্ধে পৃথক ভাবে বলতে ইচ্ছা করে কিন্তু তার সময় এবং সাধ্য নেই। আমি শুধু প্রীতির অর্ঘ্য জানাতে চাই।

লেখায় ভাষা সম্বন্ধে আপনারা সচেতন। …দু'-একটি জায়গায় সম্পূর্ণ মাত্রা রক্ষা হয়নি, কিন্তু সব মিলিয়ে রুচি রক্ষা হয়েছে। এতটা বৈচিত্র্য প্রতি সংখ্যায় রাখতে পারবেন কিনা জানি না, কিন্তু সুমিতি এবং শোভনতা দুই-ই জানি। বৈচিত্র্যের বিপত্তি আছে, কারণ পাঠক সম্প্রদায়ের উচ্চাশা ক্রমেই বেড়ে যায়—সাধ্য মতো তাদের তৃপ্ত রাখবেন জানি।

কবিতা পাইকা অক্ষরে ছাপানো আমার সমীচীন মনে হয়। গদ্যে ছাপা বিষয়ে সে ভাবে সম্প্রসারণের অবশ্য দায়িত্ব নেই। কবিতায় যথেষ্ট জায়গা থাকলে পড়ার আনন্দ অনুভব করা সহজ এবং তৃপ্তিকর হয়। সেদিকে যদি দৃষ্টি রাখেন তাহলে আমি পাঠক হিসাবে অভিনন্দন জানাব। …আমার তো মনে হয় (কবিতার ক্ষেত্রে) স্বতন্ত্র অংশ রাখা মন্দ নয়। তা না হলে 'চোখের চলা-ফেরা' ব্যাহত হয়— খোলা আঙিনায় বাগানের ফুলের সৌন্দর্য বাড়ে। লেখক পরিচয়ের বিশেষ মূল্য আছে। পত্রিকার শেষে বা অন্য কোনো স্থানে স্বতন্ত্র জায়গা রাখতে পারলে ভালো—আপনারাই মুখবন্ধ হিসাবে কোথাও কোথাও রীতি রক্ষা করেছেন দেখে ভালো লাগল। অনেক পত্রিকাই এ বিষয়ে উদাসীন —সব মিলিয়ে মিশিয়ে যা দাঁড়ায় তা বোধহয় যথেষ্ট নয়।

আপনাদের শিলাদিত্য উত্তরোত্তর সারে-ভারে-মানে অগ্রসর হোক এই আমার একান্ত কামনা (শিলাদিত্য নামটি কেন ব্যবহার করলেন পূর্বেই হয়তো তার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু শব্দটি কঠিন শোনালেও তার মধ্যে কোনো কাঠিন্য নেই—পত্রিকার রচনাগুলিতেও কাঠিন্যের চিহ্ন নেই) অথচ অঙ্গ-সঙ্গতি রক্ষা হয়েছে……

সমরেশ বসু কি কোথাও বনড দেননি ?

প্রতিশ্রুতি আর সম্ভাবনার যে সামঞ্জস্য নিয়ে শিলাদিত্য পরপর প্রকাশিত হয়ে চলেছে তাতে আমার মতো পাঠক যে কী পরিমাণ আনন্দিত তা বলে বা লিখে বোঝাতে পারব না। তবে ভয়ও হয়। আমরা ঘর-পোড়া গোরু কিনা, সিঁদুরে মেঘ দেখলেই বুকের কোন একটা জায়গায় যেন গুরুগুরু মেঘডম্বরু শুনতে পাই। কোনো ভালো জিনিসই তো আর শেষ পর্যন্ত ভালো থাকে না। হয় বাজে হয়ে যায়, দাম বাড়ে, না হয় লোপাট হয়ে যায়। যেমন ধরুন হিমক্রীম, মাদার ডেয়ারির দুধ, হরিণঘাটার দুধ, কয়লা এইসব !

দ্বিতীয় সংখ্যার প্রচ্ছদ 'এক্সিলেনট'। নিতাই ঘোষকে ধন্যবাদ। প্রচ্ছদেই যেন

একটা জীবনচাঞ্চল্য, প্রাণময়
নিয়ে পাতার পর পাতা উল্টে
কোথাও সেই জীবনজোয়ারকে
বিরত হতে হয়নি, দেখলাম।
কথা—জোয়ারের প্রাবল্যের স্বার্থে
ও গ্রহচক্র বাদ দিন। শিলাদিত
গড়ে উঠতে চাইছে তাতে ওগুলে
না, অত্যন্ত 'চীপ'। বরং 'গ্র
এর একটা পাতা খুলতে পারেন
একটি করে দলের বিস্তৃত খবর
তাতে মনে হয় শিলাদিত্য তার
মূল্যবান হয়ে উঠবে। সমরে
কোথাও বনড দেননি ? তাঁর
অথবা আনন্দবাজারের কাছে
প্রবৃত্তির কাছে কি এখনও হার
বাংলা মঞ্চের শেষ নবাব,
পাণ্ডুলিপি, বিষ্ণু দে—এই
সম্পর্কে মামুলি ভালো বললে
হবে। 'ভালো'র চেয়েও বে
উপকৃত হয়েছি অকাদেমি
তালিকাটি পেয়ে। সংখ্যায় সং
তালিকা কি দিতে পারেন না ?
চেয়ে ভালো লিখিয়ে কি পাচ্ছেন
বাংলা নাটক তো সবারই জানা।
দেওয়ার কি দরকার ছিল।
পাতাটি, সামগ্রিকভাবে পরিচ্ছন্ন
রুচি—সব মিলিয়ে সে এক প্রাণ
দোসর 'শিলাদিত্য'।

প্রশান্ত দাশগুপ্ত, ১৬৬, বোস
কলকাতা-৩৯

P 213 325

কাগজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য নিরুপায় ও অনিচ্ছাকৃতভাবে শিলাদিত্য-র মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে আগামী সংখ্যা থেকে। তবে বাড়ছে সামান্যই। তিন টাকার জায়গায় সাড়ে তিন টাকা। পত্রিকার কলেবর ও গুণমানের কোনো সংকোচন ঘটছে না। বিষয়-বৈচিত্র্য ও অভিনবত্বে ভরা শিলাদিত্য বাজারের যে কোনো পত্রিকার চেয়ে স্বল্পমূল্য। পৃষ্ঠা সংখ্যা আশিই থাকছে।

…রোবসনের সঙ্গে আমার …াযোগ ঘটেছিল আমেরিকায়'— …ন হাজারিকা

আলোকচিত্র : দীপঙ্কর ভট্টাচার্য

…য় বিশ্বযুদ্ধের প্রাকমুহূর্ত। ফ্যাসিবাদ …বাদ বিরোধী আন্দোলন এবং কৃষক- … কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে নতুন … চেতনার পরিবেশ গড়ে উঠছে। …লে জন্ম নিল 'ভারতীয় গণনাট্য … জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার নেতৃত্বে …বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ সক্রিয়- …নাট্য' আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। …রা ভারতবর্ষ ত্যাগ করার পরও …কের অবস্থার কোনো উন্নতি ঘটল … দুর্নীতি, শোষণ, অবিচার ক্রমাগত …ল এবং তা প্রত্যক্ষ করে নতুন …া শিল্প-সংস্কৃতির মাধ্যমে নতুন … প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। সেই… যুবক ভূপেন্দ্রনাথ হাজারিকাও পথে …ন। সেই সময়ই 'অগ্নিযুগের দাবা- … গানটি অসমীয়া ভাষায় লিখে সুর … সংগ্রামী জনগণের হৃদয় তিনি জয় …ম হয়েছিলেন।

… তুললাম : গণনাট্য সংঘে আপনার … উদ্দেশ্য কী ছিল ?

…ন হাজারিকা বললেন : জ্যোতিপ্রসাদ, … রাভার মতো বিরল প্রতিভা অসমীয়া …সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিরাট নাম। …ন্নিধ্যে আসা এবং কাছ থেকে দেখা …আমার জীবনকে গড়ে তুলতে অনেক- …হায্য করেছে। তাছাড়া পরবর্তী …ষ করে লোকসংগীতের পুনরুদ্ধার ও গণসংগীতের ব্যাপক প্রচলনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার জন্য অহরহ চিন্তা করেছি এই অভিজ্ঞতা থেকেই।

অবশ্য তার আগেই ১৯৪২-৪৬ সাল পর্যন্ত ভূপেনবাবু ছাত্র-রাজনীতি করেছিলেন। ঐ সময় তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্র-নীতি নিয়ে এম এ পড়ছেন। 'মারকস সোসাই-টি'তে যোগ দিয়েছিলেন। সেই সময়ই বৃটিশ পুলিশের নজরে পড়েন। তখন একের পর এক প্রগতিশীল গান লিখে 'মুক্ত দেউল' রচনা করেছেন। ভারতবর্ষে থাকাকালীন সেরকম কোনো বিপদ না ঘটলেও বৃটিশের চোখে ভবিষ্যতের অন্ধকার গহ্বরে নিমজ্জিত করবার মতো যথেষ্ট উপাদান ছিল ভূপেন হাজারিকার

ভূপেন হাজারিকার আঁকা মায়াকোভস্কির স্কেচ

ব্যবহারে। তাই বোধহয় ভূপেনকে কিছু দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। পরে ১৯৪৯ সালে উচ্চ শিক্ষার্থে আমেরিকায় গেলেন। কিন্তু নিউইয়র্ক বিমান বন্দর থেকেই সরাসরি জেলে চলে যেতে হলো। সে কথা মনে করে হাসতে হাসতে বললেন, 'ভাগ্যিস সাতদিন জেল খেটে-ছিলাম, তা না হলে পল রোবসনের মতো বিরাট পুরুষের সান্নিধ্য লাভ এ জীবনে হতো কি না কে জানে !'

জানতে চাইলাম, সেটা কী ভাবে সম্ভব হলো ?

বেশ উৎসাহ নিয়েই হাজারিকা বললেন : 'একই জেলে একজন নিগ্রো উইলি স্মিথ ছিলেন, পল রোবসনের শিষ্য, তাঁর সঙ্গে জেলেই প্রথম আলাপ হয়। সে সময় রোবসন অন্য জেলে বন্দী ছিলেন। পরে মিঃ স্মিথের মাধ্যমে রোবসনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটে। তারপর থেকেই আমেরিকান গোয়েন্দারা সব সময়ই আমাকে নজরে রেখে-ছিল এবং ডক্টরেট পাওয়ার দিনই আমেরিকা ছাড়তে হয়েছিল, এমন কি কনভোকেশনে পর্যন্ত তারা অংশগ্রহণ করতে দেয় আমাকে।'

তবু ভূপেন হাজারিকার মতে পল রোব-সনের সান্নিধ্যই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। সে প্রসঙ্গে বললেন : আমার গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল 'গণসংযোগের মাধ্যম ও ভারতবর্ষ' এবং এরই মধ্যে একটা অধ্যায়ে ছিল 'সমাজ সংস্কারে সংগীতের প্রভাব'।

ডক্টরেট ডিগ্রিটা হয়তো ভবিষ্যতে সে ভাবে আমার কেরিয়ারে কোনো কাজে লাগেনি, কিন্তু আমার গবেষণা সমাজকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গীতে দেখার সুযোগটুকু আমাকে দিয়েছে এবং অপ্রত্যক্ষভাবে আমার জীবিকার উপরেও প্রভাব ফেলেছে।'

প্রশ্ন করলাম ঃ রোবসন সম্পর্কে আপনার মতামত কি? রোবসন কেন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন?

ঃ আমি যখন আমেরিকায় যাই তার অনেক আগের থেকেই পল রোবসন একজন বিশ্ববিখ্যাত সংগ্রামী গণশিল্পী। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে দেখার জন্য, তাঁর সান্নিধ্য লাভের জন্য আমি মানসিকভাবে তৈরি ছিলাম। সান্নিধ্যে এসে দেখলাম, পল রোবসন শুধু একজন বিশ্ববিখ্যাত গণশিল্পীই নন, প্রকৃত পক্ষে একজন জনদরদী মানুষ। ছোট ছোট মানুষগুলির (সাদা কালো নির্বিশেষে) সুখ-দুঃখ-বেদনার ভাগী হতে তাঁর কোনো রকম দ্বিধা নেই। আমি অনেক লোকশিল্পী-গণশিল্পী দেখেছি যাঁরা দুদিকেই তাল রেখে চলেন। কিন্তু পল রোবসন ছিলেন সম্পূর্ণ আলাদা। 'ওথেলো' নাটকে রোবসন 'ওথেলো' সেজে জনপ্রিয়তার চূড়ান্ত শিখরে আরোহণ করেছিলেন। সেখান থেকে একজন শিল্পী অত সহজে সমস্ত লোভ-মোহ ও অর্থের হাতছানি এড়িয়ে সাধারণ মানুষের জন্য রাস্তায় নেমে আসতে পারেন এ যেন কল্পনাতীত মানুষকে ভালো না বাসলে মানুষের জন্য এভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে না কেউ। রোবসন নিজের সম্পর্কে বলতেন ঃ I am a negro-slave's grand-son। ওয়াশিংটনের Peek Skill-এ বর্ণবিদ্বেষী ফ্যাসিসট গুণ্ডারা যখন তাঁকে মারধর করবার জন্য ষড়যন্ত্র করছিল তখন কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকরাও গুণ্ডাদের হাত থেকে রোবসনকে রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে এসেছিল। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন হাওয়ার্ড ফাসট, পিটসিগারের মতো বিশ্ববিখ্যাত শ্বেতাঙ্গ লেখক ও শিল্পীরা। উন্মাদ বর্ণবিদ্বেষীরা যখন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণে উদ্যত হলো তখন রোবসনকে মাঝখানে ঘিরে রেখে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গরা একসঙ্গে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে লাগল এবং রোবসনের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সবাই একই সঙ্গে গেয়ে উঠল—

'We shall not—we shall not be moved !
Just like a tree that's standing by the water.
We shall not be moved ! —'

লক্ষ্য করলাম কথা বলতে বলতে হঠাৎ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে একটু বাঁকা হাসি হেসে হাজারিকা বলে উঠলেন—'জিজ্ঞেস

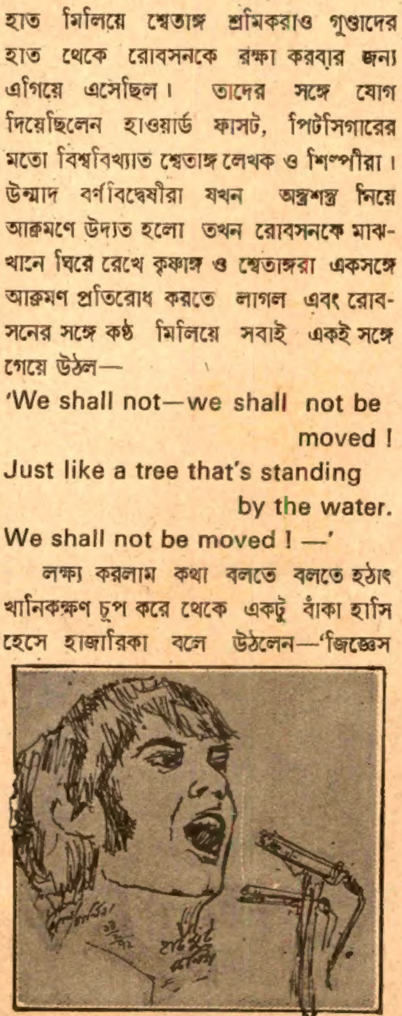

ভূপেন হাজারিকার আঁকা। গণশিল্পী হার্টমটের স্কেচ

করছেন রোবসন কেন গ্রেপ্তার
বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী ছিলেন ব
কথায় বলা যায় 'মারকসিসট' ছি
তন্ত্রের প্রসার ও প্রচারে বিশ্বা
তাই তাঁকে যখন তখন নানা অভি
বন্দী করে রাখত। গ্রেপ্তার
হতেন? জনসাধারণের কাছ
সরিয়ে রাখবার জন্য আমেরি
তাকে কি না করেছে! কোথাও য
জন্য হল ভাড়া পেতেন না রোবসন
যেতেন সেখানেই পুলিশের সতর্ক
তাঁর প্রতি। বাধ্য হয়ে রাস্তায়
রোবসন। জনচেতনা জাগ্রত
পথে পথে গান গেয়ে বেড়া
বাধা পেলে গুরু গম্ভীর অকম্প্র
'yes, I will sing. Whe
people want to hear
of peace and freedo
life.' জানেন কি পল রোব
শান্তিনিকেতনে আসার জন্য ড
কিন্তু আমেরিকা সরকার তাঁকে
আসতে দেয়নি। তাই রোবস
ভাব প্রকাশ করে বাংলায়
টেপ করে পাঠিয়েছিলেন শা
সেই শুভেচ্ছা আমরাই রে
বাংলায় লিখে দিয়েছিলাম।
ঠিক ভাবে উচ্চারণ ক'রে টেপ
রোবসন। তাতে মোটামুটি বল
'ভারতবর্ষের সংগ্রামের জন্য আ
রইল। আমাকে এরা (আমে
যেতে দেয়নি বলে যেতে পারল
মুহূর্তে আমার মন কিন্তু শান্তি
রইল।'

লটালাম। জানতে চাইলাম
নও কি চাকরি করেছেন ? সাড়ে
করি করতে হয়েছিল। গৌহাটি
কলেজে লেকচারার হিসেবে ছয়
কাশবাণী গৌহাটি, কলকাতা ও
মোট দেড় বছর এবং গৌহাটি
লয়ে রাষ্ট্রনীতির অধ্যাপক হিসেবে
ছর। সব জায়গাতেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে
অমিল ঘটায় চাকরি ছাড়তে বাধ্য
। ডঃ হাজারিকার ভাষায় ঃ 'চাকরি-
নিজেকে বাকসবন্দী বলে মনে হতো ;
ত্র স্বাদ পাবার জন্য চাকরি ছেড়েছি।'
পর আর কথনো চাকরির চেষ্টা
ন ভূপেনবাবু। বরং শুরু করেছিলেন
যাযাবরের জীবন। মনের তাগিদে
ব্রহ্মপুত্র দুই নদীতেই বিচরণ করতে
লেন। এরই মধ্যে একদিন শুরু করলেন
চিত্র প্রযোজনা। নিজের কাহিনী, সংগীত
পরিচালনায় ১৯৫৬ সালে নির্মিত হলো
া বাটর সুর' (ফেলে আসা পথের সুর)।
মীয়া চলচ্চিত্র ইতিহাসে এক নতুন ধারা
র্তিত হলো এই ছবিতে। বক্স অফিসেও
রেকরড সৃষ্টি করল। এসে গেল
য় যাবার পালা। ১৯৫৮ সালে তৈরি
লেন বাংলা ছবি 'মাহুত বন্ধুরে'। বইটি
ভাবে না চললেও বাংলা চলচ্চিত্র জগতে
পন হাজারিকাকে আলাদা সম্মান দিয়ে-
। তারপর ১৯৬০ সনে অসমীয়াতে
স্তলা' তুললেন। '৬২ সনে 'প্রতিধ্বনি'
'৬৪ সনে 'লটিঘটি' (ওলট-পালট)।
পর তিন বছরই ছবি তিনটি শ্রেষ্ঠ
লিক ছবি হিসেবে রাষ্ট্রপতির পদক
। ১৯৬৭-৬৮ সনে সর্বশেষ ছবি করেন

ভূপেন হাজারিকা সম্পাদিত পত্রিকা

'চিকমিক বিজুলী'। অভিনেতা হিসেবেও ভূপেন হাজারিকাকে তাঁর শেষ ছবিতে দেখা গেছে।

ভূপেন হাজারিকা চলচ্চিত্র প্রযোজনা, পরিচালনা ও সংগীত নিয়ে যখন মেতেছিলেন সেই সময়েই ১৯৬২-৬৩ নাগাদ পত্রিকা সম্পাদক হিসেবেও নিজেকে সক্রিয়ভাবে জড়িত করেন। সখের পত্রিকা বা লিটল ম্যাগ নয়। রীতিমতো একটি ব্যবসা-বাণিজ্য সফল পত্রিকা। একজন কৃতী গায়ক যে একজন সার্থক সম্পাদকও হতে পারেন তার প্রমাণ রয়েছে ঘরে সাজানো তাঁরই সম্পাদিত অসমীয়া জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকার অজস্র সংখ্যা। নাম 'আমার প্রতিনিধি'। কলকাতার মহাত্মা গান্ধী রোড থেকে প্রকাশিত অসমীয়া পত্রিকাটি তিনি একনাগাড়ে প্রায় কুড়ি বছর সম্পাদনা করছেন। পত্রিকাটি হাতে নিয়ে উলটে-পালটে দেখতেই নজরে পড়ল ভূপেন হাজারিকার স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়। তাছাড়া 'শিল্পীর পৃথিবী' নামে একটা ফিচার নিয়মিত লেখেন। বিভিন্ন পাঠকের চিঠির উত্তর দেন 'সহস্র জনে মোরে প্রশ্ন করে' কলমে।

আমি প্রশ্ন করলাম ঃ কি করে সম্ভব হয় ? সময় পান ?

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অত্যন্ত সহজভাবে বললেন ঃ কেন ? প্রতিদিন খুব সকালে ও রাত্তিরে এই পত্রিকার সম্পাদনা সংক্রান্ত সর্বকিছু কাজ করি।

ঃ বর্তমান বাংলা সাহিত্য ও গান সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী ?

একটু সময় নিয়ে চিন্তিতভাবে বললেন ঃ বড় কঠিন প্রশ্ন। তবু যা দেখছি তাই বলি—ভারতীয় মূল ভাষা যে কটি আছে তার মধ্যে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সবচেয়ে বেশি ইতিবাচক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এবং সারা ভারতবর্ষ তাকিয়ে থাকে 'আজ কী সৃষ্টি হলো বাংলায়'। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। তারপরই আমি মনে করি বিশেষ করে সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে মালয়ালাম ও মারাঠী, বাংলার পরে এই দুটোই আমার চোখে ধরা পড়েছে। এর বেশি কিছু বলতে পারব না।

শুধু পত্রিকা সম্পাদনাই নয় তিনি এক সময় সক্রিয় রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। উত্তর-পূর্ব আসামের নাওবৈচা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে আসাম বিধানসভায় ছিলেন ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত বিরোধী পক্ষের নির্দলীয় সদস্য হিসেবে। আসামের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের তাগিদেই এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিশেষতঃ কয়েকটি গঠনমূলক বিষয়ের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল।

তিন সর্বজ্ঞার সাহিত্য সম্মেলনের আসরে

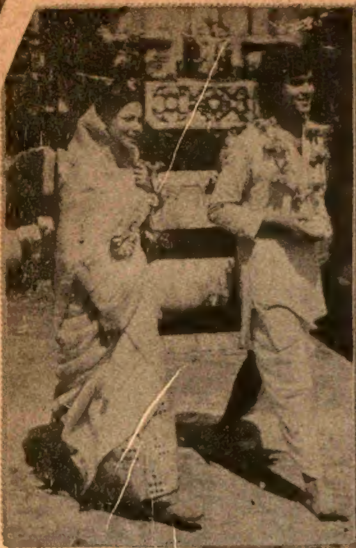

ভূপেন হাজারিকা পরিচালিত
'মন প্রজাপতি' চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য

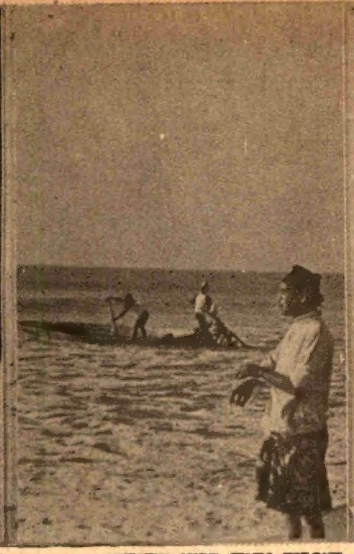

সমুদ্রের ধারে অন্য ভূপেন

১৯৭২ বার্লিনের পথে ভূপেন হাজারি

যেমন, রবীন্দ্র ভবন মঞ্চ, একটা আর্ট গ্যালারী ও স্বল্পমূল্যে কাজ করার মতো একটা চলচ্চিত্রের স্টুডিও তৈরি। একাজে সফলও হয়েছেন তিনি। গৌহাটীতে অবস্থিত 'জ্যোতিচিত্রবন' আজ ভারতবর্ষের একমাত্র সরকারী স্টুডিও।

আর হয়তো কখনো সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবেন না, কিন্তু রবীন্দ্র ভবন মঞ্চ, আর্ট গ্যালারী বা স্টুডিওর পরেও যা থাকছে তা ভূপেনবাবু অস্বীকার করেন না। একজন এম এল এ বা এম পি-র ক্ষমতা যথেষ্ট, তাঁরা ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারেন। ভূপেন হাজারিকার মতে। অশিক্ষায় ভরা সমাজে বর্তমান সংসদীয় প্রথা সমস্যার সমাধান বিলম্বিত করে। তবু ছোট ছোট মানুষগুলির অন্তরের কথা বিধানসভা বা লোকসভার মাধ্যমে সরকারের কাছে অনেক সহজে পৌঁছে দেওয়া যায়।

নতুন নতুন গান লেখা ও তাতে সুর দেওয়া যেমন কমপোজিট আর্ট তেমনি ছবি আঁকাটাও ভূপেন হাজারিকার কাছে এখনো সমান আনন্দ দেয়। তাই মাথায় নেপালী টুপি, মুখে সিগারেট, পরনে সূক্ষ্ম কাজ করা পাঞ্জাবী ও ডোরা কাটা লুঙ্গি, হাতে তুলি ভূপেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম : ছবি আঁকেন কখন? সময় পান কতটুকু?

বাঁ হাতে মুখের সিগারেটটা সরিয়ে স্বভাব-সুলভ হাসি ফুটিয়ে বললেন : আগে নিয়মিত আঁকতাম, এখন সময় পাই না, তবু মাঝে-মধ্যে আঁকি।

সামনের অসম্পূর্ণ ছবিটার দিকে তাকিয়ে তার মর্ম বুঝতে চেষ্টা করলাম। তাড়াতাড়ি নিজেই বললেন : মায়াকোভস্কির ছবি। শেষ হয়নি। একটু অপেক্ষা করুন। বুঝতে পারবেন।

দেখলাম তুলির কয়েকটা আঁচড়ে মুহূর্তে একটা চেনা মুখ ভেসে উঠল। নানান কোণ থেকে ছবিটাকে বেশ কয়েকবার দেখতে থাকলেন ভূপেনবাবু। আর আমি দেখছিলাম তুলি হাতে শিল্পীর মুখখানা। সাফল্য তাঁর হৃদয়ের আনন্দে তৃপ্ত মুখাবয়বে ছায়া ফেলেছে। হাতের তুলিটা ঠিক জায়গায় রেখে পাশের সোফাতে শরীরটা এলিয়ে দিলেন আলতোভাবে।

আমি জানতে চাইলাম তাঁর ছবি আঁকা সম্পর্কে।

বললেন : আমি বরদাচরণ উকিলের ভাই রণদাচরণ উকিলের 'স্কুল অব আর্ট'-এ বেনারসে থাকার সময়ে আঁকা শিখেছিলাম। নিউইয়র্কে Prang Education Centre-এ আমার ছবির একটা একক প্রদর্শনীও হয়েছিল। তারপরই সেখানকার 'আর্ট স্টুডেন্টস লিগ'-এ যোগ দিই।

: নিজের বইয়ের মলাট আঁকার ইচ্ছে হয় না?

: মায়াকোভস্কির 'ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন' কবিতার বইটা অনুবাদ করছি

ভূপেন হাজারিকার আঁকা পুরীর সমুদ্রতীরের দৃশ্য

অসমীয়াতে। ভাবছি এর মলাটটা আমি আঁকব। আমার লেখা বাচ্চাদের ছড়া বইটারও মলাট আঁকার ইচ্ছে ছিল, সময়ে অভাবেই কাজটা করে উঠতে পারিনি।

ছড়ার বই ছাড়াও তাঁর বেশ কয়েকখা বই বাজারে রয়েছে যা থেকে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা এনে দিতে পারে ডঃ ভূপে হাজারিকাকে। জানতে চাইলাম : আপন লেখা বইগুলির বিষয় কী? গল্প কবিতা? আপনার সাহিত্যের মূল ম বা কী?

: আমি কখনো উপন্যাস লিখিনি বেশির ভাগই গীত-সাহিত্য। তারপর নন্দনতত্ত্বের বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ ও রচনা ভ্রমণ কাহিনী লেখা হয়েছে। বাচ্চাদে জন্য লেখা ছড়ার বইটা ১৯৭৮ স রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পেয়েছিল। আরো বই লেখার ইচ্ছে আছে। আগামী সেপটেমবর কলকাতা থেকে রওনা হ সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের এশিয়ান সেকট আমন্ত্রণে ৩০ সেপটেমবর ব্যাঙ্ককে গাইব। সেখান থেকে জাপানে। RO (People Song) প্রগতিবাদী একটি স প্রতি বছর সারা পৃথিবী থেকে সাতজ আমন্ত্রণ জানায়। গত বছরও গিয়েছিল এবারও ডেকেছে। জাপানের বিভিন্ন বি বিদ্যালয়ে গান গাইব। তার মধ্যে ওসাকা বি বিদ্যালয়ও রয়েছে। তারপর নিউইয়র্ক, ল হয়ে কলকাতায় ফিরব। ফিরে এ এর উপর একটা বই লিখব।

: এ পর্যন্ত ক'খানা বই প্রকাশ হয়েছে

: সংখ্যার দিক থেকে খুব বেশি ন তবে প্রত্যেকটা বই-ই বাজারে ভাল ক পায়। যেমন গানের বই বলতে জিলিকাব লুই তরে পার, (২) সংগ্রাম

পুরো নাম ঃ
ভূপেন্দ্রকুমার হাজারিকা।

ঘনিষ্ট মহলে ঃ
ভূপ।

জন্ম তারিখ ঃ
২৫ সেপটেমবর ১৯২৬।

জন্মস্থান ঃ
সদিয়া, আসাম।

আদি বাড়ি ঃ
নাজিরা, আসাম।

প্রধান জীবিকা ঃ
গান ও লেখা।

গান গাওয়ার ব্যাপারে সংস্কার ঃ
গাওয়ার আগে আমার স্বর্গীয়া 'মা'র আশীর্বাদ ভিক্ষা।

অবকাশ বিনোদন ঃ
ভ্রমণ ও মাছধরা।

রেওয়াজের সময় ঃ
ভোর।

নেশা ঃ
বিতর্কমূলক আড্ডা।

স্মরণীয় কোনো অভিজ্ঞতা ঃ
প্রমথেশ বড়ুয়ার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ।

সঙ্গীতে অনুপ্রেরণা ঃ
মা-বাবা, জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা, বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা ও পল রোবসন।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা ঃ
লোকসঙ্গীতের একটি গবেষণাগার খোলা।

প্রিয় লেখক ঃ
হাওয়ার্ড ফাস্ট (স্পার্টাকাস)।

প্রিয় গায়ক ঃ
৺শচীনদেব বর্মণ।

প্রথম প্রকাশিত রেকর্ড ও সাল ঃ
একটি অসমীয়া গানের রেকর্ড, ১৯৩৬।

প্রথম প্রকাশিত বই ঃ
জিলিকাব লুইতরে পার (উজ্জল হবে ব্রহ্মপুত্রের পার) অসমীয়া ভাষায়, প্রকাশক ঃ ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ।

পছন্দ ঃ
পিকাসোর পেইনটিং।

অপছন্দ ঃ
তীব্র গতির ড্রাইভিং।

কি ধরনের সঙ্গী পছন্দ করেন ঃ
যাদের চিন্তা ইতিবাচক।

ভয় ঃ
কূপমণ্ডূকের দর্শন।

সখ ঃ
ফুটবল খেলা দেখা।

ঘনিষ্ঠ বন্ধু / সুহৃদ ঃ
ও. সি. গাঙ্গুলী ও মন্টু ঘোষ।

প্রিয় খাবার ঃ
ইলিশ আর চিংড়ি।

প্রিয় বই ঃ
রুটস, ন হন্যতে।

প্রিয় গান ঃ
সাগর সঙ্গমে সাঁতার কেটেছি কত।

সবচেয়ে আনন্দদায়ক স্মৃতি ঃ
গণনাট্য সঙ্ঘের দিনগুলি।

সবচেয়ে বিষাদময় ঘটনা ঃ
আমার মার ক্যানসারে মৃত্যু।

আজি, (৩) আগলি বাঁহরে লাহরি গগনা, (৪) বহ্নিমান ব্রহ্মপুত্র। আর প্রবন্ধের বই হলো—(১) সুন্দরর ন-দিগন্ত, (২) সুন্দরর সরু বর আলিয়েদি, (৩) সময়র পথী ঘোঁরাত উঠি। এবং একটি মাত্র ছড়ার বই —(১) গানে গানে অ আ ক খ। হাসতে হাসতে বললেন ঃ আমি যখন থাকব না তখন এই বই আর গানের রেকর্ডগুলোই আমার স্মৃতি বহন করবে। তাছাড়া ইচ্ছে আছে লোকসংগীতের একটি সংগ্রহশালা করার। জানি না সময় পাব কি না। ওটা করে যেতে পারলে এ পৃথিবীতে জন্মানোটা সার্থক হবে।

হঠাৎ একজন এসে ঘরে ঢুকলেন। ভূপেনবাবুর হাতে একটি টেলিগ্রাম ও চিঠি দিয়ে চলে গেলেন। চিঠিটা পড়তে পড়তে তিনি বেশ গম্ভীর হয়ে উঠলেন। ভাবলাম বোধহয় পারিবারিক কোনো দুঃসংবাদ। জিজ্ঞেস করেই বসলাম ঃ কি, কোনো খারাপ সংবাদ?

ঃ খারাপ আর কি? আসামের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। প্রতিবছরই বন্যায় ভাসিয়ে নেয়। আর দুর্গত মানুষরা আমাকে লিখে জানায় তাদের অশেষ যন্ত্রণার কথা।

আমি বললাম ঃ এর কি কোনো প্রতিকার নেই?

প্রশ্ন শুনে এতটুকু সময় ব্যয় না করে আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন ঃ প্রতিকার চায় কেউ?......খানিক চুপ করে থেকে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে আমায় বললেন ঃ প্রতিকার নিশ্চয় আছে, কিন্তু উদ্যোগ নেই। শুধু পরিকল্পনাই হচ্ছে—কার্যকর হচ্ছে না।

প্রসঙ্গ পাল্টে ভূপেনবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ঃ রাজনীতি, চিত্র-পরিচালনা, ছবি আঁকা, সাহিত্য ও গানের মধ্যে কোনটি আপনার আত্মপ্রকাশের সার্থক বাহন?

উত্তর লখিমপুরের বন্যা পীড়িতদের মাঝখানে ডঃ ভূপেন হাজারিকা

বললেন ঃ আমার পক্ষে গান।

ঃ কেন?

ঃ কারণ পরিবেশ আমাকে বাধ্য করেছে গায়ক হতে। আমার বাবা ও মার এব্যাপারে উৎসাহ ছিল অপরিসীম। তাছাড়া কৈশোরেই জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার মতো এক বিরল প্রতিভার সান্নিধ্য আমাকে গানের জগতে প্রোথিত করেছে। আর যখন যুবক তখন আমি লাভ করি বিশ্ববিখ্যাত জনদরদী শিল্পী পল রোবসনের সান্নিধ্য। অতএব গান আমার আত্মপ্রকাশের সার্থক বাহন এতে কোনো সন্দেহ নেই। সাহিত্যেও আমার বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল। পারফর্মিং আর্টিস্ট হিসেবে যখন আমি অবসর নেব, তারপর সাহিত্য ও ছবি আঁকা নিয়ে বসব।

স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে যে, ডঃ ভূপেন হাজারিকা যদি গায়ক-গীতিকার-সুরকার না হতেন তাহলে কী হতেন? এ লেখা পড়ে নিশ্চয় সবাই বলবেন ঃ চিত্র পরিচালক। কিন্তু পাশাপাশি আরো কয়েকটা দিক রয়েছে—রাজনীতিজ্ঞ অথবা চিত্রকর। কিন্তু অসমীয়া ভাষায় লেখা তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ সম্ভারের কথা মনে রাখলে সাহিত্যিক হিসেবেও অস্বীকার করা যায় না তাঁকে।

অমর দে

আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক সংগৃহীত

পোড়োবাড়ি

আলোক সরকার

অপরিযাপ্ত ফসল আর ওই কৃষক
কৃষক কাজ ক'রে চলেছে হাত ভরে উঠছে ধানের গুচ্ছ
রোদ ঝলমল করছে উৎসব শ্রমময় একটা উৎসব
শ্রমটা কোথাও দেখবে না, কেবল ওই কৃষক।

দুলে উঠছে নিবিড় একটা স্বর্ণিল, দুলে উঠছে প্রতিমুহূর্ত
নিঃশব্দ আর একাগ্র আর প্রাণনা, নিঃশব্দ আর একাগ্র
ফেটে ফুটে উঠতে চাইছে আভা, তাকে কোথাও দেখবে না
কেবল একটা অনুপস্থিত—আঁধারময় সেই বিরাম।

মেঘ যখন লাফিয়ে উঠবে সূর্যে ভরাদুপুরে ডেকে উঠবে কাক
পোড়োবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবে দমকা ঘুরে পেঁচিয়ে হারিয়ে যাবে দিগন্তে।
এইসব নিরর্থ অকিঞ্চিৎ, কে মনে রাখছে তার কথা!
রোদ ঝলমল করছে উৎসব দুলে উঠছে নিবিড় ওই স্বর্ণিল।

দেখো ওই নিবিড় স্বর্ণিল শ্রমবিবর্জিত ওই কৃষক
বর্ণ আর দীপ্তি আর উল্লাস—না চাইতেই কণ্ঠে দোলায় মালা
হাত ধরাধরি করে ঘনিয়ে তুলবো সখ্য প্রাণময়তা ছিঁড়ে ছিনিয়ে নিচ্ছে ফসল
মুঠো উপচে পড়ছে আমাদেরও—শ্রমময়তা গুমরে মরুক পোড়োবাড়ি।

তুমি কতোদূরে গেছো

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

তুমি ঠিক কতোদূরে গেছো, আমি বুঝতে পারি না।
এক শহরেই আছো, মাঝেমাঝে চিরকুট লেখো।
এদিকে সমুদ্র এসে আমাদের মাঝখানে জাঁকিয়ে বসেছে।
উড়ো চিল ঢেউ ছুঁয়ে লাফ দেয়; হাওয়ায় পৃথিবী কেঁপে ওঠে।

তুমি কি খারাপ আছো? ভালো আছো? নাকি ভালো নেই?
আমি যে কেমন আছি, তা কি আমি জানি! তুমি জানো?
ভালো থাকা, ভালো না থাকার মধ্যে আকন্দের ফুল ভেসে যায়।
এখুনি এখানে ছিলো, তারপরে আবার ওখানে ॥

সমুদ্র শাসন করে। এতো জল একসঙ্গে কখনো দেখিনি।
স্বপ্নে তাড়া ক'রে ফেরে; ঘুম ভেঙে গেলে, তাড়া করে।
এক শহরেই আছো, মাঝেমাঝে টেলিফোন করো।
ভৌতিক চাঁদের আলো আমাকে বলে না, তুমি কতোদূরে গেছো ॥

সাপুড়ে

দেবীদাস আচার্য

তার হাতে ঝাঁপি ছিল কয়েকটা
সাপের খেলা—বলে ডুগডুগি বাজাতেই
বেশ ভীড় জমে রাস্তায়
সাপের প্রকৃতিতে মানুষ নেই অথচ অনেক মানুষই
অযথা সাপ, তাই মানুষের বদলে সে
সাপেরই খেলা দেখায়।
হঠাৎ হঠাৎ নেচে উঠতে কোনও সাপ নিতান্ত ভালবাসে না
তবুও বাঁশীর হাওয়া গায়ে পেলে প্রাচীন বিশ্বাস ভুলে
মাঝে মাঝে ঘাড় নেড়ে ওঠে
এই সুগভীর সংবাদে সে
সুখ-ঝাঁপি থেকে একটা গোখরো আর
মোহ-ঝাঁপি থেকে একটা কেউটে টেনে বার করে।

পাল্কি

শোভন মহাপাত্র

ছিটকে পড়ে অদেখা সেই পাতা
না-গোধূলি না-সন্ধ্যা-বিহ্বল দু'টি তারা
জ্বলছে পাতা আঁচলডুরি স্বপ্ন কুর্চি ফুল
না সেই পাথর না শ্যাওলা অলীক স্বপ্নময়
কবে যে সেই পুঁটলি মাথায় নিমতা যাওয়া
সাপকাটি নথ মথের ডানা ঝুমকো ফুলের ছোট্ট সিঁথি
পশম রঙের মৃত্যু এবং সিঁদুরটিয়া

ঘুমিয়েছিল শর্ষেক্ষেতে সবুজ এবং নীল পাল্কি
দুলছে দোদুল দোলায় কে সে কোন বাসনা
মহুয়াতলা ভাঙছে আলো মনে পড়ছে লাল বাঁকুড়া
চালের হাঁড়ি কলাপাতা
সিন্নি এবং পায়েস রে বউ

ধূ ধূ স্মৃতি এখনও সেই মাদল ঘুঙুর
ঝিন্নী নামের আদুল বউটি।

বাঘ

দ্বিজেন আচার্য

'বাঘ--বাঘ' বলে, হা-হা করে
ছুটে এল আদিবাসী মেয়ে—
ছুটে যাই বন্দুক বাগিয়ে। করি আস্ফালন।
হেঁকে বলি: কোথায়—কোথায়?

সে, তির্যক ছায়া ফেলে আমাকে দেখায়!

অন্য পদধ্বনি

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি বাড়ি ফিরে আসায় পিলু ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। পিলুর সব ছিল, গাছপালা, শস্যক্ষেত্র, বনজঙ্গল, খোঁড়া গরু—সব। কেবল দাদা নেই। দাদা ফেরার। সে নিজে কত জায়গায় দাদাকে খুঁজতে গেছে। নিবারণ দাসের আড়তে গিয়ে বলেছে, দাদা আমার কোথায় চলে গেল। রেলগাড়ি চড়ে দাদা চলে গেছে। রেলগাড়ি কতদূর যায়। সকাল বিকেল সে স্টেশনে গিয়ে বসে থাকত, দাদাটা যদি ফেরে। বাবা বলতেন, মতিভ্রম। মতিভ্রম না হলে এমন হয় না।

বাবার সম্বল ছিল তখন গ্রহগুরু। সকাল হলেই গ্রহগুরুর দরজায় হাজির হয়ে ডাকতেন, ও সুবল, কিছু টের পেলে?

গ্রহগুরু বলত, ভালই আছে কর্তা। ভাববেন না। সব গ্রহের ফের। ফিরে আসবে।

বাবা বলত, তখন একটা ভাল কাজ মানু ঠিক করে দিল, ক'জনের হয়। মানুর বন্ধু এই করে বাড়ি গাড়ি সব করেছে। তোর যে হতো না কে বলবে। তুই একটু ধৈর্য ধরে কাজটা শিখতে পারলি না। চিরকুটে লিখে রেখে গেছে,—আমি যাচ্ছি, ভাববেন না। বড় হয়ে ফিরব।

বাড়ি ফিরে আমার খুব একটা মুখ ছিল না। তিন চার মাস বাড়ি ছাড়া—মা নাকি একদিন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। আর বাবাকে দোষারোপ করছিল। আমি যা ছিলাম তাই আছি। বড় হয়ে ফিরব এই চিরকুটটি বাবা পুঁটলিতে ঠিক যত্ন করে বোধ হয় রেখে দিয়েছেন। আসলে আমার মুখ নেই। বাবাই খবর পেয়ে আমাকে গিয়ে নিয়ে এসেছেন। আমার বড় হওয়াটা কী, বাড়ি ফিরে নিজেও বুঝতে পারছিলাম না।

দু-তিনদিন পিলু আমার সঙ্গ ছাড়ল না। আমি যেখানে পিলু সেখানে। কী জানি, আবার যদি দাদা ফেরার হয়। দাদাটি তার বড় হয়ে কেমন জানি হয়ে যাচ্ছে। মা-বাবার জন্য টান নেই। ভাই-বোনের জন্য ভাবে না। মায়া তো বাড়ি ফিরে এলে রাস্তায় দৌড়ে গিয়েছিল। তারপর জড়িয়ে ধরে ভ্যাক করে কেঁদে দিয়েছিল।—'দাদা তোর সঙ্গে আর আমরা কথা বলব না। কোনদিন কথা বলব না।' তারপর দৌড়।—'মা, বাবা দাদাকে ধরে এনেছে।' প্রায় চোরের মতো দেখছি সব। পলাতককে দেখার জন্য কলোনির ধীরেনের মা, গোপালের পিসি, সুবোধ, পল্টু যেখানে যে ছিল ছুটে এসেছিল।—'কোথা থেকে ধরে আনলেন?' কত রকমের প্রশ্ন। তখন পিলুই আমার ত্রাণকর্তা। সে ডাকল, 'দাদা, এদিকে আয়।' বলে সে আমাকে বাড়ির পেছনটাতে নিয়ে গেল।—'খোঁড়া গরুটার বাচ্চা হয়েছে—আয়, দেখবি।'

বাড়ি থেকে ফেরার হবার পর তিন-চার মাস কী ঘটেছিল পিলুই

সব এক এক করে বলল। দু-তিনদিন শুধু এই। একটা কথা মনে হয় আর বলে,—'বুঝলি দাদা, সেই লোকটা রে—গোবিন্দ না কী নাম, সকালে মানুকাকার কাছে হাজির। বলল, 'মানুকর্তা, আপনার ভাইপো কুড়ি টাকা চুরি করে পালিয়েছে।'

—বলল!

—কী মিছে কথা, বল! তুই কখনও চুরি করতে পারিস? আমি বড় হলে লোকটার মুখ ঘুষি মেরে ভেঙে দেব। কী সাহস, আমার দাদার নামে মিছে কথা!

আমি বললাম, না, মিছে কথা বলেনি রে! গোবিন্দর কৌটো থেকে কুড়ি টাকা নিয়েছি?

—সত্যি নিয়েছিস।

—তা না হলে ট্রেনে চড়ে যাব কী করে!

পিলু কেমন গুম মেরে গেল। এতদিন যে বিশ্বাস দাদার উপর ছিল তা যেন নিমেষে উবে গেল। খুব কষ্ট হচ্ছে পিলুর। সান্ত্বনার স্বরে বললাম, 'গোবিন্দদার কৌটোয় আর একটা চিরকুটে লিখে গেছি।'

—কী লিখে গেছিস?

—টাকা মান যশ হলে সব দিয়ে দেব।

পিলুর পায়ে বোধ হয় একটা পিঁপড়ে কামড়েছিল, সেটা সে ঝেড়ে ফেলে বলল, 'মানুকাকাকে তা বলেনি। জানিস দাদা, তুই কাউকে বলিস না, একদিন বিকেলে না আমি গেছি। রেললাইন পার হয়ে গেছি। লোকটাকে আমি চিনে রেখেছি। বড় হই, তারপর মজা দেখাব।'

পিলু কি জানে, গোবিন্দ আমাকে মারধোর করত? বাবার কত বড় বাসনা ছিল, আমি একজন মোটর মেকানিক হই। একটা গ্যারেজে মানুকাকা ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কমপারটমেনটাল পরীক্ষা পাশ করলে এর চেয়ে বড় সুযোগ আর নাকি মিলবে না। বাবাকে মানুকাকা এমন বোঝাবার পরই গ্যারেজের কাজটা বাবার কাছে হাতে-পাওয়া স্বর্গ ছিল। সেসব ছেড়ে ফেরার হওয়ায় বাবা নাকি খুব মনোকষ্টে ভুগছিলেন।

মা, জানিস, খুব ক্ষেপে যেত। একেবারে রণচণ্ডী। কি মানুষ রে বাবা, ছেলেটা কোথায় ফেরার হলো কোনো খোঁজখবর করছে না কেউ।

বাবা বলত, 'গেছে যখন ফিরে আসবে। কার জন্য তবে গাছপালা লাগিয়েছি, বাড়িঘর করেছি। ছেলে বোঝে না—কার জন্য!'

—আর ফিরেছে!—বলেই মার কান্না।

—আরে ফিরবে। দেখোনা দু-চারদিন। না খেতে পেলেই সুড়সুড় করে ফিরে আসবে।

—তুমি আমাকে জ্বালিও না।

সেই বাবা নাকি তিন-চারদিন পর নিজেই সকালে উঠে গ্রহগুরুর কাছে গেছিলেন। এ-দেশে আসার পর বাবার অনেক নতুন বিষয়ের উপর বিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল। যেমন তাঁর গ্রহগুরু। তিনিই ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান। গ্রহগুরুর কাছ থেকে খবর নিয়ে এসে মাকে জানালেন, 'খুব বেশি দূরে যায়নি। কাছে পিঠে কোথাও আছে। মতিচ্ছন্নভাব কাটলেই চলে আসবে। ওটা এ বয়সে হয়। একটু গৃহহারা হবার সখ জাগে। তারপর নাকানিচুবানি—সংসার নিত্য হা-করা জিভ, সব গিলে খেতে চায়। যখন বুঝতে পারবে সুড়সুড় করে বাছাধন ফিরে আসবে।' তারপরই বাবা গাছের সব চেয়ে পুষ্ট আতা, পেঁপে এবং একথালা চাল ডাল, গ্রহগুরুর সেবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বাবার বিশ্বাস, গ্রহগুরু সন্তুষ্ট থাকলে সংসারে কোনো অমঙ্গল ঢুকতে পারে না। তাঁর পুত্র যেখানেই অবস্থান করুক কোনো অমঙ্গলের ভয় নেই।

মা আমার জেদি এবং একরোখা। দেশ ছেড়ে আসার পর ওটা আরও বেড়েছে। বাবার প্রতি তাঁর বিশ্বাস কম। সর্বকিছুতে অদৃষ্টবাদী যে মানুষ তাঁকে মা বিশ্বাস করেন কী করে। এ-দেশে আসার পর মার মতে বাবারও স্বভাব খুব একটা ভালো ছিল না। দেশের কে কোথায় এসে উঠত এবং একটু আশ্রয় এবং অন্ন সংস্থানের নাম করে তিনি প্রায়ই ফেরার হতেন। একদিনের নাম করে গেছেন। ফিরে এসেছেন মাস পার করে। সেই বাবার ছেলে আমি। বাপের স্বভাব ছেলে পাবে, মার এটা জানাই ছিল। বাবার অবিচল গ্রহভক্তিতে মার মেজাজ নাকি খুবই তিরিক্ষি ছিল। কথায় কথায় কান্না জুড়ে দিত। রাতে ঘুমাত না। গাছের একটা পাতা খসে পড়লেও উঠে বসত। পিলু জানাল, বাবা ঘুমালে মা আর সহ্য করতে পারত না। যার ছেলে নিখোঁজ সে এভাবে নিদ্রা যেতে পারে!—তুমি কি মানুষ মা! দেখ পিলু, কে বলবে তোর দাদা বাড়ি নেই। কে বলবে দেখে, আমাদের সময় খারাপ। কেমন নিশ্চিন্তে হা করে ঘুমাচ্ছে। চেঁচামেচিতে রাতে বাবার ঘুম ভেঙে গেলে বলতেন, ঘুমাও ধনবৌ। মন শান্ত কর। শরীর নষ্ট করে লাভ নেই। তেনার ইচ্ছের উপর আমাদের হাত নেই। শুধু লড়ালড়ি সার। বলে বাবা আবার শুয়ে পড়তেন এবং কুম্ভকর্ণের মতো নিদ্রায় মগ্ন হতেন।

বাবার নিস্পৃহতা যখন চরম বোধ হতো, মা আহার বন্ধ করে দিতেন। এটাই ছিল বাবার প্রতি মার মোক্ষম ওষুধ প্রয়োগের বিধি। বাবা খুব বিড়ম্বনা বোধ করতেন। খোঁজাখুঁজি শুরু হতো। মানুকাকার কাছে ছোটাছুটি, গ্যারেজে ছোটাছুটি, চিরকুটটি আমার হস্তাক্ষরে লিখিত কিনা, না গুমখুন, এসব নিয়ে বাবার দুশ্চিন্তা দেখা দিলে, ঠাকুরঘরে ঢুকে যেতেন। যখন একান্ত অসহায় তখন দেশ থেকে আনা শালগ্রামশিলা ভরসা। পুজোর ঘরে বসে রোজ একশ একটা তুলসীপাতা শালগ্রামশিলার মাথায়। মার তাতেও ভরসা কম। বিপদনাশিনী ব্রত প্রতি বৃহস্পতিবার শুরু করে দিলেন। এই করতে করতে বাবার কাছে এক চিঠি হাজির।—আপনাদের বিলু রহমানের কাছে আছে। ঠিকানা সমেত চিঠি পেতেই বাবা দুর্গানাম সম্বল করে সোজা বর্ধমান।

ফিরে আসার পর পিলু কলোনির সর্বত্র খবর দিয়ে এসেছে, দাদা ফিরেছে। দাদা আমার কত বড় হবে, দেখিস। একা একা বর্ধমান চলে গেছে। দাদা এম এ বি এ পাশ করবে। আমার বাবাটা না দাদাকে ড্রাইভার বানাতে চায়। আচ্ছা, বাবা যে কী না। মানুকাকা যে কী না! এক বিষয়ে ফেল করলে কী হয়? বাবা তো বলেছে, কিছু হয় না। বাবা তো বলেছে দশটা বিষয়ের মধ্যে একটা বিষয়ে ফেল! কী হয়েছে তাতে, জীবনে কে কবে সব বিষয়ে পাশ করে! সেই বারাটাই মানুকাকার বুদ্ধিতে দাদাকে গ্যারেজে ঢুকিয়ে দিল। আমরা গরিব বলে মান সম্ভ্রম নেই! দেশবাড়িতে থাকলে মানুকাকা এমন বলতে সাহস পেত! দাদা চলে গিয়ে বেশ করেছে। এখন বোঝো!

সেদিন বিকেলে আমরা সবাই বারান্দায় বসেছিলাম। অঝোরে বর্ষণ শুরু হয়েছে। ব্যাঙ ডাকছে। মাঠ ঘাট জলে ভেসে গেছে। বর্ষাকালে যা হয়। এখানে আসার পর এবারেই প্রথম বাবার লাগানো গাছে কাঁঠাল ধরেছে। আম গাছগুলিতে মুকুল দেখে গিয়েছিলাম। কিছু আমও হয়েছে। বাড়ি ফিরে আসব আসব করে মা কটা আম রেখেছিল, কিন্তু শেষে পচে যায় দেখে আমার জন্য আমসত্ত বানিয়ে রেখেছে। অঝোরে বর্ষণ হলে আমার খুব ভালো লাগে। সব গাছপালা বাড়ির চারপাশে সজীব। মা রান্নাঘরে কাঁঠাল বীচি ভাজছেন। গরম গরম কাঁঠাল বীচি ভাজা অঝোর বর্ষণের দৃশ্য দেখতে দেখতে খাওয়া কী যে মজা! পিলু খোঁড়া গরুটাকে নিয়ে আসছে। দু'জনেই ভিজে গেছে। দূর থেকেই বললে, 'দাদা, কী খাচ্ছিস রে!'

বললাম, 'কাঁঠাল বীচি ভাজা।'

—মা, আমি খাব।

মা বলল, 'কটাতো ছিল। সবতো সাবাড় করেছিস।' মা যে গোপনে কাঁঠাল বীচি ও আমসত্ব আমার জন্য তুলে রেখে দিয়েছে, পিলু জানত না। পিলু অন্য সময় হলে মার-দাঙ্গা শুরু করে দিত, কিন্তু আমি ফিরে এসেছি এই পুণ্যফলে সে কিছু আর বলল না। পিলুর বড় বড় চোখ, বারান্দায় উঠে গামছা দিয়ে গা মুছতে মুছতে বলল, 'দাদা, আমাকে একটা দিবি?'

আমি বললাম, 'সবার জন্যই করেছে। মা তোকে বলে দেখছিল তুই রাগ করিস কিনা।'

মায়া কোচড় থেকে তুলে বলল, 'নে না।'

পিলু কিন্তু নিল না।

আমি বললাম, 'নে, আমার কাছ থেকে।'

পিলু বলল, 'না, খা। আমাকে মা দেবে।'

মা বলল, 'খুব যে ভালো ছেলে রে! সইবে তো!' বলেই মা একটা বাটিতে বীচি ভাজা এনে পিলুকে দিল। বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী গো, খাবে? খাও না দুটো। বিলুর জন্য তুলে রেখেছিলাম।'

আমাদের বারান্দাটা টালির। বেশ লম্বা বারান্দা। আগে খুব ছোট ছিল। সবাই পা ছড়িয়ে বসা যেত না। বাবার কাছে শুভাশুভ জানতে সব যজমানরা আসে। তাদের বসার জন্যই বারান্দাটা করা হয়েছে। এবং বড় বলে, আমাদের পোষা কুকুরটাও ভিজতে ভিজতে উঠে এল। ছোট ভাইটা হাঁটতে শুরু করেছে। ঝড়বৃষ্টিতে বড় ভয় পায়। মেঘ ডাকলে ভয় পায়। সে বাবার কোলে ভালোমানুষটি হয়ে বসে আছে। আমাদের সংসারে এই আমরা ক'জন। সামনের জমিতে বাবা কিছুটা জায়গায় পাট লাগিয়েছিলেন। সেগুলো কাটা হয়ে গেছে। পিছনের জমিতে কিছুটা আউশ ধান লাগানো হয়েছে। সেগুলো পেকে গেছে। নারকেল গাছের মাথায় বসে একটা কাক ভিজছিল। ছাতা মাথায় রাস্তায় লোকজন দেখা যাচ্ছে। পরে খালের মতো একটা সরু ফালি বাদশাহী সড়কের দিকে গেছে। জল উপচে পড়লে কই, শিঙি, মাগুর, বড় পুঁটি, ট্যাংরা জোয়ারের জলে ভেসে আসবে। বৃষ্টিটা আরও হোক, আরও জোরে, মেঘের দিকে তাকিয়ে পিলু এমনই বোধ হয় ভাবছে। লেখাপড়া করা ছাড়া পিলুর সব কাজেই ভারি উৎসাহ। কত খবর সে রাখে। কোন মাছ কখন ডিম পাড়ে, কোন মাছ বর্ষা হলে রঙবেরঙের হয়ে যায় সে ছাড়া এ খবর আমাদের আর কেউ রাখে না। সেই পিলু বীচি ভাজা খেতে খেতে বলল, 'দাদা, যাবি? মাছ উঠবে।'

মা বলল, 'সেবারের কথা মনে নেই? তোমাদের আক্কেল বড় কম!'

—কী হয়েছে! পিলু তেতে উঠল।

সেবারে পিলু মাছ ধরতে গিয়ে শিঙি মাছের কাঁটায় রক্তাক্ত হয়ে ফিরেছিল। বাবা বাড়ি ছিলেন না। একদিনের নাম করে গেছেন, দশদিনের মাথায়ও ফেরার নাম নেই। রাতবিরেতে পিলুকে পোকায় কেটেছে ভেবে আমরা বড় শংকিত হয়ে পড়েছিলাম।

বাবা খুব উদাস গলায় বললেন, 'ধনবৌ, রাখে কৃষ্ণ মারে কে।'

মা খুব তপ্ত হয়ে উঠল—'হয়েছে ধর্মের কথা আর শুনিও না। ঐ করে তো গেলে'।

কী যে গেল বাবা বুঝল না। কপর্দকশূন্য মানুষের এখন যা হোক বাড়িঘর হয়েছে, ছেলেপুলে বড় হচ্ছে, বিলুটাকে নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে, মানুকেও খবর দেওয়া হয়েছে, শ্রীমান ফিরে এসেছেন। নিয়ে আসা হলো, এখন কিছু একটা করতে হয়। শ্রীমানের বড় ইচ্ছা কলেজে পড়ে। এই পড়া নিয়ে একটা গণ্ডগোল বাধবে বোঝাই যাচ্ছিল। মানুকাকার জবাব, পড়াবেন কী করে! খাওয়াতে পারেন না, ছেলেরা বোঝে না? এখন সংসারে কী করে দুটো পয়সা আসবে না দেখলে চলবে কেন? বাবার কাছে মানুকাকার কথাই শেষ কথা। কিন্তু এবারে মানুকাকার পরামর্শমতো কাজ করবেন কিনা, সেই নিয়ে তাঁর কিছুটা বোধ হয় সংশয় জন্মেছে। মানু তো বলেই খালাস হয়তো চেনাজানা কোনো কাপড়ের দোকানে লাগিয়ে দেবে। সে তো জানে না তার ধনবৌদিটি কী বস্তু! আমি বাড়ি ফেরার পরই মা বাবাকে শাসিয়ে রেখেছে, ছেলে যা চায় তাই কর। পড়তে চায়। ভর্তি হবার টাকা ছেলে তোমার রোজগার করে এনেছে। বাধা দিলে অনর্থ ঘটাব।

তা সত্যি, রহমানদা ফেরার সময় বাবাকে বলেছে, এই নিন, কটা টাকা দিলাম। বাবা এখানে আসার পর একসঙ্গে এত টাকা কখনও হাতে পায়নি। শিষ্যরা পাঁচ দশ টাকা বেশি হলে দেয়। ঠাকুরের নাম করে পাঠায়। কলোনিতে নিত্যপূজা আছে- নিবারণ দাসের ঘরে। কিন্তু জমি এবং যজমান এই ভরসা বাবার। পড়াবার জন্য বাড়তি টাকা হাতে কমই আসে। বাবার সাহসে কুলোচ্ছিল না। কিন্তু মা এবং পিলু ও মায়া চায় তাদের দাদা কলেজে পড়ুক। এতে সংসারের ইজ্জত বাড়ে, বাবাটা কেন যে বোঝে না। মা তো সবাইকে বলে বেড়িয়েছে, ছেলে আমার কলেজে পড়বে। বাবা বুঝতে পারেন মানুষের বাড়ি-ঘর হয়ে যাবার পর একটা নীল লণ্ঠনের দরকার। সেটা ধনবৌ এখন জ্বালতে চায়। সলতে পাকানো আছে। শুধু জ্বেলে দেওয়া বাকি।

বাবা বললেন, 'মানুকে বলে দেখি, দু'একটা টিউশান ঠিক করে দিতে পারে কিনা।'

অনেকদিন পর আবার মার মনে হলো, মানুষটার বিষয়-আশয়ে ভক্তি বেড়েছে। সুবুদ্ধি গজিয়েছে মাথায়।

প্রবল বর্ষণে বাবার কথা শোনা যাচ্ছিল না। টিনের চালে ঝমঝম বৃষ্টির শব্দ। গরুটা ডাকছে। আমাদের কাঁঠাল বীচি খাওয়া শেষ। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। মা ঘরে ঢুকে হ্যারিকেন জ্বালাল। দুদিকে দুটো বড় বাঁশের মাচান। বাবার অনেকদিন থেকে সখ একটা তক্তপোষ করাবেন। উত্তরের দিকের জমিতে বড় একটা শিশুগাছ আছে। ওটা কেটে বানালে শুধু মজুরীর খরচা। আমি যদি দুটো টিউশান করি, বাড়তি পয়সা আসবে সংসারে। মারও মনঃপূত হয়েছে কথাটা। কবে যাওয়া হবে এই নিয়ে কথা হতেই বারান্দায় হ্যারিকেন রেখে বলল, 'কালই যাও। ঠাকুরপোকে বলো, তার তো শহরে চেনাজানা মানুষজন আছে। ওকে বললে ঠিক করে দিতে পারবে।'

রাতে পিলু ঘুমাচ্ছিল না। কেবল এ-পাশ ও-পাশ করছিল। এটা হয়। সে রাতে আমাকে কিছু বলতে চাইলেই এটা হয়। কিন্তু আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি, ডাকলে ঘুম ভেঙে যাবে, ঘুম ভাঙলে আমার ভারি রাগ হয় সেটা সে জানে। বুঝতে পারছিলাম, আমি সাড়া না দিলে সে কিছু বলবে না। বললাম, 'কীরে, ঘুম আসছে না!'

পিলু খুব সতর্ক গলায় বলল, 'দাদা, তুই সত্যি কলেজে পড়বি? তুই টাকা রোজগার করেছিস?'

আমি যে টাকা রোজগার করে এনেছি, পিলু জানে না। চার মাসের মতো রহমানদার কাজকর্ম করেছি। ট্রাক নিয়ে কয়লাখনিতে গেছি। ওজন মিলিয়ে কয়লা চালকলে সাপ্লাই করেছি এবং রহমানদার খুব বিশ্বাসভাজন লোক হয়ে গেছিলাম, সে তা জানে না। আমার ইচ্ছে ছিল, পড়ার টাকা হলে বাড়ি ফিরে আসব। কিন্তু রহমানদা আমাকে আশ্রয় দেওয়ার কী দেবে-থোবে জিজ্ঞেস করতে পারিনি। আসার সময় যে, সে এতগুলি টাকা বাবাকে দেবে তাও বিশ্বাস হয়নি। টাকা, কটা আসার সময় বাবার কাছেই ছিল। বাড়ি ফিরে বাবা টাকা কটা আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, মার হাতে দাও। প্রথম উপার্জনের টাকা মার হাতেই দিতে হয়। হাতে দেওয়ার পর মাকে প্রণাম করবে। পৃথিবীতে আজীবন তিনিই তোমার সবচেয়ে অধিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

আমাদের বাড়ি থেকে শহরটা বেশি দূর নয়। ক্রোশ দুই লাগে যেতে। পুলিশ ক্যামপের ভিতর দিয়ে একটা রাস্তা বাদশাহী সড়কে উঠে গেছে। বিরাট এলাকা নিয়ে ট্রেনিং ক্যামপ। দেশছাড়া মানুষ যারা, বনজঙ্গল কেটে ঘর বানাচ্ছে যারা, তাদের পক্ষে ক্যামপটা বড় কাজে লাগে। সুন্দর মাঠ ক্যামপের মধ্যে। সবুজ ঘাস পাতা—গরু-বাছুর সব ছাড়া থাকে সেখানে। ক্যামপের সব হাবিলদার সুবাদার থেকে সি ডি আই পিলুর অনুগত। ফলে গোটা এলাকাটাই যেন তার নিজস্ব জায়গা। অন্যের গরু-বাছুর ঢুকলে সে ক্ষেপে যায়। তার অনুমতি পেলে আর ভয় নেই। মাঠে কার গরু-বাছুর চরে বেড়াচ্ছে কে খবর রাখে। কেবল পিলু সব খবর রাখে। তাকে মাঠে দেখলে মনে হবে সে এত বড় বিশাল ক্যামপের তত্ত্বাবধায়ক। ক্যামপের ভিতর দিয়ে বাদশাহী সড়কে উঠতে আমাদের কম সময় লাগত। এমনিতে সাধারণের যাওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু পিলু আমাদের পাড়াটার পাসপোর্ট। বন্দুক উঁচিয়ে যে যখন সেনট্রি দেয়, পিলুর নাম বললেই হলো, পিলুদের পাড়ার লোক আমরা।

সেই পিলু এখন বাড়ি-ছাড়া হচ্ছে না। দাদা কলেজে পড়বে, এটা ঠিক হয়ে যাওয়ার পর সে আরও অহংকারী হয়ে উঠল। তার দলবলের সংখ্যা বেড়েছে। সেখানে এখন তার একটাই গল্প। দাদা কীভাবে ট্রেনে চড়ে কলকাতায় গেছে। কলকাতা কত বড় শহর। রেলগাড়ি

চড়ে যেতে হয়। চেকার টিকিট চায়। টিকিট না থাকলে তোমাকে ট্রেনে উঠতে দেওয়া হবে না। রেলগাড়ি চড়ে পিলু যখন এদেশে আসে, তখন তার সব ভালো মনে ছিল না। দাদার কাছ থেকে আবার জেনে নিচ্ছে সব। বাবার কাছে রানাঘাটের গল্প শুনেছে। দাদার কাছে কলকাতার। আর একটা শহর বর্ধমান। এখন এই তিনটি শহর সম্পর্কে সে প্রায় অভিধান, এমন একটা ভাব নিয়ে আছে দলবলের কাছে। ট্রামগাড়ি দেখতে কেমন লম্বা স্কুলবাড়ির মতো। শিয়ালদা ইস্টিশনে রেলগাড়ি বিরাট একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়। টিকিট না কেটে ট্রেনে উঠলে জেল।

পিলুর যে কত প্রশ্ন থাকে। পিলু যে-ভাবে কথা বের করে নিচ্ছে, কখন না জানি ফস করে ছোড়দির কথা বলে দিই। সেই লম্বা ফ্রক গায় দেয়া মেয়েটা, সুন্দর মুখ, সবসময় বাড়িতে জুতো পরে থাকে। সবসময় পরীর মতো বাগানে ঘুরে বেড়াত। রহমানদাকে নাম ধরে ডাকত। একসময় ছোড়দির বাবার গাড়ি রহমানদা চালাত। একটা এত বড় কুকুর ছিল ছোড়দির সঙ্গী। তেমন একটা পরীর মতো মেয়ে আমার খুব বন্ধু হয়ে গেছিল। বাবা নিয়ে আসার পর আমার এখন একটাই কষ্ট। সকাল হলে আর ছোড়দিকে দেখতে পাব না। কী যে থাকে মনে। ছোড়দির কথা মনে হলেই কেমন একটা রূপকথার রাজত্ব চোখে দেখতে পাই। ছোড়দি গাড়িতে উঠছে। পায়ে শাদা কেডস, শাদা মোজা, শাদা ফ্রক, নীল বেল্ট, মাথায় নীল চুল। বিকেলে সাইকেল চালাচ্ছে বাড়ির লনে। আমাকে পিছনে নিয়ে সাইকেল চালাচ্ছে। ছোড়দি যা বলত, তাই করতাম। একদিন ছোড়দি সাইকেলটা হাতে দিয়ে বলল, বিলু, ধর। আসছি।—ছোড়দি সেই যে গেল, আর এল না। পাঁচিলের পাশে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রহমানদা বলেছিল, কীরে, ছোড়দির সাইকেল নিয়ে কী করছিস! পরে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলেছিল, ছোড়দি ভুলেই গেছে। সাইকেলটা দিয়ে আয় বাড়িতে। ছোড়দি এমন স্বভাবেরই ছিল। সে-ই বাবাকে চিঠি লিখেছিল, বিলুকে নিয়ে যান। বিলু আমাদের এখানে আছে। ছোড়দির প্রতি আমার এজন্য একটা অভিমানও আছে। কিন্তু কেন জানি পিলুকে সব কথা বললেও ছোড়দির কোনো গল্প তাকে করতে পারিনি। কোথায় যেন এই প্রথম কিছু গোপন করতে শিখে গেছি।

পুলিশ ক্যামপ পার হলেই বাদশাহী সড়ক। দু'পাশে আম জামের গাছ। কোথাও বড় বড় রেন ট্রি। সোজা জেলা বোরডের অফিসের পাশ দিয়ে রেললাইনে উঠেছে। একটা জেলখানা, তারপর সাহেবদের কবরভূমি। শেষে সরকারি খামার ডাইনে ফেলে রাস্তাটা শহরে ঢুকে গেছে। যেতে আসতে আমার এই রাস্তাটার প্রতি একটা মায়া পড়ে গেছিল। পৃথিবীতে এমন সুন্দর রাস্তা আর কোথাও বোধ হয় নেই। দু'পাশে দিগন্তবিস্তৃত ধানখেত এবং মাঝে মাঝে আকাশের প্রান্ত দিয়ে পাখিদের উড়ে যাওয়া আমাকে মুগ্ধ করত। ছোড়দির কথা মনে এলে রাস্তাটায় একা একা হেঁটে বেড়াতাম। ইঁট সুরকির তৈরি রাস্তা। বৈশাখের ঝড়ে কখনও সেই লাল ধুলো আমাদের বাড়ি পর্যন্ত উড়ে আসত। বাবা এখানটায় বাড়ি করার পর সব কিছুর সঙ্গে কী করে যেন একাত্ম হয়ে উঠছি। আমার মা, বাড়ির গাছপালা, খোঁড়া গরু, শালগ্রামশিলা, পিলুকে নিয়ে পুজোর মাস পর্যন্ত একরকম কাটল। বাবা একদিন শহর থেকে ফিরে এসে বললেন, 'হয়ে গেল'।

বাবার এমনই স্বভাব। বাড়ি এসে বারান্দায় বসলেন। মায়া পাখা দিয়ে হাওয়া করছে। বাড়িতে দু'জন অতিথি আছেন সপ্তাখানেক ধরে। দেশ থেকে বাবা খবর দিয়ে আনিয়েছেন। এখনও সময় আছে, চলে এসো। জমিজমা কিনে এদেশে ঘরবাড়ি করে ফেল। মা এতে মনে মনে সাংঘাতিক চটে থাকে। নিজেরই খাবার নেই, শংকরাকে ডাকে।—মার এইরকম ক্ষুরধার বাক্যে বাবা কিঞ্চিৎ ঘাবড়ে গেলেও দমে যান না।

বাবার কথা, মানুষের দুঃসময় যাচ্ছে ধনবৌ—খোঁটা দিয়ে কথা বল না। চলে তো যাচ্ছে। কোনোদিন না খেয়ে আছ বল।

এইসব কথাবার্তা অতিথিরা বাড়ি না থাকলে বলত। এরাই নয়—বাবা যেখানেই যান, সবাইকে বলে আসেন, আসবেন, ঘরবাড়ি কেমন করলাম দেখে যাবেন। দেশের মানুষের সঙ্গে দেখা হলেই এই কথা। লোকজন, আত্মীয় কুটুম বাড়ি না এলে ঘরবাড়ি কার জন্য! বাবা নিজে খেতে ভালোবাসতেন, আত্মীয় কুটুমের বাড়ি বেড়াতে ভালোবাসতেন, খাওয়াতে ভালোবাসতেন। বাড়িঘর হয়ে যাওয়ার পরই দেশের আত্মীয় কুটুম চেনাজানা লোকের কাছে চিঠি। ও-দেশে আর থাকতে পারবে না। বৃথা আশা। দেশটা আবার এক হয়ে যাবে ভেব না। থাকার তো অভাব হবে না। আমি যখন আছি।

মার কাছে এই 'আমি যখন আছি' খুবই বিরক্তিকর। ছেলেটাকে যার পড়াবার মুরদ নেই, তার আবার এসব লেখা কেন। বাবার চিঠির বিশ্বাসেই দেশ থেকে দুই চৌধুরী এখন এখানে এসে উঠেছেন। রোজই রাজবাড়ি যেতে হচ্ছে। জমির বিলি বন্দোবস্ত দেখতে। বাবা প্রথম দু'দিন গেছিলেন সঙ্গে। উপেন আমিনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন। এখন ওরা নিজেরাই যায়। আমাদের বাড়ির পিছনটাতে কিছু ডোবা জঙ্গল আমবাগান আছে। তাই আপাতত কিনে রাখা। বাবা যে ভালো আছেন, সচ্ছল পরিবার বাবার এসব বোঝানোর জন্য বেশ ভালো মাছ-টাছ বাজার থেকে আসছে। একটা আস্ত ইলিশ পর্যন্ত। যে দামই হোক বাবার যেন অর্থের কমতি নেই—ফিরে গিয়ে কেউ না বলে বাবা আমার ভারি কষ্টে আছেন।

বাবা মনে করেন সংসারের অভিভাবক হিসাবে এটা তাঁর বড়ই কৃতিত্ব। বিলুটা কলেজে পড়বে—এই খবর দিতে নিবারণ দাসের আড়তে ছাতা বগলে চলে গেছেন ক'দিন। নতুন বাজার বসেছে সেখানে চেনাজানা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।—কি কত্তা, ছেলের খোঁজ পেলেন?

—পাব না কেন! ও-তো আর বাড়ি ছাড়া হয়নি। মতিচ্ছন্ন হয়েছিল। আবার সব ঠিক হয়ে গেছে। ফিরে এসেছে। কলেজে পড়তে চায়। যখন চাইছে পড়ুক। আমার একভাবে চলে যাবে। আসলে বাবার এতসব কথা বাড়িঘর করার মতোই। ছেলে আমার আর একটা পাশ দেবে। এখানে যারা বাড়িঘর করেছে, কেউ কলেজের মুখ দেখার সুযোগ পায়নি, কেবল তার ছেলে বিলু। এই একটা বড় খবরে বাবা কিছুদিন মশগুল থাকলেন। যজমান বাড়ি গেলেও আমি জানি একথা সে কথায় তিনি তাঁর পুত্রের কথা টেনে আনবেন। এবং এমন যখন চলছিল তখনই একদিন শহর থেকে ফিরে এসে বাবা বারান্দায় বসতে না বসতেই জানালেন, হয়ে গেল।

হয়ে গেল কথাটার কতরকম মানে হতে পারে বাবা যদি বুঝতে পারতেন। মা কুমড়ো ফুলের বড়া করছিল, খুন্তির শব্দে ঠিক শুনতে পায়নি। কেবল বলল, 'কি বললে?'

—হয়ে গেল।

মা এবার সবটা শোনার জন্য কড়াই নামিয়ে বারান্দায় উঠে এল। —'কি হয়ে গেল!'

—বিলুর পড়ার ব্যবস্থা। পুজোর পর ভর্তি হবে। কি যেন বলল মানু, তবে হয়ে যাবে। কোনো চিন্তার কারণ নেই। সব ক্লাশ ভর্তি হয়ে গেলেও মানু যখন আছে, বিলুর জন্য আটকাবে না। মা বোধ হয় বাবার সব কথা বুঝতে পারছিল না। আমাকে ডেকে আনল। কাছে গেলে বলল, 'তোর বাবা দেখ কি বলছে! আটকাবে না বলছে।'

বাবা বলল, 'আগে এক গেলাস জল দাও, খাই'। বাবা জলটা খেয়ে পিলুকে ডেকে জিজ্ঞেস করল গরুটা নেড়ে দিয়েছে কিনা, না, এক খোঁটাতেই আছে। বাবা তার দ্বিতীয় পুত্রটিকে সব সময় সংশয়ের চোখে দেখেন। সে সহজেই কাজ না করেও বলে দিতে পারে, হ্যাঁ দিয়েছি। এই তো দিয়ে এলাম। বাবা বাড়ি না থাকলে দ্বিতীয় পুত্রটি একটু বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। এতে সংসারের অনিষ্ট হলেও প্রতিবেশীরা পিলুর সুখ্যাতি করতে ছাড়ে না। সে তার বাবার কাজের প্রতি বড়ই অমনোযোগী। বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখে আয় নেড়ে দিল কি না'।

গরু বাছুর আমি নাড়ানাড়ি করি পিলুর পছন্দ নয়। দাদার আভিজাত্য নষ্ট হবে ভাবে। দাদা কলেজে পড়বে, সেই দাদা মাঠে গরু বাছুর টানাটানি করুক সে চায় না। সে বাবাকে আশ্বস্ত করে বলল,

বোঝার কি আছে। সারাজীবন
বুঝিয়ে তো এই হাড়-মাসে এনেছ।

'যাচ্ছি। তোমায় যে বাবা'—আর কি যেন বলার ছিল বলতে পারল না। মুগুরটা কাঁধে ফেলে চলে গেল। যাবার সময় বাবা হেঁকে বললেন, 'শোনো, পুকুরে এখন নেমো না। যদি নামো দু'ডুব দিয়ে উঠে আসবে। যদি দেখি দেরি হচ্ছে ভালো হবে না'।

এটা অবশ্য পিলুর হয়। গরমকালটায় সে পুকুর পাড় গেলেই প্যান্ট খুলে কিছুক্ষণ পুকুরে সাঁতরে নেয়। কখনও সখনও গামছায় ছেঁকে কুচো চিংড়ি ধরে আনে। আর কিছু না পারুক, ঘাস পাতা পেলে তাও জড় করে নিয়ে আসবে। বাইরে গেলে ফেরার সময় তার হাতে কিছু থাকবেই। কিছু খালি হাতে বাড়ি ঢুকতে শেখে নি।

মা-র তর সইছিল না। এমনই স্বভাব মানুষটার। সবটা না বলে অস্বস্তির মধ্যে রাখা। মা একটু রুখে উঠল, 'কি বলছিলে বিলুকে বল'।

—বলছি বলছি। বলে কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুখের ঘাম মুছলেন। মানু তো বলল, 'আই এস সি না কি বলে ওটা হবে না। এফ এ-টাও হবে না। আই কম-টা হবে। নতুন খুলেছে। কিছু সিট খালি আছে'।

আমার অবস্থা যা হয়। কলেজে পড়া নিয়ে কথা ছোড়দিও আমাকে বলে দিয়েছে, পড়াটা ছেড় না বিলু। আমাকে বড় হতে হলে পড়তে হবে। বড় হওয়ার সঙ্গে কলেজে পড়াটার এমন একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে আগে যদি বুঝতাম। মাকে বুঝিয়ে বললাম, কমার্স নিয়ে পড়ব।

বাবা যা বললেন, তার মধ্যে এফ এ-টা বুঝেছে। মার এক মামা এফ এ পাশ ছিল। স্বদেশী করত। মানুষজন তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা করত। তাঁর মতো ছেলে হবে ভাবতেই মার গর্ব বোধ হতো। কিন্তু সেটা হচ্ছেনা শুনে খুব দমে গেল। আর জেদি এক রোখা হলে যা হয়, বলল; 'বিলুকে এফ এ পড়তে হবে। ও সব আইকোম টোম চলবে না। ওতে কিছু হয় না'।

বাবা নিরাশ গলায় বললেন, বোঝো।

—বোঝার কি আছে। সারাজীবন বুঝিয়ে তো এই হাড়মাসে এনেছ।

এ-দেশে আসার পর দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় মার শরীরটা বেশ ভেঙ্গে গেছে। বাবা আমার কেমন অতলে ডুবে যাচ্ছিলেন। কি করে বোঝান বিষয়টা একই। লাইন আলাদা। বাবা অগত্যা পার পাবার জন্য বললেন, 'মানু তো বলল, আজকাল আর এফ এ পড়ে লাভ নেই'।

—রাখ তোমার মানু। ঐ তো ডোবাল। কে বলেছিল একটা গ্যারেজে ঢুকিয়ে দিতে। জলে পড়ে গেছি বলে, আমরা বুঝি আর মানুষ না।

এদেশে বাবার মানুকাকাই সম্বল। বাবার আত্মীয় বলতে এই একজনের খোঁজ তার জানা ছিল। সেখানেই ওঠা। সেখান থেকে মানুকাকা ক্যাম্পে পাঠাবার তালে ছিল, কিন্তু মার শেষ সম্বল বাবার হাতে দিয়ে আমাদের এই ঘর বাড়ি। সুতরাং মানুকাকাই যে আমার ভালোমন্দ বোঝার শেষ মানুষ মা স্বীকার করে না। বাড়ি ঘর হয়ে যাওয়ার পর বাবাও কিঞ্চিত মাকে সমঝে চলেন। জাত মান যেটুকু রক্ষা হয়েছে 'যা দেবী' এই 'সর্বভূতেষু'র জন্য। বাবা অগত্যা বললেন, 'তালে মানুকে বলতে হবে বিলু এফ এ পড়বে। তার ব্যবস্থা কর'।

—তাই বলগে।

মা এইটুকু বলে নিষ্ক্রান্ত হলেন। বাবার অবস্থা এখন খুবই বিপজ্জনক। মানুকাকাকে চটাতে পারেন না। মাকেও না। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি করবি'?

তখনই আবার আমার মা রান্নাঘর থেকে বারান্দায় হাজির, 'টিউশনির কথা কিছু বললে না?'

বাবা খুব ক্ষিপ্ত। বোঝেনা সোঝেনা—কেবল তর্ক। বাবা বলল, 'জানি না'।

মা আরও এক ধাপ ক্ষেপে গেল।—'ঠিক আছে, নিবারণ দাসকে বলছি। সেতো মরে যায়নি'।

নিবারণ দাস বাবার অবস্থাপন্ন জজমান। বাবা না থাকলে বিপদে আপদে সে আমাদের দেখে থাকে। বাবা নিবারণ দাসকে শেষ সম্বল মনে করেন। কোথাও কিছু না হলে সেতো আছেই। তাকে এ-নিয়ে জ্বালাতন করা বাবার বোধ হয় পছন্দ নয়। অগত্যা বললেন, 'বলেছি। সব বলেছি। ঠিকও হয়েছে। কালীবাড়িতে বিলু থাকবে। ওখানকার সেবাইত নাকি একজন মাস্টার খুঁজছে। বিলুকে দিয়ে হবে যাবে মানু বলল'। বাবার এই আশ্বাসে মানুকাকার উপর মার আবার আস্থা ফিরে এল। একেবারে শান্তশিষ্ট বালিকা তখন মা আমার। খুব অল্পতেই মার বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায় আবার খুব অল্পতেই মার আস্থা চলে আসে। যাবার সময় শুধু বলল, 'তোমরা যা ভালো বোঝো কর। বিলু আমার যেন ফেরার না হয়। বড় চাপা স্বভাবের'।

বুঝতে পারছিলাম মা তার পছন্দ-অপছন্দের চেয়ে আমার পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে বেশি ভাবছিল। মাকে বললাম, 'কমার্সটা ভালো মা। আমার ওটাই পড়ার ইচ্ছে'।

সুতরাং পুজোর পর পর বাবা আমার যাত্রার আয়োজন করলেন। খুব দূর নয়। আমাদের বাড়ির পিছনটাতে বড় একটা পুরনো ইঁটের ভাটি আছে। ওখানে নবমী বলে এক বুড়ি থাকে। পিলু আমাকে নিয়ে সেখানে দু একবার গেছেও। আমি ফেরার হলে পিলু নবমীকে বলে এসেছিল, দাদাটা যে কোথায় চলে গেল! পিলুকে মনমরা দেখে নবমী বলেছিল; আপনার দাদা একজন গুণীমানী মানুষ হবে গ ঠাকুর। তার কি কলোনি ভালো লাগে। বড় হলেই চলে আসবে। সেই থেকে

পিলু নাকি স্বপ্ন দেখত, দাদা রোজই সকাল বিকেল একটা গাড়িতে বাড়ি আসছে। পিলুর জন্য নতুন জামা নতুন প্যানট, মার জন্য শাড়ি, আর এক হাড়ি রসগোল্লা। পিলু রসগোল্লার কাঙাল। স্বপ্নে সে কতদিন নাকি দাদার হাত থেকে নিয়ে রসগোল্লা খেয়েছে।

আমি বাড়ি ফিরলেও পিলু নবমীকে গিয়ে খবর দিয়ে এসেছে। দাদাকে বাবা গিয়ে নিয়ে এসেছে। ছোড়দির চিঠি পেয়ে বাবা যে আমাকে আনতে রওনা হয়েছে, সে-খবরও দিয়েছিল। পিলুর সব সুখ-দুঃখের খবর নবমী বুড়িকে দেওয়া চাই। তার যত কাজ থাক, যত ফল পাকুড় সংগ্রহের বাতিক থাক, নবমীকে সব খবর না দিয়ে থাকতে পাবে না। সেই নবমী বুড়ির বনটা পার হলে, কারবালা। তারপর একটা ইঁট সুরকির রাস্তা এবং পরে কাশের বন—রেল-লাইন। রেল-লাইন পার হলেই সেই কালীবাড়িটা। পিলু শুনে বলল, ওতো খুব কাছেরে দাদা। আমি রোজ এক দৌড়ে যাব, এক দৌড়ে আসব। পিলু বোধ হয় ভেবেছে বাড়ি ছেড়ে আমার থাকতে কষ্ট হবে। দাদা থাকতে না যায়। সে দাদাকে সাহস দিচ্ছে।

বাবা সকাল থেকেই আমার যাবার আয়োজনে ব্যস্ত। পাঁজিকার শুভ দিন দেখে যাওয়া হবে। যাবার আগে বাবাব পুজো আর্চার সময় বেড়ে গেল। বিগ্রহ খুশি থাকলে সব ঠিক থাকবে। আগে তাঁকে খুশি করা দরকার। নীল অপরাজিতা তুলে এনেছেন—নেংড়ি ঢিবির হাতা থেকে পদ্মফুল তুলে এনেছেন, একশ একটা তুলসী পাতা এবং বিল্বপত্র একশ একটা। ধৌড়া গোরুটার দুধ সবটাই পায়েস হয়েছে। মা সকাল সকাল রান্নাঘরের কাজ সেরে ঠাকুরঘরে ঢুকে গেছেন। বাবা এক হাতে পুজোর আয়োজন করতে দেরি করে ফেলবেন—কারণ সব সময়ই বাবার ধারণা পুজোয় কোনো ত্রুটি থাকলে বড় খুঁত খুঁত করেন তিনি। কিনা অঘটন ঘটে। কাজেই সব দিক বজায় রাখতে হলে মা টের পান, তারও হাত লাগানো দরকার। মারা আজ পিলুকে আমাকে সকালের খাবার দিল। দুপুরের খাবার মা পুজোর ঘর থেকে বের হয়ে দেবে। স্নান করে গরদের শাড়ি পরে পায়েস রান্না, তারপর ঠাকুর ঘরে মা চন্দন বেটে আতপ চাল ধুয়ে তিল তুলসী হরিতকি সাজিয়ে এবং ধূপ দীপ জেলে যখন বুঝল বাবা খুব প্রসন্ন তখনই বের হয়ে এল। আমাকে বলল, 'চান করে ঠাকুরঘরে গিয়ে বস'।

পুজোর সময় বাবা কেমন নির্বিকল্প মানুষ হয়ে যান। পুত্র-কন্যা সব তাঁর কাছে তখন অর্থহীন। ধ্যানে মগ্ন থাকেন আর আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ঘণ্টা বাজান। তুলসীপাতা একের পর এক চাপান বিগ্রহেব মাথায়। বাবার ধারণা বিগ্রহের সেবা ঠিক ঠাক হচ্ছে বলেই আমরা সব বেঁচে-বর্তে আছি। আমি যে ফিরে এসেছি, সেও বিগ্রহের অসীম কৃপায়। বোঝাই যায় বাবা কেমন এক মহাবিশ্বের খবর পেয়ে যেন এই ধ্যানমগ্ন অবস্থায়। মানুষের জন্মমৃত্যু, বেঁচে থাকা সবই অপার রহস্যময়। যেন সব কিছুর অস্তিত্বের মূলে তিনি।

বাবার পুজো শেষ হলো বেশ বেলা করে। একসঙ্গে আমরা খেলাম। খেতে বসে বাবা বললেন, 'বিলু তোমার নতুন জীবন শুরু। মনে রেখ পৃথিবীতে কেউ তোমার পর নয়।' বাবা সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করলেন—তার অর্থ বোঝালেন। তুমি একা এ বিশ্বসংসারে। আবার তুমিই এই বিশ্বসংসার। তুমি নিজেও একজন ঈশ্বর। সবই তাঁর লীলা তোমার মধ্যে।

বাবা খুব বিচলিত হয়ে পড়লে এমন সাধুবাক্য সব আমাদের বলেন। আমার কষ্ট হচ্ছিল, কারণ যত কাছেই হোক—অন্যের বাড়ি—তারা কেমন হবে জানিনা, তাছাড়া পিলুকে ছেড়ে থাকতে আমার কেন জানি কষ্ট হয়। বর্ধমানেও হয়েছিল, কিন্তু ছোড়দি অনেকটা জায়গা জুড়ে ছিল, —অত খারাপ লাগেনি। পিলুকে বললাম, 'যাস কিন্তু।'

যাবার সময় দেখলাম মা আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা বললেন, এখন মন খারাপ করতে নেই।'

মার মন খারাপ। এটা কি মা টের পায় আমি তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। খুব বেশি দূর না। কালই হয়তো সকালে চলে আসব হাঁটতে হাঁটতে। কিন্তু মা কি আমার সেই গোপন রহস্যের খবর জেনে গেছে। মা কি জানতে পেরেছে বিলুর পৃথিবীতে আর কেউ ঢুকে যাচ্ছে। শাদা জ্যোৎস্নায় সে কোন এক পরী কে জানে।

বেলা থাকতেই রওনা দিলাম। বাবা পিছনের বনজঙ্গল পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে হেঁটে এল। পিলুর হাতে আমার জামাকাপড়ের পুঁটুলি। ওতে আছে দুটো হাফ প্যানট, একটা মারকিনের হাফ শারট। একটা বাবার পুজো-পার্বণে পাওয়া কোরা অল্পদামের ধুতি। বাবার ধারণা একজন মানুষেব পক্ষে এর চেয়ে বেশি পোষাক-আশাক নিষ্প্রয়োজন। বাড়িতে খালি গা, খালি পা এবং হাফ প্যানট পরণে—কারণ বাবার কাছে আমি এখনও খুব ছোট আছি। আমারও মনে হয় এই যথেষ্ট। কেবল ছোড়দি আমাকে বুঝিয়েছে, খালি গায়ে থাকিস না। অসভ্যতা। ছোড়দির ভয়ে সবসময় গায়ে জামা রাখতে বর্ধমানে ভারি কষ্ট হতো। এখন এসব দেখার কেউ নেই। কিন্তু যেখানে যাচ্ছি, সেখানে আবার যদি কোনো ছোড়দির উদয় হয় তবেই হয়েছে। পায়ে জুতো পর্যন্ত আছে। শারট গুঁজে পবতে শিখেছি। পিলুর কাছে আমি এখন একজন বাবু মানুষ। বাবু মানুষের হাতে গামছার পুঁটুলি শোভা পায় না। সে সেজন্য আমার সঙ্গে যাচ্ছে। তার হাতেই সব। পরণে তার ইজের। মা যত্ন করে দু-জায়গায় তালি মেরে দিয়েছে। সেই পরে একটা মারকিন কাপড়ের জামা গায় সে আমার সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে। সে ওটা কালীবাড়িতে রেখে আবার দৌড়ে ফিরে আসবে। দাদার জায়গাটাও ভালো করে ঘুরে ফিরে দেখে আসবে। তার দাদা মাস্টার—ছাত্র পড়াবে। কেমন বয়সের ছেলে বোধ হয় সেও দেখার বাসনা। যেতে যেতে কত গল্প তার। কোথায় সে দুটো খরগোস দেখেছিল, কোথায় কোন ডোবার পাড়ে একদিন কচ্ছপ ডিম পেড়েছিল, বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে তার গল্প। কিছুদূর এসেই পিছনে তাকিয়ে দেখলাম গাছপালার আড়ালে আমাদের বাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমরা নবমীর বনটায় ঢুকে গেছি।

—দাদারে ?

দাঁড়ালাম। —কিছু বলবি।

—নবমীর সঙ্গে দেখা করবি না ?

—দেরি হয়ে যাবে। তোকে আবাব ফিরতে হবে। অবশ্য বললাম না, বনজঙ্গলে সাপখোপের উপদ্রব থাকে। পিলুর অবশ্য বেজায় সাহস। এ ব্যাপারে সে বাবার স্বভাব পেয়েছে। রাতবিরেতে বাবা কখনও আলো নিয়ে বের হয় না। বাবার কথা—তুমি অনিষ্ট না করলে তিনি তোমার অনিষ্ট করবেন কেন। তিনি বলতে মা মনসা। মনসার বাহন মাত্রেই দেবতা। তাঁকে সংশয়ের চোখে দেখলে সেও সংশয়ের চোখে দেখবে। সংসাবে এমনই নাকি নিয়ম। পিলু এ বিষয়ে বাবার একটা স্বভাব পেলেও অন্য স্বভাবটা পায়নি। সে সাপের খোঁজ পেলে তেড়ে যাবেই। বাবা কতবার সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, পিলু ওটা করিস না। বনজঙ্গলে থাকি। জলে থেকে কুমীরে সঙ্গে লড়াই ঠিক না। তুই কবে যে তেনাব কোপে পড়ে যাবি।

নবমীর সঙ্গে দেখা না করে যাব ভাবতেই পিলু বোধ হয় রুষ্ট হলো। সে আর একটাও কথা বলছে না। পুঁটুলিটা বইতেও কষ্ট যেন।

অ্যাঃ, নিজে বাবুর মতো যাবে। আমি নিতে পারব না।—বলেই পুঁটুলিটা মাটিতে ফেলে দিল।

পিলু আমার চেয়ে বছর চারেকের ছোট। তবু মনে হয় বিষয়-বুদ্ধিতে সে আমার চেয়ে প্রবল। আমার আলাদা একটা সম্ভ্রমবোধ গড়ে উঠছে সেও যেন পিলুর জন্য। সেই এমন করে যে আমি আলাদা জাতের। দাদার সুখ্যাতির জন্য সে বড় কাঙাল। নিজে যা পারছে না, দাদার মধ্যে সেটা দেখতে পেলে সে খুশি হয়। সেই দাদার পুঁটুলিটা এখন মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। পিলু কি নবমীর সঙ্গে দেখা করা না করার মধ্যে কোনো মঙ্গল-অমঙ্গলের চিহ্ন দেখতে পায়। নবমীর সঙ্গে দেখা না করলে দাদাটার কি না জানি অনিষ্ট হবে—এমন সংস্কারে তাকে পেয়ে বসতে পারে। পাশ দিয়ে যাচ্ছি,

একটু ভিতরে ঢুকে দেখা করে যাওয়া এমনকি কষ্টের। আর কতটুকুনই বা দেরি হবে। বললাম, 'সেই ভালো পিলু। নবমীর সঙ্গে দেখা করেই যাব।'

পিলুর মুখে আশ্চর্য সরল স্বর্গীয় হাসি। এমন উজ্জ্বল চোখ-মুখ যে নিমেষে সে ভুলে গেল দাদাটার উপর তার অভিমান হয়েছিল। পুঁটুলিটা তুলে ঝেড়ে-ঝুড়ে আবার বগলে নিল। শেষে সে একটা কচুবন পার হয়ে যেমন অন্যবার ডাকে, এবারেও ডাকল, আমি দা-ঠাকুর, নবমী। নবমী টের পায় সেই সরল বালক, তার জন্য কোনো খবর বয়ে এনেছে। পৃথিবীতে নবমীর কাছে খবর পৌঁছে দেবার কেউ নেই। সে বনের ফল-পাকুড় খেয়ে থাকে কচু-ঘেচু সিদ্ধ করে খায়। আর আছে একটা ছাগল আর তার দুধ। বনটা পুরো পার হয়ে যাবার ক্ষমতা সে কবেই হারিয়েছে। পিলুই একমাত্র তার ডাক পয়ন। বনটার বাইরে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব খবর দেয়। বন কেটে যারা ঘরবাড়ি বানাচ্ছে তাদেরও।

বুঝতে পারি, নবমী তক্ষুনি সাড়া দেবে। ঠিক জবাব এল, একটু দাঁড়াওগো দা ঠাকুর। এই ফাঁকে সে পিলুর দেওয়া বাবার পুজো পার্বণে পাওয়া খোঁট পরে নেবে। বনের ভিতরে কে আর দেখে লজ্জা নিবারণের দায় তার থাকে না। গাছপালার মধ্যে অবিরাম যে কথাবার্তা চলে তার মধ্যে লজ্জা নিবারণের কথা থাকে না। সে পিলুর ডাকে সাড়া দেয়। ছাগলটা ব্যা ব্যা করে ডাকে মানুষের সাড়া পেয়ে। ছাগলটার একটা বাচ্চা নবমী বুড়ি পিলুকে দিয়েছিল। কিন্তু পিলুর অত্যাধিক যত্ন এবং পর্যাপ্ত আহারে পেট ফেঁপে মরে গেছে। নবমী বলেছে, বাচ্চা হলে আবার তাকে একটা দেবে।

নবমীকে সহসা দেখলে ডাইনী বুড়ির মতো মনে হয়। হাড় জিরজিরে কংকালসার চেহারা। দাঁত দু'পাশে দুটো বের হয়ে আছে। আলগা মতো দাঁত দুটো কথা বলতে গেলে নড়ে। চোখ কোটরাগত। নাক বাজপাখির মতো লম্বা। ত্যানাকানি পরে সে যখন বনের ভিতর থেকে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বের হয়ে এল তখনই পিলুর কি আনন্দ। পিলু বোধহয় ভাবে, একদিন নবমী বুড়ি আর তার ডাকে সাড়া দেবে না। মরে যাবে। যেতে আসতে একবার খোঁজ নিয়ে যায়, সে শুধু বুড়ি বেঁচে আছে কি না। বুড়ির খোঁজ-খবর নেয়। কি এখন খায় জিজ্ঞেস করে। বন থেকে সংগ্রহ করা বুনো নারকেল থাকলে, দাদা-ঠাকুরকে দিয়ে বলবে, বাবাঠাকুরকে প্রণাম দেবেন। সেই নবমী কাছে এলে পিলু বলল, আমার দাদা। চিনতে পারছ।

—ও মা, কি মানুষগো। আমি কি কালা না হাবা চিনতে পারব না। তারপরেই লম্বা হয়ে গেল। গড় হলে আমার ভারি লজ্জা করে। বামুনের বাচ্চা, আমাদের গলায় পৈতা আছে, খালি গায়ে এখানটায় ঘুরে গেলে নবমী দেখেছে। পিলুকে এখন সাক্ষাত দেবতা ভেবে থাকে। সেই যেন কখন আসে, এমন এক অপেক্ষা তার। কে জানে, এভাবেই কোন শবরীর প্রতীক্ষা ছিল কি না সেকালে। নবমী আর পিলুকে দেখে আমার কেন জানি, চোখে রামায়ণের সেই সুন্দর কাহিনীটি ভেসে ওঠে।

পিলু বলল, দাদা আমার মাস্টার হয়েছে!

—মাস্টার!

—হ্যাগো, দাদা ছাত্র পড়াবে। বিষ্ণুপুরের কালীবাড়ি চেন? আমরা সেখানে যাচ্ছি। দাদাকে পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরব।

—তবে আর দেরি করবেন না গো দাঠাকুর। ফিরতে ফিরতে সাঁঝ লেগে যাবে। ভয় পেলে বুলবেন, বন-বাঁদাড়ে কতকিছু থাকে, এরা আমাকে চেনে—আমার কথা বুলবেন—নবমী বুড়ির দাঠাকুর আমি। কেউ ছুঁতে সাহস পাবে না।

নবমীর কাছ থেকে এভাবেই বুঝি পিলু ভয় জয় করার সাহসের মন্ত্র পায়। সে বলল 'আমার দাদার গায়ে হাত বুলিয়ে দাও। আমায় যে দিয়েছিলে।'

আমার গাটা ভয়ে কেমন শির শির করছিল। পিলুর যে কত-রকমের বিশ্বাস গড়ে উঠেছে। লাঠি ঠুকে ঠুকে নবমী আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি পালাব কি না ভাবছি। পিলু বুঝতে পেরে বলল, ভয় পাস না দাদা। নবমী বলেছে, আমি ওর মতো পরমায়ু পাব।' এখন দাদারও এমন হয় সে চায়। ততক্ষণে নবমী আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। বলল, 'আমার মতো পেরমায়ু পানগো দাঠাকুর। আমার কেশের মতো'।

দেশ ছাড়া হয়ে আমরা কত অসহায় পিলুর আচরণ দেখলেই টের পাওয়া যায়। এদেশে এসে হেজেমজে না যাই তার জন্য পিলু সব দিকে খেয়াল রেখে চলে। নবমীকে দেখলে পুণ্য হয়, আয়ু বাড়ে, পিলুর ধারণা। বাবার ধারণা শালগ্রামশীলা। মার বিপদনাশিনী ব্রত। এত সব আছে বলেই কেন জানি মনে হলো আমরা ঠিক বেঁচে থাকব। পিলুর এখন আর কোনো ভয় নেই। দাদাকে বনবাসে দিয়ে এলেওনা। সে বরং আমাকে গার্জিয়ানের মতো শেখাচ্ছে।

—দাদারে!

—কী!

আমরা হাঁটছি আর কথা বলছি। ইঁটের ভাঁটি পার হলে সেই কারবালা। ডান দিকে মাইলখানেক জুড়ে মাঠ, মুসলমানদের সারি সারি কবরখানা, মিনার, বাঁধানো সান, রুপোলি চাঁদ তারা আঁকা। আর উপরে বিশাল সব বৃক্ষ। মিনারে কত স্মৃতিকথা লেখা। পড়া যায় না। উর্দু ভাষায় লেখা। সোজা গরুর গাড়ি চলার মতো একটা পথ, উঁচু নিচু ঝোপঝাড়।

পিলু দু-লাফে আমার আগে এসে গেল—বলল 'দাদারে'?

—কী বলবি তো!

—পেট ভরে খাবি?

—খাব না কেন!

—তুই ঠিক লজ্জায় পেট ভরে খাবি না।

—হ্যাঁ বলেছে।

—ঠিক জানি। আমরা কাঙাল হয়ে গেছি নারে?

—কাঙাল হব কেন?

—মা যে বলে তোমাদের রাক্কুসে ক্ষুধা, কার ক্ষমতা নিবারণ করে।

পিলু ঠিকই বলেছে। বর্ধমানে এর জন্য আমার ভোগান্তি গেছে। পিলু কষ্ট পাবে বলে তাকে গল্পটা বলিনি। পাইস হোটেল বলে অবশ্য সেখানে আমার খেতে কোনো লজ্জা ছিল না। পয়সা দিয়ে খাব—যত খুশি খাব। যত খুশি খেতে গিয়েই ঝামেলাটা হয়েছিল। কিন্তু যদি কালীবাড়িতে ছোড়দির মতো কেউ থাকে, মুখ তুলে খেতেই পারব না। পিলু কি করে যে টের পায়!

—কি রে খাবি তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ খাব।

—আমার কি, না খেলে নিজেই কষ্ট পাবি। বড় হলে কেউ সঙ্গে থাকে না। নিজেরটা নিজেই দেখে নিতে হয়।

—হয়েছে, আর পাকা পাকা কথা বলতে হবে না।

রেল লাইনে উঠে বলল, 'জানিস দাদা এখানে একটা লোক কাটা পড়েছিল।'

—কবে

—সেই যে মেলা গেল। মেলাতে লোকটা এসেছিল কালীথানে পুজো দিতে।

পিলু কেমন ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে। ভয় ভিতরে ঢুকে গেলে পিলুর চোখ খুব ভ্যাবলা হয়ে যায়। সে গুছিয়ে তখন কথা বলতে পারে না।

—কি রে কথা বলছিস না কেন। এসে তো গেলাম।

দূর থেকে কালীবাড়ির বিশাল নিমগাছটা দেখা যাচ্ছে। রেল লাইনের গুমটি ঘর পার হলেই দেখা যায়। ওকে বললাম, 'তুই আর যাবি?' পিলু কিছুক্ষণ কি ভাবল। আমার উপর বিশ্বাস কম। বলল, 'তুই যেতে পারবি'।

—খুব পারব। তুই যা। নালে বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

আবার ডাকে, 'দাদারে'।

—বল।

—তুই কিন্তু রেল-লাইন পার হোস না।

—কেন?

—কখন গাড়ি এসে ঘাড়ের উপর পড়বে।

অমা, আমাদের নতুন মাস্টার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে গো

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম পিলুর ভয়টা কোথায়। কালীবাড়ির সীমানা ঘেঁসে রেল লাইন চলে গেছে পিলুর ধারণা রেল লাইনটা ভাল না। কালীবাড়ির কাছটায় ফি বছর কেউ না কেউ কাটা যায়। কেউ এখানে আত্মহত্যা করতে চলে আসে। জায়গাটার কোনো অশুভ প্রভাব আছে। কেউ বলে মা কালীর ভোগে গেছে। তার দাদাটাকে কাজে অকাজে রেল লাইন পার হতেই হবে। যা অন্যমনস্ক। যদি কিছু হয়ে যায়। সেই ভয়ে কেমন ভ্যাবলু বনে গেল পিলু।

—আমি ঠিক দেখে পার হব। ভাবিস না।

পিলুর এইভাবে কতরকমের যে ভয় তার দাদাটাকে নিয়ে। সে নিমগাছটার কাছে এসে বলল, 'আমি যাই।

কিন্তু আশ্চর্য কালীবাড়ির সামনের রাস্তাটায় কেউ নেই। সেবাইত কোন দিকটায় থাকে জানি না। পকেটে মানুকাকার দেওয়া একখানা চিঠি সম্বল। লম্বা পাঁচিলের মতো মন্দির চলে গেছে। কিছু কাক হাহাকার করে ডাকছে অশ্বত্থ গাছের মাথায়। দুটো বড় পেল্লাই দরজা। দুটোই বন্ধ। মন্দিরের বাঁ দিকে এক ফালি একটা দরজা চোখে পড়ল। দুটো লোক মন্দিরটার দক্ষিণের মাঠে ঘাস কাটছে। একটা রিকস ক্রিং ক্রিং করে বেল বাজিয়ে এল আবার নিমেষে উধাও হয়ে গেল। পিলু দাদাকে এভাবে একা ফেলে যেতে ভরসা পেল না। এ যেন দাদাকে একটা রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে যাওয়া হবে। সে খুব সাহসী হয়ে যায়। আমি খুব সন্তর্পণে এগোচ্ছি। গাছপালার ফাঁকে বিকেলের রোদ নেমে যাচ্ছে। বিরাট এলাকা জুড়ে এই মন্দির। শনি-মঙ্গলবারে মানত দিতে লোকজন আসে। আমরাও দু-একবার ওইসব দিনে ঘুরে গেছি। ঢাক বাজছে ঢোল বাজছে। বলির পাঠার আর্তনাদ আর মন্দিরের ভিতর কেউ জোরে জোরে মন্ত্রপাঠ করছে। লোকজনে ভরে আছে। মাথায় কপালে পাঁঠার রক্ত। বৌ-ঝিরা নানারকম মানতে ব্যস্ত। সারি সারি রিকস, গাড়ি লেগে থাকে। আজ সে সবের কিছু নেই। কেমন খাঁ খাঁ করছে। মন্দির থেকে কাউকে বের হতে দেখা গেল না। মহামারীতে সব শেষ হয়ে গেলে যেমন জনশূন্য হয়ে যায় গা-গঞ্জ আমার আর পিলুর কাছে এখন জায়গাটা সে রকমের।

পিলু তবু এগিয়ে যাচ্ছে। সে ইঁটের রাস্তাটা পার হয়ে মন্দিরের রোয়াকে উঠে গেল। তারপর ফালি দরজাটা ঠেলতেই দেখল—সামনে বড় কোঠাঘর—তক্তপোষে তিনচারজন ছেলে বুড়ো শুয়ে। আসলে সবাই দিবানিদ্রা যাচ্ছে। সে খুব সন্তর্পণে নেমে এসে বলল, 'দাদা সবাই ঘুমাচ্ছেরে। এ কেমন জায়গারে! বেলা পড়ে এল, তবু ঘুমোচ্ছে!' তারপর বলল, 'ডাকব!'

আমার কেমন অশান্তি হচ্ছিল। পরের বাড়ি। আমি এদের আশ্রিত হয়ে থাকব। আমার এ বিষয়ে কতটা ডাকার দাবি আছে সে নিয়ে যখন ভাবছি, তখনই মন্দিরের দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল। বিরাট পেল্লাই দরজা ঠেলে ঠেলে কেউ খুলে দিচ্ছে। আমারই বয়সী একটি মেয়ে। ডুরে শাড়ি পরনে। মাথায় ঘোমটা। পিলু ছুটে গিয়ে বলল, 'আমার দাদা, এখানে থাকবে। ভিতরে খবর দাও না।' বালিকাটি কিছু বুঝতে পারল না। সে ঘড়া করে জল এনে ঢেলে দিচ্ছে মন্দিরের চাতালে। উঁকি দিয়ে দেখলাম, কেউ যেন মন্দিরের ভিতর

গেরুয়া নেংটি পরে শুয়ে আছে। মানুষ না বলে কংকালই বলা ভালো। আমাদের কথাবার্তায় কারো ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে ভেবে বালিকাটি সদর দরজার বাইরে বের হয়ে বলল, 'কাকে খুঁজছ।'

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু পিলু বাধা দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। বলল, 'আমার দাদা। মাস্টার। পকেটে চিঠি আছে। দেখানারে দাদা।'

বালিকাটি হঠাৎ ফিক করে হেসে দিল, 'অমা! আমাদের নতুন মাস্টার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে গো। আসেন, আসেন। তা অত ছোট কেন? ভিতরে আসেন। আপনার সকালে আসার কথা ছিল না?' বলেই সে ভিতরে দৌড়ে খবর দিতে গেল। কোন দিক দিয়ে যায় লক্ষ্য করছি। চাতালের পাশে মন্দিরের মিনা করা থাম। মেয়েটি থামের আড়ালে হারিয়ে গেল। তারপরই ফের হাজির। —'অমা, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন গো? আমার সঙ্গে আসেন। —এটা কে?'

—আমার ভাই।

—আপনিও আসেন।

পিলু বলল, 'দাদাকে দিয়ে গেলাম। আমি যাব না। বাড়ি ফিরতে হবে। দাদাকে দেখে রাখবে কিন্তু।' বলেই দৌড়।

মেয়েটি এবারেও হাসল। বলল, 'আমরা খেয়ে ফেলব না। আপনার দাদাটি আস্তই থাকবে।'

বুঝতে পারছি বয়েস কম হলেও অনেক অভিজ্ঞতার ছাপ মেয়েটির মুখে। জানি না, এ বাড়ির সে কে হয়। এতটুকুন মেয়ের মাথায় ঘোমটা কেন। চোখ ডাগর, মুখে আশ্চর্য সজীবতা। শরীরে বড় বেশি লাবণ্য। পিলুর চেয়েও বেশি পাকা পাকা কথা। চাতাল পার হয়ে যাবার সময় বলছিল, 'ভয়ে কুঁকড়ে আছেন গো দেখছি। দিন পুঁটুলিটা হাতে দিন।' বলেই আমার দিকে ভারি চোখে তাকাল। এমন চোখ এবং চোখে টান আমি জীবনেও দেখিনি। যেতে যেতে আমার শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। পুঁটুলিটা সে যেন জোর করেই হাত থেকে কেড়ে নিল।

এভাবে আমার পৃথিবী ক্রমেই বড় হয়ে যেতে থাকল। এখানে এসে টের পেলাম, ধর্মস্থানে খাবারের অভাব হয় না। দেশ ছেড়ে আসার পর এই প্রথম পর্যাপ্ত আহারের মুখ দেখলাম। সেবাইত মানুষটি যে এ অঞ্চলের একজন মানী ব্যক্তি, দু একদিনেই তা টের পাওয়া গেল। জেলা কংগ্রেসের প্রভাবশালী ব্যক্তি। মানুকাকাও কংগ্রেসের হয়ে জেল খেটেছে—সেই সুবাদে আলাপ এবং ঘনিষ্ঠতা। আমার মতো আরও দু-চারজন আশ্রিতের মতো এখানটায় জায়গা হয়ে গেল। তবু প্রথমটায় দু-দিন খুবই আড়ষ্ট ছিলাম। বাইরের ঘরে চুপচাপ বসে থাকতাম। স্নানের সময় হলে সেই ঘোমটা দেওয়া বালিকাটি আসত। বলত, চান করে নিন। খাবেন না? জড়ভরত হয়ে থাকেন কেন?

মেয়েটা এত চোপা করে কেন বুঝি না। এখানে বোধহয় সবাই হৈ চৈ করে থাকতে ভালবাসে। বাড়ির হালচাল বুঝতে সময় লাগে, এই কথাটা কি করে যে মেয়েটাকে বোঝাই। ওর নামও জেনে গেছি। সবাই লক্ষ্মী বলে ডাকে। ভিতরে গেছি—দেখেছি পাকশালার দরজায় কলসি কাঁখে দাঁড়িয়ে আছে। একবারও ওকে কাঁখে কলসি ছাড়া দেখিনি। এর কি শুধু এই কাজ। আর মাঝে মাঝে আর একটা কাজ পেয়েছে, সেটা বোধহয় আমার দেখাশুনা করা।

চিঠিটা দেখার পরই সেবাইত মানুষটি বলেছিল, থাকতে পারবে তো! বাড়ির জন্য মন কেমন করবে না তো?

মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েছিলাম।

—যখন যা দরকার বলবে। কোনো সংকোচ করবে না। নিজের বাড়ি মনে করবে। যে যার মতো এখানে থাকে খায়। এটা এজমালি সংসার। লক্ষ্মীকে ডেকে বলল, ওর ঘরটা দেখিয়ে দে। হাত পা ধুয়ে নাও। চা খাও তো? চা না খাও মুড়ি সন্দেশ, যেটা ভালো লাগে বলবে। তারপরই ডেকেছিল, শুনছ—

মাথায় বেশ ঘোমটা দিয়ে যিনি এলেন তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, মাস্টারদার ভাইপো। দেশ থেকে সবাই এরা চলে এসেছে। তোমাদের নতুন মাস্টার। খেয়াল রেখ। এত ছেলেমানুষ বুঝতে পারিনি। এখান থেকেই কলেজে পড়বে। নটু পুটুকে পড়াবে। পছন্দ কিনা দেখ।

আমি বাড়িতে থাকব শুনেই তিনি মাথার ঘোমটা কিছুটা টেনে কপালের উপর নিলেন। নিজের লোক—ঘোমটা দেওয়া ঠিক না। —ছেলে দুটো ভারি দুষ্টু। পড়তে চায় না। তোমার নাম কি?

—বিলু।

—আমি কিন্তু বিলু বলেই ডাকব।

সেবাইত বললেন. তোমার বৌদি। যা কিছু দরকার এঁর কাছে চাইবে! কোনো সংকোচ করবে না।

আমার বৌদিটির রূপ বর্ণনা দিলাম না। কারণ এমন কিছু সৌন্দর্য থাকে যার বর্ণনা দেওয়া যায় না। এতে বৌদিকে আমার খাটোই করা হবে। দীর্ঘাঙ্গী। পরনে লাল পেড়ে শাড়ি। হাতে দুটো শাদা শাঁখা। খুব লক্ষ্য না করলে শাঁখা এবং হাতের রঙ পার্থক্য করা যায় না। বৌদি লক্ষ্মীকে ডেকে বলল, নটু পুটুকে ডেকে দে। ওদের মাস্টারমশাই এয়েছেন। প্রণাম করে যেতে বল।

লক্ষ্মী বলেছিল, তোমার ছেলেরা ঘুমাচ্ছে।

—ঘুমাচ্ছে, তুলে দে।

ভাবতে পারছি না, কার্তিকের বেলা পড়ে আসে সহজে, সহজেই সন্ধ্যা নেমে আসে। অবেলায় কেন এরা ঘুমায়। লক্ষ্মী আমাকে বারান্দায় টুলে বসিয়ে সেদিন প্রায় সবাইকে চেঁচামেচি করে জাগিয়ে দিয়েছিল। নিজেই বিরক্ত বোধ করছিলাম ওর চেঁচামেচিতে। কি না জানি ভাবে। অথচ সেবাইত মানুষটা ঠাণ্ডা মাথায় বলেছিলেন, কে এসেছে বললি?

—নতুন মাস্টার এয়েছে। তোমরা ঘুমোচ্ছ আর মানুষটা কি ভাববে বলত! মানুষটা মানে আমি। —নতুন জায়গা, ভিনদেশী। দেখলে সব কি ভাবে!

সেবাইত মানুষটি বাইরে এসে বলেছিলেন, মাস্টারদা পাঠিয়েছেন?

চিঠিটা এগিয়ে দিয়ে প্রণাম সেরে নিয়েছিলাম।

তারপরই কেমন দরাজ গলা, আরে তাই তো! ঠিক আছে বোসো। ওকে হাত মুখ ধোবার জল দে লক্ষ্মী। ঘরে ঘরে ডেকে লক্ষ্মীই সবাইকে জাগিয়ে দিল। এটা মনে হয়েছিল আমার লক্ষ্মীর বড় আস্পর্ধা। এ বাড়ি কার বাড়ি, কে আসল মহাজন, কাকে বেশি সমীহ করতে হবে এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। নটু পুটু এসেছিল, তবে তখন নয়। সন্ধ্যায় লক্ষ্মী হ্যারিকেন জ্বালিয়ে দেবার পর। কারণ ভিতর বাড়িটাতে অসংখ্য ঘর। ছোট ছোট দরজা জানালা আরও ছোট। ছোড়দির বাড়ির মতো বিশাল বিশাল দরজা জানালা এ বাড়িতে নেই। মন্দিরের দুটো বিশাল দরজা বাদে আর সর্বত্র কেমন কানা গলি ঘুঁজির মধ্যে ঘরগুলি হারিয়ে গেছে: আমাকে লক্ষ্মী যখন পড়ার ঘরটায় নিয়ে গেছিল তখন প্রায় হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলাম। রাস্তার পাশে, রোয়াকের উপর ঘর। একটা দরজা সামনে, ভিতরের দিকে আর একটা দরজা। রাস্তার উপর দু-দিকে দুটো জানালা। আর দক্ষিণের দিকেও একটা জানালা আছে। ওটা খুলে দিতেই সামনের মাঠ দেখতে পেয়েছিলাম। আর মনে হয়েছিল এই ঘরটাই সবচেয়ে বেশি বড়। দু-পাশে দুটো বড় তক্তপোষ। মাঝে তিনটে হাতল ভাঙা চেয়ার। একটা টেবিল চাকচিক্যবিহীন। সামনে তাক। নটু পুটুর স্লেট পেনসিল খাতা বইতে ঠাসা। বাড়িতে ঢোকার আগে এখানেই তিন চারজন লম্বা হয়ে শুয়েছিল। ঘুমোচ্ছিল। পিলু দরজা ফাঁক করে বলেছিল, এ কেমন বাড়িরে দাদা। অবেলায় সবাই ঘুমায়।

দু-রাত কাটাবার পর কিছুটা ধাতস্থ হয়ে গেছি। বাড়িতে অতিথি অভ্যাগত, আশ্রিতের সংখ্যা অনেক। সবার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেছে—শুধু একজন বাদে। তিনি মন্দিরেই থাকেন খান। একটা গেরুয়া নেংটি পরে থাকেন। গায়ে জামা দেন না। কি খান চোখে দেখিনি। চোখে সব সময় লাল। যেন সেই মহাভারতের দুর্বাশা মুনি। সকাল-বেলায় হোতার সাঁকো থেকে বড় নিমগাছটা পর্যন্ত কেবল পায়চারি করেন—আর সংস্কৃত শ্লোক অনর্গল আওড়ে যান। যেন পৃথিবীটাকে পবিত্র রাখার দায়িত্ব, ধর্মাধর্ম রক্ষার দায়িত্ব তাঁকে কেউ অর্পণ করে

গেছেন। এমন কংকালসার মানুষ অথচ কি দৃপ্ত আর তেজী। মন্দিরের আসনে যখন বসে থাকেন, আমার মাঝে মাঝে তাঁকে কাপালিকের মতো লাগে। যদি কখনও তার চিৎকার ভেসে আসে, বাড়িব সবাই কেমন তটস্থ হয়ে পড়ে। নটু বলেছিল, নরেন খ্যাপা। কাছে যাবেন না। চোখ লেগে গেলে রক্ষা নেই। মন্দিরে বসিয়ে সারাদিন গীতাপাঠ করাবে। উঠতে দেবে না। চান করতে দেবে না। কেবল বলবে, খা খা'। আমারে খা। ভয়ে এই ঘরটা থেকে সহজে বের হই না।

সেবাইতের ছেলে নটু। পুটু ওর বোনের ছেলে। বোন এখানেই থাকে। মাথায় সিঁদুর নেই। হাতে শাঁখা নেই। পুটুর বাবা কোথায় থাকে জানি না। তবে তিনি বেঁচে আছেন জানি। গতকাল পিয়ন পুটুর বাবার চিঠি দিয়ে গেছে। ধনঞ্জয় বলে একজন এ বাড়ির আশ্রিত পুটুর জ্যাঠতুতো দাদা। পঁয়ত্রিশ চল্লিশ দেখতে। ধনঞ্জয়ও ঘরের বার হয় না। পুটুর মার ঘরে দিন রাত শুয়ে থাকে। ঘরটার জানালা ছোট বলে বারান্দার আলো থেকে সব কিছু ভিতরে স্পষ্ট দেখা যায় না। পুটুর মাকে আমি দিদি ডাকার পর স্নেহশীলা রমণীর আচরণ লক্ষ্য করেছি। বাইরে বড় কম বের হন। সকালবেলায় তাঁকে দেখলে মনে হবে, সারারাত যেন না ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন। চোখ বসে গেছে। সুশ্রী দেখতে, তবে লাবণ্য নেই তেমন। কোনো রোগ-টোগ থাকলে মেয়েদের যেমন লাগে দেখতে পুটুর মা সে রকমের।

আমার ঘরের ও পাশের তক্তপোষটায় আরও একজন এ বাড়ির আশ্রিতজন থাকে। কালো কুচকুচে দেখতে। মাথায় বিশাল টাক। বেঁটে খাটো মানুষ। এ বাড়ির আদায়পত্র তার হাতে। নটু পুটু দাদু ডাকে—আমি আর কি ডাকি, দাদুই ডাকতে শুরু করেছি। এতে খুব খুশী তিনি। আমার খাওয়া চান নিয়ে তার দেখছি বেশ একটা ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

আমার জামা প্যান্ট কোরা কাপড় দু'দিন ধরে তুলুঙ্গিতে পড়ে আছে। সকালে লক্ষ্মী মুড়ি সন্দেশ আর গ্লাসে গ্লাসে জল নিয়ে এ-ঘরে একবার আসে। তিন চেয়ারে আমরা তিনজন। পড়ার চেযে নানাবকম মুখরোচক খবর দিতে নটু পুটু ভালোবাসত। খাবাব এলে সেটা বেড়ে যেত। আমি আশ্রিত বলে, সন্দেশের পরিমাণ কম কখনও হতো না। বরং আমার মুড়ির সঙ্গে চারটে কাঁচা গোল্লা থাকলে নটু পুটুর ভাগে দুটো বরাদ্দ থাকত। সকালের জলখাবার একসঙ্গে, দুপুরের খাবার একসঙ্গে রাতেও তাই। সকালের তদারকিব দায় লক্ষ্মীর। দুপুরে বৌদি নিজ হাতে দেন। রাতেও তাই। নটু পুটুর স্কুল নেই। আমাব কলেজে ভর্তি হওয়ার বিষয়টি দাদাই ভার নিয়েছেন। সময় মতো হবে। লক্ষ্মী দু'দিনেই কেমন তেরিয়া হয়ে বলল, মাস্টার, তোমার কিছু হবে না। ও ভাবে সব ফেলে রাখে! বলে সে নিজেই নিবে এল একটা তার। সেটা টানিয়ে দিয়ে বেশ সুন্দর করে ভাঁজ কবে রেখে দিল জামা কাপড়। লক্ষ্মীর এ ঘরে আর একটা কাজ রাতে থাকে। আমাদের বিছানা কবে মশারি টানিয়ে দেওয়া। নটু পুটু আর আমি এক বিছানায পাশাপাশি। পুটুর শোওয়া খারাপ বলে লক্ষ্মী বলে গেছে, ওটাবে একপাশে দেবেন। খুব লাথি মাবে।

জামা প্যান্টের দুরবস্থা নিয়ে এখন আর আমার ভাবনা হয় না। একটা হাফ-প্যান্ট পরে সহজেই এ-ঘর ও-ঘব করতে পারি। এ বাড়িতে পোষাক-আশাকেব প্রাবল্য খুব কম। আমার ছাত্রবাও দেখছি খদ্দরের প্যান্ট জামা পরে। বদরিদাও তাই। বদরিদা হাতে কাচা কাপড় পরেন। ধোপা বাড়ির সঙ্গে এ বাড়ির সম্পর্ক কম। কেবল দিদি একটু সাজগোজ করতে ভালোবাসেন। তাকে কখনও দেখেছি, আযনার সামনে বসে সাজগোজ করছেন। বৌদির তিনবেলা স্নানের অভ্যাস। বাড়িতেই চান করেন। আমারও তাই নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু কালীবাড়ির পিছনে বিশাল ঝিল, বাঁধানো ঘাটলা দেখার পর দাদুর সঙ্গে সেখানে চান করাই শ্রেয় বোধহয়। সারাদিন লক্ষ্মীর কাজ ঝিল থেকে জল টানা। আমার জন্য বাড়তি জল ওর আর টানতে না হয় সেটাও বোধহয মনের মধ্যে কাজ করছিল। আর এরপরই লক্ষ্মী কেমন আমার প্রতি সদয় হয়ে গেল। কোনো কথায় আর চোপা করত না। বরং মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছি কথা বলতে বলতে চোখ নামিয়ে নেয়। সে অন্ত্যজ শ্রেণী থেকে এসেছে, এটাও টের পেলাম আর টের পেলাম লক্ষ্মীর ইতিপূর্বে দুবার বিয়ে হয়েছে। বর কপালে সয়নি। মা বাবা নেই। শেষে কাগে বগে ঠুকরে খাবে এই ভয়ে এ বাড়ির আশ্রয়ে এসে উঠেছে। ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিলাম, লক্ষ্মীর জন্য আমার ভিতরে আর একটা কষ্ট তৈরি হচ্ছে। কেন এমন হয় বুঝি না।

আসলে এরি নাম বড় হওযা। খেপে খেপে কষ্ট বেথে যাচ্ছি এক এক জায়গায়। আগে দেশ বাড়ির জন্য কষ্ট হতো। পবিচিত গাছপালা, মানুষজন, গোপাট, স্কুলবাড়ির সঙ্গে মানুষের নাড়ির টান জন্মে যায়। চলে আসার সময কেবল মনে হতো এখানে আর আমি থাকব না, কখনও আব আসব না, অথচ এবা শীত গ্রীষ্মে একইরকমভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। যে বালক দৌড়ে যেত, গ্রীষ্মের দিনে আম পাড়ত, সে থাকবে অনেক দূরে। শস্যক্ষেত্রগুলিতে ফসল ফলবে, কিন্তু যে বালক ক্ষেতে ফসল বেড়ে ওঠার সৌন্দর্য উপভোগ করত, সে আর থাকবে না। দেশ ছাড়ার সময আমার চোখে জল এসে গেছিল। এ দেশে এসেও যখন যেখানে থেকেছি, কি ভাবে যেন সে জাযগাটার জন্য মায়া পড়ে গেছে। এখানে এসেও তাই। এত কম বয়সে লক্ষ্মীর দুবার বিযে হয়েছে। অথচ কেউ বেঁচে নেই। মা নেই, বাবা নেই। লক্ষ্মীর চালচলন দেখলে বোঝাই যায় না সে এত শোকতাপ পেয়েছে। বরং ওই যেন এত বড় বাড়িটাব আসল চাকা। কারণ এ বাড়িতে সবাই খায়, নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত, এমনকি তারাও চান করে জামা কাপড় পর্যন্ত কেচে দেয় না। সব লক্ষ্মীর জন্য পড়ে থাকে। পাকশালায় আর দু'জন মাঝবযসী বৌ থাকে। কার্তিকের বৌ আর সদি পিসি। ওরা রান্নাবান্নার তদারক করে। উত্তর দিকের অতিথিশালার পাশে কার্তিকের থাকার ঘর। সে মোড়ে একটা মুদি দোকান করেছে। বৌ তার পাকশালে থাকে। বিনিময়ে সেও খেতে পায। সে অবশ্য বলে, দুবেলা প্রসাদ পায়। বদরিদাকে মামা ডাকে। সম্পর্কে তাই হয়। আমি বদরিনাথকে দাদা ডাকি বলে সে আমাকেও মামা ডাকে। মাস্টার ডাকে না। আমার ঘরটার ভিতর দিয়েই যেতে হয় সবাইকে। চার পাঁচটা সাইকেল আছে, সাইকেলগুলি সব পড়ার ঘরের এক কোণায় জমা হয়ে থাকে। সাইকেলেব গায়ে কারো নাম লেখা নেই! যার যখন যেটা দবকাব নিযে বের হয়ে যায। বদরিদা বলেছে এজমালি সংসার। আসলে বুঝি তিনি বলতে চেয়েছিলেন, পান্থশালা।

সকাল থেকেই পান্থশালায় লোক আসা শুরু হয়। মন্দিরের সদর দরজা দিয়ে ঢুকলে ঘুরে যেতে হয় বলে আমাব ঘরটা দিয়ে সর্টকাট করে। যাবার সময, সবার একটা কথা, 'কি মাস্টার তোমার ছাত্ররা পড়ছে'ত। এরা এখন ভিতরে গিয়ে বদরিদার ঘরে তাস খেলতে বসবে। তারপর দুপুরে খেয়ে কখনও ঘুমিয়ে শেষ বেলায় বাড়ি ফেরে। কেউ যাবাব সময় নটু পুটুব মাথায় গাট্টা মেরে যায়। নটু যে এ বাড়ির হবু মালিক কেউ মানতেই চায় না। তার বাবার বন্ধুরা আসে শহর থেকে। কেউ আবার বৌ বাচ্চা নিযেও চলে আসে। ভিতর বাড়িতে ঢুকলেই বোঝা যায় কত বিচিত্র মুখ। সবারই লোভ প্রসাদে। এবং এই লোভেই বোধহয বদরিদাব চেনাজানার জগত এত বিশাল হয়ে যাচ্ছে। বদরিদার এক কথা, এসেছ, মাব প্রসাদ না নিয়ে যাবে কি করে!

নটু বলল, স্যার শনিবার কিন্তু সকালেই দরজাটা বন্ধ করে দেবেন।

আমি বললাম, কেনরে?

—শনি মঙ্গলবারে বড় ভিড় হয়। সকাল থেকেই দেখবেন কতদূর থেকে সব লোকজন আসছে। মানত দিতে আসে। নটু আমাকে আবও খবর দিল, রাতে সদু পিসির ঘর উঠবে কালীর থানে। লোকজন তখন—এ ঘর দিয়েই ছোটাছুটি করবে। আপনারও পড়া হবে না। আমাদেরও না।

শনিবারেই সেটা যথার্থই টের পেলাম। সকাল হতে না হতেই হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। মন্দিরেব চাতালে ঢাক বাজছে। পাঁঠাব আর্তনাদ। যে-সব ছাড়া পাঁঠাগুলি অতিথিশালার ওদিকটায় শুয়ে থাকে তারাও আর্তনাদ করছে। চাতালে ঢাক বাজলে কেমন গুম গুম শব্দ হয়। কার্তিক সকাল থেকেই কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে বসে থাকে। শনি মঙ্গলবার তার দোকান বন্ধ থাকে। বড় রামদাটা বালিতে ঘসে ধার তোলে। পট্ট বস্ত্র পরে নেয়। এবং তাকে দেখলে বোঝা যায়, সে একজন তখন তান্ত্রিক মানুষ। আমাকে মামা পর্যন্ত ডাকে।

না। গাঁজা ভাঙ খায় বোধহয়। না হলে এত গুম মেরে থাকে কেন? মানত করা পাঁঠাগুলি চাতালের এক কোণায় জড় থাকে। মন্দিরের মধ্যে কেউ যেতে পারে না। বাইরে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে সন্দেশের ঠোঙা, অথবা নৈবেদ্য ছুঁড়ে দিতে হয়। সবারই কত রকমের যে দুঃখ। কত রকমের যে প্রার্থনা। ছেলেবুড়ো যুবতী মেয়ে বৌ বেটি সবার এত কি প্রার্থনা থাকে!

অবশ্য আমি একবার মাত্র বের হয়ে দেখেছিলাম। তারপরই মনে হয়েছে, ঐ গণ্ডগোলের মধ্যে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে মাথা ঘুরবে। নিজের ঘরে এসে নটু পুটুকে নিয়ে বসলাম। ওদের এ ব্যাপারে কৌতূহল খুবই কম। বরং নটুর দেখলাম সিঁড়িভাঙা অঙ্ক শেখার আজ বেশ আগ্রহ। এটা দেখে আমার মাস্টারি করার প্রবণতা চাঙ্গা হয়ে উঠল। খুব অভিনিবেশ সহকারে পড়াচ্ছি। পুটু কিন্তু জানালায় বার বার কি দেখছে। পুটুর টাসক দেওয়া আছে সেটা সে করছে না। —'কি হচ্ছে পুটু, ওদিকে মন কেন!' একেবারে গুরুজনের মতো গলা আমার।

পুটু বলল, এই ওখানে কি করছিস রে! জানালায় কাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলছে।

তাকিয়ে আমি অবাক! দেখি ওখানটায় পিলু দাঁড়িয়ে আছে। সে দাদার টানে চলে এসেছে। আমি কী ভাবে পড়াচ্ছি, ভীষণ গর্বের সঙ্গে দেখছে।

পিলুকে দেখে যতটা চঞ্চল হয়ে পড়ব ভেবেছিলাম, ঠিক ততটা হওয়া গেল না। আমার ভাই বলতেও কেমন সংকোচ হচ্ছিল। সে জানলার সিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে ইজের, খালি গা, উসখো খুসকো চুল। ও এরকমভাবেই থাকে। সকাল বেলায় উঠে ঠিক দাদার জন্য মন কেমন করায় দৌড়ে চলে এসেছে। দরজা খুলে দিয়ে বললাম, ভিতরে আয়। তারপর একটু শাসনের গলায় বললাম, কি করতে এসেছিস?

নটু বলল, স্যার কে ছেলেটা?

আমি বললাম, তোমরা ভিতরে যাও। তারপরই মনে হলো হাফ-প্যান্ট পরা স্যারের এত গাম্ভীর্য শেষ পর্যন্ত টিঁকতে নাও পারে। বললাম, পিলু।

পিলু কিন্তু বেশ খোস মেজাজে তক্তপোষে বসে পা দোলাচ্ছে—আমার দাদা। আমি দাদার ছোট ভাই। তোমরা দাদার স্টুডেন্ট? নটু বলল হাঁ। নটু পুটু সঙ্গে সঙ্গে যেন হাতে চাঁদ পেয়ে গেল। ওদের সমবয়সী আমার একটা ভাই থাকতে পারে বিশ্বাসই ছিল না। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, স্যার ভিতরে যাব। পিলুর দিকে তাকিয়ে বলল, আমি নটু, ওর নাম পুটু।

—যাও

—এই পিলু ভিতরে যাবি?

পিলু আমার দিকে তাকাল। নটু কি তার মাকে দেখাতে চায়—এই পিলু, মাস্টার মশাইর ভাই। সকাল বেলায় দাদাকে দেখতে চলে এসেছে। বৌদি যদি কিছু ভাবে, কিংবা বর্দারিদা। বাড়িটার এমনিতেই এত বেশি আকর্ষণ যে কেউ এলে যেতে চায় না। পিলু যা স্বভাবের, তাকে এমন বাড়িই মানায়। আমি বললাম, পিলু এক্ষুণি চলে যাবে। ওকে ভিতরে নিয়ে যেও না। যেন নিয়ে গেলেই পিলু ধরে ফেলবে, এখানে দাদার মতো সেও থেকে যেতে পারে। কেউ কিছু বলবে না। মন্দিরের ডাঁই করা সন্দেশ, দুপুরে সরু আতপ চালের ভাত, মাছ ভাজা, পটল ভাজা, মুগের ডাল, শনি মঙ্গলবারে বাটি ভর্তি পাঁঠার মাংস, চাটনি। পাত পেতে বসে গেলেই হলো। যে আসে সেই যখন পাত পেতে বসে যেতে পারে তবে তার বেলায় কতটা আর রামায়ণ মহাভারত অশুদ্ধ হবে! কিন্তু পিলুটা বোঝে না কেন, আমার ইজ্জত আছে! তুইতো আর কার্তিক ভাদুড়ি নোস, যে পাঁঠা কেটে বাড়ির লোক হয়ে যাবি—তুই যে নটু পুটুর স্যারের ভাই। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেল। লক্ষ্মী এসে গেছে এক বাটি মুড়ি আর চারটে কাঁচাগোল্লা নিয়ে। আমার সকালের খাওয়া। পিলু বড় বড় চোখে বাটিটা দেখছে।

লক্ষ্মী বলল, ধরো মাস্টার। তারপরই পিলুর দিকে তাকিয়ে বলল, ও মা এ যে তোমার সেই ভাইটাগো। লক্ষ্মী পিলুকে একবার দেখেই চিনে রেখেছে। কি গো দেখতে এলে দাদাকে খেয়ে ফেলেছি কি না!

লক্ষ্মীর ভিতরে অন্য এক ব্যথা কাজ করে বুঝতে পারি। সে কি টের পায়। যাকে সে ভালোবাসে সে মরে যায়। তার কি ভয় থাকে গভীরে। কোনো গোপন ভালোবাসায় পড়ে গেলে আমাকে নির্ঘাত গিলে ফেলা হবে। এবং লক্ষ্মীর আচরণ মাঝে মাঝে আমাকে বিস্মিত করে। আমার সমবয়সী অথচ এই বাড়িতে তার কি হম্বিতম্বি। সারাটা দিন কাজ, কেবল সন্ধ্যার পর সে আর কোনো কাজ করে না। বারান্দার এক পাশে শরীর মুখ ঢেকে শুয়ে থাকে—ভোঁস ভোঁস করে ঘুমায়। বারোটার পর শিবা ভোগ হয়। তারপর বর্দাবিদা, বৌদি নটু পুটু দিদি অর্থাৎ সেবাইত বংশের সবাই খাবে। অবেলায় কেন ঘুমায় সবাই, এখন বুঝতে পারি। বৌদি আমাকে বলেছিলেন, তুমি কি আগে খেয়ে নেবে ভাই। খেলে বোলো। আমার কেমন সংকোচ হয়েছিল বলতে, এত রাতে কখনও খাই না বৌদি। আবার মনে হয়েছিল, আমার দুই ছাত্র যদি এত রাত করে খেতে পারে, আমি পারব না কেন। বলেছিলাম, না না, ঠিক পারব। কোনো অসুবিধে হবে না। রাত জাগা অভ্যাস নেই বলে ঘুমিয়ে পড়তাম। লক্ষ্মী এসে ডেকে দেয়, ও মাস্টার ওঠো। খাবে চলো। দাদা বৌদি সবাই বসে আছে। আমার এত ঘুম যে কখনও বিরক্ত হয়ে যেত ডাকতে ডাকতে—কি যে মরণ, বুঝি না বাপু। খিদে পায় না। খিদের চেয়ে ঘুমটা বেশি! সেই কখন চাট্টি খেয়েছে—দেখ কেমন হাঁ করে ঘুমাচ্ছে। দেব জল ঢেলে বলছি।

উঠে বসলে দেখতাম লক্ষ্মী আমার দিকে তাকিয়ে নেই। যেন দেয়াল টেয়াল দেখছে। আসলে এ বাড়িতে লক্ষ্মীর পছন্দ মতো লোকের অভাব। আমাকে তার পছন্দ, সেটা প্রথম দিনেই বুঝতে পেরেছিলাম। বাবার গৌর বর্ণ আমরা পেয়েছি। বয়সের তুলনায় হাতে পায়ে লম্বা হয়ে গেছি বেশি। সোনালী দাড়ি গোঁফ অল্প অল্প সারা গালে। লক্ষ্মী ঠাট্টা করে কাল বলেছিল, নবীন সন্ন্যাসী ঠাকুর গো, কি যে আমার হবে?

সেই লক্ষ্মী পিলুকে দেখে ছাড়বে না বোঝাই যাচ্ছিল। এতেই আমি আরও বেশি কাবু হয়ে গেছিলাম। নটু পুটু দাঁড়িয়ে আছে সঙ্গে করে ভিতরে নিয়ে যাবে বলে। পিলু পা পা করে এগুচ্ছিল। কিন্তু চারটে বড় বড় কাঁচাগোল্লা এক জামবাটি মুড়ি দেখে তার এগোনো বন্ধ হয়ে গেল। লক্ষ্মী সব রেখে ছুটে গেছে ভিতরে। কেন গেল বুঝি না। পিলু কি সং! তামাসা! ভিতরে ভিতরে পিলুর উপর ক্ষেপে যাচ্ছিলাম। এলি তো একটা জামা গায়ে দিয়ে আসতে কি ক্ষতি ছিল। জামাটা ছেঁড়া—তা হোক না, জামা তো। ওর নাকটা দেখলাম। পোঁটা লেগে থাকে—বড় খারাপ স্বভাব। সেই কবে থেকে গায়ে রিফ্যুজি ছাপ লেগেছিল, সেটা বাড়িঘর হয়ে যাওয়ার পর থাকা ঠিক না। তবে রক্ষে নাকে পোঁটা নেই। ওর রঙ শ্যামলা। মুখে মায়ের আদল। চোখ দুটো বড়ই মায়াবী। যা কিছু দেখে, তাই ওর কাছে বিস্ময়। ফলে চোখ দুটো বোধহয় দিনে দিনে আরও বেশি ডাগর হয়ে উঠছে। এ হেন বালকের প্রতি লক্ষ্মী নটু পুটু সবাই টান বোধ করবে সেটা আর বেশি কি। কিন্তু ওর এই বিস্ময়ে আমার যে সম্ভ্রম যায়। চকিতে এতসব ভাবনা মাথায় খেলে গেল। কেউ নেই দেখে বললাম, পিলু বাড়ি যা। এক্ষুণি চলে যা।

পিলু যেন আমার কথা শুনছে না। —দাদা তুই চারটে কাঁচাগোল্লা খাবি? তারপর আর আমার জবাবের প্রতীক্ষা না করে নিজেই ছুটে কাঁচাগোল্লা তুলে একটা মুখে পুরে দিল। কাঁচাগোল্লা একসঙ্গে মুখে পুরে দিলে গলায় আটকে যায়। পিলুর অভ্যাস নেই—সে মুখে দিয়েই বুঝল, গলা দিয়ে ঢুকছে না। আমি চিৎকার করে উঠলাম, শিগগির জল খা। জল খেলে এমন সুস্বাদু খাবার মিলিয়ে যাবে—সে কিছুতেই জল খেতে রাজি না। কিন্তু চোখ মুখের অবস্থা খারাপ। জল ঠেসে ধরলাম মুখে। বিষম খাচ্ছে—এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা—আর তখনই দেখি বৌদি, লক্ষ্মী নটু পুটু হাজির। সবাই পিলুকে দেখতে এসেছে। দেখবে কি, সে তো বিষম খেয়ে অস্থির। তার হাতে আরও একটা কাঁচাগোল্লা। বৌদি কাছে গিয়ে মাথায় ফু দিল, এবং দেখলাম পিলুর

চোখ আবার সহজ হয়ে আসছে। হাতে আর একটা কাঁচাগোল্লা, দাদার বাটি থেকে তুলে নিয়েছে—কি না জানি ভাবে, সে পিছনে নিয়ে গেল হাতটা। কেউ আর দেখতে পাবে না।

বৌদি বলল, তোমার ভাই।

—হ্যাঁ।

—কি নাম ?

—পিলু।

—কি সুন্দর দেখতে। এ যে একেবারে যশোদা দুলাল। এ-বাড়ির কথাবার্তাই এই রকমের। বৌদির ঘরে একটা ছবি দেখেছি। মুখটা ঠিক পিলুর মতো। মাথায় ময়ূরের পালক—ওটা না থাকলে হুবহু পিলুর ছবি হয়ে যেত। বৌদি বলল, লক্ষ্মী ওকেও দুটো খেতে দে। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, পিলু দুপুরে মার প্রসাদ পেয়ে যাবে। পিলুর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কিন্তু যেও না।

এসময় আমার গম্ভীর থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। পিলুকে এরা জানে না। পিলু যদি আসকারা পেয়ে যায় তবে এমন সুস্বাদু খাবার হাতছাড়া করে নড়বেই না। পিলু আরও একজন আশ্রিতজন হয়ে যেতে পারে ভাবতেই আমার কেমন সম্ভ্রমে লাগল। যেভাবেই হোক পিলুকে বুঝিয়ে সুজিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হবে। লক্ষ্মীর ছোটাছুটি বেড়ে গেছে। সে পিলুর জন্য দুটো কলা, এক বাটি মুড়ি চারটে কাঁচাগোল্লা নিয়ে এসেছে। পিলু এখন খুব ভালো ছেলে। সে কলা দুটো খেয়ে ফেলল, কাঁচাগোল্লা খেল। মুড়ি খেল। তারপর আমার পড়ে থাকা বাটির দিকে তাকিয়ে থাকল।

—খাবি।

—তুই খাবি না দাদা ?

—না।

—দে। বলে সে বাকি দুটো কাঁচাগোল্লা খেয়ে ঢেকুর তুলে বলল, এদের বাড়িতে কাঁচাগোল্লার গাছ আছে নারে দাদা ?

—তাই। আমার ক্ষোভে দুঃখে কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। পিলু তুই বুঝলি না, এ-বাড়ির আমি কে ? লক্ষ্মী বৌদি নটু পটু না কি ভাবল। আমরা হাভাতে, তাই বলে লোকের কাছেও সেটা প্রকাশ করতে হবে। তোর বুদ্ধি সুদ্ধি কবে হবে। ভালো খাবার দেখলে তুই মাথা ঠিক রাখতে পারিস না ! এসব কথা বললে পিলু দুঃখ পেতে পারে, বলাও যায় না—বড় অবোধ আমার এই ভাইটি। নটু পটু দাঁড়িয়েছিল—খাওয়া হলেই তাকে নিয়ে যাবে—ঘুরবে, সব গাছপালার ভিতর হেঁটে বেড়াবে—সমবয়সী হলে যা হয়। ওরা আমার শুধু অনুমতির অপেক্ষায় আছে। নটু পটুকে বললাম, তোমরা এখন যাও।

ওরা চলে গেল। পিলু অবাক হয়ে দেখল। দাদাটার কি প্রভাব প্রতিপত্তি। সে তো তার দাদাকে একদম মানে না। আর সে দাদার এমন গম্ভীর ভারিক্কি মুখ কখনও দেখেনি। সে যেন কিছুটা ঘাবড়েই গেল। বলল, দাদারে আমি চলে যাব ?

—এখুনি যা।

—খেতে বলল যে !

—আর একদিন খাবি। ওকে বলতে পারতাম, ওরা জানে আমরা খুব গরিব পিলু। গরিব হলেই কি সব সময় হাভাতে হতে হয়। তুই বাবার মানসম্ভ্রম বুঝবি না। কিন্তু সেসব বলতে কষ্ট হলো। সে চুপচাপ বের হয়ে গেল। লাফিয়ে নেমে গেল রোয়াক থেকে। তারপর রেললাইন পার হয়ে গাছপালার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পিলু চলে যেতেই মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল। একবার ইচ্ছে হলো, বের হয়ে ডাকি—পিলু যাস না। খেয়ে যাবি। এমন সুস্বাদু খাবার পিলু কতদিন খায়নি। টানাটানির সংসারে নিত্যদিনের খাওয়া খুব একটা ভালো হয় না। পিলু এখানে খেলে বাড়ি গিয়ে বলত, মা কালীবাড়িতে ভোজ খেয়ে এসেছি। শুধু মাকে কেন, যাবার সময় নবমীকেও খবরটা দিয়ে যেত। কি সরু চাল নবমী, আর কি সুঘ্রাণ ! পাঁঠার মাংস এক বাটি। মুগের ডাল, মাছভাজা, টক, মিষ্টি। কালীবাড়িতে শনি-মঙ্গলবারে এত প্রসাদ হয় কি বলব ! ভোগের রান্না, স্বাদই আলাদা। মুখে লেগে আছে। তোমাকে একদিন ধরে ধরে নিয়ে যাব। তারপর মনে হলো, না ভালোই হয়েছে। পিলুর বড় পেটুক স্বভাব। খাবার লোভে পড়ে গেলে সে সহজে নড়তে চায় না। সে দাঁড়িয়ে থাকে। রোজ এসে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। বাড়িতে খাওয়া নিয়ে যত ঝামেলা তার। সে মাছ ছাড়া ভাত খেতে পারে না। বাজার না হলে সে নিজেই যায় ডোবা নালায়। কুচো চিংড়ি, কাঁকড়া যা পায় কোচরে করে নিয়ে আসে। আর মাংস কেনার এত পয়সা কোথায় ! একবার মাংস খাব খাব করছিল—কিন্তু হয় না। সে নিজেই গুলতি মেরে একটা খরগোস শিকার করে নিয়ে এল। মা বলেছিল, তুই কি রে ! যা পাবি তাই খাবি। তোমার এসব আমি রান্নাঘরে ঢুকতে দিচ্ছি না। শেষে অনেক কষ্টে বোঝানো গেল, খুব খারাপ হবে না খেতে। বাবাও আমাদের কথায় সায় দিলেন। কাটা-কুটি পিলুই করল। তারপর মাখামাখিও পিলুর। মা কেবল রান্না চড়িয়ে দিলেন। কিন্তু মাংসের ঘ্রান যখন ম ম করতে থাকল এবং বেশ পরিপাটি করে যখন আহার করা গেল, মা বলল, দেখিস তো আবার পাস কি না। খেতে মন্দ লাগল না।

নটু পুটু দুবার উঁকি দিয়ে গেছে। কিন্তু মাস্টার মশাইয়ের মুখ রাশভারি দেখে ঢুকতে সাহস পায়নি। তবু নটু একবার সাহস করে ঢুকে বলল, পিলু কোথায় স্যার ?

—পিলু ? পিলু তো চলে গেল।

—পিলু চলে গেছে। মা যে বলল, মাস্টারের ভাই এয়েছে। ও খাবে এখানে। রান্নাঘরে খবর দিল।

লক্ষ্মীও হাজির, কৈগো মাস্টার তোমার ভাইটি কোথায় ! বদরিদা ভিতরে নিয়ে যেতে বলল। দেখতে চেয়েছে।

ওরা কি ভাবে। পিলু কি সং। ভিতরে আমার কেমন অহংকারে বাধল। তারপরই মনে হলো, আমি অন্যায় অভিমানে ভুগছি। মানুষ মানুষকে ভালোবাসতে পারে, ঘৃণাও করতে পারে। সব মানুষ সমান হয় না। পিলুকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করেছি ঠিক, বাবারও সম্ভ্রম রক্ষা করা গেছে—কিন্তু ঠিক মনুষ্যত্ব রক্ষা হয়নি। এমন একটা সরল বালকের প্রতি আমি ভারি অবিচার করেছি। ততক্ষণে খবরটা ভিতরে পৌঁছে গেছে।

লক্ষ্মী কলসী কাঁখে ঠায় টেবিলের সামনে দাঁড়িয়েছিল। আর হাজার রকমের প্রশ্ন, চলে গেল কেন ?

—চলে গেছে। আমি কি করব। নিজের ইচ্ছায় এসেছিল, নিজের ইচ্ছাতে চলে গেছে। ও কারো কথা শোনার পাত্র নয়।

তুমি মিছে কথা বলছ মাস্টার। কালীর থানে মিছে কথা বলতে হয় না জান ! বেচে খেতে এসেছে ভেবেছ !

আমার ভিতরে ক্ষোভ বাড়ছিল। মেয়েটার এমন রূঢ় কথা আমার সহ্য হচ্ছে না। মিছে কথা বলছি, তুই তো এ বাড়িতে জল তুলিস, খেটে খাস—তোর এত আস্পর্ধা হয় কি করে। বললাম, লক্ষ্মী তুমি পিলুকে চেন না। মিছে কথা বলার কি আছে।

কিন্তু যখন বৌদি আর বদরিদা এলেন, আমার সত্যি তালগোল পাকিয়ে গেল। এবার আর খুব জোর ছিল না কথায়। বদরিদা বললেন, কোথায় সে ? কোথায় গেল !

লক্ষ্মীই জবাব দিল, কোথায় আবার যাবে। বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন মাস্টার। সম্ভ্রমে লাগে।

মেয়েটা এত বোঝে কি করে ! কিন্তু সবার সামনে লক্ষ্মীকে বলতেও পারছি না, কেন বাজে বকছ। সম্ভ্রমের কি আছে। আমিও তো আশ্রিতজন।

বদরিদা রোগা মানুষ। গলায় লম্বা পৈতা। খদ্দরের মোটা ধুতি মালকোচা করে পরা। দেখলে মনে হবে, যেন ক্ষিপ্ত হয়েই ভিতর বাড়ি থেকে উঠে এসেছেন। কিন্তু আমি জানি, এই অমায়িক মানুষটির ভিতরে একটা বড় মাপের মানুষ বাস করে। তার কাছে মিছে কথা বলতেও বাধছে। বৌদি শুধু বলল, মাস্টার এটা ভালো কাজ হলো না। কতদূর থেকে দাদাকে দেখতে এয়েছে। আবার যাবে রোদে !

আমার চোখে জল এসে যাচ্ছিল। কোনোরকমে সামলে বললাম, বাড়িতে কিছু বলে আসেনি। খেয়ে দেয়ে ফিরলে বাবা মা খুব চিন্তায় পড়ে যেতেন !

বৌদি-দাদা কথাটার মধ্যে যুক্তি খুঁজে পেয়ে আর কিছু বললেন না। নটু পুটু পিছনে দাঁড়িয়ে। লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে। ওকে বড় ভয় করছে। সে সবার সামনেই না বলে দেয়, সব মিছে কথা। মাস্টারের বানানো কথা। কি নিষ্ঠুররে বাবা! ভাইটাকে দুটো ভালো-মন্দ খেতে পর্যন্ত দিল না!

খেতে খেতে বেলা দুটো আড়াইটা বেজে যায় এ-বাড়িতে। ভোগের রান্না শেষ হয় দেরি করে। পাঁঠা বলি হয বারোটাব মধ্যে, মানুষের তো মানতের শেষ নেই। যারা বলি পছন্দ করে না, পাঁঠা উৎসর্গ করে ছেড়ে দেয়। শনি মঙ্গলবারে একটা দুটো ছাড়া পাঁঠা থাকেই। দিনে দিনে এরা জমে যায়। বাড়ে—বড় হয়। শনি মঙ্গলবারে মানতের পাঁঠা না পাওয়া গেলে, ছাড়া পাঁঠা বলি হয়। ওদিকটায় আমি যাই না। ঘরের মধ্যে বসেই টের পাই কার্তিক রামদা নিয়ে এগোচ্ছে। ঢাক কাঁসি এবং গুরুগম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ আরম্ভ হলেই বুকটা আমাব কাঁপে। পাঁঠা ধরার লোক ধনঞ্জয়। সে সকাল সকাল চান করে মন্দিরে এ-দিনে চলে যায়। পিলু চলে যাবার পর আমার কিছুই ভালো লাগছিল না। এমন কি মন্ত্রপাঠ ঢাক ঢোলের বাজনা সব কিছুতেই মেজাজ অপ্রসন্ন হয়ে হয়ে উঠছে। ঝিল থেকে স্নান সেরে আসার সময় দেখেছিলাম—কত বিচিত্র মানুষ মন্দিরের চারপাশে জড় হয়ে আছে। সাবু, ভিখিরি ছেলে মেয়ে বউ বুড়ি গর্দানমোটা ব্যবসায়ী, জমিদার বাড়ির মানুষজন সব যে যার মতো অশ্বত্থ গাছগুলির নিচে শুয়ে বসে আছে। চা খাচ্ছে ফ্লাকস থেকে। পাঁচ সাতটা বাচ্চা ছেলে গেরুয়া কাপড় পরে ঝিলের পাড়ে বসে চুল কামাচ্ছে। চুলের মানত আছে বোঝাই যায়। ধীরু নাপিত বাঁধা মানুষ মন্দিরে। সেই সব করে। গেরুয়া কাপড় সে পায়। মানুষের কত লীলা এমনই মনে হয়। পিলু এসেছিল দাদাকে শুধু দেখতে। তার কিছু আশা ছিল না। এত মানুষের মধ্যে পিলু থাকলে কি আর বেশি বাড়তি মানুষ হতো। লক্ষ্মী এসে বলল, খেতে যান গো মাস্টার। খাবার দেওয়া হয়েছে।

বলার ইচ্ছে ছিল, ক্ষিধে পায়নি। কিন্তু জানি কথাটা লক্ষ্মী শেষও করতে দেবে না। খিদে পায়নি কেন? মন খারাপ? অত দেমাক ভালোনাগো মাস্টার। কালীর থানে এয়েছ, কপালে না থাকলে হয না। মান অভিমান কমাও। গরিব বলে কি মানুষ ছোট হয়ে যায়।

খেতে গেলাম অগত্যা। কিন্তু খেতে পারলাম না। বার বারই চোখ ঝাপসা হয়ে উঠছে। পিলুটা হয়ত ডাল দিয়ে ভাত খেয়ে উঠে গেছে। কিছু ভাজা, কুমড়ো ফুলের বড়া আর কি বেশি রান্না হতে পারে। দুই চৌধুরী থাকার সময়ই বাবা ফতুর। আমার উপার্জনের টাকাও বোধহয় শেষ। খাওয়া দাওয়া কষ্টে চলছে এখানে থেকেও তা বুঝতে পারি। লক্ষ্মী বারান্দার একপাশে দাঁড়িয়ে। কলাপাতায় নুন, লেবু, কাঁচালংকা জল সে সবাইকে দেয়। তার চোখ ফাঁকি দেওয়া কঠিন বলে, চোখ ঝাপসা হলে মুখ নিচু করে রেখেছি। যতদূর জানি ভিতরের দুঃখটা কেউ টের পায়নি। লক্ষ্মীকেও পেতে দিইনি। চুপচাপ খেয়ে উঠে নিজের ঘরে চলে এলাম। তক্তপোষে মাদুর পেতে জানালা ঘেঁষে শুয়ে পড়েছি। চোখে হাত রেখে কত কিছু ভাবছি। নতুন জীবন শুরু। বদরিদা দু-একদিনের মধ্যে কলেজে যাবেন বলেছেন আমাকে নিয়ে। ভর্তি করার দায়িত্বটা মানু কাকার কথায় তিনিই ভার নিয়েছেন। মানু কাকা নাকি বলেছেন, বাবা খুব অসহায় মানুষ। তা বলতেই পারেন। যজন যাজন ছাড়া তাব আর কিছু কাজ জানা নেই। এদেশের মানুষদেব এমনিতেই ধাবণা, দেশ ছেড়ে এসে সবাই কুলিন বামুন কায়েত হয়ে গেছে। বাবা যে তেমন নয় কে জানে। মানুষেব বিশ্বাস অর্জন করতে সময় লাগে।

আর তখনি কার মৃদু শব্দ। টেবিলে খুট খুট করছে। নটু থাকতে পারে পুটুও। এরাও আমার পাশে শুযে দিবানিদ্রা দেবে। বদরিদা ওদের ভালোমন্দ দেখার দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। পাশে শোয় ঠিক, কিন্তু ঘুমাতে চায় না। এ-পাশ ও-পাশ করে। কখনও দু'জনে মারামারি পর্যন্ত শুরু কবে দেয়। সবকিছুর মীমাংসা আমাকে করতে হয়। চোখ খুলে দেখলাম, তারা কেউ কিনা! না। তাবা নয়। লক্ষ্মী। সে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, খেলে না কেন মাস্টার।

একটা কড়া জবাব দেব ভাবলাম। কিন্তু চোখ দুটো এত মাযাবী যে কড়া কথা বলা গেল না। আমি খাইনি বলে যেন এক গোপন কষ্ট বয়ে বেড়াচ্ছে। থাকতে না পেরে এখানে চলে এসেছে। বললাম, খেলাম তো।

—এটা খাওয়া। তুমি কতটা খাও আমি দেখি না! তুমি খেতে খেতে চোখের জল ফেলছিলে কেন?

—লক্ষ্মী। কেমন চিৎকার করে উঠতে গিয়েও পারলাম না। পাশ ফিরে শুয়ে বললাম, এখন যাও। আমি ঘুমাব।

—ঘুমাতে কে বারণ করেছে। ঘুমাও না। তাই বলে তুমি আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না।

একবার বলার ইচ্ছে হলো, তুমি কি এ বাড়ির গোয়েন্দা! বৌদিকে না আবার বলে দেয়। ওরা তবে কি ভাববে! উঠে বসলাম। ধরা পড়ে গেছি যখন উপায় কি! বললাম, কাউকে বোলো না।

লক্ষ্মী কেমন মাথা নিচু করে বলল, তুমি এটা মাস্টার ভাবলে কি করে আমি সবাইকে বলে বেড়াব। আমি ছোট জাতের বলে মনটা ছোট হবে কেন। কালীর থানে থাকলে মন ছোট রাখতে নেই। তিনি তো সব দেখতে পান। গোঁসা হবে না তার!

এ-হেন মেয়েটির সঙ্গে আমি কথায় কি করে পারি। চুপচাপ থাকলাম। লক্ষ্মী তবু দাঁড়িয়ে আছে। যাচ্ছে না। কি ভাবছে কে

P 23335

বাড়ি চল মাস্টার। ঠাণ্ডা লাগবে···

জানে। লক্ষ্মী গায়ে কিছু পরে না। অথচ শরীর আশ্চর্যভাবে ঢেকে ঢুকে রাখতে শিখেছে। এ-বয়সটা এমন যে সব কিছু ফুটে বের হতে চায়। লক্ষ্মী টের পায় বলেই শরীর নিয়ে এবং তার ডুরে শাড়ি নিয়ে সব সময় খুব সতর্ক থাকে। আমার ঘরে হুট হাট চলে আসে, ওতে আমি শংকিত থাকি। এই সেদিনও এটা ছিল না। ছোড়দির কথা মতো সব করতে পারতাম। ছোড়দির পিছনে সাইকেলে চেপে কতদিন দামোদরের পাড়ে চলে গেছি। নদীর চরায় হেঁটে বেড়িয়েছি। ছোড়দি কত কথা বলত, বিলু তুই বড় হবি কিন্তু। পিলু ছোড়দি মা বাবা সবাই চায় আমি বড় হই। সেই বড় হওয়াটা লক্ষ্মীও চায় বুঝি। কলেজে যাবার দিন দেখলাম, আমার একটা মাত্র ফুলপ্যাণ্ট ধুয়ে সুন্দর করে ভাঁজ করে বালিশের নিচে রেখে দিয়েছে। আমি কি পরে যাব না যাব, আমার চেয়ে লক্ষ্মী সেটা যেন বেশি জানে। কে তাকে এই দায়িত্ব দিয়েছে। বৌদি, বদরিদা না সে নিজেই এ-ভাবে মানুষের দায়িত্ব নিতে ভালোবাসে। অন্যমনস্ক হলেই দেখেছি, লক্ষ্মী কখন এসে আমার জীবনের অনেকটা জায়গা জুড়ে বসে গেছে। বুঝতে পারছি সাপের খোলস ছাড়ার মতো আমার পুরনো খোলসটা এবার শরীর থেকে ধীরে ধীরে খসে যাচ্ছে। নতুন খোলস—নতুন এক আশ্চর্য ছাপ এবং দারুচিনি গাছের মতো সুঘ্রাণ—কে যেন ধীরে ধীরে এসে একটা সঠিক আস্তানা গাড়তে চাইছে। তারজন্য প্রায়ই জানালায় অথবা জ্যোৎস্না রাতে, কোনো নির্রিবিলি আকাশের নিচে নক্ষত্র দেখতে দেখতে ভাবি সে কে! সে কোনে রহস্যময়ী নারী—যে আমায় কোন ফুলের উপত্যকায় নিয়ে যেতে চায়।

পিলু সেটা টের পেয়ে গেছে কিনা কে জানে। সে আর আসে না। প্রায়ই জানালায়, মনে হয়, সে এসে দাঁড়িয়ে ডাকবে, দাদা আমিরে। সেই স্বর্গীয় হাসিটি লেগে থাকবে পিলুর মুখে। আমি বলব, আয় ভিতরে আয়। আজ তুই এখানেই খেয়ে যাবি। লক্ষ্মী টের পেয়ে বলেছিল, বাড়ি যাও না মাস্টার। ভাইয়ের জন্য কেমন করছে মন!

কেমন উদাস গলায় বললাম, অনেকের জন্যই মন কেমন করে। কিন্তু কাউকে বলতে পারি না। পিলু কেবল সেটা ধরে ফেলেছে। সে আর সে-ভাবে বুঝি আমার কাছে আসবে না। লক্ষ্মী কি বুঝে মাথা নিচু করে রাখল। যে মেয়েটা সারাদিন চোপা করে তার চোখও দেখলাম কেমন জলে ভার হয়ে উঠছে। ধরা পড়ে যাবে বলে, সে দৌড়ে ভিতরে চলে গেল। এরপর অনেক দিন লক্ষ্মী আমার সামনে আসেনি। তাকে আর আগের মতো কাছাকাছি দেখতে পাই না।

রাতে যখন খেতে যাই ভিতর বাড়িতে তখন সে বিছানা করে রাখে। কলেজ থেকে ফিরে দেখি আমার বইপত্র খাতা সব তাকে সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে। সকালের খাবার নটু পুটুকে নিয়ে আসতে হয়। আমারটাও তারাই নিয়ে আসে। লক্ষ্মীকে কাছে পাবার যা কিছু উপলক্ষ্য ছিল, সব থেকেই সে কেমন দূরে সরে থাকছে। লক্ষ্মী যত দূরে সরে যাচ্ছিল, তত ভিতরে এক আশ্চর্য টান বোধ করছি। সে দূরে থেকে আমার সব কিছু লক্ষ্য রাখছে। আমার সব কিছুতেই তার অদৃশ্য হাত কাজ করে চলেছে। এমন কি সে আমার জন্য আলাদা স্নানের জলও তুলে রাখে। জামাপ্যাণ্ট ধুয়ে মেলে দেয়। তারপর যেখানে যা রাখবার রেখে দেয়। সাঁঝবেলায় জানি লক্ষ্মী জল আনতে যাবে ঝিলে। তাকে সেখানে একা পেতে পারি ভেবেই কেন যে গিয়ে সিঁড়ির চাতালে বসে থাকলাম। লক্ষ্মী এল, দুবার জল নিয়ে গেল। সে যেন আমাকে চিনতেই পারে

না। মরিয়া হয়ে শেষ বেলায় বললাম, লক্ষ্মী, দাদাকে বলে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করছি। মজা বুঝবে। লক্ষ্মী কেমন আঁৎকে উঠল। লক্ষ্মী ভারি যুবতী নারীর মতো বলল, মাস্টার কপালে আমার সয় না। সে মানুষটার অনিষ্ট হোক আমি চাই না। এই ভালো আছি। এইটুকু বলে সে চলে গেল। বুঝতে পারছিলাম, লক্ষ্মী নিজেকে আর জড়াতে চায় না। তার ধারণা, সে মানুষের জন্য টান বোধ করলে জগৎজননী রাগ করে। তাকে কেড়ে নেয়। সে সারা জীবনের জন্য বোধহয় এইখানে সেবাদাসী হয়ে পড়ে থাকতে চায়। আর কিছু জীবনে তার কাম্য নয়। ঝিলে কিছু পাখি উড়ে এল, ও-পাড়ের বাঁশবনে কারা আগুন জেলেছে। শীত শীত করছিল। কিন্তু উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। আকাশে কিছু নক্ষত্র। নিরিবিলি এক জনশূন্য পৃথিবীর আমি বাসিন্দা। মানুষের কত রকমের সংস্কার গড়ে ওঠে বড় হয়ে উঠতে উঠতে। এক সময় দেখলাম, লক্ষ্মী লণ্ঠন হাতে চলে এসেছে। হাতে শীতের চাদর। শুধু বলল, বাড়ি চল মাস্টার। ঠাণ্ডা লাগবে। এটা গায়ে দাও। ঠাণ্ডা লাগিয়ে জ্বর বাধালে কে দেখবে!

—কেন তুমি।

—আমি তোমার কে? কেউ না। আমার দায় পড়েছে দেখার। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে কথাগুলি বলল লক্ষ্মী। লণ্ঠনের আলোয় তার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। বুঝতে পারছি লক্ষ্মী আমার অমঙ্গল আশংকায় কাতর হয়ে পড়ছে। কিছু একটা না আবার মাস্টারের হয়। সে তারপর বলল, বাড়ি চল মাস্টার। মানুষের মুখে আকথা কুকথা লেগেই থাকে। তুমি আর আমাকে জ্বালিও না। অনেক রাত হয়েছে এবারে ওঠো।. তারপর লক্ষ্মী আমাকে দরজায় পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। যাবার সময় শুধু বলল, ভারি ছেলেমানুষ তুমি।

এ কথায় কেন যে ক্ষিপ্ত হয়ে গেলাম। দৌড়ে গেলাম, সে মন্দিরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। লণ্ঠনটা কেড়ে মুখের কাছে নিয়ে গেলাম। —দেখি তোমার মুখ। আমি ছেলেমানুষ, তুমি কি! কেমন মাথাটা লক্ষ্মীর কথায় ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছিল। প্রায় পাগলের মতোই কাণ্ডটা করে ফেলেছি।—দেখি মুখ, খোল। খোল বলছি। লক্ষ্মীর আঁচল নিয়ে কাড়াকাড়ি করছি।

লক্ষ্মী শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে রেখেছে। না না, দেখ না মাস্টার, পায়ে পড়ি। আমার মুখ দেখলে তোমার অনিষ্ট হবে মাস্টার। তারপরই কেমন আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। সত্যি ভারি ছেলেমানুষী করে ফেলেছি। কেউ দেখে ফেললে কি ভাবত! চুপচাপ ঘরে এসে বসলাম। নটু পুটুকে বললাম, আজ তোদের ছুটি। আজ আর পড়াব না। ওরা চলে গেলে—রেল লাইন ধরে অনেকটা হেঁটে গেলাম। জ্যোৎস্না রাত—আমার কেন জানি কিছুই ভালো লাগছে না। কেমন ভিতরে চঞ্চল বালকের মতো এক তীব্র অস্থিরতায় পাগল হয়ে উঠেছিলাম। তারপরই দেখলাম হাঁটতে হাঁটতে সেই নবমী বুড়ির বনটার কাছে এসে গেছি। মানুষ বুঝি শেষ পর্যন্ত এখানেই এসে থামে। কখনও খর রোদ, কখনও জ্যোৎস্না, কখনও গাছপালার নিরন্তর ছায়া। মানুষ এভাবেই সামনে হেঁটে যায়। বনভূমির এক আশ্চর্য নিথর সৌন্দর্যে আমি কেমন মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমার চাঞ্চল্য কমে গেল। ধীরে ধীরে ফের রেল লাইন ধরে হেঁটে ফিরতে থাকলাম। মনে হচ্ছিল যেন কারা চারপাশে আমার ঘোরাফেরা করছে। তাদের পায়ের শব্দ আমাকে ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যেন যেতে বলছে। হাহাকার হাসিতে টের পাচ্ছিলাম তারা আমায় কোন ফুলের উপত্যকায় নিয়ে যেতে চায়। আমি সব ছেড়ে, ঘরবাড়ি ফেলে, এখন সেদিকেই হাঁটছি। উপত্যকার দুই প্রান্তে আমি আর পিলু দাঁড়িয়ে। নির্জন সেই উপত্যকায় আমাদের দু'জনের মাঝখানে কেউ কেবল আঁচল উড়িয়ে নৃত্য করছে। পিলুর আর সেই ডাক 'দাদারে' শুনতে পাচ্ছি না। সে বার বার ডেকেও আমার সাড়া পাচ্ছে না।

সমাপ্ত

The new edition

INDIA SOCCER ANNUAL 1981

Fascinating feature articles:
SURAJIT SENGUPTA salutes Habib, the man of principle: A.T.P. SARATHY follows the career of AIFF president Ziauddin: CHUNI GOSWAMI's intimate portrait of Jarnail Singh: SUKUMAR SAMAJPATI reviews the Calcutta League: BRIAN GLANVILLE's picture of Italian club rivalries —and much else
Tournament reviews—Championship rolls—Plenty of photographs, in colour and black & white

Price Rs. 6.00

ITYADI PRAKASANI (PVT.) LTD, 47 Biplabi Anukul Chandra Street, Calcutta 700 072

বাঙালী ব্যক্তিত্ব

‘ভাগবতের একটি শ্লোক মারকসবাদকে বিস্মিত করে দিতে পারে’—শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

ময়মনসিংহের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর মাসিক সাড়ে তেত্রিশ টাকা বৃত্তিই সম্বল। নিজের খরচের জন্য সতেরো-আঠারো টাকা রেখে বাকিটা দান করে দিতেন নিষ্কিঞ্চন ব্রাহ্মণ ভট্টপল্লীর পঞ্চানন তর্করত্ন। বাংলায় দর্শন চর্চার এক উজ্জ্বল অধ্যায়ও রচনা করেছিলেন এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁর ব্রহ্মসূত্রের শক্তিভাষ্য রচনা করে। আজকের ভাটপাড়া সেকালের বিদগ্ধ সারস্বত কেন্দ্র ভট্টপল্লী, বেদান্ত, সাংখ্য, স্মৃতিশাস্ত্র আর পুরাণ চর্চায় মুখর। টোলে টোলে বিদ্যার্থীর সমাগম। বাঙালী স্মার্ত পণ্ডিতের নাম-ডাক প্রায় সারা ভারতে ব্যাপ্ত, এই সঙ্গে ভট্টপল্লীর নাম।

এই ভট্টপল্লীর ভারতখ্যাত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে পুত্র শ্রীজীবকে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহ দিচ্ছেন। ব্যায়াম, কুস্তি, ছোরা, গদকা, তরোয়াল খেলার শিক্ষণ-শিবির খোলা হয়েছে যুবকদের বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে উদ্বোধিত করতে। সভাপতি হয়েছেন স্বয়ং পঞ্চানন তর্করত্ন। বাংলায় পুরাণ গ্রন্থ সম্পাদনায় যাঁর নাম মুদ্রিত হচ্ছে, বাঙালীর ঘরে ঘরে সে নাম শ্রদ্ধায় সমাদৃত। বেদান্তের মধ্যে নতুন শক্তিতত্ত্বের আলোকে উদ্ভাসিত শক্তিভাষ্য বাংলার বিশিষ্ট অবদান হয়ে আদৃত হচ্ছে প্রাজ্ঞজনের কাছে। ১৯১২ সালে কাশীধামে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কাছে পঞ্চানন তর্করত্ন পুত্র শ্রীজীবকে পাঠালেন, ইংরাজি শিক্ষার সূচনাও কাশীধামে।

১৯২২ সাল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুটি স্বর্ণপদক লাভ করে সংস্কৃতে স্নাতকোত্তর হলেন শ্রীজীব ভট্টাচার্য। এছাড়া সংস্কৃতে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়তীর্থ মহামহোপাধ্যায় ও মহাকবি উপাধি লাভ করেছেন তিনি। শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ নামেই আজ যাঁর পরিচিতি সর্বব্যাপ্ত। সংস্কৃত ভাষাকে প্রাণ জাহ্নবীর ধারার মতো যিনি নিজের জীবনে ও সমাজ সংস্কৃতিতে অব্যাহত রাখতে চান।

১৯২৪ সাল। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আমন্ত্রণ জানালেন সংস্কৃতে কৃতী ছাত্র শ্রীজীব ন্যায়তীর্থকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকপদ গ্রহণের। পিতা সনাতন ব্রাহ্মণ্য আদর্শে পুত্রকে বিদ্যা বিক্রয়ের অনুমতি দিলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু কালের কুটিলগতি মানুষের

সমস্ত বিশুদ্ধ ভাবনা চিন্তার ও কল্যাণবোধের বিনষ্টি সাধন করে। এই কুটিল গতি যেন অপ্রতিরোধ্য, তা না হলে ১৯৩৭ সালে শ্রীজীব ন্যায়তীর্থকে পিতার অনুমতি গ্রহণ না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকপদ গ্রহণ করতে হয়? জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর তাঁর মাসিক বৃত্তি বন্ধ করে দিয়েছেন। সংসার প্রায় অচল। পিতৃভক্ত পুত্র সনাতন ব্রাহ্মণ্য আদর্শ থেকেও অনিচ্ছায় সরে আসতে বাধ্য হলেন।

একসময়ে বাংলাদেশের জাতীয় জীবনের এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার সঙ্গে শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের জীবনে কয়েকটি বছর জড়িয়ে পড়েছিল। ১৯২৩ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত বিখ্যাত তারকেশ্বর মোহান্ত মামলার বিরুদ্ধ পক্ষ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার সভাপতি ছিলেন পঞ্চানন তর্করত্ন। পিতার একান্ত সহায়ক হিসাবে শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ ২৯ দিন স্মৃতি ও তন্ত্রের বিশেষজ্ঞ হিসাবে এই মামলায় সাক্ষ্য দান করেছিলেন। মামলায় ব্রাহ্মণপক্ষ জয়ী এবং মোহান্ত পক্ষ পরাজিত হন।

দীর্ঘ জীবন জ্ঞান ও সত্য সাধনার এক নিষ্কম্প্র প্রাণশিখা ৯০ বছরের জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ। বয়স তাঁর শরীরকে জরাগ্রস্থ

করতে পারেনি। ভাটপাড়ার বাড়িতে বসেই তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম। বাড়ির প্রতিটি ইঁটকাঠে লেগে আছে তাঁর আশৈশব স্মৃতির সৌরভ। চকমিলানো ঠাকুর দালানে আজও অব্যাহত আছে প্রাচীন শাস্ত্রীয় মর্যাদা ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে ১৫৫ বছরের রটন্তী কালীপূজা, ৯৪ বছরের দুর্গা-পূজা এছাড়াও জগদ্ধাত্রী পূজা, সরস্বতী পূজা. লক্ষ্মী পূজা এবং দশ-এগারোটি বাৎসরিক শ্রাদ্ধকার্য। নাতি-নাতনি, পুত্র-কন্যা ও দীর্ঘ জীবনের জীবনসঙ্গিনী সবাইকে নিয়ে প্রসন্নো-জ্জল নির্লোভ ব্রাহ্মণ্য আদর্শকে ধরে রেখেছে ভাটপাড়ার এই ভট্টাচার্য বাড়ি।

প্রশ্ন রেখেছিলাম অনেকগুলি, সব প্রশ্নের নিঃসঙ্কোচ উত্তর দিয়েছেন তিনি। কোথাও কোনো দ্বিধা ও সংশয় বয়োবৃদ্ধ বহুদর্শী প্রবীণের কণ্ঠকে কম্পিত করেনি।

: আপনি কী আপনার দীর্ঘ জীবনের সারস্বত সাধনায় আজ আত্মতৃপ্ত?

: না। তৃপ্ত নই। আমাদের সম্প্রদায়ের ধারা রক্ষা অর্থাৎ সারস্বত সাধনার ধারা রক্ষাই ছিল জীবনের অভীষ্ট। কিন্তু তা আজ কঠিন হয়ে উঠেছে। আমার একটা সংস্কৃত টোল আছে এবং এখনও আমি অধ্যাপনা করি। কিন্তু পাঠার্থী ছাত্র নেই, সকলে অর্থার্জনে ব্যতিব্যস্ত।

: বাংলার নব্যন্যায় চর্চার যে সুনাম ও ঐতিহ্য ছিল আজও কী সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তা অম্লান আছে?

: না। নব্যন্যায় আলোচনা করবার মতো মনোবৃত্তি লুপ্ত হয়ে গেছে।

: আমাদের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কৃত কেন উপেক্ষিত? এ ব্যাপারে সংস্কৃত চর্চায় সারস্বতজনের ভূমিকা কী?

: সংস্কৃত ভাষা উপেক্ষিত হবার কারণ অনেকগুলি। প্রথমত, মানুষের ধারণা হয়েছিল উদরপূর্তিই একমাত্র প্রয়োজন; কিন্তু মানুষের জ্ঞানলাভটা তো প্রথম প্রয়োজন হওয়া উচিত, সেটা আমরা ভুলে গেছি। ইংরাজ আমলে ইংরাজরাও সাহস করল না সংস্কৃতকে উচ্ছেদ করতে। তাদের মধ্যে অনেক মনীষী এ ভাষার সযত্ন অনুশীলন করেছেন। সংস্কৃত অধ্যয়ন করে তাঁরা নিজেদের কৃতার্থ মনে করে-ছেন। যেমন শোপেনহাওয়ার, ম্যাকসমূলার উইনটারনিজ।

আলাপচারিতার মধ্যে দিয়ে জীবনের এক অমোঘ সত্যভাষণ করলেন প্রবীণ শাস্ত্রজ্ঞ ন্যায়তীর্থ। এ শুধু সত্যভাষণ নয়, আত্ম-সমালোচনার তির্যক বীক্ষণ। ন্যায়তীর্থ জানালেন: এখন আমাদের পণ্ডিতবর্গরা তাঁদের পুত্র-কন্যাদের বর্তমান বাতাবরণের পরি-প্রেক্ষিতে ইংরাজি-বাংলায় পড়াতে আরম্ভ করলেন। সংস্কৃত শিক্ষার দিকে নিজের পরিবারের লোককে এগিয়ে না দিয়ে অর্থার্জনের দিকে ঝোঁকটাই বেশি। এ ব্যাপারে আমাদের পণ্ডিত সম্প্রদায়ের অপরাধ আছে সন্দেহ নেই। আমাদের সংস্কৃত-পণ্ডিত সম্প্রদায় আজ আত্মবিস্মৃত।

: এ যুগের জীবনের মূল্যবোধ আপনাকে ব্যথিত করে? বস্তুবাদী ও ভাববাদী দর্শনের বিরোধ আপনার জীবন ও সাধনায় কখনও কী ছায়াপাত করেছে?

: হ্যাঁ ব্যথিত করে। বস্তুবাদ ও ভাববাদ এ কোনো নতুন কল্পনা নয়। সংস্কৃতে আছে। ভাগবতের একটি শ্লোক মারকস-বাদকে বিস্মিত করে দিতে পারে। সেই শ্লোকের অর্থ: যে পরিমাণ অন্নে একজনের উদর পূর্তি হয় সেই পরিমাণ অন্নের অধিকার সকল মানুষের আছে। যিনি অভিমানবশত অধিক সঞ্চয় করেন তিনি চোর ও রাজদণ্ডনীয়। আমাদের সভ্যতার আরম্ভকালে উঞ্ছবৃত্তিশীল বৃত্তির দ্বারা ব্রাহ্মণ জীবিকা নির্বাহ করত, মহাভারত, পুরাণ এবং স্মৃতিগ্রন্থে বহু প্রমাণ আছে। আমাদের বাল্যকালে পিতৃদেবের এই উপদেশ ছিল যে অর্থের প্রচুরতা মানুষকে বিপথে চালিত করে। দারিদ্রের কষাঘাতে শ্রীভগবানকে ধ্যান করবার ইচ্ছা হয়। চার্বাক-দর্শন ভারতে উত্থিত হয়েছিল। যা এখন বস্তুবাদ নামে প্রখ্যাত। কিন্তু এই চার্বাকদর্শন পূর্বপক্ষ রূপে গৃহীত হয়েছিল। তা খণ্ডনের জন্য বৌদ্ধ, জৈন থেকে আরম্ভ করে হিন্দুর সমস্ত শাস্ত্র প্রতিবাদ করার জন্য যুক্তি স্থাপন করেছে। আমি আমার জীবনে এই ভাবধারার সামঞ্জস্য করতে চেষ্টা করেছি।

: ভাটপাড়ার সারস্বত সমাজের যে ঐতিহ্য তা কী এ যুগেও অম্লান আছে? যদি তা নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে কী তার কারণ?

নির্ভীক নিষ্কম্প্র উচ্চারণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কণ্ঠে: না অম্লান নেই। এর জন্য রাষ্ট্র দায়ী এবং আমরাও দায়ী। যে কোনো ঐতিহ্যের মূল্যায়ন না হলে মানুষ তার প্রতি কখনই কোনো অনুরাগ বহন করে না।

: আপনি আপনার সময়ের উল্লেখ্য ও শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত বলে কাকে স্বীকার করেন?

: সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ এবং কাশী নিবাসী স্বামী করপাত্রীজী। আরেকজন আছেন কাঞ্চীকামকোটিপীঠের শঙ্করাচার্য।

: সংস্কৃত চর্চা ভারতের কোন অংশে বেশি সমাদৃত বলে আপনার মনে হয়।

: একসময় নবদ্বীপ ও ভাটপাড়ায় এর কদর ছিল। এছাড়া দক্ষিণ ভারত, কাশী এবং কতিপয় টোলে। পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ অবিভক্ত বাংলায় এক বিশিষ্ট সংস্কৃত-চর্চার কেন্দ্র ছিল। আমি বহুবার নিমন্ত্রিত হয়ে ঢাকায় গিয়েছি।

: এ যুগটাকে আপনার কী রকম মনে হয়। এত গতিময়তা মানব সভ্যতাকে কোথায় ও কোন পরিণতিতে নিয়ে যাবে?

: বর্তমান সমাজ-গতি ধর্মহীনতার দিকে চলেছে। এত গতিময়তা হিংসা, নৃশংসতা প্রভৃতি সমাজের শান্তি বিনষ্ট করবে আমার আশংকা হয়।

: মানব সভ্যতায় ঈশ্বরতত্ত্ব কি প্রগতির পথ দেখিয়েছে?

দৃঢ়, দার্ঢ্য উচ্চারণ, কোনো ভাষ্য তত্ত্ব উত্থাপন না করে ন্যায়তীর্থের জবাব: নিশ্চয়। প্রগতি শব্দের অর্থ যদি মানবের প্রকৃষ্ট গতি বোঝায় তাহলে ভগবৎ আরাধনাই প্রকৃষ্ট পন্থা। ভগবৎবিমুখ সমাজ কখনই উন্নতি লাভ করতে পারে না। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হলো ভগবৎ উপাসনা। সোভিয়েট রাশিয়া এত বিপ্লবের পর চার্চের দরজা আজও বন্ধ করে দিতে পারেনি। আজও সে দেশে বহুলোক চার্চের উপাসনার মধ্যে আত্মার শান্তি খুঁজে পেতে চায়।

: কিন্তু ধর্মের নামে এই যে বাবা তারকনাথ, সন্তোষী মা কিংবা বক্রতত্ত্ব শনিপূজা এতে কি হিন্দু দেবদেবীর মাহাত্ম্য ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে না?

: শাস্ত্রবিধি অনুসারে পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠান জাতীয় জীবনে কোনো অবক্ষয় সূচিত করে না।

তারকেশ্বর পুরাণ প্রসিদ্ধ, কিন্তু সন্তোষী মায়ের আমি কোনো পুরাণে শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাইনি।

ঃ আপনি কি আজও বিশ্বাস করেন বেদ অপৌরুষেয়। একসময় এই তত্ত্বটির সত্যানুসন্ধানে তত্ত্ববোধিনীর পক্ষ থেকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এ যুগে আপনারা কি করেছেন ?

ঃ হ্যাঁ। আমরা আমাদের বেদান্তাদি-শাস্ত্র-চর্চার দ্বারা এই স্থির সিদ্ধান্তে এসেছি যে বেদ কোনো মনুষ্যরচিত নয়।

ঃ তথাকথিত ধর্মব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আপনাদের মতো শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা কেন কোনো প্রতিবাদের সোচ্চার কণ্ঠ তোলেননি ? বিদ্যাসাগরের পর আর কোনো বাঙালী পণ্ডিত কি সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার, ধর্মের নামে পাপাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন ?'

ঃ ধর্ম ব্যবসায়ী বলতে যারা মনে মুখে ও কাজে বিভিন্ন সেই সব ধর্ম ব্যবসায়ীর প্রতি আমাদের কোনো দিনই সহানুভূতি ছিল না এবং এখনও নেই। মনুতে বিশেষভাবে এই সব ব্যক্তির নিন্দাই করা হয়েছে। সংস্কার এবং কুসংস্কার বুঝতে হলে শাস্ত্রানুগত ধর্ম পালনই আমরা সুসংস্কার বলে মনে করি। আধুনিক কতিপয় ব্যক্তি যারা মনে করেন পানাহারের বিচার অর্থ অপরকে ঘৃণা করা তা কখনই নয়। পুত্র সংক্রামক রোগাক্রান্ত হলে তাকেও পৃথক রাখতে হয়। সেইরকম অধ্যাত্ম চেতনায় পানাহার বিচার অবশ্য কর্তব্য। উপনিষদে একথার যুক্তিবচন আছে এবং চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে ঃ বিষয়ীর অন্ন খেলে মন দুষ্ট হয়। কারও প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা হয় না। এ আমার আত্মরক্ষা মাত্র।

ঃ আজ বাঙালী জীবনে ও মননে যে সার্বিক অবক্ষয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে সে সম্পর্কে আপনি কী ভাবছেন ?

ঃ আমি এ বিষয় চিন্তা করলেও এ ব্যাপারে প্রতিকারের অক্ষমতায় দুঃখবোধ করি।

শুধু সংস্কৃতে নয়, ইংরাজিতেও গ্রন্থ রচনা করেছেন শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ Evolution of Modern Logic এবং Antiquity of Nayasutra। লিখেছেন প্রা: ৩২টি সংস্কৃত নাটক। এছাড়া পাণ্ডববিক্রমম্ (সংস্কৃত মহাকাব্য) প্রায় ২৫০০ শ্লোক সম্বলিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৫ খৃঃ চিত্রকাব্য খণ্ডকাব্য 'সারস্বতশতকম'। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কুমারী গুলসন শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ রচিত সংস্কৃত নাটকের উপর গবেষণা করে পি এইচ ডি উপাধি লাভ করেছেন।

সময়ের সঙ্গে সমান পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে চাননি উল্লম্ফনবৃত্তি অবলম্বন করে। জেনারেশন গ্যাপের জন্যও ব্যথিত নন। প্রসন্ন আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বললেন ঈশ্বর করুণার অপার মহিমা। ব্যারাকপুরে শ্রাদ্ধ বাড়ি গিয়েছিলেন, লেবেল ক্রসিং-এর কাছে হঠাৎ একজন পিছন থেকে সজোরে জড়িয়ে ধরল, মনে হলো দুর্বৃত্ত; নাহ্, মুহূর্তে তীব্রবেগে ছুটে গেল একটা ডাউন ট্রেন ঃ নিমেষে তাকিয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই। পরম কারুণিক পথচারীর বেশে এসে রক্ষা করে কোথায় উধাও হলো ? এ জিজ্ঞাসায় জ্ঞানপ্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণের চোখ সজল ছল ছল। কণ্ঠ যেন দূরাগত কোন প্রাচীন মন্দিরের সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনির মতো এ নাস্তির যুগেও ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় বিশ্বাস···বিশ্বাস···বিশ্বাস আস্তিক্যবোধের এক অমোঘকবচকুণ্ডল।

পুরো নাম ঃ
শ্রীজীব ভট্টাচার্য।

জন্ম ঃ
১২৯৯ সন, ১১ মাঘ সোমবার (ইং ১৯০২ জানুয়ারি ২৬)

জন্মস্থান ঃ
ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।

স্ত্রীর নাম ঃ
শ্রীমতী সুনীতি দেবী।

প্রধান জীবিকা ঃ
ভাটপাড়া সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা।

লেখার ব্যাপারে সংস্কার ঃ
কোনো সংস্কার নেই। এখনও সংস্কৃত গদ্যপদ্য লিখি।

অবসর বিনোদন ঃ
লেখাটাই আমার অবসর বিনোদন।

নেশা ঃ
কোনো নেশা নেই। জীবনে চা খাইনি, নস্যি ও ধূমপানেও কোনো আসক্তি নেই।

শাস্ত্রচর্চার অনুপ্রেরণা ঃ
পিতৃদেব এবং শ্রীশ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ।

আহার ঃ
ছ'বছর বয়সে মাছ খাওয়া ছেড়েছি। মাংস, ডিম কখনও স্পর্শ করিনি। নিরামিষ ডাল, তরকারি আতপ চালের ভাত ⁰নারায়ণকে নিবেদন করে তাঁর প্রসাদ গ্রহণ করি।

সবচেয়ে আনন্দদায়ক স্মৃতি ঃ
পিতৃদেবের ১৯২৮ সালে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ।

সবচেয়ে বিষাদজনক ঘটনা ঃ
সংস্কৃত ভাষাকে নবম শ্রেণী থেকে নির্বাসিত করা।

প্রিয় বাঙালী লেখক ঃ
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্মরণীয় অভিজ্ঞতা ঃ
কাশীধামে প্রথমে হিন্দি ভাষায় বক্তৃতাদানে বিভ্রান্তি পরবর্তীকালে কাশীধামে প্রশংসা লাভ।

প্রিয় সখ ঃ
সংস্কৃত, বাংলা হিন্দি ও ইংরাজিতে কবিতা লেখা। আগে ছবি আঁকা ও গান গাওয়ার সখ ছিল।

ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ঃ
শ্রীশ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ মহারাজ। সত্যেন্দ্রনাথ সেন। ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী। আমার ছাত্ররাও আমার সুহৃদ।

সাক্ষাৎকার ঃ সুব্রত রাহা

আলোকচিত্র : শোভন রায় বর্ধন

বাংলাদেশের সাহিত্য

জলবেশ্যা

আল মাহমুদ

ওপার বাংলার বিশিষ্ট কবি আল মাহমুদ। পেশা সাংবাদিকতা। 'বাংলাদেশ' মুক্তিযুদ্ধের আগে ছিলেন 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকার সংবাদিক। বর্তমানে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর 'শিল্পকলা' পত্রিকার সম্পাদক। আল মাহমুদের কবিতায় নারী, নিসর্গ ও সর্বলিপ্ত জীবনবোধ বাংলা কবিতায় এক বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে। তাঁর 'সোনালি কাবিন', 'কালের কলস', 'লোক-লোকান্তর' কাব্যগ্রন্থগুলি প্রাণ-কবোষ্ণ, উচ্চারণে আত্মগত ও নিবিড়তম সুষমামণ্ডিত। কবিতায় লৌকিক ও দেশজ উপমা ও শব্দ ব্যবহারে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন।

আল মাহমুদ যখন গল্প লিখেছেন তখন তাঁর কাব্যবোধের অন্তরালে তীব্র জীবন-এষণা সক্রিয়। কবির লেখার গল্প কোথাও কাব্যিক আবেগ-আবিলতায় আক্রান্ত নয়। দৃঢ়, জৈবিক, মৃত্তিকাগন্ধী জীবনের মর্মমূলে প্রোথিত তাঁর জীবনবোধ। বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বগোত্রীয় লেখক হিসাবে সনাক্ত হবার মত পরিচয়বাহী আল মাহমুদের গল্প 'জলবেশ্যা'।

পেঁয়াজ আর রসুনের মরশুমে লালপুর হাটের চারপাশের গ্রামগুলোতেও পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। হাটের দু'মাইল দূর থেকেও বাতাসে কাঁচা পেঁয়াজের ঝাঁঝালো গন্ধটা বেপারীদের নাকে এসে লাগে। গন্ধটা তখন আর শুধু পেঁয়াজের গন্ধ থাকে না। রসুনেরও একটা অহংকারী গন্ধ আছে যা বাতাসে পেঁয়াজের গন্ধের সাথে মিশে বাতাসকে স্বাদযুক্ত করে তোলে।

এ ধরনের কাঁচা মসলার মরশুমে শুধু যে বাজার আর বাতাসেই গন্ধটা ছড়িয়ে পড়ে তা নয়। হাটের চারপাশের এলাকার মানুষের শরীরেও এ গন্ধটা থাকে। কথা বললে তাদের মুখ থেকেও পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ বেরোয়। তাদের ঘামে, বগলের নিচের চুলে গন্ধটা এমন তীব্র হয়ে ওঠে যে কোনো লোক, যে পেঁয়াজ-রসুনের ব্যবসা করে না, তার পক্ষে এ পরিবেশে তিষ্টানো দায়।

হাটের মধ্যে, মানুষের পায়ে চলা পথের পাশে পেঁয়াজের খোসার আস্তরণ জমে এমন উঁচু হয়ে থাকে যে কাঁচা মসলার মরশুম শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার হাটের পশারিরা পেঁয়াজ-রসুনের স্তূপীকৃত খোসার উপরই তাদের বেসাত বসায়। এর উপরই কেনাবেচা চলে। যারা চার-পাঁচ মাইল দূর থেকে হাটে তাদের বেসাত নিয়ে আসে, তাদের অনেকেই বেচাকেনা শেষ করে রাতে ঘরে ফিরতে পারে না। একে তো তারা হাট করে এমনিতেই ক্লান্ত থাকে, তার উপর রাতের বেলায় মেঘনা পাড়ের পূর্বাঞ্চলটা কোনো বেপারীর জন্যই তেমন নিরাপদও নয়। চুরি-ডাকাতি লেগেই আছে। দিনের বেলাতেই বেপারীরা চোর-বাটপাড়ের ভয়ে দল বেঁধে হাটে মাল নিয়ে আসে। চার-পাঁচজন বেপারীর এক একটি ছোটো ছোটো দল হাটবারের সকাল থেকে মাধান অবধি মাথায় পশার নিয়ে হাটে আসতে থাকে। রাত বারোটা পর্যন্ত তাদের দাম-দস্তুর, মাল গছানো, ফাও মারা চলতে থাকে। রাত দুটোর দিকে হাট যখন স্তিমিত হয়ে আসে, হাটের নিকটবর্তী গ্রামের লোকেরা কেনাকাটা শেষ করে গাঁয়ে ফিরে যায়, বেপারীরা তখন

তাদের বড় বড় কুপির আলোয় পয়সা গোনা শুরু করে। আর এই হিসেবের কাজটা তারা যথাসম্ভব তাড়াতাড়িই শেষ করে ফেলে। তখন তাদের চেহারায়, হাতের নড়াচড়ায় এমন একটা সতর্কতার পরিচয় ফোটে দেখলে মনে হবে, কোনো অদৃশ্য তস্কর এখুনি তাদের পুঁজি কেড়ে নেবে। খুতির মুখটা ভালো করে বেঁধে কোমরে না পেঁচানো পর্যন্ত তাদের মন থেকে অস্বস্তিটা দূর হয় না। প্রত্যেক বেপারীর বাঁ কাঁধে সাবানে কাচা একটা করে আধ ময়লা শার্ট থাকে। সাধারণত মাল নিয়ে হাটে আসার সময় কিংবা বেচা-বিক্রির ঝামেলায় তারা জামাটা পরে না। পরে তখনই, মাল কাবারের পর খুতিটা কোমরে বাঁধা হয়ে গেলে হাটের হোটেলে ভাত খাওয়ার খুচরা দু-তিনটে ভাঙা টাকা রাখার যখন আর জায়গা থাকে না। তখন তারা তাদের কাঁধের ঘামে ভেজা কুঁচকানো শার্ট কিংবা পিরহানগুলো গায়ে দিয়ে পকেটে ভাতের টাকাটা রাখে। তারপর বিড়ি ধরাতে ধরাতে আজিজ মিয়ার ভাতের দোকানের দিকে হাঁটতে থাকে। রাত বারোটার পরই আজিজ মিয়ার চুলা থেকে মেঘনার তাজা বোয়াল কিংবা গজার মাছের ঝাল সরুয়ার প্রকাণ্ড ডেগটা নামে। কাঁচা মসলার বেপারীদের মনমত খাবার পরিবেশনের ব্যাপারে আজিজ মিয়ার বেশ নামডাক আছে। আগুনের মতো ঝাল ঝোল দিয়ে বেপারীরা যখন লাল করে ভাত মাখিয়ে নিয়ে নলা তুলতে থাকে আজিজ মিয়া তখন আদবের সাথে তার বসার গদীটা ছেড়ে নেমে এসে খদ্দেরদের খাবার টেবিলের কাছে দাঁড়ায়। জগ থেকে কারো গেলাসে পানি ঢেলে দিতে দিতে ছোকরা চাকরটাকে বলে, 'কান্দু বেপারীর আরও দুইডা কাঁচা মরিচ দে।' কিংবা পাশের ভোজনরত বেপারীর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলে, 'খালেক ভাইয়ের পাতে একটু সওরা দে রইস্যা।' দোকানের ছোকরাটা মহাজনের কথা শেষ হবার আগেই গজার মাছের 'ভাঙাচুরার' কড়াই থেকে একহাতা তপ্ত ঝোল খালেক বেপারীর পাতে ঢেলে দেয়। খালেক বেপারী 'বহু বহু' করতে করতে টিপা নুনের মুছি থেকে নুন নিয়ে ভাতের উপর ছিটাতে ছিটাতে পরিতৃপ্তির হাসিতে ঘর্মাক্ত মুখটা ভরিয়ে তোলে। খাওয়া হয়ে গেলে বেপারীরা পেঁয়াজ-রসুনের খোসার আস্তর পড়ে থাকা হাটের আনাচে-কানাচে তাদের ছালা গামছা বিছিয়ে রাতটা কোনো রকমে কাটিয়ে দেবার জন্য গোল হয়ে বসে আড্ডা জুড়ে দেয়। কেউ তাস খেলে। কেউ আবার দলের কাছে খুতিটা নিরাপদে রেখে পেঁয়াজের বাকলের বিছানায় নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়।

এ হলো যারা হাঁটা পথে দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে হাটে কাঁচা মসলা নিয়ে আসে তাদের অবস্থা। কিন্তু যারা নদীপথে নৌকো নিয়ে মাল কিনতে আসে তাদের কাজকারবার আবার আলাদা। প্রতি হাটবারে তাদের অসংখ্য পাল তোলা নৌকা ভাটিয়ালী গাইতে গাইতে তর তর করে বাজারের বিস্তৃত ঘাট অঞ্চলকে ঘিরে ফেলে। নৌকার মাঝিরা ঘাটে ভিড়বার আগেই পালের দড়ি খসিয়ে নৌকার গতিবেগ স্তিমিত করে দিয়ে গলুইয়ের মাথাগুলো এমন সতর্কতার সাথে নৌকার সারির ফাঁকফোকে ঢুকে যায়, দেখলে মেঘনার মাঝিদের হাল

ধরার প্রশংসা না করে পারা যায় না। ঠোকা-ঠুকির কোনো ব্যাপার নেই। মাঝিরা একজন আরেকজনের নাওকে জায়গা করে দিচ্ছে। যেন মাঝিদের মধ্যে এমন একটা অলিখিত নিয়ম আছে যাতে প্রতিটি নৌকা ঘাটের ঘেরের মধ্যে নিজের উদ্যত মাস্তুল নিয়ে অনায়াসে ঢুকে পড়তে পারে। বাজারের ঘাটটাকে ঘিরে নৌকার সার যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, দূর থেকে দেখতে বেশ লাগে। মনে হয়, প্রাচীন যুগের কোনো পোতাশ্রয়। প্রতিটি মাস্তুল আকাশের দিকে তর্জনী উঁচিয়ে আছে। বাতাসে দড়িদড়া নড়ছে। মেঘনার ঢেউয়ের বাড়িতে প্রতিটি নৌকা একটু একটু কাঁপছে। আর আহত জলের শব্দ চারিদিকে একটা একটানা মাতমের রোল তুলছে।

এসব নৌকা আশেপাশের বড় বড় বাজার ছাড়াও ঢাকা-চট্টগ্রাম-সিলেট থেকে আসে। পেঁয়াজ, রসুন, মুগ-মশুর আর মিষ্টিজলের শু'টকির জন্যে এ হাট প্রসিদ্ধ। ভৈরব, আশুগঞ্জ, আজমিরিগঞ্জ, নবীনগঞ্জের পরই

লালপুর হাটের কথা লোকে বলে। যদিও হাটবারের লোকসমাগমের দিক দিয়ে ভৈরব-আশুগঞ্জের কাছে এ হাট কিছুই না। তবু প্রতি হাটবারে চার-পাঁচশ' বড় বড় নাও এ হাটেই মাল কিনতে ভিড় জমায়। দেশের পয়সাওলা মুদি, মরিচ-মসলার দালাল, শুটকির কারবারী, তাঁতে বোনা মোটা নীলাম্বরী শাড়ি আর লুঙ্গি ব্যবসায়ীদের বেহেশ্‌ত হলো লালপুর হাট। এ হাটের পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ, সিদল শুটকির খুশবাই নাকে লাগলেই হাটবারের উটকো দালালদের জিভে পানি ওঠে। তারা নাও বাইতে বাইতে বৈঠা কাঁপিয়ে বাতায় ঠুকে রসালো গান ধরে।

আর আসে বেদেরা। তাদের ঝাঁকবাঁধা নৌকাগুলো মেঘনার বুকে ভাসমান ছোটো গ্রামের মত দেখায়। তারা সহজে ঘাটে ভিড়ে না। যে পাড়ে হাট, তার ঠিক উল্টো দিকে, অপর পাড়ে তীরের মাটি থেকে তিরিশ-চল্লিশ গজ নদীর ভিতরে তারা তাদের বহর আটকায়। নদীর পাড়েও নয়, আবার নদীর মধ্যেও নয় এমন একটা জায়গায় তারা অবস্থান নেয়। তারপর ছোট কোষা নৌকায়

এরা হাটের ঘাটে এসে লাগে। বেদে যুবারা হাটে কাচের বাংড়ি, আয়না, গন্ধের সাবান, সাপের তাবিজ, দাঁতের মাজন আর ছুরি-চাকু বিক্রি করে। মেয়েরা যায় গ্রামে। তাদের হলো সাপ নাচানো, সিঙ্গা লাগানো আর দাঁতের পোক খোলার ব্যবসা। হাটের দিন সকালে তারা আসে আর পরের দিন সূর্য ওঠার আগেই বহর ভাসিয়ে অন্য হাটের দিকে চলে যায়। আগের দিন সন্ধ্যায় যেখানে একটা গ্রামের মতো দেখা যেত, দেখা যেত নদীর কোল ঘেঁষে জ্বলে উঠেছে অসংখ্য আলোর ফুটকি, রান্নার আগুন আর ধোঁয়া, কিংবা শোনা যেত শিশুর কান্না আর বেহুলার রূপ বর্ণনা করে পুরুষের গলা ছেড়ে দেওয়া গান, পরের দিন সেখানে উন্মুক্ত জলের বিস্তারে ঢেউয়ের মাতামাতি ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

লালপুর হাটের তরুণ দালালদের নেতা হলো আবিদ বেপারী। সব হাটেই যেমন নিজের পুঁজি ছাড়া ব্যবসা জমানোর একদল লোক থাকে, লালপুর হাটেও পাটের মরশুম থেকে শুরু করে পেঁয়াজের মরশুম পর্যন্ত আবিদ বেপারীর ইয়ারেরা হাঁকডাক করে বেড়ায়। বাইরের বেপারীদের মাল খরিদ করতে হলে দালালের সাহায্য না হলে চলে না। দরদস্তুর ও মাল ধরার কাজটা দালালেরা আগেই করে রাখে। এজন্য অবশ্য মহাজনরা আগেই দালালদের পয়সা দেয়। দালালেরা যাতে বাজারে আসামাত্রই চাষীদের ঝুড়ি আর ছালা ভর্তি পেঁয়াজ-রসুনটা হাতাতে পারে সেজন্য অগ্রিম শ'খানেক টাকা প্রত্যেক মহাজনই দালালদের দিয়ে রাখে। মাল কেনা হয়ে গেলে মহাজনরা কুলি দিয়ে নৌকায় মাল উঠিয়ে নেয়। প্রথম এরা খুতি খুলে কুলি বিদেয় করে। পরে সন্ধেটা পার হয়ে গেলে, যখন নদীর ঘাটটা একটু অন্ধকার হয়ে আসে তখন একে একে দালালরা মহাজনের নৌকায় উঠতে থাকে। পান বিড়ি খেতে খেতে দালালির পয়সার হিসেব চলে। দালালরা তাদের পয়সাটা কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিয়ে তারপর নাও থেকে নামে। যেদিন মহাজনদের মনমত দামে দালালরা মাল ধরতে পারে সেদিন তাদের খুব আদর হয়। মহাজনরা নৌকায় বসিয়ে দালালদের খাওয়ায়। সাধারণত মহাজনরা খাবারটা নিজেদের মাঝিদের দিয়ে নৌকার মধ্যে 'নাইয়া' চুলায় রাঁধে। হাটের দিন তারা মুরগী খায়। খাওয়ার ব্যাপারে এসব মহাজনদের বেশ একটু দিলদরিয়া ভাব আছে। যেসব মুদি-মহাজনদের বয়স কম, তারা আবার হাটে আসবার সময় পাটাতনের নিচে 'বঙ্গেশ্বরী'র বোতল নিয়ে আসে। কিংবা গাঁজার পুরিয়া। দিশি মদকেই মাঝি-মহাজনরা 'বঙ্গেশ্বরী' বলে সম্মান জানায়। রাত আটটার পর মহাজনদের নৌকার কাছে গেলে পেঁয়াজ-রসুন আর শুটকির গন্ধ ছাড়াও মাংসের স্বাদু গন্ধের সাথে মদ আর গাঁজার কড়া গন্ধ মিশ্রিত হয়ে একটা অদ্ভুত রাসায়নি সৌরভ চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। বাইরে থেকে আসা বড় নৌকার মহাজনরা আজিজ মিয়ার ভাতের দোকানে যায় না। যারা যায়, তারা হাড়কিপটে।

আজকের হাটে বেচা-বিক্রি বেশি না হলেও আবিদ বেপারী তার দালালির পয়সা নিয়ে সকলের শেষে বেশ একটু রাত করে মহাজনের নাও থেকে নামল। প্রায় একশ' মণ পেঁয়াজ আজ দুজন মহাজনকে আবিদ বেপারী ধরিয়ে দিয়েছে। আড়াই শো টাকা আজ আবিদ বেপারীর খুতিতে বাঁধা। এ হলো তার এক হাটের রোজগার। এখন এক সপ্তা স্রেফ আজিজের হোটেলে ঝাল ঝোল দিয়ে ভাত খাওয়া আর হাটের গলিতে পেঁয়াজ-রসুনের বাকলের ওপর সঙ্গী-সাথীদের সাথে তাস পেটানো ছাড়া আবিদ বেপারীর কোনো কাজকাম রইল না।

ঘাটপাড়ের ক্যাচক্যাচে কাদামাটি এড়িয়ে আবিদ বেপারী বাজারের এক প্রান্তে শুটকি-হাটার উঁচু জায়গাটায় এসে দাঁড়াল। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল নদীর দিকে। হাটের এ দিকটায় নদীর প্রস্থ প্রায় মাইল চারেক হবে। নদী মোটামুটি শান্ত। ছোট ছোট ঢেউ থাকলেও মেঘনাকে এ সময়টায় প্রশান্তই বলা যায়। ওপাড়ে গ্রামগুলোকে একটা ক্ষীণ কালো রেখার মতো দেখা যাচ্ছে। রেখার মধ্যে দু-একটা আলোর ফোঁটা, দুধের ফোঁটার মতো স্পষ্ট হয়ে আছে। বেদেদের ঝাঁকবাঁধা নাওগুলোর আলো নদীর ছোট ছোট ঢেউয়ে প্রতিবিম্ব তুলে একটা অখণ্ড আলোর মালার মতো ভাসমান মনে হচ্ছে। কিংবা মনে হচ্ছে, নদীর ভিতরে নুয়েপড়া কয়েকটা হিজল গাছকে যেন একঝাঁক অতিকায় জোনাকি ঘিরে ধরেছে।

আবিদ বেপারী বেদের বহরটার দিকে চোখ রেখে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। বহরটার প্রতিটি নৌকার ছৈয়ের ভিতরে, বেড়ার ফাঁক দিয়ে অথবা ছৈয়ের বাইরে আলো দেখা যাচ্ছে। বেদে-বেদেনীরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে তাদের রান্নাবান্নার কাজ সেরে খেতে বসেছে। কারণ একটু আগেও নৌকাগুলোকে ঘিরে যে ধোঁয়ার আস্তরণটা ছিল এখন আর তা নেই। রাতও অনেক হয়েছে। সময় সাড়ে দশটার কম হবে না।

আবিদ বেপারী একটা সিগ্রেট ধরালো। চোখ তার এখনও বেদে বহরটার দিকে স্থির হয়ে আছে। সিগ্রেটটা টান দেয়া মাত্রই একটা ঢেকুর উঠলো বেপারীর গলা দিয়ে। দিশি মদ, ঝাল মুরগীর মাংস আর পানের রসের মিশ্রিত ঝাঁঝালো মোদো গন্ধ। টক, বিস্বাদ ছড়িয়ে পড়ল ময়লা জিভের উপর-অন্ধকারে মুখটা বিকৃত করে বেপারী চোখ নামিয়ে আনল তার আঙুলের ফাঁকে ধরা সিগ্রেটটার উপর। কড়া মিনার সিগ্রেটের ধোঁয়া পেটে গিয়েই এই অশুভ, দুর্গন্ধযুক্ত চুকা ঢেকুরটা ডেকে এনেছে। একবার ভাবল সিগ্রেটটা ছুঁড়ে ফেলবে। আবার কি মনে করে সিগ্রেটটা ঠোঁটের ওপর এনে জোরে জোরে কয়েকটা টান দিল। অনেকটা সুখ টানের মতো করে। তারপর এক বুক ধোঁয়া উগরে দিয়ে আবার নদীর দিকে চোখ ফেরাল।

হাঁ, বহরটা থেকে বেশ দূরে, একটু দক্ষিণে নৌকা বাঁধা। ঢেউয়ের উপর দাঁড়িয়ে থেকে দুলছে। নৌকার ভিতরে কোনো বাতি দেখা যাচ্ছে না। আবিদ বেপারীর মুখটা পুলকে প্রসন্ন হয়ে উঠল। নৌকাটিকে দেখা যাচ্ছে ভাসমান একটা কালো চোখের মতো। আবিদ বেপারী জানে বহরের অন্যান্য নাওয়ের বাতি যখন নিভে যাবে তখন অন্ধকারে কালো চোখের মতো এই নৌকার বাতি জ্বলে উঠবে। প্রথমে ছৈয়ের ভিতরে একবিন্দু আলো। তারপর আলোটা গলুইয়ের কাছে এগিয়ে একটু স্থির হয়ে থাকবে। তারপর মানুষের মাথা সমান উঁচুতে উঠে বাতিটা তার প্রতিকী-বার্তা ব্যক্ত করে ডানে-বাঁয়ে দুলতে থাকবে। তখন মনে হবে অমাবস্যায় আচ্ছন্ন পৃথিবীর এক অংশে ভাগ্যক্রমে একটা আদিম অগ্নিকণা জলে-স্থলে পুরুষদের ডাকছে।

আবিদ বেপারী হাটের দিকে আর গেল না। বরং হাটের ডান হাতের রাস্তায় নদীর পাড় ধরে হাঁটতে লাগল। পথটা অন্ধকার। তবে জলের সম্ভবত নিজস্ব একটা ক্ষীণ দ্যুতি আছে যাতে নদীর শরীরটা অন্তত বুঝে ওঠা যায়। আর এই উপলব্ধি থাকলে পানির পাশে কোথায় অন্ধকার মাটির উপর দিয়ে পায়ে চলার পথটি আছে তাও রাতের পথিকরা ঠাহর করে ফেলে। বেপারী যেহেতু আশৈশব এপথে চলাফেরা করেই বেড়ে উঠেছে, সেজন্যে পথ চলতে গিয়ে তাকে মাটির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে না। আসলে তার চোখটা এখনও সেই নদীর উপর ভাসমান অতিকায় কালো চোখের স্থির দারুদৃষ্টির দিকেই নিবদ্ধ।

বেপারী নদীর পাড় ধরে প্রায় মাইল খানেক পথ পার হয়ে একটি গ্রামের ঘাটের কাছে এসে দাঁড়াল। জেলেদের গ্রাম। জেলে বৌরা দিনমান এই ঘাটে জটলা বেঁধে জলের কাজ করে। এখন এই ঘাটটাকে বড়ো নিঃস্তব্ধ আর শীতল মনে হলো। ঢেউ এসে কাপড় কাচার কালো পাথরটার উপর ছল ছল করছে। কেমন এক ধরনের শীতলতা আবিদ বেপারীর শরীর স্পর্শ করল। বেপারী ঘাটের পৈঠায় দাঁড়িয়ে বেদে বহরের পাশে নিঃসঙ্গ নৌকাটির দিকে তাকাল। কাত হয়ে পড়া একটি বিশাল মাথনার মতো আয়তলোচন এখনও বেপারীকে দেখছে। চোখে চোখে তাকাতে না পারা বয়োসন্ধির কিশোরের মত আবিদ বেপারী তার দৃষ্টি

ফিরিয়ে আনল। ঘাটের কাছেই জেলেদের জাল রং করার শূন্য গামলাগুলো পড়ে আছে। এখন গাব ফল পোক্ত হওয়ার ঋতু। তাই ঘাটের পিছনে বহুদূর পর্যন্ত গাবের কষ সিদ্ধ করার বড়ো জালা আর গামলার ছড়াছড়ি। কাঁচা গাবের কষটে গন্ধ জেলেপাড়া থেকে নদীর ঘাট পর্যন্ত বাতাসকে কেমন বিবমিষায় ভরিয়ে রেখেছে। অন্য সময় এ পাড়ার পাশ দিয়ে গেলে মাছের আঁশটে গন্ধ নাকে এসে লাগতো। কিন্তু এখন গাবের কাঁচা রসের গন্ধে নাকে রুমাল দিয়ে ভদ্রলোকেরা ঘাট আর পাড়াটা পার হয়ে যায়।

আবিদ বেপারী দেখল ঘাটের একটু দূরে যেখানে বড়ো কাঁঠালি বট গাছটা আছে সেখানে একটা লম্বা জেলে নাও খাড়া লগির সাথে বাঁধা। নাওটা খাড়া লগির সাথেই বাঁধা কিনা তা যদিও আবছা অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না, তবুও এতদাঞ্চলের লোক বলে তার সহজাত অন্তর্দৃষ্টিতে বুঝল নৌকাটা নিশ্চয়ই চইরের সাথেই বাঁধা থাকবে। নাওটা দেখেই আবিদ বেপারী খুশী হয়ে গেল। আসলে বাজারের ঘাট থেকে অন্ধকার জেলে-পাড়া পর্যন্ত আসা যে শুধু একটা জেলে নৌকার জন্য তা যেন বেপারীর অবচেতনা তার নিঃশব্দ সচেতনতার কাছে ব্যক্ত করল। যেন বেপারী বুঝতে পেরেছে, নিরর্থক নয়, একটা নৌকার জন্যই তার এই মাইলটাক পথ পেরিয়ে আসা। খুশী হয়ে গেল বেপারী। ঘাট পার হয়ে কাঁঠালি বটের প্রসারিত জটিল শিকড়ের উপর গিয়ে আস্তে আস্তে বসল। তার এখন অনেকটা সময় অতিবাহিত করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না বেদেদের ভাসমান গ্রামটা তাদের সবগুলো বাতি নিভিয়ে জল হয়ে যায়।

নদীর বাতাসে কাঁঠালি বটের পাতাগুলো মাথার উপর সড় সড় শব্দ তুলছে। স্তব্ধতাকে বিশদ করার জন্যই যেন শব্দটা একটানা আবিদ বেপারীর কানের ভিতর দিয়ে মরমে পৌঁছে যাচ্ছে। গাছের সবচেয়ে বড়ো শাখাটায় সম্ভবত শকুনের বাসা আছে। কারণ একটা পাখির কান্নার মতো শব্দ অকস্মাৎ আবিদ বেপারীর কানে বেজেই থেমে গেল। বেপারী একবার মুখ তুলে গাছের বড়ো ডালটার দিকে তাকাল। পরিচ্ছন্ন আকাশের দিকে গাছের পত্র-পল্লবকে একটা মস্ত বড়ো কালো ছাতি ছাড়া আবিদের আর কিছুই মনে হলো না। আর ছাতিটাকে যেন কোনো অদৃশ্য হাত বেপারীর মাথাতেই ধরে থাকবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্রকৃতির এই অনুকম্পায় আবিদ বেপারী কিছুটা অভিভূতের মত পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট খুলে একটা সিগ্রেট ধরালো।

এবার সিগ্রেটটা আর তত খারাপ লাগছে না। বিস্বাদ অবস্থাটা কেটে গিয়ে তামাকের স্বাদটা পাওয়া যাচ্ছে। বেপারী আস্তে, মৃদু টানে টানে সিগ্রেটটা শেষ করতে লাগল।

এই বট গাছটার আঁকাবাঁকা শিকড়ের সাথে বেপারীর কৈশোরের কয়েক বছরের আনন্দময় স্মৃতিও জড়িয়ে ছিল। বারো তেরো বছরের এক বালক তার এক বখাটে সঙ্গির সাথে স্কুলের নাম করে এখানে সময় কাটিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে মাকে বলত, 'পড়া কইরা আইছি।' আর আনন্দে বিগলিত এক চাষী বৌ তার ছেলেকে যত্ন করে ভাত খাইয়ে দুধের বাড়তি সরের পেয়ালাটা ছেলের মুখের কাছে তুলে ধরত। হঠাৎ মায়ের কথা মনে পড়ায় আবিদের মনটা ভিজে গেল। যে বড়ো শিকড়টার নিচে বইপত্র লুকিয়ে রেখে আবিদ তার সঙ্গির পিছনে পিছনে জেলে-পাড়ায় গিয়ে মার্বেল খেলত, গাছের সেই বড়ো শিকড়টার উপরই এখন সে বসে আছে। আর গাছের মাত্র তিরিশ গজ দূরেই তার মায়ের কবর। কৈশোরের সুখের দিনগুলো শেষ হবার আগেই মা তার উলাওঠায় মরে যায়। মার কথা মনে পড়ায় বেপারী শিকড়ের আসন ছেড়ে নেমে এল। তারপর চলল কবরস্থানটার দিকে।

কবরস্থানের উঁচু জায়গাটায় উঠে দাঁড়াতেই, একটা ঠাণ্ডা ভয়ের বাতাস এসে আবিদের শরীর ও মনকে কাঁপিয়ে দিল। মদের নেশা নেশা ভাবটা কেমন যেন কেটে যাচ্ছে। আর নেশার শূন্যস্থান পূরণ করার জন্যই যেন কবরের গর্তগুলোতে বহতা বাতাস বাড়ি খেয়ে আবিদের শরীরের উপর আছড়ে পড়তে লাগল। ভয়ে শিউরে উঠল আবিদ বেপারী, আগের সেই বারো-তেরো বছরের বালকের মতো। একবার তার মায়ের কবরটা জিয়ারত করার কথা মনে উঠল। কিন্তু কবর ও নৈশব্দ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার যে আতঙ্ক আছে তা সম্ভবত কোনো বয়স মানে না। পঁয়ত্রিশ বছরের যুবক আবিদ বেপারী স্কুল পালানো বারো বছরের বালকের মতো হঠাৎ এক দৌড়ে কবরস্থানটা ছেড়ে আবার বট গাছটার কাছে ফিরে এলো। যদিও নদীর পাড়ের এই নিঃসঙ্গ গাছটার নিচে ভয় থেকে পালানোর কোনো কারণ অথবা সত্যিকারের নিরাপত্তা নেই তবুও আবিদের মনে হলো, এখানে কোনো ভয় নেই। এক আবিদ বেপারী ছাড়া জায়গাটা আগের মতোই জন-মানবশূন্য। শুধু শকুনের বাচ্চাটা বোধ হয় আরও একবার মানুষের শিশুর কান্নার মতো শব্দ করে কেঁদে উঠল।

আবিদ বেপারী বুঝতে পারল না কেন সে তার মায়ের কবর থেকে এভাবে দৌড়ে পালিয়ে এসেছে। সাধারণত বেপারী ভীতু লোক নয়। ভূত বা জিনটিনের ভয় সে করে না। এছাড়া এখন সে আর বারো বছরের ইস্কুল পালানো নিতান্ত বালকও নয়। তবু কেন এমন হলো? বেপারী নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করল। পরে অবশ্য সে আপন মনেই এ প্রশ্নের একটা জবাব খুঁজে বের করতে চাইল। তার মনে হলো, কবরটা হলো মরা মানুষের জায়গা। এরা আর পৃথিবীর কেউ না। আজ যেমন কবরের পাশে দাঁড়িয়ে সারারাত অপেক্ষা করলে এদের কথা শোনা বা দেখা যাবে না, তেমনি কাল প্রভাতেও কবর কবরই থাকবে। জ্যান্ত মানুষের কোনো কাজে এদের আর কিছু করার নেই। জীবন ত্যাগ করে যা পাওয়া যায় এই কবরের মৃতরা নিশ্চয়ই তা পেয়েছে। যারা প্রাণবন্ত তারা তা জানেনা। জীবনধারণ করে তা কোনদিন কেউ জানতে পারেনি। কবরের লোকেরা, এমনকি তার মা-ও জীবনের জানা শেষ করে জীবনের অতিরিক্ত যে মৃত্যু তার মধ্যে আত্মগোপন করে থাকায়, আবিদ বেপারী তাদের ভয় পেয়েছে। আর এখন যে গাছটার নিচে সে নিজেকে নিরাপদ বোধ করছে, হোক তা রাতের মধ্যভাগে জনমানব অথবা কলরব শূন্য কিন্তু তা জীবনের মধ্যেই রয়েছে। এই নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের মধ্যে যেমন তাদের অস্তিত্ব আছে আগামীকাল সকালেও তারা থাকবে। জীবন ও জগত ত্যাগ করে মৃত্যুর রহস্য তারা আবিদ বেপারীর মতো অনবহিত বলেই এদের মধ্যেই আবিদ বেপারীর নিরাপত্তা। এ ধরনের একটা রক্তহীন দার্শনিক চিন্তায় আবিদ বেপারীর মতো আধ-মাতাল হাটবারের দালালও আনন্দে আটখানা হয়ে গেল। মনে হলো তার ভীতিটা অনেকটা হালকা হয়ে গেছে। সে আবার মুখ ফিরিয়ে কবরস্থানের দিকে তাকিয়ে, জোরে চিৎকার করে বলল, 'মায়ো, বাজান আবার এক বেডিরে বিয়া কইরা আমারে খেদাইয়া দিছে। জমি জিরাত কিছু দেয় নাই। আমি বাজারে বেবসা করি, দালালী করি। ভালাই আছি। তুই হুনছ মায়ো, আমার কতা? হুনছ?'

অন্ধকার কোনো জবাব দিল না। কোনো প্রকার জবাবের আশায় নয় বরং কিভাবে তার কাঁপা কাঁপা সম্বোধনগুলো অন্ধকারের আবরণের মধ্যে মিশে যাচ্ছে তা উপলব্ধি করার জন্যই আবিদ বেপারী কতক্ষণ তাকিয়ে রইল।

বেদেবহরের বাতিগুলো কখন নিভে গিয়ে পুরো বহরটা একটা কালো দাগের মতো হয়ে গেছে তা আবিদ বেপারীর খেয়াল ছিল না। যখন নদীর উপর চোখ পড়ল, দেখল সব কিছু কেমন ঠাণ্ডা জল হয়ে আছে। আর সেই নৌকাটা যা এতক্ষণ আবিদ বেপারীকে চোখে চোখে রাখছিল, তাও কেমন যেন ঢেউয়ের উপর ঠাণ্ডা চুপ মেরে ভাসছে। তবে কি কোনো অসতর্ক মুহূর্তে কালো কাঠের চন্দ্রবিন্দুর মধ্যে কোনো আলোর কণা জ্বলে উঠে অন্ধকার দিকবিদিকে তার প্রতীকী আহ্বান জানিয়ে এখন চুপ মেরে গেছে? মহা ভাবনায় পড়লো আবিদ বেপারী। তার মনে হলো নৌকার বাতি তাকে আকুল হয়ে ডেকেছিল। কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে এখন নিভে গেছে। কিংবা হাটের কোনো

তরুণ দালাল বাত্তিটার ডাক শুনে নিশ্চয়ই আবিদ বেপারীর আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে।

দারুণ অশান্তির মধ্যে আবিদ বেপারী আরও কতক্ষণ বসে রইল। আর কালো চোখের মতো নৌকাটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, 'আমি যামুই। কেউ গিয়া থাকলেও যামু। মাইরা ভাগাইয়া দিয়া ভিতরে হামামু।' এবার তার চোখ গেল ঘাটের অদূরে বাঁধা জেলে নৌকাটার দিকে। এ নৌকাটাকেও বেপারীর কাছে একটা তির্যক দৃষ্টি কালো চোখের মতোই মনে হলো। যেন নদীর বিশাল দুটি আয়তলোচন কেউ জলের ললাটের দু'পাশে জোর করে সরিয়ে দিয়েছে। ফলে নদীর ওপাড় থেকে একটা চোখ যেমন এক দৃষ্টিতে আবিদ বেপারীকে দেখছে, তেমনি এপাড়েও অপর চোখটা টেরচা চাওনিতে তাকে অবলোকন করছে বলেই বেপারীর মনে হলো।

বেপারী গাছের শিকড়টা ছেড়ে নিচে নেমে এল। একবার তাকাল বেদে বহরটার দিকে। বেদেরা ঘুমিয়ে পড়েছে। হাঁটতে হাঁটতে নৌকাটার কাছে এসে লগির বাঁধন খুলতে খুলতে একবার আকাশের দিকে, আবার নদীর দিকে দেখল। আকাশের প্রভাবে পানির উপর অস্পষ্ট দ্যুতি প্রতিফলিত হচ্ছে। নিশ্চয়ই একটু পরই চাঁদ উঠবে। যদিও অস্পষ্ট আকাশের ঈশানে এক টুকরো মেঘ জমে আছে, তবুও আবিদ বেপারী নির্ভয়ে নাও ভাসাল। অবশ্য এরই মধ্যে নদীর উপরে বাতাসের বেগটা একটু বৃদ্ধি পাওয়ায় ঢেউয়ের দাপানি বেড়ে গিয়ে নৌকাটাকে বেশ দোলাচ্ছে। বেপারী নৌকা ভাসিয়েই টলমল করতে লাগল। লগিটা সারাদিন জল খেয়ে পাথরের মতো ভারি। নৌকাটাকে ঠিকমত সামলাতে না সামলাতে তা একটু ডানদিকে বাঁক ঘুরে চলতে লাগল। বেপারী পাকা মাঝির মতো ঠোঁট কামড়ে প্রাণপণ শক্তিতে আবার এটাকে বাঁয়ে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে বেশ একটু হাঁপিয়ে পড়েছে। শুধু লগি ঠেলে এত বড়ো নদী পাড়ি দিয়ে উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছান সোজা ব্যাপার নয়। তবু বেপারী শুধু গায়ের জোরে নৌকাটাকে যথাসম্ভব সোজা রেখে যেতে লাগল। একবার লগি ঠেলে দিয়ে কোমর সোজা করে সামনের দিকে তাকাতেই দেখল বহুদূরে ভাসমান কালো চোখের উপর একটি আলোর বিন্দু বিরামহীন ভাবে ডানে বাঁয়ে দুলছে। সতেজ ঢেউয়ের উপর দোদুল্যমান আবিদ বেপারীর শরীরের প্রতিটি সন্ধি যেন এক আনন্দময় শিহরণে অকস্মাৎ কেঁপে উঠল।

'অই, ডাকতাছে।' মনে মনে বলল আবিদ বেপারী।

ততক্ষণ আবিদ বেপারীর নৌকাটা মাঝ নদীতে পৌঁছবার আর বেশি দেরী নেই। আবিদ বেপারীর কেবলই মনে হতে লাগল নদীর একটা অন্ধকার চোখ যেন আকস্মিক জলের ঝাপটায় দৃষ্টি ফিরে পেয়ে হারিয়ে যাওয়া অপর একটি চোখকে ডাকছে। আর এই মায়াবী আহ্বানে, মন্ত্রবলে বেপারীও ললাটভ্রষ্ট এক আয়তলোচনকে নদীর দুঃখিত মুখমণ্ডলের কাছে একটু একটু ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

আকাশের দিকে তাকাল বেপারী। আকাশব্যাপী তারার ঝালরের মধ্যে সাপের ডিমের মত শাদা চাঁদ দেখা দিয়েছে। পানথ সাপের ডিমের মতোই চাঁদের মধ্যভাগটা একটু ঘোলাটে আর এবড়ো খেবড়ো। এখন আর ঈশান কোণে পুঞ্জীভূত মেঘের পাহাড়টা নেই। যদিও নদীর উপর দিয়ে বাতাসের বেগটা এখনও স্তিমিত হয়নি। বেপারী আবার অন্ধকার চোখের শাদা মণির মতো কম্পমান আলোর ফোঁটার দিকে তাকাল। আলোটা এখনও নড়ছে। আর যে হাত আলোর ইশারা নিয়ে এতক্ষণ নড়াচড়া করছিল, এখন অস্পষ্ট হলেও আবিদ বেপারীর দৃষ্টিগোচর হলো। কালো একটা গাছ যেন একটি মাত্র সোনালি ফুল ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আবিদ বেপারী তাড়াতাড়ি ব্যবধানটা অতিক্রম করতে চাইল। কিন্তু জোরে লগি ফেলেই বুঝল এখানে থৈ নেই। নৌকা এখন মাঝ নদীতে। এখানে আর নদীর তল পাওয়া যাচ্ছে না। এ জায়গায় নদী খুব গভীর তা বেপারীর অজানা ছিল না। এতক্ষণ লগিটার প্রায় মাথায় আঙুলের টিপ রেখে বেপারী নৌকা বেয়ে এসেছে। এই অথৈ অবস্থায় কি করবে হঠাৎ বেপারী যেন তা সমঝে উঠতে পারছে না।

এদিকে আহ্বানকারী চোখের মণিটা হঠাৎ স্থির হয়ে আছে। কাঁপুনি থামিয়ে আলোময় চোখটা যেন মায়াভরা চাহনিতে তার সহোদর চোখটাকে দেখছে। আর নদীর অথৈ ললাটের উপর দিশেহারা একটা চোখ তার উদ্দিষ্ট যুগলের কাছে পৌঁছতে না পেরে ঢেউয়ের দুলুনিতে ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে খেতে ভাসতে লাগল।

বেপারী হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর লগিটাকে মাঝামাঝি ধরে নৌকার দু'পাশে জলের উপর অনেকটা বাড়ি দেওয়ার মতো করে জল টানতে লাগল। হাঁ, এবার ঢেউয়ের উপর দিয়ে কমজোর চলায় নাওটা এগোচ্ছে। আস্তে আস্তে বেপারী মাঝ নদী পেরিয়ে যাচ্ছে। নৌকা যতই আগে বাড়ছে, ঢেউয়ের-দাপানিও ততই কম লাগছে। শেষে নৌকাটা যখন স্থির গতি পেল, আবিদ বেপারী দেখল সে আর বেশি দূরে নেই। আলোর গাছটা বেশ স্পষ্ট হয়ে এসেছে। আলোর ফুলটা যা এতক্ষণ অদৃশ্য বৃক্ষের উঁচু শাখায় ফুটন্ত মনে হচ্ছিল তা সহসা ঝরে পড়ার মতো বৃক্ষের মূলে পড়ে আছে। গাছটাও আর স্পষ্ট নয়। দীর্ঘাঙ্গিনী এক নারীমূর্তি নদীর উদ্দাম বাতাসে চুল খুলে দিয়ে নৌকার প্রান্তভাগে দাঁড়ানো। তার পায়ের কাছে একটা ঘোলাটে লণ্ঠন সর্বশক্তি নিয়ে আলো ছড়াচ্ছে। নারীমূর্তির মুখ যে বেপারীর জেলে নৌকার দিকেই ফেরানো তা বেপারী বুঝলো। নৌকা আর একটু এগিয়ে যেতেই মূর্তির সর্বাঙ্গ বেপারীর নজরে এল। বেপারীর মনে হলো, বহুদিন আগে, তার কিশোর বয়সে গ্রামের মাতব্বরের পুকুর কাটার সময় মাটিকাটার মজুররা মাটির নিচের একটা মূর্তি পেয়েছিল। গাঁয়ের লেখাপড়া জানা লোকেরা বলেছিল মূর্তিটা হলো গঙ্গার। হঠাৎ বহুদিন আগে দেখা সেই গঙ্গামূর্তির কথা আবিদ বেপারীর মনে পড়ল। গঙ্গার মতোই একটা হাত কাঁখালে রেখে শরীরটা দাঁড়িয়ে আছে। সুগঠিত ও সরল। শুধু চুলগুলোই খোঁপায় বাঁধা না থেকে বাতাসে পিছন দিকে উড়ছে। এই বেমিল দেখে আবিদ বেপারী মনে মনে ভাবল, 'তা অইলে তুমি গঙ্গাদেবী না, মেঘনাদেবী!' এ ধরনের একটা উপমা প্রয়োগের ক্ষমতা থাকায় আবিদের হৃদয় পুলকিত হয়ে উঠল।

আবিদের নাওকে কাছে আসতে দেখে মেঘনা তার বাতিসহ নৌকার ছৈয়ের ভিতর ঢুকে গেল। তারপর একটা খিল খিল হাসির ঢেউ বয়ে গেল আরেক মেঘনার ঢেউয়ের উপর দিয়ে।

আবিদ বেপারী তার নাওটাকে সামনের নৌকার বাতার কাছে এনে লগিতে ভর রেখে দাঁড়াতেই নদী যেন নয়ন মেলে দিল আকাশের দিকে। এখন চোখ দুটি আর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নেই। সোজা চাঁদের দিকে মাত্রাজ্ঞানহীনের মতো চোখ মেলে আছে।

লগিটাকে নদীর তলদেশে সহজেই পুঁততে পারল বেপারী। লগির সাথে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধল নাওটাকে। তারপর অসঙ্কোচে গিয়ে ঢুকল সামনের নৌকায়। এক নৌকা থেকে অন্য নৌকায় উঠলে যে দুলুনি ওঠে, সে দুলুনিতে বেপারী বুঝল এ নৌকাটা হালকা জাম কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি। ভিতরে আলোর পাশে বসা মেঘনার কাছে গিয়ে বসা সত্ত্বেও নাওটা সমানে দুলছিল। লগি ঠেলে আবিদ বেপারী রীতিমতো ঘামে নেয়ে উঠেছে। বাইরে নদীতে বাতাস থাকায় শরীরের ঘামটা এতক্ষণ চামড়ার উপর ফুটে বেরুতে পারেনি। এখন বদ্ধ নৌকায় তা সুযোগ পেয়ে দরদর করে সারা গতর ভিজিয়ে সপসপে করে দিল। বেপারী নৌকার ছৈয়ের চটায় গুঁজা শাড়ির পাড়ের সুতোয় তৈরি একটি হাতপাখা দেখে তা তুলে নিল। পাখা ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'কি নাম বাইদ্যানীর?' প্রশ্ন শুনে একটা খিল খিল হাসির শব্দে ঢেউয়ের দোলায় উথাল পাথাল নৌকাটাও বুঝি মুহূর্তের জন্যে গমগম করে উঠল।

'নাম জিগাইয়া কি অইব? নাম আমার

বেউলা সুন্দরী।'

কথা কটি বলেই আবার হাসিতে গড়িয়ে পড়ল মেয়েটি। হাসির চোটে বুকের কাপড় কেঁপে কেঁপে নেমে গেলে একহাতে কাপড়টা ছতরের উপর ধরে রাখল বেউলা সুন্দরী। ব্লাউজহীন পরিচ্ছন্ন কালো শরীর। বক্ষস্থলের উপর ভাগটা কণ্ঠার দুটি প্রসারিত হাড় পর্যন্ত জলের মতো কালো হলেও একটু বেশি উজ্জ্বল এবং নির্মল। তার উপর ঝুলে আছে গাঢ় সবুজ দুগাছি পুঁতির মালা। মালার গোটা-গুলো এত্ত ছোটো যে প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হবে মেঘনায় মাঝে মাঝে যে সোনালি মাগুর মাছ ধরা পড়ে বুঝি সেসব মাছের সবুজ ডিম দিয়ে কেউ দু'গাছি মালা গেঁথে দিয়েছে।

হাসির লহরটা সশব্দে আছড়ে পড়ে কয়েকটা গমকে ভাগ হয়ে থামতে না থামতেই বেউলা সুন্দরী বেপারীর দিকে মুখ কাত করে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'আমার নাম তো হুনলেন মহাজন, অখন আপনের নামডা কন?'

'আমার নাম আবিদ আলী বেফারী। আমি অই হাডে দালালী-করি।' চিবুকটা চুলকাতে চুলকাতে বলল আবিদ বেপারী।

'অ আল্লা, আপনে তইলে লখিন্দর না। আর আমি ভাবতাছি, আমার নাওয়ে লখাই আইছে।'

আবার হাসতে লাগল বেউলা সুন্দরী। তবে এখন আর তেমন সশব্দে না বরং ঠোঁট টিপে একটু গা কাঁপিয়ে।

মেয়েটির নিগূঢ় হাসি সংক্রামিত হলো বেপারীর ঠোঁটেও। বেপারীও বোকার মতো হেসে ফেলল। বলল, 'তইলে ধইরা নেও আমিই চান সদাগরের পোলা লখাই! তোমার লখিন্দর!'

'এই কথা কন। আপনে তো লখিন্দরই, আমি জানি। রাইত নিশিতে যারা আমার ভরায় উডে, বাত্তির ডাহে উইড়া আইয়ে, তারা হগলতই লখাই।'

এবার মেয়েটির হাসিতে তার দাঁতের পাটি নজরে পড়ল বেপারীর। ফকফকে শাদা আর নিখুঁতভাবে দৃঢ়। মাড়ির যেটুকু আভাস পাওয়া গেল তাও চকচকে কালো আর সুন্দরভাবে সংবদ্ধ। বেউলা সুন্দরীর হাসিটা বড়ো ভালো লাগল বেপারীর।

'একটা পান খাইবেন মহাজন? জর্দা আছে জর্দা দিয়া দিমু।'

বেপারীকে বেশ নরম সুরে, কথায় মায়া মিশিয়ে জিজ্ঞেস করল বেউলা। বেপারী হেসে বলল, 'আমারে মহাজন কও কেরে, আমি না তোমার লখাই!'

'অম্মা; আবার রসও আছে দেহি! বেইশ বেইশ, আমার ভুল অইছে। অখন থিকা ঠিকঠাক কতা কমু। কমু লখাই মহাজন! লখিন্দরও মহাজনই আছিল। সদাগরের-পুত সদাগর। সদাগররে তো মহাজনই কয়। কয় না মহাজন?'

'হ কয়।' বেউলার মুখ নাড়ার কাছে হেরে গেল আবিদ বেপারী, হাসল, 'তোমার অত্ত বুদ্ধি! অত্তকথা জানলা কেমনে সুন্দরী? পানির মাইয়ারা এমুন চালাক অয়, হিডা তো জানতাম না!'

'কেবে জানতেন না লখাই মহাজন? অত্তাদিন বুঝি হগল হাডবারে ভরাব নৌকা বিচরাইয়া হুদা পানির মতো মাইয়া দেখছেন। পানিব ভিতরে ঢেউ দেখেন নাই?'

বেউলার পটাপট জবাবে বেপারী একটু লজ্জিত ও স্তিমিত হয়ে গেল। তার কেন যেন মনে হলো সে এক কালনাগিনীর গর্তে এসে পড়েছে যার ফণা এখন তার মাথার উপর বিস্তৃত। বেপারীর এমন অকস্মাৎ দমে যাওয়া দেখে মেয়েটিও যেন হঠাৎ শরমিন্দা হয়েছে। বলল, 'কি অইল, কথা কন না ক্যান? কথা কন, আমি পান বানাই।'

আবিদ বেপারীর দিকে পিছন ফিরে পিঠ দেখিয়ে বসে বেউলা নৌকায় একটা পাটাতন তুলে ভিতর থেকে পানের ডাবর বের করে আনল। ডাবরে হাত ঢুকিয়ে খয়েরের দাগে ভরা একটা তেনায় পেচানো একগুচ্ছ পান বের করল।

এ অবসরে আবিদ মেয়েটির পিঠ, বাহু, কোমর আর চীনা হাঁসের মতো বাঁক্যানো গ্রীবাভঙ্গি দেখার সুযোগ পেল। যদিও লণ্ঠনটা ধোঁয়াটে আলো ছড়াচ্ছে, তবুও তা ছৈয়ের বাঁশের চটায় ঝোলানো থাকায় সম্মুখ-বর্তিনীর সর্বাঙ্গে আলো পড়েছে। পেট আর বুক দিয়ে হাঁটু আর উরুতের উপর চেপে বসায় পিছন থেকে তার পিস্ট স্তন দুটির ফুলে ওঠা পর্যন্ত আবিদ বেপারী লোভাতুরের মতো দেখতে লাগল। যেন কোনো মাঝির নাওয়ের বালক মেঘনার বুকে আতকা ভেসে ওঠা গাঙ-শুশুকীর সুডৌল বুকের এক অংশ দেখে ফেলে অবাক হয়ে মনে মনে ভাবছে, অমা মাছেরও আবাব বুনি আছে।

বেউলা সুন্দরী তখন ছুরাতার ফাঁকে একটা আস্ত সুপারি রেখে ধীরে চাপ দিয়ে কুচি কুচি করে কাটছিল। আর এই চাপের শিহরণ তার মাংসের উপর এমনভাবে কাঁপন তুলছে যে বেপারীব মনে হলো মেয়েটিব ঘাড়েব পেশী আর দাপনার দুলুনি যেন দাড়াশ সাপের দ্রুতগামী কামলীলা। পিছন থেকে তার পাছা আব পিঠের নিচের অংশ অনেকটা চালকাড়ার হালকা ঢেঁকি উলটে রাখার মতো। নিখুঁত আর তেলতেলে। বেউলা সুন্দরীর পরনে মোটা কালোপেড়ে শাদা শাড়ি। এ ধরনের শাড়ি সাধারণত বেদে মেয়েদের পরতে দেখা যায় না। তারা রঙচঙে কাপড়ই পছন্দ করে। বেউলার সাদাসিধা শাড়ি আর শাড়ির গোঁজন-গাজন দেখে তাকে বেদেনী বলে মনে হচ্ছে না। বরং তার শাড়ির অস্বাভাবিক শাদা জমিন আর কালো পাড় দেখে তাকে কোনো পরমাসুন্দরী জেলে বৌ বলেই ভুল হবে। দু'হাতের কবজিভরা সবুজ বাংড়ি টুংটাং শব্দ করছে। বাঁ হাতের কনুইয়ের একটু উপরে মোটা কালো তাগায় একটা চ্যাপটা মস্তন বড় রুপোর তাবিজ। বাতি নিয়ে নৌকার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার সময় যে কেশরাশি বাতাসের সাথে বইতে দেওয়ার জন্য ছেড়ে রেখেছিল নৌকার ভিতর তা সম্বরণ করে নেওয়ায় তার মাথার প্রায় সমান সমান এক বিশাল খোঁপার সৃষ্টি হয়েছে। যেন দূর থেকে দেখা নদীপাড়ের কোনো গ্রামের বাড়ির বনের কুঞ্জ। আবার সেই পুকুরে পাওয়া গঙ্গামূর্তির কথা মনে পড়ল বেপারীর।

বেউলা সুন্দরী ততক্ষণে পান বানিয়ে বেপারীর দিকে ঘুরে বসেছে। তার চোখে চোখপড়ার লজ্জা এড়াবার জন্য বেপারী দৃষ্টি সরিয়ে নৌকার ভিতরে আসবাবপত্র দেখতে লাগল।

'লন পান।' হেসে বেউলা ছোট একটা পিতলের তস্তরিতে দু'খিলি পান এগিয়ে দিল।

খিলিজোড়া একসাথে হাতে তুলে বেপারী প্রশ্ন করল, 'কেমুন জর্দা, সুন্দর খুশবাই বারুইতাছে!'

'কস্তুরী জর্দা মহাজন। কেল্লা শহীদের মাজার থিকা আনছি। খাইয়া দেখেন, ঘামে বুকের পশম ভিজ্জা যাইব।'

হেসে বলল বেউলা সুন্দরী। তার কথায় আবিদ বেপারীও না হেসে পারল না। তারপর পানের খিলি দুটি একসাথে মুচড়ে মুখে পুরে দিল। তার পান খাওয়ার নমুনা দেখে মেয়েটি আবার হেসে গড়িয়ে পড়ল। আবিদ বেপারীও হাসতে হাসতে আবার নাওয়ের আসবাবপত্রের দিকে চোখ ফেরাল। মেয়েটি যেখানে বসেছিল, তার পিছন দিকে তিনটি সাপের ঝাঁপি। একটার উপর আরেকটা বসানো। ঝুড়ির পাশে একটা কাঠের ডেউয়া। তার সাথেই কাত করে রাখা একটা ছোটো বটি দাও। মেয়েটির ঠিক মাথাব উপর ছৈয়ের ধনুকের মতো বাঁকা চূড়াটা থেকে একটা সাপের হাড়ের মালা ঝুলছে। ছৈয়ের এক পাশের বেড়ায় একটা বড়ো শিঙ্গা গাঁথা। এরকম শিঙ্গা দিয়েই বেদেনীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বয়স্ক বেতো নরনারীর রক্তমোক্ষণ করে বাত সারায়। কলকিসহ একটা নারকেলের হুকাও বেড়ায় ঝুলছে। বেড়ার সাথে বাঁধা দড়িতে দুটি ময়লা শ্রীহীন শাদা শাড়ি। ছেঁড়া, পাড়হীন। এতক্ষণে আবিদ বেপারীর চোখে বেউলা সুন্দরীকে ঘিরে ধরা মমতাহীন দারিদ্রের বেষ্টন ধরা পড়ল।

'কি দেখতাছেন মহাজন, পানিখাওড়ী পাক্ষির বাসা দেখেন?'

হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল বেউলা সুন্দরী। বেপারী কিছু বলার আগেই আবার ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল, *'ঘরে বউ বাচ্চা* আছে?'

'না, বিয়া করি নাই।'

'অ, ল্যাজ কাড়া ছাপ!' বলেই বেউলা সুন্দরী আবার হাসতে লাগল। এবার তার হাসিতে ঠাট্টার গমক বেশি। বেপারী মেয়েটির টিটকারীর রেশটা বুঝতে পেরে বলল, 'ল্যাজ দিয়া কি করুম, ল্যাজ থাকলে টানুন লাগে।'

'অ টানাটানির মাইজে নাই, খালি ছোপ মারার তালে ঘুরেন? ইয়ানে হিয়ানে গিয়া খালি ছোপ মাইরা পলাইয়া যাওন। বাপরে, সোজা মানুষ না, একবারে পানথ হাপের মিজাজ!'

মেয়েটির মুখ নাড়া কথার ভঙ্গিতে এবার বেপারীও জোরে হেসে ফেলল। বলল, 'তোমার লগে কথায় পারুম না সুন্দরী। তুমি বাকসিদ্ধা বাইদানী।'

আবিদ বেপারীর এই সহজ পরাজয়ে বেউলা বেশ পুলকিত হয়েছে বলেই মনে হলো। সে ঠোঁট টিপে আবার একটু হেসে কথা ঘুরিয়ে বলল, 'আর বুঝি তর সইতাছে না লখাই মহাজনের, তাড়াতাড়ি খালি মরণের ঢেউ বুকে লাগাইবার মন চায়।'

কথা শুনে আবিদ হেসে মেয়েটির একটি হাত ধরল। হাত সরিয়ে না নিয়েই বেউলা সুন্দরী বলল, 'হুনেন লখিন্দর মহাজন, আগে কন দেনমোহর কত দিবাইন?'

আবিদ বেপারী খুশী হয়ে বলল, 'হুদা দেনমোহর কেরে, তুমি চাইলে কাবিন পর্যন্ত লেইখ্যা দিমু সুন্দরী!'

বলেই দু'বাহু দিয়ে বেউলাকে জড়িয়ে ধরল বেপারী। এবং বিদ্যুতের মতো দ্রুতগতিতে মাথা নুইয়ে তার কণ্ঠার হাড়ে গভীরভাবে সশব্দে চুম্বন করল। বেপারীর এই আকস্মিক ব্যবহারে মেয়েটি একটুও অবাক হলো না। বরং ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে বেপারীর মাথাটা একটু ঠেলে দিয়ে বলল, 'কেমুন কাবিন, মেঘনার পানিত খেলা ঢেউয়ের কাবিন নিহি? না মহাজন, আমি কাবিন চাই না, আমারে দেনমোহরের টেহাডা হাতে দেন আগে, পরে গতর হাতাইবেন।'

কথা শেষ করেই বেউলা সুন্দরী বেশ ভদ্রভাবে কিন্তু সবলে আবিদের বাহুর বেষ্টন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল। আবিদ উপলব্ধি করল, এই ছিপছিপে গড়নের কালো মেয়েটির দেহে এক যুবা পুরুষের জোর লুকিয়ে আছে।

আবিদ সতর্ক হয়ে তাকাল বেউলার দিকে। তার গতর থেকে শাড়িটা লুটিয়ে পড়েছে মাজার উপর। খুঁতহীন ছোটো কটোরার মতো বুক দুটিকে মনে হচ্ছে গর্ভবতী গাঙশুশুকীর শরীরের উপরভাগের নিটোল দুটি স্তনের মতই স্ফীত, পরিপূর্ণ।

আবিদ বেপারী নিজের কোমরে হাত দিয়ে প্রথম খুতির উপর বাঁধা গামছাটা খুলে দড়িতে ঝোলানো মলিন শাড়িগুলোর উপর রেখে, পরে খুতিটা বের করল। খুতির মুখ ফচকা গিঁরোতে শক্তভাবে বাঁধা থাকলেও বেপারী কায়দা করে একটানে খুলে ফেলল। হাত দিয়ে বের করে আনল তাড়া বাঁধা নোট। সব দশ টাকার। গুণে গুণে পাঁচটা নোট আলাদা করে, তাসের মতো ছড়িয়ে সে বেউলার দিকে মেলে ধরল, 'লও সুন্দরী, তোমার দেনমোহর পঞ্চাশ টেহাই দিলাম।' বেউলা বেপারীর অন্য হাতে ধরা আরেক তাড়া নোটের ভাঁজের দিকে আড়চোখ এক ঝলক তাকিয়ে হেসে সামনের তাসের মতো ছড়ানো দশ টাকার পাঁচটা নোট ধরল। হেসে বলল, 'মেঘনা পাড়ের হাট বাজারে দালালীরও বেইশ পইসা আছে দেখতাছি!'

আবিদ কোনো কথা না বলে বাকি টাকাটা খুতিতে ভরে মুখটা পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলল। তারপর তা কোমরে না বেঁধে গামছাটা যেখানে রেখেছিল সেখানেই খুতিটা রাখল। মেয়েটিও বেপারীর খুতি রাখার মধ্যে একটা পূর্ব প্রস্তুতির আভাস পেয়ে তার হাতে ধরা পাঁচটা দশ টাকার নোট দ্রুত ভাঁজ করে পেছনের সাপের ঝুড়ির ডালাটা মুহূর্তের মধ্যে ফাঁক করে নোটগুলো গুঁজে দিয়ে পলক ফেলতে না ফেলতেই ডালাটা আবার চাপিয়ে দিল। তবুও ডালা স্পর্শ করা মাত্রই ভিতরে সাপের ফোঁস-ফোঁসানি শুনতে পেলো আবিদ বেপারী। জিজ্ঞেস করল, 'কি হাপ?'

'পানোখী। মাইনষে কালনাগিনী কয়।'

বলে সোজা বেপারীর মুখের দিকে তাকাল বেউলা। জর্দা দিয়ে কড়া পান খেয়ে বেপারীর কপাল ঘামছে। ঠোঁট দুটি একটু কালচে লাল। বেউলাকে তার দিকে তাকাতে দেখে বেপারী জানতে চাইল, 'তুমি হাপ নাচাও?'

'না। আমি হাপ পালি, আর মানুষ নাচাই।'

কথাটা বলেই বেউলা হেসে হাঁটুর উপর ভর রেখে দাঁড়িয়ে দেহের চারদিকে হাত ঘুরিয়ে শাড়ির প্যাঁচ খুলতে লাগল। এখন বেউলার বুক দুটি আবিদের মুখের কাছে ফলের মত নুয়ে পড়েছে। সদ্য চেরাই করা জাম কাঠের গন্ধের মতো একটা গন্ধ মেয়েটির শরীর থেকে আবিদ বেপারীর নাকে এসে লাগল। বেপারী ঘাড় উঁচু করে একটি ফলের উপর আলতোভাবে তার জর্দাতাপিত ঠোঁট দুটি ছোঁয়াল। বেউলা শাড়ির প্যাঁচ গুটিয়ে নিয়ে উরুতের ফাঁকে রেখে নাভির উপরকার শক্ত গিঁটটা নখ দিয়ে খুঁটে খুলতে চেষ্টা করছে। বেপারী বলল, 'আমি খুইলা দিমু?'

বেউলা খিলখিল শব্দে হেসে উঠে বলল, 'বান যে বড়ো শক্ত লখাই মহাজন, দাঁত দিয়া খুলন লাগব। পারবাইন খুলতে?'

এ সুযোগ আবিদ বেপারী ছাড়তে চাইল না। সোজাসুজি মুখটা নামিয়ে আনল বেউলার নাভির কাছে। শাড়ির গিঁটে দাঁত বসাবার আগেই ঠোঁট ছোঁয়াল গভীর নাভিমণ্ডলের গর্তের নিম্নভাগে। বেউলা তলপেটে পুরুষের তপ্ত ঠোঁটের স্পর্শ পেয়ে শরীর কুঁচকে বসে যেতে যেতে বেপারীর মাথায় হাতের ধাক্কা মারল, 'আরে করেন কি আপনে, আমার ক্যাতকুতি লাগে না?'

'ক্যাতকুতি আছে নিহি মাইয়া লোকের? আচ্ছা দেও বানডাই খুইলা দেই। আর চুমা দিমু না।'

কথাগুলো বলে আবিদ বেপারী অনেকটা গায়ের জোরে, বেউলার উরুতে হাতের চাপ দিয়ে তাকে আবার হাঁটুর উপর দাঁড় করিয়ে দিল। বেউলার ফের উঠে দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে কোমরের গিঁটের দু'পাশের শাড়ি সরে গিয়ে তার তলপেট থেকে হাঁটু পর্যন্ত উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। দুটি ছোটো কলাগাছের কাণ্ডের মতো উরুমূল তার যুগল বাহু জ্যামিতির কাঁটার মতো বিস্তার করে থাকায় বেউলার অধোদেশকে একটি সুন্দর তোরণের মতো মনে হতে থাকল আবিদের। আবিদ আবার মুখটা নামিয়ে আনল মেহগনি কাঠের আলো পিছলে যাওয়া কালো রঙকে হার মানাবে এমন সুন্দর নাভিমণ্ডলের কাছে। চুম্বনের ইচ্ছায় ঠোঁটের মাংস কুঞ্চিত হতে থাকলেও বেপারী গিঁটের একটা কুঁচকানো অংশে দাঁত চেপে আস্তে টান দিল। প্রথম টানেই গিঁটের পাকানো আঁচলটা খুলে গেলে আবিদ বলল, 'দেখলা সুন্দরী, আমি কেমন আঁট গিঁরো খুলতাম পারি!'

কথা বলার সময় আবিদের চোখ বেউলার মুখের দিকে ছিল না বরং শাড়ির বাঁধন মুক্ত হয়ে পড়ায় তার অধোদেশ সম্পূর্ণ নিরাবরণ থাকায় বেপারী কালো গুল্মময় ত্রিভূজাকৃতি এক ঈষদুচ্চ বদ্বীপের মোহময় সৌন্দর্য অবলোকন করতে ব্যস্ত। আবিদের মনে হলো যেন এক ফণা মেলা সাপিনী তার ফণাসহ গর্তে ঢুকতে গিয়ে গর্তের মুখে মুখ আটকে থমকে আছে।

'নেন, জাগা ছাড়েন, আমি হুতি।'

বলে বেউলা সুন্দরী বেপারীর অভিভূত মুখের উপর তর্জনীর টোকা মারল। বেপারী নাওয়ের মধ্যভাগের দখল ছেড়ে ছৈয়ের কাছে সরে যেতেই বেউলা সুন্দরী চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল পাটাতনে। তার বুক, পেট আর উরুতের মাংসপেশীকে মনে হচ্ছে কোনো পারদর্শী শরীরচর্চাকারিণীর প্রদর্শনরতা একটি অপরূপ কৌশলের মতো।

আবিদ বেপারী লুঙ্গিটা খুলে দড়ির কাপড়ের উপর রেখে শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে বলল, 'একটা সিগ্রেট খাইয়া লমু?'

'আ মরণ! এমুন সময় আবার কেউ সিগ্রেট ধরায়? রাইত আর বেশি নাই মহাজন, জলদি করেন। হুনতাছেন না কিনারের গাঁওয়ে মোরগা ডাকতাছে। পহর

ধলা মারলে আমার বহর ছাইড়া যাইব। আইয়েন।'

বেপারীর দিকে না ফিরে, বরং ছৈয়ের বাঁকা তুঙ্গে ঝোলানো সাপের হাড়ের শাদা মালাটার উপর চোখ রেখে তাড়া দিল বেউলা সুন্দরী।

আবিদ বেপারী গায়ের জামাটা খুলে স্তূপ করে দড়ির উপর রেখে সাপের ঝুড়িগুলোর কাছে যেখানে বেউলা তার কদলীকাণ্ডের মতো নগ্ন উরুযুগল ভাঁজ করে শুয়ে আছে সেখানে গিয়ে বসল। তার সামনে গম্বুজের মতো বেউলার সুডৌল হাঁটুর চূড়া উঁচু হয়ে আছে। আবিদ বেপারী নিজের হাঁটুর উপর নিজেও একটু উঁচু হয়ে উঠল। তার মাথা সাপের সাজানো ঝুড়িগুলোর সমান হলে সে দেখলো বেউলা চোখ মুদে গম্ভীর, থমথমেভাবে শুয়ে আছে। আর তার বুকের উপরে গোল আতাফলের মাঝে বসা দুটি ভ্রমরের মতো স্তনের বোটা সদাজাগ্রত কালো আঁখিতারার মতো স্থিরভাবে বেপারীর উলঙ্গ দেহসৌষ্ঠব নিরীক্ষণ করে স্তম্ভিত, অভিভূত।

কোমল স্পর্শে বেপারী বেউলার গম্বুজের মতো হাঁটুতে হাত রাখলে মেয়েটি অতি ধীরে তার ভারি উরুযুগলের একটি ফাঁক করে দিল। যুগলের বাম স্তম্ভ জঙ্ঘার একপাশে আস্তে নেমে গেলে বেউলা তার ভাঁজ করা বাম পায়ের ভাঁজ খুলে পাটাতনের উপর নিঃশব্দে স্থাপন করল। বেশ আরামের সাথে রাখল পা'টা। অন্য পা'টাও এভাবেই রাখবে ভেবে বেপারী অপেক্ষা করছে। কিন্তু স্তম্ভটা অনড়। বেপারী তার ডান হাতটা আবার স্তম্ভের চূড়ায় রাখতে গিয়ে বুঝল হাতটা কাঁপছে। ঠিক জালি লাউয়ের মোটা লতার মতো কাঁপছে। বেপারীর স্পর্শে বেউলা ঘুমজড়ানো ধানচেরা চোখ দুটি মেলল। দৃষ্টিতে গভীর ঘুমের অলসতা ছাড়া আর কোনো অনুভূতি বোঝা গেল না। কালো মাংসল ঠোঁটজোড়ায় কোনো বাসনার বুঞ্জন নেই। বরং কেমন দৃঢ়তায় সংবদ্ধ।

বেপারী কাঁপা গলায় বললো, 'পাও সরাও বাইদানী।'

বেপারীর 'বাইদানী' সম্বোধনে বেউলার চাপা ঠোঁটের উপর হাসির একটু মৃদু ঝিলিক খেলে গেল। সে অনুমান করল তার মহাজনের অবস্থা কাহিল। বেউলা তার ডান উরু একটু ডান দিকে হেলিয়ে প্রসারিত করতে লাগল। তবে তা পাটাতনের উপর না বিছিয়ে অকস্মাৎ তুলে দিল বেপারীর বিস্তৃত কাঁধের উপর। পায়ের পাতা কাঁধ অতিক্রম করে গিয়ে সাপের ঝুড়ির ডালায় ঠেকল। বেপারী বেউলার এই উদার সম্প্রসারণে কৃতার্থ হয়ে তার ডান হাঁটুর পাশে ঠোঁট ঘষতে লাগল। দর দর করে ঘাম ঝরছে আবিদের পেশীবহুল পিঠ আর বুকের পশম ভিজিয়ে। তার কোমরে মোটা খুনসির তাগাটা ভিজে আঁট হয়ে আছে। বেপারীর নগ্নতাও এখন শিল্পিত পাথরের মতো সুন্দর আর ঋজু। যেন যাদুঘরে রাখা পাল যুগের কোনো অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি ধরাচূড়া ফেলে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসেছে।

ওদিকে আবিদের অলক্ষ্যে তার পিঠের উপর রাখা বেউলার ডান পায়ের অগ্রভাগ অর্থাৎ পায়ের পাতা ও আঙুল অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ রাজহাঁসের চঞ্চুর মতো ঠোকর মেরে সাপের ঝুড়ির ডালাটা ফেলে দিল। আর চোখের নিমেষে একটা 'অকথ্য' ফোঁসফোঁসানি তুলে ঝুড়ির অধিবাসিনী কালনাগিনী দ্রুত হিলহিল করে বেউলার পা বেয়ে নেমে এসে আবিদের ডান বাহুতে ছোবল হানল। বাহুর উপর সাপের মুখের ভেজা শীতল স্পর্শে ঘাড় ফিরিয়েই বেপারীর চোখের তারা ভয়ে স্থির হয়ে গেল। সাপটা বেউলার উরুতের উপর থেকে ঘাড় বাঁকিয়ে আবিদের দু'চোখের মধ্যিখানে ফণা তুলে একটু একটু ডানে-বাঁয়ে দুলছে। আর মুখ থেকে কালো সুতোর মতো সরু জিভটা দ্রুত পিছনে পিছনে আসা-যাওয়া করছে। বুঝি নড়লেই আবার ছোবল হানবে। বেউলা একদৃষ্টে সাপটার দিকে তাকিয়েই চোখ বড় বড় করে চিৎকার করে উঠল, 'খাইছে, মহাজন, আপনেরে কালে খাইছে। সব্বোনাশ অইছে—এই হাপের যে দাঁত তোলা অয় নাই গো।'

তার চিৎকার আর উরুতের কাঁপুনিতে সাপটা ক্রুদ্ধ হয়ে আবিদের দু'চোখের মাঝখানে, নাসিকার গোড়ায় সজোরে ছোবল মারল। বেপারীর দু'চোখের পাতা থর থর করে কয়েকবার কেঁপে শেষে স্থির বিস্ফারিত হয়ে রইল। তারপর অজ্ঞান দেহটা উবুড় হয়ে পড়ল বেউলার বুকের উপর। এমন ভাবে পড়লো, দেখলে মনে হবে কোনো রমণরত পুরুষ তার অংশভাগিনীকে মধুরতম পুলকের মাঝে আলোড়িত করতে করতে দাঁত দিয়ে বক্ষবর্তুল মর্দন করছে।

আবিদের জ্ঞানহীন দেহটা বুকের উপর দু'হাতে জড়িয়ে ধরে, খিলখিল হেসে উঠল বেউলা সুন্দরী। তার বাহুর উপর থেকে ফণা মেলে রাখা কালনাগিনীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার লখিন্দরের কাম অইয়া গেছে লো লেংটা বাইদানী। অখন তর ফোঁস ফোঁস থামা।'

বলেই আবার খিলখিল করে হাসতে লাগল বেউলা। মুখমণ্ডল উঁচু করে আবিদ বেপারীর কপালের নিচে নাসিকার গোড়ায় যেখানে সাপটা ছোবল বসিয়েছিল, সেখানে দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন করল। পরে বেপারীর দেহটাকে কায়দা করে বুকের উপর থেকে ঠেলে পাশে চিৎ করে শুইয়ে দিল ঠিক একটা বাচ্চা ছেলেকে শুইয়ে দেয়ার মতো। বেপারীর ঠোঁট জোড়া একটু ফাঁক হয়ে আছে। তার ধীরগতি নিঃশ্বাসের দুলুনিতে পেশল বুক আর নেতিয়ে পড়া পেট পরস্পরের সাথে তাল রেখে ক্রমাগত ওঠাপড়া করছে। শিশ্নটিকে মনে হচ্ছে হাত ফসকে বেরিয়ে পড়া টাকি মাছের মতো লম্বমান।

বেউলা সুন্দরী উঠে বসে নগ্ন জঙ্ঘাপ্রান্তে দু'হাত রেখে আড়মোড়া ভাঙল। লুটিয়ে পড়া কেশরাশি খোঁপা করে বাঁধল। কিন্তু শাড়ি পরল না। সাপটাকে তখনও ফণা ধরে থাকতে দেখে হাত বাড়িয়ে কালনাগিনীর ঘাড়টা খপ করে ধরল।

'দাঁত নাই বাইদানীর আবার ফোঁসফোঁসানি কত। লো লেংটা বাইদানী, তুই আমার লখিন্দররে করলি কি? দিমু মাথা ছেইচা।'

সাপটাকে কপট তিরস্কার করতে করতে কোমর উঁচু করে বেউলা উঠল। কালনাগিনী তখন বেউলার হাতে লতার মতো ঝুলছে। সাপটা যাতে দেহ মুচড়াতে না পারে সেজন্য অপর হাতে তার কোমরটা ধরে ফেলল বেউলা। শেষে তুলে এনে ঝুড়ির ভিতর নামিয়ে দিয়ে ডালা চাপিয়ে দিল। তার হাতের নড়াচড়ায় কোনো তাড়াহুড়া আছে বলে মনে হলো না। বরং ধীরে সুস্থে ছৈয়ের বেড়ায় কাপড় ঝোলানোর দড়িটার কাছে বসে বেপারীর গামছা দিয়ে মুখটা মুছল। টাকার খুতিটা খুঁজে বের করে তা সাপের ঝুড়ির ডালার ভিতরে গোল করে গুঁজে দিল। এবারও সাপটা ফোঁসফোঁসানির শব্দে তার ক্রোধ ব্যক্ত করছে।

টাকার খুতিটা সামলানো হয়ে গেলে বেউলা গামছাটা দিয়ে বেপারীর জ্ঞানহীন দেহের নগ্নতা ঢেকে বেশ সাহসের সাথে তাকে পাঁজা কোলে তুলে নিয়ে নৌকার গলুইয়ের কাছে এসে দাঁড়াল। আবিদ বেপারীর ভারি দেহের ভারে বেউলার মতো শক্তিস্বরূপিণীও একটু বাঁকা হয়ে আছে। নদীর উপর জোর বাতাস আর অনর্গল ঢেউ থাকায় আবিদ বেপারীর জেলে নৌকার হালকা গলুইটা মদের মতো লাফাচ্ছে। বেউলা নাওয়ের দাপানিতে পানিতে পড়ে যাওয়ার ভয়ে একটা সুযোগের অপেক্ষায় নৌকার কিনারার কাঠে পা রেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু আবিদ বেপারীর ভারি দেহের ভার তার হাতে আর সইছিলো না। শেষে ঢেউয়ের দুলুনির মধ্যেই সে জেলে নৌকার গলুইয়ে পা রেখে চির অভ্যস্তের মতো উঠে গেল। আর জেলে নৌকার দুটো তক্তার উপর বেপারীকে শুইয়ে দিয়ে হাত বাড়িয়ে নদীর পানি তুলে বেপারীর চোখে একটা ঝাপটা মেরে দ্রুত ফিরে এল নিজের নৌকায়। তারপর মুহূর্ত বিলম্ব না করে লগির বাঁধন খুলে নাও ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগল বেদে বহরটার দিকে। যেন মেঘনার ললাটের উপর থেকে এক অতিকায় কালো চক্ষু স্বইচ্ছায় তার সহোদরা লোচনকে ত্যাগ করে ভেসে যাচ্ছে। আর ঢেউয়ের উপর আটকে রাখা দোদুল্যমান পরিত্যক্ত নয়নটি এক নগ্ন গঙ্গামূর্তির চাতুরী দেখে অথৈ ঢেউয়ের উপর ছল ছল করে কাঁদতে লাগল।□

যাঁরা জানতে চান

উপন্যাস কাকে বলে ? কী তার বৈশিষ্ট্য? কোন কোন উপাদান ?

শর্মিলা বসু

আজকের জনপ্রিয়তম সাহিত্য-মাধ্যমগুলির অন্যতম হল উপন্যাস। সাধারণভাবে উপন্যাস বলতে আমরা বুঝি একটি কাহিনী, যেখানে কেবল একটি ঘটনার ঋজুতার পরিবর্তে নানা ঘটনার জটিলতা এবং সেই অনুষঙ্গে অনেক চরিত্র এসে ভিড় জমায় অর্থাৎ মহাকাব্যে যেমন আদ্যন্ত প্রায় একটি যুগকে ধরা যায় উপন্যাসও তেমনি প্রায়শই সমাজ এবং সময়ের মুখপত্র হয়ে ওঠে।

সাহিত্যের আসরে কিন্তু উপন্যাস অপেক্ষাকৃত নবীন অতিথি। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের বিরাট চত্বরে উপন্যাসের হদিশ কোথাও পাওয়া যায়নি। এই ঘটনার সত্যতা কেবল বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কাব্য-কবিতার একাধিপত্য পরিহার করে গদ্যে বিন্যস্ত কাহিনীরস আস্বাদনের জন্য আধুনিকতার সীমারেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হয়েছিল। এর অন্যতম কারণ আধুনিকতা,—যার মানেই জটিলতা—বিশ্বাস আর সংস্কারের অভ্যস্ত দুনিয়া ছেড়ে, রাখালিয়া সমাজের সারল্যকে অতিক্রম করে এক সংশয়, জিজ্ঞাসা আর অসরলতার জগতে পদার্পণ। ঈশ্বরানুগত্যের একটানা বেড়াজাল অতিক্রম করে মানুষের সুখদুঃখ, জালাযন্ত্রণাকে নিয়ে বিভাবনও এই যুগেরই যুগলক্ষণ। সাহিত্যে যে মানুষকে নিয়ে আসা হল সে একটা গোটা মানুষ—তাই, তার রক্তমাংসের আবেগ-অনুভূতিগুলোর ঊর্মিময় উত্থানপতন এখনকার সাহিত্যের কাঙ্ক্ষিত ; মধ্যযুগীয় ঐশীক্ষমতার নিস্তরঙ্গ প্রকাশমাত্র নয়।

যুগলক্ষণের এই সমস্ত নতুন চিহ্নগুলিকে আত্মস্থ করতে গিয়ে উপন্যাস-সাহিত্যকে কয়েকটি শর্তের জন্য অপেক্ষমান থাকতে হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, এইসব শর্তাবলীর পরিপূরণ না হওয়া পর্যন্ত উপন্যাস সাহিত্য-জগতে ঢুকতেই পায়নি। এগুলিকে এরকম ভাবলে বোধহয় খুব বেশি ভুল হবে না—

ক) উপযুক্ত গদ্য-মাধ্যম খ) মুদ্রাযন্ত্র বা ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা গ) আধুনিক জীবন ও মানবমুখীনতা ঘ) সংবেদনশীল পাঠক।

শ্রব্য এবং দৃশ্য—সাহিত্যের দুটি রূপভেদ। কবিতা শ্রব্যকাব্য, নাটক দৃশ্যকাব্য। উপন্যাস শ্রব্যসাহিত্য নয়—চোখে দেখে, বুদ্ধি দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে হয়—তবেই তা মস্তিষ্কের কাছে এবং হৃদয়ের কাছে আবেদন জানাতে পারে। তবে নাটক এবং উপন্যাসের দৃশ্যগুণের পার্থক্য যে-কোন মানুষের কাছেই সুস্পষ্ট। নাটকে কোন একটি ঘটনার গতিকে অভিনেতার অভিনয়, বাচন এবং রং-রূপের মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়—যেক্ষেত্রে উপন্যাসে পুরো ব্যাপারটাই তাকে অনুধাবন করতে হয় বর্ণনার দ্বারা। তাই নাটকের উপস্থাপন্-রীতি যেখানে প্রত্যক্ষ, উপন্যাসের সেক্ষেত্রে পরোক্ষ। এবং এই কারণেই উপন্যাসকে অনেক বেশি নির্ভর করতে হয় তার ভাষা-মাধ্যমটির উপর। উপন্যাসের ভাষা কেবল বর্ণনামাত্র নয়, তা হল ঔপন্যাসিকের সমস্ত ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ। Style is the man কথাটি এখানে খুব বেশি প্রযোজ্য। বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ী হয়ে না-যাওয়া পর্যন্ত উপন্যাসের ভাষা যথার্থ হয়ে উঠতে পারে না, তা কেবল বর্ণনা হয়ে থাকে। কিন্তু কাঠামো নির্মাণই তো উপন্যাসের শেষ কথা নয়—তাতে প্রাণসঞ্চার করাই হল এর চরম লক্ষ্য। তাই উপন্যাসের গদ্য হয় ঋজু, সহজে সংযোগকারী, অনাবশ্যক কাঠিন্য ও আড়ষ্টতাবর্জিত—আবার প্রাত্যহিকের ব্যবহৃত গদ্যও নয়। যেমন বাংলা উপন্যাসের কথাই ভাবা যাক। মধ্যযুগে কবিকঙ্কনের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আদি-ঔপন্যাসিকের প্রথম আভাস পাওয়া গেছে এমন দাবি তো অনেকেই করেন। কিন্তু তবুও ১৮৬৫ না আসা পর্যন্ত আমাদের থেমে থাকতে হয়েছিল সার্থক উপন্যাসের জন্য। ১৮৬৫-তে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে যদি আমরা মনে করি 'দুর্গেশনন্দিনী'ই প্রথম সফল উপন্যাসের দাবি নিয়ে হাজির হল তাহলেও আমাদের এটুকু স্বীকার করতেই হবে 'দুর্গেশনন্দিনী'র জগৎও আমাদের প্রতিদিনের তো নয়ই—কাছাকাছির চেনাজানা জগৎও নয়। এখানে চরিত্রগুলি কতকগুলো আদর্শকে রূপ দেবার জন্য সৃজিত হয়। ব্যক্তিত্বের চেয়েও বড় হল এখানে তাই আদর্শ। কিন্তু ১৮৭২-এ পৌঁছে যখন আমরা সেই বঙ্কিমচন্দ্রেরই হাতে পেলাম 'বিষবৃক্ষ'-এর ফসল—তখন আমরা চমকে উঠলাম। এখানকার মানুষরা আদর্শের মোটা ছদ্মবেশটার আড়ালে লুকিয়ে থাকে না—প্রবৃত্তির বিচিত্র অলিগলিসমেত নিজেকে প্রকট করে তোলে। 'বিষবৃক্ষ'-এর কালপর্বে পৌঁছেই বঙ্কিম বুঝতে পারলেন তাঁর উপন্যাস-সাহিত্যের গদ্য কেমন হবে। এ তৎসম শব্দবহুল রমান্যাসের গদ্য নয়—একদিকে বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতঘেঁষা পাণ্ডিত্য গদ্যরীতি, আরেক দিকে হুতোমী বা আলালী গদ্য—এ দুয়ের মিশ্রণে ঠিক নয়—এ দুয়ের গুণগুলির সমন্বয়ে গড়ে উঠল যে নতুন গদ্যরীতি, তা-ই হল বাংলা উপন্যাস-মাধ্যমের যথার্থ আদি-জননী। এইরকম নিরীক্ষা কেবল বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, বিশ্বের অন্যান্য সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আলংকারিকতা, কাব্যময়তা, অত্যুচ্ছ্বাসের দরজাগুলো পেরিয়ে একেবারে সহজ, সরল, অনাড়ম্বর অথচ সাহিত্যের উপযুক্ত বাহন ভাষার জন্য অপেক্ষা সব দেশের উপন্যাস-সাহিত্যকেই করতে হয়েছে।

ঔপন্যাসিক ম্যান্সেল ক্যাথারিন।

প্রশ্ন উঠতে পারে গদ্যে লেখা রচনা কী এর আগে ছিল না ?—ছিল বৈকি। আমাদের ভারতবর্ষে ছিল গদ্যে লেখা বৌদ্ধজাতকের গল্পগুলি, 'দশকুমার-চরিত'। অন্যদিকে ছিল বানিয়ানের 'পিলগ্রিমস প্রগ্রেস'-এর মত গদ্যকাহিনী। তবুও যথার্থ উপন্যাস যে ভারতবর্ষে উনিশ শতকের আগে তৈরি হয়নি একথার যাথার্থ্য সন্দেহাতীত।

এবার জিজ্ঞাসা জাগতে পারে গদ্যের ব্যাপারটা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু ছাপাখানার সঙ্গে উপন্যাসের জন্মের সম্পর্ক কোথায় ? আসলে কবিতা আমরা যত তাড়াতাড়ি মুখস্থ করতে পারি গদ্য তা পারি না। কবিতার ক্ষমতা আছে কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশের এবং স্মৃতিতে বর্তমান থাকার, গদ্যের সে ক্ষমতা নেই। গদ্য তাই কখনোই শ্রুতিনির্ভর নয়, তা কখনোই শ্রব্য মাত্র থাকতে পারে না—তার দৃশ্য-আবেদনের প্রয়োজন রয়েইছে এবং এই আবেদনকে সর্বজনীন করে তোলার জন্যই ছাপাখানার প্রয়োজন। 'বঙ্গদর্শন' না থাকলে 'বিষবৃক্ষ' এত বহুল প্রচার লাভ করতো কিনা এ ব্যাপারে সংশয় আছে।

বরং আমরা উপন্যাসের জন্মপত্র বিচারে একটা ব্যাপারে অনেকটা নিঃসংশয়। উপন্যাস যে মধ্যযুগে সৃজিত হতে পারেনি, আধুনিকযুগের সীমানা পর্যন্ত তাকে যেমনভাবে অপেক্ষা করতে হয়েছে তার কারণ উপন্যাসে ঈশ্বরমুখী সংস্কারাবদ্ধ কোন কোন নির্দিষ্ট কাহিনী নিয়ে নাড়াচাড়া করা হয় না, এখানে মানুষকে গোটা মানুষ হিসেবে নিয়ে আসার একটা প্রবণতা আছে। কোন সমালোচক বলেছিলেন আধুনিকযুগকে যদি একটামাত্র চিহ্নের দ্বারা প্রকাশ করতে হয় তাহলে সে চিহ্নটি হবে জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

আমাদের দেশের সাহিত্য পত্রিকায় উচ্চতর ছাত্রছাত্রী এবং সাহি[illegible] জিজ্ঞাসুদের জন্য আলাদা কোনো বিভাগের ব্যবস্থা নেই। অথচ [illegible] ছাত্রছাত্রী ও ব্যক্তির সাহিত্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা ও প্রশ্ন আছে নানা[illegible] সম্প্রতি সাহিত্য বিভাগের উচ্চতরমানের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য [illegible] Types of Literature. বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ অথচ [illegible] আমাদের প্রয়াস হবে এই বিষয়টি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ ও সঠিক ব্যক্তিকে দিয়ে সাহিত্যের নানা শাখা ও আঙ্গিক সম্পর্কে আলোচনা করা। এ আলোচনায় প্রত্যক্ষত উপকৃত হবেন বিদ্যার্থীরা কিন্তু পরোক্ষভাবে ব্যাপকহারে লাভবান হবেন সাহিত্যের সাধারণ অথচ মনস্ক পাঠক-পাঠিকারা। অনেকেই তো উপন্যাস পড়েন কিন্তু জানেন কি উপন্যাস কাকে বলে, তার রকম কত ? বহুজনই তো নাটক দেখেন অথচ জানেন কি কোন দেশে উৎপত্তি নাটকের, কেমন করে হলো তার বিবর্তন ? আধুনিককালের কবিতাকে বেশিরভাগ মানুষই তো [illegible] বলেন কিন্তু কেন দুর্বোধ্য তার কারণ জানেন কি ? সাহি[illegible] সব নানা বিষয়ে একটা স্পষ্ট ও ধারাবাহিক ধারণা করবার জন[illegible] বিভাগটির ভাবনা।

আসলে গোটা আধুনিক যুগটাই একটা জিজ্ঞাসা—একটা বিরাট বড় জিজ্ঞাসা। গোষ্ঠীর মধ্যে পাঁচজনের একজন হয়ে তখন আর মানুষ থাকতে পারছে না—তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ প্রায়শই ঘটছে। ব্যক্তিমানুষ তার ব্যক্তিসত্তাকে দিয়ে যে-জীবনপ্রশ্নের সমাধান করতে চাইছে উপন্যাসের মূল উপজীব্য তো তাই-ই। তাই উপন্যাসে কপালকুণ্ডলা, হীরা দাসী বা রোহিনীর মত চরিত্ররা আসে একেবারে আদিপর্বেও—কালকেতু, খুল্লনা বা রঞ্জাবতীর মত দেবমহিমার হাতের খেলার পুতুলরা আসে না। উপন্যাসে চরিত্র আর স্রষ্টা মিশে যায়—তাই ব্যক্তিত্বের এমন রম্য প্রকাশ ঘটে। যেখানে তার ব্যতিক্রম ঘটে সেখানে উপন্যাসের ত্রুটি, দুর্বলতা।

ব্যক্তিত্বের এই বিকাশের জন্য উপন্যাসরচকের বিস্তৃত এবং সুগভীর অভিজ্ঞতার দরকার হয়। অভিজ্ঞতা ছাড়া কোন চরিত্রের আন্তর উদ্ঘাটন ঘটে না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন চরিত্র তার আন্তরিক সমস্যা নিয়ে প্রতিভাত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত চরিত্রটির সার্থক রূপায়ণ ঘটছে না। উনিশ-শতকের পরবর্তী বিশ্বসাহিত্যের তাই মূল লক্ষণ ঘটনা-বিবৃতি নয়, চেতনাপ্রবাহ (stream of conciousness) নিয়ে নাড়াচাড়া করা। আধুনিক উপন্যাস সেই অর্থে ঘটনা-বিরল কিন্তু আভ্যন্তরীণ বিচিত্র অভিঘাতে তা শানানো ছুরির মত দীপ্ত এবং ধারালো। অনভিজ্ঞতা সাহিত্যকে পঙ্গু করে তোলে, অন্যদিকে অভিজ্ঞতাই পারে সাহিত্যের কেন্দ্রে যথার্থ গতি সঞ্চার করতে। অভিজ্ঞতার এই জোরেই শরৎচন্দ্রের পরবর্তী বাংলা-উপন্যাসে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়—তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ এবং মানিক এমনভাবে আলোড়ন এনেছেন। এই তিন ঔপন্যাসিক যেন তাঁদের উপন্যাসের চরিত্রকে চিনিয়ে দিয়েছেন তাঁদের অত্যন্ত আপন তিনটি নদীর দ্বারা—যথাক্রমে কোপাই, ইছামতী এবং পদ্মা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে গল্পকথনই ঔপন্যাসিকের একমাত্র লক্ষণ নয়। আরো কতকগুলি উপাদানের মত কাহিনীও উপন্যাসের একটি মূল উপাদান। ফরস্টার সাহেব যে-সাতটি কৌণিকে উপন্যাসের উপাদানগুলিকে বিন্যস্ত করতে চেয়েছেন তা হল—The Story (কাহিনী), People (মানুষ), The Plot (প্লট), Fantasy and Prophecy (কল্পনা এবং ভাববাণী), Pattern and Rhythm (ধরন এবং ছন্দ)।

একথা অনস্বীকার্য কাহিনীই হল উপন্যাসের মুখ্য উপাদান। একটি গল্প বলার প্রবণতা প্রায় সব উপন্যাসেই

ঠক চাচা ও ঠক চাচী

থেকে গেছে। এমনকি আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসেও একটা ক্ষীণ গল্পসূত্র আবিষ্কার করা যায়। এই কাহিনী জীবনের কাহিনী তবে একেবারেই যে জীবনের প্রতিফলনমাত্র তা নয়। উপন্যাসের কাহিনী জীবনকে ভিত্তি করে আরেক নতুন জীবনের সন্ধান দেয়—যে জীবনে কল্পনার একটা বিরাট ভূমিকা থেকে গেছে। যেমন ধরা যাক 'রাজসিংহ' উপন্যাসের কথা। এখানে রাজসিংহ-চঞ্চলকুমারী-ঔরঙ্গজেবের কাহিনীটিতে ইতিহাসের একটি সূত্র থাকলেও দরিয়া - মবারক-জেবউন্নিসার কাহিনীটিতে লেখকের কল্পনার ছোঁয়াই প্রবল। কিন্তু তবুও গোটা উপন্যাসের 'এপিক কাব্য'-র 'লিরিক ভূমিকা'টুকু নিঃসন্দেহে অনেক সময়ে অনেক বেশি উপভোগ্য। আসলে এখানে আবার সেই মানুষের কথা। যে মানুষকে নিয়ে উপন্যাস তাকে ঔপন্যাসিক আগাগোড়া পর্যবেক্ষণ না করলে সেই মানুষ উপন্যাসের চরিত্র পেতে পারে না। যেমন হয়েছে গোরা, বা শচীন বা কুমুদিনী—যেমন হয়েছে সর্বজয়া বা শশি ডাক্তার। এই মানুষ কিছু করে অর্থাৎ সে ক্রিয়াশীল। মানুষ কেমন করে তার সন্ধানের দায় প্লটের। একটি উপন্যাসের যেসব ঘটনায় বর্ণনা কাহিনীতে স্থান পায় তাদের কার্যকারণ আবিষ্কার প্লটের উদ্দেশ্য। এই কার্যকারণগুলিকে কয়েকটি ভাগে বিশেষভাবে বিন্যস্ত করা যায় এবং এই বিন্যাসের ভঙ্গিগুলিকে আমরা স্বচ্ছন্দে বিশ্লেষণ করতে পারি কয়েকটি জ্যামিতিক আকারের দ্বারা। যেমন ধরা যাক, বৃত্তাকার প্লটের কথা। যেখানে একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে যাত্রা করে আবার সেখানেই ফিরে আসা যায়। আবার কোথাও কোথাও প্লট মাকড়সার জালের মত ছড়িয়ে পড়ে। কোন কোন উপন্যাসে গোটা কার্যকারণটাই একটা শৃংখলের মত কাজ করে। কোথাও আবার একটি বিশেষ রূপ দেখা যায় প্লটের।

উপন্যাস রচনার বিভিন্ন কৌশল এবং বিষয়ের ভিত্তিতে উপন্যাসকে কয়েকটি শ্রেণীর মধ্যে ফেলে অনেক সময়ে আমরা বিচার করি। যেমন বিবৃতিমূলক বা বর্ণনাত্মক, আত্মজৈবনিক, পত্রোপন্যাস, আত্মকথনমূলক, ডায়ারি-আকৃতি, বিভিন্ন চরিত্রের বিবৃতি-অনুসারী প্রভৃতি। বাংলায় উপন্যাসের গড়ন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা খুব বেশি না হলেও হয়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই গঠনের মধ্যে ভাঙচুর এনেছেন বারবার। তা নাহলে 'গোরা'র মহাকাব্যিক বিশালতার পর 'চতুরঙ্গে'র মিতকথনে তিনি এমনভাবে পৌঁছে যেতে পারতেন না। আবার আকার যে উপন্যাসকে চেনার কোন মাপকাঠি নয় তাও রবীন্দ্রনাথই দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর 'নষ্টনীড়' গল্পগুচ্ছে স্থান পেয়েছে অথচ 'মালঞ্চ' বা 'দুই বোন' উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর 'যুগলাঙ্গুরীয়' বা 'রাধারাণী'কে উপন্যাসই বলেছেন। কিন্তু তখনও আমরা ছোটগল্পের সঙ্গে পরিচিত হইনি। তাই বাধ্য হয়েই বঙ্কিমকে হয়তো উপন্যাস নামটা ব্যবহার করতে হয়েছিল। সে বাধ্যতা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের সময় আর ছিল না। বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর আত্মকথনে উপন্যাসের যে গতি তাকেও বঙ্কিমই প্রথম ধরতে পেরেছিলেন তাঁর 'রজনী' উপন্যাসে। জীবনকে নিয়ে যেহেতু উপন্যাস, জীবনীকে নিয়েও বটে। তাই কোন বিখ্যাত ব্যক্তিকে নিয়ে লেখা উপন্যাসের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। অনেক সময়ে কোন ব্যক্তিকে অন্য নামের আড়ালে উপস্থিত করা হয়েছে। আত্মজৈবনিক উপন্যাসও বেশ কিছু লেখা হয়েছে এবং হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে অনেক সময়ই লেখক নিজে কোন একটি চরিত্রের আড়ালে লীন হয়ে থাকেন। কখনও আবার কোন চরিত্রই গোটা উপন্যাসের কথক হয়ে ওঠে—গোটা উপন্যাসটাকে তখন বলা যায়, আত্মকথনমূলক।

কেবল বলবার ধরনের বিভিন্নতায় নয়, বিষয়বস্তুর তারতম্যেও উপন্যাসের নানা শ্রেণীবিভাগ করা যায়। যেমন ঐতিহাসিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক। এছাড়া আধুনিক সাহিত্যের আরও দুটি উল্লেখযোগ্য ভাগ—শিশু বা কিশোর উপন্যাস এবং গোয়েন্দা-উপন্যাস। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় বিষয় ঔপন্যাসিকদের সামাজিক—অধুনা মনস্তাত্ত্বিকও বটে। ফ্রয়েড, ইয়ুং-এর প্রভাব সাহিত্যে পড়বার পর থেকে সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক প্রায়শই মিলেমিশে গেছে। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ'-এর মূল সমস্যা ব্যক্তিমানসের হয়েও কোথায় তা যেন সামাজিকও বটে। কারণ, ব্যক্তি তো কোন নিরালম্ব সত্তামাত্র নয়—ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের যোগ ঘনিষ্ঠ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' বা একেবারে সাম্প্রতিককালে বিমল কর, সমরেশ বসু, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মত লেখকদের রচনাতেও এরকম মিলেমিশে যাওয়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। কিশোর ও শিশু উপন্যাস ইদানীং বেশ জনপ্রিয়। গোয়েন্দা-কাহিনীও বটে। বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ঘনাদা, টেনিদা বা ফেলুদার কয়েকজন দাদার জনপ্রিয়তা তো বেশ হৈ-চৈ ফেলে দেয় মাঝে মাঝে।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে উপন্যাসের আরেকটি বড় অংশ আঞ্চলিক। কোন অঞ্চলকে নিয়ে এবং অনেক সময়েই ঐ অঞ্চলের উপভাষাকে অনেক জায়গায়, বিশেষত, কথোপকথনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে বেশ কিছু উপন্যাস লেখা হয়েছে। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস', সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' অমরেন্দ্র ঘোষের 'চরকাশেম', অদ্বৈত মল্ল বর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' বা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী-বাঁকের উপকথা' এ জাতীয় উপন্যাস।

একথা ঠিক যে প্রথম বাংলা উপন্যাস লেখার বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা 'আলালের ঘরের দুলালে' আছে। এর কাছে যেসব নকশা (হুতোম প্যাঁচার নকশা এর মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত), ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাগুলি (নববাবুবিলাস, নববিবিবিলাস, কলিকাতা কমলালয়), বা হানা ক্যাথরীন মুলেন্সের (ফুলমণি ও করুণার বিবরণ) রচনাগুলিতে যে বিচ্ছিন্ন প্রয়াস হয়েছে আলাল তার তুলনায় অনেক সংহত। তবুও আলাল কেন উপন্যাস নয় তার সবচেয়ে বড় যুক্তির জায়গাটা হল, আলালে কেবল মানুষের চরিত্রের একটা দিকই প্রতিভাত, অন্যদিকের আভাসমাত্র নেই। যে ভাল সে আগাগোড়া ভাল, যে খারাপ সে আগাগোড়া খারাপ এরকম বীক্ষণ উপন্যাসের হওয়া উচিত নয়। দোষে-গুণে, প্রেমে-বিরহে, আনন্দ-বেদনায় মেশানো মানুষের কথা নিয়েই তো উপন্যাসের সার্থকতা। যে সার্থকতা আংশিকভাবে দাবি করতে পারে 'দুর্গেশনন্দিনী'। যে 'দুর্গেশনন্দিনী' সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন 'যে পথ দিয়ে উহার অশ্বারোহী পুরুষটি অশ্বচালনা করিয়াছিল তাহা প্রকৃতপক্ষে রোমান্সের রাজপথ এবং বঙ্গ উপন্যাসে প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রই এই রাজপথের রেখাপাত করিয়াছিলেন।' এইপথ ধরেই আজ বাংলা উপন্যাস বিশ্বসাহিত্যের দরবারে হাজির হয়েছে। আজ সে সমৃদ্ধ, নানা বুদ্ধিবৃত্তি এবং হৃদয়বৃত্তির বিশ্লেষণে ও আলোতে বিচিত্র তার সাফল্যের রাজপথ। □

সাহিত্য-ধাঁধা

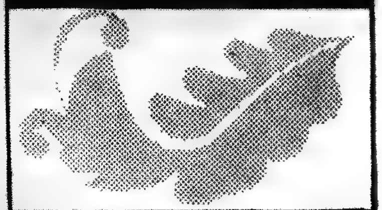

প্রথম সংখ্যা থেকেই আমাদের পত্রিকার সাহিত্য ধ'াধা বিভাগটি পাঠক-পাঠিকাদের মন কেড়েছে। নির্ভুল ও ভুল উত্তরসহ চিঠি এসেছে প্রায় শ'চারেক। আমরা আনন্দিত ও অভিভূত। অংশগ্রহণকারীদের সবাই পুরস্কৃত হবেন না নিশ্চয়ই কিন্তু অংশগ্রহণের উদ্যমটুকু আদৃত হবে।

কেউ কেউ অভিনন্দন জানিয়েছেন এই বলে যে, নতুন ক'রে তাঁদের সাহিত্য-জিজ্ঞাসাকে আমরা উসকে দিচ্ছি। অনেকে জানিয়েছেন, চাকুরি জীবনের একঘেয়ে যান্ত্রিকতায় সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক যখন ক্ষীণ হয়ে আসছিল তখন সাহিত্য-ধ'াধা বিভাগটি তাঁদের পক্ষে সেতুবন্ধের কাজ করবে। আমরাও ঠিক তাই চাইছি।

গ্রাম ও মফস্বল থেকে চিঠি লিখে অনেকে অনুযোগ করেছেন, ডাকযোগে তাঁরা কখনই কলকাতার প্রতিযোগীদের আগে উত্তর পাঠাতে পারবেন না। অতএব সাহিত্য-ধ'াধার জয়মাল্য বরাবর থাকবে কলকাতা-বাসীদের শিরোধার্য। খুব সংগত অনুযোগ।

আরেকজন পত্রদাতা শ্রীঅনিন্দ্য রায় লিখেছেন : 'আপনারা এই প্রতিযোগিতায় সমস্ত পাঠকদের সুযোগ দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু তাতে আসল পাঠকদের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে। কারণ অনেকে শুধু প্রতিযোগিতার অংশটি কোনো স্টল বা দোকান থেকে দেখে নিয়ে প্রতিযোগিতায় যোগ দেবেন। তাদের তো আর পাঠক বলা যেতে পারে না সুতরাং আমার মতে কুপন পদ্ধতির প্রচলন করাই ভালো।' খুব ভালো প্রস্তাব।

সর্বদিক ভেবে বিবেচনা করে আমরা এই বারের সাহিত্য-ধ'াধা বিভাগের নিয়মাবলী একটু বদলে দিচ্ছি। সংযোজিত হচ্ছে নতুন কিছু নিয়ম। বর্জিত হচ্ছে পুরনো কিছু নিয়ম।

সাহিত্য ধাঁধার নতুন নিয়ম

১। এখন থেকে সাহিত্য ধাঁধা বিভাগে একমাত্র তাঁদের উত্তরই গ্রহণ-যোগ্য হবে যাঁরা এই পৃষ্ঠায় মুদ্রিত কুপনটি পূরণ করে উত্তরের সঙ্গে পাঠাবেন।

২। এখন থেকে কলকাতা ও হাওড়ার পাঠক-পাঠিকাদের উত্তর পাঠাতে হবে পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে এবং মফস্বলের ক্ষেত্রে ১৫ দিনের মধ্যে।

৩। এবার থেকে সাহিত্য ধাঁধার প্রতিযোগীদের দু'টি পুরস্কার দেওয়া হবে। কলকাতা-হাওড়ার উত্তর দাতাদের মধ্যে থেকে একজনকে এবং মফস্বলের উত্তর দাতাদের মধ্যে থেকে একজনকে। দুটি পুরস্কারের অর্থমূল্য হবে কুড়ি টাকা করে।

৪। উত্তর কাগজের একপিঠে স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাবেন। সঙ্গে নাম, ঠিকানা। খামের উপর লিখে দেবেন 'সাহিত্য ধাঁধা'। উত্তর পাঠাতে হবে শিলাদিত্য সম্পাদকের নামে কার্যালয়ের ঠিকানায়।

৫। পুরস্কার যিনি পাবেন তাঁকে পত্রিকা দপ্তর থেকে ডাকযোগে পুরস্কার মূল্য পাঠানো হবে পত্রিকা প্রকাশের বারো সপ্তাহের মধ্যে। এ ব্যাপারে তাগাদার প্রয়োজন নেই।

পাঠক, আপনি যে শুধু উপন্যাস পড়তেই ভালোবাসেন তা তো নয়! এখন নাটকও তো খুব জনপ্রিয়। এবারের 'সাহিত্য-ধ'াধা' তাই নাটক বিষয়ক। যে-সব নাটক থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তা মুদ্রিত আকারে পাওয়া যায়। এবারে দেখুন আপনাদের ভাগ্যদেবী জয়লক্ষ্মীর বেশে ধরা দেন কিনা। অগ্রিম শুভেচ্ছা নিন।

এবারকার নতুন ধাঁধা

১। 'পাবলিক? —এই মাঝ রাতে পাবলিক এখন থিয়েটার দেখে-টেখে গিয়ে টেনে ঘুম লাগাচ্ছে। তুমি কি ভাবছো পাবলিক আমাকে এমনই ভালোবাসে যে ঘুমের ঘোরে আমাকে স্বপ্ন দেখছে? —পাগল! আমাকে আর কেউ চায় না কালীনাথ, কেউ না—আমার ঘর-সংসার, বৌ-ছেলেমেয়ে কেউ নেই—কিছু নেই—'

বহুপরিচিত এই রূপান্তরিত নাটকটি কে রূপান্তর করেছেন? রূপান্তরিত নাটকটির কী নাম-করণ করা হয়? নাটকে ঐ কথাগুলো কে বলেছিল? প্রথম কোথায় এবং কবে নাটকটি অভিনীত হয়?

২। 'ওমা, মাগো, এটা ছোট বাসনা নিয়ে আসা। শোনলাম পুরুনো বাসনকোসন বেচে দিচ্ছেন? —বুড়ো জমিদারবাবুর এটা নুপোর গড়গড়া ছিল! এত্তোখানি গড়গড়া—এত্তোখানি পাকানো নল—সেই নল মোচের নিচে গু'জে জমিদারবাবু এমুনই করে তামুক টানতেন! গড়গড়াটায় বড্ড নোভ আমার! —কত টাকা হলে আমারে দেবেন মা?'

কার লেখা? কোন নাটক থেকে নেওয়া হয়েছে? নাটকে একথা কে কাকে বলেছিল? প্রথম কবে কোথায় কাদের প্রযোজনায় ও কার নির্দেশনায় নাটকটি অভিনীত হয়েছিল? নাটকটির মূল কথা কি?

৩। 'এই সব কথা বলার সুযোগ পেলে ববুণদার কলম জোর ছোটে, তা বড় লোকেরা গরিবদের মারবে এতো কিছু নতুন কথা নয়—ওদের মারটা তবু বুঝি—কিন্তু নন্দ বাউড়ি? সে তো বলতে গেলে আর একটা আমি—সে কি বলে দাসুবাবুর কাছে চুকলি খেয়ে আমার কাজটা বাগিয়ে নিলো—।'

কার রচনা? কোন নাটক থেকে নেওয়া হয়েছে? নাটকে এই কথাগুলো কে বলেছিলো? প্রথম কবে কোথায় নাটকটি অভিনীত হয়?

৪। 'দু'হাতে সামনে যাকে পেয়েছো তার সর্বস্ব মুড়িয়ে খেয়েছো! বুঝেছো, একটু রয়ে সয়ে খেতে হয়! ওজন বুঝে চলতে হয়! যে ডালে বসে পা দোলাবে সে ডালের গোড়ায় কোপ মারতে নেই। পরিণামে মহাকবি বাল্মীকির দশা হয়—'

নাট্যকার কে? নাটকের নাম কি? উল্লেখিত কথাগুলো কার কথা? কাকে বলেছিল? নাটকটি প্রথম কারা কবে কোথায় অভিনয় করেছিল?

উত্তর নির্দেশিকা

সাহিত্য ধ'াধা (২)

১। 'আগামী' / সুকান্ত ভট্টাচার্য / 'ছাড়পত্র';

২। 'ঘর ছাড়া' / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / 'সেঁজুতি';

৩। 'ক্রেসিডা' / বিষ্ণু দে / 'চোরাবালি';

৪। 'পরস্পর' / জীবনানন্দ দাশ / 'ধূসর পাণ্ডুলিপি';

৫। 'প্রস্তাব, ১৯৪০' / সুভাষ মুখোপাধ্যায় / 'পদাতিক';

৬। 'বুকের মধ্যে রাত্রি' / নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী / 'খোলামুঠি';

৭। 'কবিতার সত্যে' / শক্তি চট্টোপাধ্যায় / 'প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই';

৮। 'জাতক (১)' / সুধীন্দ্রনাথ দত্ত / 'সংবর্ত';

৯। 'আমার খানিকটা দেরি হয়ে যায়' / সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় / 'আমি কীরকমভাবে বেঁচে আছি';

১০। 'তিনটে গুলি' / 'ফেরারী ফৌজ' / প্রেমেন্দ্র মিত্র;

কুপন

নাম :

ঠিকানা :

পাঠানোর তারিখ :

গত সংখ্যার সাহিত্য ধ'াধায় প্রথম সঠিক উত্তর পাঠিয়ে পুরস্কার জিতলেন স্বপন চক্রবর্তী বনগাঁ / ২৪ পরগণা

বিশিষ্ট বাঙ্গালী কবি : নির্বাচিত কবিতা

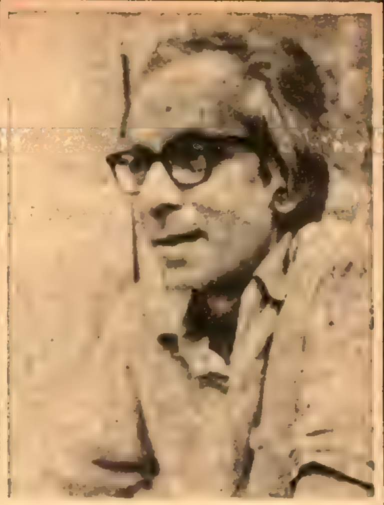

সমর সেন

কবির জন্ম ১৯১৬. কলকাতায় : পিতামহ ঃ বিশ্রুত আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন, যাঁর আদি নিবাস ঢাকা. মানিকগঞ্জের সুয়াপুর। পিতা অরুণচন্দ্র ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক. মাতা চন্দ্রমুখী অসামান্যা সুন্দরী, সুগৃহিণী. বঙ্কিম-বান্ধব জগদীশনাথ রায়ের ('বিষবৃক্ষ' এঁকেই উৎসর্গ) দৌহিত্রী : স্ত্রী ঃ সুলেখা সেন। স্কটিশচার্চ থেকে ইংরেজি অনার্সে কৃতিত্বসহ বি.এ. (১৯৩৬), পরে তুল্য সাফল্যে এম.এ.। কিছুদিন অধ্যাপনা (কাঁথি পি. কে. কলেজ, দিল্লি কমার্সিয়াল কলেজ) : কলকাতায় এক বিজ্ঞাপনী অফিসে মাত্র সাতদিন : পুনরায় দিল্লি ঃ রেডিও-র সংবাদ বিভাগে সাড়ে পাঁচ বছর। ১৯৪৯ নভেম্বরে 'স্টেটসম্যান'-এ সংবাদ-সম্পাদনায় : ১৯৫৭ ফেব্রুয়ারি সপরিবারে মস্কো যাত্রা—'বিদেশি ভাষার সাহিত্য প্রকাশালয়', এখন 'প্রগতি প্রকাশালয়' সংস্থার বাংলা বিভাগে। শতবার্ষিক রবীন্দ্রনাথের রুশী সংস্করণে সক্রিয় ভূমিকা-গ্রহণ। 'নাও' পত্রিকা সম্পাদনা ঃ ১৯৬৪-৬৭ :১৯৬৮ থেকে অদ্যাবধি 'ফ্রণ্টিয়ার'-সম্পাদক।

কবিজীবনের সূত্রপাত ও সমাপ্তি নাটকীয়। ১৮ বছর বয়সেই রীতিমতো সংহত. নাগরিক বিদ্যাবুদ্ধিজীবী 'মধ্যবিত্তমাদির জগতে'র শ্লেষাক্রমণাত্মক তীব্র সমালোচক-কবিরূপে শুদ্ধ গদ্যকবিতায় যাঁর "চমৎকার" বেতের মতো আবির্ভাব. তাঁরই ত্বরিত অবসান ও প্রস্থান মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে ! প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ঃ কয়েকটি কবিতা ১৯৩৭ : গ্রহণ ১৯৪০ ; নানাকথা ১৯৪২ ; খোলা চিঠি ১৯৪৩ ; তিন পুরুষ ১৯৪৪। প্রায়-সমগ্র 'সমর সেনের কবিতা' ১৯৫৪। "পরে কয়েকটি টুকিটাকি কবিতা"।

এখনও তিনি এক ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব-পর্বান্তর রূপায়ণের নবীন-'প্রবীণ' নৈপুণ্যে 'প্রখর' কবি. একটি বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব বলে বিবেচ্য। ছাত্রাবস্থায়ই 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম বর্ষে (যুগ্ম-সম্পাদক ঃ বুদ্ধদেব ও প্রেমেন্দ্র) তিনি সহ-সম্পাদক। দ্বিতীয় বর্ষে প্রেমেন্দ্রর বিদায়-গ্রহণে যুগ্ম-সম্পাদক। বিষ্ণু দে-র মধ্যস্থতায় সুধীন্দ্র-সান্নিধ্য, বিদগ্ধ 'পরিচয়ে'র আড্ডা ও লেখালেখি। প্রথম কাব্যগ্রন্থ বেরোতেই বিপুল অনুকূল সমালোচনা ঃ বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে, ধূর্জটিপ্রসাদ। তাঁর সবচেয়ে বড়ো ও কড়া সমালোচক তিনি নিজেই। এজন্য 'বাবু বৃত্তান্ত' ছাড়াও অবশ্য পাঠ্য তাঁর In Defence of the Decadents প্রবন্ধ (১৯৩৯), অংশবিশেষ ঃ "In these times of dereliction and dismay of wars, unemployment and revolutions, the decayed side of things attracts us most. The boredom and horror, rather than the glory of life is our immediate reality."

যুগপৎ নিঃসঙ্গ অবক্ষয়, সমষ্টি-প্রগতি, সমাজ-বিপ্লবজড়িত তাঁর বিচিত্রাবস্থানী বহুবিরোধময় বাস্তবিক ক্লান্তি, সংশয়, প্রতিশ্রুতি-প্রতিশ্রুতিভঙ্গের সংক্রান্ত ইতিহাসই সমর সেনের কবিতা।

একটি মেয়ে

আমাদের স্তিমিত চোখের সামনে
আজ তোমার আবির্ভাব হলো :
স্বপ্নের মতো চোখ, সুন্দর, শুভ্র বুক,
রক্তিম ঠোঁট যেন শরীরের প্রথম প্রেম,
আর সমস্ত দেহে কামনার নির্ভীক আভাস :
আমাদের কলুষিত দেহে
আমাদের দুর্বল, ভীরু অন্তরে
সে উজ্জ্বল বাসনা যেন তীক্ষ্ণ প্রহার।

মৃত্যু

(অংশ) ৫
পিচের পথে অন্ধকার, দীর্ঘ গাড়ি.
মন্দিরের বিবর্ণ দুঃস্বপ্ন,
লজ্জাহীন গণিকার সলজ্জ প্রণয়

সূর্য অস্ত গেল, সূর্যদেব কোন দেশে—
এখানে সন্ধ্যা নামল,
শীতের আকাশে অন্ধকার ঝুলছে শূয়রের
চামড়ার মতো,
গলিতে গলিতে কেরোসিনের তীব্র গন্ধ,
হাওয়ায় ওড়ে শুধু শেষহীন ধুলোর ঝড় :
এখানে সন্ধ্যা নামল শীতের শকুনের মতো।

মধ্যরাত্রে
ধাবমান ট্রেনের মন্থর শব্দ :
আমাদের মৃত্যু হবে পাণ্ডুর মতো।

স্বর্গ হতে বিদায়

(অংশ) ৩
ম্লান হয়ে এল রুমালে
ইভনিং ইন-প্যারিসের গন্ধ--
হে শহর হে ধূসর শহর !
কালিঘাট ব্রিজের উপরে কখনো কি শুনতে পাও
লম্পটের পদধ্বনি
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
হে শহর হে ধূসর শহর !
লুব্ধ লোকের ভিড়ে যখন তুমি নাচো
দশ টাকায় কেনা কয়েক প্রহরের হে উর্বশী,
তখন শাড়ির আর তাড়ির উল্লাসে,
অমৃতের পুত্রের বুকে চিত্ত আত্মহারা
নাচে রক্তধারা
আর দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদ ওঠে
হে শহর হে ধূসর শহর।

'আমি নহি পুরুরবা হে উর্বশী'
মোটরে আর বারে

আর রবিবারে ডায়মণ্ডহারবারে
কয়েক টাকায় কয়েক প্রহরের আমার প্রেম,
তারপর সামনে শূন্য মরুভূমি জ্বলে
বাঘের চোখের মতো।

মদনভস্মের প্রার্থনা

মাস্তুলের দীর্ঘ রেখা দিগন্তে
জাহাজের অদ্ভুত শব্দ
দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে
বিষণ্ণ নাবিকের গান।
সমস্ত দিন কাটে দুঃস্বপ্নের মতো :
রাত্রে নিবিড় প্রেম ; কুসুমের কারাগার।
কত দিন, কত মন্থর, দীর্ঘ দিন,
কত গোধূলি-মদির অন্ধকার,
কত মধুরাতি রভসে গোঙায়নু,
আজ মৃত্যুলোকে দাও প্রাণ
দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে
বিষণ্ণ নাবিকের গান।

একটি বেকার প্রেমিক

চোরাবাজারে দিনের পর দিন ঘুরি

সকালে কলতলায়
ক্লান্ত গণিকারা কোলাহল করে,
খিদিরপুর ডকে রাত্রে জাহাজের শব্দ শুনি ;
মাঝে মাঝে ক্লান্তভাবে কী যেন ভাবি—
হে প্রেমের দেবতা, ঘুম যে আসে না,
সিগারেট টানি :
আর শহরের রাস্তায় কখনো বা প্রাণপণে দেখি
ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক।
আর মদির মধ্যরাত্রে মাঝে মাঝে বলি :
মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও,
পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো
হানো ইস্পাতের মতো উদ্যত দিন।
কলতলার ক্লান্ত কোলাহলে
সকালে ঘুম ভাঙে
আর সমস্তক্ষণ রক্তে জ্বলে
বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি।

একটি বুদ্ধিজীবী

Jupiter first deprives of reason those whom he wishes to destroy

যাযাবর মেঘ এলো পাহাড়ের বন্দরে,
আর আমাদের জাহাজের উপরে
সেই গভীর পাহাড় থেকে দুরন্ত ঝড় এলো :
শান্তি নেই,
লোকারণ্যে ঐশ্বর্যের সূর্য ছড়ায় ছায়ার দুঃস্বপ্ন।
বৃদ্ধ মহাকাল
ক্ষয়িষ্ণু জীবনে এনেছে জরার যন্ত্রণা ;
তাই তো গলিত দেহের উপরে গভীর রাত্রে
ঘোরে
দুঃস্বপ্নের নিঃশব্দ শকুন,
নিষ্ফল দিন কাটে ক্ষয়রোগীর কামার্ত প্রার্থনায় ;
তাই ঘরে ব'সে সর্বনাশের সমস্ত ইতিহাস
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো বিচলিত শুনি,
আর ব্যর্থ বিলাপের বিকারে বলি :
আমাদের মুক্তি নেই, আমাদের জয়াশা নেই ;
তাই ধ্বংসের ক্ষয়রোগে শিক্ষিত নপুংসক মন
সমস্ত ব্যর্থতার মূলে অবিরত খোঁজে
অতৃপ্তরাতি উর্বশীর অভিশাপ।
মাথার উপরে আসন্ন পৃথিবীর
অন্ধকার-বিরহিত সূর্য-সংকৃত আকাশ,
তবু সত্য শুধু পতন-বন্ধুর পথ,
বন্ধ্যা ভূমি আর নিষ্ঠুর দিগন্ত।

শবযাত্রা

(অংশ)

৬
যখনি ভেবেছি, নতুন মোড় নিলাম
হাওয়ায় উড়েছে ধুলো,
মনের আহার্যে বসেছে মাছি,
আর আগেকার লজ্জা, ভয়, গর্ব,
আর সব ব্যর্থতা নিয়েছে সঙ্গ ;
গ্লানিটানা অদৃষ্টলিপি,
দিনশেষে কালের মেহেরবানী যে মামুলী শান্তি,
তাতে হয়তো শুধু প্রভুদের অধিকার।

আজ আঁধির পর রুক্ষমুখ আকাশ স্নিগ্ধ হয়ে
আসে,
শরীরের খাঁজে নমনীয় অন্ধকার,
চোখে সুর্মা টেনে সৌখীন সন্ধ্যা এলো ;
সর্বনাশা যত মেঘ দিগন্তে বন্দী,
এরই মধ্যে পুরাতন অশান্তি আমাকে ঘেরে,
দিনশেষের জানোয়ার।

৭
শহর ছেড়ে চলি অনেক দূরের গ্রামে।
সেখানে দেখি তুখোড় মহাজন,
তার তৃতীয় নয়নের সামনে
জীর্ণ বলদে চষা মাঠে সোনালী ফসল ফলে না,
দিনে দিনে পশ্চিমের রুক্ষ শক্তিশেল হানে।
তাই অনেক কিষাণ আজ জমায়েত, সরবে
হাঁকে,
'লাঙল যার জমি তার।'
পড়ন্ত রোদে অনেক বুড়ো চাষা বাইরে ব'সে
উদভ্রান্ত ব্যাপার দেখে,
বৈশাখী দিন আসন্ন, তারাও জানে।

আমাদের ডালভাঙা ক্রোশের শেষ নেই,
গুমোট কাল,
একদিন ছেড়ে অন্য লজ্জাহীন দিনে হাঁটি ;
উড়ন্ত চিল আকাশে নীল বিন্দু,
এক একবার ঘুঘু ডাকে।...

নববর্ষের প্রস্তাব

(অংশ)

৩
সত্তার কৌলীন্য খোয়াবো না কোনোদিন
এ গর্বে জিইয়ে থাকে বুদ্ধিজীবীরা।
বিশ্বকে বিচলিত করার সাহস রাখে না,
চিন্তিত দর্শক, হয়তো বোঝে
দুনিয়াদারির দুর্দিন, বাজার অন্ধকার,
পথে জমকালো স্তব্ধতা ;
দ্রুতগতিক দেখে মহাত্মাদের প্রস্থান,
নিশাচরের নাচ নির্জন হাটে।

৪
ঘরে ফিরি, আলো জ্বেলে কুলুঙ্গিতে রাখি,
এ অন্ধকারে আরো অনেক অন্ধকার জমে।
চলিত সভ্যতার মোড়ে বিপরীত মতামতে
ধাঁধা লাগে,
কোন ঘাটে তরী ভিড়াই ?
নীলচে চোখ, তুঙ্গ বুক, উরুর নিম্নদেশ
অন্ধকার,
দেহস্বার্থের স্বর্গে আস্থা হারাই,
ও নিরুদ্বেগ উদ্দাম বিলাস
নতুন মানুষের জন্ম
আবার জন্ম মৃত্যু প্রেমের কারাগার রচে,
বিষে বিষ অক্ষয় হয়।
স্বার্থপর ও অর্থহীন শরীরের কারবার
যদি না গড়ি নতুন বিশ্বসংসার।

অনেক ঘাটের জল খেয়ে বুঝি
অনেক লোক যেখানে
সেখানে সত্তার নতুন সূর্য ওঠে,
কালের ঘোলাটে জলে জোয়ার লাগায়
সম্ভব হয় অনেকের খেয়া পারাপার,
গভীর জলে একের শবদেহ ডোবে।

স্মৃতিতে

ওরা কাজ করে,
দুমুঠো তোলে ঘরে,
তবে দুবেলা মুখে নয়।
রোজ ভাত ভালো নয়, ভালো নয়
পাঁচসালায় বৃথা অপচয়।

কেটেছে বিশ বছর ;
রাত কত হলো
এ প্রশ্নের মেলেনি উত্তর।
অনেকের দেহ মেদোজ্জ্বল,
অনেকের মনে পড়েছে কড়া।
ভারা ভারা ধান কাটা হয়নি সারা।

নির্বাচন ও সম্পাদনা ঃ
নিখিলকুমার নন্দী

স্বীকৃতি ঃ সুধাংশু দে (দে'জ পাবলিশিং)

পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গে প্রথমেই পাণ্ডুলিপিকারের ব্যক্তিগত অভ্যাসগুলির কথা একটু না বললে এই ভাষ্য কিছুটা শিরোনামহীন নিবন্ধের মতো ঠেকবে। কারণ, একথা অনস্বীকার্য যে, পাণ্ডুলিপির শৈলীতে লেখকের ব্যক্তিত্বের অভিক্ষেপ ঘটেই। বিশেষ করে বিভূতিভূষণের মতো বিচিত্র ব্যক্তিত্বের—যিনি প্রকাশকদের কাছ থেকে পাওয়া অর্থের নিখুঁত হিসেব রাখতেন, কিন্তু প্রাপ্ত চেক এবং নগদ টাকা আশ্চর্য ঔদাসীন্যে গুঁজে রাখতেন এখানে-সেখানে। ছ'মাস কি এক বছর পরপর প্রকাশকরাই গিয়ে খোঁজ করে বইয়ের ভিতর থেকে বা তোষকের তলা থেকে নিজেদের পাঠানো টাকা ও চেক উদ্ধার করে ব্যাংকে গিয়ে লেখকের অ্যাকাউণ্টে জমা দিয়ে আসতেন। বিভূতিভূষণের দৈনিক প্রয়োজন ছিল আনাদুয়েক পয়সা—বিড়ি বা সিগারেট কেনবার জন্য। হরিদ্বার-দিল্লি-বোম্বের মতো দূরে কোথাও যেতে না হলে যানবাহনের পরোয়া করতেন না। দশ-পনেরো মাইল রোজ এমনিই হেঁটে বেড়াতেন। বিয়ের পর নববধূকে নিয়ে ঘাটশিলা থেকে হেঁটে সুবর্ণরেখা নদী পেরিয়ে চলে গিয়েছিলেন সিদ্ধেশ্বরডুংরি পাহাড়ে ময়ূর দেখতে। সারাদিন পাহাড়ী আমলকী খেয়ে কাটিয়ে বিকেলে যখন ফিরলেন তখন নববধূর মুখ শুকিয়ে এতটুকু।

এই মানুষ বিভূতিভূষণ। উঠতেন খুব ভোরে—'ব্রাহ্মমুহূর্তে'। সূর্য ওঠবার আগেই স্নান সারা হয়ে যেত। তারপর লেখার সরঞ্জামভর্তি সুটকেশ হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। দেশের বাড়িতে থাকলে কুঠির মাঠে (শতাধিক বছর আগে এখানে নীলকুঠি ছিল), কিম্বা কোনো বড় গাছের নিচে—আর ঘাটশিলায় থাকলে সুবর্ণরেখা নদীর ধারে পাথরের উপর অথবা বনকাটি কি বুরুডি পাহাড়ের ঢালুতে বসে যখন লেখা শুরু করতেন তখন হয়ত সূর্য উঠছে।

লিখতেন প্রধানত সকালে। খুব চাপ থাকলেও বিকেলে বা রাত্রে একমাত্র দিনলিপি ছাড়া কিছু লিখতেন না।

রচনাশৈলী ও জীবনদর্শনের মতই হস্তাক্ষর বদলেছে বিভূতিভূষণের। 'পথের পাঁচালী' আর 'দৃষ্টিপ্রদীপ'-এর পাণ্ডুলিপিতে হাতের লেখা গোটা গোটা, দুটি পংক্তির মধ্যে অবকাশ বেশ স্পষ্ট ও নিয়মিত। বোঝা যায় এই যুগে লেখকের অবসর ছিল এসবের দিকে নজর দেবার। তৎপরবর্তীকালে লেখার চাপ বেড়েছে, পংক্তিবিন্যাস হয়েছে ঘনসন্নিবিষ্ট—একই মাপের কাগজে অনেক বেশি ধরেছে। কিন্তু লক্ষ করবার বিষয়—এর ফলে লেখা অপরিষ্কার হয়নি—সমান দৃষ্টিনন্দন রয়েছে। বিভূতিভূষণের ছিল পাকা হস্তাক্ষর—ঈষৎ তির্যক, কৌণিক গঠন

মৃত্যু-মুহূর্তে বিভূ
আজ আমার

অক্ষরগুলির। কথনো কখনো কাগজে
পরিপ্রেক্ষিতে পংক্তিগুলি বাঁকা, কিন্তু পর
স্পরের সঙ্গে নিখুঁতভাবে সমান্তরাল
বানান ভুল হতো না (এ দাবি একম
রাজশেখর বসু ছাড়া কম লেখকই রাখেন)।

লেখাটা যেন খেলার মতো ছিল। টলস
নাকি 'ওয়র অ্যানড পিস' বহুবার বদলে
ছিলেন চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপির পথে। বর্তমা
অনেক বরেণ্য সাহিত্যিকও রচনার দ্যু
ও মনোমত রূপটি আনার জন্য অনেক কাট
কুটি করে থাকেন। বিভূতিভূষণের পাণ্ড
লিপিতে কাটাকুটি থাকলেও খুবই সামান্য
যেন সংশোধন যা হবার তা মনের ভিতরে
হয়ে একেবারে প্রেস কপি বেরিয়ে আসত
পরবর্তী সময়ে যে উপন্যাস তাঁকে স্থায়ি
দেবে, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপি তৈ

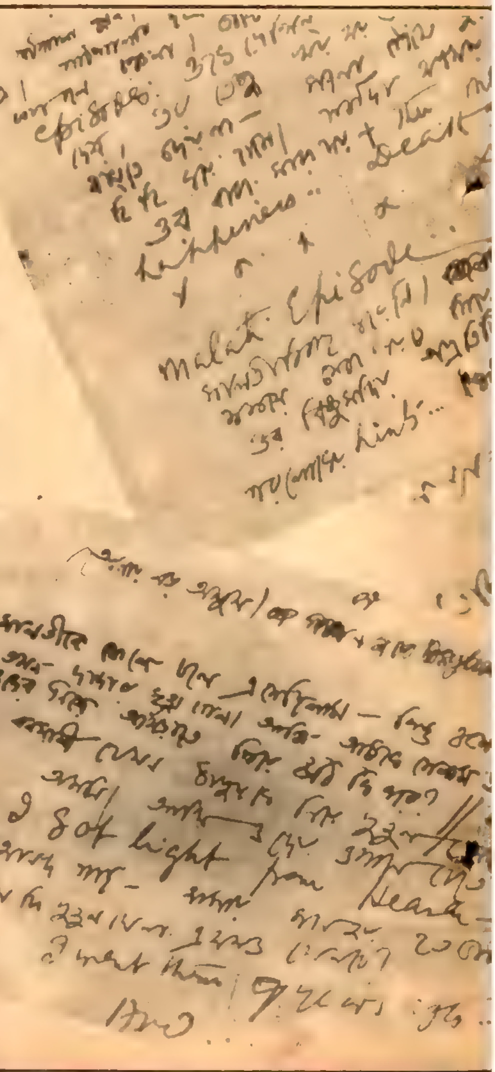

উপন্যাসের অধ্যায়ের নমুনা

ষণ বলেছিলেন ঃ
খা হলো না

বতে করতে মার্জিনে কত কি টুকিটাকি াইন লিখেছেন। 'ইছামতী' লিখছেন. র উইলিয়ম গ্রে-র গ্রামবাংলা দর্শনের দৃশ্য র্ণনার সময় মার্জিনে ছোট্ট করে লেখা—াবলু আজ ডিম খেয়েছে।' যেন ছোট াটের আগমন আর দু-বছরের শিশু পুত্রের থম ডিম আস্বাদন সমান গুরুত্ব বহন করে। ন্ত বা দেখেছেন চমৎকার মেঘ করে এসেছে ীর ওপারে, অমনি মার্জিনে তার কথা লখে ফেলেছেন।

ব্যবহার করবার কাগজের ব্যাপারে কোনো ংস্কার রাখতেন না। বিদেশি প্রকাশন ংস্থার প্রচার পত্রের উল্টোদিকে, পুরনো ামের ভাঁজ খুলে বা প্রথম জীবনে কাজ রতেন যেখানে, সেই খেলাতবাবুদের জমিদারি ংক্রান্ত আদায়-বইয়ের শাদা পাতায় প্রাণ

শিপটন সাহেবের মৃত্যুর বর্ণনা

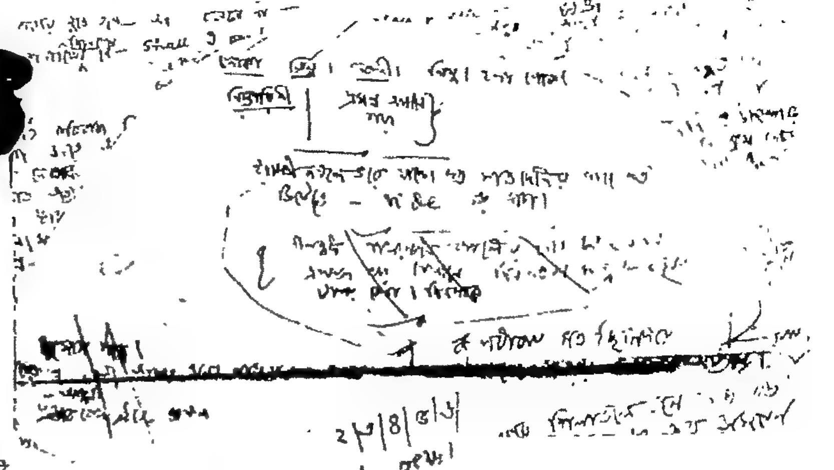

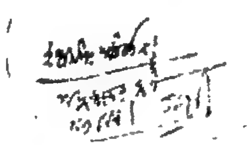

স্ত্রী রমা দেবীকে লেখা চিঠি

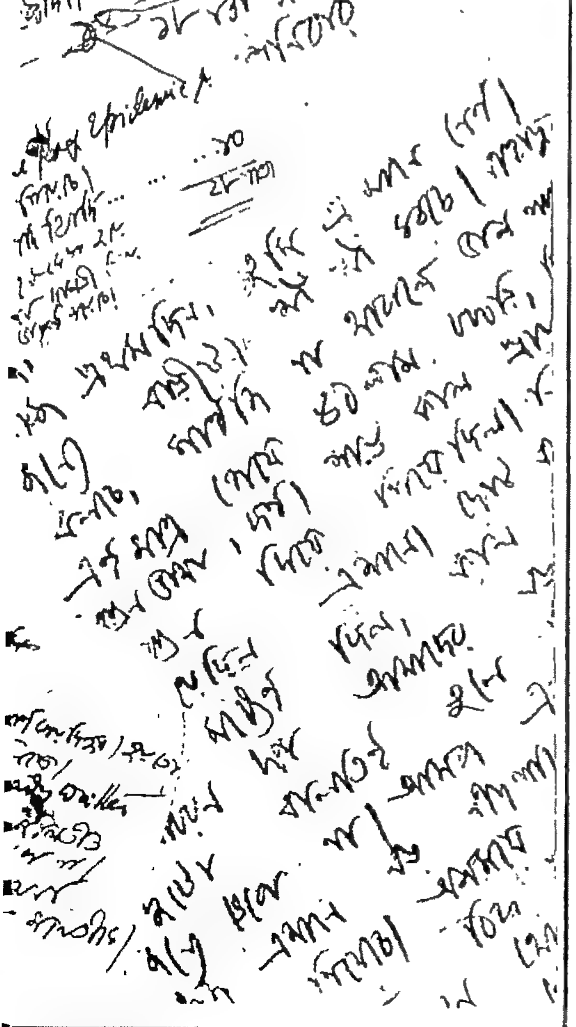

ভরে জীবনের শ্রেষ্ঠ লেখাগুলি লিখেছেন। সে সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা খাতা দেখতেন। নম্বর তোলবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষকদের নিউজ প্রিন্টের উপরে ছাপা খসড়া মারকসিট দিত। 'দৃষ্টিপ্রদীপ' তো প্রায় পুরোটাই তার অপরদিকে লেখা। এক মাপের লাল, সবুজ, গোলাপী কাগজ কোথাও পেয়েছিলেন কিছু। তাতে লেখা হয়ে গেল 'ইছামতী'। এভাবে পথচলতি হাতে আসা টুকরো-টাকরা কাগজের বুকে বাংলা ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ ক'টি উপন্যাস ও গল্প রূপ পেল। এদিকে প্রকাশকরা লিখবার জন্য সোনার জলে নাম লেখা বাঁধানো চামড়ার খাতা বাড়িতে দিয়ে যান। সে খাতার—'সোনার জলে দাগ পড়ে না, খোলে না কেউ পাতা—'

একে কি বলা যায়? কৃপণ? যে লোক ওয়াইড ওয়ারলড ম্যাগাজিনের ভিতর, তাকের উপরে পাতা খবরের কাগজের নিচে হাজার হাজার টাকার নোট রেখে ভুলে যায়—ব্যাংকে যাওয়ার মনোভাবের অভাবে যার চেক তামাদি হয়ে যায়, সে—কৃপণ? বৈষয়িক? না বোধহয়। আসলে এটাই খেলা, একটা মজা। ভিতরের ঐশ্বর্য যার অপরিমেয়, সেই তো পারে বাইরে জীবনকে সরল থেকে সরলতর করে নিতে।

ভক্তের নিত্য পূজার মতো লেখার ব্যাপারটা ছিল প্রাত্যহিক। ১৯৫০ খৃস্টাব্দের ১ নভেম্বর রাত আটটা পনেরো মিনিটের সময় যখন অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত. নাভিশ্বাস উঠছে, বারবার সহধর্মিণী রমা দেবীর দিকে তাকিয়ে বিভূতিভূষণ বলছেন—'আজ আমার লেখা হলো না, আজ আমার আর লেখা হলো না—'

তবু যা রয়ে গেল তাও তো অনেক। খামে, বিল-বইয়ের উল্টোদিকে. মারকসিটে. বাতিল দস্তাবেজে. লাল, সবুজ. গোলাপী কাগজে হাজার হাজার পাতা সুন্দর হাতের লেখা সম্বলিত পাণ্ডুলিপি। আরো লিখতে পারতেন, লেখেননি। সময় ছিল, তবু লেখেননি। আসলে বিভূতিভূষণ ছিলেন শিল্পী হিসেবে নিদারুণভাবে সচেতন. জানতেন ঠিক কোথায় থামলে ভালো দেখায়। 'পথের পাঁচালী'-র রচনারম্ভের কাল থেকে ধরলে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের সক্রিয় সাহিত্যিক-জীবনে তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা কুড়িটিরও অনেক নিচে। ছোটগল্প দু-শোর কিছু বেশি, অর্থাৎ বছরে ৮/৯টি। জেমস জয়েস নাকি সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি একাসনে বসে 'ফিনেগানস ওয়েক'-এর ক'টি লাইন নাড়াচাড়া করতেন, গ্রাহাম গ্রীন নিয়ম করে দিনে তিনশো থেকে চারশো শব্দ লেখেন। এই ভালো। বিভূতিভূষণও জানতেন বেশি লিখলেই বড় আসন পাওয়া যায় না—খামোকা প্রুফ-রিডারের অভিশাপ কুড়োতে হয়।

বিপদ হয়েছে উত্তরাধিকারীদের। এই বিপুল ও বহুমুখী পাণ্ডুলিপির সম্ভারকে কী ভাবে সংরক্ষিত করা যায় তা এক সমস্যা। বাছাই করা, আলাদা করে গুছিয়ে রাখা—অনেক কাজ। ধরুন, বিভূতিভূষণের পাণ্ডু-লিপি গুছিয়ে রাখছেন, হঠাৎ তার মধ্যে থেকে একটা সেকেন্ড ক্লাস ট্রামের টিকিট আর একটা ছেঁড়া খাম বেরিয়ে মেঝেতে পড়ল। 'না জানি কি অমূল্য সম্পদ পেলাম' ভেবে তুলে নিয়ে দেখলেন খামের গায়ে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা—'আজ বৃষ্টির পরে ভারী সুন্দর রোদ উঠেছে।' আর ট্রামের টিকিটের পিছনে ততোধিক ক্ষুদ্রাক্ষরে লেখা—'কানাই জেলে এইমাত্র টাটকা মাছ দিয়ে গেল।'

অমূল্য সম্পদ নয়?

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

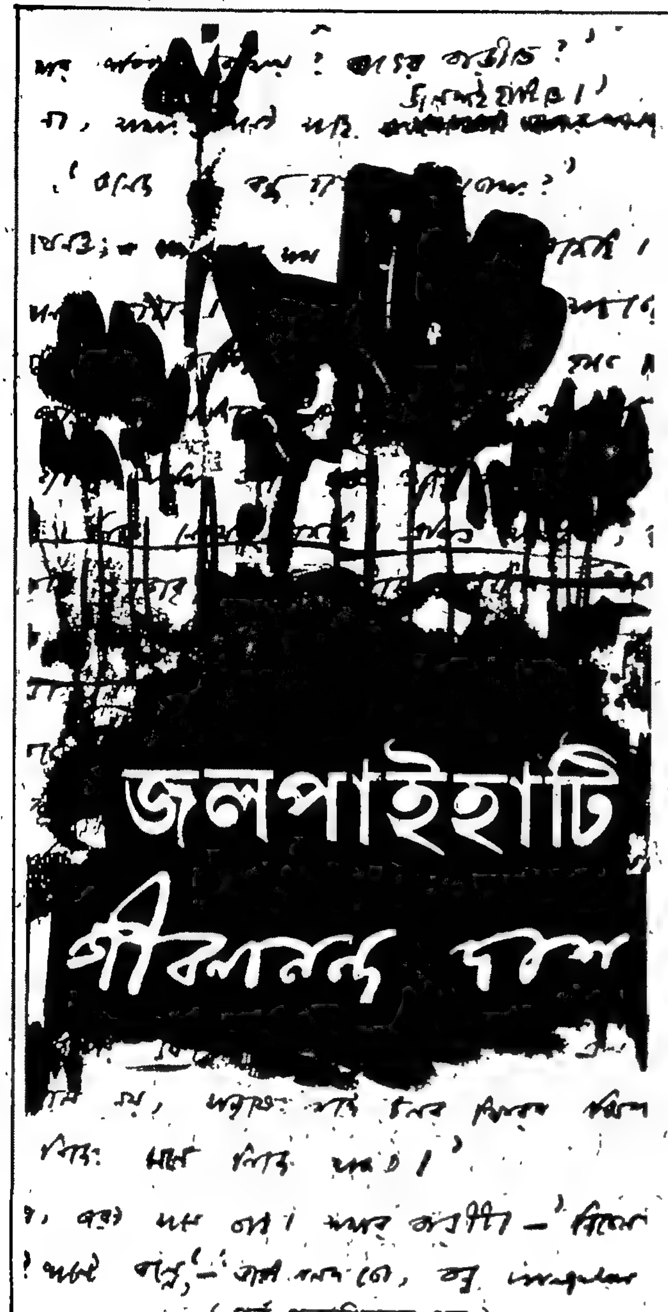

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তিন

'আমি নির্ঝরের জল খেতে ভালবাসি।'

'নির্ঝরের ?'

'স্কোয়াশ তো ফ্যাক্টরির জিনিস।'

নিশীথ হাত বাড়িয়ে চোখ বুজে ঠাণ্ডা কাঁচ স্পর্শ করে এক ঢোঁকে গেলাসের সমস্তটা জল খেয়ে ফেলল।

'এটা কি নির্ঝরের জল ?'

'নির্ঝরের খুব কাছে !'

শুনে নমিতা ডিশ গেলাস অনুভূতির দিকে তাকিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে নিশীথের কথাটা আন্দাজ করে নিচ্ছিল।

'সেই জার্মান ইহুদী ডাক্তার রোজেন বুর্গ ; তার সঙ্গে কি দেখা হল যখন গিয়েছিলেন মুখুজ্যে সাহেবের বাড়িতে ?'

'না। তিনি রোজ আসেন না।'

'বায়ান্ন বছর মত বয়স আপনার বাবার। জাঁদরেল মানুষ। এরকম শক্ত প্যারালিসিস হল। প্যারালিসিস হয় কেন মানুষের ?'

নমিতা অনিমেষ জলে ভর্তি ঠাণ্ডা একটা কাঁচের গেলাসের দিকে তাকিয়েছিল। সেটা তুলে নিয়ে গালে চেপে ধরল। তার পরে আরো ওপরে বাঁদিকের রগে—ডানদিকের রগের ওপরে গেলাসটা চেপে রেখে নির্নিমেষ চোখে নিশীথের দিকে তাকিয়ে বললে, 'শরীরটাকে বেশি কবুল করলে হয়ে যায়। কিংবা মনটাকে।'

নিশীথ হাত বাড়িয়ে দিল আর গ্লাস জল খাবে বলে। তাকিয়ে দেখল সব গ্লাসের জল ফুরিয়ে গেছে। নমিতার হাতে জল ভর্তি একটা গ্লাস আছে শুধু। নমিতার কপালের ডানদিকের বাঁদিকের রগ স্নিগ্ধ হয়েছে, ঠাণ্ডা হয়েছে কপাল, মাথা ; ঠাণ্ডা জলের গেলাসটা গালে ছুঁইয়ে টেবিলের ওপর রেখে দিল।

'জল খাবেন আপনি ?'

'আছে জল ঐ গেলাসটায় ?'

'আছে। আপনিতো স্কোয়াশ খাবেন না। এই যে গেলাসটা রাখলুম এটা কি নির্ঝরের জল ?'

'আঃ, কি ঠাণ্ডা।' গেলাসটা হাতে তুলে নিয়ে বললে নিশীথ।

রেফ্রিজারেটরে ছিল। তবুও এই গেলাসটার ভেতরে অনেকখানি বরফের গুঁড়ি ঢেলে দিয়েছে বাবুর্চি। দেখেছেন কত বরফ—গলেনি বেশি।'

নিশীথ জল শেষ করে গেলাসের বরফের তলানির দিকে তাকিয়ে দেখল।

গেলাসের ভেতরে হাত ডুবিয়ে বরফের টুকরোগুলো তুলে নিল নমিতা ; কপালে রগে ঘষতে ঘষতে উঠে দাঁড়াল। নাকে চোখে ঘষতে লাগল। টেলিফোন ডাকছে নাকি ? তাড়াতাড়ি চলে গেল নমিতা। কেমন যেন মনপবনের মাঠে চড়িভাতির মত খাওয়া—ওদের হয়ে গেছে।

নিশীথ ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসল, বেসিনে প্রায় মিনিট পনেরো ধরে ভালো করে হাত-মুখ ধুয়েছে।

নমিতা টেলিফোন ধরতে সেই যে চলে গেছে নিজেদের ঘরের দিকে—তারপর এদিকে আসেনি।

নরওয়েজীয় কূলকিনারা থেকে নেমে এসেছে নমিতা—ও ঠিক এদেশি মেয়ের মতো নয়—দেখতেও নয়, খুব সম্ভব ভঙ্গি কিংবা অর্থ তাৎপর্যেও নয়, যে গেলাসে মুখ দিয়ে জল খেয়ে ফেলেছে নিশীথ, তার তলানির বরফের কুচিগুলো হাত গলিয়ে তুলে নিল, রগে ঘষল—ঠোঁটে চোখে রগড়ে নিল। আমাদের দেশের মেয়েরা এরকম করত না। যদি করত তাহলে সে একটা খেলা হতো, সে খেলার নাম আছে। কিন্তু নমিতা নিশীথকে কোনো খেলায় আহ্বান করে নিশীথের এঁটো গেলাসের বরফ নিজের চোখে ঠোঁটে ঘষতে যায়নি ; ঘষেছে এমনিই—কানের পাশের রগ দপদপ করছিল বলে। গেলাসে হাত ঢুকিয়ে বরফের গুঁড়ো তুলে নেবার সময় মনেও ছিল না নমিতার যে ওটা এঁটো গেলাস, কিংবা খেয়ালে থাকলেও ও মানে যে বরফ এঁটো হয় না। কিংবা কোনো জিনিস এঁটো হলেও কিছু হয় না। শিশুর মনে, বালিকার মনে তুলে ঘষে নিয়েছে। রগড়াতে রগড়াতে ভুলেই গেছে কি করেছে না করেছে !

নিশীথ ড্রয়িংরুমের ফ্যানটা খুলে দিল। চোতের বাতাস আসছিল বেশ ফুরফুর করে বাইরের থেকে, কিন্তু কিছুক্ষণ হলো থেমে গেছে ; কেমন গুমোট।

আপনাকে খাবারের ঘরে খুঁজছিলুম, কখন এলেন আপনি ?

অনেকক্ষণ।

খাওয়া না হতেই টেলিফোন ধরতে উঠে গেলাম আমি।

খাওয়াতো শেষ হয়ে গেছল।

শেষ হয়েছিল ?—নমিতা দূরে দাঁড়িয়ে বইয়ের শেলফের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললে, 'আমি ভেবেছিলুম শেষ না হতেই উঠে

গেলেন আপনি।'

কে টেলিফোন করল?

মা করেছেন।—নমিতা নিশীথের মুখোমুখি খাকি রঙের একটা সোফায় এসে বসল, 'মা আমাকে দুপুরে নেমন্তন্ন করেছিলেন—'

খেতে? আপনার তো খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে—

না খেতে নয়, তাঁর ওখানে তাস খেলতে যেতে। দুপুর মানে আড়াইটে তিনটে। নিজের হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে নমিতা বললে: 'এখন দুটো পঁয়ত্রিশ, আপনি তাস খেলতে জানেন?'

খেলি মাঝে মাঝে।

নমিতা মাথা কাত করে একটু ভেবে নিয়ে বললে: 'মা ইফতিকার উদ্দীন সাহেবের বাড়িতে আছে।'

কে ইফতিকার উদ্দীন?

একজন বড় ব্যারিস্টার তিনি। বড় মানে অনেক টাকা আছে। ব্যারিস্টারি করেন না তিনি।

দুপুরবেলা তাস খেলেন?

মার নেমন্তন্ন ছিল ওখানে, তাই তাস খেলবার ব্যবস্থা হয়েছে হয়তো? বলে ঘরের ঝকঝকে কাঁচের শার্শিগুলোর উপর তাকিয়ে দেখল, গরম উজ্জ্বল দুপুরের সূর্যখণ্ডগুলো এসে পড়েছে সব—পরিচিত আস্বাদের মতো যেন। 'মাকে বলে দিয়েছি যে আমি এখন যেতে পারব না, পাঁচটা সাড়ে পাঁচটায় যাব। বলেছি জিতেন এখানে নেই, জামশেদপুরে গেছে।—এই যে টিন।' বললে নমিতা।

নিশীথ তুলে নিল একটা। হাতের কাছে ছোট তেপয়ের উপর রেখে দিল নমিতা টিনটা, নিজে সিগারেট নিল না। দেশলাই দিল নিশীথকে। শার্টের বুকপকেটে দেশলাইটা রেখে দিল নিশীথ—জ্বালাল না।

ইফতিকার উদ্দীন সাহেবের বাড়ি গিয়ে তাস খেলব দুপুরবেলা আমি—সে হয় না। যদি কোথাও যাই দুপুরে—বাবার কাছে যাব। দুজন নারস ঠিক করে দিয়েছি বাবার জন্যে—তারা আছে ওখানে,' তবে আমি মাঝে মাঝে গেলে—বাবা চান যে আমি যাই। আমিও চাই যেতে।

যাবেন নাকি আজ দুপুরবেলা?

না।

কেন?

এই তো ইয়ুসুফ সাহেবের কাছে টেলিফোন করে এলাম।

ইয়ুসুফ কে?

বাবা যে ফ্ল্যাটে থাকেন পার্ক সার্কাসে তারি আর একদিকে থাকে ইয়ুসুফ আর তার স্ত্রী, খুবই ভালো লোক ওরা। কোথায় যেন বেরিয়ে গেছে আয়েষা। ফোন ধরল ইয়ুসুফ নিজে, বললে, মুখুজ্যে সাহেব ঘুমিয়ে আছেন, বাবা জেগে উঠলে—ওখানে আমার যাবার দরকার হলে ইয়ুসুফ আমাকে জানাবে।

দরকার যে কোনো মুহূর্তে হতে পারে।

সে সব তো নারসদের হাতে। বেশি দরকার হলে ডাক্তার আছেন। ইয়ুসুফের ভাই জুলফিকার তো সারাদিন বাড়িতেই থাকে। বাড়িতেই তার অফিস। দরকার হলে ডাক্তারকে ফোন করে দেবে জুলফিকার। বাবা দুপুরবেলা আমাকে চান না।—নমিতা বললে।

বুকপকেট থেকে দেশলাই বার করে সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিল নিশীথ।

দুপুরবেলা মোটর ড্রাইভ করে তার ওখানে যে আমি যাই সে হুজ্জোতি মোটেই পছন্দ করেন না তিনি, বলেন এরকম করলে তোমার প্যারালিসিস হবে—বলে বালিকার মতো মুখ-দুষ্ট নির্দোষ যুবতীর মতো মুখে একটু চোখ টিপল, হেসে নিল নমিতা, 'আজ সাড়ে পাঁচটার আগে বেরুব না।

কোথায় যাবেন?

মার ওখানে, তাসের আড্ডা ভেঙে যাবে তখন, না ভাঙলেও তাস খেলব না আমি। ওরা ফ্ল্যাশ খেলে।

ফ্ল্যাশ?

ফ্ল্যাশ খেলতে শুরু করে মার বারফট্টকা ভাবটা কেটে গেছে খানিকটা। বসে থেকেও যে নেশা করা যায় টের পেয়েছে; পান জর্দা কিমামও খাচ্ছে আজকাল। ইফতিকার উদ্দীন সাহেবের সঙ্গে বেশি মেলামেশা হচ্ছে—

নিশীথ খুব আস্তে আস্তে সিগারেট টানছিল।

আপনি হলে শোবেন আজ রাত থেকে।

হলে শোবে আজ রাত থেকে নিশীথ? কি করবে? সিগারেটের ছাই ঝেড়ে উত্তর দিতে যাচ্ছিল। নিশীথ কিছু বলবার আগে নমিতা বুঝিয়ে দিল জিনিসটা তাকে, 'নিচে তো ফ্যান নেই, খুব বাতাস খেলে হলে—ফ্যাক্টরির বাতাস নয়—নির্ঝরের।'—বলে হাসল নমিতা, টিনের থেকে একটা সিগারেট বার করে নিল।—'আর যদি ফ্যাক্টরির জিনিস চান, তাহলে হলের দুটো পাখা খুলে শুয়ে থাকতে পারেন।'

নিশীথ, কথা ভাবছিল।

আমি ভাবছিলাম আমাদের শোবার ঘরের পাশে যে ঘরটা আছে সেখানে ঠিক করে দিলে হয়। জিতেন মাঝে মাঝে ওখানে বাড়ির অফিস করে—রাতে শোয়। ভারি চমৎকার হাওয়া ঐ ঘরে। মাথার উপর ফ্যান—টেবল ফ্যানও আছে। স্কাইলাইট অনেক। দরজা-জানালা বন্ধ করে শুলেও কোনো অসুবিধা হবে না।

বন্ধ করার কী দরকার?

আমরা করি না। কিন্তু কেউ কেউ ভাবে দোর আটকে না রাখলে চোর আসে—

তা আসে বটে। অফিসের দরকারি কাগজপত্র বুঝি সব? টাকা আছে?—নমিতাকে জিজ্ঞেস করল নিশীথ। নমিতা নিজের পা ঘেঁষে কার্পেটের নক্সার দিকে তাকিয়েছিল, নিশীথের চোখে চোখ পড়ল তার।

ক্রসড চেক। চেক ছাড়া টাকা কে বাড়িতে রেখে দেয় আজকাল।

সিগারেটের খানিকটা ছাই অন্যমনস্কভাবে কার্পেটের ওপরই ঝেড়ে ফেলে বললে নিশীথ, 'টাকা তো ব্যাংকে থাকে।'

কোন ঘরে শোবেন আপনি?

হলটা বড্ড বড় হয়ে পড়ে—ল্যাটা মাছকে সাগরে পাঠিয়ে লাভ কী?

লাভ আছে বৈকি—হাতের সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিয়ে নমিতা বললে—'সেখানে তার হাঙর হয়ে পড়বার সম্ভাবনা।'

আমি জিতেনের ওখানেই শোব।

জিতেন ফিরে এলে?

হলে।

নমিতা নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, 'তিনটে বেজেছে। আপনার তো বিশ্রাম হলো না—'

ঘুম? ঘুমের সময় আছে, হাত-পা ছড়িয়ে শোফায় বসে আছি, পাখা ঘুরছে, আপনার সঙ্গে কথা বলছি, ড্রয়িংরুমে বসে খুব ভালো লাগছে আমার।

নমিতা সিগারেটের ধোঁয়া শেষ পর্যন্ত আত্মসাৎ করে কেমন একটা স্তম্ভনের ঘোরে নিশীথের দিকে তাকিয়েছিল।

ঘুমোতে যাবেন আপনি?—জিজ্ঞেস করল নিশীথ।

না। এখন না।

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। নিভে যাচ্ছিল নিশীথের সিগারেট। কিছু কিছু ধোঁয়ার ভগ্নাংশ ধীরে ধীরে বেরুচ্ছিল নমিতার মুখের ভিতর থেকে।

হানিফকে বলব জিতেনের ও ঘরটায় আপনার জিনিসপত্তর রেখে দিতে?

হানিফ কে?

আমাদের বেয়ারার।

জিতেনের এ বাড়িতে আর্দালি চাপরাশি তো খুব কম।

হানিফ আছে, রফিক আছে, বিশু, মহিম আছে, বাবু-বিবি আছে। আমরা দুজন লোক তো শুধু, আপনার সঙ্গের লাগেজ সবই তো নিচে?

এই হানিফ!—ড্রয়িংরুমের জানালার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাক দিল নমিতা।

হুজুর!—বলতে না বলতেই দুড়দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে কুড়ি পঁচিশ বছরের একজন পাঞ্জাবি মুসলমান ছোকরা ড্রয়িংরুমের দরজায় এসে হাজির হলো। নিশীথের বিছানা স্যুটকেস সাহেবের দুসরি কামরায় রেখে আসতে বলা হলো।

লেকপাড়ায় দুজন মুসলমান আর্দালি রেখেছে দেখছি জিতেন। কোথাকার মুসলমান?

পাঞ্জাবের।

বিপদে পড়বে না তো?

না, এখন আর কিচ্ছু হবে না।

ওদের নিজেদের মনে কোনো ভয় ডর নেই?

কিচ্ছু না। নমিতা বললে, 'একটা কথা আগের থেকে আপনাকে জানিয়ে রাখা দরকার, যে ঘরে আপনি শোবেন'—দরজায় ছায়া পড়তেই চোখ খুলে তাকাল সে। হানিফ এসে বললে জিনিসপত্তর রেখে দেওয়া হয়েছে বড়সাহেবের ঘরে। সে একটু পার্ক সার্কাস যেতে চাইল ইফতিকার উদ্দীন সাহেবের ওখানে। পাঁচটার সময় ফিরবে।

কেন? সেখানে কি আছে? সাদি? যিতনা কুছ কোশিশ করো হানিফ—

হুজুর, কুছ নেই—লেকিন—হামেশা—

আচ্ছা যাও।

যে কথা পাড়ছিল নমিতা, হানিফ এসে পড়াতে ভেঙে গেল, কথাটি যেন পাড়বেনা আর নমিতা—মনে হলো নিশীথের। জানালার ভিতর দিয়ে অনেক দূরের দিকে তাকিয়ে আছে সে, কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয় যা দেখার তাছাড়া আর কিছু দেখছে না যেন। কোনো ব্যথা নয়, দুরাশা নয়, ক্লান্তি নয়; কিন্তু নানারকম কথা বলার অবক্ষয়ে যে নিস্তব্ধতা এসে পড়ে মানুষের চোখে মুখে,—পৃথিবীর সমস্ত জিনিসেরই অবসান যে রকম নিস্তব্ধ (হয়তো নিষ্ফল) তেমনি নির্বাণচক্রের মতো তাকিয়েছিল যেন—কোনো জিনিসের দিকে নয়, অফুরন্ত সময়কণিকাগুলোর দিকে।

জিতেনের ঘরে শোবেন আপনি আজ রাতে, কিন্তু ঘুমুতে পারবেন তো?

কেন কী হবে?

সে ঘরে টেলিফোন বাজে।

তা বাজতে থাকবে।

ধরতে হবে তো।

জিতেন জামশেদপুরে আছে—টেলিফোন ধরে কী লাভ?

বড় ব্যবসায়ী মানুষের কাছে নানারকম জরুরী খবর আসে।

জিতেন জামশেদপুরে—সবাই কি তা জানে। সাহেব চলে গেলে তার স্ত্রী নেই?

সাহেব তো হলো। আমার নিজের প্রাইভেট টেলিফোনও আসে; রাতে, অনেক রাতেও আসে।

অনেক রাতে যে প্রাইভেট ফোন আসে সেটা আমার ধরা উচিত নয়।

সে ফোন আমার অনেক রাতের নিজের জিনিস; যদি অনুচিত হয় আমি নিজে বলে দেব। নমিতা হেসে বললে—

নিশীথ সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, "জিতেন ধরে?'

আমার ফোন?

হ্যাঁ।

ওর ঘুম বেশি।

নিশীথ চিমটের মতো করে ডানপায়ের আঙুলে দিয়ে টেনে তেপয়টা আস্তে আস্তে নিজের দিকে নিয়ে এল। সিগারেটের কিছুটা ছাই তেপয়ের অ্যাশট্রের ভিতর ঝেড়ে ফেলে তেপয়টা আঙুলে ঠেলে আস্তে আস্তে সরিয়ে দিল আবার, 'রাতবিরেতের সমস্ত টেলিফোনই আপনার ধরতে হয়?'

বেশি রাতে জিতেনের কাছে ফোন আসে না।

আমি যদি ধরি আপনার ফোন—বলে নিশীথ চুপ করল। আরো কিছু বলবে হয়তো সে। কি বলবে, বলে নিক; শোনা যাক। নমিতা নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল, নিশীথ কিছু বললে না আর।

আপনি ফোন ধরে যদি ওদের কথাটা জেনে রাখতে চান ওরা তাতে ভড়কাবে না।

আপনি তখন ঘুমুচ্ছেন?

ঘুমুচ্ছি হয়তো—

আপনার কানের কথা আমাকে বলবে?

শোনার অনুমতি রয়েছে বলেই তো কান পেতে আছেন—জানবে না তারা?

কি ভাববে তারা: নমিতা দেবির সেক্রেটারী?

হয়তো জিতেন দাশগুপ্তকে বলছে। কিংবা—

কিংবা?

নিশীথ সেনকে।

সিগারেটটা জ্বলে জ্বলে জ্বলে নিশীথের আঙুল পুড়িয়ে ফেলছিল প্রায়। তবুও সেটাকে ফেলে না দিয়ে আঙুলে আটকে রাখল নিশীথ। বেশি দন্ধাচ্ছিল বলেই—নাকি অন্যমনস্কতায় হাতের থেকে খসে পড়ে গেল সিগারেটটা—কার্পেটের উপর। তুলে নিয়ে অ্যাশট্রের ভিতর ধীরে ধীরে ডুবিয়ে রাখল নিশীথ।

বেশি রাতে ফোন আসে আপনার—রোজ রাতেই?

না, রোজ রাতে নয়—তবে কোনো কোনো সময় রোজ রাতেই।

আপনার ফোন ধরব আমি; জেগে উঠি যদি!

ফোন এলেও ঘুমোতে পারবেন?

কোনো কোনো ফোন খুব ভয়কাতুরে—দু-একবার ডেকেই ছেড়ে দেয়।

অতরাতে যাদের চায় তারা ভয়কাতুরে নয়; আমাকে না পেয়ে তারা ছাড়বে?

আপনাকে না পেয়ে? কোথায় আপনি তখন? ঘুমিয়ে তো আছেন—

ঘুমিয়ে আছি কিন্তু কেউ না জাগলেও আমাকে না জাগিয়ে ছাড়বে না ওরা।

নিশীথ ব্যাহত হয়ে বললে, 'এই রকম ডাকসাইটে?'

কেন দুপুর রাতের ঘুমে এত কী মায়া?

মানুষের দুটো নিস্তব্ধতা আছে পৃথিবীতে: মৃত্যু আর ঘুম, এছাড়া আর সবই শেষ পর্যন্ত অজ্ঞেয়।

অনিমেষভাবে চুপ করে থেকে কিছুক্ষণ পরে নমিতা বলল: 'নিস্তব্ধতা আছে মানুষের জীবনে। কিন্তু তা ঘুম? মৃত্যু?' ঘরের ভিতর কোথায় যেন শব্দ হলো—বেড়ালের? বাতাসের? লোকজনের?—'আমি তো মনে করি না।' নমিতা বললে যেন ঘুমের থেকে জেগে উঠে। তা মনে না করাই স্বাভাবিক। শাদা সাধারণ পথে চলতে চলতে সহজ কথাবার্তার ভিতর দিয়েই জটিলতা এসে পড়ে, কথাবার্তা বলতে বলতে আজ নিবিড়তা এসেও পড়েছিল হয়তো—সোজা সহজ পথে, কিন্তু সব গহনতাই নেশার মতন জিনিস। নেশায় ধরলে মন ব্যক্তিগত হয়ে উঠতে চায়, নিস্তব্ধতা আছে ঘুম আর মৃত্যুর: অগ্রসর হচ্ছে সেই দিকে নিশীথের জীবন। অগ্রসরের সীমানায় পৌঁছুলেই সমাধি, যে সংস্কৃতি ও বৃদ্ধির ভিতর থেকে জেগেছিল নিশীথের জীবন চল্লিশ বছরেরও আগে, নৈষ্ফল্য ভেদ করে সার্থকতায় পৌঁছুবার আশা সে পোষণ করেছিল বারবার। আশাকে সফল করে তুলবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টাও করেছে কতবার সে। কিন্তু কিছুতেই ভেদ করা সম্ভব

হলো না। কিন্তু নমিতা আর এক পৃথিবীর। তার সফলতা কিংবা ব্যর্থতা অন্যরকম। ঘুম বা মৃত্যুর বাইরে সে এক অন্য কৈবল্যের স্তর। টাকা রয়েছে সেখানে—টাকাই সব ; মিলন রয়েছে সেখানে, মিলনই সব ; দেহ রয়েছে—নানারকম সুধা, ফেনা, সৈন্ধবের স্বাদ উপলব্ধির ভিতরে পৃথিবীর মাটিকে নিকটতমের মতো পায় শরীর। আকাশের নক্ষত্রলোকের ব্যাপ্তির ভিতরে কামশরীরের মতো আলোকিত হয়ে ফেরে মন। কেন ঘুমোতে চাইবে ও জগতের মানুষ? কেন মৃত্যু চাইবে? নমিতার মতন জীবন পাওয়া—কিংবা জিতেন দাশগুপ্তের মতন : সম্ভব কি নিশীথের পক্ষে?

খুব বেশি রাতে আসে টেলিফোন আপনার। হাত বাড়িয়ে বাতি নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারের ভিতর কান পেতে শোনেন? মানুষ মানুষের অন্তরঙ্গ বলেই মেশিনের স্বাদ এত বেশি।

মেশিনের?

হ্যাঁ টেলিফোনের—নিশীথ বললে। 'টেলিফোনের ঘরেই শোব আমি।'

অন্যসব দিক দিয়েই ঘরটা খুব ভালো। বেশ নিরিবিলি ঠাণ্ডা। কলকাতার চারিদিকের হাওয়া এসে কথা বলে যায় যেন ; কিন্তু মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে দেবার জন্য। জেগে জেগে ঘুমিয়ে যাবে মানুষ, তারপর সাতভাই চাঁপার মতো ঘুমিয়ে পড়ে—কেঁচে গণ্ডূষ করে।

ও ঘরে জল আছে?

জল রেখে দেব—বললে নমিতা যেন জলসত্রের মতো মূর্তি ধরে।

ঘোমটা নেই, তবুও রয়েছে অনেকদূরে গলা অব্দি ঘোমটা টেনে—রাতের ঠাণ্ডা ভরন্ত নদীর জল—ওর ঐ গলার স্বরের ভিতর, 'জল রেখে দেব বলে' ডাকছে—জোনাকিকে, নক্ষত্রকে।

যদি বলেন, হানিফকে বলব আপনার ঘরে ওয়াটার কুলারটা রেখে আসতে।

নিশীথ মাথা নেড়ে বললে, কিছু বরফ রেখে দেয় যেন, ওয়াটার কুলারের দরকার নেই।

অনেকরাতে টেলিফোন এলে—ঘুম ভেঙে গেলে—বিরক্ত হবেন না তো?

অসময়ে ঘুম ভেঙে দিলে খুব খুশী হব না, তবে অন্ধকার ঘরে জেগে উঠে পৃথিবীর অন্ধকার, পৃথিবীর হাওয়া, পৃথিবীর মানুষের কাছ থেকে আবেদন আসছে টের পেয়ে খারাপ লাগবে না। নিশীথ পায়ের আঙুল দিয়ে কিছুক্ষণ ঠুকল কার্পেট। অ্যাসট্রেটা হাতে তুলে নিয়ে রেখে দিল।

সিগারেটের টিনের ঢাকনি খুলে ভিতরের সিগারেটগুলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঢাকনি এঁটে বললে নমিতা, ভালো কথা খুব ভালোভাবে আপনি বলতে পারেন নিশীথবাবু।

আমাদের কলেজের জয়মাধববাবু পারতেন আমি, পারি না। আজ সকাল থেকেই মন দিয়ে আপনার কথা শুনছি আমি। এতদিন বাইরে বাইরে থেকেও নিখুঁত বলে যাচ্ছেন কত সহজে ; অনেক বাঙালীও এরকম পারে না। নিশীথ নমিতার দিকে তাকাল।

যেন নিশীথের কথা শোনেনি নমিতা, এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে আছে, সিগারেট জ্বালিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল—আপনি কোথাও বেরুবেন বিকেল বেলা?

না কোথাও না।

কেন?

আজ সকালে খানিকটা ঘুরে এসেছি। কাল বেরুব। কোনো ভালো বই আছে?

আছে। আমি পছন্দ করে দিয়ে যাব। পড়ে আমাকে বলতে হবে কেমন লাগল। আজকের খবরের কাগজ পড়েছেন?

না।

খবর জানবার তাগিদ নেই আপনার, দেখছিলুম আমি। জিতেনের খুব আছে। আমার মাঝে মাঝে থাকে—মাঝে মাঝে হারিয়ে ফেলি। পড়বেন খবরের কাগজ?

না—বললে নিশীথ—'বিকেলবেলা ইফতিকার উদ্দীন সাহেবের বাড়ি বেড়াতে যাবেন?'

ভাবছি কী করব। নমিতা বললে, 'দু-একদিন ফ্ল্যাশ খেলেছি ওদের সঙ্গে। ভালো লাগে না, টাকা নষ্ট হয় বলে নয় ; ওদের ওখানে কেউ নেই যেন মনে হয়, কিছু নেই যেন ; ভারি ফাঁকা লাগে। অথচ খুব হৈ চৈ দিনরাত। আমি শান্তি ভালোবাসি কিন্তু বোকার মতো নয়। তার চেয়ে অশান্তি ঢের ভালো। কিন্তু ওদের ওখানে—যারা দিনরাত সরগরম হয়ে থাকতে ভালোবাসে তাদের খুব ভালো লাগবে।

জিতেন যায় না ইফতিকার উদ্দীন সাহেবের বাড়ি?

না।

সলিল মুখুজ্যে সাহেবের ওখানে?

ক্বচিৎ যায়। নানারকম কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

খুব বেশি রাতে কারা টেলিফোন করে আপনাকে?

কয়েকটা রাত ধরলেই তো বুঝতে পারবেন।

আমি ধরব? আপনি তো ঘুমিয়ে থাকবেন।

আমাকে যা জানাবার আপনাকে তা জানিয়ে দেবে।

যেন জানালেই হলো, বড় বাজারের মাড়োয়ারীরা নাক রগড়ে কোটেশন জানাচ্ছে ; সেইরকম বুঝি? কিন্তু তাতো নয়—ভাবছিল নিশীথ।

নমিতাকে ডাকলে নিশীথ সেন যদি হাজির হয়—

তাহলে একমণ তুলোর থেকে একমণ লোহা বেশি ভারী হবে বুঝি? —নমিতা হাসতে হাসতে বললে।

বাইরে পড়ন্ত রোদ, সমস্ত ড্রয়িংরুম চৈত্রের বিকেলের বাতাসে ভরে গিয়েছে, দু-একটা খোলা পাতলা বইয়ের পাতা ফরফর করে উড়ছে। মস্তবড় দেওয়াল-ক্যালেনডার দুটো উল্টে পাল্টে শিলাবৃষ্টির মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল ছলাৎ ছলাৎ করে দেওয়ালের উপর। বাইরে পটকা ফলের মতো আলোর রং যেন—গাছ পাখি আকাশ ছুঁয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ছে : যেন কেউ ছিল না এখানে, তাকে তারা সুজাতার মূর্তি দিয়েছে, অন্যমনস্ক হয়েছিল পুরুষ, তাকে তারা বিপ্রতিভ করে তুলেছে ; কনে দেখা আলোর কণিকারাশিকে জ্বালিয়ে জাগিয়ে তুলে বিচলিত করে দিয়ে পুরুষটিকে, নিমেষনিহত করে রেখে নারীকে হুহু করে ছুটে আসছে চৈত্রের অবলায়িত বাতাস ; ডানার পালক ছিঁড়ে শাদা পায়রার, উড়ন্ত কাকটাকে ধাক্কা দিয়ে কার্ণিশে কাত করে, শিমূলের তুলো উড়িয়ে কোথায় ছুটে চলে গেল তারা সব কমলা রঙের ওই মেঘ—সুমাত্রা, শ্যাম, মালয়ের মতো ছেঁড়াফোঁড়া মেঘের অংশ নিভিয়ে—নিভিয়ে ফেলে।

না, আজ আর বেরুব না নিশীথবাবু।

কি করবেন তাহলে?

চলুন আপনাকে সেই বইটা দোব। আমিও একটা বই পড়ব এখানে ড্রয়িংরুমে বসে।

বই আনা হলো। বাতি জ্বালানো হলো। পড়তে বসল দু'জনে দুটো সোফায় :—খুব কাছাকাছি নয়, দূরে নয়, নেহাৎ মুখোমুখি নয়, আড়াআড়িভাবে মুখোমুখি।

ভাগ বসালাম না তো আপনার নিরিবিলি বই পড়ার উপর নিশীথবাবু? কোনো উত্তর দিল না নিশীথ। নিঃশব্দে পড়তে লাগল দু'জনে, প্রায় দু'ঘণ্টা উতরে গেল। হাত বাড়িয়ে সিগারেটের টিন থেকে বের করে নিয়ে সিগারেট জ্বাললে—খেল—মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখল নীল ধোঁয়ার সরু ফালির দিকে—দেখল বেড়ে বড় হয়ে শাদা নীল ধোঁয়া মিলিয়ে যাচ্ছে সব। নড়েচড়ে বসল তারা—মাথা তুলে তাকিয়ে নেয় ; পরের বার চোখাচোখির সময় ক্ষতিপূরণ করে কী যে বীতাশোক তিমিরাতীতভাবে, কিন্তু তার পরের বার চোখকে এড়িয়ে চলে চোখ,

কোনো কিছু হয়েছিল স্বীকার করতে চায় না ; উপলব্ধি করেছিল তাদের ভিতর একজন—নাকি দু'জনেই তারা ? কিন্তু তাও একটা কথাও মুখ দিয়ে বেরলো না কারো ; নিজের সোফা ছেড়ে দু'মুহূর্তের বাইবেব সন্ধানেও উঠে গেল না কেউ। কতদূর পড়া হলো বই ? শিখণ্ডীর মতন নয় বই, মনীষীদের লেখা ; খুব ভালো জিনিস,—'কিন্তু ভালো জিনিসেরও বেশি খুব ভাল নয়।' বললে নিশীথ অনেকক্ষণের নিস্তব্ধতা ভেঙে।

তার মানে ? হাতের বইটা বন্ধ করে সরিয়ে রাখল নমিতা, 'ধিকিধিকি ভস্ম-স্নিগ্ধ হাসিতে বই নয়, কি যেন অন্য কোনো কিছুর সময় অতীত হয়ে যাচ্ছে অনুভব করে উঠে ফিরে এল নিজের সোফায় নমিতা, হাতের বইটা বন্ধ করে রাখল নিশীথ।

কলকাতায় আসবার আগে নিশীথের জলপাইহাটিতে কয়েকটা দিন কি রকমভাবে কেটেছিল ? জলপাইহাটি ছেড়ে নিশীথের কলকাতায় রওনা হওয়ার আগে সুমনার শরীরের অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। জলপাইহাটি কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনছে না নিশীথের—এখানে থেকে গড়িমসি করে লাভ নেই তার—কলেজের কাজ ছেড়ে দেবে ঠিক করেছিল নিশীথ— না ছেড়ে দিলেও অবিলম্বে ছুটি তো নেবেই, ছুটি না দিলে কলেজে যাবে না সংকল্প করেছিল সে। এরকম অবস্থায় দেশে পড়ে থেকে লাভ নেই কিছু—নিশীথের মন কলকাতায়—ঘুরে দেখে আসুক নিশীথ : ভাবছিল সুমনা। নিশীথকে সুমনা নিজেই আশা ভরসার কথা বলে পাঠিয়ে দিতে চাচ্ছিল কলকাতায়। সপরিবারে থাকা কলকাতায় গিয়ে ? কোথায় পরিবার নিশীথের ? কাঁচরাপাড়ার হাসপাতালে ভানু বাঁচবে না। ভানুর দিদি বেঁচে মরে আছে কোথাও, কোথায় যে বের করতে পারবে না কোনোদিন। কেউ কেউ বলে পদ্মা-মেঘনার গ্রাম-জঙ্গলে বকের দ্বীপে, চিলের দ্বীপে মেয়েদের কান্নার সুর শোনা যায়—অনেক গভীর রাতে, কেউ কেউ আরও দূরের খবর দেয়—করাচিতে, শিয়ালকোটে, পেশোয়ারে, লাহোরে, নিজামের দেশে হায়দ্রাবাদে ? কোথায় নিয়ে গেছে রাণুকে—অতদূরে নিশ্চয়ই নয়। কে কারা নিয়ে গেছে—তাও তো বলতে পারা যায় না। জলপাইহাটির কোনো চেনাজানা মানুষ সেই সঙ্গে সেই রাত্রে যে সরে পড়েছে তাতো শোনা যায়নি। কলকাতায় তখন দাঙ্গা হচ্ছিল বটে। কিন্তু কলকাতার দাঙ্গা জলপাইহাটিতে ছিটকে পড়েনি তো ; কেউ শোনেনি। মনটা ছটফট করছিল সুমনার : কাঁচড়াপাড়ার ভানুর জন্যে ; বাঁচবে না হয়তো ; মরবে না হয়তো ; কিন্তু ভানু এলাকাব ভিতর আছে। মরে গেলেও ছাই হাড় যে জায়গাটায় দাহ করা হবে নাগালের ভিতর চিহ্নের দেশে থেকে যাবে সব। কিন্তু বড়সড় সুন্দর মেয়েটি কেমন সুস্থ ছিল সূর্য তারার আগুনের মতো, তার জন্যে দেশ নেই, সমাজ নেই, কেউ নেই, জীবন নেই তার—মৃত্যু নেই। কলকাতায় যাবার দু-একদিন আগে নিশীথকে বলেছিল সুমনা, 'তুমি তো যাচ্ছ কলকাতায়, রাণুকে খু'জে দেখো তো।'

আচ্ছা দেখব।—বলেছিল নিশীথ। কিন্তু দেখবে না, খুব সমীচীন লোক নিশীথ, খুব আত্মস্থও বটে, মিছেমিছি মসজিদে ঢোকবার লোক নয় সে। ঢুকে কোনো লাভ নেই জানে সে : নিশীথ সত্যই জানে যে ভানু নেই।

আমি কলকাতায় চললাম, সুমনা।

কোথায় গিয়ে উঠবে ?

জিতেন দাশগুপ্তের বাড়ি।

জিতেনবাবু বিয়ে করেছে শুনলাম—

কই আমি তো শুনিনি। কার কাছে শুনলে ? ও বিয়ে করবে আমাকে খবর দেবে না ?

আমাকে যতীন হালদার বলেছিল। মগরাহাটীর যতীন। কলকাতায় নানারকম টুকিটাকি কাঁচামালের ব্যবসা করে ; তাছাড়া আরও কী বলছিল আমাকে—সুমনা ছড়ানো ডান হাতের উপর কপাল ঠেকিয়ে মাথা হেঁট করে মনে করে নিয়ে বললে—'মনে পড়েছে, বলছিল ব্যাকেলাইটের ব্যবসা করে, ব্যাকেলাইট কী ?'

ব্যাকেলাইট। জানিনা। তো যতীন কি করে জানলো জিতেন বিয়ে করেছে ?

দাশগুপ্ত সাহেবের অফিসে যেতে হয় যতীনকে ব্যবসার কাজে। অফিসের লোকেদের কাছে শুনেছে হয়তো।

শুনে নিশীথ নিজেকে কেমন একটু কাবু বোধ করল যেন। কলকাতায় যাবার উৎসাহে একটু পোড় লাগল। জিতেন তাহলে বিয়ে করল—যেন ভরতের বাটুল খেয়ে মাটিতে পড়ে গেছে হনুমান।

আগে ভালো করে দেখেশুনে নাও।

খারাপ খবর কখনও মিথ্যে হয় না।

লোকটি বিয়ে করেছে এতদিন পরে, শত্রুর ভালোর জন্যে নয় নিশ্চয়ই।

সেটা খারাপ খবর হলো। ভালো বন্ধুই বটে তুমি জিতেনবাবুর—

অনেক যুদ্ধ করেছে জীবনে নিশীথ, কোনো যুদ্ধেই জয়ী হতে পারেনি। এখন আর লড়ায়ে জেতবার আশা নেই তার। 'আচ্ছা শেষবারের মতো লড়ে দেখা যাক, এবার না জিতে ছাড়াছাড়ি নেই। এরকম কোনো সংকল্প উৎসাহ এখন নিশীথের হৃদয়ে নেই আর। কিন্তু স্বাভাবিক প্রাণোচ্ছ্বাস রয়েছে ; তা রয়েছে, সুযোগ পেলেই উপচে উঠতে চায়। নিশীথ সুমনার কাছে থেকে ঘুঙুর চেয়ে নিল : রাণুর জন্যে কেনা হয়েছিল, রাণু যখন ন' দশ বছরের। রাণুর ঘুঙুর কোনো রকমে জোড়াতাড়া দিয়ে পায়ে এ'টে নিয়ে নিশীথ কলকাতার এম্পায়ারে কী এক রাবণনৃত্য দেখেছিল একসময়, তেমনি দুর্দমনীয় ভাবে নাচতে নাচতে বললে : 'সুমনা, যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন।'

কে, বিলোচন কে ? বিলোচন কে ! নিশ্চয় দাশগুপ্ত সাহেব ! তাই না ? যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন—দেবে না দেবে না যবে বিবাহে—বিবাহে—চলিলা· দ্রুম দ্রুম—চোখ ঘুরিয়ে বাবরি উড়িয়ে রাবণনৃত্যে বাসুকির মাথা না থে'তলে ছাড়ছিল না নিশীথ ; কলেজের ফিলজফির প্রফেসর মহিম ঘোষাল এসে দরজায় ধাক্কা দিলেন। মহিমবাবুর সঙ্গে কথা সেরে এসে দরজা বন্ধ করে আবার নাচতে লাগল নিশীথ। সুমনাকে আচ্ছন্ন হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তে দেখে নাচ থামাল। বললে, 'পারনিসাস এনিমিয়ার রুগী। এদের সঙ্গে ঘর করে মজাও করতে পারা যায় না একটু।'

মজা কলকাতায় গিয়ে কোরো, দাশগুপ্ত সাহেবের বৌয়ের কাছে। তোমার এরকম নাচ দেখলে আমার মাথা যেন কেমন করে ওঠে।

কেমন আছে শরীরটা আজ ?

বড় খারাপ লাগছে।

খারাপ !

খারাপ। মনে হচ্ছে যেন মরে যেতে বাকি নেই বেশি—

নিশীথের হাত ধরে সুমনা তাকে নিজের বিছানার পাশে টেনে বসাল। খুব অনিচ্ছার সঙ্গে বসল নিশীথ। অনিচ্ছাটাকে সতর্কভাবে চেপে রেখেছে ঠিক—কিন্তু তবুও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নিয়ে স্বামীকে পর্যবেক্ষণ করে বুঝে নিতে পারে কোনো কোনো স্ত্রী। সুন্দর ছিল বটে সুমনা একদিন—কিন্তু কেমন হাড়-ফ্যাকাসে রক্ত হয়ে গেছে—শরীরে হাড়গোড় ছাড়া কিছু নেই আজ তার। নিশীথ খণ্ডিত লোক, কিন্তু তবুও বিলাসী মানুষ, দেহরসিক আরো বেশি। কী করবে সুমনাকে নিয়ে আজ ? স্ত্রীর শরীর একেবারে বাতিল। হাড়ের ভিতর দিয়ে চিঁ চিঁ করে যে শব্দ বেরোয়, নিশীথের মতো মানুষের মনের খোরাক মেটাতে গিয়ে জাউয়ের মতো কাজ করে তা, ভুসির মতো ভুর হয়ে পড়ে থাকে।

তোমাকে চেঞ্জে যেতে বলেছে ডাক্তার মজুমদার।

কোথায় যাব ?

কোনো শুকনো জায়গায় ; কাছেই : দেওঘর, গিরিডি যেতে পার, মিহিজাম, জামতাড়া, ঝাড়গ্রাম—

টাকা আছে চেয়ে যাবার ?

ধার করে নিতে হবে।

প্রভিডেনড ফানডে টাকা নেই ?

সব নিয়েছি, আর নেই।

কার কাছ থেকে ধার করবে ?

নিশীথ একটু ভেবে বললে, 'জিতেনকে বলে দেখব।'

কিন্তু জিতেনবাবু তো টাকা ধার দেন না।

সুমনার দিকে খানিকটা সরস বিস্ময়ে তাকিয়ে নিশীথ বললে, 'কে বললে তোমাকে ?'

তুমিই তো বলেছ।

আমি বলেছি ?—সুমনার মবুণ্ডে শালিখের মতো চোখের ঘোলাটে ভাবটা ভালো লাগছিল না নিশীথের। একটা বেড়াল···ভারি ধবধবে সুন্দর তিব্বতি বেড়ালের মতো মোটাসোটা শাদা ফনফনে লোমে লোমাচ্ছন্ন ; বেড়ালটা মাদী ; অর্জুন গাছের ছায়াকাটা রোদে বসেছিল ; বেড়ালটার সুন্দর মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্নিগ্ধ সচকিত তাকিয়ে রইল নিশীথ ; মুখটা বেড়ালের, না নারীর ছিল কোনোদিন ! জীবনে সৌন্দর্যের প্রবেশ নারীদের সঙ্গে অলিতে গলিতে ঘেঁষাঘেঁষি নিশীথের জীবনে যে খুব বেশি ছিল কোনোদিন তা নয়—কিন্তু সম্ভাবনা ছিল, আবহাওয়া ছিল, প্রতিশ্রুতি ছিল।

জিতেনের কাছে ভালো করে চেয়ে দেখিনিতো আমি কোনোদিন।

এবার দেখবে।

না দেখে উপায় কী ?

পাবে ?

দেখা যাক, প্রভিডেনড় ফানডের আরও সাতশো টাকা তুলে নিয়েছি। আরও তিনশো-চারশো আছে পি এফ-এ ; রেজিগনেশন না দিলে ও টাকা পাওয়া যাবে না। রিজাইন করলেও পাওয়া যাবে না। কলেজের লোন অফিসে আমার আটশো টাকা ধার আছে সুমনা।

সাতশো টাকা তুলেছ ?

হ্যাঁ।

কোথায় সে টাকা ?

তোমাকে দেড়শো দিয়ে যাব। মজুমদার আর তার কমপাউনডারকে পাঁচশো, আমি পঞ্চাশ টাকা নিয়ে কলকাতায় রওনা দেব।

ডাক্তারকে পাঁচশো দিতে হবে।—কর্ণের চাকার মতো সুমনা আরো যেন বসে গেল খানিকটা মাটির ভিতর। এই চাকাটাকে উদ্ধার করে রথ চালিয়ে নিজেকে রক্ষা করবে নিশীথ ? চারিদিক থেকে সমাজ সময়ের শয়তানরা যা চোখা চোখা বাণ মারছে! কয়েকটা হাড়গোড় শুধু, কপালে সিন্দুর : সুমনা জিভ কেটে শিলিঙের দিকে তাকিয়ে আছে। ঠিক এরকম জিনিস খাটে চড়ে আসে! কতলক্ষবার দেখেছে তো নিশীথ : আগুন জ্বলে ওঠে, সৎকার করে ওরা বাড়ি ফিরে যায়। খাটে বেঁধে নিতে হবে ; আগুন জ্বালতে হবে, দাহ শেষ হলে কলসী কলসী জল ঢেলে দুচারটে হাড় কুড়িয়ে এনে চান করে বাড়ি ফিরতে হবে। হাতভরা কাজ পড়ে রয়েছে সব। কিন্তু এসবের আগে নেই—কাজও রয়েছে ঢের ; যাকে বেশি দিন বাঁচালে বেশি টাকা খরচ হবে শুধু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যাবে না কিছুতেই, তাকে যতদিন সম্ভব বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। এটা যে ভুয়ো সংস্কার নিশীথ জানে তা ; কিন্তু তবু এ অসার জিনিসটার কাছে সেও জব্দ হয়ে আছে। রাণু ভানু হারীত তিনজনেই শেষ করে গেছে সুমনাকে। তারপরে তত্ত্বাবধান করতে রেখে গেছে নিশীথকে। ছেলেমেয়ের বাপ হয়ে নিশীথের আজ বেয়াইবাড়ি গিয়ে দুটো মিষ্টি কথা শুনবার সময় হয়েছিল কি—এদের দিকে না তাকিয়ে, জিতেনের কাছ থেকে ঋণ চাওয়ার ভাবনা মনের ত্রিসীমার থেকে তাড়িয়ে দিয়ে হারীতের রোজগার খাওয়ার সময় হয়েছিল। কোথায় হারীত, কোথায় রাণু-ভানুর শ্বশুরবাড়ির ইসিইয়ারকি-ইসটকুটুম্ব সব ? যে-পেঁচা ইসটকুটুম ঢ্যাঢ্যম ঢ্যাঢ্যম বলে উড়ে যায় সেই কুয়াশা শ্মশানের ভিতরে সব।

তোমার ওষুধপত্র ইনজেকশন ডাক্তারের ভিজিট সমস্তই মজুমদার আর তার কমপাউনডার জ্যোৎস্না সিকদার ঠিক করে দেবে। জ্যোৎস্না ছেলে ভালো, আমাদের কলেজে আই এস সি পড়ছিল, ছেড়ে দিয়ে কমপাউনডারি করছে। মজুমদার খুব—

সাধু মানুষ। ঘোড়েল মানুষও বটে—

কেন বলছ সুমনা ?

নাহলে পাঁচশো টাকা নেয়—

নিশীথ কাগজ পেনসিল নিয়ে হিসেব কষে দেখাতে গেল সুমনাকে, পেনসিল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সুমনা বললে,—'কোনো দরকার নেই হিসেবে আমার ? জোচ্চোর যত সব—'

তাহলে কি, টাকাটা ফিরিয়ে আনব ?

দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে—সেই মুখে উল্কি কেটে শেয়ালের মতন ?

তা মুখে উল্কি কেটেছি বটে। কি করব। কলকাতায় যাওয়া বন্ধ করে দিই।

সুমনা কিছুক্ষণ ঘরের কোণে কোণে আট দশ বছর আগের পুরনো শিশি বোতলগুলোর উপর মাকড়সার পাতা জালের রাশি রাশি নির্লিপ্তির দিকে তাকিয়ে থেকে অবসন্ন হয়ে বললে, 'কলকাতায় না গিয়ে কি করবে এখানে বসে ? কলেজের কাজে ইস্তফা দিয়েছ না ?'

না দিইনি এখনো। ছুটি নিয়েছি।

নিয়েছ ? মঞ্জুর করেছে ?

এখনও জানতে পারিনি কিছু। দরখাস্ত দিয়েছি।

তোমাকে ওরা তাড়িয়ে দেবে।

দিক।

তা বলে এখানে বসে করবে কি ? ভানুকে তো কাঁচড়াপাড়ায় পাঠিয়ে দিলে। সে খরচ পোষাবে কি করে ?

টাকা দিয়ে দিয়েছি কিছু। মাসখানেকের ভিতর দরকার হবে বলে মনে হয় না।

আমার দেড়শো টাকা আমাকে দাও।

টাকাটা হাতে নিয়ে একটু হাসি ফুটে উঠল সুমনার মুখে। —'কেন পড়ে থাকবে তুমি জলপাইহাটিতে। মজুমদার ডাক্তার ভালো, বুড়ো মানুষ অসৎ হবে না। পাঁচশো টাকা পেয়েছে—আমার একটা হিল্লে করবেই। আমার জন্য ভেবো না। মহিমবাবুর স্ত্রী, ছেলে, ঘোষালমশাই নিজে, জ্যোৎস্না সিকদার, জিতেন সবাই তো রইল, তুমি কলকাতায় চলে যাও কালই। সুবিধে হবে সব দিক দিয়েই দাশগুপ্তের বাড়িতে। ওখানেই উঠো। জিতেন দাশগুপ্তকে বলে একটা চাকরি বাগিয়ে নিতে হবে—যত তাড়াতাড়ি পার। ইচ্ছে করলে ও খুব বড় পোসটে বসিয়ে দিতে পারে তোমাকে। ওর নিজের অফিসই তো আছে।'

নিশীথ পেটে পেটে হাসছিল—আজকের পৃথিবীর লোকায়তের বলগা মুখে তালপাতার সেপাইয়ের এই কথামৃত শুনতে শুনতে। কিন্তু সম্প্রতি চোখ বুজে স্ত্রীর দিকেই তাকিয়েছিল। বিন্দু বিন্দু বিষণ্ণ হাসিতে অন্তঃস্থল ঘামিয়ে উঠেছিল তার। মৃত্যু শয্যায় মাথা পাতা সাদামাটা এই ঘোর বিশ্বাসী মানুষটির কথা শুনে।

কলকাতায় গিয়ে আর একটি কাজ কোরো তুমি। রাণুকে খুঁজে বার করতে হবে—সুমনা বললে।

রাণু যে কলকাতায় নেই, কোথাও নেই, যদিও বা কোথাও থেকে থাকে সেখানে যে মনপবন ছাড়া আর কারোরই প্রবেশ নেই। এ কথা সুমনাকে কি করে বোঝাবে নিশীথ।

খুঁজে দেখব রাণুকে।

আমাকে ছুঁয়ে বল, বাপ যেমন মেয়েকে খোঁজে তেমনি করে খুঁজে বার করবে।

ছু'য়ে বলছি বটে কিন্তু বাপের চেয়ে মায়ের মনই তো ছেলেমেয়েকে খোঁজে বেশি, মা যেমন মেয়েকে খোঁজে তেমনি করে তোমাকে ছু'য়ে বলছি রাণুকে খু'জে দেখব আমি।

কেমন একটা আশ্চর্য হাসি-হাসির ভিতরে একআধছিটে রক্তের কণাও যেন এল সুমনার ফ্যাকাসে মুখে—

নাখোদা মসজিদে দেখব।

কাকে.?

রাণুকে।

কে বললে সে সেখানে আছে।

অনেকে বলছে। —নিশীথ মাথা নেড়ে বললে, 'ভুল বলেছে। কথা বলে নেশা জমিয়ে দিতে চায় ওরা। বড় সর্বনেশে লোক। ওদের চেয়ে আমি বেশি জানি।'

কি জান তুমি। রাণু কোথায় আছে জান?

আমি খু'জে দেখব।

সুমনা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'আমি কিছু জানি না। মেয়েকে হাত ধরে নিয়ে আসতে হবে দেশে। স্টেশন থেকে বেড়িয়ে নিয়ে আসতে তুমি ওকে রোজ সন্ধ্যায়; চোৎ মাসের মেলায় থেকে. হাতে ধরে ঝড়-বাতাসের, কু-বাতাসের থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসতে। আমি বলতাম মোমের আলো নাকি যে অত সন্তর্পন। ওতো চাঁদ— কু-বাতাসে ওর করবে কী। কিছুক্ষণ চুপ থেকে সুমনা বলল 'কিছু করেছে বটে কু-বাতাসে। ভানুর খবর কি?'

এই তো যাচ্ছি কলকাতায়, কাঁচড়াপাড়ায় নামব একবার।

শনিবার শনিবার যেও কিন্তু কাঁচড়াপাড়ায়। রোববারটা থেকে এসো, ওর মামা আছে বটে ওখানে। কিন্তু সেতো কোনোদিন ডেকে জিজ্ঞেস করত না; এখন কি গা দেবে? নিশীথ চলে গেল একটু বাইরের হাওয়া খেয়ে আসতে। কলেজের ফিলজফি-লজিকের অধ্যাপক মহিম ঘোষাল তার পরিবার নিয়ে নিশীথদের ভাড়াটে বাড়িটার একটা অংশে রয়েছে। বাড়িটা একতলা। ছাদে ওঠার সিঁড়ি আছে। সব নিয়ে ছটা ঘর—দুটো রান্নাঘর, দুটো স্নানের ঘর আছে। রান্না ও স্নানের একটা একটা ঘরই ছিল। অধ্যাপক দুটি চাঁদা করে যুদ্ধের আগে সস্তার মরশুমে দুটো বাড়তি ঘর তৈরি করিয়ে নিয়েছিল। বাড়িটার দক্ষিণ দিকের অংশে নিশীথরা দুবছর থাকে—উত্তরের ভিটেয় মহিমরা। দুবছর কেটে গেল নিশীথদের উত্তরে যেতে হয়, মহিমদের তখন দক্ষিণায়ন।

এমনি করে বারো বছর এ বাড়িতে বেশ অজ্ঞাতবাসে কেটেছে নিশীথের। দিনগুলো মন্দ ছিল না। কলেজের কাজে মাইনে বেশি ছিল না, ঝঞ্ঝাটও তেমন কিছু ছিল না। স্বাধীনতা ছিল একরকম। মফস্বলের উঠানের—মাঠের ঘাসের মতন একটা সহজ দিব্যতা ছিল হৃদয় শরীরের নির্লিপ্তি ও শান্তিকে পরিব্যাপ্ত করে। উত্তেজনা উৎসব মহৎ আকাঙ্ক্ষার দূরতায় ভাবুক নিশীথকে দিয়ে কথা ভাবাত, মাঝে মাঝে দু-চারটে লিপি লিখিয়ে নিত—খুব সংক্ষেপেই। তারপর লৌকিক পৃথিবীর ব্যক্তিগত তুচ্ছতার মৃদু সংঘর্ষের দেশে সে সব বড় বড় বাতাসের আক্ষেপ কোথাও কিছু আশ্রয় না পেয়ে নষ্ট হয়ে যেত। জলপাইহাটি ছেড়ে কলকাতায় যাবার সময় এই কথাগুলো ভাবছিল নিশীথ। জলপাইহাটিতে আর ফিরে আসা হবে না। সুমনা হয়তো মরে যাবে। রাণুকে খু'জে পাওয়া যাবে না; ভানুও যে ফুরিয়ে যাবে সেটাও নির্দোষ সত্য কথনের অপর পিঠের মতনই সত্য ও নির্মল। অথচ জলপাইহাটিতে এদের সকলকে নিয়ে হারীতকে নিয়ে একটা যুগ—মানুষের জীবনের একপুরুষকালই যেন কেটে গেছে নিশীথের। এরা আজ সকলেই প্রায় বিদায় নিয়েছে—নিচ্ছে; জলপাইহাটির বাড়িও বিদায় নিয়ে গেল নিশীথের মন থেকে। বিদায়ের ভান করেছিল এর আগে কয়েকবার। কিন্তু সে সব ভান ভেঙে ফেলবার মতো তোড়জোড় ছিল তখন চারিদিককার আবহাওয়ায় জলপাইহাটিতে-পৃথিবীতে-নিশীথের জীবনে ইতিহাসে। কিন্তু উনিশশো আটত্রিশ ঊনচল্লিশ থেকে ইতিহাস যে মোড় ধরেছে, চল্লিশ একচল্লিশ বেয়াল্লিশ তেতাল্লিশ-ছেচল্লিশে এসে কেমন যেন অস্বাভাবিক দ্রুততায় পুরনো পৃথিবীও স্বভাব শেষ করে দিল সব। রাণু যে হারিয়ে গেছে, সুমনা যে মরছে, ভানুর যে এই অবস্থা, হারীত যে অলাতচক্রে ঘুরছে এগুলো কোনো একটি বিশেষ পরিবারের বিচিত্র ব্যক্তিসর্বস্ব জিনিস নয়—আকস্মিক ঘটনা নয় এ সব—এ রকম না হয়ে পারত না। নিশীথের নিজের জীবনদৃষ্টিও গত দু-তিন বছরের ভিতর, সময়ের আগুনের ভিতর নিজেকে ক্ষালন করে নিতে নিতে অনুভব করেছে পৃথিবীর স্থির সত্যগুলো। স্থির হয়তো কিন্তু কেবলি নতুন ধারাপ্রপাতের দ্রুততার ভিতর দিয়ে নিজেদের স্থিরভাবে আবিষ্কার করে নিতে ভালো.বেসে তারা—দ্রুত বিদ্যুতের চুড়োয় চুড়োয় আকাশও যে বিদ্যুৎ ও ঝড়—এরকম বিভ্রম বিলাস জাগিয়ে তোলে আত্মহারা মানুষের মনে। কিন্তু ঝড় বিদ্যুৎ অন্ধকার যখন সমস্ত শেষ করে দিয়ে যাচ্ছে— তখন লক্ষ লক্ষ মানুষের দিশাভ্রষ্ট হওয়া ছাড়া উপায়—হত নিহত নির্বাপিত ,হওয়া ছাড়া পথ নেই—ইতিহাসের দু'তিন পুরুষ, ছ'পুরুষ, এক পুরুষ যারা এরকমভাবে ক্ষয়িত হয়ে যায় তারা ভবিষ্যৎ মানুষের মনে জ্ঞান, হৃদয়ে অনুতাপ, শুদ্ধতা বাড়িয়ে দেয় কিনা বলা কঠিন—কিন্তু নিজেদের জ্ঞান সম্পূর্ণ করে যায় এই জেনে যে মানুষের বিদ্যা বাড়লেও তার জ্ঞান বাড়ে না, বাড়াতে গেলেও তা জ্ঞানপাপে দাঁড়ায় গিয়ে। মানুষের মন আলোকিত করতে পারে না (দু'একজন সৎ ও মনীষীর মন ছাড়া) মানুষকে আশা, ভরসা, প্রতিশ্রুতি-শান্তি দিতে পারে না কিছুই। এরকম উপলব্ধির কোনো যাথার্থ্য আছে বলে মনে করত না দু'চার বছর আগে নিশীথ। কিন্তু এখন করে। এখন সে মানে যে এ যুগে এর চেয়ে যাথার্থ্য আর কিছু নেই। এ যুগে ক্ষয়িত হওয়াই স্বাভাবিক— মৃত হওয়া, নির্বাসিত হওয়া—অবক্ষয় উত্তীর্ণ করে ক্ষেম সূর্যের মুখ দেখাকে অপর যুগের সুস্থির সত্য বলে গ্রহণ করা চলতে পারে। কিন্তু সেই অপরযুগ কি এমনি এমনি আসবে? কজন লোক চেষ্টা করছে সেই যুগকে লাভ করতে? কি প্রণালী তাদের? কোথায় সেই পদ্ধতি একটা শুষ্ক বড় শতাব্দীকে নিয়ে আসতে হলে পৃথিবীব্যাপী যে সাড়া পড়ে যায়। কোথায় সেই আশা ভরসা নিঃস্বার্থতা? আসল বোমাটা এর হাতে আছে বটে, কিন্তু ওর হাতে আছে কিনা এই তাড়নায় তো আজকের পৃথিবী পঙ্গু। শুধু আমেরিকা বা রাশিয়া নয়—এশিয়ার— আমাদের দেশেও পদ্মানদীর এপারে ওপারে রাষ্ট্রে, সমাজে, পরিবারে 'ম' কে ব্যাহত করবার কৌশল জানা আছে 'ক'-এর। জানা আছে কি 'খ'-য়ের 'ক'-কে বেচাল করবার কৌশল শুধু নয় অস্ত্রসিদ্ধি? মনের তপঃশক্তিতে মেশিনকে চালাতে পারত হয়তো মানুষ, কিন্তু মানুষকে ছুটিয়ে চালাল মেশিন, মানুষকেই চালাল সে, যন্ত্রকে ব্যবহার করবার মতো সততা ও মনীষা হারিয়ে ফেলেছে মানুষ। এই সবই তবে আজকের পৃথিবীর নিহিত সত্য, কতকাল পর্যন্ত ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে থাকবে কে জানে।

তাই যদি হলো তাহলে ইতিহাসে যে সব আলোড়নের যুগ কেটে গেছে, বিলোড়নের দিনকাল আসবে বলে মনে হয় সবই যখন শেষ পর্যন্ত মৃত্যু দ্বেষ ও পতিতের ধর্মেই আবর্তিত হচ্ছে শুধু, তখন ইতিহাসের বিষ ও সোমরসের দিকে তাকিয়ে অতীত বা ভবিষ্যৎ সমাজের অমৃতত্ব ঘোষণা করে কি লাভ? কোনো বড় ঘোষণারই কোনো মানে নেই।

মনীষীরা অবিশ্যি ভালো বই লিখবে, নেতারা বিমিশ্র ভাষার কাঁচা বিবৃতি দেবে—পাকাতে পারবে, কবি বিজ্ঞানীদের একটা বড় শ্রেণী অংশ সূর্য স্বপ্ন দেখবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ মরে যাচ্ছে; পৃথিবীর থেকে শেষ বিদায় নেবার আগে হিংসার পরিবর্তে হিংসা ফিরিয়ে দেবার বিজাতীয় লোভে দুর্বল ঠোঁট কেঁপে উঠছে কারু; রিরংসাকেই জীবনে সফল করে ভয়াবহ বৃষ গর্দানের দোষে রক্তের চাপে মরে যাচ্ছে কেউ।

[ক্রমশ]

বাংলা ছবির চিত্রনাট্য

মালঞ্চ

ছবির দৈর্ঘ্য : ১২ রীল
আর্থিক অনুদান : ১,৫০,০০০
কাহিনী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রযোজনা, চিত্রনাট্য, সঙ্গীত, পরিচালনা : পূর্ণেন্দু পত্রী
চিত্রগ্রহণ : পান্তু নাগ
সম্পাদনা : অরবিন্দ ভট্টাচার্য
অভিনয়ে : মাধবী চক্রবর্তী, সুমিত্রা মুখার্জি, সন্তু মুখার্জি, ধ্রুব মিত্র, রবি ঘোষ, সন্তোষ দত্ত, দিপালী চক্রবর্তী।

ছবি তৈরির কাহিনী :
সাতাত্তর সালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ণেন্দু পত্রী বলেছিলেন—'জনসাধারণের কাছে হাত পেতে চাঁদা চাইছি। চাঁদা তুলে ছবি করব এবার। কারণ গত চার পাঁচ বছরে কোনো প্রযোজক আসেনি আমার কাছে।' শুরু তখন থেকেই। তারপর বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতায় ও রাজ্য সরকারের অনুদান নিয়ে উনআশি সালে এই ছবিটি শেষ করেন। আশি সালে অনুষ্ঠিত ভারতের আন্তর্জাতিক উৎসবে 'মালঞ্চ' ইণ্ডিয়ান প্যানোরামা বিভাগে নির্বাচিত হয় না, অথচ বার্লিন উৎসবে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পায়। লাল সুতোর ফাঁশ গলায় নিয়ে ছবিটি শেষ পর্যন্ত যেতে পারেনি বার্লিনে। এমনকি নিজের শহরেও ছবিটিকে মুক্তি দিতে পারেননি এখনও পূর্ণেন্দু পত্রী! কারণ প্রদর্শক—পরিবেশক চক্রের অশুভ আঁতাত।

সিকোয়েন্স/৭ দৃশ্য/৬ অভ্যন্তর। রাত্রি।

নীরজার শোবার ঘর।

ফলের বাসকেট নিয়ে আদিত্য ঘরে ঢুকে নীরজার পাশে বসল।

নীরজা—আমাদের দশ বছরের বিয়ের জীবনে আজ ঘটল প্রথম ব্যতিক্রম।

আদিত্য—কী ব্যতিক্রম নীরু?

নীরজা—আজ ফুল পেলুম না তোমার হাত থেকে।

আদিত্য—কেন? সরলা দিয়ে যায়নি?

নীরজা—দিয়েছে। কিন্তু সে কি তোমার হাত থেকে পাওয়া?

আদিত্য—মিথ্যে রাগ করছ নীরু। যাবার আগে তোমার কাছে এসেছিলুম। দেখলুম অঘোরে ঘুমোচ্ছ। তাই আর ডাকলুম না তোমাকে। তাছাড়া আপিসে যাওয়ার তাড়া ছিল। অনেক গণ্ডগোল চলছে সেখানে।

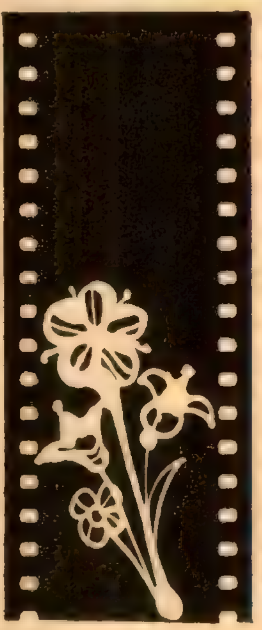

নীরজা—আপিস থেকে ফিরে কি করলে? সরলাকে নিয়ে অর্কিড ঘরে যাওনি?

আদিত্য—হ্যাঁ, ওকে কিছু কাজ বুঝিয়ে দেওয়ার ছিল।

নীরজা—ভোরে উঠে বাগানের ফুল তুলছিলে দুজনে?

আদিত্য—হ্যাঁ, ও আমাদের অনেকদিনের অভ্যেস। মেসোমশাই ভোর চারটের আমাদের তুলে দিয়ে বলতেন, যাও, বাগানে যাও

নীরজা—ওকে আর ডেকো না। ওর বদলে হলাকে ডেকে নিও।

আদিত্য—(হেসে) হলা? ওর যা নাক ডাকে আমার ডাক ওর কানে গিয়েই পৌঁছয় না।

সিকোয়েন্স ৭ দৃশ্য ৭ বহির্দৃশ্য। ভোর।

বাগান

আদিত্য ও সরলা বাগানে ফুল তুলছে।

সিকোয়েন্স ৮ দৃশ্য/১ বহির্দৃশ্য। দিন।

নীরজার শোবার ঘর।

রোশনি মুখ ধুইয়ে দিল নীরজার। নীরজার চোখ বাগানের দিকে

নীরজা—কতদিন ভোরবেলায় বাগানে যাইনি। রোজ ভোরে আমাকে জাগাতেন। ভোরবেলায় ফুলের চালান না পাঠিয়ে আমার একটা দিনও কাটত না।

রোশনি—যাবে খোঁখি! সেরে উঠলে আবার যাবে

নীরজা—জানলাটা খুলে দে।

রোশনি জানলাটা খুলে দিল।

নীরজা—আয়নাটা দে।

রোশনি আয়না চিরুনী নিয়ে তার সামনে এল।

নীরজা—আর যাই হোক আমার সময়ে মালিরা ফাঁকি দিতে পারত না।

রোশনি—এখন তো হরির লুট চলেছে।

নীরজা—তোর জামাইবাবুকে বলিসনি কেন? থেমে) চলুক এমনি কিছুদিন। তারপর সব ছারখারে যাবে। একদিন বোঝার সময় হবে, মায়ের চেয়ে সৎমার ভালবাসা বড় নয়।

রোশনি—তবে তোমার ঐ হলা মালিকে দিয়ে কোনও কাজ হবে না।

নীরজা—হলার কি দোষ? নতুন মনিবকে ঐ বা সইতে পারবে

কেন? ওদের হলো সাতপুরুষে মালিগিরী! আর তোমার সরলা দিদিমণির হলো বই পড়া বিদ্যে।

নীরজা কপালে সিঁদুরের টিপ পরল। রোশনি জলের গামলা নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সরলা ঢুকল ঘরে। হাতে একটা অরকিডের ডাল। রাখল নীরজার বিছানায়। নীরজা তাকিয়ে দেখল। তার চোখে মুখে রাগ। চাপা বিরক্তি।

নীরজা—এ ফুল তোমায় কে আনতে বললে?

সরলা—আদিত্যদা।

নীরজা—নিজে এলেন না যে।

সরলা—আজ খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন। কাল রাত্রে আপিসের তালা ভেঙে চুরির খবর এসেছিল।

নীরজা—টানাটানি করে পাঁচ মিনিট সময় দিতে পারলেন না?

নীরজা রাগে ফুলটা তুলে নিল হাতে।

নীরজা—জানো মার্কেটে এ ফুলের দাম কত? পাঠিয়ে দাও সেখানে।

নীরজা ছুঁড়ে ফেলে দিল ফুলটাকে।

নীরজা—কি করছিলে সারা সকাল? কোথায় ছিলে?

সরলা—অরকিড ঘরে।

নীরজা—অরকিড ঘরে তোমার ঘন ঘন যাবার কি দরকার?

সরলা—আদিত্যদা বলেছিলেন পুরনো অরকিড চিরে নতুন অরকিড বানাতে।

নীরজা—আনাড়ির মতো সব নষ্ট করবে তুমি। আমি নিজের হাতে হলা মালিকে তৈরি করে শিখিয়েছি। তাকে হুকুম করলে সে কি পারত না? তোমার উপরে বাগানের আর কি ফরমাস আছে?

সরলা—গোলাপের ডাল পুঁততে হবে।

নীরজা—এই কি তার সময় নাকি?

সরলা—মফস্বল থেকে হঠাৎ অনেক গুলো অরডার এসেছে। তাই বর্ষার আগেই গাছগুলো বানাতে বললেন আদিত্যদা। আমি বারণ করেছিলাম।

নীরজা—ওঃ, বারণ করেছিলে?

সরলা—তোমার মকরধ্বজ খাওয়ার সময় হয়েছে।

নীরজা—দরকার নেই। হলাকে একবার পাঠিয়ে দিও তো।

সরলা চলে গেল। নীরজার প্রতিক্রিয়া।

সিকোয়েন্স/৮ দৃশ্য/২ অভ্যন্তর। দিন।

দোতলার বারান্দা।

হলা পড়ি মরি করে ছুটে আসছে বারান্দা দিয়ে।

সিকোয়েন্স/৮ দৃশ্য/৩ অভ্যন্তর। দিন।

নীরজার শোবার ঘর। নীরজা ও হলা।

নীরজা—তোমরা সব বাবু হয়ে উঠেছ? গোলাপের ডাল পুঁততে হাতে খিল ধরে? দিদিমণি তোমাদের অ্যাসিসটেনট মালি নাকি?

হলা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে।

নীরজা—বাবু শহর থেকে ফেরার আগেই যতগুলো পারিস ডাল পুঁতবি। আজ আর ছুটি নেই। পোড়া ঘাস পাতার সঙ্গে বালি মিশিয়ে জমি তৈরি করে নিবি ঝিলের পাড়ে। মনে থাকবে?

হলা—মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানাল।

নীরজা—যা।

হলা চলে গেল।

সিকোয়েন্স/৮ দৃশ্য ৪ বহির্দৃশ্য। দিন।

বাগান।

হলা একটা জায়গায় বসে পায়ের তলা থেকে কাঁটা বের করছে। সরলা এসে দাঁড়াল পিছনে।

সরলা—এখানে কি করছিস?

সরলার সাড়া পেয়ে হলা উঠে দাঁড়াল ত্রাস্ত ভঙ্গীতে।

সরলা—মল্লিকদের বাড়ি ভাঙা হচ্ছে দেখেছিস?

হলা—হাঁা।

সরলা—ঐখান থেকে ভাঙা ইঁট সুরকি এনে গাছের তলায় বিছিয়ে দে।

হলা—আজই আনতে কইতেছেন?

সরলা—আজ নয়। এখুনি।

হলা—রোদের সময় সুরকি দিলে গাছের গরম লাগবে।

সরলা—গাছের কি হবে না হবে, সে আমি বুঝবো। তোকে যা বলছি, তাই কর।

সরলা চলে গেল। হলার প্রতিক্রিয়া।

বাগান।

হলা ও একজন মালি সুরকি বইছে।

বাগানের একটা জায়গায় সুরকি ফেলছে হলা।

সিকোয়েন্স/৯ দৃশ্য/১ অভ্যন্তর। দিন।

দোতলার বারান্দা।

হলা আসছে। হাতে একটা পিতলের ঘটি।

নীরজার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

হলা—বৌদিই-ই।

নীরজা—ভিতরে আয়।

সিকোয়েন্স/৯ দৃশ্য/২ অভ্যন্তর। দিন।

নীরজার শোবার ঘর।

হলা ঘরে ঢুকে পিতলের ঘটিটা রাখল খাটের সামনে টুলে।

নীরজা—ওটা কি রে ?

হলা—পিতলের ঘটি বৌদি। কটকের তৈরি। তোমার ফুলদানী হবে।

নীরজা—দাম কত ?

হলা—এর আবার দাম নিব বৌদি। গরিব বলে তো ছোটলোক হয়ে যাইনি।

নীরজা—তাহলে কাজ ছেড়ে দিতে চাইছিস কেন ?

হলা—বৌদি, তুমি যখন মনিব ছিলে, যা বলেছ করেছি। তখন ছিলাম মালি, এখন হয়েছি কুলি।

নীরজা—কেন ? কুলি হতে যাবি কেন ?

হলা—মল্লিকদের বাড়ি ভাঙা হতেছিল। সরলা দিদিমণি হুকুম দিলেন ভাঙা সুরকি এনে গাছের তলায় বিছোতে। আমি বলেছিনু, গরম সুরকি দিলে গাছের গরম লাগবে। ধমক খেনু সে কথা কয়ে। মাথা হেঁট করে ঝুড়ি ঝুড়ি সুরকি বইতে হলো। দেশের লোকের কাছে আমার জাত গেল বৌদি। (থেমে ; দেশ থিকেন চিঠি এয়েছে বৌদি। হালের গরুটা মারা গেছে।

নীরজা—চুপ কর। কেউ মরেনি। রোশনিই

রোশনি ঘরে ঢুকল জলভর্তি কুজো নিয়ে।

নীরজা—ক্যাশ বাকসোটা দেতো।

রোশনি ক্যাশ বাকসো এনে দিল। নীরজা দুটো টাকা দিলে হলাকে। হলা নীরজার হাত থেকে টাকাটা নিয়ে চুপ করে বসে রইল।

নীরজা—বসে রইলি কেন ? কাজে যা। সরলা দিদিমণি যদি এর পর সুরকি বইতে বলে, আমার নাম করে বলবি, বারণ করেছি। যা, কাজে যা।

হলা—বৌদিদি, মোর ভাগনির বিয়ে। এত বড় বাড়ির মালি। পিতলের গয়না দিলে তোমাদেরই নিন্দে হবে। দেশশুদ্ধ মানুষ তাকি আছে। কি দিই, কি দিই।

নীরজা—কি চাস তুই ?

হলা—বাজু যদি দেন এক জোড়া। সোনা বাঁধানো।

নীরজা—আচ্ছা দেখবো। যা এখন।

হলা—বৌদিদি, বউটার জন্যে শাড়ি দিবেননি একখান ? বিয়ের দিন পরবে।

নীরজা—(রোশনিকে) দেতো ওকে আলনার উপরের ঐ শাড়িটা।

রোশনি—সে কি খোঁখি। ও যে ঢাকাই শাড়ি।

নীরজা—আমার কাছে এখন সব শাড়ি সমান। কবে আর পরব ?

রোশনি আলনা থেকে শাড়িটা নিয়ে ছু'ড়ে দিল হলার সামনে।

হলা—বৌদিদি। হাতটা মোংরা। কত দামের শাড়ি। মোংরা লাগবে। তুয়ালেটা নি। হলা নীরজার টুল থেকে তোয়ালেটা নিয়ে শাড়িতে জড়িয়ে বেরিয়ে গেল।

রোশনি এসে দাঁড়াল নীরজার শিয়রে।

রোশনি—খোঁখি ! ভাল মানুষ পেয়ে লোকে তোমাকে ঠকিয়ে যাবে এমনি করে ?

নীরজা—রোশনি ! এখন আমার ঠকার পালা।

সিকোয়েন্স ৯ দৃশ্য ৩ বহির্দৃশ্য। দিন।

বাগান।

রমেন আসছে বাগান দিয়ে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল পুকুর ঘাটে একলা বসে থাকা সরলা। রমেন চুপি চুপি এগিয়ে গেল সেই দিকে। কাঁধের ব্যাগ থেকে বের করলে আবীরের কৌটো। হাতের মুঠোয় ভরে নিলে আবীর। পিছন থেকে এসে আবীর মাখিয়ে দিলে সরলার মুখে।

রমেন—হোলি হ্যায় !

রমেন বসল সরলার পাশে। দেখতে পেল সরলার বিষণ্ন করুণ মুখ।

রমেন—কি হয়েছে ? কি হয়েছে ?

সরলা নিরুত্তর।

রমেন—বলবে না ? ঠিক আছে।

রমেন চলে গেল। সরলার প্রতিক্রিয়া।

সিকোয়েন্স ৯ দৃশ্য ৪ অভ্যন্তর। দিন।

নীরজার শোবার ঘর।

রমেন আবীর মাখিয়ে দিলে নীরজার পায়ে।

নীরজা আবীর মাখিয়ে দিলে রমেনের কপালে।

রমেন—বৌঠান, সরলাকে বকেছ নাকি ?

নীরজা—কেন ?

রমেন—ঘাটের সিঁড়িতে বসে আছে। মনমরা, চোখে জল।

নীরজা—তোমার সঙ্গে কথা আছে ঠাকুরপো।

রমেন তার আবীর মাখা কপাল মুছতে লাগল রুমালে।

নীরজা বালিশের তলা থেকে বের করল একটা নষ্ট হয়ে যাওয়া পুরনো ফটোগ্রাফ। এগিয়ে ধরল রমেনের দিকে।

নীরজা—দেখতো; চিনতে পারো কি না।

রমেন—এতো আদিত্যদাদের ছেলে বেলার ছবি ! তুমি কোথায় পেলে ?

নীরজা—পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটতে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সরলা তখন কি মিষ্টি ছিল দেখেছো ?

রমেন—এখনো আছে।

নীরজা—আচ্ছা বলতো সকলের আগে কী চোখে পড়ে ওর ?

রমেন—সবটাই, একসঙ্গে।

নীরজা -আজ্ঞে না। চোখ দুটো। কেমন যেন গভীর করে তাকাতে পারে। আর কী নিটোল দেখছো ওর হাত দুটো।

রমেন—তুমি কি ওকে নিলেম করতে বসেছ নাকি ?

নীরজা—ঠাকুরপো !

রমেন—বলো।

নীরজা—আমার দিকে তাকাও।

রমেন—তাকালাম।

নীরজা—সরলাকে তুমি বিয়ে কর।

রমেন—করলাম।

রমেন হেসে ফেলল।

নীরজা—ঠাট্টা নয়। আইবুড়ো মেয়েকে উদ্ধার করা মহাপুণ্যের কাজ।

রমেন—বৌঠান আমি যে রাস্তায় হাঁটি, সেটা সপ্তপদী গমনের রাস্তা নয়, বড় পিছল। কখন যে জেলখানা থেকে ডাক আসবে, তার ঠিক নেই।

নীরজা—তোমার ঐ জেল-জেল খেলাটা ছাড়তো।

রমেন—খেলা নয় বৌঠান। প্রেমে পড়ে গেছি।

রমেন হঠাৎ গান ধরল।

হাসি হাসি পরব ফাঁসি
দেখবে জগৎবাসী।

নীরজা—আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। মরবার আগে তোমাদের বিয়েটা দেখে যেতে চাই। নইলে ভূত হয়ে জ্বালাতন করব। কেন, সরলাকে তোমার পছন্দ নয় ?

রমেন—খুব পছন্দ। তবে সে কেবল কল্পনায়।

নীরজা—বাস্তবেও তাই হবে। একবার ডেকে আনতো তাকে।

রমেন—সে আসবে না। তার যা মুখের চেহারা দেখলুম।

নীরজা—আমার নাম করে বল। ঠিক আসবে।

রমেন বেরিয়ে গেল।

নীরজা ফটোগ্রাফটা দেখছে। শোনা গেল আদিত্যর গাড়ির হর্ণ।

নীরজা—রোশনিই—রোশনিই—

রোশনি ঘরে ঢুকল।

নীরজা—তোর জামাইবাবুর গাড়ি এল ?

রোশনি—হ্যাঁ খোঁখি।

নীরজা—আয়নাটা দেতো একবার।

রোশনি আয়না এনে দিল। নীরজা চুল আঁচড়াচ্ছে।

নীরজা—আজ আমার মুখটা এত ফ্যাকাশে লাগছে কেন ?

রোশনি—হবে না ? রোজ রোজ না খেয়ে থাকলে মুখ কি গোলাপী হবে ? দুধ আনি ?

নীরজা —না।

রোশনি—না খেয়ে থাকো তবে সারাদিন।

এই সময় আদিত্য ঢুকল ঘরে।

রোশনি বেরিয়ে গেল।

আদিত্য—আজ কতক্ষণ তোমাকে দেখিনি নীরু। যতক্ষণ না ফিরছি মনে স্বস্তি ছিল না। তুমি নিশ্চয় জান, আমার কোনো দোষ ছিল না।

নীরজা—অত নিশ্চয় করে কি করে জানবো বলো ? আমার কি আর সেদিন আছে। সত্যি করে বলতো আজ সকালে তুমি আমার ভুলে যাওনি ?

আদিত্য—কি বলছো নীরু ? যাবার আগে এসেছিলুম তোমার কাছে। দেখলুম অঘোরে ঘুমোচ্ছ। তাই আর ডাকলুম না তোমাকে। তুমি মিথ্যে সন্দেহ করছ নীরু।

দরজার কাছে রোশনির কণ্ঠস্বর।

রোশনি—জামাইবাবু, খোঁখি আজ সকাল থেকে দুধ খায়নি, মালিশ করেনি। ওষুধ খায়নি। এমন করলে আমরা ওর সঙ্গে পারব না।

রোশনি চলে যাবে।

আদিত্য—কেন খাওনি নীরু ? খুব অন্যায়

নীরজা—তোমার পা দুটো দাও তো !

সিকোয়েন্স/৯ দৃশ্য/৫ বহির্দৃশ্য। দিন।

বাগান।

সরলা আসছে বাগান থেকে বাড়িতে, আঁচলে মুখের আবীর মুছতে মুছতে।

সিকোয়েন্স ৯ দৃশ্য/৬ অভ্যন্তর। দিন।

নীরজার শোবার ঘর।

নীরজা আবীরের প্যাকেট থেকে একটু আবীর নিয়ে বুলিয়ে দিলে আদিত্যর পায়ে। আদিত্য নীরজার কপালে দিল আবীরের টিপ।

আদিত্য-রোশনি এই সময় সরলা এসে দাঁড়াল দরজার কাছে।

আদিত্য—ওঃ সরলা ! তোমার বৌদি সকাল থেকে কিছু খাননি। কেন খেতে দেওয়া হয়নি ওকে ?

নীরজা—ওকে বকছো কেন বলতো ? ওর কী দোষ ? সরলা তুমি যাও তো ভাই। ও বেচারী সারাদিন খাটছে মালির কাজে। আবার নার্সেরও কাজ।

সরলা চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল।

আদিত্য—শোনো, অরকিড ঘরের কাজ হয়ে গেছে ?

সরলা—হ্যাঁ।

আদিত্য—গোলাপের কাটিং ?

সরলা—মালিরা জমি তৈরি করছে।

আদিত্য—হলার উপর ভার দিয়েছ ? তাহলে তো গোলাপ হবে না। দাঁতন কাঠির চাষ হবে। তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাজগুলো করাও।

সরলা চলে যাচ্ছিল।

আদিত্য—তোমার বৌদির জন্যে কমলালেবুর সরবৎ এনে দাও এক গ্লাস। তাতে একটু আদার রস আর মধু দিও।

সরলা চলে যাবে।

নীরজা—তুমি ওকে বড্ড খাটিয়ে মারছো। আমি একটা কথা বলব?

আদিত্য—বল।

নীরজা—রমেন ঠাকুরপোর সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে দাওনা।

আদিত্য—ঘটকালি করা কি আমার ব্যবসা?

নীরজা—আসল কথা, তোমার ইচ্ছে নয় বিয়েটা।

আদিত্য—ঠিক বলেছ নীরু। সরলা চলে গেলে আমার বাগান দেখবে কে?

নীরজার শরীরে ঘনিয়ে উঠল একটা যন্ত্রণার ভঙ্গী। আদিত্যর চোখে পড়বে। আদিত্য থামাতে এলে বারণ করবে নীরজা।

নীরজা—আমাদের বিয়ের পর ঐ অরকিড ঘরের পত্তন। আমরা দুজনে মিলে ওটাকে সাজিয়ে তুলেছিলাম।

আদিত্য—সে তো জানি নীরু।

নীরজা—জানো? তবুও ওটাকে নষ্ট হতে দিতে তোমার এতটুকুও লাগল না?

আদিত্য—নষ্ট হবে কেন?

নীরজা—সরলা কী জানে বাগানের?

আদিত্য—কি বলছো নীরু? যে মেশোমশায়ের কাছে আমি মানুষ, তিনি তো সরলারই জ্যাঠামশাই সারাজীবন বাগান নিয়ে ..

নীরজা—ঐ বাগান নিয়েই তো সর্বনাশ হয়ে গেল এমন অলুক্ষুনে মেয়ে।

আদিত্য—আজ তোমার কী হয়েছে বলতো?

নীরজা—সরলাকে তুমি বিয়ে করলে না কেন? তুমি তো ভালবাসতে ওকে।

আদিত্য—নিশ্চয়ই বাসতাম। আমি কি জড় পদার্থ যে ওকে ভালবাসতাম না? মেশোমশাই তাঁর নিজের ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন রেঙ্গুনে। ব্যারিসটারী পড়তে। আর সরলাকে রেখেছিলেন কাছে। বাগান নিয়েই সারাজীবন থাকবে; বিয়ে করবে না, এই চেয়েছিলেন তিনি। তারপর তিনি চলে গেলেন। বাগান চলে গেল পাওনাদারদের হাতে। অনাথ হলো সরলা। বুক ভর্তি ওর দুঃখ। তবু একদিনের জন্যেও দীর্ঘশ্বাস ফেলেনি আমার কাছে।

নীরজা—থামো গো থামো। অনেক শুনেছি আর বলতে হবে না। অসামান্য মেয়ে। তাহলে দাও না বারাসাতের মেয়ে স্কুলের হেডমিসট্রেস করে।

আদিত্য—বারাসতের মেয়ে স্কুল? কেন আন্দামানেও তো আছে?

নীরজা—ঠাট্টা নয়। সরলাকে বাগানের আর যা কাজ দাও, দিও। অরকিড ঘরের কাজ দিতে পারবে না।

আদিত্য—কেন?

নীরজা—ও অরকিড বোঝে না!

আদিত্য—শোনো নীরু। ও আমার চেয়েও বেশি বোঝে। মেশোমশায়ের সবচেয়ে বড় শখ ছিল অরকিডের। লোক পাঠিয়ে জাভা থেকে, চীন থেকে, সেলিবিস থেকে অরকিড আনাতেন তিনি।

নীরজা—জানি গো জানি, ও আমার চেয়ে ঢের বেশি বোঝে। তবুও ঐ অরকিড ঘর শুধু তোমার আর আমার।

নীরজার কান্না। সরলা সরবতের গ্লাস নিয়ে ঘরে ঢুকল।

আদিত্য—রেখে দাও।

সরলা গ্লাস রেখে বেরিয়ে গেল।

আদিত্য—কেঁদো না নীরু। বল কি করব, তুমি কি চাও, সরলাকে বাগানের কাজে না রাখি?

নীরজা—কিছু চাইনে, কিছু না, তোমার বাগান, তুমি যাকে খুশি দিতে পার।

আদিত্য—আমার বাগান? তোমার নয়? কবে থেকে এমন ভাগ হয়ে গেল?

নীরজা—যেদিন থেকে তোমার জন্যে রইল সবকিছু আর আমার জন্যে এই ঘরের কোণ। আমার এই ভাঙ্গা প্রাণ নিয়ে আমি কিসের জোরে দাঁড়াব তোমার ঐ আশ্চর্য সরলার পাশে?

আদিত্য—নীরু আগে তো কতদিন সরলাকে কাছে ডেকেছ তুমি। কতবার পরামর্শ করেছো ওর সঙ্গে। মনে নেই? সেবার বাতাবি লেবুর সঙ্গে কলম্বা লেবুর কলম বাঁধা নিয়ে…

নীরজা—তখন ওর অত গুমর ছিল না। আমার বাগানে এখন ওরই আধিপত্য। কোথাও একটু ব্যথা লাগল না তোমার মনে? আমার বাগান কি আমার দেহ নয়? সেটাকে চিরে দুখানা করে ফেলতে পারলে তুমি? আমি হলে কি এমন করতে পারতুম?

আদিত্য—কি করতে তুমি?

নীরজা—বাগান ছারখার হয়ে গেলেও ঢুকতে দিতুম না কোনো মেয়েকে। মালি রাখতুম। একটার জায়গায় দশটা। (পজ্) যখন আমি মরতে বসেছি: তখন ওর অহংকার নিয়ে তুমি আমাকে অপমান করে চলেছ রোজ। এমনটা কেন হতে পারল বলতো?

আদিত্য—তুমিই বলো।

নীরজা—আমার চেয়ে ওকে তুমি ভালবাস বলে। এতদিন সেকথা লুকিয়ে রেখেছিলে।

আদিত্য—নীরু, তুমি যেভাবে কথা বলছো, এর জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। দশ বছর ধরে তুমি আমাকে জানো। সুখে দুঃখে নানান ভাবে। এর পরও যদি এমন কথা বলতে পার, কোনো জবাব দেব না। আমি কাছে থাকলে তোমার শরীর খারাপ হবে। ফরনারির পাশে জাপানী ঘরে থাকব আমি, যখন দরকার হবে ডেকো। আসবো।

আদিত্য বেরিয়ে গেল।

নীরজা কিছুক্ষণ স্তব্ধ। তার সমস্ত শরীর যেন যন্ত্রণায় ফুঁসছে। একটু পরেই সে বিছানার চাদর বালিশ ইত্যাদি ছুঁড়ে ফেলতে লাগল মেঝের। শেষে আবীরের ঠোঙা। ক্যামেরা এগিয়ে যায় আবীরের দিকে। সমস্ত পর্দা লাল। □

নির্মল ধরের সৌজন্যে

প্রতিবেশী গল্প

সম্প্রতি জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত কেরালার মালয়ালম কথা-সাহিত্যিক এস কে পোট্টেক্কাটের জন্ম ১৯১৩ সালের ১৪ মারচ। কেরালার কোজিকোড গ্রামে। তাঁর রচিত বইয়ের সংখ্যা একষট্টি। তাঁর প্রথম কবিতার বই 'প্রভাতকান্তি' প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। তারপর 'নতন প্রেমম' উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সালে। তাঁর রচিত প্রথম গল্পের সংকলন প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। সংকলনটির নাম 'রাজমল্লি'। তারপর বিষকন্যাকা, নিলে ডায়েরী, ইন্দোনেশিয়ান ডায়েরী নামে যথাক্রমে উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত হয়।

কুকুর

এস কে পোট্টেক্কাট

পুব দিগন্তে সোনালী আলো ছড়িয়েছে মাত্র কিছুক্ষণ আগে। কিরণ তখনও ছেঁড়া মাদুরের উপরে হাত-পা গুটিয়ে পড়ে আছে। ঘুম তার ভেঙে গেছে অনেক আগেই। তবু সে পড়ে আছে ব্যাঙের মতো ঘাপটি মেরে।

প্রায় আধ ঘণ্টা ঠিক এইভাবে পড়ে থাকার পর উঠে ধুতিটা ঝেড়েঝুড়ে ভালো করে পরে নেয় সে। দু-তিনবার কাশে, তারপর উঠোনে দাঁড়িয়ে চারদিকে একবার তাকায়।

কিরণের নব্বই-পার-হওয়া দিদিমা উঠোনে বসে রোদ পোয়াচ্ছে। ছ বছরের ছেলে উঠোনের অন্য এক পাশে একা একা নারকেলের ডালকে দড়ি দিয়ে বেঁধে তার উপর বসে 'ঘোড়া ঘোড়া' খেলছে। আর ঝাঁটাকাঠি দিয়ে সেই কাল্পনিক ঘোড়াকে চাবুক কষতে কষতে 'হেই-হেই' করে চেঁচাচ্ছে।

বাড়ির সামনের সুদূর বিস্তৃত ক্ষেতের দিকে কিরণের দৃষ্টি পড়ে। ফসল তোলার পর ক্ষেতে আর অন্য কিছু কাজ শুরু করা হয়নি। ফসল ফলানোর মজুরী হিসেবে সে নিজে যা পেয়েছিল তার কানাকড়িও এখন আর হাতে নেই। তিনদিন ধরে উনুনে হাঁড়ি চড়েনি।

ঘরের ভিতর থেকে তার স্ত্রী খুব কাতরাচ্ছে। সে এখন পূর্ণগর্ভা। দু-এক দিনের মধ্যেই হয়ত সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে। অথচ উনুনে হাঁড়ি চড়াবার জন্য সামান্য কিছু পয়সা পর্যন্ত তার হাতে নেই। কিরণ আবার ক্ষেতের দিকে তাকায়। ফাঁকা ক্ষেতের প্রতিফলন যেন তার মনেও লেগেছে। কোনো কাজ বর্তমানে তার নেই, বাড়ি ছেড়ে চাকরির সন্ধানে বেশিদূর যেতেও পারে না।

ক্ষেতের দিকে সে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়। ছোট খালটার কাছে গিয়ে থামে। ঝুঁকে পড়ে দু-আঁজলা জল দিয়ে মুখটা ধুয়ে নেয়। আঙুল দিয়ে দু-একবার দাঁতগুলো ঘষে কুলকুচো করে। তারপর ধুতির খুট দিয়ে মুখটা মুছে গাঁয়ের দিকে পা বাড়ায়।

রাস্তায় উঠে কিছুটা এগিয়ে যেতেই মানুষের একটা জটলা তার নজরে পড়ে। কিরণ এগিয়ে গিয়ে সেই ভিড়ের কাছে দাঁড়াতেই তার কানে এল রামম্নায়ার এবং

আলন মাপ্পিলার কথাবার্তা।

—কি ব্যাপার রামম্নায়া, কণ্ঠকুরুপের দোকানের সামনে এত ভিড় কিসের ?

—আমাদের চাপ্পুনীর যে কালো কুকুরটা আছে সেটা পাগল হয়ে গেছে। কুকুরটা চার-পাঁচটা গরুকে কামড়েছে। তাই কেলু ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্যে মুন্‌সিক সাহেবের সারটিফিকেট চাইতে এসেছে।

—মুন্‌সিকের সারটিফিকেটের কি দরকার ?

—পাগলা কুকুরে কামড়ানোর হাস-পাতালে যাতায়াতের জন্য প্রত্যেক দিন চার পাঁচ আনা করে পাওয়া যাবে সারটিফিকেট থাকলে।

আলন মাপ্পিলা সেই ভিড়ের ভিতর ঢুকে পড়ে। কেলু নিজের ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে আছে। সে সকরুণভাবে তাকাচ্ছে সকলের দিকে। যেন বুঝে উঠতে পারছে না এ অবস্থায় এখন কি করা দরকার।

—আরে এই কেলু, মুন্‌সিক সাহেবের কাছে তাড়াতাড়ি যা না। এ সময় তিনি বাড়িতেই থাকেন। তরকারির ঝুড়ি মাথায় চন্দু নামক লোকটি তাকে পরামর্শ দেয়।

ছেলেকে কাঁধে তুলে নিয়ে কেলু মুন্‌সিকের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল ; লোকেরাও যে যার পথ দেখল।

সেখান থেকে আরও এগিয়ে কিরণ কারোপ্পনের চায়ের দোকানের সামনে পৌঁছাল। পথের ধারেই এক কোণে বসে সে দোকান-দারকে হাঁক দিল। 'কই হে, আধ কাপ চা দাও।'

মিনিট দশেক পরে দোকানদার এক গেলাস চা এনে কিরণের সামনে রেখে দিয়ে বলে—'চিনিটিনি সব ঠিক আছে। আর কিছু চাইলে পাবে না, হ্যাঁ—।'

প্রথম প্রথম এক কাপ চা নিয়ে সে বলত, 'চা গাঢ় হয়নি, একটু লিকার কড়া করে দাও।' পরমুহূর্তেই শোনা যেত 'ও ভায়া, এই একটু চিনিটিনি দাও।' চেয়েচিন্তে চিনিও পেত। এইভাবে আধ কাপ চাকে পুরো এক কাপ বানিয়ে নেওয়ার কায়দা সে জানত। কিরণের সেই অভ্যাস সম্পর্কে দোকানদার ওয়াকি-বহাল। কিন্তু আজকালকার এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দিনে চিনি, চা বেশি করে পাওয়ার কায়দা কদ্দিনই বা আর চলে।

দোকানদারের এই সতর্কবাণী পেয়ে কিরণ একেবারে দমে যায়। দুই হাতে গেলাস ধরে ফুঁ দিতে দিতে চা খেতে থাকে। প্রত্যেক চুমুক চা খেয়ে কেন যেন সে মাথা নাড়ছে। সামান্য কিছুটা খাওয়ার পর গেলাস নিচে রেখে দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে সে ড্যাব ড্যাব করে শালপাতার উপর সাজানো ইডলীর দিকে তাকায়।

চা-এর সঙ্গে টা না হলে যেন আর চলছে না। কিন্তু ট্যাঁক তো ফাঁকা। কি যেন একটু ভেবে নিয়ে সে বলে, 'একটা ইডলী দাও তো ভাই। আর হ্যাঁ, এই পয়সাটা কালকে দিয়ে দেবখন।' শেষের কথাটি তার মুখ দিয়ে বেরুল ঠিক 'ইতি গজ' পদ্ধতিতে।

—পয়সা ট্যাঁকে না থাকলে ইডলী না খাওয়াই ভালো। কথা কটি বলে দোকানদার চা বানাতে বানাতে অন্য এক ছোকরার উদ্দেশ্যে খেঁকিয়ে ওঠে—'নে নে, চা খেয়ে তাড়াতাড়ি গেলাসটা খালি করে দে।'

কিরণের মুখটা হঠাৎ যেন লম্বা হয়ে গেল। গেলাসের সর্বশেষ বিন্দু নিঃশেষে টেনে নিয়ে ট্যাঁক থেকে প্রয়োজনীয় ও বাদবাকি পয়সা কটি বের করে গেলাসের কাছে রেখে দেয় সে। তারপর কাছাকাছি ঘুরঘুর করতে থাকে।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। ধোপা কেলুকে মুন্‌সিক সাহেবের বাড়ি থেকে ফিরতে দেখে, যে কাজের জন্য সে গেছলো তার কতদূর কি হলো জানার ঔৎসুক্য নিয়ে সে এগিয়ে গেল।

—মুন্‌সিক সাহেবের সারটিফিকেট পেয়েছ ? কিরণ শুধায়।

—হ্যাঁ পেয়েছি। এবার সোজা হাস-পাতালে যেতে হবে।

—কত পয়সা পাবে ? কিরণ আগ্রহে জিজ্ঞেস করে।

—এই বড় জোর ছ'আনা। ওরা তো বলেছে একুশটা ইনজেকশন দিতে হবে। কেলু যেতে যেতে বলে।

কিরণও চলে যায় সেই ফাঁকা বিস্তৃত ক্ষেতের পাশ দিয়ে মাথা নিচু করে। তার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করতে থাকে একটি পাগলা কুকুর আর ছয় আনা পয়সা!

সারাদিন এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে রাতে বাড়ি ফেরে কিরণ। সারাটা দিনে কারও পেটে একমুঠো ভাতও পড়েনি। কিরণের গর্ভবতী রুগ্না বউ আশপাশ থেকে শাক-পাতা সংগ্রহ করে এনে ছেলের, নিজের আর বুড়ির পেটের জ্বালা কিছুটা মিটিয়েছে। সেই অপূর্ব বস্তুর খানিকটা তার জন্যও ছিল।

পরের দিন ভোরে দাওয়ায় শোয়ানো বাচ্চা ছেলে চাত্তনের আঁৎকে ওঠা কান্নায় আর 'পাগলা কুকুর' 'পাগলা কুকুর' বলে কিরণের অস্বাভাবিক চিৎকারে বাড়ির সকলে এবং প্রতিবেশীরা ধড়মড় করে জেগে ওঠে। ওদিকে কিরণ ততক্ষণে একটা বড় ছড়ি হাতে নিয়ে ঝোপ-জঙ্গলের চারপাশে কিছুটা যেন পরিকম্পিত ব্যস্ততায় ছোটাছুটি করতে থাকে। আর বউ এদিকে রোরুদ্যমান ছেলেটাকে সামলাতে ব্যস্ত—আহা, বাছার পায়ের গোছে কয়েকটা দাঁত একেবারে আমূল বসিয়ে দিয়েছে কুকুরটা?

স্ত্রীকে ছেলের পরিচর্যায় ব্যস্ত দেখে কিরণ এসে দাঁড়াল। অনাহারে কোটরগত চোখদুটো ধকধক করে জ্বলছে। সমস্ত শরীর তার অবর্ণনীয় এক উত্তেজনায় কম্পমান। স্বামীর এই মূর্তিতে ভয়-বিমূঢ় বউ তার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই তাড়াতাড়ি দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে নিল। কিন্তু...কিন্তু তার স্বামীর ঠোঁটে যেন কয়েক বিন্দু রক্ত লেগে রয়েছে না? বউটি তার আনত দৃষ্টিকে আবার তার মুখের দিকে প্রসারিত করে, ঈষৎ চাপা গলায় বলে—'তোমার ঠোঁট কাটল কি করে? রক্ত পড়ছে যে!' এই কটি কথা যেন কিরণের উত্তেজনায় আরক্ত মুখকে এক মুহূর্তের জন্য ফ্যাকাশে করে দিল। কিন্তু তখনি নিজেকে সামলে নিল। কাপড়ের একপ্রান্ত দিয়ে মুখটা ভালো করে মুছে নিয়ে সে বলল, 'ও কিছু নয়।' অভুক্ত শীর্ণ ছেলেটা যন্ত্রণায় আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করছে! ব্যাপারটা যে কি ঘটেছে তা সে আদৌ বুঝতে পারেনি।

কিরণের চেঁচামেচি শুনে প্রতিবেশীরা সব ছুটে এসে জড়ো হল। কিরণ তাদের প্রত্যেককে ব্যথা-ব্যাকুলতা-ভরা কণ্ঠে জানাল যে কিভাবে তার ঘুমন্ত ছেলেটাকে পাগলা কুকুরে কামড়েছে।

—কুকুরটার রং কালো। তার লেজটা গুটোনো ছিল। মুখটা হাঁ-করা, আর জিভ দিয়ে লকলক করে লালা পড়ছে—কুকুরের বর্ণনা সে প্রত্যেককে শোনাল।

—আরে,এ যে সেই পাগলা কুকুরটার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। ঐ কুকুরটাই তো কাল কেলু ধোপার ছেলেটাকে কামড়েছিল। দুধওয়ালা কায়ারণ কিরণের বর্ণনার সমর্থনে বলে।

—দেখ, এই কুকুরটাকে আর ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, যেখানেই ওটা থাকুক, খুঁজে বের করে তাকে মেরে ফেলা উচিত। চানু দারুণভাবে চটে গিয়ে বলে, 'হ্যাঁরে কিরণ, বল দিকি শালার কুকুরটা কোন দিকে গেছে?'

—আরে, আমি কি আর অত খেয়াল করেছি! কি জানি ঐ শয়তানের বাচ্চাটা কোন দিকে গেছে।

সেইদিন ভোরে মুন্সিক সাহেব ঘুম থেকে উঠে দেখলেন উঠোনে একজন লোক তার ছেলেকে কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুন্সিক সাহেবকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কিরণ ছেলেটার পায়ে চিমটি কেটে বিড়বিড়িয়ে বলে ওঠে, 'ব্যাটাছেলে কাঁদ না!'

চাত্তন ডুকরে ডুকরে কাঁদতে শুরু করে।

—কি চাসরে? মুন্সিক সাহেব আমলাতান্ত্রিক ভাব নিয়ে জিজ্ঞাসা করে।

—হুজুর, আমার এই বাচ্চা ছেলেটাকে পাগলা কুকুরে কামড়েছে। বলেই কিরণ গামছা দিয়ে চোখ মুছে কান্নার ভাব দেখায়।

—কুকুরটাকে মেরে ফেলেছিস?

—না বাবু, কুকুরটা কামড়েই পালিয়ে গেছে।

—গাধা কোথাকার! আর তুই হাত গুটিয়ে বসেছিলি? বল কোন কুকুরটা কামড়েছে?

—আজ্ঞে, সেই চাপ্পুনি নায়ারের কালো কুকুরটা।

—কালকে যেটা ধোপার ছেলেকে কামড়েছে সেটা নাকি?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ বাবু।

—তোরা সব মানুষ না জানোয়ার! এত লোক থাকতে গাঁয়ের দু-দুটো ছেলেকে কামড়ে কুকুরটা চলে গেল। আর তোরা বসে বসে আকাশের তারা গুনছিলি?...তা এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কি চাস?

আজ্ঞে...আজ্ঞে...সারটিফিকেটটা...

মুন্সিক সাহেব একটা সারটিফিকেট দিয়ে দিলেন—কিরণের ছেলেটাকে পাগলা কুকুরে কামড়েছে বলে।

চাত্তনকে কাঁধে তুলে নিয়ে তখনই কিরণ হাসপাতালের দিকে চলে যায়।

ডাক্তার এসে বড় এক ইনজেকশন দেয় চাত্তনের পেটে। ছেলেটা হাত-পা ছুঁড়ে খুব জোরে কাঁদতে চেষ্টা করে। কিরণ তার হাত-পা খুব জোরে চেপে ধরে থাকে।

খুব খুশী মনে সে বাড়ি ফেরে। মাথার গামছায় এক সের চাল বাঁধা পুঁটলি। হাতে দশ পনেরটা কলা আর একটি মাছ। কাঁধে বসা ছেলেটি নেতিয়ে পড়েছে। হাসপাতাল থেকে যে পয়সা পেল তার থেকে মাত্র চারটি পয়সা খরচ করে তাড়ির দোকানে।

চার পাঁচটা ইনজেকশন নিতে না নিতে ছেলেটির গা অনেকক্ষণ জলে ডুবে মরা মানুষের মতো ফুলে যায়। চলতে ফিরতে পারে না। কিন্তু তবু কিরণ ইনজেকশন দেওয়ানো বন্ধ করেনি। প্রত্যেকদিন ছেলেটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে সে যেত হাসপাতালে। পথে যার সঙ্গে দেখা হতো তাকেই বলত, ছেলেটাকে পাগলা কুকুরে কামড়েছে। মুন্সিক সাহেব সারটিফিকেট দিয়েছেন। ইনজেকশন দেবার জন্য হাসপাতালে যাচ্ছি।

সপ্তম দিনে ছেলেটার অবস্থা আরও সঙ্কটজনক দেখায়—'বাবা, আজ আমাকে ছুঁচ ফোটাতে নিয়ে যেও না। না, না, আমি যাব না।' ছেলেটা প্রত্যেকদিন বাবাকে এই অনুরোধ করত। কিন্তু সে কথায় কান না দিয়ে টেনে হিঁচড়ে কাঁধে বসিয়ে নিয়ে কিরণ এগিয়ে যেত হাসপাতালের দিকে।

এগারোটি ইনজেকশন দেওয়ার পর ছেলেটির গা আরও ফুলে যায়। নাক মুখ সমান দেখায়। চোখগুলোতে যেন চারদিক থেকে মাংসের পুঁটলি এসে চেপে ধরেছে। গায়ের রং সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, বীভৎস দেখাচ্ছে তার মুখ। ঐ অবস্থায় ডাক্তার ইনজেকশন দেওয়া আপাতত বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিলেন।

দিন কয়েক ছেলেটাকে আর আনবে না, আর তোমাকেও আসতে হবে না। ডাক্তার কিরণকে হুকুম দেয়।

হঠাৎ মুখটা কিরণের যেন সমস্ত আশা হারিয়ে ম্লান হয়ে ওঠে। ছেলেটাকে টেনে পিঠে চাপিয়ে নেয় সে। ফুলে ফেঁপে ওঠা ছেলেটার ভারে সামনে ঝুঁকে কিরণ জোরে জোরে হেঁটে নিজের বাড়ির দিকে ফেরে।

পরদিন ভোরে কিরণ দেখে তার চাত্তন অজ্ঞান হয়ে ছেঁড়া চাটাইয়ে পড়ে আছে। একটা ক্ষীণ শব্দ কান পেতে যেন সে শুনতে পায়।

খোকা, খোকা, খোকা চাত্তন!—কিরণ খুব ঘাবড়ে গিয়ে বারে বারে ডাকতে থাকে। নেড়েচেড়ে দেখে। ছেলেটি নড়ে না।

কিছুক্ষণ পর আবার সাড়া পাবার চেষ্টা করে। চাত্তনের বুকে কান পেতে শোনার চেষ্টা করে। সেই ক্ষীণ শব্দটা থেমে গেছে। কান্নায় ফেটে পড়ে কিরণ 'খোকা, খোকা' বলে ওকে ডাকে। খোকা কিন্তু আর সাড়া দেয় না। চিৎকার করে বউকে ডাকে কিরণ।

ওদিকে ঘরের ভিতর থেকে নবজাত শিশুর কান্না তার সে-ডাকে সাড়া দেয়।

কান্না শোনার পর ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো নিজের বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে সে ঘুরতে ঘুরতে ছুটে এসে অপলক দৃষ্টিতে নিষ্পন্দ মৃত চাত্তনের দিকে চেয়ে দেখে, নিঃশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়ে।

ও-ঘরের দিকে সে এগোবে কোন মুখে? কোন সাহসে? □

মূল মালয়ালাম থেকে অনুবাদ : জোস্না বিশ্বনাথম

দুষ্ট গান্ধর্ব

সেই সব সোনালি হৃদয় সন্ধ্যার দ্রৌপদী

ধ্রুবজ্যোতি রায় চৌধুরী

ফিরনেকে শায়েস্তা করতেই হবে !

এথেনসের যত বউ ছিল তারা সবাই একজোট হলো ফিরনের বিরুদ্ধে। বাড়ির ভিতর থেকে স্বামীরত্নরা বেরিয়ে যান ফিরনের টানে। এ তো আর সহ্য করা যায় না। পাওয়া গেল ইউথিয়াসকে। ফিরনের অসংখ্য প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকদের একজন। পুরবাসিনীদের প্ররোচনায় ইউথিয়াস মামলা করলেন ফিরনের বিরুদ্ধে। অভিযোগ : এই রাজ্যের সু-নাগরিকদের চরিত্র নষ্ট করে দিচ্ছে ফিরনে। নাগরিকদের কর্তব্য থেকে তারা বিচ্যুত হচ্ছে।

ফিরনে বিপদে পড়লেন। রাজ-বিচারে মৃত্যু অনিবার্য। তিনি হাইপেরিডিসের দ্বারস্থ হলেন : আমাকে বাঁচাও। বাগ্মী হাইপেরিডিস রাজি হলেন। শর্ত : শয্যাসঙ্গিনী হতে হবে। ফিরনে বিন্দুমাত্র অনীহা প্রকাশ করলেন না। মামলা চলল। ফিরনের সমর্থনে হাইপেরিডিসের বিস্ময়কর বাগ্মিতা তখনও বরফ গলাতে পারেনি —মৃত্যুদণ্ড বোধ হয় আটকানো যাবে না। সহসা বিচারকদের সামনে হাইপেরিডিস ফিরনের পোশাক একটানে খুলে ফেললেন : দেখুন আপনারা— এই শরীরে কী কোন পাপ লুকিয়ে থাকতে পারে ?

অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন সমবেত বিচারকবৃন্দ। উন্মুক্ত স্তনাগ্র, আশ্চর্য শরীর। এ তো নারী নয়, কল্পনা ! নিশ্চয়ই কোনো দেবী, ছলনা করতে এসেছেন। এত নিখুঁত শরীরে পাপ লুকিয়ে থাকতে পারে না। কুসংস্কারবিভ্রান্ত বিচারকবৃন্দ ফিরনেকে মুক্তি দিলেন।

এথেনসের সুন্দরী রমণীদের মধ্যে ফিরনে তৃতীয়। আসল নাম সেনসারেট—কিন্তু কাঁচা সোনার মতো গায়ের রং ছিল বলে লোকে তাকে ডাকত ফিরনে নামে। থিসপিয়ের ছোট গ্রামে ফিরনের যৌবন এসেছিল। যৌবন-জ্বালায় অস্থির হয়ে ফিরনে একদিন চলে এলেন এথেনস নগরে, শিল্পী অ্যাপিলিসের রক্ষিতা হিসেবে।

অ্যাপিলিসের বিখ্যাত অ্যাফরোডাইট ভাস্কর্যের জন্যই ফিরনের প্রয়োজন ছিল। অ্যাপিলিসের কাজ শেষ হতেই ফিরনের সঙ্গে ভীষণ বন্ধুত্ব হয়ে গেল আর একজন শিল্পীর সঙ্গে : প্র্যাকসিটেল। প্র্যাকসিটেল অ্যাফরোডাইটের দুটি মূর্তি গড়লেন ফিরনেকে সামনে বসিয়ে। একটি নগ্ন—অন্যটি পোশাক পরা। সাটির ও ঈরোজ। ফিরনে ঈরোজের মূর্তি রেখে এসেছিলেন নিজের গ্রামে। বহু বছর পর সম্রাট নিরো ঈরোজের মূর্তি বাজেয়াপ্ত করে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন—কিন্তু জ্বলন্ত রোমে কোথায় যে মূর্তিটি হারিয়ে যায়, তার কোনো হদিস আজ অবধি পাওয়া যায়নি।

গ্রীক গণবধূদের মধ্যে ফিরনের চালচলন ছিল একেবারে আলাদা। পাঁচজনের সামনে নগ্ন অবস্থায় কখনও তাঁকে দেখা যেত না। সাধারণ-স্নানাগারে কোনদিনই যেতেন না। রতিমঞ্জরীতে ব্যস্ত হতেন রাতে। বছরে দুদিন তাঁকে সম্পূর্ণ নগ্ন দেখতে পেতেন এথেনসের নাগরিকরা। এলু সিনিয়ান ও পোসিডোনিয়ন উৎসবে। সম্পূর্ণ নগ্ন ফিরনে মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে—হাজার হাজার লোকের মাঝখান দিয়ে হেঁটে যেতেন সমুদ্রে—বিভিন্ন ঈশ্বর-ঈশ্বরীর উদ্দেশ্যে পুজো দেওয়ার জন্যে।

ফিরনের আকর্ষণ এড়াতে পারতেন এমন কেউ এথেন্সে ছিলেন না। ব্যতিক্রম ছিলেন একজন। দার্শনিক জেনোক্রেটস। প্লেটোর পাঠশালাটি চালাতেন তিনি—জ্ঞানচর্চা ছাড়া অন্য কোনো চর্চায় বিন্দুমাত্র আগ্রহ তাঁর ছিল না। ফিরনে অবাক হলেন, এ কেমনতরো পুরুষ ? রাতগুলো কাটে কী করে ? ফিরনে বাজি ধরলেন জেনোক্রেটসের বন্ধুদের সঙ্গে : এক রাত্রেই কাৎ করে দেবে পণ্ডিতমশাইকে !

খুব স্বচ্ছ পোশাক পরে গভীর রাতে ফিরনে কড়া নাড়লেন জেনোক্রেটসের দরজায়। জেনোক্রেটস দরজা খুললেন : কী ব্যাপার ? ফিরনে চট করে কামরার মধ্যে ঢুকে পড়ে জানালেন, রাস্তায় গুণ্ডারা তাড়া করেছে আমাকে—আজ রাতের মতো একটু আশ্রয় দিন।

ফিরনে—প্রাচীন গ্রীসের বিখ্যাত বারাঙ্গনা। বছরে দু'বার জন-সমক্ষে নগ্ন হতেন কিন্তু প্রেমিকদের সঙ্গে মিলিত হতেন গভীর রাতে। সুনাগরিকদের চরিত্র নষ্টের দায়ে অভিযুক্তা বিচার সভায় নগ্ন হওয়ার পর রেহাই পেয়েছিলেন : এত সুন্দর শরীরে পাপ থাকে না।

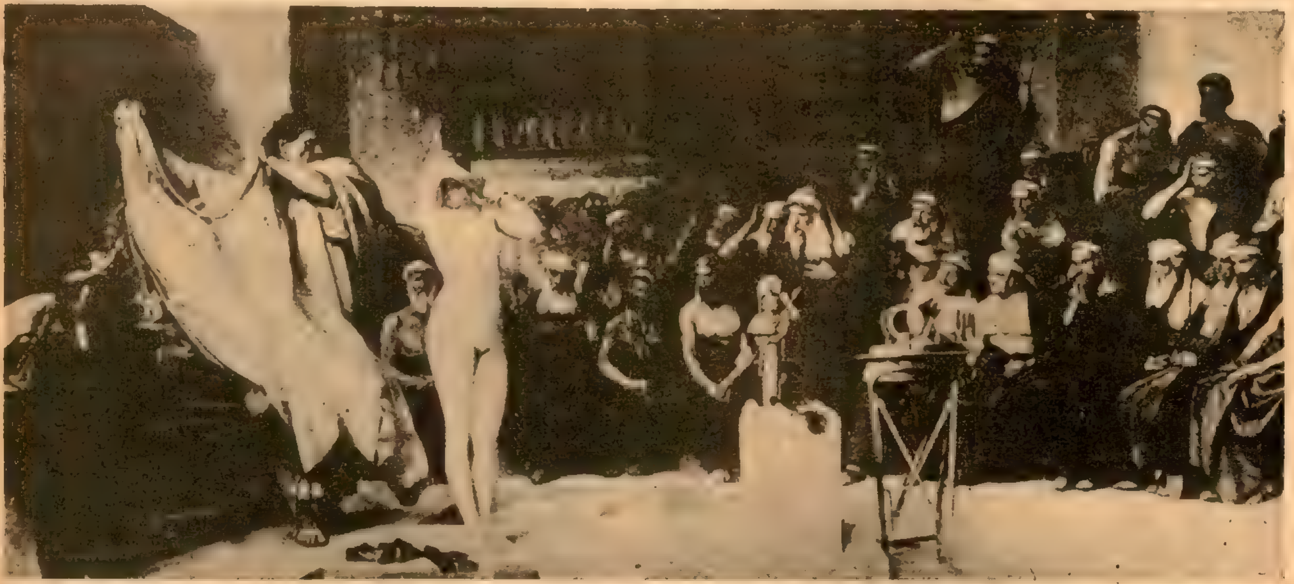

নেল গুঙ্গন—ইংল্যানডের রাজা দ্বিতীয় চারলসের রক্ষিতা। আত্মপরিচয় দিতেন 'প্রটেসট্যানট বেশ্যা'। বিখ্যাত তৈল-চিত্রকর স্যার এডুইন ল্যানডসির—যিনি জন্তু জানোয়ারের ছবিতে সিদ্ধহস্ত—নেলের তৈলচিত্রে চারিত্রিক মর্যাদা প্রকাশের চেষ্টা করেছেন।

ও। এই বেঞ্চটায় শুয়ে পড়ো তাহলে।

জেনোক্রেটস নিজের বিছানার দিকে পা বাড়াতে ফিরনে বিবস্ত্র হয়ে এগিয়ে গেলেন। জেনোক্রেটস ভ্রূক্ষেপও করলেন না। ফিরনে এবার হিংস্রভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন অধ্যাপককে। অধ্যাপক বিরক্ত হলেন : এসব কী হচ্ছে?

ফিরনে অগত্যা ক্রিয়ানিষ্পত্তিতে ব্যর্থকাম হয়ে সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে গেলেন। বন্ধুদের বললেন : প্রস্তরমূর্তির সঙ্গে রতিবিলাস হয় না!

ফিরনের সঙ্গে এমন বহু প্রেমিকের সংযোগ হয়েছিল, যারা কুবেরের সম্পত্তি দিতেও কার্পণ্য করেননি। গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার থীবসের প্রাচীর ভেঙে ফেলার পর ফিরনে প্রস্তাব দিয়েছিলেন : নতুন প্রাচীর আমি বসিয়ে দেব—কিন্তু একটি ফলকে লিখে দিতে হবে 'আলেকজাণ্ডার থীবস ধূলিসাৎ করার পর ফিরনে থীবসকে নতুন করে গড়ে দিয়েছিল'।

সোনালি ত্বকের ফিরনে আজীবন সম্মানিত হয়ে মারা যাওয়ার পর এফিসাসের দেবী ডায়েনার মন্দিরে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক স্বর্ণ-মূর্তি স্থাপিত হয়। এই মূর্তিটিও বানিয়েছিলেন তাঁর প্রাক্তন প্রেমিক প্র্যাকসিটেল।

মানুষী সভ্যতারই মতো প্রাচীন গণিকাবৃত্তি। সংস্কৃত কাব্যে-নাটকে বিভিন্ন ধরনের গণিকার কথা উল্লেখ আছে। ক্ষেমেন্দ্রের কলাবিলাসে চৌষট্টি কলায় পারদর্শী গণিকা, কথা সরিৎসাগর-এর মদনমালা পরিশিষ্ট পর্বের কুবেরসেনা, মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনা থেকে গ্রীসের এসপাসিয়া কিংবা ফিরনে—মানুষী-সভ্যতারই একটি অঙ্গ। বাইবেলে কথিত জেরিকোদেয়াল ধসে যেতে দেখেছিলেন এক বারবণিতা। প্রাচীন মিশর, পারস্য অথবা গ্রীসের আঁকা-বাঁকা পথে পতাকাবেশ্যাদের দেখা মিলত—আজও যেমন মেলে লণ্ডন প্যারিস হঙকঙ কলকাতা বোম্বেতে। ওরা আছে—মানুষের জন্যেই আছে। একবিবাহে যেমন রক্ষিতার প্রয়োজন হয়েছে—ঠিক তেমনিই গণিকার প্রয়োজন হয়েছে।

মেয়েরা গণিকাবৃত্তির দিকে যায় কেন? এই নিয়ে পৃথিবীতে যে অসংখ্য সমীক্ষা হয়েছে, তাতে দেখা যায় শতকরা মাত্র দুজন দারিদ্রের জন্যে বেশ্যা হয়েছে। বাকিরা গণিকাবৃত্তি—অন্যান্য বৃত্তি থেকে সহজসাধ্য বলেই বেছে নিয়েছে। খুঁজে পেয়েছে বিশেষ এক আনন্দ, বিজয়ের স্বাদ। ডকটর জোসেপ টিনেনবামের মতে, 'কোনো গণিকাকে তার দুঃখ থেকে উদ্ধার করা যায় না। কেননা সে দুঃখকে ভালবাসে।' ফলে, কোনো গণিকা তার বৃত্তিকে যতই ঘৃণিত মনে করুক না কেন, এই বৃত্তি সে কোনো দিনই ছাড়বে না। কেননা, রাত্রির প্রতিটি মুহূর্তই তার কাছে বিজয়ের প্রতীক।

রক্ষিতাদের যুগ শুরুই হয়েছিল প্রাচীন গ্রীসের আলোকিত সভ্যতায়। একবিবাহে স্ত্রী বেশিরভাগ সময় ঘর গৃহস্থালীর কাজে ব্যস্ত, বিব্রত থাকতেন। বাড়ির নগ্ন-নির্জন কোণে পড়ে থাকতেন। বাড়িতে দ্বিতীয় পুরুষের প্রবেশ অধিকার ছিল না। নিঃসঙ্গ নারীটিকে বোঝানো হতো জন্মদাত্রী হিসেবেও তাঁর কোনো ভূমিকা নেই—কেননা 'বীজ' পুরুষ ছাড়া অন্য কেউ বপন করতে পারে না! বিদ্রোহী হলে শাস্তি হতো ভয়ানক। পরপুরুষের সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে ধরা পড়লে স্বামী খুন করে ফেললেও কারুর কিছু বলার থাকত না।

এই অবস্থায় এথেনসের কিছু নারী যে কুলটা হয়ে বেরিয়ে আসবেন, এটা খুবই স্বাভাবিক। চার দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে আসা এইসব গণিকাদের মধ্যে সবচেয়ে নিম্নশ্রেণীর ছিলেন পোর্ণি (পোর্ণোগ্রাফি শব্দের উৎপত্তি দ্রষ্টব্য) বা বেশ্যা—বিভিন্ন ক্রেতার পরীক্ষার জন্যে শরীর মেলে ধরতে হতো তাঁদের, সরকারি কর দিতেন বলে এঁদের অবস্থা পরবর্তী যুগে উন্নীত হয়। শ্রেণীগতভাবে সবার উপরে থাকতেন হিতেরা—বা রাজনর্তকী, তার পরে অলত্রিস—ষোড়শ কলায় পারদর্শী সঙ্গমবিলাসী নারীরা

এথেনিয়ান রাজনর্তকীদের শুধুমাত্র সুন্দরী হলেই চলত না, নানা বিষয়ে বিদগ্ধ হতে হতো। শৃঙ্গারমঞ্জরীতে অদ্বিতীয় এইসব নারীদের কোনো নাগরিক অধিকার না থাকলেও রাজ্যের

উত্থান-পতন ঘটত এদের ভ্রূ-কুঞ্চনে ! সম্রাট থেকে দার্শনিক, কবি থেকে প্রধানমন্ত্রী—সবাই এঁদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করতেন।

সাইরিনের জন্যে অনেকে পাগল হয়ে গিয়েছিল—কীভাবে যেন কথাটা প্রচার হয়ে গিয়েছিল সাইরিন বারোটি বিভিন্ন যৌন-সঙ্গমে অবিশ্বাস্যভাবে পটু। থিওরিস নাট্যকার সোফোক্লিসকে যখন এক জারজ সন্তানের পিতা করলেন—বৃদ্ধ সোফোক্লিসের আইনসঙ্গত পুত্র আদালতে মামলা করলেন (যাতে সম্পত্তির অধিকার হতে তাঁকে বঞ্চিত না করা হয়), দাবী করলেন : বাবার ভীমরতি ধরেছে—মাথার ঠিক নেই। সোফোক্লিসও তাঁর যে ভীমরতি ধরেনি প্রমাণের জন্যে সর্বাধুনিক ১১৩টি নাটক পড়ে শোনালেন দরবারে। লামিয়া—ম্যাসিডোনিয়ার রাজা ডিমিট্রিয়াস পোলিওক্রেটেসের কাছে ১২০০,০০০ টাকা দাবী করেছিলেন রক্ষিতা-পণ হিসেবে। ল্যামিয়ার জন্যে রাজা তাইতেই রাজি হয়ে সাবানের উপর শুল্ক বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এথেনসের এক রসিক ভদ্রলোক মন্তব্য করেছিলেন : ল্যামিয়ার জন্যে যদি সাবানের এই হাস হয়—তাহলে ল্যামিয়ার নোঙরা সাফ করতে আর কত সাবান লাগবে ?

গ্রীক ইতিহাসের রাজনর্তকীদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিলেন এসপাসিয়া। এসপাসিয়ার শরীরী সৌন্দর্য সম্বন্ধে বেশি কিছু জানা যায় না—শুধু জানা যায় সোনালি চুল। রুপালি গলার এই মহিলা পেরিক্লিসের চোখ থেকে স্বপ্ন চুরি করে নিয়েছিলেন ! সক্রেটিস পর্যন্ত এসপাসিয়ার কথা বলার ঢঙ পছন্দ করতেন।

এসপাসিয়ার জন্ম মিলেটাসে। মিগারাতে একটি গণিকালয় পরিচালনা করতেন। ৪৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দে তিনি এথেনসে এলেন দর্শনশাস্ত্র ও বাগ্মিতার একটি পাঠভবন খোলার জন্যে। গ্রীক মেয়েরা এসে ভর্তি হলেন তাঁর পাঠভবনে। একদিকে গণিকালয়ের ব্যবসা—অন্যদিকে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা ! সক্রেটিস, অ্যানাকসাগোরাস, ইউরিপিডিসের সঙ্গে—এথেনসের একচ্ছত্র অধিনায়ক পেরিক্লিসও একদিন এসে বসলেন এসপাসিয়ার বক্তৃতামালা শোনার জন্যে। গ্রীক ইতিহাসে আর একটি নতুন অধ্যায় যোজিত হলো। এসপাসিয়া দর্শনশাস্ত্রের পাঠভবন বন্ধ করে রাজনর্তকী হলেন।

পেরিক্লিসের বয়স তখন চল্লিশ। এসপাসিয়ার পঁচিশ। গ্রীসকে গণতান্ত্রিক করে পেরিক্লিসের জনপ্রিয়তা তখন উচ্চশিখরে। একজন স্ত্রী, একজন রাজনর্তকী গণিকা ও দুই সন্তানের পিতা এসপাসিয়াকে পেয়ে সবাইকে ছেড়ে দিলেন। স্ত্রীকে আর একজনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে পেরিক্লিস এসপাসিয়াকে নিজের প্রাসাদে এনে তুললেন। এসপাসিয়া এথেনসের নাগরিক ছিলেন না বলে তাঁকে বিয়ে করতে পারলেন না, কিন্তু সম্পত্তি উইল করে দিলেন নবজাত জারজ দ্বিতীয় পেরিক্লিসকে। তারপর, বিশ্ব-সংসার ভুলে এসপাসিয়ার সঙ্গেই বসবাস করতে লাগলেন।

পেরিক্লিসের শত্রুরা, এমন কি সমর্থকরাও এসপাসিয়াকে পছন্দ করেন নি। কেননা, রাজ্য-রাজনীতির ব্যাপারে পেরিক্লিসের মতামত অনেকখানি প্রভাবিত হতো এসপাসিয়ার কথায়। নাট্যকার হার্মিপাস অভিযোগ আনলেন, এসপাসিয়া এথেনীয় ঈশ্বরদের বিরুদ্ধে জনমত বিষাক্ত করে দিচ্ছেন—এথেনসের সুন্দরী ললনাদের পেরিক্লিসের অঙ্কশায়িনী হওয়ার জন্যে প্ররোচিত করেছেন। ৪৩২ খৃষ্টপূর্বাব্দে দেড় হাজার এথেনসবাসীর সামনে প্রকাশ্য বিচার চলে—বিদেশী বলে তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের যখন কোনো সুযোগ দেওয়া হলো না, পেরিক্লিস আর পারলেন না। সেই গণ-আদালতে তিনি আবেগে কাঁপা-কাঁপা গলায় হৃদয় উন্মুক্ত করে দিলেন। বিচারকরা মুক্তি দিলেন এসপাসিয়াকে।

তবুও নাট্যকার অ্যারিসটোফেনস ছেড়ে কথা বললেন না, তিনি আরও অভিযোগ আনলেন : এসপাসিয়া মিগারাতে পতিতালয় চালান—মিগারার দুই উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী দুজন সুন্দরী পতিতাকে হরণ করেছে বলে এসপাসিয়া পেরিক্লিসকে মিগারা আক্রমণের পরামর্শ দিয়েছেন।

এই অভিযোগ শোনার পর জনমত এসপাসিয়ার বিপক্ষে চলে গেল। ইতিমধ্যে, মহামারী প্লেগের আবির্ভাব হলো এথেনসে। এথেনসের বহু সৈনিক তাতে মারা গেলেন। মারা গেলেন পেরিক্লিসের দুই বৈধ সন্তান। মিগারার যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পেরিক্লিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলো তিনি রাজকোষের অর্থ আত্মসাৎ করে সন্ধির শর্ত কিনেছেন ! ন বছরের কারাবাস হলো তাঁর। ষাট বছর বয়েসে পেরিক্লিস মারা যাওয়ার একমাস পরে এসপাসিয়া বৈধব্যের যন্ত্রণা ভোলার জন্যে লিসিকলসের এক ধনপতি মেষ ব্যবসায়ীর শয়নকক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

এই ঘটনার বহুকাল পর ১৬৭৫ সালের এক বিকেলে লাল চুল, ছোট-খাটো চেহারার নেল গুয়েনকে দেখা গেল। বালিকা বয়সে একটি পতিতালয়ে তিনি মদ বিতরণ করতেন, তারপর তাঁকে দেখা গেল মঞ্চাভিনেত্রী হিসেবে—এই সময় তাঁর বয়েস উনিশ। রাজা দ্বিতীয় চারলসের গাড়িতে তিনি নিয়মিত বেড়াতে বেরুতেন বিকেলে। সহসা একদিন লনডনের জনতা তাঁর গাড়ি ঘেরাও করল, ভাবল ইনিই বোধহয় ডাচেস অব পোর্টস মাউথ—লুঈজি দা কেরএল—চারলসকে বশীভূত করার জন্যে চতুর্দশ লুঈয়ের পাঠানো এক ফরাসি মহিলা। লুঈজি ছিলেন ক্যাথলিক বারাঙ্গনা, আর এই সময় ক্যাথলিক-বিরোধী একটি আন্দোলন চলছিল ইংল্যানডে। অশ্লীল গালিগালাজ আর সহ্য করতে না পেরে নেল চেঁচিয়ে উঠলেন :

: আপনারা ভুল করছেন—আমি প্রটেসট্যানট বেশ্যা !

সঙ্গে সঙ্গে জনতা তুমুল হর্ষে অভিনন্দন জানাল : প্রটেসট্যানট বেশ্যা ! সাবাস !

নেলও জনতাকে প্রত্যভিনন্দন জানিয়ে সগর্বে গাড়ি চালালেন। দ্বিতীয় চারলসকে তিনি তৃতীয় চারলস বলে ডাকতেন—কেননা দ্বিতীয় চারলসের আগে আরও দুজনের শয্যাসঙ্গিনী ছিলেন তিনি !

সেদিন, ১৬৭৫ সালের সেই উন্মত্ত জনতার মনে একবারও কিন্তু রাজা চারলসের রক্ষিতা কত সহজে নিজের পরিচয় দিয়ে গেলেন সেই সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। □

এসপাসিয়া—যাঁকে সক্রেটিস অবধি শ্রদ্ধা করতেন ! এথেনসের শাসক পেরিক্লিসের লীলাসহচরী তাঁর জারজ পুত্রের জননী। দর্শন শাস্ত্রের চর্চা ও গণিকাবৃত্তির সহাবস্থান।

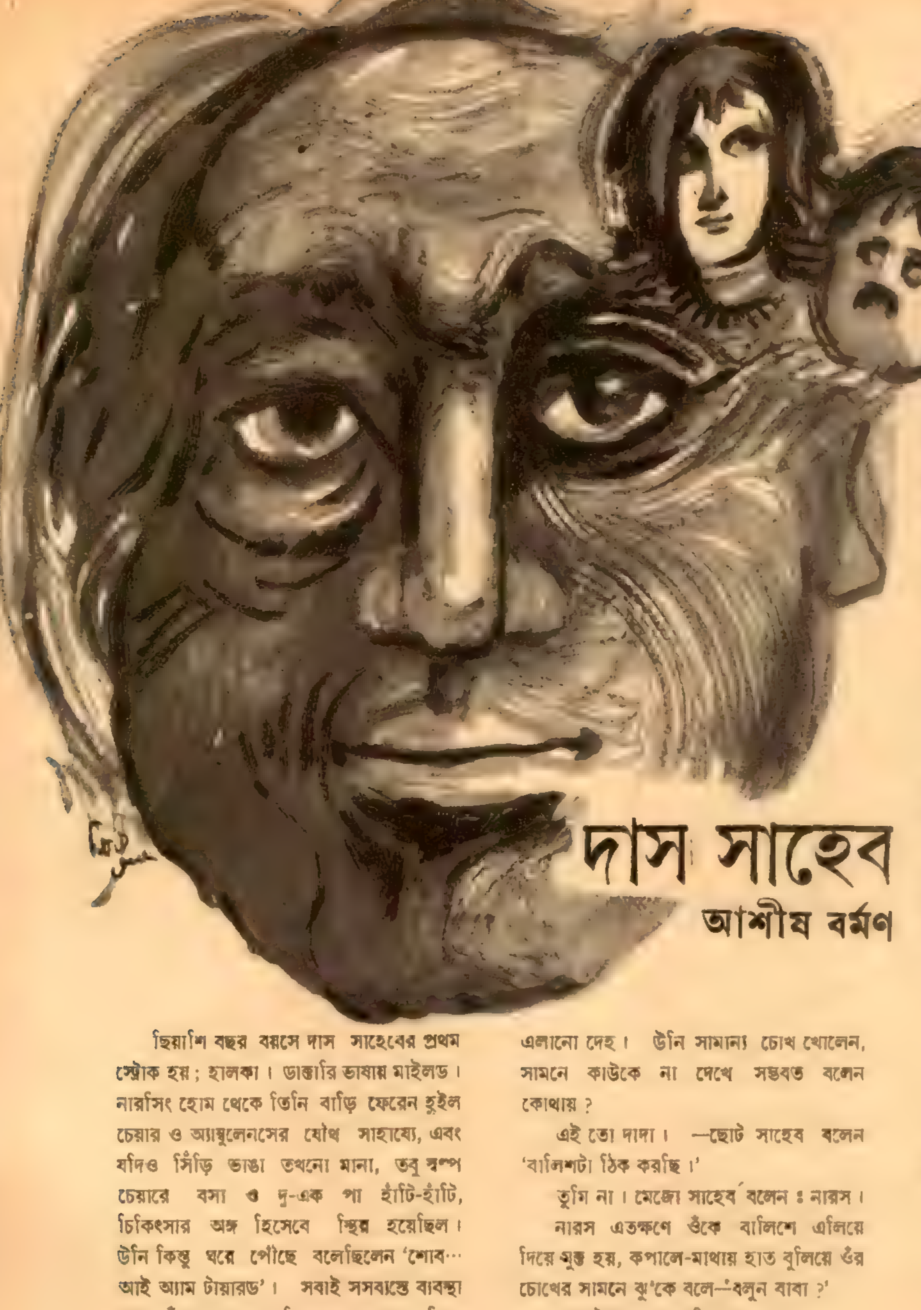

দাস সাহেব

আশীষ বর্মণ

ছিয়াশি বছর বয়সে দাস সাহেবের প্রথম স্ট্রোক হয়; হালকা। ডাক্তারি ভাষায় মাইলড। নারসিং হোম থেকে তিনি বাড়ি ফেরেন হুইল চেয়ার ও অ্যাম্বুলেনসের যৌথ সাহায্যে, এবং যদিও সিঁড়ি ভাঙা তখনো মানা, তবু স্বল্প চেয়ারে বসা ও দু-এক পা হাঁটি-হাঁটি, চিকিৎসার অঙ্গ হিসেবে স্থির হয়েছিল। উনি কিন্তু ঘরে পৌছে বলেছিলেন 'শোব··· আই অ্যাম টায়ারড'। সবাই সসব্যস্তে ব্যবস্থা করে, ওঁকে ধরে-ক'রে বিছানায় তোলে। কিন্তু শুতে শুতে ওঁর ভুরু কোঁচকায়, মুখে বিরক্তির ছায়া নামে, যা এত রোগ-ভোগেও বীতিমত কঠিন দেখায়। কান্ত, ওঁর বাবুর্চি-কাম প্রাইভেট হেলপ, চকিতে ঘাবড়ে যায়, কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতায় সে তাড়াতাড়ি নিম্নস্বরে বলে সাহেব ঃ বালিশ উঁচু করে দেব ?

হুঁ। —দাস সাহেব চোখ বোঁজা অবস্থাতেই বলেন,স্টুপিড নারসটা কোথায় ?

এই যে বাবা।

নারস, কান্ত, আশি বছরের কনিষ্ঠভ্রাতা মিঃ টি সি দাস ; রিটায়ারড আই সি এস এবং পরে বিবিধ কোমপানির ভুতপূর্ব চেয়ারম্যান—কান্তর ছোট সাহেব—সবাই তখন ঝুঁকে ওঁর বালিশ সাজানোয় ক্ষিপ্রগতি, ঈষৎ উত্যক্ত। নারস সন্তর্পণে ধরে আছে মেজো সাহেবের এলানো দেহ। উনি সামান্য চোখ খোলেন, সামনে কাউকে না দেখে সম্ভবত বলেন কোথায় ?

এই তো দাদা। —ছোট সাহেব বলেন 'বালিশটা ঠিক করছি।'

তুমি না। মেজো সাহেব বলেন ঃ নারস।

নারস এতক্ষণে ওঁকে বালিশে এলিয়ে দিয়ে মুক্ত হয়, কপালে-মাথায় হাত বুলিয়ে ওঁর চোখের সামনে ঝুঁকে বলে—'বলুন বাবা ?'

ডোনট বাবা-ফাবা মি···বুঝলে ?

আচ্ছা স্যর।

গুড !

উনি চোখ বোঁজেন, হাতের ইঙ্গিতে ঘর খালি করতে বলেন। মুখে শ্রান্তি, মাথা হেলিয়ে দেন উঁচু বালিশের স্তূপে। পায়ের আওয়াজ সরে যাচ্ছে টের পেয়ে ডাকেন—'কান্ত'।

হ্যাঁ সাহেব।

উনি আঙুলে নির্দেশে ওকে থামতে বলেন ! কান্ত ছোট সাহেব ও নারসের দিকে একবার তাকায়, চকিতে, অতঃপর খাটের পাশে এগিয়ে আসে। নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে। সাহেব তখুনি চোখ খোলেন না, কান্তও অনড়। অন্যেরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে, সব শব্দ যখন তিরোহিত, তখন মিঃ বি সি দাস চোখ খোলেন। তাকিয়ে থাকেন কান্তর পানে নির্নিমেষ। কান্ত ভিতরে ভিতরে অল্প অগোছালো হয়ে যায়, ইতিমধ্যে সে চুরি করেছে অনেক, অথবা ঠিক চুরি নয়, হিসেবের গোলমাল, কিছু টাকা নয়-ছয়, ছোটখাট জিনিস হাতানো। সে চোখ নামায় মাটির দিকে।

সাহেব বলেন—'তুমি রোগা হয়ে গেছ দেখছি।'

আজ্ঞে, না তো ইয়ে

কিয়ে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

উনি আবার চোখ বুজলেন। সামান্য হাসির আভা এল ঠোঁটে, অন্তত কান্তর তাই মনে হলো হঠাৎ। আবার পরমুহূর্তে তার সংশয় জাগে, মনে হয় তা নয়, দৃষ্টির ভ্রম। আর কিছু ভাবার বা দেখার আগেই সাহেব চোখ খোলেন, তাকান তার দিকে, বলেন ঃ চাবিটা কোথায় ?

চাবি ?

বড় রিং-টা···ইডিয়েট !

আজ্ঞে, ছোট সাহেবের কাছে।

বুলাও উসকো।

ডাকছি।

কান্ত এক-পা নড়ার সঙ্গে সঙ্গে উনি ডাকেন ঃ শোনো।

বলুন সাহেব ?

মেমসাহেবের ঘরে কেউ গেছিল ?

হ্যাঁ সার।

কে ?

ছোট সাহেব, মণি দিদিমণি

মণি ?

বড় সাহেবের নাতনি।

আই সি···যাও।

মেমসাহেব পরলোকে আজ দশ বছর, সাহেবের দাদা তারও আগে। তখনো কান্ত এ-বাড়িতে ঢোকেনি। তাঁর ছেলেপিলেরা এখানে দৈবাৎ এসেছে কখনো, নাতনি মণি থাকত ছোটবেলায়, পরে আর কান্ত তাকে এ-যাবৎ দেখেনি। এবার দেখে প্রথমে বিভ্রান্ত হয়েছিল, একেবারে মেমসাহেব। এ-বাড়ির মেমসাহেবের ঘরে থাকে সিন্দুক, তিনি নিজে গত। কান্ত হাসে। ছোট সাহেবের খোঁজে যায়।

বিছানার পাশে পায়ের শব্দে দাস সাহেব চোখ খোলেন। দেখেন নারস, হাতে ওষুধ ও

গেলাশে জল। উনি তিক্ত চাউনি মেলে বলেন ঃ তোমায় ডাকিনি, এখন যাও।

যাচ্ছি, ওষুধটা খেয়ে নিন।

পরে। আমার এখন কাজ আছে।

এক সেকেনড লাগবে স্যার…এমনিতেই ওষুধ দিতে দেরি হয়ে গেছে…।

সো হোয়াট।

এটাই আমার দায়িত্ব, কাজ…প্লিজ স্যার! চকিতে ওঁর মুখের বিরক্তি ছাপিয়ে কৌতূহলের আভাস ফোটে। তখনো ওষুধ হাতে নারস দাঁড়িয়ে, হয়তো অল্প ইতস্তত, কিন্তু স্থির, সামান্য ঝোঁকা। উনি তাকিয়ে থেকেই বলেন ঃ তোমার নাম কি?

রানী মিত্র।

হোয়াট অ্যান আয়রণি! —উনি এবার ওষুধ খান, রানী ন্যাপকিন দিয়ে ওঁর মুখ মুছিয়ে দিয়ে বলেন ঃ তোমায় শক্ত লোক মনে হয় না কিন্তু।

ডাক্তার সেন আমার উপর নির্ভর করেছেন, স্যার।

থ্যাঙ্কস…ইউ মে গো নাও।

রানী বেরিয়ে যাওয়ার আগেই ছোট সাহেব ঘরে ঢোকেন। দাস তখন নিমীলিত নয়ন, অথচ সজাগ। শুনতে পান রানী যেতে যেতে নিম্নস্বরে বলে ঃ বেশি ক্লান্ত করবেন না স্যার।

না-না, আমি তো আসতেই চাইনি…হি নীডস রেসট।

রানী চলে গেলে, এক মুহূর্তের নৈঃশব্দ যখন ঘরে চারিয়ে যায়, তখন দাস চোখ খোলেন।

ডেকেছ তুমি?

হ্যাঁ, হ্যয়ার আর মাই কীজ?

আছে, সেফলি…ভালো করে রেখে দিয়েছি আমি। রিং-টা আমি চাই।

এখন থাক না দাদা…আই উড টেক কেয়ার অফ এভরিথিং। ভেবো না শুধু শুধু…।

আই ডোনট পারট উইথ মাই কীজ।

দেখ, তোমার শরীরটা ঠিক নেই…ডাক্তার…।

টু হেল উইথ ডকটরস…আমার চাবি চাই।

ওকে, ওকে বাড়ি থেকে নিয়ে আসব…।

কান্তকে নিয়ে যাও…নাও

বেশ।

ছোট সাহেব ফেরেন। আর্থরাইটিসের ব্যথায় ঈষৎ খোঁড়ান, শক্ত ছড়ি নিয়ে হাঁটেন। হয়তো সে যন্ত্রণাতেই কিংবা অপমানে ক্ষোভে ওঁর মুখ তামাটে দেখায়।

বিকেলের দিকে ছোট সাহেবের নাতি এল। এক মাথা ঘাড়-লতানো চুল, গালে ঝুলো জুলপি, থুতনি ঢাকা লেনিন দাড়ি এবং দীর্ঘাঙ্গ। চালাক-চতুর, আঙুলে গাড়ির রিং, দরাজ হাসি হাসি গলায় বলল—'হ্যালো গ্র্যানড-পা, ইউ লুক ফাইন! সাহেব এক সেকেনড তাকিয়ে রইলেন, বললেন 'তুমি কে?'

বাঃ, ডিকি!

ডিকি?

সরমার ছেলে।

আই সি! বছর পনেরো দেখিনি তোমায়।

ডিকি কেমন থতমত খেয়ে যায়, সামলে নিতে নিতে হাসে,'বলে ইউ অয়্যার সো বিজি, অলওয়েজ।'

তোমার গালে কি…সাইড বার্নস, না দাড়ি?

ডিকি গালে আচমকা হাত দিয়েছিল, এবার বিমূঢ়ভাবে সেটা নামায়। দাস সাহেব অবিচলিত চেয়ে থাকেন, ধীরে ধীরে বলেন 'আমাদের জমিদারীতে বরকন্দাজ থাকত… ইয়া গাল পাট্টা আর বাবড়ি…ওনলি ইয়োর ফ্রেনচ কাট ইজ ওরিজিন্যাল।

ডিকি হাসে, তামাশার হাল্কা মেজাজ ও দরাজ স্বর কিন্তু ফোটে না, হাসির আওয়াজ শোনায় কর্কশ, শুষ্ক। নারস তাড়াতাড়ি বলে 'ওঁর বেশি কথা না বলাই ভালো।'

আই অ্যাম সরি।

আপনি বরং ওই চেয়ারটায় বসুন।

থ্যাঙ্কস এ লট।

ডিকির মুখ কালচে দেখায়, দোমনাভাবে সে চেয়ারটায় বসবে, কি-না ভাবে এক সেকেনড, কিছুটা বিস্রস্ত, আলগা। ঠিক তখনই দাস সাহেব বলেন 'ইউ বেটার গো অ্যানড হ্যাভ টি…কান্তকে বলো।'

না-না কি দরকার। —ডিকি তাড়াতাড়ি বলে দাদু এলেই আমি যাব।'

তাহলে ম্যাগাজিন দেখগে…বাইরের ঘরে।

সেই ভালো।

বাট ডোনট টাচ মাই হুইসকি।

নো নো! ডিকি প্রায় ছিটকে বেরিয়ে যায়। তার কান দুটো তপ্ত, গনগনে হয়ে ওঠে। প্রায় স্বগতোক্তি করে সে, ব্লাডি ওলড ফাগি! চেঁচিয়েই এ-কথা সে ছুঁড়ে দিত, কিন্তু বুড়ো শয়তান কুবের। তার নিজের দাদুর হিসেবে পঁচিশ-ত্রিশ লাখ টাকার উপর কেলিয়ে আছে। এদিকে বংশে লালবাতি, নিজের বলতে আমরাই টিমটিম করছি। গুড গড।

রানী খাওয়ায় বুড়োকে। আগেই পোশাক আশাক বদলে দিয়েছে, টাকের দু'পাশে আঁচড়েছে সযত্নে। কাঁচের পাত্রে ডুবন্ত বাঁধান দাঁত বাথরুমে নিয়ে গিয়ে পেসটে মেজে, তাজা ঝকঝকে অবস্থায় এনে দিয়েছে। দাস সাহেব সব নীরবে দেখেছেন কিংবা উপলব্ধি করেছেন, কোনো উক্তি করেননি গোড়ায়। কেবল সাজ-সজ্জা হয়ে গেলে, দাঁত লাগানোর অন্তে যখন রানী ওঁর হাতে ছোট্টো, হাতাওলা আয়নাটা দেয়, তখন উনি নিজের প্রতিবিম্ব দেখেন আলস্যে, কিন্তু অভ্যস্ত সতর্কতায়। শেষে আয়নাটা ফিরিয়ে দিতে দিতে বলেন 'নিজেকে তাজা লাগছে…মানুষ, মানুষ।'

আফটার শেভ লোশন দেব? …দাড়ি কামিয়ে লাগাননি আপনি।

থাক। —উনি এবার তাকান নারসের মুখের উপর, বলেন ঃ তুমি কাজের…থ্যাঙ্কস।

বাইরে যাবেন?

বাইরে?

বারান্দায়…বেশ খোলামেলা, ঠাণ্ডা…দু' পা হাঁটাও হবে আপনার…ডাক্তার বলেছেন।

বেশ। উনি বলেন 'একটু ধর আমায়, উঠি'।

দাঁড়ান-দাঁড়ান। রানী বাধা দেয়, বলে, 'এতটা একেবারে হাঁটা মানা…হুইল চেয়ারটা মাঝখানে রাখি, বসবেন'।

নারস হুইল চেয়ার দ্রুত মাঝপথে রাখে, খাট থেকে বারান্দার মধ্যস্থলে, একটেরে। অতঃপর ওঁকে নিয়ে যায় তিন-চার পা, হাতের ভরে। হুইল চেয়ারে বসায়, কুশান-টুশান দিয়ে সামনে নিয়ে যায় বারান্দায়।

সন্ধ্যার একটু আগে বড় ডাক্তার আসেন, সঙ্গে পারিবারিক চিকিৎসক। আত্মীয়-স্বজন ঘর ছাড়েন। পাশের ঘরে থাকেন উৎকর্ণ। ডঃ সেন পরীক্ষা সেরে এক মুখ হাসেন, বলেন ঃ প্রোগ্রেস খুব ভালো।

আই ওয়ানডার!

দেখবেন, উইদইন টু উইকস ইউ উড ফীল নরমাল…অলমোসট।

খাবো কি, রাত্রে?

কি চান? চিকেন স্যুপ, বেকড…

আই হেট চিকেন স্যুপ, ইনসিপিড!

ওয়েল—ডাক্তার হাসেন বলেন বেশ বেকড চিকেন খান, ডিলিসিয়াস…গ্যাব-নিসড উইদ গ্রীন পীজ।

এবার দাস সাহেবের ঠোঁটে হাসি ফোটে সন্দেহাতীত। ডাক্তার যাবার আগে কিন্তু উনি বাধা দেন, বলেন 'আর ডাক্তার…'

বলুন?

আমি শান্তি চাই…নিরিবিলি।

অফকোর্স।

নট দিস ক্রাউড।—উনি আবছা ইঙ্গিত করেন। বড় ডাক্তার এক নিমেষ থমকে যান, অতঃপর তাকান পারিবারিক চিকিৎ-সকের দিকে, মুখে মৃদু হাসি, বলেন 'ডঃ চ্যাটারজি দেখবেন ব্যাপারটা। ডোনট ওয়রি'।

ধন্যবাদ।

সুতরাং স্বজনদের ঘরে আসা মানা হলো। ডাক্তারি কেতায়। রুগীর বিশ্রাম চাই, বাক্যালাপ বন্ধ। ঘরে শুধু নির্বাক নারস থাকবে। ডাক্তার সেনের নির্দেশ।

সব সেরে ডাক্তার চ্যাটারজি রুগীর কামরায় আসেন। পালস ঈষৎ দেখে, নিজের ব্যাগটা হাতে নিতে নিতে বলেন, 'রাত্রে আবার আসব চেমবার ফেরত'।

আর একটা ব্যবস্থা করে যাও।—সাহেব বলেন 'রানীকে নারস-কাম হাউসকিপার করব ভাবছি…কি গো, আপত্তি আছে

তোমার ?'

উনি রানীর দিকে তাকান। রানী বিমূঢ় হয়ে যায়, ঠিক বোঝেও না ব্যাপারটা। ডাক্তার চ্যাটারজিও হকচকান, অল্প বিভ্রান্ত-ভাবে বলেন ঃ কিন্তু আপনার নাইট নার্স তো আসবে।

আসুক। ওয়েলকাম। রানী সব সুপারভাইজ করবে···বুড়ো লোক আমি, একা।

কিন্তু আমি তো বাড়িতে বলে আসিনি।—রানী বলে 'কাপড়-চোপড় নেই কিছু···'

ড্রাইভার তোমায় গাড়িতে নিয়ে যাবে··· ইনফরম ফ্যামিলি···যা লাগে নিয়ে এসো।

তাছাড়া···

ওয়েল, গো অ্যাহেড···বলো।

মিছিমিছি আপনার অনেক খরচ হবে।

উনি জবাবে কিছু বললেন না ওকে। চ্যাটারজির দিকে তাকালেন, বললেন 'সো দিস ইজ সেটেলড···রাতে এসো'।

হ্যাঁ স্যার।

ডাক্তার চলে গেলে দাস সাহেব রানীকে বলেন ঃ তুমি রাতে রেসট পাবে, ঘাবড়িও না। নাইট নারসকে একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দিও··· ব্যস।

না-না, তা না।

দেয়ার ইট ইজ ও কে। —উনি হঠাৎ অদূরে ব্যুরোর উপর রাখা ছবিটা দেখিয়ে বলেন 'ওটা নিয়ে এসো তো'। রানী ছবিটা এনে দিলে উনি বলেন 'ছবিটা দেখেছ'?

আজ্ঞে!

কেমন দেখতে মহিলা?

খুব সুন্দরী।

শুধু ম্যাড়মেড়ে সুন্দরী নয়, সি ওয়াজ ব্রাইট, স্পারকলিঙ···কে ছিল জানো?

অনুমান করতে পারি···মিসেস দাস?

হ্যাঁ। —উনি এবার একটু হাসেন, কিংবা হাসির আভাস মাত্র ফোটে ও'র মুখে। এবং দেখতে দেখতে সে অভিব্যক্তি আনমনা হয়ে আসে। ছবিটা খাটের পাশের টেবিলে উনি রাখতে রাখতে বলেন ঃ আমার চেয়ে ও একত্রিশ বছরের ছোট ছিল···দ্বিতীয় স্ত্রী, প্রথমা মারা যান, ডিউরিং চাইলড বারথ, উইথ দি চাইলড,।

রানী কেমন স্থানু হয়ে যায়, তার নির্ধারিত বসার চেয়ারটার পিঠ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে অনড়। কোনো কথা আসে না তার। কথা বলেন দাস সাহেবই; বলেন তারপর আমি শুধু অঢেল টাকা কামিয়েছি মোকদ্দমায় আর উড়েছি···খাওয়া-দাওয়া-পিনা আর উইমেন···রেবাকে বিয়ে করি, আমি যখন তিপ্পান আর ও বাইশ···দেন কিলড হার।

রানী এবার হঠাৎ বলে ঃ ও কথা থাক স্যার···এখন।

আহা শোনো না···আমি শান্তভাবেই বলছি, কোনো ক্ষতি হবে না···।

এই তো হয়ে গেলো বলা, কোনো ঈর্ষা, সংশয়, সন্দেহ আর অশান্তিতে আমি রেবাকে মারলুম। ওর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, আকাঙ্ক্ষা সব নাকচ করে দিয়ে, প্রায় কয়েদে রেখে। শেষ দশ বছর ওর বাঁচার কোনো বাসনা ছিল না। মরলেও ঘুমের মধ্যে···হার্ট।

রানী একটু শিউরে উঠল ভিতর ভিতর। আপনা থেকে তাকাল হাত ঘড়ির দিকে। তারপর ওষুধ ঠিক করল, জল নিল। দিল এসে রুগীকে। সবই নির্বাক, অভ্যস্ত হাতে। দাসও ওষুধটা খেলেন চুপচাপ, শেষে মুখ মুছে চাবির গোছাটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'একটু ব্যুরোটা খোলো তো···মাঝের শেলফটা দেখো।'

কী চান ওখানে?

হুইসকি···নিশ্চয়ই বোতল আছে।

আমায় মাফ করবেন···।

হোয়াট ডু ইউ মীন?

আমি নারস···ওটা আপনার বারণ এখন।

ননসেনস! আমার ইচ্ছে আমি খাব।

আচ্ছা, আসছি দাঁড়ান।

রানী চাবি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। উনি তাকিয়ে রইলেন। প্রথমটা ঠিক না বুঝে, স্বল্প বিভ্রান্তির ঘোরে। পরে কয়েক মুহূর্ত দরজাটার পর্দার পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিড়বিড় করেন গুডনেস, দি সিলি ওম্যান হ্যাজ ভ্যানিসড।

দিন ছ'সাতের মধ্যেই দাস সাহেব নিজে উঠে বাথরুম যেতে শুরু করেছিলেন। ধীরে ধীরে বারান্দায়ও, কিন্তু বারান্দায় রানী তাঁকে একা যেতে দিত না। পাশে পাশে থাকত, যদিও দিন পাঁচেকের মাথায় দাস সাহেব হঠাৎ বলেছিলেন 'আমায় ধরো না।'

কেন?

লেট মি বি! আমি খোকা নই।

রানী থমকে গেছিল, সাহায্যের জন্যে ও'র বাজু ধরা হাত সরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু ওর আকস্মিক ঝাঁঝ। খিঁচিয়ে ওঠা ওঁর খারাপ লাগে। এমন নয় যে দাসের মেজাজ তার ইতিমধ্যে অগোচর রয়ে গেছে, তবু অপ্রত্যাশিত ঝঙ্কার রানীকে বিমূঢ় করে। বারান্দায় চেয়ারে বসতে বসতে সম্ভবত দাস সাহেব ব্যাপারটা উপলব্ধি করেন, অথবা হয় তো এমনিই বলেন, অদূরে গাছের মাথার দিকে চেয়ে থেকে বলেন ঃ আমি কারু উপর নির্ভর চাই না।

রানী চুপ করে থাকে। এক্ষেত্রে বাক্যব্যয় নিরর্থক। মনে শুধু একটা চাপা অস্বস্তি থাকে কি করে হঠাৎ সহজ হবে ঠিক বোঝে না। এমন সময় ছোট সাহেব আসেন, সে বেঁচে যায়। কান্তকে চায়ের কথা বলতে এগোয়।

ছোট সাহেব বলেন ঃ কেমন আছ দাদা?

ভালো।

ইউ লুক বেটার।

আই অ্যাম···বস।

চেয়ারে বসতে গিয়ে যন্ত্রণায় ছোট সাহেবের মুখ বিকৃত হয়ে যায়। হাতের ছড়ি সোজাসুজি রেখে উনি ডান পা-টা লম্বা সামনে বাড়িয়ে বসেন। দাস সবই লক্ষ্য করেন, এবং ছোট ভাইয়ের মুখের কাতর ভাব মেলাবার আগেই বলেন ঃ আমার কথা না ভেবে, নিজের শরীরটা দেখ।

ও কিছু না।—ছোট সাহেব ক্লিষ্ট হাসেন, বলেন 'আর্থরাইটিস'।

আমার ও-সব বালাই নেই।

থ্যাঙ্ক গড!

চায়ের সরঞ্জাম এনে, চা তৈরি করে দিয়ে কান্ত বিদায় নিলে ছোট সাহেব আসল কথাটা পাড়েন, ইতঃস্তত করতে করতে হঠাৎ বলেন 'ইয়ে দাদা, তোমার কাজের ব্যাপারটা কিছু ভাবলে?'

কাজের?

মানে এই উইল-টুইলের কথা আর কি।

ভাবার কিছু নেই।

না তা নয়···তবে শরীরের কথা তো, কিছু বলা যায় না।

আই অ্যাম নট কিকিং দি বাকেট, ইয়েট।

সে কী! ও-কথা কে বলে···এত বিষয়-আশয়···এই যা।

আই হ্যাভ টেকেন কেয়ার অব এভরিথিং ···ভেবো না।

ব্যস ব্যস।—ছোট সাহেব ক্লেশহীন হাসার প্রয়াস পান, নিম্নস্বরে বলেন ঃ একদিন সব আলোচনা করে নিলে হয়···কী বল?

দাস তখুনি কিছু বলেন না, কিছুক্ষণ নির্নিমেষ চেয়ে থাকেন ভাইয়ের দিকে। এবং ক্রমে তাঁর মুখ তামাটে, থমথমে, জমাট হয়ে আসে। ছোট সাহেব দৃষ্টি সরান দ্রুত, কিন্তু পরিত্রাণ পান না।

দাস গম্ভীর শ্লেষে চাপা স্বরে বলেন আই মে আউটলিভ ইউ, খোকা।

ব্যাপারটা ওখানেই চুকে যায়। বিধ্বস্ত খোকা বিদায় নেন লৌকিক সৌজন্য বজায় রেখে। আর সেই সন্ধ্যাতেই নাইট নারসের ইতি ঘটে। দাস সাহেব নিজেই তার ব্যবস্থা নেন আচমকা। নারসকে প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দিয়ে ধন্যবাদ জানান। রানী বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, বোঝে তার করনীয় কিছু নেই। এই একপেশে, দাপুটে ব্যক্তিত্বের মুখে সে তৃণতুল্য। তবু নারস চলে গেলে সে বলেছিল 'এটা বোধহয় না করলেই পারতেন।'

রাবিশ!

অন্তত ডাক্তারকে···।

হোয়াট ডাক্তার···। আই ডিডনট লাইক হার ফেস।

এতেই চোকেনি বিভ্রাট। সে সন্ধ্যায় কান্ত বরফ এনে দিলে উনি হুইসকি অন রকস-ও খান। এক পেগের উপর। নিশ্চয়ই আরো নিতেন। কিন্তু তখনই রানী এসে

দাঁড়ায়, বলে 'আমি তাহলে চলি, স্যর ?'

কোথায় ?

বাড়ি। কাল এসে টাকা নিয়ে যাব।

কেন ?

আপনি মানা না শুনলে আমার বিপদ।

ও ড্যাম ইউ !

উনি উত্যক্ত হয়ে বোতল থেকে হাত সরান। রানী হুইস্কির বোতল তুলে নিয়ে গিয়ে চাবি দিলে গোঁজ হয়ে থাকেন, হুঙ্কার ছাড়েন না। অবশ্য তখনো পানীয় ও'র পাল্লার বাইরে নয়, ঈষৎ দূরে শুধু।

কিছুক্ষণ শূন্য গেলাস হাতে নিয়ে অন্যমনস্ক, স্তব্ধ বসে থাকার পর দাস সাহেব পাত্রটা টেবিলে রাখেন। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ান, বলেন 'চাবির গোছাটা নিয়ে এস। তারপর উনি সতর্ক, সংযত পদক্ষেপে এগিয়ে যান। পাশের ঘর পেরিয়ে একটা বড় শোবার ঘরে এসে দাঁড়ান। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে বলেন ঃ রেবা মারা যাবার পর এ-ঘরে কেউ শোয় না।'

রানী দেখে মস্ত জোড়া খাট, গদি, ধবধবে সিল্কের বেড কভার। এক পাশে ড্রেসিং টেবিল, গদিওলা টুল, আলমারী। একদিকে কার্পেটের উপর কেদারা, গদিওলা চেয়ার, সাইড টেবিল—ছোট ঘরোয়া আড্ডার জায়গা। আর বিপরীত দিকে, এক কোণায় অবস্থিত পুরনো, বৃহৎ সিন্দুক।

দাস সিন্দুকটার কাছাকাছি, খাট ঘেঁষে একটা চেয়ারে বসলেন এসে। বললেন দরজাটা বন্ধ করে দাও···ছিটকিনি দিয়ে।

রানী তাই করে এলে দাস সাহেব একটা চাবি দেখিয়ে সিন্দুক খুলতে বললেন। আর বললেন যা বেরোয় খাটে রাখতে।

রানী খাটে সাজিয়ে দিল অনেক গয়না, কিছু কাগজপত্র, একটা বড় ভারি খাম। চার পাঁচটা ছবির অ্যালবাম।

ব্যস ?—উনি রানীর মুখের দিকে তাকালেন। রানী বলল ঃ হ্যাঁ, আর কিছু নেই ?

ফাইন !—ও'র মুখে কূট রহস্যের ছায়া। উনি নির্নিমেষ গয়নাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। অতঃপর খামটা ইঙ্গিত করে বললেন ওটা খোলো, গুণে দেখো তো কত টাকা আছে।'

এক'শ টাকার বাণ্ডিল সব। রানীর হাত কাঁপে, মাথাটা কেমন দপদপ করে। সে একটা একটা নোট গুণতে যায়, উনি বাধা দেন, বলেন 'দেখি'।

রানী বাণ্ডিলটা ও'র হাতে দেয়। উনি প্রথম ও শেষ নোটের নম্বর দেখে নিয়ে ফেরৎ দিতে দিতে বলেন ঃ 'দশ। ছিল সাতাশ হাজার···বুঝলে ?

রানী কিছু বলে না, স্থানু হয়ে থাকে। উনি গয়নাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলেন, 'আসল জিনিসগুলো গেছে, সীতাহার, শেলি, নেকলেস, এক'শ ভরির গোট···মায়ের। সীতাহারটার দাম এখন পঞ্চাশ হাজার হয় তো বেশি···আমায় যখন ঝিন্দের মহারাজা ওটা দিয়েছিলেন···নাইনটিন টোয়েনটিনাইনে, তখনই হাজার পনেরো মূল্য ছিল। লোকটা শালীকে খুন করে···কেস-এ আমি বাঁচিয়ে দিই।

উনি হঠাৎ থামেন, রানীর দিকে তাকিয়ে স্বল্প হাসেন, বলেন ঃ সিগারেট খেতে দেবে আমায় ?

এ্যাঁ ?

সিগারেট। লাইব্রেরীতে টিন আছে।

কী দরকার ?

বেশ।—উনি হাতের ইঙ্গিতে বলেন 'তুলে ফেল সব···ছ'টা গোল্ড বারও হাওয়া হয়েছে···অল ফর মাই ট্রিটমেণ্ট !'

রানী চুপচাপ সব সিন্দুকে তুলতে থাকে, কিন্তু চোখের কোণা থেকে ও দেখতে পায় দাসের অভিব্যক্তির কাঠিন্য। উনি আপন মনে বলেন ঃ 'ওরা ভেবেছিল আমি আর নারসিংহোম থেকে ফিরব না।···পুওর থিংস'।

অতঃপর নিজের ঘরে এসে উনি শুয়ে পড়েন। চোখ বোঁজেন। রানী আস্তে বলে আপনার খাওয়ার সময় হলো।

আমি খাব না।

তা কি হয়···জোর পাবেন কী করে ?

আর জোর !—উনি চোখ খোলেন না। রানী দ্বিরুক্তি না করে বেরিয়ে যায়। যেটুকু খাওয়ার খান, হয় তো সামনে বেকড ভেটকি দেখলে আপত্তি করবেন না।

দুদিন পর বিকেলে রানী একবার বাড়ি গেছিল, সব আয়োজন সেরে। ফিরেছিল আটটার মধ্যেই। কিন্তু ঘরে এসে দাসকে দেখেনি, বারন্দাও ফাঁকা। হয় তো আবার স্ত্রীর শোবার ঘরে গেছেন ভেবে সে এগোয়, কিন্তু বাঁয়ে লাইব্রেরীতে আলো জ্বলছে লক্ষ্য করে সেদিকেই এগিয়ে যায়। তার আসার কোনো শব্দ হয়নি, অন্তত বইয়ের আলমারীর সামনে দাঁড়ান দাস তা টের পাননি। তাই রানী যখন হঠাৎ ওঁকে দেখে বলে ওঠে 'আরে ! এখানে কী করছেন ?'

তখন দাস অকস্মাৎ চমকে যান। তাঁর হাত থেকে একটা বই আর খাম মাটিতে পড়ে যায়। উনি সামলে নিয়ে বলেন ঃ ওঃ, তুমি ! দরজাটা দাও।'

রানী দরজা দিয়ে এগিয়ে যায়। বই আর খামটা তুলে ওঁর হাতে দেয়। খামটা ছিঁড়ে গেছে, সম্ভবত উপর থেকে পড়ে, আর ভিতরে নোট।

বইটা রাখো।—দাস বলেন। খাম নিয়ে এগিয়ে যান চেয়ারে। রানী আলমারীর ঠাসা বই-এর ফাঁকে হাতের বইটা গুঁজে দেয়। সবই আইনের কেতাব। দাস সাহেব হঠাৎ একটা সিগারেট ধরান, টেবিলে রাখা সুদৃশ্য সিগারেট কনটেনারটা অন্যমনস্কভাবে ঘোরান। রানী কাছে এলে সামনের চেয়ার নির্দেশ করে বলেন 'বসো'। রানী বসে। উনি ফাটা খামটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন ঃ এটা তোমার কাছে রেখে দাও···হাজার ছ'সাত টাকা আছে বোধ হয়।

এত টাকা আমি কী করব ?

রেখে দাও, সেফ কাসটডি।

না।

দেখো রানী।—উনি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যান বলেন ঃ হঠাৎ আমি মরলে তোমার মাইনে পেতেও মুস্কিল হবে···আমার চারপাশে শকুন উড়ছে।

কী যা তা বলেন।

ইউ ডোনট নো !—ওঁর মুখটা হঠাৎ ভীষণ ধূর্ত দেখায়। ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি। উনি বলেন 'এ বাড়ির নানা জায়গায় আমার লুকোনো টাকা আছে ওরা জানে না···কিন্তু খুঁজবে···আমি গয়া হলেই খুঁজবে···সিওর।

আমি এসব বুঝি না।

ইউ আর এ ফুল, বাট এ গুড সোল !

ওঁর মুখে চক্রান্তের আভাস ছড়ায়, চাপা, উত্তেজনা, বক্র ঠোঁটের ফাঁকে উনি বলেন ঃ ঐ যে বড় ছবিটা দেখছ, অয়েল পেনটিং···বাবার···ওটার পিছনে ফ্রেমের ভিতর দশ হাজার টাকা আছে। আমি হঠাৎ টাঁসলে তুমি নিয়ে নিও···কেউ আসার আগে, কেউ জানে না।

রানী স্থবির হয়ে বসে থাকে, চিন্তা, বোধশক্তি, বিবেচনা সব তালগোল পাকিয়ে এক অজানা শঙ্কায় তার মর্মচ্ছেদ করে। এহেন প্রেতাত্মা তার কল্পনারও ঊর্ধ্বে। তার মাথা ও সর্বাঙ্গ অবশ লাগে।

দাস উঠে দাঁড়ান, ওর দিকে কৌতুক, ব্যঙ্গ ও চক্রীর মিশ্র চাউনি মেলে বলেন ঃ আরো অনেক খানা-খন্দ আছে···টাকা রাখা···তুমি না পালালে, থাকো যদি, সব বলব···ধীরে ধীরে।

কিন্তু সে রাত্রেই রানী ঠিক করে সে আর থাকবে না। ডাক্তার সেনকে বলে যত সত্ত্বর সম্ভব এ গোলক ধাঁধা থেকে রেহাই নেবে। নচেৎ হয় তো জেল, কারাবাস, বদনাম তার নিয়তিতে অনিবার্য। অন্তত এমন সব চিন্তার মধ্যেই সে ঘুমোয়, তন্দ্রা আর জাগরণের ছায়ায় অনেকক্ষণ ছটফটিয়ে।

অথচ পরের দিন সকাল সাতটার মধ্যেই দেখে দাস সাহেব বেহুঁস। হুইস্কির একটা খালি বোতল, গেলাস তার খাটের পাশে টেবিলে পড়ে আছে। অ্যাসট্রে ভর্তি আধ-পোড়া সিগারেট, ছাই। দিন দু'এক অতঃপর ডাক্তাররা ধস্তাধস্তি করে, নিরর্থক। তৃতীয় সন্ধ্যায় মেজ সাহেবের সরকারী মৃত্যু ঘটে। কিন্তু কেউ কাঁদেনি, এক কান্ত ছাড়া। সে ভেউ ভেউ করে ভেঙে পড়ে। ছোট সাহেব, ডিকি, মণিদি সবাই কাঠ, কিংবা পাথরের মতো কদিন থাকেন।

সংবাদপত্রের শোক সংবাদে, ওঁর গুণ-কীর্তনসহ এ খবর বেরোয় যে উনি স্ত্রীর নামে ট্রাস্ট করে গেছেন, তাতে হাসপাতাল হবে, শুধু কান্ত পেয়েছে দশ হাজার টাকা। □

সাহিত্যে মেসবাড়ি ও মেসবাড়িতে সাহিত্যিক

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী প্রথম জীবনে কিছুকাল হ্যারিসন রোডের এক মেসবাড়িতে ছিলেন। তাঁরই ব্রাদার-ইন-প্রফেশন প্রদোষ মিত্র ওরফে ফেলুদা থাকেন কলকাতায় নিজেদের বাড়িতে। এ থেকে একটা সত্য বেরিয়ে আসে যে, কলকাতার সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডে মফস্বল খারিজ হয়ে গেছে বা যাচ্ছে, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছিলেন মফস্বল থেকে, সত্যজিৎ খোদ কলকাতার। বাহাত্তর নমবর বনমালী নস্কর লেনের এক মেসে বাস করেন বিখ্যাত ঘনাদা। প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজে একসময় মেসে থাকতেন, গোবিন্দ ঘোষাল লেনে। ঘনাদার গাল-গপ্পের মেসবাড়ি তারই স্মারক। স্বাভাবিক কারণেই ব্যোম-কেশের মত কোন মেসবাড়ির রহস্য নিয়ে অদ্যাবধি ফেলুদাকে মাথা ঘামাতে দেখিনি। এখন সাহিত্যিকরা একটু নাম করলেই কলকাতা তাকে আশ্রয় দেয়, নিজের বাড়িতে না হলেও ভাড়াটে বাড়িতে, চাকরি দেয়, মার্কেনটাইল আপিসে না হলেও খবরের কাগজে। সুতরাং স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত মেস-বাড়ির দুঃখ তাদের সইতে হয় না। ফলে, মেসবাড়ি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আর নেই বললেই চলে।

কলকাতায় মেসবাড়ির আদিরূপ পাওয়া যায় শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখায়। আজকের মত সেকালে মফস্বল থেকে কলকাতায় যাতায়াতের এমন সহজ সুযোগ ছিল না। কলকাতায় যারা বিষয়কর্ম করতেন তারা হয় কোন পদস্থ আত্মীয়ের আশ্রয়ে, নয় তো দু'পাঁচজন একত্র হয়ে বাসা করে থাকতেন। গ্রামের মধ্যে কেউ একজন কৃতী বা সম্পন্ন হলে কলকাতায় তার একটি চাকর-বাকর পরিচালিত বাসা থাকতই, জ্ঞাতি-কুটুম্বরা পড়াশুনো করতে, চিকিৎসা করাতে বা চাকরির খোঁজে কলকাতায় এলে সেই বাসাতে এসে উঠত। পুরুষ মানুষের বাসা, সুতরাং হুটহাট এমনি আসা যাওয়া লেগেই থাকত। এভাবে আশ্রয় আর অন্নদান ভদ্র সম্পন্ন গৃহস্থের একটা সামাজিক কর্তব্য ছিল। কলকাতায় যেসব পুরনো মেসবাড়ি আছে তার কোনটায় মেদিনীপুরবাসীর অগ্রাধিকার, কোনটায় জয়নগর মজিলপুরবাসীদের। এর মূল ঐখানেই। হয়তো ষাট-সত্তর বছর আগে ও মেসের পত্তন করেছিলেন ওই অঞ্চলের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আদি পুরুষ চলে গেছেন, জ্ঞাতিকুটুম্বের সীমা শ্লথ হয়ে গেছে, পরিচিত অনাত্মীয় এসেও উঠেছে। উদার অন্নদাতার স্থান নিয়েছে চাঁদার খাতা। একনায়কতন্ত্রের বদলে গণতন্ত্র।

কলকাতার চাঁপাতলা সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের লেনের এমনি একটি বাসায় শিবনাথ শাস্ত্রী অনেকদিন কাটিয়েছেন। সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকানাথ শিবনাথের মামা, তিনি অনেকগুলি নিষ্কর্মা যুবককে এই বাসায় অন্ন দিতেন। এক একটি ভীষণাকৃতি মর্দ, কেউ দেড় কুনকে, কেউ দু' কুনকে চালের ভাত খায়। শিবনাথের বাবা সংস্কৃত দশকুমার চরিত থেকে নাম সংগ্রহ করে তাদের নাম রেখেছিলেন। তাতেই সে বাড়িতে কারো ডাক নাম হল দর্পসার, কারো নাম দর্প-নারায়ণ, কারো বা চণ্ডবর্মা। থালা ঘটি বাটি চুরি হয়ে যেত বলে শিবনাথের মাতামহ প্রত্যেকের জন্যে এক-একখানি মেটে পাথর কিনে দিয়েছিলেন। শিবনাথের বাবা রসিক ছিলেন, তিনি নিষ্কর্মা মর্দদের পাথরের পিঠে নরুণ দিয়ে কুঁদে লিখে দিয়েছিলেন কে কত কুনকে চালের ভাত খায়। খেয়েদেয়ে যে যার পাথর ধুয়ে মেজে রাখত।

দ্বারকানাথ সোমবার থেকে শনিবার এক বেলা কলকাতায় থাকতেন, তিনি যতক্ষণ আছেন তাঁর অন্নাশ্রিতরাও ততক্ষণ শান্তশিষ্ট হয়ে থাকত। তিনি শনিবার বিকেলে দেশে যেতেন। শনিবার রাত্রি আর রবিবার সারাদিন দশকুমার চরিত্রের চরিত্ররা আর এক মূর্তি ধারণ করত। কেউ গাঁজা খেত, কেউ মদ খেত। কেউ বা গণিকালয়ে গিয়ে রাত কাটাত। এদের মধ্যে বালক শিবনাথকে অনেকদিন কাটাতে হয়েছে। রামতনু লাহিড়ী বালক বয়সে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের বাসায় ছিলেন। বিদ্যালঙ্কারের স্বভাব চরিত্র ভাল ছিল না, বাসাটি আরো ভয়ঙ্কর ছিল।

পরে মফস্বলাগত এমনি অনেক স্মরণীয় ব্যক্তিদের কলকাতা গ্রাস করেছে। তাঁরা কলকাতাতেই স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে ঘরসংসার পেতেছেন। পরান্নজীবীরা মেসকমিটি করে বাসা চালিয়েছে খরচখরচা ভাগাভাগি করে। তখন মেস মানে অল্প খরচে আহার ও বাসের ব্যবস্থা। এমনি মেসেই এসে উঠতেন মফস্বলের সাহিত্যিকেরা। মালদার চাঁচোল থেকে এসেছিলেন শিবরাম চক্রবর্তী। বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা একটি ছেলে কলকাতায় কী না করেছে! অন্নসত্রে খেয়েছে, ফুটপাতে শুয়েছে, খবরের কাগজের হকারি করেছে, স্বদেশী করেছে, জেল খেটেছে। শেষ পর্যন্ত সেই ছেলেটিই হয়েছেন শিবরাম, যিনি একা কুম্ভের মত হাস্যরসের কেল্লাটি রক্ষা করেছেন আমৃত্যুকাল। তিনি ছিলেন অকৃতদার, অকৃতঘর। মেসেই থেকেছেন আজীবন। মার্কাস স্কোয়ারের কাছে মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটে মুক্ত আরামেই কাটিয়েছেন, এমনি একটা ধারণা শিবরামই জন্মে দিয়ে গেছেন আমাদের মধ্যে। কিন্তু আমার তো মনে হয় এই মুক্ত আরামের শ্লোগান দিয়ে তিনি আমাদের অনেক লজ্জা ঢেকে দিয়েছেন, কান্নার বিষয়কে হাসির করে তুলেছেন।

শিবরামের চির আরামের কিছুদিন আগে বনফুল তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। মেসের নোংরা ঘর, তক্তপোষ ও বিছানাপত্র দেখে বনফুল দুঃখ পেয়েছিলেন, বাংলাদেশের তিন পুরুষের হাসির রাজার এই হাল! আমরা ওই সদাহাস্যময় মানুষটিকে উপযুক্ত মর্যাদা দিইনি, দিলে মেসবাড়ি থেকে তাঁকে আমরা মুক্ত করে আনতাম, যাবজ্জীবন সত্ত্ব-সমেত দিতে পারতাম একখানা ছোট বাড়ি, সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে। পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখলের আশঙ্কা তাঁর ক্ষেত্রে অন্তত ছিল না।

সাহিত্যে ঘনাদা সাহিত্যিক শিবরামের দোসর। দুজনেই অদ্বিতীয়।

বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও রোমানটিক মেসবাড়ি আছে 'চরিত্রহীন

উপন্যাসে। সাবিত্রী সেখানকার ঝি এবং গৃহিণী। বয়স একুশ বাইশের কাছাকাছি। এমন পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি বেশবাসে মনোরঞ্জক, সুরসিক ঝি বাস্তবের কোন মেসে আছে কিনা জানি না, থাকলে তাকে নিয়ে শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই লেগে যেত বোর্ডারদের মধ্যে। শরৎ-চন্দ্রের মেসবাড়ির অভিজ্ঞতা ছিল। তাই একাধিক স্খলিত চরিত্রকে তিনি মেসবাড়িতে স্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে ট্র্যাডিশন সেই পুরনো কলকাতার বাসাবাড়ির, কুশীলবেরা শিবনাথ শাস্ত্রী বর্ণিত মর্দদের উত্তরপুরুষ। চণ্ডীগড়ের লম্পট জমিদার জীবানন্দ কিছুদিন বাদুড়বাগানের মেসে ছিল, সেই মেসে থাকতে অলকার মায়ের হোটেলে মাঝে মাঝে খেতে যেত। জীবানন্দ নিজেই বলেছে, ওই সময়ে একটা প্রণয়কাণ্ডের বৃন্দে হয়েছিলুম। আর একজন মেস-আশ্রয়ী দেবদাসের চুনিলাল। যে ঘরে দেবদাস থাকে, তারই পাশের ঘরে ন' দশ বছর আছে চুনিলাল। এই দীর্ঘ সময় তার কেটেছে বি এ পাশ করার জন্যে, কিন্তু পাশ করতে পারেনি। চুনিলাল রোজ সান্ধ্যভ্রমণে বেরোয়, কোনদিন রাত্রে বাসায় ফেরে না। কোথায় যায়, বাংলা সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই তা জানেন। চুনিলাল দেবদাসকেও নিয়ে গিছল চিৎপুরে চন্দ্রমুখীর কুঠিতে।

আরো পরে বাংলা সাহিত্যের মেসবাড়ি থেকে এ ধরনের প্রকাশ্য লাম্পট্যের পাট উঠে গেছে। অধিবাসীদের জীবনে তখন মাত্র দুটি উদ্দেশ্য—অফিসে চাকরি করা, আর ফিরে এসে মেসে খাওয়া ও ঘুমানো। এমনি একটি মেসবাড়ির বর্ণনা আছে অপরাজিত উপন্যাসে। পঞ্চানন দাসের গলিতে সেই

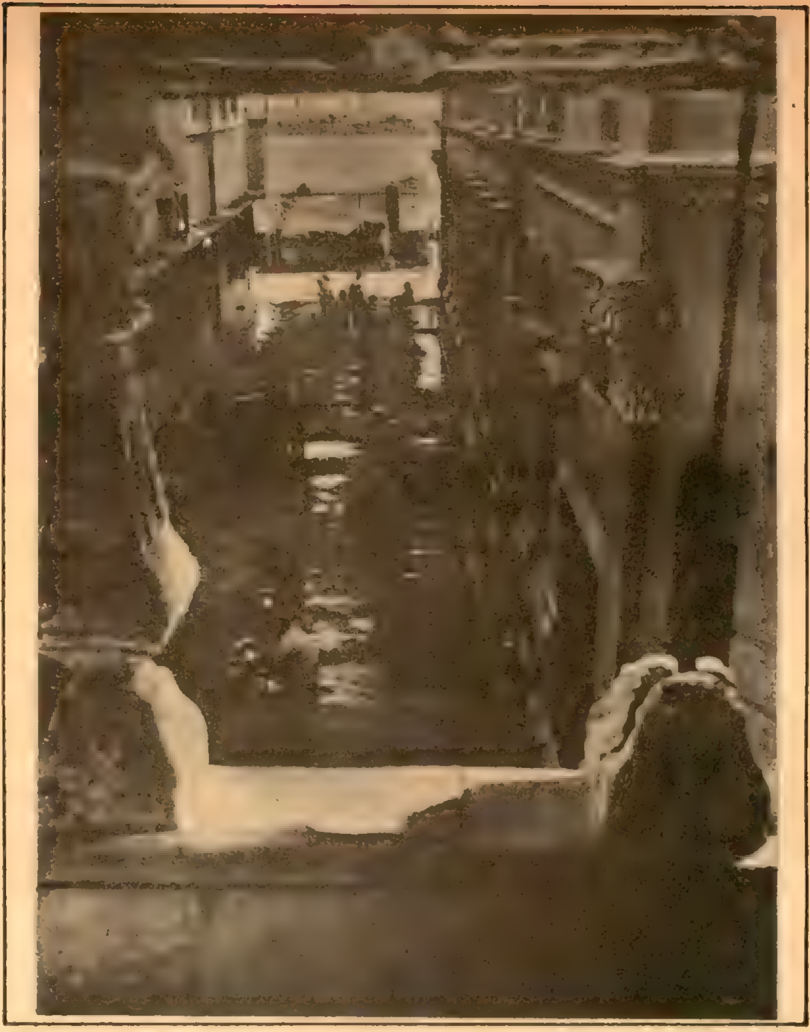

'মুক্তারামবাবুর স্ট্রীটে মেসে মুক্ত আরামে তক্তারামে শুয়ে শুক্তারাম খেয়ে জীবন কেটেছে :'

[বিশ্বনাথ চক্রবর্তী যে ঘরে থাকতেন।]

মেস। অপুকে ঠিকানা দিয়েছে দেবব্রত, তার মেসোমশাই অখিলবাবু ওই মেসের বাসিন্দা। অখিলবাবু মেসের ছাদে আসন পেতে সন্ধ্যাহ্নিক করেন।

অখিলবাবু সাদরে অপুকে গ্রহণ করলেন, কিন্তু এই মেসে, অপু দেখল, থাকা ও পড়া-শুনো দুইয়েরই অসুবিধা। এক এক ঘরের মেঝেতে তিনটি ট্রাঙ্ক, কতকগুলি জুতোর বাকস, কালি-বুরুশ, তিনটি হুঁকো (তখনো সিগারেট হুঁকোকে স্থানচ্যুত করেনি)। ঘরে আর কোন আসবাবপত্র নেই। রাত্রে সর্বদিন আলো জ্বলে না। এই এক ঘরে যে তিনজন বাবু থাকেন তারা অফিস থেকে ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে যে যার বিছানায় শুয়ে চুপ করে তামাক টানেন, একটু আধটু গল্পসল্প যা হয় তাও অফিসের গল্প। তারপর খেয়ে দেয়ে ঘুম।

এরকম ঘরে এতগুলো লোকের সঙ্গে এক বিছানায় শোয়া অপুর পক্ষে অসম্ভব। সে হাঁপিয়ে উঠল। ওর ক্লাশের কয়েকটি ছেলে একখানা ঘর ভাড়া করে থাকত, স্ব-পাকভোজন, অপুকে তারা নিতে রাজী হল। লক্ষ্য করবার বিষয়, যে তিনটি ছেলে এই মেসটি চালু করেছিল তাদের সবাইকার বাড়ি মুরশিদাবাদ। ওদের সঙ্গে থাকবার জন্য অপু অখিলবাবুদের মেস ছেড়ে এলো।

এই গল্পাংশে বিভূতিভূষণের মেস-বাসের অভিজ্ঞতার ছাপ আছে। তিনি লিখেছেন, অনেক পরে মেস ছেড়ে দিলুম এবার।... ১৯২৩ সালে কলকাতায় মীর্জাপুর স্ট্রিটের মেসে ঢুকেছিলাম—সেই থেকে ওই একই মেসে, একই অঞ্চলে কাটিয়েছি।

কল্লোল যুগের শক্তিশালী লেখক শৈলজানন্দ থাকতেন শাঁখারিপাড়া রোডের এক মেসে। সেই মেসবাড়ির এক দারুণ বর্ণনা দিয়েছেন অচিন্ত্যকুমার। জাঁদরেল রায়সাহেব দাদা-মশাইয়ের দৌহিত্র শৈলজানন্দ, তাঁর এই দীনদশা! আছে এই একটা থুথ্‌ড়ে ভাঙা মেসে! হাঁটতে চলতে মনে হয় এই বুঝি পড়ল হুঁড়মুড় করে। দোতলা বাড়ি, পুব-পশ্চিমে লম্বা, দোতলায় সুমুখের দিকে কাঠের রেলিং দেওয়া একফালি বারান্দা—প্রায় পড়ো-পড়ো। জায়গায় জায়গায় রেলিং আলগা হয়ে ঝুলে পড়েছে। উপরতলায় মেস, নিচে সাড়ে বত্রিশ ভাজার বাসিন্দে। হিন্দুস্থানী,

ধোপা, কয়লা-কাঠের ডিপো, বেগুনি ফুলুরির দোকান, চীনেবাদামওয়ালা, কুলফিবরফওয়ালার আস্তানা। সব মিলিয়ে এক বিচিত্র রাজ্য। শৈলজার মত আরো অনেকে মেসের ঘরে মেঝের উপর বিছানা মেলে বসেছে। চার-ধারে জিনিসপত্রের হাবজাগোবজা। কারু বা ঠিক শিয়রে দেয়ালে বেঁধা পেরেকে জুতো ঝোলানো। পাশবালিশের জায়গায় বাক্স-প্যাটরা। পোড়া বিড়ির জগন্নাথক্ষেত্র। দেখলেই মনে হয় কতগুলি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের অপেক্ষায় প্লাটফর্মে বসে আছে।

জেনে না জেনে কলকাতার অনেক মেস-বাড়ি নবীন সাহিত্যিকদের আশ্রয় দিয়েছে। চোরবাগানের বালক দত্ত লেনের একটি অখ্যাত মেসে থাকতেন সুবোধ ঘোষ, ওই মেসেই তাঁর প্রথম গল্পের পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়েছে। আর এক কথাকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র তেইশ বছর বয়সে এসে উঠলেন মেসে, সাকিন ৬৬ নম্বর শোভাবাজার স্ট্রিট। টিউশনি করে থাকেন। ভাইকেও এনে তুললেন ওখানে। মেসের দোতলায় একটা ঘরে পাঁচজন থাকতেন। নারায়ণ গাঙ্গুলি এম এ-তে ভর্তি হয়ে ওই মেসে এসে জোটেন। নরেন্দ্রনাথ, তস্য ভ্রাতা ধীরেন্দ্রনাথ, নারায়ণ গাঙ্গুলি, তিনজনই সাহিত্যিক, বাকি দুজন কাজ করত গেঞ্জির কলে। মাথাপিছু সীট-রেন্ট দু' টাকা। মেসে খাবার ব্যবস্থা ছিল না, ওরা তিনজন শোভাবাজারের মহামায়া হোটেলে খেতে যেতেন। সে সময় পাঁচ পয়সায় ডবল ডিমের কারি পাওয়া যেত, একজনের একবেলা খাওয়া হয়ে যেত দু' আনায়। নরেন্দ্রনাথের চাকরি বলতে তখন দুটো টিউশনি, আয় পঁচিশ টাকা। এই মেসবাড়ি থেকে নরেন মিত্তিরের প্রথম গল্প 'মৃত্যু ও জীবন' বেরিয়েছে দেশে, আনন্দবাজারে বেরিয়েছে 'সংসার'। এক ঘরে দুজনে দুধারে গল্প লিখতেন, নরেন আর নারায়ণ। নারায়ণ বিছানায় শুয়ে শুয়ে লিখতেন, আর নরেন লিখতেন বিছানার উপর একটা সুটকেশ পেতে। লিখতে লিখতে বিড়বিড় করে নিজের পাণ্ডুলিপি পড়ার অভ্যাস ছিল তাঁর। গল্পের দক্ষিণা ছিল পাঁচ টাকা। সেই টাকা এলেই লিখিয়েদের আর আনন্দের সীমা থাকত না। রূপবাণী রেসটুরেনটে খেতেন দু' আনার ফাউল কাটলেট, টকি শো হাউসে গ্যারি কুপারের ছবি দেখতেন তিন আনার সীটে। এই মেসবাড়িতেই আসত লেখকদের বন্ধুরা, সাহিত্যের আলোচনায় আসর সরগরম হয়ে উঠত, অভ্যাগতদের আপ্যায়নের জন্যে ছিল শ্যামসুন্দর কেবিনের এক পয়সা কাপ চা।

একালের নবীন লেখকরা এ স্বর্ণযুগ কল্পনা করতেও পারেন না। কল্পনা করতে পারেন না লেখক হয়ে ওঠার জন্যে এমন কৃচ্ছ্রসাধন। এখন লিখনরত লেখকদের যে ছবি বেরোয় তার জেল্লা অনেক—প্রশস্ত টেবিল, সুদৃশ্য টেবিলল্যামপ, হাতে দামী কলম। ছোট বড় সব লেখকেরই দেয়াল-জোড়া বই সাজানো লেখার ঘর আছে। মেসের বিবর্ণ দেয়ালে পিঠ দিয়ে, টিনের সুটকেশের উপর বালির কাগজ পেতে লেখার দিন গত হয়েছে।

বুদ্ধদেব বসুর 'একটি জীবন' গল্পের নায়ক গুরুদাস খুলনার গ্রাম থেকে কলকাতায় আসতেন। জগত্তারিণী স্কুলের হেড পণ্ডিত অভিধান রচনার কাজে হাত দিয়েছিলেন। কলকাতায় আসতেন বইপত্রের খোঁজে। এসে উঠতেন শিয়ালদার কাছে একটা মেসে। সীট ভাড়া মাসে সাড়ে চার টাকা। আহার সারতেন পাইস হোটেলে, সেখানে চার পয়সায় ভাত ডাল তরকারি এতটা পেতেন যে একবেলার বেশি খেতেই হত না। এমনি করে তিরিশ বছর কষ্ট করে খেটেখুটে গুরুদাস সঙ্কলন করলেন 'বৃহৎ বঙ্গীয় অভিধান।' শুনেছি এই গল্পের লিভিং মডেল ছিল। যদি তা সত্যি হয়, তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে সাহিত্যকর্মীদের অস্থায়ীভাবে আশ্রয় দিয়ে মেসবাড়িগুলি বাংলা সাহিত্যের অশেষ উপকার করেছে। হয়তো এখনো করছে। একালের কোন গুরুদাস হয়তো টিনের সুটকেশ নিয়ে মফস্বল থেকে কলকাতায় আসেন গবেষণার কাজে, এসে ওঠেন শিয়ালদার কাছাকাছি কোন সস্তা মেসে, কেউ তাকে চেনে না। আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ হলে সংবাদপত্রগুলি ঝাঁপিয়ে পড়বে, কাগজে কাগজে তার দীর্ঘ সাধনার রোমহর্ষক গল্প বেরুবে, তাতে ত্যাগ, নিষ্ঠা, তপস্যা ইত্যাদি বড় বড় কথার ছড়াছড়ি। গণ্যমান্য লোকেরা হয়ত তার গ্রামের বাড়িতে গিয়ে তাকে সম্বর্দ্ধিত করবে। সেই ভবিষ্যৎ গুরুদাস তখন বলবেন, ওরে, আমাকে একটু পাশ ফিরিয়ে দে। ওঁদের সামনে আমি না হেসে ফেলি! □

আলোকচিত্রে : দীপঙ্কর ভট্টাচার্য

বিষ্ণু দে-র 'ঘোড়সওয়ার' কি ড্রিম পোয়েম ? প্রদ্যুম্ন মিত্র

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এমন কয়েকটি কবিতা খুব উল্লেখযোগ্য যা অর্থবোধ ও নানা অনুষঙ্গে বহুবিতর্কিত কিন্তু নতুন ভাষ্যেরও অপেক্ষা রাখে। অনেকক্ষেত্রে এসব কবিতার কবিকৃত ভাষ্য পাওয়া যায় ; অনেক সময় যায় না। একেক কাব্য সমালোচক এ জাতীয় কবিতার একেক রকম ভাষ্য করেছেন। অর্থাৎ কবিতাটির মধ্যে এমন কিছু আছে যা বারবার নানা পরিপ্রেক্ষনীতে আলোচনাযোগ্য। এবং কবিতাটি নিশ্চয়ই রসোত্তীর্ণ ও বহুপঠিত।

এই বিভাগে এমনই একটি করে কবিতা মাঝে মাঝে আলোচিত হবে। বিশ্লেষিত হবে। উল্লেখিত হবে পুরনো ভাষ্য ও নতুন ভাষ্য। কবিতাটির সৌন্দর্য, কবিত্ব ও অভিনবত্ব পরতে পরতে বুঝিয়ে দেবার প্রয়াস থাকবে। দেখিয়ে দেওয়া হবে কবিতায় বিশেষ শব্দ, বাক্‌রীতি, চিত্রকল্প ও ছন্দের বিশেষ ভূমিকা এবং কবির অভিপ্রেত ব্যাপারটি। পরিণামে হয়ত গড়ে উঠবে এক সহৃদয় ও অনুকম্পায়ী পাঠক সমাজ। বাংলা কবিতা কবি-পাঠকের বহুপ্রতীক্ষিত সমবায়।

এ সংখ্যায় বিশ্লেষিত হল বিষ্ণু দে-র লেখা বহুখ্যাত কবিতা 'ঘোড়সওয়ার'। কবিতাটি প্রসঙ্গে কবিপত্নী প্রণতি দে-র পত্রাংশ : 'ওঁর খুব জ্বর ছিলো। 4 th বা 5 th Jan. 1935, rheumatic fever, সারারাত প্রায় delirium-এর মতো কেটেছে। ভোরের দিকে আমায় বললেন, 'কাগজ কলম দাও। গলার ব্যথাতে অনেক সময় কথা বলতে পারতেন না। slate-এ বা কাগজে লিখে দিতেন। হাতের কাছেই ছিলো—কবিতাটির প্রথম অংশ তক্ষুনি লেখা হয়ে গেলো, তারপর খানিকটা ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি অবাক হয়ে কবিতাটি পড়লুম—Coleridge-এর Kubla Khan-এর মতো dream-poem বলে আমার মনে হলো। ২য় ভাগটা ঘুম থেকে উঠেই শেষ করে ফেললেন।'

বিষ্ণু দে-র 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটির প্রথম প্রকাশ 'পরিচয়' পত্রিকায়, শ্রাবণ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে। 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে, ১৯৩৭ সনে পুনঃপ্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণ 'চোরাবালি'তে কোন কবিতারই সন তারিখের উল্লেখ ছিল না। দ্বিতীয় সিগনেট সংস্করণে (আষাঢ় ১৩৬৭, ১৯৬০) 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটির রচনাকাল ১৯৩৫ বলে উল্লেখিত।

আধুনিক বাংলা কবিতাকে তিন যুগের বেশি সময় ধরে লালন ও পরিচর্যার দায়িত্ব যিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, সেই বুদ্ধদেব বসুর মতে, 'ঘোড়সওয়ার একটি প্রথম শ্রেণীর কবিতা, বর্তমান যুগের বাংলাভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা।' 'চোরাবালি' প্রকাশের পর গ্রন্থটি সম্পর্কে যারা উৎসাহ, উচ্ছ্বাস কিম্বা কৌতূহল দেখিয়েছিলেন তাদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ, ধূর্জটিপ্রসাদ, বুদ্ধদেবের সঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ছিলেন। অবশ্য তাঁর অভিমত কবির পক্ষে অনুকূল হলেও ('কাব্য হিসাবে এর গুণপনা আছে') কবিতার পক্ষে খুব সুখকর ছিল না ('শ্রাব্য হিসাবে এটা আমার কাছে বহুদূর বর্জনীয়')। কবিতাটির শিল্পসৌকর্য, সংহতি, নাট্যগুণান্বিত গীতিধর্মিতা এবং অভিব্যক্তির ঋজুতা সম্পর্কে অনেকেই সপ্রশংস হয়ে ওঠেন, কিন্তু এর ভাবগৌরব বা অর্থসঙ্কেত সম্পর্কে ইঙ্গিত একমাত্র সুধীন্দ্রনাথের ভাষ্যে পাওয়া যায়। চিঠিপত্রের একাদশ খণ্ডে শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠির সূত্রে আমরা জানি সুধীন্দ্রনাথের 'নির্দেশ' সত্ত্বেও কবিতাটির অর্থ-সম্পর্কিত 'সংশয়' রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। কাব্য হিসাবে গুণবান অথচ শ্রাব্য হিসাবে বর্জনীয় এরকম অদ্ভুত স্ব-বিরোধী সিদ্ধান্তে তিনি নীতি আর নান্দনিকতার প্রশ্ন এক করে ফেলেছেন, যা ঠিক নয়।

'চোরাবালি'র ভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'চোরাবালি আর ঘোড়সওয়ার শুধু রিরংসার রূপক নয়, তাদের উপর প্রকৃতি-পুরুষ বা ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধারোপ সহজ ও শোভন।' সে-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, রিরংসা-সংক্রান্ত সংশয় নিরস্ত করতে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথ যেন খোঁচা দিয়ে পাঠকের মনে সেই ভাবটি জাগিয়ে দিয়েছেন যদিচ তিনি ঘোষণা করেছেন কবিতাটির ভাব-অবলম্বন রিরংসা নয়। এখানে বলা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ যেভাবেই সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্য গ্রহণ করুন না কেন, তিনি কিন্তু রিরংসার রূপকটি খারিজ করে দেননি। বরং মনে হয় যে কোনও উৎকৃষ্ট কবিতার বিশেষত প্রতীকী ক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক অর্থের সেই বহুতল বিস্তারের দিকেই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। য়ুং প্রমুখ পুরাণবিদদের উল্লেখ করে কবিতাটির প্রতীকী সম্ভাব্যতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি।

'জনগণের কবিতা' হিসাবেও 'ঘোড়সওয়ার'কে গ্রহণ করেছেন অনেকে এবং সেরকম গ্রহণে 'অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার'—এর প্রতীক্ষা ও আহবান অর্থের আর একটি স্তবক স্পর্শ করে। কিন্তু এহ বাহ্য। ভালো কবিতার শ্রেষ্ঠত্বের একটা দিক তার আত্মনির্ভরতা। অক্ষর আর ধ্বনির সমন্বয়েই তার অর্থের গূঢ়তা। 'ঘোড়সওয়ার'কে সেদিক থেকে বিচার করাই পাঠকের কাজ।

কবিতার প্রথম চার পঙক্তিতেই ধরা পড়েছে পুরো কবিতাটির মেজাজ ও ভাব। বিচ্ছিন্নতার বোধ এবং তার থেকে উত্তরণের আকুল প্রার্থনা কবিতার ভাবভিত্তি যা রিরংসা অথবা প্রেমের রূপকে স্থাপিত। এরই সঙ্গে আশ্লিষ্ট হয়েছে উর্বরতা কেন্দ্রিক লোকাচার, এবং সাম্যবাদী সমষ্টি চেতনায় বিশ্বাসবোধ। ব্যক্তিক বিচ্ছিন্নতার আর্তি এবং উত্তরণের আকুলতা প্রথম স্তবকের দুই অর্ধাংশে যেন শিল্পিত পরিমাপে বিধৃত। প্রথমার্ধের 'হৃদয়ে আমার চড়া' জোয়ারচঞ্চল 'জনসমুদ্রে'র বিপরীতে এক বন্ধ্যা ব্যবধানের দ্যোতক। 'চড়া' শব্দটির সূত্রে সমষ্টির থেকে ব্যষ্টির এই বিচ্ছিন্নতা দ্বিতীয়ার্ধে এনেছে 'চোরাবালি'র চিত্রকল্প যা অবচেতনের ব্যঞ্জনাবহ। বিচ্ছিন্নতাবোধে পীড়িত ব্যক্তিমানবসত্তার মগ্নচৈতন্যের থেকে উৎসারিত যেন পুরুষকারের প্রতি উদ্ধারের আহবান 'কোথায় ঘোড়সওয়ার ?'

প্রতীক হিসাবে ঘোড়া উঠে এসেছে রূপকথা এবং ইতিবৃত্তের পৃষ্ঠা থেকে। তার সঙ্গে জড়িত স্বপ্ন আর শৌর্যের মহিমা। আবার য়ুং-এর সূত্রে মনস্তাত্ত্বিক স্তরে ঘোড়া যৌনতার, পুরুষার্থের প্রতীক। ঘোড়ার তেজি চেহারা, উদ্যত ভঙ্গি, তার গতির ছন্দ আর বীর্যবান আরোহী—সবকিছু মিলিয়ে কবির চেতনায় ঘোড়া নিষ্ক্রমণ বা প্রয়াণের যথার্থ পরিবাহক। 'ঘোড়সওয়ার' তাই পরিত্রাতার যোগ্য অনুষঙ্গে আশ্রিত থেকে রিরংসা তথা প্রকৃতি-পুরুষ রূপকটিতে প্রাণ সঞ্চার করেছে। আর যৌনশক্তির প্রতীক ঘোড়া ও তার পৌরুষদীপ্ত সওয়ার কবিতার ভাবগত প্রেক্ষিত, বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা ও মিলনের আকুলতা, বহুমাত্রিক করেছে চরিতার্থ দেহ মিলনের ঈপ্সায় : 'অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার ?' গ্রামীণ সংস্কারে, উপজাতীয় বিশ্বাসে মাটির বন্ধ্যাত্বমোচন বা উর্বরতাবৃদ্ধির জন্য আজও নানা অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে। হলকর্ষণের পূর্বে ধরিত্রীপূজার রীতি এদেশে এখনও জনপ্রিয়। একখণ্ড পাথরে সিঁদুর লেপন করে অর্চনা—এ জাতীয় আচারের অঙ্গ। এই পাথরখণ্ড সেখানে রজস্বলা রমনীযোনির প্রতীক। লাঙল বা হলের ফলার আদিম চেহারা ছিল তীক্ষ্ণ ঋজু দণ্ডের, যা বর্শাফলকেরই অনুরূপ, যে সমুদ্যত বর্শা এ কবিতায় সমুত্থিত পুরুষাঙ্গের উপমান। প্রার্থিত পুরুষ ঘোড়সওয়ারের হাতে কোষমুক্ত

তরবারি না দিয়ে কবি তুলে দিয়েছেন সমুদ্যত বর্শা যা যৌন রূপকটির পরিপূরক। 'কামনায় থরো থরো তনু বায়ু', 'উঁচু বল্লম', 'হঠকারিতায় ভেঙে দাও ভীরুদ্বার'—জাতীয় শব্দ-যোজনা সারা কবিতায় রিরংসার রূপকটি অন্তঃপ্রবাহী রেখেছে। পাশাপাশি 'প্রিয়', 'প্রিয়তম মোর', 'হৃদয় আমার ধরো' এবং 'লোকনিন্দা'র মত শব্দ ও প্রসঙ্গ প্রেম-বিরহ-মিলনের শাশ্বত কাব্যবস্তুর অভিব্যক্তিপ্রবণ।

প্রথম স্তবকের বিচ্ছিন্নতার দ্বারা পীড়িত ব্যক্তিক অস্তিত্ব ও সমষ্টিজীবনের প্রাণচাঞ্চল্য ব্যবধানের মধ্য হতেই উদ্ধারের আহ্বানটিকে প্রবল ও অনিবার্য করেছে। এই মূল ভাববস্তু ব্যঞ্জনাময় হয়েছে দুই স্তরে—যৌন উর্বরতা-তান্ত্রিক লোকায়ত আচার ও নারীপুরুষের প্রেম-বাসনা-সংরক্ত অনুভবের চিত্রকল্পে। দ্বিতীয় স্তবকের 'বর্শা তোলো' এবং 'নয়নে ঘনায় বারে বারে ওঠাপড়া' সুমিত, সমান্তরাল ভঙ্গীতে এই দুটি অর্থপ্রসৃতির স্তরকে ধারণ করছে। এ স্তবকের পাঁচটির মধ্যে চারটি পঙক্তিতে প্রশ্নচিহ্নের আবর্তন ব্যক্তির দ্বিধা ও সংশয় পরিস্ফুট করে; কিন্তু উন্মোচনী চরণটির সম্বোধনের প্রকৃতি ('দীপ্ত বিশ্ব-বিজয়ী'!) ও আহ্বান ('বর্শা তোলো') আত্মনিমজ্জনের ইচ্ছার দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে। পরবর্তী স্তবকের চিত্রকল্পগুলি দ্বিধা ও সংশয়ের মানসিকতাটি যেন যাচাই করে দ্যাখে, বোঝা যায় অভিজ্ঞতা ও প্রতিবেশ উভয়তই রয়েছে ব্যষ্টি-সমষ্টির ব্যবধানের বীজ। রতি-অনভিজ্ঞা নারী ('অঙ্গে রাখি না কারোই অঙ্গীকার ?') এবং প্রতিকূল পরিপার্শ্ব ('চাঁচর বালির চড়া') অতিক্রম করে তবু প্রবল পিপাসার তীব্রতা ও আত্মনিষ্ক্রমণের অভীপ্সা, 'মৃগতৃষ্ণিকা' ও 'আত্মাহুতির' চিত্রে। এ স্তবকেও কিন্তু বিচ্ছিন্নতা অনতিক্রম্যই থেকে গেছে; চতুর্থ স্তবকে এসেই পাঠক তার 'উৎসনিবৃত্তি' ইঙ্গিত পান: 'হৃদয়ে আধির চড়া'। জনসমুদ্রের জোয়ার, সাগরের উদ্বেল জলরাশি প্রতিহত হয় এই আধির চড়ায়, মানসিক ক্লৈব্যে। উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা তবু চৈতন্যের গহ্বর থেকে হাঁক দেয়: 'ললাটে তিলক টানো'—দীপ্ত বিশ্ববিজয়ী ঘোড়সওয়ারের কাছেই স্বয়ম্বরা হতে চায় চোরাবালি, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিসত্তা। সমষ্টির চেতনার অংশভাক হয়েই তার পরিত্রাণ; তাই জনসমুদ্রের কোলাহল মন্থন করে উঠে আসে প্রার্থিত পুরুষকার'।

স্তবক থেকে স্তবকান্তরে কবিতাটি যতই অগ্রসর হয়েছে ততই রিরংসা ও প্রেমের রূপক দুটির সমান্তরাল বিস্তৃতি অবলম্বন করে জোরদার হয়েছে ব্যষ্টি-সমষ্টির দ্বান্দ্বিক মিলনের নাটক। পরিত্রাতা ঘোড়সওয়ার ক্রমশ তার যথার্থ অভিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন: 'তিনি দূরদেশাগত ও বিজয়ী, তাঁর ললাটে সূর্যতিলক, তাঁর তুরঙ্গ 'বৈতরণীর পার' অর্থাৎ পরিত্রাণ। অনুষঙ্গগুলি পরীক্ষা, ও বিশ্লেষণ দাবি করে। সূর্য প্রাণের উৎস, সূর্যতিলকধারী ঘোড়সওয়ার নিয়ে আসেন নূতন প্রাণের জয়বার্তা; বৈতরণী পুরাণ-কথিত প্রেতপুরী বেষ্টনকারী নদী যাকে অতিক্রম করে পৌঁছুতে হয় স্বর্গলোকে। বিরুদ্ধ প্রতিবেশ, চিত্তের বিকলতা, এবং মধ্যবিত্তসুলভ কামনারাই রচনা করেছে বৈতরণীর আবেষ্টন ('আমার কামনা প্রেতচ্ছায়ার বেশে') যাকে অতিক্রম করে পাওয়া যাবে 'পিতৃলোকের দ্বার'। বিশ্বজয়ী তবু অব্যবহিত পরিপার্শ্ব থেকে সুদূর সমষ্টি-চেতনার বাণীই যেন ব্যক্তির চিত্তক্লৈব্যের পরিত্রাতা 'দীপ্ত ঘোড়সওয়ার', চোরাবালিকীর্ণ মাতৃভূমি এভাবেই যেন সমষ্টিচেতনার অঙ্গীকারে মধ্যবিত্ত বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করে পৌঁছবে তার ঈপ্সিত স্বদেশে। অভ্যস্ত জীবনের গণ্ডীতে এই দীপ্র দ্বৈরথ-উন্মুখ আবির্ভাব যেন বিপর্যয় নিয়ে আসে; তাই নিঃশ্বাস যেন বইতেও ভয় মানে, তাই লোক-নিন্দার সঙ্কোচ।

কবিতার পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম স্তবকে শৃঙ্গার ও প্রতীক্ষার চিত্রগুলি বারবার এসেছে নবীন অনুষঙ্গে। বুদ্ধদেব ও ধূর্জটিপ্রসাদ—দুজন মনীষীই 'ঘোড়সওয়ার' কবিতায় যে গতিস্পন্দ, ধ্বনির অভ্রান্ত উত্থান-পতন, সংহত আবেগ ও গীতিধর্মিতা আবিষ্কার করেছেন তা বোধহয় সবচেয়ে স্পষ্ট এই মধ্যবর্তী অংশে। এখানেই রয়েছে রতিকাতর ঈপ্সা ('হঠকারিতায় ভেঙে দাও ভীরুদ্বার') অথবা উপপ্লবের আভাস ('হিমশিলাপাত ঝঞ্ঝার আশা মনে')।

'ঘোড়সওয়ার' 'জনগণের কবিতা' বা 'পিপলস পোয়েট্রি' বলে অনেকের মনে হয়েছিল। সাম্যবাদী চেতনার বীজ প্রকট-ভাবে না হয়েও অঙ্গীকারের ধ্বনি ও উদ্ধারের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় শিল্পিত হয়ে আছে এ কবিতায়। ষষ্ঠ বা সপ্তম স্তবকের 'কামনায় থরো থরো তনুবায়ু,' 'বল্লম উঁচু', 'কামনার টানে সংহত গ্লেসিয়ার' শৃঙ্গার-কামনার রূপকে সমষ্টির মধ্যে ব্যক্তির নিষ্ক্রমণ ব্যক্ত করছে। অন্য দিকে আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের রূপকে যিনি আসেন তিনি 'দূরদেশের', 'সাতসমুদ্র চৌদ্দনদীর পারে'র পরিত্রাতা রাজকুমার। কবিতার শেষ দুটি স্তবকের অভিব্যক্তি ও সংস্থান এই অনন্বয়লোপী সমষ্টি-চেতনার বিজয় প্রতিষ্ঠিত করে। জোয়ার-চঞ্চল জনসমুদ্র এবং জনহীন মেরুচূড়ার বিপরীতমুখী চিত্র ব্যক্তিক নিঃসঙ্গতার বিপরীতে সমষ্টির প্রাণচাঞ্চল্যে কবিতার চূড়ান্ত অভিপ্রায় ('হালকা হাওয়ায় কেটে গেছে কবে লোক-নিন্দার দিন') ঘোষণা করছে। স্পষ্টতই এখানে বিচ্ছিন্ন মানুষকে দ্বিধা ভয় অতিক্রম করে আহ্বান জানানো হয়েছে সমষ্টি সান্নিধানে। এরই পাশে শেষ স্তবকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে রিরংসার রূপক ঘোর কামনা ও দেহমিলনের ব্যাকুলতা। কবিতার অন্তিম আবেদন, 'অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার ?' সারা কবিতাটিতে বিকীর্ণ থেকে আবৃত্ত হতে হতে পরিত্রাণের জন্যে এক ব্যাকুল প্রার্থনায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। 'ঘোড়সওয়ার'-এর মত কবিতার ক্ষেত্রে কবির কৃতিত্ব এক দুর্লভ চমৎকারিত্বের সিদ্ধি যা নিপুণ ভাস্কর্যের মত ভেদচিহ্নহীন, অনুপুঙ্খ অথচ সামগ্রিক, সূক্ষ্ম উত্থান-পতনে নিয়ন্ত্রিত এ কবিতার ধ্বনি অখণ্ড প্রবহমান সংগীত তরঙ্গের মতই চেতনাকে ভাসিয়ে দেয় তার সম্মোহনিক ইন্দ্রজালে। □

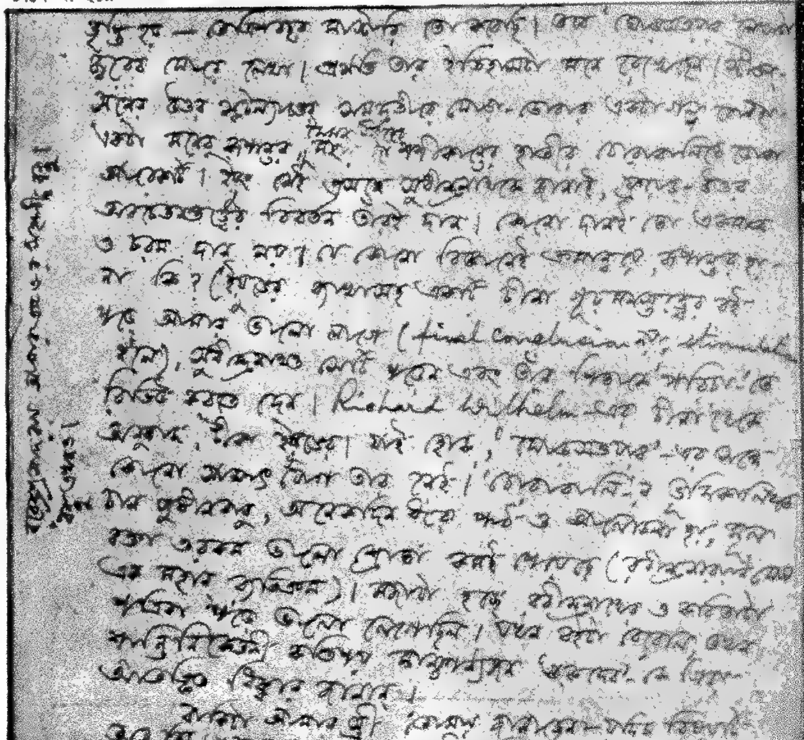

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদ

বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর মানেই হৈ-চৈ, মারামারি, ইলেকশন, চেয়ার-টেবিল ভাঙা, ছাত্র-ধর্মঘট, উপাচার্য ঘেরাও, পোসটার লড়াই এবং বিবদমান ছাত্রসংগঠন নয়। সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরেই চলছে নানা সৃজনপ্রয়াস, গবেষণা, গ্রন্থ সম্পাদনা, দেয়াল পত্রিকার নবীন স্বাক্ষর, অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীদের মৌলিক কাজকর্ম। তৈরি হচ্ছে নতুন বইয়ের পাণ্ডুলিপি। বানান সংস্কারের উদ্যম কিংবা ভ্রাম্যমান গবেষকদের ক্ষেত্র-গবেষণা চলছে। আমরা আর তার কতটুকু খবর পাই বা রাখি? এই বিভাগে নিয়মিত পাওয়া যাবে পশ্চিমবাংলার একেক বিশ্ববিদ্যালয়ের একেক বিভাগের বাস্তব ছবি ও আশাব্যঞ্জক প্রতিবেদন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই তো বঙ্গসংস্কৃতি ও সাহিত্যের সবচেয়ে সক্রিয় ওয়ারকশপ। এ মাসে দেওয়া হলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সামগ্রিক পরিচিতি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করতেন রবীন্দ্রনাথ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অন্তর্গত। মূল বিভাগে বাংলা, উর্দু আর তামিল ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন হয়ে থাকে। বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক উর্দু ও তামিল বিভাগেরও প্রধান। হিন্দি বিভাগটিও আগে এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৬২ সাল থেকে হিন্দি আলাদা বিভাগের মর্যাদা পেয়েছে।

কিন্তু কবে থেকে শুরু হয়েছে এম এ ক্লাশে বাংলা পঠন-পাঠন? কী ভাবেই বা শুরু হলো?

১৯১৯, ১ জুন থেকে বাংলা এম এ-র পঠন-পাঠন শুরু হয়। প্রথম বছরে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩২ জন, অধ্যাপক ছিলেন ৬ জন। ১৯২০-তে প্রথম বাংলা এম এ পরীক্ষা হয়। নন-কলেজিয়েট ছাত্র হিসেবেই সবাইকে পরীক্ষা দিতে হয়। পাশ করেছিলেন ১৬ জন। প্রথম শ্রেণী পেয়েছিলেন ৭ জন, দ্বিতীয় শ্রেণী ৯ জন।

এম এ ক্লাশে বাংলা পঠন-পাঠন চালু হবার ব্যাপারে যেসব তথ্য মেলে তা খুবই আকর্ষণীয়।

১৮৯১ সাল থেকেই স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ভারতীয় ভাষার পঠন-পাঠনের প্রস্তাব, সমর্থন, আলোচনা, ভাবনা-চিন্তা শুরু করেন বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন। ১৯০৪ সালে বিধিবদ্ধ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনে সর্বপ্রথম প্রবেশিকা থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত পরীক্ষার্থীদের নিজের নিজের মাতৃভাষাজ্ঞানের পরীক্ষা নেওয়ার নিয়ম শুরু হয়। ১৯১৩ থেকে দীনেশচন্দ্র সেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে বাংলায় এম এ পাঠক্রম প্রবর্তনের অনুরোধ জানাতে থাকেন। ১৯১৬ সালে উপাচার্য দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী বাংলা পঠন-পাঠনকে স্নাতকোত্তর স্তরে উন্নীত করার বিষয়ে যে ভাবনা-চিন্তা চলছে তার সংবাদ দেন। ১৯১৭ সালের ২৬ জুন ভারত সরকার স্নাতকোত্তর সাহিত্য ও বিজ্ঞান-শিক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুমোদন করেন। ১৯১৭, নতুন-শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ১৯১৯, ৩ ফেব্রুয়ারি ভারত সরকার ভারতীয় ভাষা বিভাগ সৃষ্টির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবিত বিধান অনুমোদন করেন। ১৯১৯ সালের ১০ এপ্রিলের অধিবেশনে প্রধান ভাষা বাংলা এম এ পরীক্ষার পাঠ্যক্রম অনুমোদিত হয়েছিল।

অনেক বিখ্যাত মনীষীর অধ্যাপনা, গবেষণা, পরীক্ষকরূপে সহায়তায় ও বিশেষ ভাষণে এই বিভাগ অখণ্ড বাংলাদেশে প্রধান স্থান ও নেতৃত্বের আসন লাভ করেছিল। আজও এই বিভাগ সারা দেশের বাংলা পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে আদর্শ ও সর্বোন্নতমানের।

বাংলা বিভাগের প্রাক্তন কৃতী ছাত্রের তালিকা বেশ দীর্ঘ। আমরা কয়েকজনকে স্মরণ করতে পারি ঃ প্রিয়রঞ্জন সেন, বিশ্বপতি চৌধুরী, প্রবোধচন্দ্র সেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, জনার্দন চক্রবর্তী, সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, সুরেশ চন্দ্র মজুমদার, শ্যামাপদ চক্রবর্তী, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, বিজন বিহারী ভট্টাচার্য, প্রমথনাথ বিশী, তারাপদ ভট্টাচার্য, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, জগদীশ ভট্টাচার্য, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

বাংলা বিভাগের যে কয়েকজন কৃতী অধ্যাপককে এই মুহূর্তে স্মরণ করতে পারি, তাঁরা হলেন ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগেন্দ্রনাথ বসু, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল কুমার দে, সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ডি আর ভাণ্ডারকর, আই জে এস তারাপুরওয়ালা, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, বসন্তরঞ্জন রায়, প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, মহম্মদ শহীদুল্লাহ, শশাঙ্ক মোহন সেন, আশুতোষ

বাংলা বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপকমণ্ডলীর মাঝে অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ (১৯৩২-১৯৩৪)

ভট্টাচার্য, জনার্দন চক্রবর্তী, রথীন্দ্রনাথ রায়, বিশ্বপতি চৌধুরী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন সেন, সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।

বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক

দীনেশচন্দ্র সেন	১৯১৯-১৯৩২
খগেন্দ্রনাথ মিত্র	১৯৩২-১৯৪৬
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৪৬-১৯৫৫
তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত	১৯৫৫-১৯৫৬
শশিভূষণ দাশগুপ্ত	১৯৫৬-১৯৬৪
প্রমথনাথ বিশী	১৯৬৪-১৯৬৬
বিজন বিহারী ভট্টাচার্য	১৯৬৬-১৯৭১
আশুতোষ ভট্টাচার্য	১৯৭১-১৯৭৩
অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৭৩-১৯৭৯
ক্ষুদিরাম দাস	১৯৭৯-১৯৮০
অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৮০—

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ১৯১৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত ডি লিট দেওয়া হয়। ১৯২২, রবীন্দ্রনাথ বাংলা এম এ পরীক্ষার অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯২৩ 'সাহিত্য' বিষয়ে স্পেশাল ইউনিভারসিটি রীডারশিপ বক্তৃতা দেন। ১৯৩০-'মানুষের ধর্ম' কমলা বক্তৃতা। ১৯৩২-১৯৩৪ সালে বাংলা বিভাগে বিশেষ অধ্যাপকপদে যোগদান করেন। সে সময় তাঁকে পঞ্চম ও ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের কয়েকটি ক্লাশ নিতে হতো। ১৯৩৭ সমাবর্তনে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া বাংলায় দীক্ষান্ত ভাষণ আলোড়ন তুলেছিল। এই বছরই দেন 'লীলা' বক্তৃতা এবং নির্বাচিত হন পি এইচ ডি থিসিসের পরীক্ষক পদে।

বাংলা ভাষা চর্চার জন্য বাংলা বিভাগ থেকে সারা বছর ১৬টি বক্তৃতার ব্যবস্থা আছে। এছাড়া বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ গবেষণা গ্রন্থের জন্য মেয়েদের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়ে থাকে (১) মোক্ষদা সুন্দরী স্বর্ণপদক এবং নলিনীসুন্দরী স্বর্ণপদক,

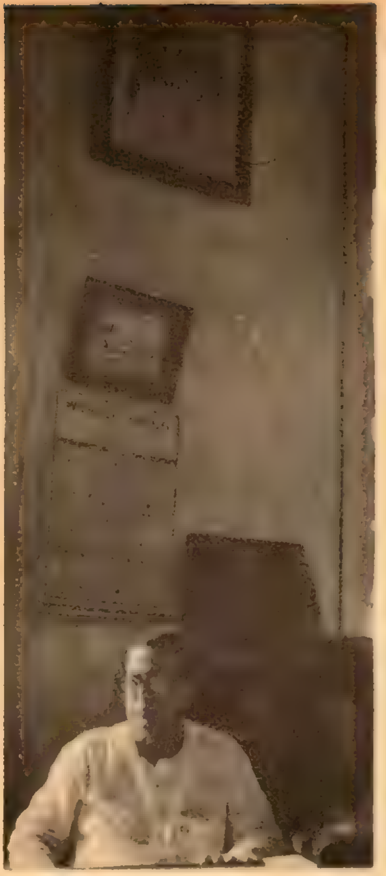

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(২) নগেন্দ্রনন্দিনী স্বর্ণপদক, (৩) ভুবন মোহিনী দাসী স্বর্ণপদক, (৪) লীলা পুরস্কার। বিশেষ কৃতিত্বের জন্য প্রতি বছর দেওয়া হয় জগত্তারিণী স্বর্ণপদক, সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক, রামতনু লাহিড়ী স্কলারশিপ, মোয়াট স্বর্ণপদক, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্বর্ণপদক, গ্রিফিথ মেমোরিয়াল পুরস্কার, জুবিলী গবেষণা পুরস্কার। শ্রেষ্ঠ নাটক রচনার জন্য দেওয়া হয় সুধাংশুবালা পুরস্কার ২০০০ টাকা।

বাংলা এম এ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের জন্য দেওয়া হয়ঃ ব্রহ্মময়ী স্বর্ণপদক, ক্ষেত্রমণি পুরস্কার, দুর্গামণিদেবী স্বর্ণপদক, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রৌপ্যপদক, রামাইচন্দ্র মিত্র পুরস্কার, যদুনাথ-মহালক্ষ্মী রৌপ্যপদক, অন্নপূর্ণাদেবী স্বর্ণপদক, চন্দ্রনাথ-শ্রীনাথ কুণ্ডু স্বর্ণপদক।

এই মুহূর্তে বাংলা বিভাগে নানা বিষয়ে বহু উল্লেখযোগ্য গবেষণা চলছে। ১৯৮১ সালেই ৯৬ জন গবেষক তালিকাভুক্ত হয়েছেন। কয়েকটি প্রস্তুয়মান গবেষণার শিরোনামঃ

বাংলা মঙ্গলকাব্যে সমাজচেতনা, বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ এবং সবুজপত্রের লেখক গোষ্ঠী, গ্রামীণ অর্থনীতিক পটভূমিকায় বিভূতি-সাহিত্যের নর ও নারী, বাংলাদেশের লোক কাহিনীঃ রূপ ও রীতি, বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্রঃ পারস্পরিক প্রভাব, পরিচয় পত্রিকার আদিপর্ব ও বাংলা সাহিত্য, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কৃষি ও কৃষক, বাংলা নাটকে প্লটের বিবর্তন, বাংলা গ্রন্থ ও পত্রিকার বিষয়-বিন্যাসের স্বরূপ ১৮০০-১৮৬৭, ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারত চর্চায় বাঙালী, বাংলা সাহিত্যে কল্লোল ও ত্রৈমাসিক পরিচয় পত্রিকার দান—এই রকম নানা বিষয়।

প্রতি বছরই ১৫ থেকে ২০ জন গবেষণার কাজ শেষ করছেন। সফল হচ্ছেন ৭ থেকে ১০ জন। মাঝপথেও কেউ কেউ ছেড়ে দিচ্ছেন।

প্রশ্ন হলো, এখন যেসব ছাত্রছাত্রী বাংলা পড়েন তাঁরা কি শুধু বই মুখে নিয়ে বসে থাকেন? তা নয়, তাঁরাও সৃষ্টিশীল কাজ করে চলেছেন পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে।

এম এ প্রথম বর্ষের ছাত্র যোগেশরঞ্জন মিস্ত্রী রীতিমতো নাট্যামোদী। গোসাবায় তাঁর 'রক্তঝরা একাত্তর', 'লীডার', 'রঙমহল', 'বদলা চাই', 'বিনয়-বাদল-দীনেশ' নাটকগুলি পর পর অভিনীত হয়েছে ও হচ্ছে।

দেবীরানী রায় (১ম বর্ষ) সত্যযুগ পত্রিকার একজন নিয়মিত গ্রন্থ-সমালোচক, গল্প-কবিতা-প্রবন্ধও লেখেন। পর্ণশ্রী, অনির্বাণ, ধূসর-পাণ্ডুলিপি পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত।

জীবনানন্দের কন্যা মঞ্জুশ্রী দাশ এবার প্রাইভেটে বাংলায় এম এ দেবেন। তিনিও

গবেষণা বৃত্তি ও গবেষক সংবাদ

বৃত্তির নাম	প্রাপক	বৃত্তির অর্থমূল্য	গবেষণা বিষয়	বৃত্তির স্থায়িত্বকাল
ইউনিভারসিটি স্কলারশিপ	প্রভাস সামন্ত	মাসিক ৪০০ টাকা	মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের ভনিতায় কবি মনোভাব ও সমাজ পরিচয়।	৩ বছর
ইউনিভারসিটি স্কলারশিপ	তরুণ মুখোপাধ্যায়	মাসিক ৪০০ টাকা	বাংলা কাব্যনাট্যে রূপ ও রীতি	৩ বছর
রামতনু লাহিড়ী স্কলারশিপ	মানসী সিংহ	মাসিক ২০০ টাকা	চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের বাংলা নাটকে সমাজ এবং অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন।	৩ বছর
রামতনু লাহিড়ী স্কলারশিপ	শঙ্কু রায়	মাসিক ২০০ টাকা	ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতির পুনর্মূল্যায়ন	৩ বছর
রামতনু লাহিড়ী স্কলারশিপ	সুব্রতা নন্দী	মাসিক ২০০ টাকা	রামমোহন থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহ পর্যন্ত বাংলা গদ্যরীতির বিচার	৩ বছর
ইউ জি সি স্কলারশিপ	স্বপ্না ঘোষ	মাসিক ৪০০ টাকা	দুই বিশ্বযুদ্ধ তিন কবি--এলিঅট-রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ	৩ বছর

কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী লিখে থাকেন। তাঁর জারমান ভ্রমণ দিললি বেতারে প্রচারিত।

সৈয়দ আব্দুল ওদুদ কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ফিচার লিখছেন। বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পর্যটকের চোখে দক্ষিণেশ্বর—এরই মধ্যে প্রকাশিত।

তবে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীই সম্ভবত তেমন কিছু লেখেন না। লিখলেও খুব গোপনে লেখেন।

বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করেন দেয়াল পত্রিকা। এখন দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের 'সুচেতনা' এবং প্রথম বর্ষের 'অর্কপ্রভ' ও 'প্রত্যয়' বেশ সাড়া জাগিয়েছে। সেখানে প্রকাশিত হচ্ছে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ। বিষয়গুলো কী ? 'পথের পাঁচালীর দুর্গা-উৎস ও মৃত্যু'—শংকর রঞ্জন মজুমদার, 'শীত—অন্যমনস্ক চিন্তা-ভাবনা'—সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, আঁকা ও লেখায় আছেন মলয় ঘোষ, গল্প লিখেছেন শিপ্রা দে, কবিতা রচনা করেছেন—দীপক চৌধুরী, শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, সমর দাস। এ সবই দ্বিতীয় বর্ষের।

প্রথম বর্ষে 'অমর প্রেমচন্দ একটি সাহিত্যিক মূল্যায়ন' লিখেছেন সাহানা বিশ্বাস। কবিতা—অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলকৃষ্ণ ঠাকুর, জগৎ পাল।

ম্যানাসক্রিপ্ট লাইব্রেরিতে—লাইব্রেরিয়ান-১। সরটার-১। টাইপিসট (বাংলা)—১। বই ১০,৭০০। প্রতিদিন ২০০ থেকে ২৫০ বই লেনদেন হয়। রিডিং টেবিল আছে। সেখানে ১৫/২০ জন ছাত্রছাত্রী একসঙ্গে বসে পড়াশুনা করতে পারে।

১৯১৯, ভারতীয় ভাষা বিভাগ সৃষ্টি হওয়ার সময় থেকেই পুঁথি সংগ্রহেরও কাজ শুরু হয়। এই পুঁথির সংখ্যা এখন আট হাজারেরও বেশি। এখনও কোনো উল্লেখ-যোগ্য পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেলে তা কেনা হয়। এখন পুঁথিশালা দেখাশনা করেন ডঃ তুষারকান্তি মহাপাত্র।

পুঁথি সংরক্ষণের জন্য অত্যাধুনিক ব্যবস্থায় মাইক্রোফিলম করে পুঁথি সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা এখনও হয়নি। ল্যামিনেশন বা ডি-অ্যাসিডিফিকেশন-এর কোনো ব্যবস্থাও এখনও হয়নি। তিরিশ-খানিরও বেশি পুঁথি এ পর্যন্ত সম্পাদিত-প্রকাশিত।

পুঁথি বিভাগে পুঁথি কপি করার জন্য বাংলা এম এ ১ম বর্ষ থেকে ৩ জন, ২য় বর্ষ থেকে ৩ জন—মোট ৬ জন পুঁথি নকলনবিশ থাকার কথা। এবার এখনও পর্যন্ত ২য় বর্ষ থেকে ৩ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রতি মাসে প্রতিজন তিরিশ টাকা করে বৃত্তি পেয়ে থাকেন।

বাংলার অধ্যাপকরাও তাঁদের গবেষণার কাজে সতত সক্রিয়। যেমন ঃ বিভাগীয় প্রধান শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পুরাতন বাংলা গদ্য সংকলন, পুরাতন বাংলা নাটক সংকলন, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য চিন্তা বিষয়ক আলোচনা গ্রন্থ রচনার মধ্যেও তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ৫ম খণ্ড শেষ করার কাজে অতিব্যস্ত।

বিশিষ্ট কবি ও রবীন্দ্র অধ্যাপক ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র বাংলায় মধ্যযুগের কাব্যভাষা এবং আধুনিক যুগের কাব্যভাষা বিষয়ক এক তুলনামূলক বই লেখায় নিযুক্ত।

অকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত বিশিষ্ট বিবেকা-নন্দ-নিবেদিতা গবেষক অধ্যাপক শংকরীপ্রসাদ বসু নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র বিষয়ক একটি দীর্ঘ ভূমিকা রচনা, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ ৫ম খণ্ড এবং নিবেদিতার এক হাজারেরও বেশি চিঠির সংকলনগ্রন্থ সম্পাদনা রচনার কাজে বহুব্যস্ত।

বিশিষ্ট রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গবেষক ডঃ প্রণব রঞ্জন ঘোষ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের মননভূমির নানাদিক,রামকৃষ্ণ ও বাংলা সাহিত্য ২য় পর্যায়, উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় রবীন্দ্র-মানস বিষয়ে বই লেখায় সদা নিয়োজিত। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য সম্মেলন সংগঠনও তাঁর গবেষণারই অন্যতম দিক।

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ডঃ উজ্জ্বল কুমার মজুমদার লিখছেন সাহিত্যের রূপ-রীতি, ছোট গল্পের রূপ-রীতি, সাম্প্রতিক গল্পকারদের নিয়ে একটি আলোচনার বই, রবীন্দ্রনাথের পড়াশুনা—এই বিষয়ে একটি বই।

স্বনামধন্য লোক-সাহিত্য গবেষক ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক রবীন্দ্র সংগীতের রূপতত্ত্ব, বাংলা ধাঁধায় গঠনরীতি বিষয়ে দুটি বই লিখে চলেছেন।

ডঃ দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটক এবং সমালোচক মোহিতলাল বিষয়ক বই দুটি যুগপৎ লিখে চলেছেন।

এছাড়াও অন্যান্য অধ্যাপকরাও কিছু না কিছু রচনার কাজে ব্যস্ত আছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে পাঠ নিয়েছেন এমন কয়েকজন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিদেশী পণ্ডিত হলেন ঃ চেকোশ্লোভাকিয়ার দুসান জ্বাভিতেল, মস্কোর ভেরানভিকোভা, শিকাগোর এডোয়ার্ড ডিমক।

বাংলা প্রকাশনা সমিতির উদ্যোগে যে গ্রন্থগুলির প্রকাশ আসন্ন ঃ (১) নবাবিষ্কৃত চর্যাপদ—শশিভূষণ দাশগুপ্ত ঃ সম্পাদনা—অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। (২) পদামৃত

পুঁথিশালা ও পাঠাগার

বাংলা বিভাগের অধ্যাপক-সভা

সমুদ্র—রাধামোহন ঠাকুর ঃ সম্পাদনা—উমা রায়, (৩) বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা ঃ সম্পাদনা—যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য, (৪) নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরণ ঃ সম্পাদনা—সাধনা মজুমদার।

১৯৬৭ সাল থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে বাংলা বিভাগের গবেষণামূলক সাহিত্য পত্রিকা 'বাংলা সাহিত্য পত্রিকা।'

গবেষণা পরিষদ

১৯৭৩ সাল থেকে গবেষণা পরিষদ আঞ্চলিক অভিধান প্রস্তুতির গবেষণায় ব্যস্ত আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাড়ে চার লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছে। যাঁরা এর সঙ্গে যুক্ত ঃ পরিচালক ঃ ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সহঃ পরিচালক ঃ ডঃ তুষারকান্তি মহাপাত্র। সংযুক্ত পরিচালক ঃ ডঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, ডঃ বেলা দত্তগুপ্ত। সম্পাদক ঃ ডঃ রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য, সিনিয়র রিসারচ ফেলো। সুমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, সিনিয়র রিসারচ ফেলো। জুনিয়র রিসারচ ফেলো—বিপ্লব চক্রবর্তী, কেশব আড়্‌, মায়াদীপা চক্রবর্তী। ফিলড ইনভেসটিগেটর—জয়ন্ত ঘোষাল, সুপ্রিয়া সেন, সুজাতা রায়, নীলিমা চট্টোপাধ্যায়, বাসুদেব মোশেল, রঞ্জিত বাগ। বৃত্তির পরিমাণ—সিনিয়র রিসারচ ফেলো ৫০০ টাকা। জুনিয়র রিসারচ ফেলো ৪০০ টাকা। ফিলড ইনভেসটিগেটর ৩০০ টাকা।

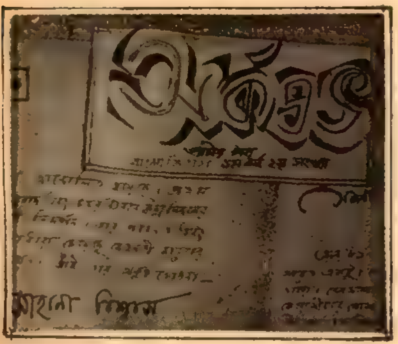

দেয়াল পত্রিকা 'অর্কপ্রভ'

বাংলা বানান সংস্কার

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ থেকে 'বাংলা বানানের নিয়ম' চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশনের উদ্যোগ চলছে। এ বিষয়ে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি ১৫টি প্রস্তাব দেশের বিজ্ঞজনদের কাছে পাঠিয়েছে। প্রস্তাবগুলির উপর মতামত পাওয়ার পর একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গ্রহণযোগ্য প্রস্তাবগুলিকেই নিয়মে পরিণত করবে।

তাপসকুমার ভট্টাচার্য

[স্বীকৃতি ঃ সুকুমার মিত্র, সুশান্ত মণ্ডল, মধুসূদন ভট্টাচার্য]

আলোকচিত্র : দীপক ভট্টাচার্য

বইপাড়ার খবর

নতুন নতুন বই-এর সন্ধানে একদল উৎসুক পাঠক প্রতিদিন বইয়ের বাজারে ঘুরঘুর করেন। কী বই বেরুল। দোকানের পর দোকান ঘুরে সোকেসে বই দেখেন। তার থেকে দু-একটা চুজ করেন।

তবুও চোখ বিশ্বাসঘাতকতা করে। কেমন করে যেন ফসকে যায়—দেখতে ভুল হয়ে যায়। এত রংবেরং-এর প্রচ্ছদপটের মধ্যে অনেক ভাল বই যেন মুখ লুকিয়ে থাকে অবগুণ্ঠন টেনে দেয়।

সেদিন কথা হচ্ছিল নাথ ব্রাদার্সের একজন মালিকের সঙ্গে। যেখানে প্রতিদিন শয়ে শয়ে পাইকারী আর খুচরো ক্রেতারা আসেন। তাঁরা বিক্রেতাও এবং প্রকাশকও। সম্প্রতি তাঁরা বের করেছেন 'দ্যানিকেন তত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গ দেবতা'। লিখেছেন বীরেন মিত্র। বের করেছেন নারায়ণ সান্যালের 'আবার যদি ইচ্ছা কর'—পল গগ্যা এবং ভ্যান গগের জীবনের অনেক জানা-অজানা কাহিনী নিয়ে লেখা উপন্যাস। এছাড়াও তাঁদের প্রকাশনা থেকে বের হয়েছে শম্ভুনাথ ঘোষের 'প্রশ্নোত্তরে নজরুল গীতি' এবং 'সঙ্গীতের ইতিবৃত্ত'।

প্রকাশনা জগতে দে'জ অল্প দিন হল প্রবেশ করেও অনেক স্থায়ী সম্পদ রেখে চলেছেন। উপন্যাস, গল্প, কবিতাগ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অনেক রেফারেন্স প্রবন্ধের বইও প্রকাশ করছেন। অপ্রাপ্য দুর্লভ অনেক গ্রন্থ তাঁরা আবার প্রকাশ করছেন। সম্প্রতি তাঁরা প্রকাশ করেছেন শ্রীকৃষ্ণের যৌবন, অন্তিমলীলা এবং লীলা স্থান নিয়ে এক মনোরম গ্রন্থ। 'দ্বারকা ও প্রভাসে'। লেখক শঙ্কু মহারাজ। ভ্রমণ কাহিনী যাঁরা ভালোবাসেন শঙ্কু মহারাজ তাঁদের কাছে খুবই একটি পরিচিত নাম। নবপত্র সম্প্রতি কিশোর পাঠকদের উপহার দিয়েছেন নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'টুকটুকে রামায়ণ'। গ্রন্থটি বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে একশ বছর আগে ছোটদের মতো করে লেখা হয়েছিল। বৈচিত্রতার সারিতে আছেন আরো অনেকে—'পাত্রজ' 'সাহিত্য মন্দির' 'মডেল' 'হরফ প্রকাশনী' 'মৌসুমী' 'পত্রপুট' 'অভ্যুদয়' 'শৈব্যা' 'করুণা'। করুণায় সাম্প্রতিক সংযোজন হচ্ছে শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং মুকুল গুহ অনূদিত 'কহলীল জিব্রানের শ্রেষ্ঠ কবিতা'। শৈব্যা অল্প বয়স্কদের হাতে উপহার তুলে দিয়েছেন যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া'। পাঁচশ ছড়ার

এক অমূল্য সংকলন। যে ছড়াগুলো শিশুমনকে আনন্দে উদ্ভাসিত করে তুলবে। রত্নার প্রকাশিত আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে অমলেন্দু দে-র 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী'। প্রকাশকের মতে গবেষণামূলক গ্রন্থের বাজার নেহাৎ খারাপ নয়। বরং দিন দিন বাড়ছে। চাহিদার মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে। প্রকাশনা জগতে আরো কয়েকটি উল্লখযোগ্য সংস্থার নাম হচ্ছে সুবর্ণরেখা, ধ্রুপদী, কথাশিল্প। প্রকাশনা এবং পরিবেশনের ক্ষেত্রে তাঁরা খুব ছিমছাম। এঁরা সাধারণত সিরিয়াস বই প্রকাশ করেন। বুদ্ধিদীপ্ত পাঠকদের কাছে তাঁদের প্রকাশিত বইগুলো খুবই পরিচিত। ধ্রুপদীর সাম্প্রতিক প্রকাশনা 'দাঙ্গা-বিরোধী গল্প', এঙ্গেলস এর 'অ্যানটি ডুরিং'-এর অনুবাদ। কথাশিল্প প্রকাশ করেছেন 'দেশ পরিচয় গ্রন্থমালা' সিরিজ। এই সিরিজের দুটি পুস্তিকা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। পুস্তিকা দুটি হচ্ছে 'পশ্চিমবঙ্গের খেতমজুর' এবং 'পশ্চিমবঙ্গের বর্গাদার'। দুটি পুস্তিকারই লেখক প্রখ্যাত চিন্তাবিদ অশোক রুদ্র। সুবর্ণরেখা থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে প্রমোদ সেনগুপ্তের 'ভারতীয় মহাবিদ্রোহ',—একদিন প্রগতিশীল পাঠকমহলে এই বই দারুণ সাড়া জাগিয়ে বিতর্কিত হয়ে উঠেছিল। বইটি প্রথম প্রকাশ হয় সিপাই বিদ্রোহের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৫৭ সালে। তারপর দীর্ঘদিন বইটি অপ্রাপ্য থাকে। অনেক তরুণ পাঠকই এই বই-এর নাম জানেন, কিন্তু চোখে দেখেননি। এই বইটির যিনি লেখক সেই প্রমোদ সেনগুপ্তও একজন ইতিহাসখ্যাত পুরুষ। বার্লিনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গী ছিলেন। বার্লিন থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে যে প্রচার অভিযান চালানো হত তিনি ছিলেন তাঁর অন্যতম।

কমলেশ সেন

পুরোনো বই : নতুন পাঠক

দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের লেখা 'ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত' ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত হয়। আর কোনো সংস্করণ হয়নি। কেন কে জানে! এই অসামান্য বইয়ের আদর্শ যে-মূল পুঁথি সেটি এদেশেই নেই, আছে বারলিনের জাতীয় গ্রন্থাগারে। সেই পুঁথির ইংরাজি অনুবাদ করেন জর্মান পণ্ডিত ডবলিউ পারশ। সেটি ছাপেন জর্মানীর প্রকাশন প্রতিষ্ঠান ফারড-ডামলার। 'ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত' বাংলা বইটি এই দুয়ের সহায়তাপুষ্ট অথচ কার্তিকেয়চন্দ্রের অসামান্য মৌলিক রচনা।

'রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে লোকেরা নেমকহারাম কহিত'

দ্বিজেন্দ্রলালের বাবা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় (১৮২০-৮৫) উনিশ শতকের একজন স্বনামধন্য উজ্জল পুরুষ। বহু ভাষাবিদ ও বিদ্বান কার্তিকেয় সুকণ্ঠ গায়ক ও সঙ্গীত-সাধকরূপে সে যুগে খ্যাত ছিলেন। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র ও সে যুগের বহু জ্ঞানীগুণীর সঙ্গে কার্তিকেয়র সখ্য ছিল। তাঁর পূর্ব ও উত্তর পুরুষদের অনেকেই ছিলেন কৃষ্ণনগরে নদীয়ারাজের দেওয়ান। নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০-১৭৮২)-এর অধস্তন পঞ্চম পুরুষ (দত্তক) মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায়ের (রাজত্বকাল ১৮৪১-৫৭) আমলে কার্তিকেয়চন্দ্র নদীয়ারাজের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। কার্তিকেয় পরবর্তী মহারাজ সতীশচন্দ্র রায়ের (১৮৫৭-১৮৭০) আমলেও দেওয়ান পদে নিযুক্ত থেকে তাঁর পোষ্যপুত্র মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র রায়ের আমলে (১৮৭১-১৯১১) অবসর গ্রহণ করেন। দেওয়ানি পদে রাজকার্য পরিচালনার অসামান্য কর্মদক্ষতায় কার্তিকেয় নদীয়া রাজবংশের অকৃত্রিম হিতাকাঙ্ক্ষী ও কর্ণধার হয়ে ওঠেন। বাংলায় নবজাগরণের অন্যতম রূপকার রামতনু লাহিড়ী ছিলেন কার্তিকেয়র পিসতুতো ভাই। বাংলার প্রথম যুগের খেয়াল গায়কদের অন্যতম ছিলেন কার্তিকেয়। তাঁর লেখা সঙ্গীত সংকলন 'গীতমঞ্জরী'। ১৯৩২ সম্বৎ (১৮৭৫ সাল)-এ প্রকাশিত হয় কার্তিকেয়র সুবিখ্যাত বই : 'ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিত' অর্থাৎ 'নবদ্বীপের রাজবংশের বিবরণ'। প্রকাশক ছিলেন বালীর হরিমোহন মুখোপাধ্যায় (নদীয়ারাজ সতীশচন্দ্রের দ্বিতীয়া মহিষী ভুবনেশ্বরী দেবীর পিতা)। কলকাতার গোয়াবাগানের 'নতুন সংস্কৃত যন্ত্রে' বইটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা আট আনা। পৃষ্ঠা সংখ্যা— ৬+২৩৪। নামপত্র, ভূমিকা ও পরিশিষ্ট বাদে ২৫টি অধ্যায়ে বইটি সম্পূর্ণ। কোনো আলোক বা রেখাচিত্র নেই। কত ছাপা হয়েছিল—উল্লেখ নেই।

'সেকালের কার্তিকেয়চন্দ্র

বাঙালীর লেখা প্রথম 'ইতিহাসের বিষয় 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' এবং দ্বিতীয় 'নদীয়া রাজবংশ'। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' শ্রীরামপুর মিশনারীদের প্রেসে ১৮০৫ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। কার্তিকেয়র বইতে রাজীবলোচনের বইয়ের কোনো উল্লেখ নেই এবং কার্তিকেয় এই বইয়ের উপর নির্ভরও করেননি।

নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ১৬৭৪ শকে (১৭৫২-৫৩) 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য কৃষ্ণনগরে রচনা করেন, এই কাব্যে নদীয়া রাজবংশের ইতিহাসও পাওয়া যায়। কার্তিকেয় তাঁর বইতে 'অন্নদামঙ্গল' থেকে কোনো তথ্য নিয়েছেন বলে ভূমিকায় উল্লেখ করেননি, তবে 'অন্নদামঙ্গল' থেকে উদ্ধৃতি আছে। রেভারেণ্ড জেমস লঙের 'দি নদীয়া রাজ' প্রবন্ধটি 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকার জুলাই ১৮৭২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কার্তিকেয় তাঁর বইতে এই প্রবন্ধেরও উল্লেখ করেননি, তবে কয়েকবার হানটার সাহেবের বইয়ের উল্লেখ করেছেন।

'ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত' সংস্কৃত, ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় লেখা কিন্তু তিনটি বই এক নয়। আদিশূর আনীত কান্যকুব্জীয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভট্টনারায়ণের বাংলায় উপনিবেশ স্থাপনের আমল থেকে নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ১৭২৮ সালে রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত নদীয়ারাজবংশের ইতিহাস হলো সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিতং।' রচয়িতার নাম পুঁথিতে নেই। সম্ভবত, নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অভিষেকের সময় পুঁথিটি একজন অনুগ্রহভাজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত রচনা করেন। সাধারণত পুঁথির শেষে পুঁথিকারের নাম-ধাম ও প্রচ্ছন্নভাবে শকাব্দে রচনাকালের উল্লেখ থাকে। কিন্তু এই পুঁথিতে এসব কিছুই নেই। পুঁথিটি নদীয়া রাজবাড়িতেও নেই, আছে বারলিনের জাতীয় গ্রন্থাগারে ১৮৫২ সালে সংস্কৃত 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতং'-এর ইংরেজি অনুবাদ (টীকা ও ভূমিকা সহ) বারলিনের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ফারড-ডামলার প্রকাশ করেন এবং অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন সংস্কৃতজ্ঞ জর্মান পণ্ডিত ডবলিউ পারশ। কার্তিকেয়র বইটি কিন্তু সংস্কৃত বা ইংরেজি 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতং'-এর বাংলা অনুবাদ নয়, সম্পূর্ণ নতুন বই। কার্তিকেয়র বইয়ের নামপত্রে উল্লিখিত আছে : 'মহারাজেন্দ্র বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ রাজা ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণের বাঙলায় আধিপত্য স্থাপনাবধি বর্তমান ক্ষিতীশচন্দ্রের সময় পর্যন্ত এই রাজবংশের ইতিহাস এবং নবদ্বীপ প্রদেশের পূর্বতন ও অধুনাতন অবস্থা।' তথ্যগত বিচারে সংস্কৃত ও ইংরেজি 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতং'-এর সঙ্গে কার্তিকেয়র বইয়ের অভিন্নতা বর্তমান। কার্তিকেয় নিজেই লিখেছেন : '...উক্ত ক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিত মাত্র অবলম্বন করি নাই। যে স্থানে রাজবাটির কাগজের সহিত উক্ত ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিতের অনৈক্য দেখিয়াছি, সে স্থানে ঐ কাগজকেই অগ্রগণ্য করিয়াছি, সুতরাং কোনো কোনো স্থানে উক্ত গ্রন্থের সহিত আমার বর্ণনীয় বিষয়ের অনৈক্য হইয়াছে।'

বস্তুত, কার্তিকেয়র বইটি শুধুমাত্র একটি রাজবংশের তথাকথিত ইতিহাস নয়, সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জন-ইতিহাসে সমৃদ্ধ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কার্তিকেয়র বই একজন স্তাবকের লেখা নয়, স্তাবকের স্তুতিমূলক রচনাও নয়। কার্তিকেয় যেমন নদীয়া-রাজদের কার্যদক্ষতা, বিদ্যানুরাগ ও সংস্কৃতি-পোষকতা সহ নানা গুণের সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন, তেমনি আবার কঠোরভাবে তাঁদের দোষেরও সমালোচনা করেছেন, তুলে ধরেছেন তাঁদের ব্যর্থতা ও অদূরদর্শিতার সজীব চিত্র। কার্তিকেয় লিখেছেন যে নদীয়ারাজদের অনেকে বলপূর্বক জমিদারি অধিকার ও প্রসার করেছেন, কর সংগ্রহে নায়েব গোমস্তা প্রভৃতি রাজকর্মচারীদের শৈথিল্য হলে কঠোর শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকায় তাঁরা নির্মমভাবে কর আদায় করতেন ও ছিয়াত্তরের (১১৭৬) মন্বন্তরের পরে খাজনা মকুব করা হয়নি। তিনি নদীয়ারাজ ঈশ্বরচন্দ্রকে 'অতিশয় দুঃশীল, নির্দয় ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ মদ্যপ' বলে উল্লেখ করেছেন এবং অমিতব্যয়ী ঈশ্বরচন্দ্র কী ভাবে আমোদ-প্রমোদে কাল কাটাতেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। কার্তিকেয় জানিয়েছেন যে নদীয়ারাজ রামচন্দ্রের বিদ্যানুশীলন ও বিষয়কর্মে বিন্দুমাত্র অনুরাগ ছিল না, নদীয়ারাজ রামগোপাল ছিলেন বিদ্যাবুদ্ধিহীন, দীর্ঘসূত্রী ও 'ধূমপান পরতন্ত্রী'। তিনি নদীয়ারাজ সতীশচন্দ্রের অমিতব্যয়িতা, কুসংসর্গ ও সুরাপানের কথা লিখেছেন। কার্তিকেয় নদীয়ারাজ গিরিশচন্দ্রের নির্বুদ্ধিতার দুটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন যার ফলে জমিদারির বিপুল অংশ নিলামে উঠে বেহাত হয় ও রাজকোষ থেকে তিন লক্ষাধিক টাকা মূল্যের মণিমুক্তা স্বর্ণালংকার অপহৃত হয়। তিনি নির্ভীকভাবে সৎসাহসে মহারাজ গিরিশচন্দ্রের 'এক নীচ জাতীয়া দুষ্ট প্রকৃতি রমনীর প্রতি অতিশয়' আসক্তি ও তার 'মনোরঞ্জনে নিরতিশয় ব্যগ্রতা'র তথ্য প্রকাশ করেছেন। আবার, নদীয়া রাজবংশের ঐশ্বর্য ও আধিপত্যের চেয়ে বিদ্যানুরাগ, সংস্কৃতি পোষকতা ও বদান্যতা বিষয়ে, কার্তিকেয় নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে তথ্য সহযোগে লিপিবদ্ধ করেছেন।

এই বইয়ে নদীয়া রাজদের লেখা সংস্কৃত কবিতা, নদীয়ার বিভিন্ন রাজার করা বিচারের মীমাংসাপত্র, ফারসী ফরমানের (রাজসনন্দ) বাংলা অনুবাদ, তায়দাদ, দলিল, অর্পণনামা, দানপত্র ও উত্তরাধিকারপত্র সংযোজন করেছেন। এগুলি সেকালের জন-ইতিহাসের অমূল্য উপকরণ। কার্তিকেয়র ভাষা সাবলীল, স্বচ্ছন্দ ও আকর্ষণীয়। তথ্যও সাজিয়েছেন কালানুক্রমিক ভাবে।

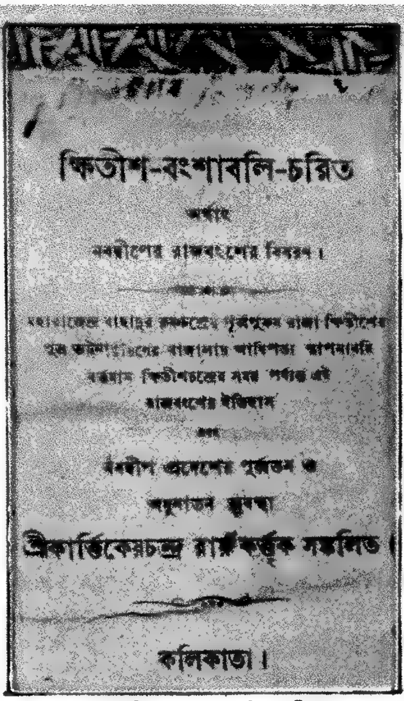
ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত
অর্থাৎ
নবদ্বীপের রাজবংশের বিবরণ।
শ্রীকার্তিকেয়চন্দ্র রায় কর্তৃক সঙ্কলিত।
কলিকাতা।

বাংলা 'ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত' বইয়ের নামপত্র

প্রশ্ন জাগতে পারে: ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিতের ক্ষিতীশ কে? যেহেতু নদীয়ারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র রায়ের সময়ে এই বই প্রকাশিত হয় সেহেতু অনেকেই ভাবেন ক্ষিতীশ আসলে রাজা ক্ষিতীশচন্দ্র। কিন্তু তা নয়। ১৫৭৭ খ্রীস্টাব্দে বাংলার রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ থেকে যে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নিয়ে আসেন, ভট্টনারায়ণ তাঁদের অন্যতম। এই ভট্টনারায়ণ ছিলেন কান্যকুব্জের জনৈক রাজা ক্ষিতীশের পুত্র। এই বংশধারার ২০তম পুরুষ (কুলজী অনুসারে) হলেন নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদার এবং ১৬৫৬ সালে মোগল সম্রাটের ফরমানে তিনি নদীয়ারাজ হন। তাই, 'ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিত' বলতে কান্যকুব্জের রাজা ক্ষিতীশকেই বলা হয়েছে।

বইটি রচনা ও প্রকাশের ব্যাপারেও একটি চমকপ্রদ তথ্য আছে। নদীয়া রাজবংশের সঙ্গে কার্তিকেয়র দেওয়ানি ও সখ্যসূত্রে যোগাযোগ পুরুষানুক্রমিক। কার্তিকেয় নিজেও চব্বিশ বছর দেওয়ানি ও দশ বছর অন্যান্য কাজে (গৃহ শিক্ষকতা সহ) রাজপরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে রাজ পরিবারের সঙ্গে ওঠাবসায় ও মেলামেশায় কার্তিকেয় বহু পারিবারিক তথ্য অবগত ছিলেন। তিনি নিজে রাজবাড়ির ফরমান, তায়দাদ, দলিল, চিঠি ও হিসাবপত্র স্বচক্ষে দেখবার ও নাড়াচাড়া করবার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি নিজেও অনেকদিন থেকে এই রাজবংশের ইতিহাস লিখবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন। যোগ্য কেউ লিখলে তিনি তথ্য সরবরাহ করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। মনের কথা প্রকাশ করতেই অনেকেই এগিয়ে এলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউই আর লিখলেন না। এদিকে মহারাজ সতীশচন্দ্রের অকাল মৃত্যুতে নদীয়া রাজ-সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন হলো। ডেপুটি কালেকটর কালীচরণ ঘোষ সরকারী ভাবে নদীয়া রাজবংশের ইতিহাস লিখে নদীয়া কালেকটরীতে জমা দেবার জন্য কার্তিকেয়কে অনুরোধ করলেন। প্রথমে তিনি বাংলায় মোটামুটি ইতিহাস লিখলেন। তারপর তার ইংরেজি অনুবাদ করে সরকারী দপ্তরে জমা দিলেন। তখন অনেকেই তাঁকে পুরো ইতিহাস লিখতে অনুরোধ করলেন। কার্তিকেয়র বাসনা থাকলেও সময়ের অভাব ছিল। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জমিদারির নানা কাজ করতে হয়। কিন্তু সময়ের অভাবে উদ্যমীর কাজ অসম্পূর্ণ থাকে না। দুবছর ধরে রাত নটা থেকে রাত দুটো পর্যন্ত নিয়মিত ভাবে কঠোর পরিশ্রমে তিনি নদীয়া রাজবংশের ইতিহাস রচনা করলেন। ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে তিনি অতদিন আগে এই ইতিহাস রচনায় আধুনিক সমাজবিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিই গ্রহণ করেছিলেন। কার্তিকেয় লিখেছেন…'যত্ন থাকিলেও এদেশের কোনো পুরাবৃত্ত লেখা সহজ ব্যাপার নয়। আমাদের দেশে ইতিহাস লেখবার রীতি প্রায়ই ছিল না। সুতরাং, পুরাবৃত্ত সংকলনে প্রবৃত্ত হইলে, পরম্পরাগত প্রবাদের উপরি অনেক নির্ভর করিতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে এই রাজবংশের পূর্ব বৃত্তান্ত সংগ্রহে আমার কিম্বদন্তীর প্রতি অধিক নির্ভর করিতে হয় নাই। ইতিহাস, পুরাতন কাগজ, ফরমান ইত্যাদি হইতে প্রায়ই এই ইতিহাস সংকলিত হইল।…যে সকল ফরমান ও পুরাতন কাগজপত্র হইতে এই ইতিহাসের অধিকাংশ সংকলিত হইল, তৎসমুদয় অদ্যাপি রাজবাটিতে বিদ্যমান আছে।'

'ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিত'-এর পাণ্ডুলিপি রচনার পর ছাপার সমস্যা দেখা দিল। হিসেব করে দেখা গেল ছাপতে খরচ হবে ৪৩৬ টাকা। রাজবংশের ইতিহাস রাজকোষের টাকাতেই প্রকাশ হওয়া উচিত। কিন্তু জমিদারি তখন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে। তাই যে কোনো ব্যয়ই সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ। কার্তিকেয় বাধ্য হয়ে নদীয়ার কালেকটর সি সি স্টিবনসের কাছে অর্থ মঞ্জুরের জন্য আবেদন করলেন—পরিশ্রমের পুরস্কার হিসেবে নয়, বই ছাপার খরচের জন্য। কালেকটর এই আবেদন

পত্রটি সুপারিশ করে পাঠালেন কমিশনার লর্ড ইউলিস ব্রৌনের কাছে। কমিশনার জানালেন যে বইটি প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও সরকার অর্থ মঞ্জুর করবেন না, কারণ নদীয়ারাজ এসটেট ঋণভারগ্রস্থ। ঋণ পরিশোধ হলেই বিষয়টি বিবেচিত হবে। যে রাজবংশ কবি জ্ঞানীগুণীদের পোষকতা করেছেন, সমাদর করেছেন, সেই রাজবংশের ইতিহাস প্রকাশে রাজকোষের অর্থ ব্যয় হতে পারবে না জেনে কার্তিকেয় মর্মাহত হলেন বটে কিন্তু হতাশায় ভেঙে পড়লেন না। তিনি নিজের খরচেই বইটি প্রকাশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই বিদগ্ধ মহলে ও পত্রপত্রিকায় সাড়া পড়ে গেল। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট', 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন', 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব', 'সোমপ্রকাশ', 'আর্য দর্শন' ও 'সাহিত্য' পত্রিকায় বইটির সপ্রশংস সমালোচনা প্রকাশিত হলো। পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি লিখলেন: 'সভ্য সমাজে যতদিন ইতিহাসের আদর থাকিবে, তাবৎকাল কার্তিকেয়র নাম স্বর্ণাক্ষরে ধরাতলে দেদীপ্যমান থাকিবে।' এছাড়া, আরও অনেকে কার্তিকেয়র কাছে তারিফ করে চিঠি লিখলেন। ইতিমধ্যে নদীয়ারাজ এসটেট ঋণমুক্ত হলো। বইটি ছাপার যে খরচ হয়েছিল তার অর্ধেক পরিমাণ অর্থ সরকার মঞ্জুর করলেন লেখকের পুরস্কার হিসেবে। কার্তিকেয়ই প্রথম বাঙালী লেখক যিনি বই লিখে ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে পুরস্কার পেয়েছিলেন।

কিন্তু আশ্চর্য যে, নানাভাবে আলোচনা, প্রশংসা ও সমাদর হওয়া সত্ত্বেও বইটি কিন্তু আশানুরূপ বিক্রয় হলো না। সকলেই বিনা মূল্যে উপহার হিসেবে বইটি পেতে চাইলেন। কার্তিকেয় আক্ষেপ করেছেন: 'এখনও আমাদের দেশীয় লোক যত আমোদপ্রিয়, তত জ্ঞানপ্রিয় হয় নাই।...অতি উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ অবিক্রীত হইয়া কীটের আহার হইয়াছে। আমার এই গ্রন্থের প্রশংসা শুনিয়া অনেকেই তাহা পড়িবার জন্য ব্যগ্র হন, কিন্তু তজ্জন্য ব্যয় করিতে ইচ্ছা করেন না। এমনকি যাঁহাদের বংশের ইতিহাস তাঁহারাও এক জোড়া সামান্য বিনামার জন্য যে ব্যয় করিয়া থাকেন তাহার অর্ধেকও এ পুস্তকের নিমিত্ত ব্যয় করিতে পারেন না।' রাজ আত্মীয়দের বিনামূল্যে এ বই উপহার দেবেন না বলে কার্তিকেয় প্রতিজ্ঞা করেও অবশ্য শেষ পর্যন্ত প্রতিজ্ঞা রাখতে পারেননি।

এই অসামান্য বই ইতিহাসের প্রচুর তথ্য দিয়ে ভরা। নবাব সিরাজদ্দৌলার অত্যাচারের বর্ণনা দিয়ে কার্তিকেয় লিখেছেন: 'ইঁহার অত্যাচারে...সকলেই জ্বালাতন

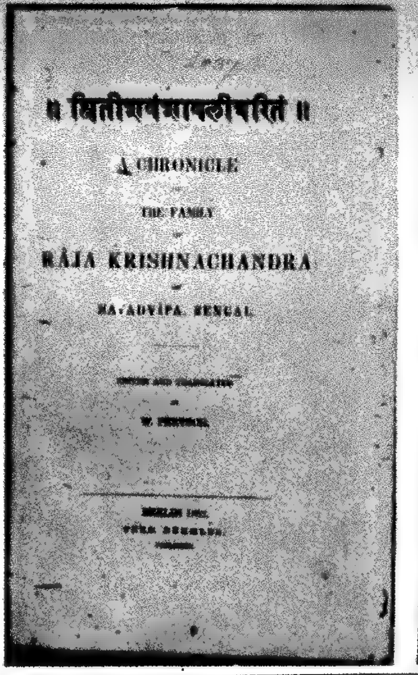
॥ ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং ॥

A CHRONICLE OF THE FAMILY OF RAJA KRISHNACHANDRA OF NAVADVIPA, BENGAL.

ইংরাজি অনুবাদের নামপত্র

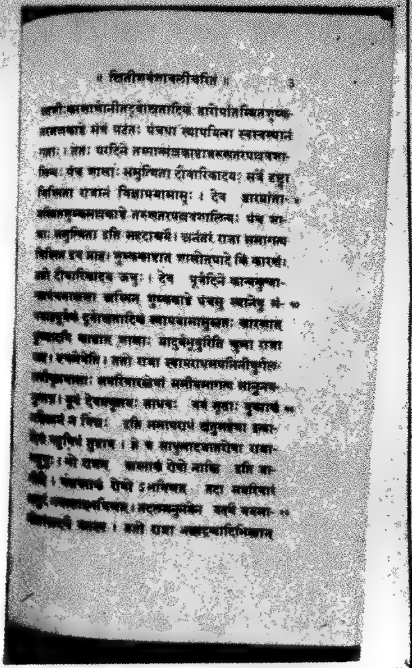
॥ ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং ॥

সংস্কৃত 'ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিতং'

আলোকচিত্র : সত্যেন মণ্ডল

হইলেন এবং আপনাদের ধন, মান, জীবন সর্বদা সঙ্কটাপন্ন বোধ করিতে লাগিলেন। ...তাঁহার বিষম দৌরাত্ম্য সকলের অসহ্য হইয়া উঠিল।' পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের ভূমিকা প্রসঙ্গে কার্তিকেয় লিখেছেন: ...'শিবির মধ্যে চাটুকারদিগের সহিত আমোদে কালহরণ করিতে লাগিলেন।' কার্তিকেয় কী ভাবে ও কেন নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইংরেজদের সহায়তা করেছিলেন তার সুবিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। সিরাজের বিরুদ্ধে হিন্দু রাজা-জমিদার ও জগৎ শেঠের গোপন মন্ত্রণা সভায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বক্তব্য কার্তিকেয় লিখেছেন: '...ইংরেজেরা যেমন পরাক্রান্ত ও সাহসী, তেমনি আবার বুদ্ধিমান ও বিশ্বস্ত। নবাবের দৌরাত্ম্যে আমরা...বিপদগ্রস্থ,...সুতরাং চেষ্টা ও যত্ন করিলে তাঁহাদের সাহায্য পাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। তাঁহারা সহায়তা করিলে মিরজাফর পূর্ণ মনোরথ হইবেন এবং আমাদেরও ইষ্টসিদ্ধি হইবেক।' এই সভা শেষে 'রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইংরেজদিগের সহায়তা সাধনের ভার' নিয়ে ফিরলেন। কৃষ্ণচন্দ্রকে যে এদেশের মানুষ বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ দিয়েছিল, কার্তিকেয়র বইতে তার স্বীকৃতি আছে: '...রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই রাজবিপ্লবের প্রবর্তক,......ও প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ...লোকেরা তাঁহাকে নেমকহারাম কহিত। ...এই রাজবিপ্লব সংঘটন বিষয়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের যে বিশেষ যত্ন ও সংস্রব ছিল, তাহার অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে।' কার্তিকেয় লিখেছেন যে ক্লাইভই কৃষ্ণচন্দ্রকে মহারাজেন্দ্র বাহাদুর উপাধি আনিয়ে দেন এবং এই ফরমান রাজবাটিতে আছে। কার্তিকেয়র বইতে মিরজাফরদের বিশ্বাসঘাতকতার কথাও আছে, আবার মীরমদন-মোহনলালের বীরত্বের কথাও আছে। কার্তিকেয় বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গে সেকালের হিন্দু সমাজপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিধানের কঠোর সমালোচনা করেছেন: 'রাজা কৃষ্ণচন্দ্র...স্বদেশের কোনো কলুষিত ব্যবহার পরিশুদ্ধ করণে কখন হস্তক্ষেপ করেন নাই।...তিনি...কোনো...ব্যক্তি স্বদেশের কোনো দূষিত ও অহিত ব্যবহার নিরাকরণে যত্নবান হইলে, তাঁহার চেষ্টা বিফল করিয়া দিয়াছেন।'

কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার বিদূষক গোপাল ভাঁড়ের অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্কের অবসান আজও হয়নি। কিন্তু কার্তিকেয় নির্দ্বিধায় গোপাল ভাঁড়ের গল্প লিখেছেন তাঁর বইতে। অবশ্য কৃষ্ণনগরের বারোদোলের মেলা সম্পর্কে কোনো কথা লেখেননি। জগদ্ধাত্রী পূজা সম্পর্কেও সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই, তিনি নদীয়ার স্বাস্থ্যকর জলবায়ু ও সুস্বাদু ফলের উল্লেখ করেছেন। ভূমি ব্যবস্থার পরিচয় তুলে তিনি জানিয়েছেন: কৃষিজ জমির গড় খাজনা ছিল প্রতি বিঘায় দু' আনা, বাস্তু ও বাগানের দু' টাকা, এছাড়া ছিল নিষ্কর জমি। তখন চালের মণ ছিল বারো আনা, তেলের মণ পাচ টাকা ও ঘিয়ের মণ দশ টাকা।

বিগত কয়েক শতকে নদীয়ার গ্রামের পর গ্রাম ম্যালেরিয়ায় ধ্বংস হয়েছে, অগণিত মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, কার্তিকেয় বর্ণময় ভাষায় তুলে ধরেছেন সংক্রামক মহামারীর সজীব চিত্র। তিনি বইতে নদীয়ার নীলচাষ, নীলকরদের অত্যাচার ও জোটবদ্ধ

চাষীদের সংগ্রামী ভূমিকার উল্লেখ করেছেন। নদীয়ার বিদ্যাচর্চা বিশেষ করে সংস্কৃত ও ফারসী শিক্ষা, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প, শান্তিপুরের তাঁত ও সেকালের কৃষ্ণনগরে সঙ্গীত চর্চার বিশদ বিবরণ রয়েছে এই বইতে। এদেশের বিচারালয়ে ফারসীর বদলে ১৮৩৭ সাল থেকে বাংলা চালু হলো। কার্তিকেয় নিজে ফারসী জানতেন। কী ভাবে এদেশে ফারসী ভাষা অনুশীলন বন্ধ হয়ে গেল কার্তিকেয় তার উল্লেখ করেছেন।

গদ্যই লেখকের প্রতিভা বিচারের নিকষ পাথর। কার্তিকেয় সে যুগে একজন সার্থক গদ্য লেখক ছিলেন। ব্যক্তিজীবনে কার্তিকেয় ছিলেন নির্ভেজাল মানুষ। গদ্য রচনায় ও তথ্য পরিবেশনেও তিনি ভেজাল মেশাননি। প্রয়োজনে তাঁর রচনা হয়েছে কখনও আবেগ-মথিত, আবার শানিত বুদ্ধিদীপ্ত ও প্রমাণ-নির্ভর। ইতিহাস রচনায় কল্পনার স্থান নেই কিন্তু নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে ব্যাখ্যায় অনুমান থাকতে পারে। কার্তিকেয় এ ব্যাপারে ছিলেন সতর্ক ও সচেতন।

'ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত' সেকালে সমাদৃত হয়েছিল কিন্তু একটিমাত্র সংস্করণের পর আর প্রকাশিত হয়নি। অথচ, আজও গ্রন্থটি আঞ্চলিক জন-ইতিহাসের অমূল্য উপাদান-উপকরণে বিরল সূত্রগ্রন্থ। বাংলার ইতিহাস রচনায় এই দুষ্প্রাপ্য বইটি অপরিহার্য আকর। সামগ্রিক বিচারে, 'ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত' শুধু নদীয়া রাজকথা নয়, প্রকৃতপক্ষে মূল্যবান এক জন-ইতিহাস।

মোহিত রায়

সাম্প্রতিক বই

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী ও বাংলা গীতিকবিতার ধারা
ডঃ বিষ্ণুপদ পাণ্ডা
শরৎ পাবলিশিং হাউস
কলকাতা-৯
দাম — ৩০·০০

ডঃ বিষ্ণুপদ পাণ্ডার কবি বিহারীলাল বিষয়ক এই গবেষণাগ্রন্থ সাম্প্রতিক মননশীল বাংলা সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এর প্রধান কারণ, এটি একই সঙ্গে তত্ত্বমূলক গবেষণাগ্রন্থ এবং রসযুক্ত সাহিত্যগ্রন্থও হয়েছে। আমাদের দেশের সাহিত্য-সংক্রান্ত অনেক গবেষণাগ্রন্থ নিছক তত্ত্বকথায় পূর্ণ থাকে। এবং সে তত্ত্বকথাও নীরসভাবে বিবৃত হয়। তাই বাংলা গবেষণাগ্রন্থের প্রতি রসিক পাঠকের এত অনীহা। অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে, গবেষণাগ্রন্থ মূলত তত্ত্বগ্রন্থ; রসসৃষ্টি এর গৌণ বা মুখ্য, কোনো লক্ষ্যই নয়। যাঁরা তত্ত্ববিষয়ক গবেষণাগ্রন্থ থেকে রসের আস্বাদ পেতে চান এবং সে স্বাদ না পেলে গবেষণাগ্রন্থের প্রতি ধিক্কার দিয়ে থাকেন, তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, যিনি যথাস্থানে ঠিক বস্তু সন্ধান করেন, তিনিই প্রাজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজতে গেলে শুধু বিড়ম্বনাই লাভ হয়। সুতরাং মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাহিত্যের গবেষণাগ্রন্থ আর পাঁচটা গবেষণার মতো তত্ত্ববহ ও যৌক্তিক পারম্পর্যে বিধৃত। ডঃ বিষ্ণুপদ পাণ্ডার এই গ্রন্থ যুক্তি ও সিদ্ধান্তের দিক থেকে বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ডঃ পাণ্ডা মধ্যযুগীয় সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। তিনি ভুবনেশ্বর মিউজিয়ম থেকে ওড়িয়া হরফে ওড়িয়া কবির লেখা অনেকগুলি বাংলা কাব্য আবিষ্কার করেছেন। একটি তো (দ্বারিক দাসের মনসামঙ্গল) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তিনি যে আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধেও অতিশয় অভিজ্ঞ এবং সেই রসের মধ্যে আকণ্ঠ মগ্ন, তা তাঁর এই গ্রন্থ না পড়লে বোঝা যেত না।

গ্রন্থটি প্রধানতঃ পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এ ছাড়াও আছে প্রাককথন, যেখানে তিনি কাব্যে আধুনিকতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। আধুনিকতা যেমন একটা যুগের বাণী, তেমনি আবার একটি ব্যক্তিমানসেরও গূঢ় গহন মর্ম-বাণীও হতে পারে। এই ভূমিকায় স্বল্প পরিসরে বাংলা কাব্যের আধুনিকতার স্বরূপ এবং মধ্যযুগ থেকে তার মৌল পার্থক্য কোথায়, তা অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 'কবি ও কাব্য' অধ্যায়টি সুবিস্তারিত, দু'শ পৃষ্ঠারও বেশি। এটি আবার তিনটি উপচ্ছেদে বিভক্ত - (ক) পরিমাণ প্রসঙ্গ, (খ) বৈচিত্র্য প্রসঙ্গ, (গ) দক্ষতা প্রসঙ্গ। বিহারীলালের সমগ্র কাব্যসাধনার ইতিবৃত্তকে কেন্দ্র করে এই উপচ্ছেদগুলি গড়ে উঠেছে। 'বৈচিত্র্য প্রসঙ্গ' উপচ্ছেদটি বিশেষভাবে মৌলিক বলে দাবি করতে পারে। মূলতঃ 'সারদামঙ্গল' ও 'সাধের আসন' অবলম্বন করে তিনি বিহারীলালের কবিচেতনায় নারীভাবনার স্বরূপ, তার রোমান্টিক ও মিস্টিক রসের সংমিশ্রণ এবং তার উৎস থেকে সমাপ্তিতে উত্তরণ— এইভাবে তিনি বিহারীলালের সারদাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। বিহারীলাল একইসঙ্গে মিস্টিক ও রোমান্টিক, তাত্ত্বিক ও রসিক, অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী, কবি ও নবী। ভারতের ব্রহ্মবাদ, চণ্ডীতত্ত্ব, দ্বৈতরস এবং পাশ্চাত্যের আদর্শায়িত রোমান্টিক সৌন্দর্য-চেতনা তাঁর কাব্যে বিচিত্র রসায়ন সৃষ্টি করেছে। ডঃ পাণ্ডা যেভাবে অবলীলাক্রমে এই গ্রন্থে বিহারীলালের সারদাতত্ত্বের পশ্চাতে দ্বৈতাদ্বৈতের কন্দুক ক্রীড়া করেছেন তাতে তাঁর প্রতিভার প্রতি আমাদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা জাগে। এই অংশে পূর্বপ্রচলিত অনেক ধারণার মূল বনিয়াদ ধসিয়ে দিয়ে এবং সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে সারদাতত্ত্বের ব্যাখ্যা করে আমাদের গবেষক রসসাহিত্যের গবেষণায় নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। আরো তিনটি বড়ো অধ্যায়ে (সমকালীন কাব্যধারা ও কবি, প্রভাব ও প্রসঙ্গ, বাংলা কাব্যধারায় কবির স্থান) তিনি বাংলা গীতিকাব্য ও কবিদের বিবর্তনের ধারায় বিহারীলালের কবিপ্রকৃতির সম্যক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্র-পূর্বযুগের কাব্যকবিতার রূপরীতি-গত বৈচিত্র্য ও প্রকৃতি নিয়েও তথ্যবহ আলোচনা করেছেন। সে আলোচনায় তিনি বিবর্তনের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন বলে তাঁর ইতিহাস-চেতনা কোনো কোনো স্থানে অতিশয় তীক্ষ্ণতা লাভ করেছে। পরিশিষ্টে কবির ব্যক্তিগত জীবন ও গ্রন্থাদির তালিকা দেওয়া হয়েছে। ফলে এটি গবেষক ও সাধারণ পাঠক, দু-সম্প্রদায়েরই কাজে লাগবে।

এই আলোচনার আর একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য, ডঃ পাণ্ডা অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে বিহারীলালের প্রায় অধিকাংশ কবিতা ও খণ্ডকাব্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। এতদিন এগুলি সাহিত্যের ইতিহাসে কোনোপ্রকারে অস্তিত্ব রক্ষা করছিল, কারণ গুণগত গৌরব ও শিল্পগত কলালক্ষণ এই সমস্ত সহজ ভাব ও সরল সুরের কবিতা ও গানে সর্বত্র সুলভ নয়। যা আপাতত মনোহারী নয়, যা মন-প্রাণ-কানকে আবিষ্ট করতে পারে না, লিরিক কবিতা হিসেবে তা ততটা সার্থক হয় না। বিহারীলালের কিছু কিছু রচনায় এক ধরণের শিথিলতা ও অসামঞ্জস্য ছিল, কবি নিজেও সে সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। ডঃ পাণ্ডা সেই সমস্ত অকৃতার্থ কবিতাকেও কৌতূহল ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচার করেছেন। আমরা কাব্য-কবিতা নিয়ে সৌখিন মজদুরি করতে করতে মনের স্বাভাবিক প্রত্যয় হারিয়ে বসে থাকি। কিন্তু ডঃ পাণ্ডা সে সহজিয়া পথের পথিক নন। গীতিকবিতা কবির অন্তরসম্ভূত

মর্মকথা হলেও যিনি তার ইতিবৃত্ত ও বিকাশ আলোচনা করবেন তাঁর অনেকখানি ঘর্ম ঝরবে। ডঃ পাণ্ডা সাহিত্যরসে বুঁদ হয়ে থাকলেও এই আলোচনায় ঘর্মসিক্ত পরিশ্রমের যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন।

বিহারীলালের প্রতিভার প্রতি আমাদের গবেষকের অশেষ শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু তাই বলে তিনি কবির দোষত্রুটির প্রতি অন্ধ নন। বিহারীলাল যে পরিমাণে ভাবুক ছিলেন, সেই পরিমাণে দক্ষ আর্টিস্ট ছিলেন না। ভাবগম্ভীর মিস্টিক চেতনাই তাঁকে আত্মবোধের সীমার বাইরে যেতে দেয়নি। তাই তাঁর কোনো কোনো পংক্তি আশ্চর্য কাব্যগুণান্বিত মনে হলেও সবকিছু মিলেমিশে সর্বদা একটা সর্বাবয়বযুক্ত রসবস্তু ও উপভোগের সামগ্রী হয়ে উঠতে পারেনি। তিনি অন্তরের ভাব ও প্রেরণাকে হৃদয়সমুদ্রে ডুবিয়ে রেখে দিতেন, অন্তরের আকাশে সন্ধ্যার মেঘলীলা দেখে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যেতেন, কিন্তু সেই মুগ্ধতা শিল্পের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের অভিমত অনুসরণ করে বলতে হয়, সন্ধ্যার মেঘমালার মতো তা অপরূপ সুন্দর, কিন্তু যত সুন্দর তত রহস্যময়, তত দুর্বোধ্য। পাঠক যে সব সময়ে তাঁর রচনা থেকে একটা গ্রহণযোগ্য ও উপলব্ধিগোচর রসবস্তু খুঁজে পাবে এমন কোনো কথা নেই। অর্থাৎ ভাবাবেগমুগ্ধ মিস্টিক চেতনার জন্যই কবি সৃষ্টিকর্মে ততটা সার্থক হলেন না। তাই সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং কিশোর রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রদীপ থেকে নিজ নিজ অন্তর-প্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা কাব্যগুরুর ভাবমুগ্ধ এবং রসাবেশবিবশ ইন্দ্রিয়াতীত নামরূপহীন নৈঃশব্দ্যের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হতে পারেননি, বা চাননি। বিহারীলালের কবিতায় কোথায় দুর্বলতা, তা ডঃ পাণ্ডা সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। তিনি কবির দুর্বলতা বা অক্ষমতা মুছে ফেলার চেষ্টা করেননি। আসল কথা, বিহারীলাল বাংলা গীতিকবিতার নতুন পথের দিশারী, কিন্তু নিজে সব সময়ে সে পথে চলতে চাননি। তাঁকে নীরব কবি বলা না গেলেও, তিনি যে ভাবরসে আত্মবিস্মৃত এবং সেইজন্য আত্মপ্রকাশে উদাসীন, তা স্বীকার করতে হবে। তিনি নিজেই কবি, নিজেই পাঠক; নিজেই প্রেমিক, নিজেই প্রেমাস্পদ। তাঁর সারদা তাই একাধারে আদর্শায়িত, জ্যোতির্ময়ী অধ্যাত্ম চেতনা, আবার রোমান্টিক নারীসুলভ প্রেম ও সৌন্দর্যময়ী। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাঙালীর নারীসংস্কার। জননী ও জায়া—বাঙালী দুই নারীকেই ভজনা করেছে। কুলত্যাগিনী রাধা ও গৃহচারিণী উমা—আমরা

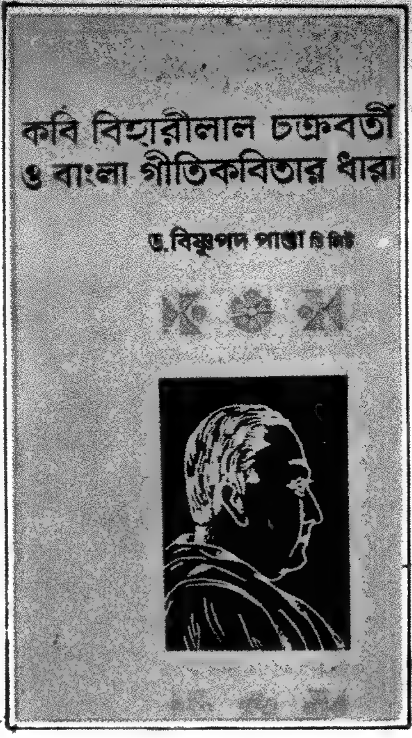

দুই নারীকেই সাধ্যসাধনায় গ্রহণ করেছি। পাঁচশো বছর ধরে সেই ধারাই চলে আসছে। বিহারীলালে তার আধুনিক সূচনা। নারীর এই কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রানুগ মূর্তি বিহারীলালের ভাবমুগ্ধ হৃদয়ে ধরা দিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথে তা পূর্ণতালাভ করল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে, হৃদয়ের সেই অস্ফুটভাব ও অপার্থিব আনন্দকে বিহারীলাল যথোচিত বাণীমূর্তি দিতে পারেননি। তাঁর বিচিত্র মনঃপ্রকৃতিই তাঁকে ইন্দ্রিয়ময় মূর্তি রচনায় বাধা দিয়েছে। শেলী, কীটস, রবীন্দ্রনাথ যে-অর্থে রোমান্টিক গীতিকবি, ঠিক সেই অর্থে বিহারীলাল গীতিকবি নন। কারণ তিনি ভাবাবেশে যত মুগ্ধ ভাবপ্রকাশে ততটা উৎসাহী নন। সে যাইহোক, তাঁর প্রতিভার ঐশ্বর্য ও দীনতা—দুই-ই ডঃ পাণ্ডা যথাসম্ভব নিঃস্পৃহ-ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। কল্পনার উদ্দামতা ও আবেগের নির্বাধ উচ্ছ্বাস অনেক সময়ে কবিকে রসসৃষ্টিতে বাধা দেয়। বিহারীলালের কল্পনা ও আবেগ কোনো কোনো সময়ে যে বিপথে গিয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর কোনো কোনো রচনায় প্রতিভার এমন বিদ্যুৎ-চমক আছে যে বিস্মিত হতে হয়। বিষ্ণুপদ পাণ্ডা মহাশয় অত্যন্ত পরিশ্রম করে সেই সমস্ত ভাবগত ও রসগত বিরোধের সমন্বয় খুঁজবার চেষ্টা করেছেন। বিহারীলালের উপর এত নিপুণ ও পুংখানুপুংখ আলোচনা বাংলা সাহিত্যে আর নেই। সেদিক থেকে এই গবেষক অকুণ্ঠ প্রশংসা দাবি করতে পারেন।

তাঁর এই গ্রন্থ আমাদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে, গতানুগতিক কাব্যসংস্কারকেও কিছু নাড়াচাড়া দিয়েছে। কিন্তু একটু অনুযোগ করি। তিনি নিজ মত সমর্থনের জন্য যে-সমস্ত নজির তুলেছেন, অথারিটি কোট' করেছেন, তাঁর মতো প্রধান ও সুধী গবেষকের পক্ষে তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কারণ যাঁদের রচনা থেকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি উদ্ধৃতি তুলেছেন, তাঁদের অনেকের রচনাই তাঁর থেকে দুর্বল। পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের ছাত্রের মতো তাঁকে অপরের উদ্ধৃতির সমর্থন খুঁজতে দেখলে ভালো লাগে না। তিনি নিজ শক্তিসামর্থ্যে যথেষ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত, সেক্ষেত্রে তিনি নাই-বা নজির খুঁজলেন। তিনি নিজেই নজির হয়ে থাকুন, এই আমাদের প্রার্থনা। গ্রন্থটি পরিমিত মাপের এবং পাইকা অক্ষরে ছাপা। সুতরাং পড়তে আনন্দ হয়। খালেদ চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদপট খুবই সুরুচিসম্মত হয়েছে। রসিক ও চিন্তাশীল সমাজে এ গ্রন্থটি বিশেষ আদরণীয় হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

যাঁরা লিটল ম্যাগাজিন বার করেন তাঁদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গা থেকে অনেক তরুণ সাহিত্য সংস্কৃতিসেবী অনেক শ্রম স্বীকার করে নিঃস্বার্থভাবে লিটল ম্যাগাজিন বার করছেন। আমরা তাঁদের প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাই। আগামী সংখ্যা থেকে শিলাদিত্য পত্রিকায় নিয়মিত লিটল ম্যাগাজিনের খবর ও সম্ভবক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য রচনার পুনর্মুদ্রণ থাকবে। তাই অনুরোধ, লিটল ম্যাগাজিন যাঁরা বার করেন আমাদের দপ্তরে এক কপি করে তাঁদের পত্রিকা পাঠান।

সাহিত্য বিতর্ক

সাহিত্য-বিতর্ক খুব জমে উঠেছে। চারজন বিশিষ্ট বঙ্কিম বিশেষজ্ঞ ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার, ডঃ ভবতোষ দত্ত, ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত ও অধ্যাপক রেজাউল করীম আমন্ত্রিত লেখক হিসেবে গত দু' সংখ্যায় লিখেছেন। এ সংখ্যায় বিতর্কে অংশ নিচ্ছেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অধ্যক্ষ মোহম্মদ আশরফ । পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে এই প্রসঙ্গে ছাপা হবে শুধু পাঠক পাঠিকাদের চিঠি। প্রতিটি মুদ্রিত চিঠির জন্য পনেরো টাকা সাম্মানিক দেওয়া হবে। লিখতে হবে ৩০০ শব্দের মধ্যে, কাগজের এক পৃষ্ঠায়। খামের উপরে লিখে দেবেন 'সাহিত্য-বিতর্ক'। তাড়াতাড়ি চিঠি পাঠান। বিতর্কবহুল, যুক্তিপূর্ণ এবং চিন্তাশীল।

বঙ্কিমচন্দ্র কি ইসলাম বিরোধী ছিলেন ?

মুসলিম আর ইসলাম এক নয়

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বাংলা সাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট এবং যখন বর্তমান বাংলা ভাষাকে বঙ্গীয় মুসলিম সমাজ মনে-প্রাণে তাদের মাতৃভাষা বলে গ্রহণ করেনি তখন বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না। প্রশ্নটা উঠেছে বিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে যখন বঙ্গীয় মুসলিম সমাজেও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা সৃষ্টি হওয়ার সূচনা দেখা দেয়। তখন থেকে বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে নানাবিধ আলোচনা বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে দেখা দিয়েছে। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা গঠনের সে সময় যে প্রচেষ্টা চলেছিল—তাতে দেখা গেল বঙ্কিমচন্দ্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ উনবিংশ শতাব্দীর এক দল লেখক এদেশীয় মুসলিম চরিত্রকে নানাভাবে হীন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। কাজেই তাঁকে সাহিত্যের একজন মস্ত দিকপাল বলে স্বীকার করলেও হিন্দু-মুসলিম উভয়েই এক জাতির অন্তর্গত দুটো শাখা বলে স্বীকার করা সম্ভবপর ছিল না। হয় তাঁকে সাহিত্য থেকে অপাংক্তেয় করা প্রয়োজন ছিল, না হয় হিন্দু-মুসলিমের সাহিত্যকে দুটো পৃথক খাতে প্রবহমান করা সম্ভবপর ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রকে হিন্দু সমাজ কিছুতেই ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তাঁদের কাছে 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের ঋষি। তাঁরই অঙ্কিত আনন্দমঠের সন্তানগণের ভাবধারায় উদবুদ্ধ হয়ে ক্ষুদিরাম বসু, কানাইলাল দত্ত, প্রফুল্ল চাকী প্রমুখ সন্ত্রাসবাদীগণ অকাতরে ফাঁসিকাঠে ঝুলেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি অন্তর্নিহিত দীর্ঘকালীন আক্রোশের ফলে মুসলিম সমাজে এক অভিনব প্রতিক্রিয়াও দেখা দিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের অঙ্কিত 'আয়েষা' চরিত্রের জবাব দিতে গেয়ে কেউবা বঙ্কিম দুহিতা, কেউবা ঈশা খাঁ ও রায়নন্দিনী বা কেউবা তারাবাঈ প্রভৃতি উপন্যাসও প্রণয়ন করেছিলেন। তবে তাতেও বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আসন টলেনি দেখে, আস্তে আস্তে মুসলিম সমাজ তাদের ভাষাকে ইস্কুল কলেজে প্রচলিত ভাষা থেকে পৃথক করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে। এতে আমাদের মনে হয়—দু'পক্ষ থেকেই মস্ত বড় ভুল করা হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে ভুল করা হয়েছে মুসলিম শব্দ ব্যবহারে এবং মুসলিমদের পক্ষে ভুল করা হয়েছে ইসলাম ও মুসলিমদের মধ্যে কোনো পার্থক্য না করাতে। যে কোনো দেশের ইতিহাসের আলোচনা করলে দেখা যায় বিজেতার বিরুদ্ধে বিজিত জাতির আক্রোশ দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকে। এতে ধর্মীয় ঐক্যেরও কোনো বিশেষ কার্যকারিতাও নেই। কোনো পৌরাণিক যুগে অযোধ্যার নির্বাসিত রাজকুমার রামচন্দ্র দাক্ষিণাত্য ও লংকা বিজয় করেছিলেন বলে আজও সে-অঞ্চলের লোকদের কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে আক্রোশের অবসান হয়নি। বিজেতার প্রতি বিজিতদের আক্রোশ কেবল তাদের আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিজেতার ভাষাকেও গ্রহণ করাতে তা প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৪৭ সালে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বলে প্রতিষ্ঠিত করার সূচনায় মুসলিম অধ্যুষিত সিন্ধু প্রদেশ থেকেই সর্ব প্রথম তার প্রতিবাদ উত্থিত হয়। ডঃ দাঁভদপোতা অম্লান বদনে উর্দুকে বিজেতার ভাষা বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। কাজেই বিজেতা পাঠান অথবা মুঘলদের বিরুদ্ধে বিজিত তৎকালীন ভারতবাসী জনসাধারণের আক্রোশ অমূলক নয়। তবে এ ক্ষেত্রেও একটা ভাববার বিষয় রয়েছে। ভারতবাসী পদবী সব সময়ই একার্থবাচক নয়। পাঠানেরা যে সময় এ দেশ অধিকার করে, তখন এদেশবাসী ছিল রাজপুত প্রভৃতি জাতিরা এবং প্রাণপাত করেও তারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। মুঘলেরা যখন এদেশ আক্রমণ করে, তখন এদেশবাসী কেবল রাজপুতেরা ছিল না—পাঠানেরাও তখন এদেশবাসী হয়ে গেছে। আবার ইংরেজেরা যখন এদেশ অধিকার করে, তখন রাজপুত, মারাঠা, শিখ, পাঠান এবং মুঘল সকলেই এদেশবাসী হয়ে গেছে তার প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় বাবর কর্তৃক এ দেশ আক্রান্ত হলে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে শেষ পাঠান সম্রাট ইব্রাহীম লোদীর সঙ্গে চিতোরের রাণা সংগ্রাম সিংহও তাকে প্রতিরোধ করার জন্য যুদ্ধ করেছেন। পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফর বা জগৎ শেঠ ক্লাইভের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেও সে প্রান্তরে মোহনলাল ও মীর মদন প্রাণ দিয়ে ওদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে ইংরেজ আমলের পূর্বে মুসলিমেরাও এদেশবাসী হয়ে গেছেন।

তবে মুসলিমদের এদেশবাসী হওয়ার এ ধারাটা নানাবিধ কারণের ফলে ইংরেজদের আগমনের পর থেকে উল্টা স্রোতে বইতে থাকে। মুঘল শাসনের শেষ পর্বে এ উপমহাদেশে মারাঠা ও শিখ শক্তির উত্থানের ফলে মুসলিমেরা তাদের কার্যকলাপে স্বভাবতই ভীত হয়ে পড়ে। এদেশ থেকে মুসলিম বিতাড়ন যেন তাদের মূলমন্ত্র হয়ে পড়ে। তার ফলে শাহওয়ালী উল্লাহ দেহলভীর আহ্বানে আহমদ শাহ আবদ-ই-আলী পানিপথে ভারত আক্রমণ করে মারাঠাদের সঙ্গে যে ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত হন, তাতে শক্তিহীন মুঘল এবং মুসলিম ওয়াবেরা আহম্মদ শাহ আবদ-ই-আলীর পক্ষাবলম্বন করেন। তখন থেকে এদেশবাসী বলতে ঢালাও করে সকল লোককে মনে করার কারণ ছিল না। তখন থেকেই এদেশবাসী হয়ে গেল, রাজপুত, শিখ, মারাঠা, মুসলিম প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত।

ইংরেজেরা সে বিভাগকেই ফলাও করে প্রকাশ করত চেয়েছিল। কারণ সে বিভাগ ছিল তাদের শাসনের স্থায়িত্বের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তবে তারা তাদের দেশে প্রচলিত জাতীয়তাবাদের ধ্যান-ধারণাও এদেশে আমদানী করেছিল। তার ফলেই ভৌগোলিক ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার ধারণা এদেশে প্রসার লাভ করে।

একথা অবশ্য সত্য যে, মুসলিম সমাজে

সব সময়ই জাতীয়তার সঙ্গে অল্পবিস্তর আন্তর্জাতিকতার ভাবধারা বর্তমান। যে কোনো দেশের সত্যিকার মুসলিমের মানসে একদিকে যেমন রক্ত, ভাষা ও ভৌগোলিক পরিবেশমূলক জাতীয়তার ভাব বর্তমান, তেমনি ইসলাম ধর্মে প্রত্যয়শীল এ জগতের সকল মুসলিমের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষাও বর্তমান। তবে এ আন্তর্জাতিকতার প্রেরণা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার বিরোধী নয় বরং পরিপোষক। বিভিন্ন দেশের মুসলিমেরা একই ভাষার দ্বারা পরিচালিত হলেও স্বদেশকে শ্রদ্ধা করা বা ভালবাসা—তাদের ধর্মেরই এক অঙ্গ। ইসলাম ধর্ম প্রবর্তক হযরত মোহম্মদ মোস্তফার (দঃ) পরিষ্কার বাণী রয়েছে—হুব্বুল ওয়াতনে মিনাল ইমান—স্বদেশ প্রেম-ইমানেরই অঙ্গ—অবশ্য শিল্পের দিক থেকে তাতে কোনো ত্রুটি দেখা দেয়নি। কারণ শিল্পের উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্ভর করে শিল্পীর উপজীব্যকে প্রকাশ করার সার্থকতার উপর। তাঁর এ জাতীয়তাবাদের মন্ত্রকে তিনি সার্থক ভাবে তাঁর রচিত 'রাজসিংহ' নামক উপন্যাসে প্রকাশ করেছেন বলে—এখনও রাজসিংহ বাংলা ভাষায় রচিত উপন্যাসের মধ্যে এক সার্থক সৃষ্টি বলে পরিগণিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের এসব উপন্যাস পাঠে এ কথাই মনে হয় যে মুসলমান বলতে—বহিরাগত ভারত শত্রু এক বিদেশী শক্তিকে তাঁর লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন। মুসলমান শব্দটির পরিবর্তে যদি তিনি পাঠান বা মুঘল শব্দও ব্যবহার করতেন—তা হলেও তাঁর রচিত উপন্যাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতো না। দুর্গেশনন্দিনীতে তিনি মুসলমান শব্দ ব্যবহার করেননি। তবে তা সত্ত্বেও পাঠান সর্দার কতলু খাঁর মেয়ের জগৎসিংহের কাছে প্রেম-ভিক্ষা তাকে মুসলিম সমাজের কাছে আপত্তিজনক করে তুলেছে। যদি তিনি রাজসিংহ সীতারাম বা আনন্দমঠে জাতি হিসাবে মুসলিমদের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ না করতেন তা'হলে দুর্গেশনন্দিনীর চরিত্র চিত্রণে মুসলিমেরা হয়ত এত বিক্ষুব্ধ হতো না।

প্রশ্ন হচ্ছে তিনি ইসলাম বিদ্বেষী ছিলেন কিনা? এ প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে অপর একটা প্রশ্ন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই দেখা দেয়। সেটা হচ্ছে ঃ ইসলাম ও মুসলিম কি সমার্থবাচক। সম্প্রতি যে সব গবেষণা হচ্ছে তাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এদেশীয় কেন, কোনো দেশীয় মুসলিমই সত্যিকার ইসলামের অনুসারী নয়। এ সম্বন্ধে আধুনিক যুগে মরহুম আবুল হাশিমের চিন্তা বিশেষভাবে আলোকপাত করেছে। তিনি স্পষ্টভাবেই দেখিয়েছেন খোলাফায়ে রাশেদীনের পরে ইসলাম ক্রমশ সামন্ততন্ত্র ও রাজতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। ইসলামের তৌহিদের মূলে যে ধারণা বর্তমান তাকে বলা যায়—আল্লাকে সৃষ্টিকর্তা, বিবর্তনকারী এবং পালনকারী রূপে গ্রহণ এবং সঙ্গে সঙ্গে এ জগতের তথা সমগ্র অস্তিত্বের একমাত্র সার্বভৌমত্ব আল্লার বলে স্বীকৃতি। অথচ কার্যক্ষেত্রে উমাইয়াদের শাসনের সূচনা থেকেই এ প্রত্যয়কে সর্বতোভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। উমাইয়া ও আব্বাসীয়া বংশের খলিফাগণ আল্লার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেননি। অবশ্য সীবংশের খলিফাগণ (?) সার্বভৌমত্ব তাদের করতলগত করার উদ্দেশ্যে কলমার রূপ পর্যন্ত পরিবর্তন করেছিলেন। 'লহিলাদা ইল্লাল্লাহর' পরিবর্তে তারা 'লামাবুদাইল্লাল্লাহ' প্রবর্তন করেছিলেন। তার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। মাবুদ শব্দের অর্থ হচ্ছে উপাস্য। অপরদিকে ইলাহর অর্থ হচ্ছে সার্বভৌম। অথচ এরাই মুসলিম জগতে যুগে যুগে শ্রদ্ধার অর্ঘ লাভ করেছেন। ভারতীয় তুর্কি বা মুঘলদের আচরণের মধ্যে ইসলামের ভাবধারা কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে, বিচার করতে গেলে যে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। সদা-সর্বদা শানশাওকতের সঙ্গে চলাফেরা, আহারে, বিহারে, বিলাসের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করা এবং সর্ব সাধারণের কোষাগার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করা, তাদের পূর্বাপর রীতি ছিল। যা কদাকাস্মিনকালেও ইসলাম ধর্ম অনুমোদিত নয়। লাহোর, দিল্লি বা আগ্রার দুর্গগুলোতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়, তাজমহল ও মতি মসজিদ সৃষ্টিতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় মোটেই ইসলাম অনুমোদিত নয়। বলাবাহুল্য ইসলাম ও মুসলিম মোটেই সমার্থবাচক নয়। কাজেই কোনো ব্যক্তি মুসলিম বিদ্বেষী হলে তাকে ইসলাম বিদ্বেষী বলা যায় না। তবে ইসলাম বিদ্বেষী হলে যেকোনো ব্যক্তিকে মুসলমান বিদ্বেষী হতেই হবে। কারণ ইসলামকে সম্পূর্ণ অনুসরণ না করলেও তাকে অন্তত সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় মতবাদ বলে গ্রহণ করেছে বলে—ধর্মের অসারতার সঙ্গে ধর্মাবলম্বীরও অপদার্থতা প্রমাণিত হয়। কাজেই ইসলাম বিরোধী মাত্রেই মুসলিম বিরোধী হতে বাধ্য। বঙ্কিমচন্দ্র ভারত বিজেতা মুসলিমদের চরিত্র অংকন করে, তাঁদের মনীষী সমাজে স্থান প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তবে বিদেশীয় কোনো মুসলিম চরিত্র সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করেননি। এমনকি সুলতান মাহমুদের মতো প্রতিমা ধ্বংসকারী সম্বন্ধেও কোনো কটূক্তি করেননি। এতে স্পষ্টই বুঝা যায়, ভারতের বুকে স্থায়ীভাবে বাস করে, যারা এদেশীয় লোকের স্বাধীনতা হরণ করেছিল, তিনি মুসলমান বলতে তাদেরই মনে করেছিলেন। যেহেতু এদের আচার আচরণ খাঁটি ইসলাম-সম্মত ছিল না—এজন্য এদের প্রতি তাঁর এ বিদ্বেষী মনোভাবকে সারা বিশ্বের মুসলিম সমাজের লোকের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত মনোভাবের প্রকাশ বলে স্বীকার করা যায় না। অপরদিকে যেহেতু ইসলাম ও মুসলিম সমার্থবাচক নয়, এজন্য বিজেতা মুসলিমদের প্রতি তাঁর এ আক্রোশকে ইসলাম বিদ্বেষের অপর রূপ বলা যায় না।

মোহম্মদ আশরফ

যাঁরা লেখা পাঠাতে চান

শিলাদিত্য নবপর্যায়ে তিনটি সংখ্যা বেরিয়েছে। পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে একটা পূর্বনির্দিষ্ট ছকে এবং স্পষ্ট পরিকল্পনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন উঠছে, এ কাগজে যাঁরা লিখতে চান তাঁরা কী লিখবেন? না, যেমন-তেমন লেখা পাঠাবেন না। গল্প-কবিতা পাঠান আপত্তি নেই। কিন্তু ফিচার বা বড় প্রবন্ধ বা হালকা নিবন্ধ বা নতুনতর কিছু বিষয়ে লেখা পাঠাবার আগে বরং আমাদের সঙ্গে একটু পত্রালাপ করে নিন। জানান ঃ কী বিষয়ে লিখতে চান, কত তার দৈর্ঘ্য, তার বিষয়গত অভিনবত্ব কোন খানে। সম্ভব হলে লেখাটার সংক্ষিপ্তসার বা স্কিমটা আগে পাঠান। তারপরে আমাদের অনুকূল মত পেলে মূল লেখাটা পাঠান।

এইভাবেই নতুন নতুন লেখক উঠে আসবেন। শিলাদিত্য হবে সত্যিকারের প্রতিভাবান লেখকদের মঞ্চ। তবে আপনারাও যত্নশীল হোন। যে কোনো লেখাই পাঠিয়ে দেবেন না। পাঠান, আপনার সেরা লেখাটি। □

আপনি ও গ্রহচক্র

অকটোবর

মেষ

ছোটখাট অসুস্থতা বেশ নাকাল করতে পারে। মাসের মাঝামাঝি বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। মেয়েদের রক্তাল্পতায় ভোগবার আশংকা। অল্প বয়সীদের কোনো আঘাত সাময়িক পঙ্গু করতে পারে।

আর্থিক ব্যাপারে আগের কোনো যোগাযোগ ভেস্তে যাবে। মাসের মাঝামাঝি আর্থিক টানাপোড়েন বেশ প্রকট হয়ে উঠবে; কিছু ঋণ হতে পারে। মেয়েদের জমানো টাকায় হাত পড়বে।

পারিবারিক ক্ষেত্রে কোনো কোনো ব্যাপারে বিশেষ সংযমের প্রয়োজন হবে। কোনো ভাই-বোনের সঙ্গে মন কষাকষি। বাড়ি-ঘর বদলির ব্যাপারে নতুন কোনো সমস্যা। মেয়েদের কোনো বন্ধুর পরামর্শে লাভ ও ক্ষতি দুই-ই হতে পারে। অল্পবয়সীদের কোনো ঘটনা মনকে বিশেষ বিচলিত করবে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো সন্তানকে কেন্দ্র করে নতুন অশান্তি। অবিবাহিতদের প্রেম-প্রণয় ব্যাপারে নতুন ঝামেলা ও অশান্তি।

কর্মস্থলে সারাটা মাস শত্রুরা কখনও গোপনে কখনও খোলাখুলি তৎপর হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংযম ও ধৈর্যের প্রয়োজন হবে। মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে সুনাম বাড়বে এবং কোনো গুণের বিশেষ স্বীকৃতি।

গোপন পথে কিছু আয় বাড়তে পারে। মেয়েদের আয় বাড়াবার প্রচেষ্টায় আংশিক সাফল্য। ব্যবসায়ীদের নতুন বিনিয়োগে ক্ষতি হবার আশংকা।

বৃষ

পেটের কোনো রোগ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। মাসের মাঝামাঝি নতুন কোনো উপসর্গ অবস্থাকে ঘোরাল করতে পারে। মেয়েদের শরীর চলনসই হলেও ছোট-খাট অসুস্থতা লেগে থাকবার সম্ভাবনা। অল্পবয়সীদের নাক-কান-গলার কোনো রোগ ভোগাবে।

আর্থিক ক্ষেত্র খুব একটা আশাপ্রদ নয়। কিছু যোগাযোগ ভেস্তে যাবে। ব্যয়ের চাপ অল্পবিস্তর মাস জুড়েই চলবে। মেয়েদেরও আর্থিক টানাটানি খানিকটা নাকাল করবে।

পারিবারিক ক্ষেত্রে আগের কোনো জটিলতার উপরে আলোকপাত। মেয়েদের ঘনিষ্ঠ কোনো আপনজনের সংবাদ বিশেষ বিচলিত করবে। লেনদেন ব্যাপারে মেয়েদের ভালোরকম ক্ষতি। অল্পবয়সীদের কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা বিশেষ উপকৃত হবার সম্ভাবনা। জমি-জমা ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে অনেকদূর এগোনো সম্ভব। বয়স্কদের দূরের কোনো সংবাদ বিশেষ উৎসাহিত করবে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অতীতের কোনো ভুল বোঝাবুঝির অবসান। কোনো সন্তানের স্বাস্থ্য দুশ্চিন্তায় ফেলবে। অবিবাহিতদের আগের কোনো যোগাযোগ ভেঙে যেতে পারে।

কর্মক্ষেত্রে নিজের আদর্শ অনুযায়ী চলবার পথে বাধা। কোনো সহকর্মীর প্রস্তাব ভেবে চিন্তে গ্রহণ করা প্রয়োজন। মেয়েদের কর্মস্থলে কোনো কোনো ব্যাপারে তৎপর না হলে ক্ষতি হতে পারে।
ব্যবসায়ীদের বড় ধরনের ক্ষতির আশংকা।

মিথুন

ভালোমন্দয় মিলিয়ে চলবে শরীর। পুরনো কোনো রোগ অবহেলায় নয়। মেয়েদের কোনো ব্যথা-বেদনায় সাময়িক পঙ্গু হবার আশংকা। অল্পবয়সীদের ছোটখাট অস্ত্রোপচার হতে পারে।

আর্থিক ব্যাপারে অতীত কোনো প্রচেষ্টায় আংশিক সাফল্য। ব্যয়ের চাপের দরুণ খুব একটা সচ্ছলতা আশা করা যায় না। মেয়েদের ঋণ।
ভাইয়ের স্বাস্থ্য দুশ্চিন্তায় ফেলবে। মেয়েদের কোনো বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্য, বিচ্ছেদের সম্ভাবনা।

স্বামী-স্ত্রীর কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বিশেষ সমঝোতা ও মিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্ত্রীর একক প্রচেষ্টায় আর্থিক লাভ। অবিবাহিতদের কোনো যোগাযোগকে কেন্দ্র করে মতের অমিল ও অশান্তি। মেয়েদের প্রেম-প্রণয় ব্যাপারে ঝামেলা।

কর্মক্ষেত্রে দূর-যাত্রা ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হাসিল। মেয়েদের কর্মস্থলে বিভাগীয় রাজনীতি মনকে বিক্ষিপ্ত করবে। অন্যের মতে ঝটতি সায় দেয়া ঠিক হবে না। কর্মপ্রার্থীদের সময় প্রতিকূল।

আয় বাড়বে ধীরে ধীরে। মেয়েদের একসঙ্গে কিছু অর্থপ্রাপ্তি। ব্যবসায়ীদের ঢিমে তালে চলবে তবে মাসের মাঝামাঝি বকেয়া আদায়ের সম্ভাবনা।

কর্কট

শরীর নিয়ে সামান্য ভোগান্তি। মেয়েদের পুরনো কোনো রোগ বাড়বার আশংকা। অল্পবয়সীদের আঘাত থেকে বিপত্তি।

আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন সমস্যা। পুরনো কোনো ঋণ শোধ হতে পারে। মেয়েদের আর্থিক ব্যাপারে ঝুঁকি নিলে ক্ষতি। সামান্য সঞ্চয় আশা করা যায়।

পারিবারিক ক্ষেত্রে মানসিক দুর্বলতা ও উদ্যমহীনতায় কোনো অভাবনীয় সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। মেয়েদের কারও অশোভন আচরণে ক্ষুব্ধ হবার আশংকা। সন্তানদের অন্যের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা।

কর্মক্ষেত্রে ঢিমে-তালে ভাব কিছুটা ক্ষতি করবে। হিসাব সংক্রান্ত কোনো সমস্যা বেশ জটিল হবে। মেয়েদের কর্মস্থলে অতীত কোনো প্রচেষ্টার সফল রূপায়ণ। কোনো সহকর্মীর ঈর্ষা ব্যথিত করবে। কর্মপ্রার্থীদের আগের কোনো যোগাযোগে অনেক দূর এগনো যাবে।

আয় বাড়বে তবে যথেষ্ট মেহনত করে। লেনদেন কারবারীদের বিশেষ লাভ। মেয়েদের আয় বাড়ানোর প্রচেষ্টায় সহজ সাফল্য। ব্যবসায়ীদের নতুন বিনিয়োগের ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো।

সিংহ

শরীর ভাবিয়ে তুলবে। মেয়েদের কোনো মেয়েলি রোগ বাড়বার আশংকা। অল্পবয়সীদের রক্তাল্পতা বা ব্যথা-বেদনায় কষ্ট পাবার বেশ সম্ভাবনা।

আর্থিক ক্ষেত্রে কোনো নতুন প্রয়াসে সাফল্য; সঞ্চয় হবে তবে ব্যয় বৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব নয়। মেয়েদের ঋণ আর সঞ্চয়ে টান।

পারিবারিক ব্যাপারে নানাভাবে স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। ছোটখাট ব্যাপারকে কেন্দ্র করে মেয়েদের অসম্মান। কোনো ভাই বা বোনের বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা। বয়স্কদের মানসিক চাপ চলবে। কোনো মামলা-মোকদ্দমায় আশানুরূপ ফল লাভের পথে বাধা। অকারণ যুক্তি-তর্কে মেয়েদের কোনো সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। অল্পবয়সীদের কাজে-কর্মে সহজ অগ্রগতি।
মেয়েদের আয় বৃদ্ধির ব্যাপারে অনেকটা নিশ্চিত থাকা যেতে পারে। ব্যবসায়ীদের হঠাৎ বিরাট ক্ষতি বেশ কাবু করবে।

কর্মক্ষেত্রে দূরে কোনো পরিবর্তনের ইংগিত। মেয়েদের কর্মস্থলে নতুন কোনো জটিলতা। কর্মপ্রার্থীদের বর্তমান কোনো প্রচেষ্টায় সাফল্য।

কন্যা

শরীর নিয়ে কিছু অসুবিধে থাকবে। মেয়েদের শারীরিক অসুস্থতার চেয়ে মানসিক অসুস্থতাই কাহিল করবে বেশি। অল্পবয়সীদের পায়ে চোট লাগা বা জখম হওয়ার আশংকা।

আর্থিক ক্ষেত্র আশাপ্রদ। পুরনো কোনো যোগাযোগ ফলপ্রসূ হবে। নানাভাবে সঞ্চয় বাড়বে। মেয়েদের আর্থিক টানাপোড়েন চলবে। কিছু ঋণ ও সঞ্চয় ক্ষীণ হবার সম্ভাবনা।

পারিবারিক ক্ষেত্রে দূরের কোনো আত্মীয় স্বজন বা প্রিয়জনের সান্নিধ্যলাভ। কোনো বন্ধুর জীবন সংশয়। মেয়েদের আগুন থেকে বিপদের আশংকা। কোনো সন্তানের কাজ-কর্ম উদ্বেগের কারণ হবে। মেয়েদের ভ্রমণের ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো।

স্বামী-স্ত্রীর কোনো যৌথ প্রচেষ্টায় সাফল্য ও আর্থিক লাভ। মাসের মাঝামাঝি অবিবাহিতদের আগের কোনো যোগাযোগ ভেঙে যাবার আশংকা। প্রেম-প্রণয় ব্যাপারে মেয়েদের অশান্তি ও ঝামেলা।

কর্মস্থলে ঊর্ধ্বতন কারও সঙ্গে মতের অমিল ও অগ্রগতিতে বাধা। মেয়েদের কর্মস্থলে মোটামুটি স্থিতাবস্থা চলবে।

তুলা

মেয়েদের ফোঁড়া বা ব্রণ খানিকটা নাজেহাল করবে। অল্পবয়সীদের এ মাসের শেষ সপ্তাহে পেট সংক্রান্ত গোলযোগ।

আর্থিক ব্যাপারে হতাশা। ব্যয় বাড়বে। কিছু ঋণ হবারও আশংকা। মেয়েদের আর্থিক ব্যাপারে অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকা যাবে। সঞ্চয় বাড়তে পারে।

পারিবারিক ক্ষেত্রে নানান কাজে নিকট-জনের সহায়তা লাভ। মেয়েরা কোনো প্রতিজ্ঞা রাখতে সমর্থ হবেন। বয়স্কদের বিশেষ কোনো চিন্তাধারার সুষ্ঠু বাস্তব রূপায়ণ। কোনো ভাইয়ের কাছ থেকে দীর্ঘদিন পরে ন্যায্য কোনো পাওনা পাওয়া যাবে। অল্পবয়সীদের বিশেষ কোনো দ্রব্য হারাবে কিন্তু শেষে তা পাওয়া যাবে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ কোনো ব্যাপারকে কেন্দ্র করে অশান্তি। অবিবাহিতদের কোনো ভালো যোগাযোগ মাসের শেষাশেষি।

[illegible] বাড়ানোর প্রচেষ্টা পণ্ডশ্রমেরই নামান্তর। মেয়েদের আয় বাড়াবার প্রচেষ্টায় আংশিক সাফল্য। ব্যবসায়ীদের মন্দা দীর্ঘ-স্থায়ী হতে পারে।

বৃশ্চিক

শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। মাসের মাঝামাঝি মেয়েদের কোনো বড় ধরনের অস্ত্রোপচারের আশংকা। অল্পবয়সীদের ছোটখাট অসুস্থতা লেগে থাকতে পারে।

আর্থিক অবস্থার সামান্য পরিবর্তন ; সামান্য সঞ্চয় হতে পারে। মেয়েদের আর্থিক ব্যাপারে বিব্রত হবার আশংকা ; সঞ্চয়ে হাত পড়বে।

পারিবারিক ক্ষেত্রে সামান্য কোনো ব্যাপারে আত্মীয় বিরোধ। মেয়েদের কোনো বিশেষ আশা ফলবতী হবে। সন্তানদের কারও কর্মে সাফল্য ও সুনাম। দূর ভ্রমণে বিপদ। বয়স্কদের দূরের কোনো সংবাদ উৎসাহিত করবে।

কর্মস্থলে অতীতের কোনো ভুলের জন্য পরিস্থিতি জটিল হতে পারে। মেয়েদের কোনো অতিরিক্ত দায়িত্ব ও সম্মান। কর্ম-প্রার্থীদের হঠাৎ কোনো সুযোগ আসতে পারে।

আয় বাড়াবার সুযোগ সীমিত। মেয়েদের সামান্য আয় বৃদ্ধি। ব্যবসায়ীদের নতুন বিনিয়োগে ঝুঁকি।

ধনু

শরীর মোটামুটি চলবে। মেয়েদের ছোটখাট আঘাত। অল্পবয়সীদের ফোঁড়ায় বেশ কষ্ট পাবার সম্ভাবনা।

আর্থিক অবস্থা কিছুটা সহজ হবে। আগের কোনো ঋণ শোধ। মেয়েদের কোনো বকেয়া অর্থপ্রাপ্তি। পারিবারিক ক্ষেত্রে দূরের কোনো আত্মীয়ের প্রস্তাবে কার্যসিদ্ধি। মেয়েদের কোনো অপবাদের আশংকা। কোনো বন্ধুর দুরভিসন্ধি সম্পর্কে সাবধান। জমিজমা ক্রয় ব্যাপারে নতুন কোনো সমস্যা অগ্রগতিকে ব্যাহত করবে। কোনো ভাই-বোনের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বিশেষ সমঝোতার ইংগিত।

মেয়েদের কর্মস্থলে নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকা প্রয়োজন হবে। মাসের মাঝামাঝি সময় অনুকূল হবার সম্ভাবনা। কর্মপ্রার্থীদের কোনো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে।

আয় বাড়বে নানা ভাবে। মেয়েদের আয়ের পথ সুগম হবে। ব্যবসায়ীদের বিশেষ ইংগিত।

মকর

শরীর উৎপাতসূচক। অম্বলের রোগ জটিল হতে পারে। মেয়েদের চোখ বা কান সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। অল্পবয়সীদের কোনোরকম আঘাত লাগতে পারে।

আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ, ফলে সঞ্চয় বাড়বে। মেয়েদের নানান ঝামেলায় ব্যয় বাড়বে। হঠাৎ কিছু ঋণও হতে পারে।

পারিবারিক ক্ষেত্রে কোনো সম্পত্তিগত বিরোধ তুঙ্গে উঠবে। কোনো আত্মীয়-স্বজনের আচরণ বিশেষ ব্যথিত করবে। মেয়েদের কোনো বান্ধবীর সঙ্গে মনান্তর। বয়স্কদের আইন সংক্রান্ত কোনো ঝামেলা বিব্রত করবে।

স্বামী-স্ত্রীর কোনো যৌথ প্রচেষ্টায় অনায়াস সাফল্য। অবিবাহিতাদের হঠাৎ কোনো ভালো যোগাযোগ। প্রেম প্রণয় ব্যাপারে হতাশা ও অশান্তি।

কর্মস্থলে নির্ধারিত কর্মসূচীতে বাধা। মাসের মাঝামাঝি কোনো নতুন যোগাযোগ ও পরিবর্তনের ইংগিত। মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কোনো সিদ্ধান্ত স্বীয় অনুকূলে যাবে। কর্মপ্রার্থীদের কোনো প্রিয়জন সাহায্য করবে।

আয় বাড়তে পারে নানান সূত্রে। ফাটকা লেনদেন কারবারে অধিক লাভ। মেয়েদের আয় বাড়াবার ব্যাপারে ঝামেলা। ব্যবসায়ী-দের সাময়িক মন্দা।

কুম্ভ

ভালো-মন্দয় মিলিয়ে চলবে শরীর। মেয়েদের হঠাৎ কোনো অস্ত্রোপচার হতে পারে। অল্পবয়সীদের শরীর মোটামুটি চলবে।

আর্থিক ব্যাপারে নতুন যোগাযোগ ফলপ্রসূ হবে। তাহলেও ব্যয়ভার বেশ গুরুভার হবার আশংকা। মেয়েদের সহজ সঞ্চয়।

পারিবারিক ক্ষেত্রে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকা প্রয়োজন হবে। কোনো শরিকী মামলার নিষ্পত্তি। মেয়েদের দূর ভ্রমণ ও লাভ। সন্তানদের সঙ্গে কোনো ব্যাপারে মনোমালিন্য জনিত কারণে অশান্তি। বয়স্কদের আকস্মিক ক্ষতি :

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি। মাসের মাঝামাঝি অবিবাহিতদের বিবাহ ব্যাপারে নতুন যোগাযোগ।

কর্মক্ষেত্রে তুচ্ছ কোনো ব্যাপারে মতান্তর। মাসের মাঝামাঝি কর্মের কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা। মেয়েদের কর্মস্থলে ক্ষেত্রবিশেষে নিজের মতাদর্শে দৃঢ় হতে হবে। কোনো সহকর্মীর জন্য উদ্বেগ। কর্মপ্রার্থীদের দূরের কোনো যোগাযোগ ফলপ্রসূ হবে।

আয় বাড়তে পারে অল্প-স্বল্প। মেয়েদের আয় বৃদ্ধির প্রবাহ চলবে। ব্যবসায়ীদের হঠাৎ মন্দা ও ক্ষতি।

মীন

গলার কোনো রোগ বেশ ভোগাতে পারে। মাসের মাঝামাঝি মেয়েদের পেট সংক্রান্ত কোনো গোলমালে পড়তে হবে। অল্পবয়সী-দের শরীর নিয়ে সামান্য ঝঞ্ঝাট।

আর্থিক ব্যাপারে ব্যর্থতা ও হতাশা। নানাদিক থেকে ব্যয়ের চাপ আসবে। মেয়েদের আয় ব্যয়ে সমতা রাখা মুশকিল। ভালোমত ঋণ হবার আশংকা।

পারিবারিক ক্ষেত্রে কোনো অর্থনৈতিক সংকট তীব্র হবে। কোনো সহৃদয় বন্ধুর সাহায্য পাওয়া যাবে নানা ভাবে। মেয়েদের কোনো গোপন ব্যাপার ফাঁস হয়ে যাবার জন্য অশান্তি। কোনো প্রিয়জন বিয়োগের আশংকা। সন্তানদের কারও কর্মের পরিবর্তন। গৃহাদি পরিবর্তন বা সংস্কার হতে পারে।

স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের শরীর নিয়ে অশান্তি। অবিবাহিতদের কোনো যোগাযোগ ভেঙে যেতে পারে।

কর্মস্থলে সময় আগের চেয়ে অনুকূল। আগের কোনো সমস্যার জট খুলতে পারে। মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে কোনো সহকর্মীর পরামর্শে লাভ। কর্মপ্রার্থীদের কোনো যোগাযোগ ফলপ্রসূ হতে অহেতুক দেরি।

সামান্য আয় বাড়বে। মেয়েদের আয় বাড়াবার সুযোগ কিছুটা হাতছাড়া হবে। ব্যবসায়ীদের সময় প্রতিকূল ও মন্দা।

বরাহমিহির

মুদ্রাকর ও প্রকাশক অরুণকুমার পাল কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড প্রেস, ৭৬/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩ (ফোন ২৪-৫৫২০), থেকে মুদ্রিত

The new edition

INDIA SOCCER ANNUAL 1981

Fascinating feature articles :
SURAJIT SENGUPTA salutes Habib, the man of principle : A.T.P. SARATHY follows the career of AIFF president Ziauddin : CHUNI GOSWAMI's intimate portrait of Jarnail Singh : SUKUMAR SAMAJPATI reviews the Calcutta League : BRIAN GLANVILLE's picture of Italian club rivalries —and much else
Tournament reviews—Championship rolls—Plenty of photographs, in colour and black & white

Price Rs. 6.00

ITYADI PRAKASANI (PVT.) LTD, 47 Biplabi Anukul Chandra Street, Calcutta 700 072

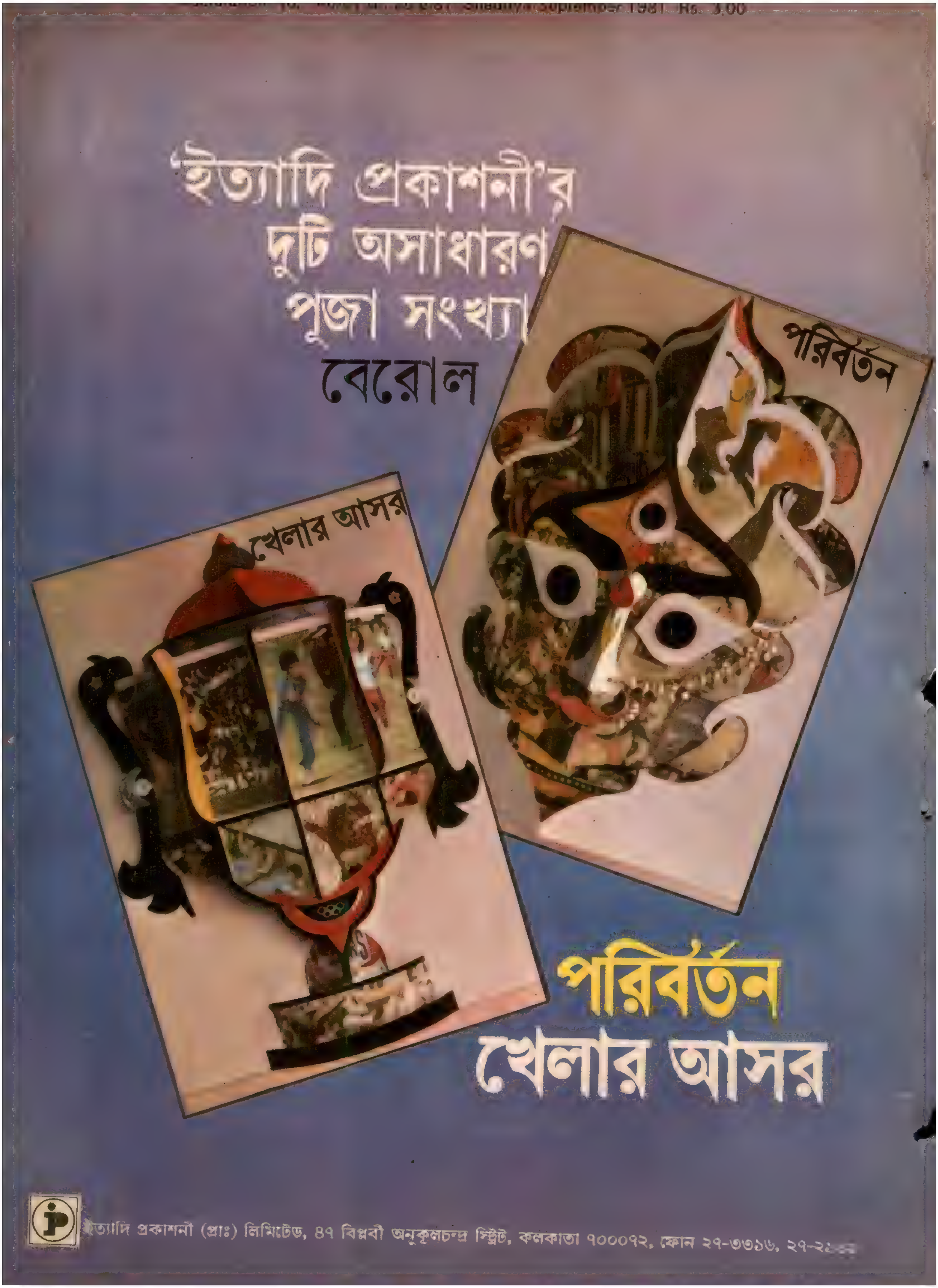
'ইত্যাদি প্রকাশনী'র
দুটি অসাধারণ
পূজা সংখ্যা
বেরোল
পরিবর্তন
খেলার আসর
পরিবর্তন
খেলার আসর
ইত্যাদি প্রকাশনী (প্রাঃ) লিমিটেড, ৪৭ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২, ফোন ২৭-৩৩১৬, ২৭-২

শিলাদিত্য

সবার মুখে হাসি দেখতে আমাদের ভাল লাগে

আজ যারা পড়াশুনা করছে বড় হয়ে সবাই চাইবে রোজগার করতে

আমরা প্রত্যেকের জন্যই সে ব্যবস্থা করতে পারব না। কিন্তু জনসাধারণের আমাদের উপর যে আস্থা আছে, তাকে পাথেয় করে নিশ্চয়ই বেশ কয়েক লক্ষ ভাইবোনের দিকে আমরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারবো।

(স্থাপিত ১৯৩২)

দি পিয়ারলেস জেনারেল ফাইনান্স এণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোং লিঃ

রেজিস্টার্ড অফিস : **পিয়ারলেস ভবন**, ৩, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯

মোট সম্পদের পরিমাণ ১৫০ কোটি টাকার উর্দ্ধে

P/1A—81 Ben

সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা **শিলাদিত্য** নবপর্যায় প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা অক্টোবর ১৯৮৯

সম্পাদকীয়

অশীতিপর ভাষাচার্য এবছর এক দশহাজারী সাহিত্য পুরস্কার পেয়ে বলেছেন : টাকাটা তাঁর খুব দরকার ছিল। সারাজীবন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। এখন পেনসনটুকুও পান না। কী দেশ আমাদের!

গল্প কবিতা উপন্যাস ইত্যাদি মৌলিক রচনার স্রষ্টারা মোটা টাকার সাহিত্য পুরস্কার পান তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যাঁরা ইতিহাসবেত্তা বা ছান্দসিক, ভাষাতাত্ত্বিক বা বৈয়াকরণ তাঁরা কী অপরাধ করেছেন? সমাজ সংস্কৃতিতে এঁদের স্থায়ী ও স্মরণীয় অবদান কি উপেক্ষণীয়?

যাঁরা সারাজীবন ধরে তৈরি করছেন পরিভাষা কিংবা অভিধান, যাঁরা তাঁদের সমগ্র সৃষ্টিশীলতা লাগাচ্ছেন বিদেশী ভাষার অনুবাদব্রতে, যাঁরা বিজ্ঞানকে মাতৃভাষায় করছেন সহজবোধ্য, যাঁরা গ্রামগঞ্জ ঘুঁড়ে সংগ্রহ করছেন দুষ্প্রাপ্য পুঁথি ও গান তাঁদের কি কোনো পুরস্কারই প্রাপ্য নয়? এমন দিন কি আসতে পারে যখন আমরা দেখব বিখ্যাত কোনো গ্রন্থ বা পত্রিকা সম্পাদক তাঁর কৃতির জন্য পুরস্কৃত হলেন?

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদশিল্পী : নিতাই ঘোষ

৫

কোলরিজ, ডিকোয়েনসী, বোদল্যার, এডগার অ্যালেন পো থেকে একালের হাকসলি এবং হালফিলের গীনসবার্গ সকলেই কোন না কোন মাদকদ্রব্যে আসক্ত। বাংলা ভাষায় এই প্রথম ড্রাগ সাহিত্যের উপর আলোচনা করেছেন তরুণ লেখক অতনু রায়।

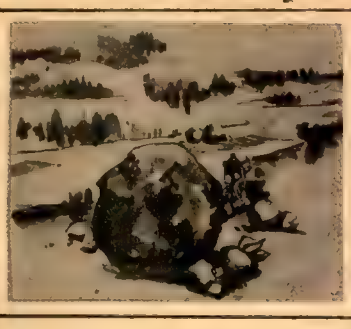

১১

তিন বিবাহিত যুবক জীবন ও শিল্প জিজ্ঞাসার কোন এক অমোঘ টানা-পোড়েনে নিজেদের বৃত্তের বাইরে চলে আসে অনাস্বাদিত পাপবোধের আকর্ষণে। কিন্তু তারপর? 'পলায়ন' উপন্যাসে দেবদাস আচার্য এই প্রশ্নের এক দুঃসাহসিক বলয় উন্মোচন করেছেন।

৫২

যিনি বাঙালী জাতির খণ্ডিত সত্তাকে বার বার অস্বীকার করেছেন সাহিত্যে। ছড়ার আপাতসারল্যে যাঁর অনায়াস গতিবিধি। গান্ধীবাদী হয়েও যিনি কমিউনিসটদের সম্পর্কে সহিষ্ণু। সেই বিরল ব্যক্তিত্ব সাহিত্যিক ও চিন্তাশিল্পী অন্নদাশঙ্কর রায়ের সাক্ষাৎকার : সুমিত মজুমদার।

৪২

ধর্ষিতা এক নারী ও আদালতের বিচার প্রহসনের এক মানবিক সংকট উদভাসিত হয়েছে তপন সিংহের নতুন ছবি 'আদালত ও একটি মেয়ে' চলচ্চিত্রে। চিত্রনাট্যের নির্বাচিত অংশ ও বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের আলোকচিত্র।

পাঠকের চিঠি/২
কবিতা/হরপ্রসাদ মিত্র, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, অমিতাভ দাশগুপ্ত, সুশান্ত বসু/৪
যাঁরা জানতে চান/সনৎকুমার গুপ্ত/৩৬
প্রতিবেশী গল্প/দুই বোন/উমাশঙ্কর যোশী/
অনুবাদ : শিবকুমার যোশী/৩৮
বাংলা পুঁথির জগৎ : এক অন্য অভিজ্ঞতা/তুষারকান্তি মহাপাত্র/৪০
হাসির গল্প/খুদে অক্ষরে যা ছিল/হিমানীশ গোস্বামী/৪৭
নোবেল প্রাইজের লেখক/কিপলিং/ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী/৫০
বিশিষ্ট বাঙালী কবি ও নির্বাচিত কবিতা/প্রেমেন্দ্র মিত্র/৫৭
সাহিত্য বিতর্ক/বঙ্কিমচন্দ্র কি ইসলাম বিরোধী ছিলেন/মযহারুল ইসলাম, মমতাজ হোসেন/৫৯
কবিতা/কৃষ্ণা বসু, পরিমল চক্রবর্তী, দীপায়ন নন্দী/৬২
জলপাইহাটি/জীবনানন্দ দাশ/৬৩
বাংলাদেশের সাহিত্য/কেনাকাটার সম্পর্কে/সৈয়দ শামসুল হক/৭১
কৌতুকী/৭২
গল্প/প্রতিকৃতি/সীতা/অরুণ মুখোপাধ্যায়/৭৩
পুরনো বই : নতুন পাঠক/অসাধু সিদ্ধার্থ/স্বপন সরকার/৭৪
সাম্প্রতিক বই/সৌরীন ভট্টাচার্য, দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়/৭৬
লিটল ম্যাগাজিনের পাতা/রৌরব /৭৮
সাহিত্য ধাঁধা/৮০

প্রতিসংখ্যা সাড়ে তিন টাকা
বিমান মাশুল পূর্বাঞ্চলে ৩০ পয়সা
ভারতের অন্যান্য স্থানে ৪০ পয়সা

সম্পাদক : অশোক চৌধুরী

শিল্প-নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

পাঠকের চিঠি

'বাংলামঞ্চের শেষ নবাব' প্রসঙ্গে ঃ প্রতিবাদ

শিলাদিত্যে (আগস্ট, ১৯৮১) প্রকাশিত অমিতাভ দাশগুপ্তর 'বাংলা মঞ্চের শেষ নবাব' নামীয় ঐতিহাসিক দলিলের মতো তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধে 'বাংলা রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্র নাটকাভিনয়' সম্বন্ধে অগভীর মন্তব্য করা হয়েছে। লেখক বলেছেন 'ঐ মহান লেখকের নাট্যপ্রতিভার সঙ্গে বাংলা রঙ্গমঞ্চের সম্পর্ক সাধারণভাবে ঘনিষ্ঠতায় বাঁধা পড়েনি।' ঘনিষ্ঠতায় বাঁধা পড়া ব্যাপারটি ঠিক কি বোঝায় তা জানি না, তবে ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয় যেন উনবিংশ শতকের শেষ দুই দশক এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাটক অবহেলিত তো ছিলই না বরং রীতিমতো সমাদৃত ছিল। অধিকন্তু রবীন্দ্র-নাটকের প্রযোজনার সূত্র ধরে স্বয়ং কবি, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথ সরাসরি বাংলামঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, রাতারাতি গান লিখে সুর দিয়ে শিল্পীকে শিখিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ নিজে, হারমোনিয়মের রিড টিপে গান শিখিয়েছেন দিনেন্দ্রনাথ আর গগনেন্দ্রনাথ মালকোঁচা মেরে দৃশ্যপট আঁকতে লেগেছিলেন। একাধিক মঞ্চে পাল্লা দিয়ে রবীন্দ্রনাটক অভিনীত হচ্ছে, নানারকম রবীন্দ্র অবদান একত্রিত করে অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'রবীন্দ্র রজনী'; মঞ্চের দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ দ্রুত নাটক লিখে দিচ্ছেন, রাতের পর রাত পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে রবীন্দ্রনাটক অভিনয় হয়ে চলেছে—এসব যদি ঐতিহাসিক সত্য হয়, তবে কি বলা যায় রবীন্দ্রপ্রতিভা ঘনিষ্ঠতায় বাঁধা পড়েনি? আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে তথ্য উপস্থিত করছি।

১৮৭২ সালে বাংলা রঙ্গমঞ্চের দ্বার সাধারণের জন্য উন্মোচিত হলো। রবীন্দ্রনাথ তখন এগার বার বছরের বালক। এজন্য বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রথম দশ পনের বছর রবীন্দ্র-নাটকাভিনয় হয়নি। রাম না জন্মাতে রামায়ণ রচিত হলেও হতে পারে, নাটক লেখা না হলে নাটকাভিনয় সম্ভব নয়। আবার প্রচলিত নাট্যধারা থেকে খুব দূরের কোনো রীতির নাটক প্রযোজনা করে ঘটি বাটি বিক্রি করে 'দেউলে' সাজবার আকাঙ্ক্ষা না থাকাও মঞ্চ-মালিক বা স্বত্বাধিকারির পক্ষে অসম্ভব নয়। এজন্য বাল্মীকিপ্রতিভা (১৮৮১), রুদ্রচণ্ড (১৮৮১) বা কালমৃগয়া (১৮৮২) বাংলা রঙ্গমঞ্চে প্রথম যুগে অভিনীত হয়নি। ১৮৮৬ সালে কেদার চৌধুরী 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে' রবীন্দ্রনাথকে প্রথম বরণ করে আনলেন 'বৌঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩) উপন্যাসকে 'রাজা বসন্ত রায়' নামে নাট্যরূপ দিয়ে। গ্রন্থ প্রকাশের পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে নাট্যরূপারোপ ব্যাপারটি লক্ষ্য করবার মতো। 'রাজা ও রানী' নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ সালের আগস্টে, আর 'এমারেল্ড' মঞ্চে তা অভিনীত হয় ১৮৯০ এর জুন মাসে—এক বছরের মধ্যে। দুটি নাট্য-প্রযোজনাই ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করেছিল। ১৮৯২ সালের আগস্ট সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হয়ে ঐ বছরের শেষ দিকেই সাধারণ মঞ্চে 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনীত হয়েছিল বলে এক সংবাদ আছে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' নামক গ্রন্থে।

এমারেল্ড থিয়েটার ১৮৯৫ সালের ২ জানুয়ারি 'রাজা বসন্ত রায়'কে নব পর্যায়ে মঞ্চস্থ করে এবং জুন মাস পর্যন্ত একটানা নিয়মিত অভিনয় করে চলে। ঐ এপ্রিল থেকে এর সহনাটিকা হিসাবে 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' নামক ব্যঙ্গ নাটিকাটি অভিনীত হতে থাকে 'দুকড়ি দত্ত' নামে।

১৮৯৭ সালে 'এমারেল্ড' মঞ্চে ক্লাসিক থিয়েটারের অভিনয় শুরু করেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি একান্ত রবীন্দ্রানুরাগী ছিলেন। তিনি বহু রবীন্দ্র-নাটক মঞ্চস্থ করেন, রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্প ও উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন। 'দালিয়া' গল্প অবলম্বনে 'জীবনে মরণে' নামে যে নাটক তিনি রচনা করেন, তা রবীন্দ্রনাথের সম্মতিক্রমে অমরেন্দ্র দত্তের নামে মুদ্রিত হয়। নীচে তাঁর প্রযোজিত রবীন্দ্র নাটক ও নাট্যরূপ মঞ্চাবতারণের তালিকা দেওয়া হলো।

'চোখের বালি' (১৯০৪, ২৬ নভেম্বর); 'গোড়ায় গলদ' (১৯১০, ৯ জানুয়ারি); 'মুক্তির উপায়' অবলম্বনে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'দশচক্র' (১৯১০, ২৬ ফেব্রুয়ারি); 'জীবনে মরণে' (দালিয়ার নাট্যরূপ, ১৯১১, ১৭ জুন) ; 'রাজা ও রানী' (১৯১২, ১৮ মে) ; 'বিনি পয়সার ভোজ' (১৯১২, ১০ অক্টোবর) ; 'বিদায় অভিশাপ' (১৯১৩, ৯ আগস্ট) ; 'অভিমানিনী' (শাস্তি গল্পের নাট্যরূপ, ১৯১৪, ১৩ জুন) ; 'অকলঙ্ক শশী' (দিদি গল্পের নাট্যরূপ দেন রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯১৪, ৩১ অক্টোবর)।

এই কালের নাট্য-প্রযোজক ও পরিচালকদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল সাধারণভাবে রবীন্দ্র-নাটকের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। ফলে যেসব মঞ্চে তাঁদের মালিকানা বা মতামতের গুরুত্ব ছিল, সেসব মঞ্চে রবীন্দ্র-নাটক মঞ্চস্থ হয়নি। একে বাংলা রঙ্গমঞ্চের রবীন্দ্র নাটকের প্রতি সাধারণ অনীহা বলে গ্রহণ করলে ভুল হবে।

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় স্টার মঞ্চে 'আর্ট থিয়েটার' অভিনয় শুরু করলে রবীন্দ্র-চর্চার জোয়ার বয়ে যায়। ১৯২৩ সালের ৩০ জুন 'কর্ণার্জুন' দিয়ে আর্টের জয়যাত্রা শুরু হলেও ঐ সালেরই ২৯ আগস্ট থেকে রবীন্দ্র-নাটকাভিনয়ও শুরু হলো। আর্টের প্রথম রবীন্দ্র-নাটক 'রাজা ও রানী'। এই অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য ছিল কাল ও স্থানিক বিশেষত্ব অনুযায়ী পোশাক ও দৃশ্য-পট রচনা। ঐ কালের সব পত্র-পত্রিকায়ই এ ব্যাপারে আর্টকে তারিফ জানিয়েছে। ঐ সালের 'শিশির' পত্রিকার আগস্ট সংখ্যা থেকে একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি '…বহু বৎসর পূর্বেকার কাশ্মীর যেন চোখের সম্মুখে ভাসিতেছিল। কাশ্মীরের দৃশ্য বলিয়া বাঙ্গালার ঘর বাড়ির দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে নাই……।' অহীন্দ্রবাবু লিখেছেন, এই পোশাক ও পরিবেশকে স্থান-কালানুগ করতে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ঐতিহাসিক শুধু পরামর্শই দেননি, স্বয়ং পাগড়ী বেঁধে দিয়ে কাশ্মীরী রীতিটির যাথার্থ্য বজায় রেখেছেন।

শোনা যায় 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'কে 'চিরকুমার সভা'য় পরিণত করে তাকে মঞ্চস্থ করার দায় শিশিরকুমারের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু শিশিরকুমার অক্ষয় চরিত্রের জন্য গায়ক-অভিনেতা সংগ্রহ করতে না পেরে সে দায় ত্যাগ করেন। তখন 'আর্ট থিয়েটার' এ নাটক মঞ্চস্থ করে। এই সূত্রে ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে আর্ট-মঞ্চের সম্পর্ক গাঢ় হয়। এর গান শেখাতে আসতেন দিনেন্দ্রনাথ, দৃশ্যপটাদির তদারক করতে আসতেন গগনেন্দ্রনাথ। আর্টের আন্তরিকতা ও শিল্পনিষ্ঠায় এঁরা ক্রমে দূরত্ব ত্যাগ করে এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন। দিনেন্দ্রনাথ উঠে এসে হারমোনিয়ম ধরে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশেষত্ব ফুটিয়ে তোলেন শিল্পীদের কণ্ঠে, গগনেন্দ্রনাথ মালকোঁচা মেরে লেগে যান দৃশ্যপট আঁকতে। ১৯২৫ সালে এ নাটক প্রথম মঞ্চস্থ হলো ১৮ জুলাই। ২৫ জুলাই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দেখতে এলেন। (যতদূর জানি, নিজের নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয় সেই প্রথম দেখতে এলেন কবি)। অভিভূত কবি অপরেশচন্দ্রকে 'রসিকবাবু' নাম দেন। এই অনুপ্রেরণায় আর্টের মঞ্চে রবীন্দ্রচর্চার ধুম পড়ে যায়।

খুশী হয়ে রবীন্দ্রনাথ এঁদের জন্য 'শেষ রাত্রি' গল্পটির নাট্যরূপ দিলেন 'গৃহপ্রবেশ' নামে। ঐ বছরেই ৫ ডিসেম্বর 'সে' নাটক মঞ্চস্থ হলো। এই নাটকের মঞ্চ-পরিকল্পনা, অভিনয়, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্পর্কে সে কালের পত্রপত্রিকায় যেসব আলোচনা ও পত্রাদি প্রকাশিত হয়েছে, তা পড়লে মনে হয়, এই নাট্য-প্রযোজনা বাংলা অভিনয়—ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। সেটা স্থানান্তরে আলোচনার বিষয়। তবে এ নাটকও ১৯

ডিসেম্বর দেখতে এলেন কবি। নীহারবালার গান শুনে কবি এত খুশী হলেন যে, রাতারাতি আরও দুটি গান লিখে সুর-সংযোজন করে নীহারবালাকে শেখান হলো। নীহারবালা কবির এই অযাচিত অনুগ্রহে বিগলিত হয়ে একদিনের মধ্যে সবটা আয়ত্ত করে পরবর্তী রাতেই নূতন অংশ উপহার দিলেন দর্শকদের।

পরবর্তী বছরে আর্ট থিয়েটার 'বশীকরণ' (১০ জানুয়ারী) এবং 'বিদায় অভিশাপ' (১৬ এপ্রিল) মঞ্চস্থ করলে কবি দেখতে এলেন। 'কর্মফল' গল্পের কবিকৃত নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হলো ২৩ জুলাই, ১৯২৬। কবি পরের বছর ২ ফেব্রুয়ারী 'সে' নাটক দেখতে এলেন।

এ বছরটা যেন বাংলা নাট্যমঞ্চে রবীন্দ্র-চর্চারই জোয়ার। শিশিরকুমার নাট্যমন্দিরের উদ্বোধন করলেন 'বিসর্জন' নাটক দিয়ে। ফলত, ঐ এক বছরে চারটি পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্র নাটক প্রযোজিত হল। মনে রাখতে হবে এর মধ্যে মধ্যে 'চিরকুমার সভা' এবং 'রাজা ও রানী' অভিনয় হয়েই চলেছে। আর্ট থিয়েটার মাঝে মাঝে 'রবীন্দ্র রজনী' যাপন করে চলেছে।

১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথ নিজের 'বৌঠাকুরানীর হাট'-এর এক নাট্যরূপ দেন 'পরিত্রাণ' এবং 'গোড়ায় গলদ'-এর নাট্যরূপ 'শেষরক্ষা'। প্রথমটি আর্ট থিয়েটার এবং দ্বিতীয়টি নাট্যমন্দির মঞ্চস্থ করে।

১৯২৯ সালে শিশিরবাবু মঞ্চস্থ করলেন 'তপতী'। প্রবোধ গুহ আর্ট থিয়েটার থেকে বেরিয়ে গিয়ে মনোমোহন মঞ্চে 'মুক্তির উপায়' কে নূতন করে নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চস্থ করালেন। ১৯৩৩ সালে আর্ট থিয়েটার নতুন করে নামায় 'বৈকুণ্ঠের খাতা'।

আর্ট থিয়েটার উঠে গেল। শেষ হলো বাংলা মঞ্চের একটা বিশেষ অধ্যায়। এসময়ে 'টকি'র সর্বগ্রাসী প্রভাব এসে গ্রাস করছে জনপ্রিয়তা। দর্শক কমে যাচ্ছে। তবু দুর্দিনেও বাংলা মঞ্চ ত্যাগ করেনি রবীন্দ্র-নাথকে। ১৯৩৫ সালের ২৮ জুলাই শিশিরবাবু মঞ্চস্থ করেন 'শ্যামা'। নবনাট্য-নিকেতনে নরেশ মিত্র-র নাট্যরূপায়ণে মঞ্চস্থ হলো 'গোরা' পরের বছর। ১৯৩৬ সালের শেষ সপ্তাহে 'যোগাযোগ'এর নাট্যরূপ অভিনীত হলো নাট্যমন্দিরে।

তথ্য বাড়াবার দরকার নেই। উপরের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে নিশ্চয় বোঝা যাবে যে, প্রায় ষাট বছর ধরে বাংলা মঞ্চে রবীন্দ্রনাট্যচর্চা হয়ে এসেছে প্রবল বেগে। বাংলা নাট্য ইতিহাসে এত বড় স্থান জুড়ে নেই অন্য কোনো নাট্যকার। এরপরেও কি মন্তব্য করা যায় যে 'সেকালের মেলোড্রামা, চড়া সুরের নাটক ও ইচ্ছাপূরণের কাহিনী-প্রিয় দর্শকের পক্ষে রবীন্দ্রনাট্যের সূক্ষ্মতা সুকুমার কারুকাজ ও তত্ত্বকে উপলব্ধি করা অসম্ভব ছিল?' রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাটকগুলিকে একালের গ্রুপ থিয়েটারগুলি নতুন আলোতে উদ্ভাসিত ও প্রযোজিত করেছে সন্দেহ নেই, সেকালের দর্শকও রবীন্দ্রনাথকে কম উপভোগ করেনি।

নীরদ হাজরা, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

প্রথম বাংলা নাটক কোনটি?

নবপর্যায় শিলাদিত্য পত্রিকার ২য় সংখ্যা হাতে পেলাম। পত্রিকার এক স্থানে অনুপম ত্রিবেদীর 'প্রথম বাংলা নাটক' শীর্ষক রচনায় ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত 'কুলীনকুলসর্বস্ব'-কে মৌলিক নাটক বলে অভিহিত করা হয়েছে। সন্দেহ নেই, নাটকের প্রধান গুণ অর্থাৎ সমাজ ও জীবনের প্রতিচ্ছবি কুলীনকুলসর্বস্বতেই প্রথম মোটামুটিভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু নাটক কি শুধুই সমাজ ও জীবনের প্রতিচ্ছবি? সার্থক নাটক হতে গেলে আরো যা দরকার তা হলো বাস্তব সংলাপ অর্থাৎ নরনারীর মুখের ভাষা, বাস্তব চরিত্র-চিত্রণ এবং নাটকীয় সংহতি ও গতি। এই দিক দিয়ে বিচার করলে কুলীনকুলসর্বস্বকে প্রথম মৌলিক পূর্ণাঙ্গ নাটক বলা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, সে সম্বন্ধে আলোচনার অবকাশ আছে।

বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলিন্য প্রথার ফলে বাঙ্গালী সমাজের যে নিদারুণ অধোগতি হয়েছিল, উনিশ শতকের মধ্যভাগেও যার প্রকোপ পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত ছিল,—তারই একটি বাস্তব-সম্মত বিবরণ এই নাটকে পাওয়া যায়। তথাপি এর কতকগুলি ত্রুটি আছে। কুলীনকুলসর্বস্বের প্রধান ত্রুটি কাহিনীর ধারা-বাহিকতার অভাব, সুতরাং নাটকীয় সংহতি ও গতির অভাব। কাহিনী বিবৃতিমূলক, ঘটনা সংঘাতবর্জিত। সংলাপ অধিকাংশ স্থলেই অত্যন্ত দীর্ঘ, ভাষা অত্যন্ত আড়ষ্ট। ভীষণ বিরক্তিকর পদ্য – সংলাপই কুলীন-কুলসর্বস্বের নাটকীয় সম্ভাবনা তিরোহিত করেছে। ফুলকুমারীর বঞ্চিত জীবনের ট্রাজেডি দীর্ঘ পদ্য-সংলাপে বিনষ্ট হয়েছে। চরিত্রগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব অনুপস্থিত। কোনো চরিত্রই সুপরিস্ফুট নয়। তাই তৎকালীন সমাজ জীবনের সমস্যামূলক বাস্তব প্রতিচ্ছবি কিছুটা থাকলেও অন্যান্য নাট্যগুণের অভাব থাকায় কুলীনকুলসর্বস্বকে ঠিক নাটক বলা যায় না। একে ব্যঙ্গাত্মক সামাজিক নক্সা বলা যেতে পারে। তবে বাংলা নাটকের শৈশবে যখন কোনো আদর্শ স্থাপিত হয়নি, সেই সময় কুলীনকুলসর্বস্ব রচনা করে রাম-নারায়ণ বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন।

পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক বলতে আমরা যা বুঝি বাংলা সাহিত্যে তার প্রথম নিদর্শন উমেশচন্দ্র মিত্রর 'বিধবা বিবাহ নাটক' (১৮৫৬)। বিধবা বিবাহ নাটকের কাহিনী একটি সুসংবদ্ধ নাট্যরূপ লাভ করেছে। শুধু তাই নয়, এতে পূর্ণাঙ্গ নাটকীয় চরিত্রও সৃষ্ট হয়েছে। এই নাটকের সুলোচনাই বাংলা নাট্য-সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নায়িকা চরিত্র। পূর্ণযৌবনা বালবিধবার জীবনটি লেখক অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কিত করেছেন। বিধবা বিবাহ আইন পাশ হওয়ায় একটি পূর্ণযৌবনা বালবিধবার অবরুদ্ধ কামনা কীভাবে উল্লসিত হয়ে উঠেছে এবং গোপন প্রণয়ে মানব জীবনের প্রবলতম প্রবৃত্তিটির চরিতার্থতায় জীবনকে সফল জ্ঞান করে অনিবার্য দুর্ঘটনার কবলে পড়ে অকালে বিনষ্ট হয়ে গেছে—তার মর্মান্তিক আলেখ্য সার্থক-ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই নাটকের চরিত্রগুলি সবই রক্তমাংসের মানুষ। পারিবারিক এবং সামাজিক চিত্র নিখুঁতভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। সর্বদিক থেকে বিচার করলে বিধবা বিবাহ নাটক একটি উল্লেখযোগ্য নাট্যসৃষ্টি।

শীতলচন্দ্র সরকার, খোশালপুর, হাওড়া।

সাধারণের পত্রিকা হোক

নবপর্যায়ে শিলাদিত্য আমাকে মুগ্ধ করেছে।

লেখক নয় লেখাই আপনাদের বিবেচ্য হয়ে উঠুক। নিরপেক্ষ ও উদারনীতি শিলাদিত্যকে ইত্যাদি প্রকাশনীর অন্য দুটি পত্রিকার মতো জনপ্রিয় করে তুলবে। এবং বাজারের দু-একটি পত্রিকার অহংকারকে চূর্ণ করবে। আপনারা বুঝিয়ে দিচ্ছেন সম্পাদনা মানে রেডিমেড লেখা ছাপানো নয়—বরং অনেক যত্ন, পরিশ্রম ও নিষ্ঠার প্রয়োজন। ক্ষুদ্র সম্পাদকীয়টি বলে দিচ্ছে আপনারা যুগ-সচেতন ও অভিজ্ঞ। আমার অনুরোধ এ যুগের পাঠকদের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ থেকে তারাশঙ্কর পর্যন্ত প্রথমশ্রেণীর গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধগুলি মাঝে মাঝে পত্রস্থ করলে বহু পাঠকের কাছে ঐ লেখাগুলি বেঁচে থাকবে। আজকের তরুণরা অনেক ভাল লেখার নাম শোনেন কিন্তু হাতের কাছে পড়ার সুযোগ পান না। আপনাদের পত্রিকাই একমাত্র মাধ্যম হতে পারে।

শুধু ভাষা নয়, শব্দের কচকচি নয়, মন-প্রাণ স্পর্শ করে এমন গল্প-উপন্যাস ও প্রবন্ধ ছাপুন। সাধারণ মানুষের ভাষায় কথা বলুন এবং অল্প শিক্ষিত বিশাল জনগণের দ্বারে পৌছান। ইন্টেলেকচুয়ালদের জন্য বহু খোরাক আছে এবং তা অসুলভ নয়। সংবাদধর্মী ও ভাষার পাণ্ডিত্যধর্মী সাহিত্য পড়ে কোনো রস পাই না—বরং অনীহা দেখা দিয়েছে। আধুনিক লেখকদের এত নাম-ডাক, এত প্রচার তবুও মনকে স্পর্শ করছে না। ভাল লেখা নিশ্চয়ই আছে, খোঁজ নিন এবং সজাগ হোন অচিরেই ডালি ভরে উঠবে এবং বাংলাসাহিত্য সমৃদ্ধ হবে।

নীলকমল গুহ, ঢাকুরিয়া কালীবাড়ী, উত্তর ২৪ পরগণা

ঘরে

হরপ্রসাদ মিত্র

ঘরের টিকটিকিগুলোর জন্মহার বেড়েছে।
নয়নতারার মাপ ছোটো হয়ে আসছে বারান্দার টবে।
মাহাড়ায় এবার আর থোপা-থোপা ফুল ফুটবে না মনে হয়।
দিনের আয়ু বড়োই ছোটো হয়ে এলো আশ্বিনে।

পশ্চিমের জানলায় সূর্যাস্ত দেখা গেল।
গোলাকার বৃহৎ এক রক্তপ্রবাল যেন।

প্রকৃতির পতঙ্গ সরীসৃপ শ্বাপদ ইত্যাদিও
আমাকে নজরে রেখেছে।
কথাটা এতোই অবিশ্বাস্য যে বলতে দ্বিধা হয়।

কী একটা বোধ খোঁচা দিচ্ছে ভেতরে।
ঘরটা অন্ধকার।
মাথার মধ্যে কখনো আফগানিস্তান,
কখনো সিরিয়া।

গোড়া থেকে চেনা

অমিতাভ দাশগুপ্ত

যে-ছুরি সন্ধ্যার বাঁকে ভ্রূক্ষেপবিহীন
খুন করে একটি যুবক—
তাকে আমি চিনি।

যে-হাত আগুন ছুঁড়ে
বাসবন্দী-রমণীকে
দেয় লাল-মৃত্যু উপহার—
তাকে আমি চিনি।
যে-নলের মুখ থেকে
হঠাৎ গুলির শব্দ
ফুটো করে স্বপ্নের কপাল—
তাকে আমি চিনি।

তার শরীরের প্রতি চণ্ড কোষে, উড়ন্ত রেখায়
জানি, আজও লেগে আছে
আমার মায়ের ঘন দুখের নির্ভুল অভিমান।

মিথ্যার বদলে

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

ওঠো, ঐ তো সিঁড়ি, উঠে যাও
মঞ্চে না দাঁড়ালে কেউ তোমার কথা শুনবে না।
চারিদিকে মানুষ মাথার অন্ধকার, একটাও
কথা তারা কক্ষনো বলে না, বলবে না!
তারা শুধু চুপ করে শোনে। তুমি কি তাদের কিছু বলবে?
শোনাবে পরম কোনো ত্রাণবাণী! তোমার মুখের উপরে জ্বলবে
সভাপতির মতন শহরের বুক থেকে
অতি কষ্টের বাঁচানো কিছু আলো, সেই আলোয় দাঁড়িয়ে
তুমি কি এবার চেনা ব্যর্থতার সব প্রণালী এড়িয়ে
বলবে এমন কথা যে কথা কেউই কখনো শোনেনি
আর শোনেনি বলেই বিশ্বাস করবে এই শনি
সময়ের ওপারেই আছে তুঙ্গ রবির ফসল!

ওঠো, ঐ তো সিঁড়ি, এই শেষবার
তোমার কথা ও কাহিনী আমরা শুনবো, কিন্তু তার আগে
চেয়ে দেখা সামনের মানুষ মাথার অন্ধকার
কারো মুখে আলো নেই তাই দেখছো না রাগে
তাদের চোয়াল জমতে জমতে ক্রমশ পাথর, সাবধান
তোমার একটা মিথ্যার বদলে ছুটে আসবে
দুঃখের উদ্ধত রক্ত, তোমার নামের পাশে
তারাই সাজাবে ফুলহীন অগ্নির শ্মশান!

বাসে

সুশান্ত বসু

যুযুধান দুই প্রতিপক্ষ
তাকায় কেবলই আড়ে আড়ে
কে কাকে এড়িয়ে নিরাপত্তা
জিনে নেবে চকিত মুহূর্তে!

ক্লান্তি-করুণ সারা অঙ্গ
ঝরে ঘাম নিদারুণ গ্রীষ্মে
ছুটে যায় জন্তুর পিণ্ড
গিলে-খাওয়া দ্রুত চলচক্র!

নুয়ে-পড়া শব্দের ন্যুব্জ
ভিতরে ভিতরে ফোঁসে সাপ
লোভে পাপে লোল পরিহাসে
শিকড়-হারানো অস্তিত্বের
গুহা থেকে গেঁজে-ওঠা জল
বমি করে ম্লান বেঁচে থাকা!

যুযুধান যত প্রতিপক্ষ
তাকায় কেবলই আড়ে আড়ে!

আধুনিক সাহিত্যের নতুন দরজা খুলে দিচ্ছে 'ড্রাগ-সাহিত্য'

অতনু রায়

গত দুশো বছরে ইংরেজি সাহিত্যের ক্রমবিকাশ নিয়ে অজস্র বই লেখা হয়েছে। রচনাবিশেষের গুণাগুণ এমনকি সাহিত্যের নিতান্ত তুচ্ছ বিষয়গুলি নিয়েও সমালোচকরা বাদানুবাদে প্রবৃত্ত। অথচ এই সময়টুকুকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের অঙ্গনে একটি নতুন ধারা যে ধীরে ধীরে বিকাশলাভ করে উঠল, কোলরিজ, ডিকোয়েন্সী, ইয়েটস প্রভৃতি প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের রচনায়, সেই রহস্যময় 'ড্রাগ-সাহিত্য' নিয়ে আলোচনা, এই সত্তরের দশকে এসে মাত্র দু-একজন সমালোচক করলেন, তাও তেমন বিস্তারিতভাবে নয়। এই দীর্ঘ অবহেলার কি কারণ?

এমনও নয় যে এর ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে কেউ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারে। বরং সাহিত্যের আসরে যখন কোনো আন্দোলনই ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরের বেশি স্থায়ী হয়নি, 'ড্রাগ-সাহিত্য' সেখানে গত দুশো বছর ধরে ক্রমান্বয়ে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় [illegible] রচনায় পুষ্ট হয়ে আসছে- স্বয়ং কোলারিজ থেকে হাল আমলের গীনসবার্গ তার পৃষ্ঠপোষক।

তবে কি ঐসব ঐতিহাসিক সমালোচকরা ইচ্ছে করেই চোখ বুঁজে আছেন? ভাবছেন এ বিষয় নিয়ে লেখার অর্থই প্রচলিত সংস্কারের বিরোধিতা করা? যে মাদক-সেবন [illegible] ও সমাজের চোখে নিষিদ্ধ, অনিচ্ছায় তাকেই সম্মান দেওয়া, পক্ষপাত দেখানো; এবং হয়ত নতুন কিছু লেখক-অলেখককে মাদক সেবনে অনুপ্রাণিত করা। কিন্তু আজ যখন আমরা বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ড্রাগসের ব্যবহার ছড়িয়ে পড়া নিয়ে সবচাইতে বেশি চিন্তিত, তখনও 'ড্রাগ-সাহিত্য'কে স্বীকৃতি দেওয়ার বিরুদ্ধে উক্ত অজুহাত রীতি-মতো তরল ও হাস্যকর বোধ হয় না কি?

সেই বাড়ি, যেখানে হাশিশ ক্লাবের অধিবেশন বসত।

অবশ্য এই পশ্চিমবাংলায় বসে ড্রাগ-সাহিত্যের স্বরূপ বুঝতে অসুবিধা আছে, সেকথা মানি। কেন না, বাংলা সাহিত্যে সত্যিকারের মাদক-প্রভাবিত রচনা সম্ভবত নেই। ইদানীংকার কিছু তরুণ লেখক বিভিন্ন ধরনের নেশাটেশায় অভ্যস্ত ঠিকই, এবং তা হয়ত যোগব্রত বা তুষার রায়ের মতো কিছু প্রতিভার অকালমৃত্যুরও কারণ, কিন্তু মাদক-দ্রব্যের সম্পূর্ণ প্রভাবে লেখা তাদেরও কোনো বিশিষ্ট রচনা সম্ভবত নেই। এখানে মনে রাখা দরকার মদ, পান, তামাক এগুলো যদিও নেশার বস্তু, কিন্তু আমাদের বর্তমান আলোচনার বাইরে, অন্যদিকে হেরোইন-কোকেনকেও আমরা বাদ দিচ্ছি, কেন না এদের প্রভাবে কোনো উন্নতমানের সাহিত্য রচনার প্রমাণ এখনও মেলেনি। আমাদের [illegible] মোটামুটি তিন ধরনের, সফেদ [illegible] ও তার যৌগ; হাশিশ ও [illegible] (ক্যানাবিস, মারিযুয়ানা, কিফ, ঘাস, পট ইত্যাদি) এবং হ্যালুসিনোজেন (মেস[illegible]লেন, পীয়োট, এল এস ডি ইত্যাদি) প্রভাবিত সাহিত্য নিয়ে।

তাই মাইকেল মধুসূদন, মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায়, কমলকুমার মজুমদার এবং অনুরূপ অনেকেই বাদ চলে গেলেন। বরং বঙ্কিমচন্দ্রের

'কমলাকান্ত'ই এই ধারার কিছুটা কাছাকাছি আসে। তবে বঙ্কিম ঐ রচনায় আফিম-সেবনের অভিজ্ঞতা এবং গুণাগুণের কথা বিস্তারিত বললেও, লেখাটা যে মাদকের প্রভাবেই রচিত, এমন কথা তাঁর কোনো জীবনীকারই বলেন না। অথচ বঙ্কিম যে ইংরেজ লেখকটির কাছ থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করেছিলেন, ড্রাগ-সাহিত্যের অন্যতম প্রবাদ-পুরুষ সেই ডিকোয়েন্সীর 'কনফেশন অফ অ্যান ইংলিশ ওপিয়াম ইটার' বইতে শুধু আফিম সেবনের বিশিষ্টতার কথাই বলা হয়নি, ওটি লেখার সময় ডিকোয়েন্সী কোনো কোনোদিন ১০,০০০ থেকে ১২,০০০ ফোঁটা লাউডানাম (অ্যালকোহলে গোলা আফিম ; রঙ লালচে-খয়েরী) খেতেন।

তবে মাদক প্রভাবিত না হয়েও কিছু বাঙালী লেখকদের রচনায় এক সুগভীর আত্মমগ্নতা আছে—যা কিন্তু একান্তভাবেই ড্রাগ-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। জীবনানন্দ, বিভূতি-ভূষণ অথবা সতীনাথ ভাদুড়ি, এ'দের রচনায় সুর কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ডিকোয়েন্সী, বোদল্যার, অথবা ইয়েটসের মাদক প্রভাবিত রচনাগুলি থেকে অন্যতর নয়। আসলে এ'দের নেশার উৎসটাই হয়ত ছিল ভিন্ন।

বাংলা সাহিত্যে সত্যিকারের মাদক প্রভাবিত রচনা সম্ভবত নেই। ইদানীং-কার কিছু তরুণ লেখক বিভিন্ন ধরনের নেশাটেশায় অভ্যস্ত ঠিকই, এবং তা হয়ত যোগভ্রষ্ট বা তুষার রায়ের মতো কিছু প্রতিভার অকালমৃত্যুর কারণ।

বিচিত্র এইসব ড্রাগ-সাহিত্যিকদের রচনার কৌশলও। কেউ কেউ (সুন্দর উদাহরণ কবি জর্জ ক্র্যাব) সবসময় লেখার সরঞ্জাম হাতের কাছে রাখতেন, যাতে ঘুম আচ্ছন্নতা থেকে জেগে উঠেই লিখে ফেলতে পারেন স্বপ্নবৃত্তান্ত, তা সে পদ্য অথবা গদ্য যে আকারেই হোক।

কোলরিজ

মানের আঁকা বোদল্যার-এর স্কেচ

অন্যান্যরা (যেমন ডিকোয়েন্সী অথবা এডগার অ্যালান পো) সোজাসুজি নেশার ঘোরেই লিখতেন। ব্যক্তিত্ব, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর পরিবেশের বিভিন্নতা ছাড়াও মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনুযায়ী ভিন্ন হতো তাঁদের অভিজ্ঞতা। এক জাতীয় মাদকজনিত অভিজ্ঞতা থেকে অন্য মাদকের প্রভাব পৃথক করা অবশ্য কঠিন। বিশেষত ক্যানাবিস, আফিম, এল এস ডি, মেসালিন কমবেশি একইভাবে কাজ করে—যদিও তীব্রতা তাদের ভিন্ন। ক্যানাবিস সবচেয়ে লঘু, এল এস ডি সবচেয়ে শক্তিশালী। হ্যালুসিনোজেনই আবার একমাত্র ড্রাগ যা মানুষকে তার 'দেহের বাইরে' নিয়ে যায়। ড্রাগের সাহায্যে লেখকরা অতীত অথবা ভবিষ্যতের রাজ্যে চলে যান। আশ-পাশের বস্তুজগতের তুচ্ছতম খুঁটিনাটিও তাঁদের চোখে পড়ে, অথবা তাঁরা নাকি ইচ্ছে করলে অন্য জগতেও ঘুরে আসতে পারেন।

প্রশ্নটা জরুরী, সাধারণ লেখালেখি থেকে ড্রাগ-সাহিত্যের পার্থক্য কোথায়? ফর্মের পার্থক্যটা অবশ্য প্রথমেই চোখে পড়ে। সব মাদক প্রভাবিত রচনাতেই দীর্ঘ ছন্দোময় ছেদহীন পংক্তি, শব্দ ও ভাবের অনায়াস পুনরাবৃত্তি, গদ্যের বিভিন্ন ঢং-এর একত্র মেশামেশি—সব মিলিয়ে অবচেতনা এবং স্বপ্নের যে স্খলিত আকারমাত্রিকতা—তারই প্রতিফলন।

আর বিষয়বস্তু প্রায় সর্বদাই নানান কাল্পনিক ছবি, দর্শন ও ভিশন-এর বর্ণনা। এক কথায় এরা সোজাসুজিভাবে সেটাই করে, যা অন্যান্য রচনা অতটা সোজাসুজি করে না, এরা পাঠককে দেয় মুক্ত, স্বাধীন জীবনানন্দের আস্বাদ—স্থান-কাল সম্বন্ধে স্বাভাবিক ধারণা-গুলো সেখানে বিকৃত, যে ধরনের অভিজ্ঞতা মানুষ একমাত্র ঘুমের মধ্যেই অনুভব করে।

আর একটু বুঝিয়ে বলি। সময়ের উপাদানটাই ধরুন। আমরা নাটকে এক সন্ধ্যার মধ্যেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতন দেখি, জেমস জয়সের ব্লুম একদিনেই ভাবলিনে যা আনন্দ করে, ততখানি হেঁটে ঘুরতেই আমাদের সপ্তাহখানেক লেগে যাবে। অর্থাৎ, এই যে সময়কে ছোট করা বা বাড়ানো, এটা সাহিত্যের প্রতি আমাদের আকর্ষণ বাড়ায়।

১৯৫৩ সালের বসন্তকালে আলডাস হাক্সলি যখন একদিন প্রথম 'মেসালিন' খেলেন, তিনি নিজেকে আবিষ্কার করলেন এক 'অনন্ত দর্শনানন্দের মধ্যে ('...in a timeless bliss of seeing...)। বললেন, 'আমি হয়ত আমার হাতের ঘড়িটার দিকে চাইতে পারতাম, কিন্তু ঘড়ি, সেটা তো অন্য জগতের। তখন আমার অভিজ্ঞতা ছিল এক অনির্দিষ্ট সময়সীমার, কঠিন বাস্তবের সঙ্গে অনবরত জায়গা বদল করছিল এক সতত পরিবর্তনশীল অ্যাপোক্যালইপস'।

'এভাবেই সকলের দেখা উচিত, প্রতিটি বস্তুর আসল চেহারাখানা কি', হাক্সলি তাঁর আচ্ছন্নতার মধ্যে বলে ওঠেন। স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধে চালু ধারণাগুলো ওলোটপালোট করে ড্রাগস লেখককে দেখায় প্রতিটি বস্তুর আসল রূপ; তাঁদের রচনার মধ্যে তাই বাইরের ধাবমান জগত সম্বন্ধে একবুক ঘৃণা। তাঁরা পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন জগতে নিহিত বিস্ময়গুলি, খুলে দিতে চেয়েছেন দৈনন্দিনের অজস্র মিথ্যার মুখোস। মাদক প্রভাবিত রচনামাত্রই, তাই, স্বাভাবিক কারণেই, স্বপ্নসম্ভব।

'কনফেশন অফ অ্যান ইংলিশ ওপিয়াম ইটার' লেখার সময় ডিকোয়েনসী কোনো কোনোদিন ১০,০০০ থেকে ১২,০০০ ফোঁটা লাউডানাম (অ্যালকোহলে গোলা আফিম) খেতেন।

শিল্পসৃষ্টির জন্যে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার প্রায় মানুষের ইতিহাসের সমান পুরনো।

বোদল্যার

ডিকোয়েনসী

ড্রাগসের প্রথম উল্লেখ আমরা পাই খৃষ্ট জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে লেখা প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ 'ঋগ্বেদ'-এ। তখনকার ঋষিরা যে সোমরস পান করতেন, তা 'অমনিত মুস্করীয়' (সোমলতা) নামক এক ধরনের উদ্ভিদের রস। এরপর হোমারের রচনায় হেলেনের 'নেমপেন্থ' (এক ধরনের আফিম) খাওয়ার কথা, ভার্জিলের 'ঈনীডে' মাদকসেবন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা. চসার ও শেকসপীয়রের অনেক চরিত্রের মুখে

ড্রাগের সাহায্যে লেখকরা অতীত অথবা ভবিষ্যতের রাজ্যে চলে যান। আশপাশের বস্তুজগতের তুচ্ছতম খুঁটিনাটিও তাঁদের চোখে পড়ে অথবা তাঁরা নাকি ইচ্ছে করলে অন্য জগতেও ঘুরে আসতে পারেন।

আফিম ও অন্যান্য মাদকের উল্লেখ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু সাহিত্যে ড্রাগসের উল্লেখ যত কৌতূহলজনকই হোক, আপাতত আমাদের আলোচনার বিষয় নয়—'ড্রাগ সাহিত্য' বলতে বোঝায় মাদক যখন সাহিত্য সৃষ্টির উত্তেজক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের আলোচনা তাই গত দুশো বছরে সীমাবদ্ধ—যার সঠিক খুঁটিনাটি ও তথ্যাদি আমাদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে হঠাৎ একগুচ্ছ নেশাড়ু সাহিত্যিককে পেয়ে যাওয়া—এর পিছনে একটা সামাজিক অবস্থাজনিত কারণও আছে! শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডে এইসময় ড্রাগসের বহুল ব্যবহার সমাজের প্রায় সব স্তরেই ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি, শুনলে আশ্চর্য হতে হয়, এসময় আফিম, হাশিশ, অথবা লাউডানামের দাম এক গ্লাস বিয়ার, জিন অথবা তামাকের চেয়েও ছিল সস্তা। আর বাস্তবের কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার এই সোজা পথটা রোম্যাণ্টিক কবিদের চরিত্রের সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়ে গেল।

মাদক প্রভাবিত সাহিত্যের এই আধুনিক পর্যায়ের শুরু নিঃসন্দেহে স্যামুয়েল টেলর কোলরিজকে দিয়ে। চোদ্দটি ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট এই ছেলেটি ছোটবেলা থেকেই একা, অবহেলিত, সামান্য স্বপ্নাতুর। বড় হয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়াকালীন কবিতা লেখার শুরু এবং আফিম সেবনও। প্রথমে নিছক শারীরিক ব্যথা-বেদনা থেকে আরাম পাবার জন্যে খেলেও, আফিম আর হাশিশের নেশা তাঁকে ক্রমাগত পেয়ে বসে। ১৮০২ সালে লেখা 'ওড টু ডিজেকশন' সেই অসহায়তারই ভাষারূপ। ক্রিস্টাবেল, কুবলা খান প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতা মাদক প্রভাবিত কল্পনার জগত আর কঠোর বাস্তবের সংঘর্ষের প্রতিচ্ছবি। তাঁর কিছু কবিতা যেমন 'পেইনস অফ স্লিপ' অথবা 'দে ওয়ানডারিং অব কেইন' সোজাসুজি আফিমের প্রভাবে লেখা—যেখানে লাউডানামের প্রতি কবির আসক্তি .. ভালমন্দের অনুভূতি, এবং স্বপ্ন সাম্রাজ্য, সমস্তই বড় সুন্দরভাবে বিধৃত।

যদিও ড্রাগ-সাহিত্যের প্রথম লেখক কোলরিজ, কিন্তু যিনি প্রথম পাঠক সমাজের কাছে মাদক সেবনের আনন্দ-বেদনার কথা বলেন, প্রচলিত সংস্কার আর শুচিবায়ুগ্রস্ততার বিরোধিতা করে সাধারণের প্রশংসা ও নিন্দা কুড়োন, তিনি টমাস ডিকোয়েন্সী, তাঁর 'কনফেশন অফ অ্যান ইংলিশ ওপিয়াম ইটার' এই সাহিত্যধারার এক বিশিষ্ট ধ্রুপদী। ড্রাগ-সাহিত্য এ বই-এর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি আজও। সহজ গদ্য কবিতার ছন্দে ডিকোয়েন্সী তাঁর স্বপ্নের বর্ণনা দিয়েছেন; আফিম সেবনের গুণাগুণের কথা বলেছেন; যেসব প্রশ্ন তিনি রেখেছেন, যেসব উক্তি করেছেন, তার অনেকেই আজও

এডগার অ্যালেন পো

গ্রেগরী করসো

অনুত্তরিত, যদিও সেগুলি আজকের পৃথিবী সম্বন্ধে তীক্ষ্ণভাবে সত্য।

মনে রাখা দরকার যে আমরা এখানে ড্রাগ-সাহিত্যের ধারাবাহিক তথ্যানুগ ইতিহাস লিখতে বসিনি। নচেৎ চীনা এবং ইজিপ্সীয় সাহিত্যের আলোচনা ইতোমধ্যেই করা দরকার হতো। ইংরেজি সাহিত্যের এই হাতগুণতি কয়েকজন লেখককে বেছে নেওয়ার কারণও শুধু এই নয় যে, ড্রাগ-সাহিত্যের আধুনিক পর্যায়ের এঁরা ধারক ও বাহক, কিন্তু এঁদের

'ড্রাগ-সাহিত্য' তুলে ধরতে চায় জগতে নিহিত বিস্ময়গুলি, খুলে দিতে চায় দৈনন্দিনের অজস্র মিথ্যার মুখোস। মাদক প্রভাবিত রচনামাত্রই, তাই স্বাভাবিক কারণেই, স্বপ্নসম্ভব।

রচনাগুলির সঙ্গে আমরা অল্পবিস্তর পরিচিতও। আলোচনা সংক্ষেপের জন্যে আমরা ল্যাম্ব, শেলি, সাদে, বায়রন প্রভৃতিদের বাদ দিচ্ছি—যদিও আফিম থেকে তৈরি 'ব্ল্যাক ড্রপ' এঁরা খেতেন; ওয়াল্টার স্কট 'ব্রাইড অফ লামারমোর' লেখার সময় প্রতিদিন ২০০ ফোঁটা করে লাউডানাম খেতেন; শার্লটে ব্রণ্টে এবং এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং উভয়েই ড্রাগসের কথা লেখেন, এবং মনে হয় না তাঁদের বিদ্যে শুধুই পুঁথিগত ছিল। অবশ্য মেয়ে-লেখকদের মধ্যে ড্রাগসের ব্যবহার কোনো কালেই খুব চালু নয়। উপরের দুজন ছাড়া মেরি শেলি এবং মেরি ক্যানডানই যা সামান্য নেশাটেশা করতেন, বাকিরা উল্লেখ-যোগ্য নন।

ড্রাগ-সাহিত্যের পরবর্তী মহারথী গোয়েন্দা গল্পের জনক, হরর-উপন্যাসের স্রষ্টা বহুবিতর্কিত এডগার অ্যালান পো। বিতর্কিত কেননা তাঁর রচনায় ড্রাগসের প্রভাব কতখানি, ব্যক্তিগত জীবনেও বা তিনি কতটা নেশাড়ু

ফারলিন ঘেত্তি

ছিলেন, তা নিয়ে দ্বিমত আছে। তবে তাঁর কিছু ছোটগল্প, যেমন 'লাইজিয়া', 'বেরেনিস', 'ফল অফ দি হাউস অফ আশার' নেশা এবং নেশাগ্রস্ততা নিয়েই লেখা ; এছাড়া আরও কিছু গল্প, যেমন 'এ টেল অফ র‍্যাগেড মাউণ্টেন', কবিতার পংক্তি, বিক্ষিপ্ত বর্ণনা নিঃসন্দেহে মাদক-প্রভাবিত 'ভিশন'। 'মুনস্টোন' উপন্যাসের রচয়িতা উইলকি কলিনস-ও লাউডানামের প্রভাবে কয়েকটি উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনা করেন। এরমধ্যে

অবশ্য মেয়ে লেখকদের মধ্যে ড্রাগসের ব্যবহার কোনোকালেই খুব চালু নয়। শার্লটে ব্রণ্টে ও এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং ছাড়া মেরি শেলি এবং মেরি ক্যাভানই যা সামান্ত নেশাটেশা করতেন।

'আর্মাডেল' এবং 'এ উওম্যান ইন হোয়াইট' পাঠকসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল।

১৮৪০ সাল নাগাদ ড্রাগের ব্যবহার ফ্রান্সেও ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ডিকোয়েন্সী, পো ইত্যাদিদের অভিজ্ঞতায় আকৃষ্ট হয়ে ফ্রান্সে গ্যোতিয়ে, বোদল্যার, জেরার দ নর্ভাল প্রভৃতি লেখকরা মিলে স্থাপন করেন 'হাশিশ ক্লাব'। ড্রাগসংক্রান্ত এইসব পরীক্ষানিরীক্ষা, এবং অভিজ্ঞতার কথা বোদল্যার লিখেছেন তাঁর 'লে পারাদি আর্তিফিসিয়ে' (নকল স্বর্গ) বইতে, ড্রাগ-সাহিত্যে যার নাম ডিকোয়েন্সীর 'কনফেশন'এর সঙ্গে সমান মর্যাদায় উচ্চারিত হয়ে থাকে। পরের বছরগুলোতে পিয়ের লোতি, আলেকজাঁদ্র দুমা, আর্থুর র‍্যাঁবো প্রভৃতিরাও এ আন্দোলনে সামিল হন ও তাঁদের রচনায় ড্রাগ-সাহিত্যের ঝুলি পূর্ণ করেন।

প্যারিসের বোহেমিয়ানরা যেমন কোলরিজ, ডিকোয়েন্সীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে 'হাশিশ ক্লাব' খোলেন, তেমনি শতাব্দীর শেষদিকে এসে ইংরেজ 'ডেকাডেন্ট' সাহিত্যিকরা আবার এইসব ফরাসীদের দেখাদেখি ড্রাগের সাহায্যে নতুন পথ ও চেতনার দিকে চোখ মেলে তাকান। লণ্ডনের এইসব উজ্জ্বল তরুণ সাহিত্যিকরা, ইয়েটস যাদের বলেছিলেন 'দি ট্র্যাজিক জেনারেশন', ড্রাগ-সাহিত্যে এক নতুন পরিচ্ছেদের সংযোজক।

অস্কার ওয়াইল্ড, অব্রে বেয়ার্ডসলি, আর্নেস্ট ডাউসন, সেলউইন ইমেজ প্রভৃতিরা লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি ও কাফেগুলোতে অ্যাফিম, লাউডানাম, ও হাশিশ খেতে শুরু করলেন, ফরাসীদের ঢঙে। তবে সে যেন অনেকটাই চলতি ফ্যাশানের বশে, সত্যিকারের ড্রাগ-সাহিত্য এ'দের হাত দিয়ে বলতে গেলে কিছুই বেরোয়নি। শতাব্দীর একেবারে শেষদিকে শুধু একজন লেখক ড্রাগ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সম্ভাবনার নতুন পথ খুলে দিলেন 'মেসালিন' ও অন্যান্য হ্যালুসিনোজেন ড্রাগের উপর গবেষণা শুরু করে—তাঁর নাম হ্যাভলক এলিস।

এলিসের জগতজোড়া খ্যাতি যদিও মূলত তাঁর যৌনমনস্তত্ত্বমূলক রচনার জন্যে, কিন্তু তাঁর বিভিন্ন লেখায় 'মেসালিন' নামক ড্রাগের যে-সব প্রতিক্রিয়ার হুবহু বর্ণনা আছে, তার মূল্যও নেহাত কম নয়। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত এইসব রচনার সংকলন তাঁর 'ওয়ার্ল্ড অফ ড্রিমস' তথ্যসমৃদ্ধ হয়েও স্বাদু, বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্য-গুণসম্পন্ন।

ড্রাগ-সাহিত্য এলিসের কাছে অবশ্য আরেকটা কারণেও ঋণী। তাঁর সমকালীন দুজন কবিকে এলিস তাঁর 'মেসালিন' খাওয়ার পরীক্ষায় আমন্ত্রণ জানান। একজন ডব্লিউ বি ইয়েটস এবং অন্যজন আর্নেস্ট ডাউসন। ফলতঃ আমরা দারুণ কিছু মাদকপ্রভাবিত রচনা উপহার পেয়ে যাই। ইয়েটস অবশ্য এ ব্যাপারে অধিক উৎসাহী, কেননা তিনি সর্বদাই—রহস্যময় ও স্বপ্নালু, পরামনোবিদ্যা অধ্যাত্মতত্ত্বে তাঁর অসম্ভব আগ্রহ। তাঁর কিছু

অ্যালেন গীনসবারগ

কবিতা ও গল্প আমাদের দেয় ড্রাগ-ভিশনের হুবহু ভাষাচিত্র। 'দি সিক্রেট রোজ' গল্পে কয়েকটি দৃশ্যে যখন আফিম প্রভাবিত দর্শনের বিশিষ্ট কারুকৃতি, অন্যান্য দৃশ্যগুলি বহন করছে হাশিশের প্রতিক্রিয়ায় স্থান ও কাল সম্বন্ধে ধারণার তারতম্য। তাঁর শ্রেষ্ঠ মাদক-প্রভাবিত গল্প 'অ্যাডোরেশন অফ দি

হ্যাভলক এলিসের জগৎজোড়া খ্যাতি যদিও মূলত তাঁর যৌনমনস্তত্ত্ব মূলক রচনার জন্যে, কিন্তু তাঁর বিভিন্ন লেখায় 'মেসালিন' নামক ড্রাগের যেসব প্রতিক্রিয়ার হুবহু বর্ণনা আছে তার মূল্যও নেহাত কম নয়।

ম্যাজাই'তে স্বপ্নদর্শনের সঙ্গে মিশেছে মাইথোলজি এবং অকাল্টিজম সংক্রান্ত তত্ত্বাদি।

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন এইসব সাহিত্যিকরা মিলে ড্রাগ-সাহিত্যের ধারাটিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন, সেসময় কিছু গোপন অকাল্ট দলের সদস্যরাও যৌথভাবে ড্রাগস নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। যদিও খুব উন্নতমানের সাহিত্যসৃষ্টি এ'রা করতে পারেননি। তবু এ'দের মধ্যে কয়েক-জনের, যেমন, অ্যালজেরনন ব্ল্যাকউড এবং অ্যালেইস্টার ক্রাউলের রচনা পরে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। ক্রাউলেকে অনেকে 'বীট' আর 'হিপি'দের পূর্বসূরী বলেও মনে করেন।

ড্রাগ-সাহিত্যের অঙ্গনে ডিকোয়েন্সীর পরেই যাঁর স্থান, তাঁর নাম আলডাস হাক্সলি। মাদকদ্রব্যের সঙ্গে সাহিত্যিক সৃজনশীলতাকে যুক্ত করার নতুন পথনির্দেশ তিনিই করেন। ১৯৫৩ সালে একদিন যখন তিনি এক গ্রাম মেসালিনের ৪/১০ ভাগ খান, সেই অভিজ্ঞতা থেকেই সৃষ্টি হলো ইংরেজি সাহিত্যের দুটি বিখ্যাত রচনা—'দি ডোরস অফ পারসেপশন' এবং 'হেভন অ্যাণ্ড হেল'। এতদিন যাঁরা ড্রাগ-সাহিত্যকে

ছোটখাট লেখকদের পাগলামি বলে উড়িয়ে দিয়ে এসেছেন, একজন শক্তিশালী প্রতিভূ সাহিত্যিকের অভিজ্ঞতা এবং মতামতের সামনে তাঁরা থমকে দাঁড়ালেন।

এদিকে তখন আমাদের জীবন ও সাহিত্যে এক চরম সন্ধিক্ষণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অমানবিক নৃশংসতা, হতাশা ও বিষাদ কাঁপিয়ে দিয়েছে যত পুরাতন মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও আনুগত্যের স্থির ভিত্তিপ্রস্তর। সকলেই চাইছে বাস্তবের রুক্ষ, কঠিন অভিজ্ঞতা থেকে পালিয়ে বাঁচতে, অতিক্রম করে যেতে তাদের নির্ধারিত চেতনা। পালিয়ে যেতে, তা সে পালানোর অর্থ যদিবা হয় নিজের সত্তারই আরও গহীনে ডুব দেওয়া।

মাদকসেবী সাহিত্যিকদের সর্বাধুনিক প্রজন্মের সূচনা আমেরিকায়, একদল তরুণ কবি-সাহিত্যিককে কেন্দ্র করে—যাদের এক-সঙ্গে বলা হয় 'বীটস'। কোলরিজ, ব্যোদল্যার, ক্লে এবং অন্যান্যদের মতো এরাও চেয়েছিল নিজেদের জন্যে একটা পৃথক পরিপূরক জগত

১৯৫৩ সালে একদিন যখন অলডাস হাকসলি এক গ্রাম মেসালিনের দশ ভাগের চার ভাগ খান। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই সৃষ্টি হলো ইংরাজি সাহিত্যের দুটি বিখ্যাত রচনা : 'দি ডোরস অফ পারসেপসন' এবং 'হেভন অ্যানড হেল'।

সৃষ্টি করে নিতে, উত্তেজক ড্রাগসের সাহায্যে মনোমতো প্রকাশভঙ্গী খুঁজে পেতে। সাধারণ মানুষের কাছে সে যতই ছন্নছাড়া বা নষ্ট দেখাক না কেন। উত্তেজক দ্রব্য বলতে প্রথমে ছিল মদ আর পেপ পিল—কিন্তু ক্রমে তারা শরণ নিল নানান ধরনের হ্যালুসিনেটরি বা নারকোটিক ড্রাগসের।

বীট আন্দোলনের পুরোহিত ছিলেন নীল কাসাডি, যাঁর লাগামছাড়া, নীতিবিগর্হিত জীবনযাপন তাঁর প্রিয় শিষ্য জ্যাক কেরুয়াকের কাছে আদর্শ বোধ হয়েছিল। কাসাডির নিজস্ব লেখা অবশ্য বিশেষ পাওয়া যায় না—এক তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত আত্মকথার অংশ 'দি ফার্স্ট থার্ড' ছাড়া। মারিজুয়ানা, বেনড্রেন, ও পীয়োট বদলাবদলি করে খেতে খেতে এই লেখা, গদ্যের প্রায় সবরকম ঢংই তাই এখানে এক সঙ্গে মিশেছে—সর্বোপরি ছেদহীন, যতিচিহ্নহীন এক স্ট্রীম-অফ-কনশাসনেস স্টাইল।

কেরুয়াক বীট প্রজন্মের সবচেয়ে স্মরণীয় নাম। কাসাডির সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ড্রাগসের প্রতিক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষা চালানোর সময় লেখা তাঁর 'ভিশন অফ কোডি' সবচেয়ে খোলাখুলি রকম মাদক প্রভাবিত গ্রন্থ। যদিও কেরুয়াক পরে বিশ্বজোড়া খ্যাতি পান তাঁর 'অন দি রোড' উপন্যাসের জন্যে। তাঁর সমস্ত

জ্যাক কেরুয়াক

লেখা, মানে স্বপ্ন-লেখার মধ্যে ঐ 'বিয়া-টিচিউড' জীবন, মাদক প্রভাবিত কল্পনার জগত, যৌবনের বিদ্রোহ, একদিকে পরিবার, পুরাতন মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য, এবং অন্যদিকে অসংযত, বিপজ্জনক জীবনযাপনের অদম্য ইচ্ছার মধ্যে দ্বন্দ্ব, আর এই পরিচিত দিগন্ত পেরিয়ে চলে যাবার আকাঙ্ক্ষার কথা ছড়িয়ে আছে।

এ'দের দুই সঙ্গী উইলিয়ম ডি বুরুজ (Burroughs) এবং অ্যালেন গীনসবার্গ আজ আমেরিকান সাহিত্যের পুরোভাগে। এছাড়া ফার্লিংগেত্তি, গ্রেগরি কর্সো এবং অন্যান্য বীট কবিরাও অনেক মাদক-প্রভাবিত গ্রন্থের রচয়িতা। বুরুজ-এর প্রথম বই 'জাঙ্কি' ছদ্মনামে লেখা, আমাজনের কাছে পাওয়া এক নতুন ধরনের ড্রাগ 'ইয়েগ' এর প্রতিক্রিয়ার বিবরণ। এই 'ইয়েগ'-এর সন্ধানে ঘোরার সময় গীনসবার্গকে লেখা চিঠিগুলো পরে সংকলিত হয়ে বেরোয় 'দি ইয়েগ লেটার্স'—যার মধ্যে ছিল নেশাগ্রস্ততা নিয়ে লেখা 'দি নেকেড লাঞ্চ' উপন্যাসের বীজ। বুরুজ-এর রচনা বহুবার বাজেয়াপ্ত হয়েছে, সমালোচকরা নির্দয়ভাবে আক্রমণ করেছেন, কিন্তু এখনও তিনি ড্রাগ-সাহিত্যের অবিসংবাদিত 'গুরু'। সমস্ত রচনাতেই তাঁর নতুনতর ড্রাগের তত্ত্ব-তল্লাশ, সত্তার গভীরে ডুব দেওয়া, এবং সৃজনশীল সাহিত্যের জগতে পৌনঃপুনিক অভিযান।

গীনসবার্গ নিঃসন্দেহে আজ পৃথিবীর প্রথমসারির কবিদের মধ্যে একজন, বহু বিতর্ক এবং কিংবদন্তী তাঁকে ঘিরে। তাঁর প্রথম বই 'হাউল' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক সমাজকে চমকে দিয়েছিল, যুবমানসকে করেছিল অনু-সন্ধিৎসু। এরপর 'কাদ্দিশ' এবং অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ—'যেখানে তাঁর সমকামিতা, স্বপ্নাতুর মন, মাদকদ্রব্যের চেতনা পরিবর্তনকারী ক্ষমতায় বিশ্বাস, হিন্দুধর্ম ও জৈন বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগের কথা স্পষ্ট। এল এস ডি তাঁর বেশিরভাগ সময়ের সঙ্গী, এবং কিছু কবিতা, যেমন 'এল এস ডি—২৫' অথবা 'ওয়েলস ভিজিটেশন' ঐ প্রভাবেই রচিত। তাঁর ভাষায়, 'LSD is the Christ of the Kali Yuga···it is the Christ or

উইলিয়ম ডি-বুরুজ-এর রচনা বহু-বার বাজেয়াপ্ত হয়েছে, সমালোচকরা নির্দয়ভাবে আক্রমণ করেছেন, কিন্তু এখনও তিনি ড্রাগ-সাহিত্যের অবি-সংবাদিত গুরু। সমস্ত রচনাতেই তাঁর নতুনতর ড্রাগের তত্ত্বতল্লাশ।

Messiah because i'ts the creator interfering in history'। ইদানীং গীনসবার্গ আরও বেশি কর্মবাদী, মাদক-প্রভাবিত, এবং আশপাশের প্রবহমান জগত সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল।

১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে সমস্ত বিশ্ব যখন বিধ্বংসী ধ্বংসলীলায় মেতেছে। সুইজারল্যাণ্ডে এক বিজ্ঞানী—অ্যালবার্ট হফম্যান—গবেষণা করতে করতে অপ্রত্যাশিত-

ইংরেজ চিত্রকর লক ফিলডস-এর আঁকা আফিমের আড্ডাখানা

হাশিশ সেবনকারী

ভাবে আবিষ্কার করে ফেললেন আশ্চর্য একটি ড্রাগ —এল এস ডি।

হাকসলি যেমন তাঁর 'মেশালিন' খাওয়ার অভিজ্ঞতার কথা লিখে পরবর্তী প্রজন্মের লেখকদের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, অ্যালান ওয়াটস তেমনি ১৯৬১

ইদানীংকালের ড্রাগ-সাহিত্যের মুখ্য লেখক ডক্টর টিমথি লিয়ারি আপাতত ড্রাগ-রিসারচ কলোনী স্থাপন করার অভিযোগে কারারুদ্ধ।

সালে L S D খেয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিলেন 'দি জয়াস কসমোলজি' বইতে। হাক্সলি ও ওয়াটস দুজনেই ছিলেন প্রজ্ঞাসম্পন্ন, সহজেই বুঝেছিলেন যে, যদি এই ড্রাগ দার্শনিক ও সূক্ষ্মবোধবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির উপর প্রযুক্ত হয়, তবে তাকে দিতে পারে অত্যন্ত উ'চুদরের অন্তর্দৃষ্টি। এ'দের পরীক্ষা তাই ছিল আধ্যাত্মিক, বিশেষ উদ্দেশ্যসম্পন্ন, ও সার্বজনীন। পরে অবশ্য কেন কেসি এবং তাঁর 'দি মেরি প্র্যাঙ্কস্টারস' দলের সাহিত্যিকরা ড্রাগ-পরীক্ষার এই পবিত্রতার খোলসটা ছিঁড়ে একে ঘরের বাইরে সাধারণের চোখের সামনে আনেন।

ইদানীং কালের ড্রাগ-সাহিত্যে মুখ্য লেখক ডঃ টিমথি লিয়ারি, আপাতত ড্রাগ রিসার্চ কলোনী স্থাপন করার অভিযোগে কারারুদ্ধ। তাঁর লেখা 'হাই প্রিস্ট' ড্রাগ-সম্বন্ধীয় দর্শনের এক বিতর্কমূলক আলোচনা। এছাড়া মাদক-প্রভাবিত সাহিত্য রচনা করেছেন অ্যানড্রু ওয়েইল, উইলিয়ম ক্র্যাডক। লিখছেন উত্তর আমেরিকার পল বাহয়েলস, ফ্রান্সের হাল আমলের কবি এ'রি মিশো, বিখ্যাত ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক আলেকজাণ্ডার ট্রকচি—যাঁর মাদক-অভিজ্ঞতা ও হেরোইন-আসক্তি, উপন্যাস 'কেইনস বুক' লেখার অন্যতম মালমসলা।

আবার এই ড্রাগ-কালচারের সঙ্গেই ঘনিষ্টভাবে জড়িত 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড প্রেস ও রক-সঙ্গীত। বব ডিলান, জিমি হেনড্রিক্স, জেরি গারসিয়া, অথবা সদ্যপ্রয়াত জন লেনন অজস্র মাদক প্রভাবিত গান রচনা করেছেন। 'বীটলস' দলের জনপ্রিয় গান 'Lucy in the sky with Diamonds' তো L S D-রই প্রতিরূপ। অন্যদিকে আণ্ডারগ্রাউণ্ড প্রেস পাঠকদের সামনে নিয়মিত পেশ করছে নতুন

আজকের পৃথিবীর প্রথম সারির কবি অ্যালেন গীনসবারগের বেশিরভাগ সময়ের সঙ্গী এল এস ডি। তিনি বলেন : L S D is the Christ of the Kali Yuga .. it is the Christ or Messiah because it's the creator interfering in history.

সব ড্রাগনির্ভর রচনা ও পরীক্ষানিরীক্ষার খবর। নতুন ধরনের মাদক প্রভাবিত সাংবাদিকতা চালু করেছেন হাণ্টার টমসন ও স্মোকস্ট্যাক এল রোপো।

শেষ করার আগে আর একটি জরুরী বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে যেসব সাহিত্যিক এই আধুনিক ট্র্যাডিশনটির স্রষ্টা, তাঁরা ড্রাগস খেতেন গোপনে, ব্যক্তিগত-ভাবে। তাঁদের লেখায় তাঁরা মাদক সেবনের আনন্দ-বেদনার কথা লিখে গেছেন, কিন্তু কখনই পাঠককে খেতে উৎসাহিত করেননি। লেখক তাঁর আশ্চর্য অভিজ্ঞতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিচ্ছেন এই আশায় যে তা পাঠকদের কাছে এক নতুন জগতের দ্বার খুলে দেবে। কিন্তু ১৯৫০ কি তার পরবর্তীকালের ড্রাগ-সাহিত্যে ঈষৎ অন্য ধরনের সুর শোনা গেল, যা অবশ্য আমেরিকান চরিত্রের অঙ্গই প্রায় বলা চলে। যে অভিজ্ঞতার বর্ণনা ইদানীংকালের মাদকসেবী সাহিত্যিকরা দিচ্ছেন তা ইণ্টারেস্টিং নিশ্চয়ই, কিন্তু সাধারণ পাঠক স্বাভাবিক অবস্থায় তার রসটা পুরোপুরি নিতে পারবে না। হাক্সলির লেখায় এই কথাটাই একটু প্রচ্ছন্ন, আর লিয়ারিতে একদম খোলাখুলিভাবে বলা—যেন ড্রাগ-সাহিত্যের প্রকৃত রসাস্বাদন করতে হলে খানিকটা মাদক সেবনের অভিজ্ঞতা নিতান্ত না থাকলেই নয়। অবশ্য এ ধরনের মন্তব্য অথবা মনোভাব কতটা গ্রহণযোগ্য, সে বিতর্কে আমরা আপাতত যাচ্ছি না।

আর এ ধরনের মন্তব্য শুধুমাত্র ক্যানাবিস এবং হ্যালুসিনোজেন জাতীয় ড্রাগ সম্বন্ধেই করা হয়েছে। এগুলো সত্যিই এমন ধরনের মাদক যা পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে সেবনকারীর দৃষ্টিভঙ্গীতে আমূল পরিবর্তন এনে দিতে পারে। এগুলো আজকের শতাব্দীর যত কুশ্রী, কদর্যতা লেখকের চোখে আঙুল দিয়ে

এই ড্রাগ কালচারের সঙ্গে ঘনিষ্ট-ভাবে জড়িত আছে আনডার গ্রাউণ্ড প্রেস ও রকসংগীত। বব ডিলান, জিমি হেনড্রিকস, জেরি গারসিয়া অথবা সদ্যপ্রয়াত জন লেনন অজস্র মাদকপ্রভাবিত গান রচনা করেছেন। 'বীটলস' দলের জনপ্রিয় গান 'Lucy in the sky with Diamonds' তো LSD-রই প্রতিরূপ।

দেখিয়ে দেয়, আবার সঙ্গে সঙ্গে বলে দেয় পরিপূরক পন্থার কথাও। 'টার্ন অন, টিউন ইন, ড্রপ আউট'—তাই টিমথি লিয়ারির সাইকাডেলিক বিপ্লবের যুদ্ধনিনাদ ॥ □

স্বীকৃতি

COHEN, DANIEL : Dreams, Visions, and Drugs.

LEIBOVITZ, S KRIPPER : Drug Related Alterated states of consciousness.

HAINING, PETER : The Hashish Club. Vols. 1 & 2.

COOK, BRUCE : The Beat Generation·

পলায়ন

দেবদাস আচার্য

বকখালি

না, দীঘা

উঁহু, ঘাটশিলা। ঘাটশিলা এখন শর্ট ট্রিপ-এর হাল-ফ্যাশন—স্টেটবাসে চার ঘণ্টার জার্নি। আজকাল রোববার কাটাতে তো কলকাতার মানুষ ঘাটশিলার দিকেই নজর দিয়েছে।

স্থির হয়ে গেল ঘাটশিলা। তিনজনেরই পছন্দ। তাছাড়া বকখালি আর দীঘা তিনজনই ঘুরে এসেছে। দিব্যেন্দু ছাড়া বাকি দুজন—অর্থাৎ বরুণ আর সুমন্ত ঘাটশিলায় যায়নি। বিভূতিভূষণ আর ঋত্বিক ঘটক ঘাটশিলাকে বাঙালী মধ্যবিত্তদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় করে গেছেন। তাছাড়া রোমাঞ্চকর সুবর্ণরেখা নদী, তামার খনি-পাহাড়, অভ্রময় ভূমি, আদিম জনপদ আর সিংভূমের জঙ্গল—এসব রোমানটিক বাঙালী তরুণদের পক্ষে স্বপ্ন জাগাতে যথেষ্ট। অতএব ঘাটশিলা।

সুমন্তর বাড়ি রানাঘাট। শ্বশুরবাড়ি দমদম এয়ারপোর্ট—২ নং গেট-এর কাছে। শ্বশুর অসুস্থ, তাই স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুর মশায়কে দেখতে এসেছে সুমন্ত। তিন চারদিন ছুটি আছে। টানা শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত। আর শ্বশুর তেমন কিছু অসুস্থ নন যে তাঁর শিয়রে বসে থাকতে হবে। আসলে বৌ-এর এ একটা ছুতো। পালা-পার্বণ আর অসুখ-বিসুখ না হলে তো স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি আসার নাম করে না সুমন্ত। আজকাল আবার পালা-পার্বণে শ্বশুর বাড়িতে আসার পাটও প্রায় উঠতে চলেছে। তাই যে কোনো অসুস্থতার সংবাদ শ্বশুর বাড়ি থেকে ভেসে এলে সুমন্তর স্ত্রী বায়না ধরে। অবশ্য সুমন্তরও একরকম গোপন লোভ থাকে শ্বশুরবাড়ি আসার। না, শ্বশুরবাড়ির মোহে নয়। স্রেফ দু-একটা দিন নিজের খেয়ালখুশি মতো ঘুরে বেড়ানোর জন্যে ওরও শ্বশুরবাড়িতে আসতে ভালোই লাগে। কলকাতার লাগোয়া ভালো ঠেক। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, কলেজস্ট্রিটে কফিহাউসে আড্ডা দেওয়া, হাল আমলের বাঙলা পদ্য চর্চার খবরাখবর নেওয়া—এসব হয়ে যায়।

বরুণ রানাঘাটের পাশের একটা গ্রামের ছেলে। বি এস সি পাশ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের স্কুলে একটা পেট-ভাতা মাস্টারি জুটিয়ে নিয়েছিল। গ্রামের ছেলে, গ্রামের মাস্টার, একটা ছোটো গণ্ডীর সংক্ষিপ্ত জীবনেই ওর কাটিয়ে দেওয়ার কথা। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে, এতেই সন্তুষ্ট থাকতে অভ্যস্থ হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। কিন্তু হঠাৎই ওর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। এবং একটা চাকরি। বিয়ের অনুসঙ্গেই চাকরি। মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরি। বেশ নামকরা কোম্পানিতে। নামকরা কোম্পানি ওদের ভালোই পয়সা দেয়। তখন সুমন্তর বয়স তেইশ হবে, যখন ও ইলাকে বিয়ে করে ও চাকরি পায়। তখন গাঁয়ে মাস্টারি করে যা আয় করত, তার চেয়ে নতুন চাকরিতে ঢুকে তার আয় সাত-আট গুণ বেড়ে গেল এক লাফে। সেই থেকে বরুণ কাঁকুড়গাছি পোস্ট-অফিসের কাছে রামকৃষ্ণ সমাধি লেনে একটা সরকারি ফ্ল্যাট জুটিয়ে নিয়ে দিব্বি আছে। কলকাতাতে ওর পোস্টিং, কলকাতার চারপাশ ঘিরেই ওর কাজের চৌহদ্দী। কাজেই ওখানেই ও জমে আছে একেবারে প্রায় আট-ন' বছর। একটা সন্তানও হয়েছে ওর। পুত্র সন্তান। স্ত্রী ইলা কলকাতারই মেয়ে। ওর বাবা বেশ সঙ্গতি-সম্পন্ন মানুষ। বরুণকে আর জীবনে কলকাতা ছাড়তে হবে না, কারণ ওর শ্বশুরমশায় সেসব ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছেন। বরুণের

বাবা মা উভয়েই মারা গেছেন। গ্রামের এজমালি বাড়ির কথা ভুলে গেছে বরুণ। গ্রামে ফেরার তেমন আর টান নেই বরুণের। দাদাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ আনুষ্ঠানিক হয়ে পড়েছে। এসব নানা কারণে সুমন্তর সঙ্গে বরুণের দেখা সাক্ষাৎ যা হবার তা হয় কলকাতাতেই।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে সুমন্ত সোজা চলে এসেছে বরুণের ফ্ল্যাটে। শনিবার। বরুণ দুপুরের পর বাড়ি থাকে। বরুণের সঙ্গে ওর ফ্ল্যাটে বসে খানিক আড্ডা জমিয়ে বিকেল নাগাদ একবার কফি হাউসে যাবে দুজনে। কলকাতায় এসে বেশির ভাগ সময় সুমন্ত বরুণকেই তার সঙ্গী করে নেয়। কলেজের বন্ধু। একসঙ্গে পদ্য লিখত। পদ্যের কাগজ বার করত। এসব কারণে দুজনের বন্ধুত্ব —সময় এবং ভূগোল-এর কারণে খুব বেশি দূরে সরে যায়নি।

কড়া নাড়তেই বরুণ দরজা খুলে সুমন্তকে পেয়ে বেশ চনমনিয়ে উঠল। বলল, 'বাঃ, ভালোই হলো—'

কি ভালো হলো—

ভিতরে চলো, বলছি, ভালো খবর আছে—

ওরা ভিতরে গিয়ে বসতেই, বেশ খুশি মনে এসে দাঁড়াল ইলা। সেও বলল, 'বেশ হয়েছে! জমবে ভালো—'

কি হলো ইলা ?—সুমন্ত বলল।

ওঁরা তো আগামীকাল বেড়াতে যাচ্ছেন,—ওঁরা মানে উনি আর দিব্যেন্দু। আপনিও সঙ্গী হয়ে যান।

ঠিক সময় মতোই এসেছ। একটু দেরী হলেই বেরিয়ে যেতাম। তিনটেয় কফি হাউসে দিব্যেন্দুর সঙ্গে 'মিট' করার কথা আছে। —বরুণ বলল, এবং ইলাকে ডেকে বলল—ঝটপট একটু চা করে দিয়ে তোমার আতিথেয়তা সেরে নাও তো ইলা। আমরা মিনিট পনেরর মধ্যেই উঠব।

ইলা চা করতে চলে গেল।

দিব্যেন্দু! মানে আমাদের আঁতলে দিব্যেন্দু! কতকাল ওকে দেখিনি। ওর খবর আগে বলো, শুনি। ওতো প্রায় অজ্ঞাতবাসে চলে গিয়েছিল।

প্রায় তাই, কিন্তু হঠাৎ উদিত হয়েছে। এবং বেশ জুৎসই ভাবেই উদিত হয়েছে। ও এখন রাইটার্সে খুপরি পেয়েছে, জান? সল্টলেকে ফ্ল্যাট কিনেছে। প্রেম করে এক অধ্যাপিকাকে বিয়ে করেছে। ডব্লু বি সি এস অফিসারদের রাইটার্সে খুপরি পাওয়া মানেই নট নড়ন-চড়ন ব্যাপার। এ ভাগ্য কম ডব্লু বি সি এস-দেরই হয়।

দিব্যেন্দুর বাবা বছর দশেক আগে রানাঘাটে বদলি হয়ে যান। উনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে একজন ছোট-খাট অফিসার। বছর চারেক তিনি রানাঘাটে ছিলেন। দিব্যেন্দুর সঙ্গে সেই সময় বরুণ আর সুমন্তর পরিচয় হয়। দিব্যেন্দু বরাবর কলকাতাতেই পড়াশুনো করেছে। দিব্যেন্দু তার পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। দাদা কলকাতার এক হাসপাতালের ডাক্তার। দাদার কাছে এবং বাবার কাছে পালা করে থাকত দিব্যেন্দু। পড়ত কলকাতায়। সেই সময় দিব্যেন্দুর সঙ্গে বরুণ এবং সুমন্তর পরিচয় হয়। বরুণ এবং সুমন্ত তখন ছিল রানাঘাট কলেজের ছাত্র। দিব্যেন্দু কলকাতার মানুষ হয়েছে। কলকাতাতেই পড়াশুনো করেছে, খুব চটপটে ছেলে, আর মুখে কাফকা, কামু, সার্ত, বালজাক লেগেই থাকত তার, কারণ ওসব সে পড়ে ফেলেছে—এসব কারণে খুব তাড়াতাড়ি সে রানাঘাটের তরুণতম পদ্যচর্চাকারী ছেলেদের মধ্যে হিরো হয়ে উঠেছিল। তার মুখে কফি হাউসের রোমান্সের গল্প শুনে খুব খুশি হত সবাই। পদ্যের থিয়োরী ছাড়ত সে মফস্বলের তরুণদের মধ্যে বেশ লাগসই ভাবেই, স্যুররিয়ালিজম, ডাডাইজম-এসব কথা বরুণ আর সুমন্ত ওর মুখে প্রথম শুনে বিমূঢ় হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দিব্যেন্দুর সঙ্গে বরুণ আর সুমন্তর সম্পর্কটা বেশ গাঢ় হয়েছিল। এখন কেবল বরুণের সঙ্গেই যোগাযোগ আছে। দুজনে বেশ কাছাকাছি অঞ্চলেই এসে গেছে আজকাল। দিব্যেন্দুকে সুমন্ত ভুলে যায়নি এতদিনে, কিন্তু দীর্ঘদিন দেখা সাক্ষাৎ না থাকলে যা হয়—অনেক হালকা হয়ে গেছে ওদের সম্পর্ক। একদা, ঐ রানাঘাটে একটা লিটল ম্যাগাজিন বের করেছিল তিনজনে। তার দু তিনটে সংখ্যা বহু কষ্টে বেরিয়েছিল। সেই কাগজে সুমন্ত আর বরুণ লিখত ছন্দমিল দেওয়া রোমান্টিক ধাঁচের কাঁচা কাঁচা কবিতা আর দিব্যেন্দু ইংরেজি কবিতার অনুবাদ করত। থিয়োরী লিখত ঐ কাগজে। ওর বাংলা কবিতায় সেই তখন থেকেই এলার্জি আছে। তবু, দিব্যেন্দু সুমন্ত ও বরুণকে বন্ধু হিসেবে মেনে নিয়েছিল। সেই বেলুন একদিন ফেটে গেল। গত ছ' সাত বছর সুমন্ত দিব্যেন্দুর পাত্তা পায়নি। আজ, বরুণের কাছে দিব্যেন্দুর একেবারে হালফিল খবর পেয়ে সুমন্ত বেশ চনমনিয়ে উঠল।

দিব্যেন্দু যে কবিতা লেখার মতো অপকর্মে ডুবে থাকতে আসেনি, এটা সুমন্ত তখনও জানত। ওর ফালতু আর উপরি আবেগ নিয়ে মাথা ব্যথা ছিল না আদৌ। তখনই দিব্যেন্দু বেশ ইনটেলেকচুয়াল। পৃথিবীর বড় বড় মানুষের লেখা পড়ার পর বাঙালী কবিদের হাল বুঝে গেছে। হালে সে যেন ইংরেজ কবি হতে চায়, ফালতু বাঙালী কবি হওয়ার বিন্দুমাত্র সখ ছিলনা ওর। কিন্তু বরুণ আর সুমন্ত খাঁটি মফস্বলের ছেলে। বাংলার মফস্বলের স্যাঁতসেঁতে হাওয়ায় ওদের হৃদয় নরম, অল্প আবেগেই দ্রাবিত হয়ে পড়ে। তাই বরুণ আজও তার পদ্যচর্চা ত্যাগ করেনি। তাছাড়া বরুণ ইলার কাছ থেকে বেশ প্রেরণা পেয়েছে। বরুণ মাঝে মধ্যে পদ্য না লিখলে ইলা রাগ করে, অভিমান করে। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। পদ্য লেখার ব্যাপারে ঘরের বৌর এমন সমর্থন কেবল ভাগ্যে থাকলেই জোটে। ইতিমধ্যে ইলার অনুপ্রেরণায় বরুণ একটা কবিতার চটিবই প্রকাশ করেছে নিজের গ্যাঁটের টাকায়। থাক, ধরা থাক কিছু হৃদয়ের উত্তাপ, কাগজে-কালিতে। দিব্যেন্দু নাকি আজও তার অনুবাদ কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। দু একটা তার নানান্ লিটল ম্যাগাজিনে বের হয়। এ খবর সুমন্তকে বরুণই দিল। হায়, কেবল সুমন্তই আর কিছু লিখতে পারে না আজকাল। কিছুই না। কোথায় যে গেল তার হৃদয়ের সেই অতিরিক্ত বাষ্প, কোথায় যে গেল সেই হৃদয়ের দ্রবণ, ছন্দে-মিলে মৌতাতে ভোগা তিরতিরে অনুভূতিটুকু। সে এখন একজন ব্যর্থ কেরানী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে ধান-পাট ফলনের রিপোর্ট রিটার্ন তৈরি করে। মফস্বলের হাফ-গেরস্থ। রানাঘাটের মতো ছোট্ট শহরের পক্ষে মানানসই একজন নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী।

ইলার করে দেওয়া চা খাওয়া হয়ে গেছে ওদের। বরুণ বাইরে বেরুনোর জন্যে তৈরি হয়ে নিয়েছে ইতিমধ্যে।

চলো, বরুণ সুমন্তকে বলল।

কোথায় যাবে ?

কফি হাউসে ওখানে দিব্যেন্দু অপেক্ষা করবে বিকেল চারটে থেকে। অফিস থেকে সোজা বেরিয়ে কফি হাউসে আসবে ও।

সত্যিই কাল তোমরা বেড়াতে যাচ্ছো ?

হ্যাঁ, তুমিও যাবে।

কিন্তু, একটু টানাটানি আছে, এসেছি শ্বশুরকে দেখতে—

একেবারেই পাতি গেরস্থ হয়ে পড়েছ দেখছি, শ্বশুরমশায় তো ভালোই আছে বললে, তবে আর ঝামেলার কি আছে—

পয়সা কড়ি—

আমি ধার দেব, দিব্যেন্দু আছে। তুমি যা পার নিয়ে নিও—

আচ্ছা চলো তো দেখি—

বরুণ এবং সুমন্ত কফি হাউসে চলে এল। ঠিক চারটের সময়। ঢুকেই, প্রায় ঢোকার মুখেই দিব্যেন্দুকে পাওয়া গেল। শনিবারের কফি হাউস হচ্ছে দুনিয়ার ঠেক। ঐ দিন মেলা বসে যায় কফি হাউসে। ঐদিন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া কিম্বা মুর্শীদাবাদের জলঙ্গী, বর্ধমানের কর্ণসুবর্ণ থেকে লিটল ম্যাগের সম্পাদকেরা আসে কলকাতায়—তাদের প্রিয় কবিদের কবিতা সংগ্রহের জন্যে। কাজেই চারটে থেকেই জমজমাট হয়ে ওঠে কফি হাউস।

দিব্যেন্দু তার রাশভারি চালে হাত তুলে বরুণ আর সুমন্তকে ডেকে নিল। দিব্যেন্দু সুমন্তে দেখে বেশ খানিকটা অবাক হলো। অনেকদিন পর দেখা। উচ্ছ্বাসের ঘোর কাটতেই দিব্যেন্দু বলল, 'সুমন্তও আমাদের

সঙ্গে চলুক না, বরুণ—'

হ্যাঁ, ওতো যাবেই, নিশ্চয়ই যাবে—

তাহলে স্থির করো, কোথায় যাবো আমরা

কফির অর্ডার দাও দিব্যেন্দু।

দিব্যেন্দু কফি হাউসের কায়দায় টুসকি ঝেড়ে তিনকাপ কফির অর্ডার দিল।

রাতেই ফিরতে হবে, ভোরে বেরিয়ে রাতেই ফিরতে হবে, অতএব কাছাকাছি একটা জায়গা তোমরা নির্বাচন কর।—দিব্যেন্দু বলল।

বকখালি—সুমন্ত বলল। ও একবার বকখালি বেড়িয়ে এসেছে। বরুণ এবং দিব্যেন্দু নাকচ করল। ওরাও বকখালি ঘুরে এসেছে।

দীঘা। বরুণ বলল।

উঁহু। দীঘাতে বোধহয় আমরা সবাই দু একবার করে গেছি,—আমি একটা জায়গার কথা বলব?

হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো

ঘাটশিলা। গিয়েছ ঘাটশিলা?

চমৎকার। আমি যাইনি! সুমন্ত প্রায় লাফিয়ে উঠে দিব্যেন্দুর প্রস্তাব সমর্থন করল।

আমিও যাইনি, বরুণ বলল।

আমিও না, দিব্যেন্দু বলল, আমি সব ভেবেচিন্তে রেখেছি। সকাল ৬-১৫ এর স্টীল এ চাপব। দশটার পর নামিয়ে দেবে। বিকেল ৫-২০তে ফিরতি স্টীল পাব। রাত ১০টার পর হাওড়া—কেমন হবে?

এর চেয়ে ভালো আর হয় না। বরুণ এবং সুমন্ত দিব্যেন্দুকে পুরোপুরি সমর্থন করল।

কিন্তু একটা কথা আছে?

কি?

আমার স্ত্রীকে বলা চলবে না যে আমি বেড়াতে যাচ্ছি। ওকে ম্যানেজ করতে হবে। সুমন্ত এসে ভালোই হয়েছে। ওকে ব্যবহার করতে হবে।

কিভাবে ব্যবহার করবে।

তোমরা গিয়ে এমন ভাবখানা করবে যে সুমন্ত হচ্ছে একজন হুমড়ো চুমড়ো মানুষ—এসেছে রাণাঘাট থেকে। দিব্যেন্দুকে এক মহতী কবি সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে নিয়ে যেতে চায়—

বেশ, ঠিক আছে। একটা এপিসোড তৈরি করো, এখুনি—বরুণ বলল—আমরা প্রথমে যাবো তোমার স্ত্রীর কাছে। সবিনয়ে বলব ইনি হচ্ছেন সুমন্ত দত্ত চৌধুরী—স্থানীয় কলেজের বাংলার হেড—কবি সম্মেলনের হোতা—যাচ্ছেন কলকাতা থেকে শক্তি, সুনীল এবং দিব্যেন্দু—

না না না—সুমন্ত আপত্তি জানিয়ে বলল—অধ্যাপক-টধ্যাপক বলো না, যদি দিব্যেন্দুর স্ত্রী ইউ জি সি কিংবা অর্কাকইটা প্রসঙ্গে কথা তোলেন, কিংবা শেষ পাঠান আমলের বাঙলার প্রশাসন বিষয়ই কথা উঠে যায়, তা হলে ফুটে যাবো—সবাই ধরা পড়ে যাবো—

তা হলে, তোমার উপর একটা ইমেজ আরোপ করতে হবে তো, নইলে দিব্যেন্দুর স্ত্রী ছাড়বে কেন দিব্যেন্দুকে৷আচ্ছা বললেই হবে যে তুমি স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার—জন প্রতিনিধি—বরুণ বলল, সাহিত্য সম্মেলনের অর্গানাইজার।

না না, মোটেও তা বলো না—আমার স্ত্রী খচে যেতে পারে। ও ভোটে জেতা মানুষকে পছন্দ করে না, রেগে যায়—

কেন? তোমার বউ কি প্রচ্ছন্ন নকশাল নাকি, বরুণ বলল—

দূর, তা নয়। এটা ওর একরকম কমপ্লেকস। ওর ভোটাধিকার হওয়ার পর থেকে ও যাদের ভোট দিয়েছে তারা কেউই জিততে পারেনি কোনো দিন। ও হলো তাই হেরো পার্টির সমর্থক। সেই জন্যেই ওর ধারণা ভোটে জেতা মানুষরা সব বাজে—

তা হলে যারা হারে তারাই ভালো! কি বল!

হাঃ-হাঃ

কিন্তু একটা প্ল্যান তো ছকে রাখতে হবে।

তা হলে তোমার কলিগ, রানাঘাটের কোনো অফিসার বানানো যায় না সুমন্তকে,—

চলবে না। ওসব পাতি ডব্লু বি সি এস-দের ও পাত্তাই দেয় না। আমার কলিগ বলা মুশকিল। তাতে ওর বিন্দুমাত্র হৃদয় দ্রবিত হবে না। ও এখন আমার চেয়ে বেশি মাইনে পায়, জানো তো! আই এ এস-টাই এ এস বললে চলে—

কিন্তু সবাইকে তো আব আই এ এস বানানো যায় না। আর সুমন্তর যা চেহারা! ওকে একজন জনপ্রতিনিধি বানানো যায় বড়জোর—তাও বামপন্থী জনপ্রতিনিধি—

হাঃ হাঃ

শোনো, এভাবে প্ল্যান করে কিছু হবে না, একেবারে উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। তবে, আমরা যে রানাঘাটের এক মহতী কবি সম্মেলনেই যাচ্ছি—এটাকে অবলম্বন করে সব যেন স্থির হয়, এবং সুমন্তকে পেয়ে ভালোই হয়েছে, তোমাকে তো আমার স্ত্রী চেনে, সুমন্তকে চেনে না ওকেই কাজে লাগাতে হবে।—দিব্যেন্দু বলল।

কবিদের উপর তোমার বৌর খুব ভক্তি, তাই না?

মোটেও না। কালচার সম্বন্ধে অবদমন থেকে এই ভক্তি। আর হ্যাঁ, আকাদামি লরিয়েতদের সম্বন্ধে ওর অবশ্য দুর্বলতা আছে কিছু—দিব্যেন্দু বলল।

তাই হবে, উপস্থিত বুদ্ধির উপর ম্যানেজ করতে হবে। চল উঠি—বরুণ বলল।

কোথায় যাবে?—সুমন্ত বলল।

একটু জিন খেতে পার্ক স্ট্রীটে যাবো—ওখানে একটা ভালো 'বার' আছে—বরুণ বলল।

তা ভালো, চলো—অনেকদিন মদ্যপান করিনি—আর জিন মদ নয়—অথচ বেশ মদ্য পানের পাপ হয়—দিব্যেন্দু বলল।

পাপ! তোমার দেখছি পাপ করার দিকে লোভ হয়েছে আজকাল! সুমন্ত বলল।

যা বলেছ, একটু পাপ-টাপ না করলে আর পারছি না—বড় একঘেয়ে লাগছে। দিব্যেন্দু বলল।

একটা কথা বলব দিব্যেন্দু?—সুমন্ত মিন মিন করে বলল।

বলো।

তোমার স্ত্রী কবিদের খুব একটা পছন্দ করেন না বললে। কবি সম্মেলনে উনি কি তোমাকে যেতে দেবেন?

হ্যাঁ, উনি তা দেবেন। কারণ কবি আর কবি-সম্মেলন এক জিনিস নয়। একটা হলো ব্যক্তিত্ব আর একটা হল কালচার। উনি কালচার পছন্দ করেন!—দিব্যেন্দু বলল।

বাব্বাঃ—সুমন্ত হাফ ছাড়ল।

কি হলো—

এত সব সূক্ষ্ম ব্যাপার আমি ভালো বুঝিও না—সুমন্ত বলল।

বুঝে কাজ নেই তোমার। বেশ আছ,—বরং এবার উঠি, চলো, একটু জিন খাইগে—

কফি হাউস রমরম করছে এখন। ঘ্যাম ঘ্যাম কবিদের ঘিরে এ'দো গলি আর মফস্বল থেকে আসা পাতি কবিদের চাকলায় হাওয়া মাতোয়ারা হয়েছে। বাংলা কবিতার ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে তীব্র কচলানি শুরু হয়ে গেছে। দুদ্দাড়-ল্যাং মেরে কাত করে দেওয়া হচ্ছে পূর্বসূরীদের। গম্ভীর স্পর্ধা, অহংকার-এর বাতাস ছুঁয়ে বয়ে আসছে এক কোণ থেকে গ্যাঞ্জার গন্ধ। বিদ্রোহ, দৌরাত্ম, তারুণ্যের ধর্ম। এই ধর্ম রক্ষার জন্যে চল্লিশ পেরিয়ে পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই কবিরাও প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সুমন্ত এসব দেখে কেবল ভিরমি খায়। হায় মফস্বলের তির তিরে মধ্যবিত্ত বুক—কোনো রকম বিদ্রোহ না করেই নিজেকে কালের অন্ধকার স্রোতে নিজেকে সঁপে দেওয়া, হারিয়ে যাওয়া। সুমন্ত বহুদিন কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু এই বাতাসে তার বুক মুষড়ে ওঠে। যদি এদের সঙ্গে একত্রে পাল্লা দিয়ে সে চলতে পারত, তাহলে হয়ত পাঁচটা লিটিল ম্যাগ-এ তারও কবিতা ছাপা হতো—এই দুরন্ত দঙ্গলে সেই সুবাদে হয়তো তারও একটু স্থান হতো। হলো না, কিছুই হলো না।

এখন, কেবল সে মনে মনে রবীন্দ্রনাথকে আউড়ে, 'জানি হে জানি তাও হয়নি হারা'—ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়। কবিতা-আন্দোলনের নতুন রূপ-রেখা নিয়ে হুল্লোড় চলছে পাশের টেবিলে, সুমন্তর মনে হলো, ওদের সঙ্গে যদি সুমন্তর আলাপ থাকত তো বেশ হতো।

কি ভাবছ সুমন্ত—বরুণ বলল—

চমৎকার!

কি?

যাই বলো—এরা বেশ আছে।

হাঃ হাঃ

হাসলে কেন বরুণ?

চলো, জিন খেতে—দিব্যেন্দু লাফিয়ে উঠল।

শেষবারের মতো চোখ বুলিয়ে নিল সুমন্ত কফি হাউসের উপর দিয়ে। এক কোনায় বসে আর্ট স্কুলের কিছু তরুণ তাদের ঝুলি থেকে কিছু ছবি বের করে তাদের বন্ধুদের দেখাচ্ছে। একে একে কফি হাউস ভরে যাচ্ছে নানান মানুষে। বনেদী রেসুড়ে আসছেন, যিনি ঘোড়ার পায়ে কলকাতাও বাজি ধরতে পারেন, আসছেন বিগত যৌবন খেলোয়াড়, ফিল্ম এবং মঞ্চের উঠতি আর ব্যর্থ অভিনেতারা—নিজেদের অবস্থা যাচাই করার জন্যে। আসছেন সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে বিগ-হাউস পত্রিকার সাংবাদিক, সহকারী চিত্র পরিচালক, মঞ্চ নির্দেশক, তুফান তুলে এসেই মিলিয়ে গেলেন এক হিরো—আর আসছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সমালোচক, প্রাবন্ধিক। আর এরই মাঝে ফুলের মতো ফুটে আছে দু-একটি টেবিলে সুন্দরী মেয়েরা। ও'রা কি কবিতা লেখেন? ও'রা কি মঞ্চের অভিনেত্রী? বিদূষী? মফস্বলের সুমন্তর চোখ আঠা হয়ে লেগে থাকে কফি হাউসের আনাচে-কানাচে।

পার্ক স্ট্রীটের এই নতুন বারটির আবিষ্কারক দিব্যেন্দু। গ্ল্যামারহীন, ছোটো, ঘরোয়া। যেন বৈঠকখানা ঘর। মৃদু আলো। কয়েকটি সোফা আছে সুন্দর করে সাজানো। গা এলিয়ে ঘরোয়া পরিবেশে মদ্যপান যারা করতে চান—তাঁদের ভালো লাগবে। না, কোনো বড় বারের মতো তীব্রতা এর নেই, আছে নিরিবিলি শান্তি।

তিনজনে তিন পেগ জিন খেয়ে ঝিম হলো। সুমন্ত মদ্যপানে অভ্যস্ত—তবে বাংলা। জিন সে তুলনায় ভারি আরামদায়ক, শান্ত। জিন বোধহয় সুমন্ত এই প্রথম খেল।

উফ—দুর্বিসহ—দিব্যেন্দুর মুখে কথা ফুটল—

কি হলো, দিব্যেন্দু—বরুণ বলল।

শালা, কি যে ফর্মুলা আছে; বুঝি না। ছেলেটার বয়স সবে এক বছর। অথচ এখন থেকেই প্ল্যান চলছে ওকে নিয়ে—কোন ইংলিশ-মিডিয়ামে ওকে ভর্তি করতে হবে। তারপর ওকে তৈরি করতে হবে, বিনয় ঘোষের ভাষায়, প্রথম শ্রেণীর একটি নিশ্চিন্ত দাসত্বের উপযুক্ত করে—আমাদের ছেলেগুলোর এই হলো পরিণতি—একেই বলে রাইটনেস—আমাকেও আশৈশব এভাবেই গড়া হয়ে পাঁচ ফুট চার ইঞ্চির একজন মানুষকে ছয় ফুট তিন ইঞ্চি বানানোর জন্যে হাতে তুলে দেওয়া হয় কি জান?

কি?

কেরিয়ার অ্যাণ্ড কোর্স, রিডার্স ডাইজেস্ট—

হুম—

নিজের কথা নিজের মতো করে কখনও ভাবতে পারলাম না আমি—দিব্যেন্দু বলল।

উফ—বরুণ ঢেকুর তুলল—

কাল আমরা কিছু পাপ করব। অল্প একটু পাপ। কিছু অশ্লীলতা করব। একটু বেলেল্লাপনা করব। রাজি?

রাজি—বরুণ বলল, অন্তত একটি দিনের জন্যেও আমরা এই একঘেয়েমি থেকে পালিয়ে বাঁচব!

সুমন্ত, তুমি রাজি?

রাজি! তবে কাকে বলে পাপ, কাকে বলে পুণ্য—এ বোধই নেই যে আমার!—সুমন্ত বলল।

এতক্ষণে সুমন্ত ওদের বন্ধুত্বের পুরনো ভাবটায় আঁচ পেল। ওরাও তাহলে বোধহয় দুঃখী। সামাজিক অর্থনৈতিক কারণে দিব্যেন্দু এবং বরুণের সঙ্গে সুমন্তর মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। বাঙালী জীবনের সফলতার একটা সামাজিক অলিখিত ভাবধারা আছে। সেই ভবধারায় ফেলে দেখতে গেলে বরুণ আর দিব্যেন্দু সফল। দিব্যেন্দু ফ্ল্যাট কিনেছে, অধ্যাপিকা বিয়ে করেছে, তাও আবার প্রেম করে, এ পর্যন্ত সুমন্ত শুনেছে। এতেই বোঝা যায় দিব্যেন্দুর মতো পাঁচ ফুট চার ইঞ্চির বাঙালীর জীবনে কতটা সামাজিক সফলতা এসেছে। বরুণের সঙ্গে তো সুমন্তর রীতিমতো যোগাযোগ আছে। ইলার মতো স্ত্রী, এবং ওর ফ্ল্যাটের সাজানো গোছানো অবস্থা দেখে তো বেশ গর্বই বোধ করে সুমন্ত। যা হোক, এমন একজন বন্ধু তার আছে, যে মধ্যবিত্ত সমাজে কূল পেয়েছে। এর চেয়ে বেশি স্বপ্ন দেখতে ক'জন অভ্যস্ত। গত দু'শ বছরে বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবন গড়ে উঠে একটা আদল পেয়েছে। সেই আদল বিবেকানন্দ, নজরুল, রবীন্দ্রনাথে মাজাঘষা হয়ে এখন বেশ রীতিমতো সুন্দর। কত না বাঙালী মনীষীর চিন্তায় গত দু'শ বছরের ঐতিহ্যের উপর দাঁড় করানো এই এক অদ্ভুত জীবন। আকাশে মাথা ঠেকে না, মাটিতে পা লাগে না—অথচ নিস্পন্দ ভেসে থাকা এক নিরেট লোভনীয় জীবন। সমস্ত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়—এই জীবনের জয়গানে মুখর। কচি কচি ছেলেদের স্বপ্নে আর রক্তে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এই ফানুসের মোহ। বরুণ এবং দিব্যেন্দু তো এর মধ্যে আশ্রয় করে নিয়েছে। সুমন্ত পারেনি। সুমন্ত দৌড়ে পিছিয়ে গেছে, কিংবা যোগাযোগে অপারগম হয়ে পড়েছে, সেই জন্যে সে কেরানী। তবু মন্দ কী! শ্রম নেই, অথচ প্রান্তিক নিশ্চয়তাটুকু তো সেও পেয়েছে। একটু হীনমন্যতা তার আছে বটে, তবে, সে ব্যাপারটাকে পাত্তা দেয় না।

ঝিমুচ্ছ কেন সুমন্ত, দিব্যেন্দু বলল।

অ, হ্যাঁ, তাহলে কাল একটু পাপ করতে হবে আমাদের কি বলো—

পাপ নয়, বরং বলা উচিত এস্থেটিক-টেনশন—বরুণ শুধরে নিয়ে বলল।

বাঃ, ভালো বলেছ, আর সেটার শুরু হবে আজ থেকেই, বৌকে ফাঁকি দিয়ে—দিব্যেন্দু বলল।

নিজের সঙ্গে নিজেরই ফাটকাবাজী, ধোঁকা দেওয়া—কি বলো, এতে একরকম আত্মহননের প্রেরণা আছে, কি বলো—বরুণ বলল।

দূর দূর, থিয়োরাইজ করে কি লাভ। তার চেয়ে "পাপ' শব্দটাই ভালো। বেশ সাব্লাইম টোন ফুটে ওঠে, জীবনের একটা মাত্রা বোঝা যায়। ডাইমেনশন। সেকেণ্ড ডাইমেনশন। তাছাড়া 'পাপ' শব্দটার সঙ্গে একরকম সামাজিক মূল্যবোধও জড়িয়ে আছে। ইতিমধ্যে বিশ্বের চতুর্থ মাত্রা, অর্থাৎ ফোরথ ডাইমেনশন আবিষ্কার হয়ে গেছে, কিন্তু, শালা, ভারতীয় মধ্যবিত্ত জীবনের এই একমাত্রার প্রণালী আর ভাঙল না। দিব্যেন্দু বলল।

সুমন্ত চুপচাপ রয়েছে। একদিন ও ভেবেছিল দশটা কবিতা লিখবে। মাত্র দশটা। তার জন্যে দাঁত চেপে ও সাতাশ আঠাশ বছর পর্যন্ত কেবল কবিতারই চর্চা করত। কী যে মধ্যবিত্ত জীবন, কিইবা তার স্বপ্ন, তার পতন, তার পাপ-পুণ্য—এসব সে ভালো করে বোঝেইনি। কেরিয়ার অ্যাণ্ড কোর্স হাতে নিলে তার শরীর রিরি করে উঠত। কোনো ফাঁপা, শূন্য আদর্শবাদে সে কখনও মুগ্ধ হয়নি। এমনকি, একজন রাজনৈতিক দলের অতি সাধারণ ক্যাডারও যে সামাজিক সম্মান-ইজ্জৎ ভোগ করে তাও সে পায়নি। এভাবে কি হলো? সে হারিয়ে গেল। কোথায় যে হারিয়ে গেল! হদিস পাওয়া মুশকিল আজ? ওর দুঃখ, অবশ্যই অন্যরকম। বরুণ আর দিব্যেন্দুর যদি হয় অস্তিত্বের বিপন্নতা, তবে, সুমন্তর অস্তিত্বের শূন্যতা—

আর এক পেগ করে হলে হয়—বরুণ বলল।

তা বেশ তো, তবে, মাতাল করে ছেড়ো না যেন, বউ ধরে ফেলবে, সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে তখন—দিব্যেন্দু বলল।

দূর, জিনে কি কেউ মাতাল হয়!—বরুণ অর্ডার দিল।

ওরা আর এক পেগ করে জিন খেয়ে, খানিকটা পরেই উঠে পড়ল।

চলো, তোমরা আমার সঙ্গেই যাবে।—দিব্যেন্দু বলল।

ওরা তিনজন রাস্তায় নেমে এল।

ট্যাক্সি,—দিব্যেন্দু হাত তুলল। ট্যাক্সিটা এগিয়ে আসছে।

আবার ট্যাক্সি কেন? একটু এগিয়ে গিয়ে এস-১৪ ধরলে হতো না? বোধহয় তোমার বাড়ির কাছাকাছি নামিয়ে দিত। ওদিক দিয়েই তো যায় এস-১৪—সুমন্ত বলল।

তোমার ঐ পাতি মধ্যবিত্ত স্বভাব রাখো তো। খালি ট্যাক্সি এই কলকাতার ভাগ্যে থাকলে পাওয়া যায়, জানো—দিব্যেন্দু সুমন্তকে ধমক দিয়ে বলল।

ওরা তিনজন ট্যাক্সি চেপে এসে নামল দিব্যেন্দুর ফ্ল্যাটের সামনে।

দোতলায় ফ্ল্যাট। উঠে কলিং বেল টিপল দিব্যেন্দু। ভিতর থেকে সুন্দর মিষ্টি কণ্ঠস্বর ভেসে এল 'যাই'।

একটু দাঁড়াতে হলো ওদের।- সামান্য একটু। সেইসময় সুমন্ত দরজায় লাগান একটা নাম ও নম্বর দেওয়া প্লেট পড়ছিল। এই ফ্ল্যাটের নাম 'সুজাতা'। দিব্যেন্দুর স্ত্রীর নাম সুজাতা। স্ত্রীর নামেই দিব্যেন্দু ফ্ল্যাটের নাম রেখেছে—এটা আন্দাজ করে নিল।

সুইট—সুমন্ত নিজে নিজে বলল।

কি?

তোমার স্ত্রীর নাম।

ওঃ।

দিব্যেন্দুর স্ত্রী এসে দরজা খুলে দিল। ও বাকি দুজনকে, অর্থাৎ বরুণকে এবং সুমন্তকে ভাবতে পারেনি। তাই লজ্জিত হয়ে বরুণকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'দেরি হয়ে গেল, বাচ্চাটাকে খাওয়াচ্ছিলাম, কিছু মনে করবেন না'। —বরুণকে দিব্যেন্দুর স্ত্রী চেনেন।

দিব্যেন্দুর স্ত্রী আপ্যায়ন করে ভিতরে নিয়ে গেলেন তিনজনকেই। বসতে বললেন। নিজে ওদের জন্যে ডানলোপিলোর সোফা ঝেড়ে দিলেন। ওরা বসার পর একটু দাঁড়ালেন। বোধহয় উনি সুমন্তর সঙ্গে পরিচিত হতে চাইছেন। কিন্তু, বরুণ এবং দিব্যেন্দুর উপস্থিত বুদ্ধি সম্ভবত ঘোরের মাথায় ব্যর্থ হতে চলেছে। তবু ভালো যে এতক্ষণ ওরা চুপচাপ আছে। দিব্যেন্দুর স্ত্রী এবার বাধ্য হয়েই যেন বরুণের সঙ্গে কথা বললেন—'কি, গিন্নী ভালো আছেন? পুত্র? ওদের একদিন আনলেন না কিন্তু আজও। আমি যেতে পারি না বলে কি আপনার গিন্নীকেও আনতে দোষ?'

দুর জিনে কি কেউ মাতাল হয়!—বরুণ অর্ডার দিল

এ হলো আর এক মধ্যবিত্ত কমপ্লেক্স। কে কার বাড়ি আগে পদধূলি দেবে—তাতে অনেক মান-অভিমান মিশে থাকে। সুমন্ত এক লহমায় ভেবে নিল।

এ ঘরের দরজা দিয়ে অন্য ঘরের মেঝে দেখা যায়, পর্দা সরালে। পর্দা সরান ছিল। সেখানে, মেঝেতে দিব্যেন্দুর তুলতুলে পুত্রটি উঠে দাঁড়াচ্ছে আর পড়ে যাচ্ছে। দিব্যেন্দুর স্ত্রী 'আসছি' বলে অন্য ঘরটিতে চলে গেলেন।

জানলা দিয়ে তাকালে কালো ঝকঝকে রাস্তা চোখে পড়ে। শান্ত, নীরব রাস্তা। দু'একটি কার, একটি দুটি মোটর বাইক ছাড়া কোনো উপদ্রব নেই। একটি কি দুটি মানুষ হেঁটে যাচ্ছে সন্ধ্যের নিওন আলোর পথ দিয়ে। কিছুক্ষণ আগে হালকা এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বৃষ্টিতে ভিজে কালো রাস্তা ঝকঝকে হয়েছে। ঠাণ্ডা নিওন আলো পড়ে পাথরকুচির উপর হীরের দ্যুতির আভাস তৈরি করেছে। একটা বাচ্চা গুলমোহর গাছে থৈ থৈ করছে রক্ত রাঙা ফুলের ঢেউ। তার উপরও পড়েছে আলো। সমস্ত পরিবেশটাই ঝকঝকে, ছিমছাম, শান্ত, সুন্দর। বাইরে থেকে দেখে এমন সুন্দর লাগে না। দোতলার জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখে সুমন্ত মুগ্ধ হলো। ওর মনে হলো ও বিদেশে এসেছে। মধ্যে মধ্যে বিদেশী ছবিতে এমন রঙিন আর ঝকঝকে দৃশ্য ও দেখেছে। তার সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে হলো ওর এই পরিবেশটাকে। কলরব মুখরিত অগোছালো নগর কলকাতার একপাশে স্বপ্নের মধ্যে যেন ঘুমিয়ে আছে এই পরিবেশ। নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের এক তরুণের পক্ষে এখানে স্থান করে নেওয়া তো এক সিদ্ধিলাভ।

চমৎকার। সুমন্ত বলেই ফেলল।

কি? বরুণ জিজ্ঞাসা করল।

দিব্যেন্দুর এই ফ্ল্যাট, এই পরিবেশ, দিব্যেন্দুর স্ত্রী, ওর সন্তানটিও। ভালোই আছ হে দিব্যেন্দু।

সুজাতা মৃদু, সপ্রতিভ, মার্জিত, ধীমতী, সামান্য কৃশ কিন্তু ভারি স্মার্ট মেয়ে। একটা বড় ট্রের উপর ওদের তিনজনের জন্যে খাবার সাজিয়ে নিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল সুজাতা। দিব্যেন্দু একটা 'টি'-টেবিল টেনে এনে দিল। তার উপর ট্রে-টা নামিয়ে সুজাতা তিন জনের সামনে তিনটে বড় শাদা প্লেট এগিয়ে দিল। চিনে মাটির ঝকঝকে প্লেটে দৈ আর খৈ। কিছু আমের টুকরো, সন্দেশ। ফ্রিজ থেকে নামান। তাই সবই হিমশীতল। গরমের পক্ষে তোফা জলখাবার। এরপর সুজাতা একটা হাতলহীন পাতলা চেয়ার টেনে ওদের সামনে বসল।

এতক্ষণে দিব্যেন্দুর মাথায় বুদ্ধি খুলে গেছে। ও সুজাতাকে বলল—'আমার বন্ধু, সুমন্ত, রাণাঘাটে বাড়ি, দারুণ পদ্য লেখে।' সুজাতা দু হাত জোড় করে নমস্কার জানাল। এখনকার একজন নামকরা তরুণ কবি, বুঝলে সুজাতা, ওকে নিয়ে হৈ চৈ হয় কফি হাউসে। সারা পশ্চিমবাংলায় ওর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে—'দেশ' পত্রিকায় গত দু'বছরে ওর চার-পাঁচটা কবিতা ছাপা হয়েছে—দিব্যেন্দু এক নিঃশ্বাসে সুমন্তর উপর ইমেজ আরোপ করে চলল।

তাই বুঝি, তুমি এতদিন তো ওঁর কথা আমাকে বলনি, সুজাতা অনুযোগের সুরে বলল।

বলার চেয়ে ধরে এনেই বেশি ভালো করিনি?

তা বেশ করেছ, সুজাতা দিব্যেন্দুর কথার চাপে ঢোক গিলে বলল, দেশের কোন সংখ্যায় আপনার কবিতা ছাপা হয়েছে? সুজাতা সরাসরি সুমন্তকে জিজ্ঞাসা করল।

সুমন্ত বেশ খানিকটা হতচকিত হয়ে পড়ল। কানমুখ লজ্জায় খানিকটা গরম হয়ে পড়ল। সুজাতাকে কি সে উত্তর দেবে ভেবে পেল না। সুমন্ত কোনোদিনই 'দেশে' কবিতা লেখেনি। সেই কবে

কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে—এখন সে পুরোপুরি হাফ গেরস্থ। একজন ইতিহাসের অধ্যাপিকা, সাজতামামি নিয়ে যার কারবার তাকে দুম করে মিথ্যে কথা বলার সাহসই হলো না সুমন্তর। বিশেষত সুজাতাকে দেখার পর থেকে সুমন্তর মনে সুজাতা সম্বন্ধে একটা সম্ভ্রমবোধ জাগ্রত হয়ে পড়েছে। চাতুরীর আশ্রয় সে কি ভাবে নেবে। সুমন্তর হাল বুঝে দিব্যেন্দু বলে, 'বোধহয় গত অকটোবর-এর কোনো সংখ্যায়। কেন, সুমন্ত দত্ত চৌধুরী নামটা তোমার মনে পড়ছে না?'

নামটা এমনিতেই ক্যাচি। এরকম নাম বিখ্যাত মানুষদেরই হয় অবশ্য—সুজাতা বলল, 'আচ্ছা, আপনার কবিতা খুঁজে পেতে দেখে নেব। গত দেড় বছরের দেশ ঘরে জমিয়ে রেখেছি।'

সুমন্ত আপাতত হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। দিব্যেন্দু বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়েই বলল, সুমন্ত একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। ও আমার অফিসে গিয়েছিল। প্রস্তাবটা বল সুমন্ত—"

আমি এসেছি আপনার অনুমতি নিতে। দিব্যেন্দুকে আমরা রানাঘাটের কবি সম্মেলনে পেতে চাই। ওখানে সুনীল, শক্তি, বিনয়—এ'রা যাচ্ছেন। তাছাড়া দেবারতি, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, ভাস্কর চক্রবর্তীরাও যেতে পারেন। আমাদের স্থানীয় কলেজ হলে একটা বড় কবি সম্মেলনের আয়োজন করেছি। দিব্যেন্দু হবে প্রধান বক্তা—সুমন্ত বেশ গুছিয়ে বলল।

বেশ তো যাবে। আমার অনুমতি নেওয়ার কি আছে। কথাগুলো বলার পর সুজাতার মুখ চোখে বেশ খুশির হাওয়া ছড়িয়ে পড়ল।

আমরা কিন্তু আপনার গান শুনব,—বরুণ আব্দার করার মতো করে বলল।

বেশ তো, শুনবেন, আগে একটু চা খাইয়ে নিই।

সুজাতা উঠে গেলেন, চা করে আনবার জন্যে। সুজাতা উঠে যাওয়ার পরই দিব্যেন্দু ফিস ফিস করে বলল—গিলেছে, চমৎকার সুমন্ত, চমৎকার।

সুজাতা চা নিয়ে এলেন। সম্ভবত চা হয়েই ছিল। একটা বালিকা ঝি সারাক্ষণের জন্যে আছে ওদের কাজকর্মে সাহায্য করার জন্যে। সুজাতা বললেন—কি গান শুনবেন।

ব্রহ্ম সংগীত।

আমিও পছন্দ করি। সুজাতা সুমন্তকে তারিফ করলেন।

সুজাতা ভালো শিক্ষকের কাছে গান শিখছেন। রেডিও অডিশনে পাশ করেছেন। খুব শিগগিরই ওঁর প্রোগ্রাম পড়বে। সত্যিই, ভারি চমৎকার মহিলা, চাকরি, সংসার, সংগীত-চর্চায় এমন সাফল্য। বলবার মতন, গাল ভরে প্রশংসা করা যায় সুজাতার মতো মহিলাদের। সুজাতাকে দিব্যেন্দু হারমোনিয়ামটা টেনে এনে দিল। সুজাতা হারমোনিয়ামে হাত দিয়ে বললেন, বেশি না, তিনখানা গান শুনাব।

সুজাতা ঠিক তিনখানা গান গাইবার পর থামলেন। বললেন, আর একদিন সময় হাতে নিয়ে এলে যত খুশি গান শোনাব।

এবার আমরা উঠব দিব্যেন্দু,—বরুণ বলল, তাহলে ভোর ৫টার ট্রেনটা ধরা চাই কিন্তু—

ওরা তিনজন উঠে পড়ল।

সুজাতা বরুণ এবং সুমন্তকে খুব সবিনয়ে সস্ত্রীক ওঁর আতিথেয়তা গ্রহণ করার জন্যে নিমন্ত্রণ জানালেন।

দিব্যেন্দু বরুণ আর সুমন্তকে বাস স্টপে পৌঁছে দেবার জন্যে সঙ্গে চললো।

দিব্যেন্দুর ফ্ল্যাট থেকে বাস স্টপ পর্যন্ত যাওয়ার সময়টুকুতে ওরা তিনজনে প্রোগ্রামটা ছকে ফেলল। স্থির হলো, দিব্যেন্দু সোজা হাওড়া চলে যাবে। তিনখানা টিকিট কেটে অপেক্ষা করবে। সুমন্ত বরুণের কাছে রাত্রে থাকবে। পাঁচটার সময় ওরা দুজনে হাওড়া পৌঁছে দিব্যেন্দুর সঙ্গে দেখা করবে। ৬-২০ স্টিম অবশ্যই ধরবে। দিব্যেন্দুর পৌঁছুতে অসুবিধা হবে না, ও পাশের ফ্ল্যাটের একজনকে বলে রাখবে, সে দিব্যেন্দুর মোটর সাইকেলেই দিব্যেন্দুকে হাওড়া পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে। সুজাতাকে এসে বলবে, শিয়ালদা পৌঁছে দিয়ে এলাম।

ভি আই পি থেকে একটা ৪৫ নং ধরল বরুণ আর সুমন্ত। এবার সুমন্তর শ্বশুরবাড়ি।

দিব্যেন্দু চলে গেল। দিব্যেন্দু চলে যাওয়ার পর সুমন্ত বরুণকে ফিস ফিস করে বলল, যাই বলো, যা দেখলাম, তা দিব্যেন্দুর মতো ছেলের পক্ষে যথেষ্ট। কেন যে ওর 'পাপ' করার সাধ হয়। একেই বলে বিলাসিতা।

গুল মারার দরকার হবে? —বরুণ সুমন্তকে জিজ্ঞাসা করল।

না, অতি সাধারণ মহিলাকে টোপ খাওয়ানো সবচেয়ে মুশকিল। ও কবি বিংবা কবি সম্মেলন কোনোটারই ধার ধারে না। যা বলবার আমিই বলব। সত্যি কথা বললেই চলবে।

দমদম এয়ারপোর্ট-এর ২নং গেটের কাছে সুমন্তর শ্বশুরবাড়ি। বাস্তুহারাদের কলোনী। দেখলেই বোঝা যায়। বস্তির পাশাপাশি বাস্তুহারাদের কলোনীও আমাদের সমাজে নতুন ডাইমেনশন তৈরি করেছে। ছোটো-ছোটো জমির টুকরোর মধ্যে খুপরি খুপরি বাড়ি। পাঁচ ইঞ্চি ইঁটের গাঁথুনির উপর টালি বা টিনের ছাউনি দেওয়া। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা নানান জেলার নানান আর্থিক-সামাজিক বৈচিত্র্যের মানুষ এক জায়গায় হয়ে নতুন বসতি গড়ে তুলেছে।

শ্বশুরবাড়িতে এসে বাইরের ঘরে বরুণকে বসিয়ে সুমন্ত সটান ভিতরে চলে গেল স্ত্রী মালতির কাছে। শ্বশুরের সংবাদ না নিলে নয়, তাই প্রথমে শ্বশুরের কথা জানতে চাইলে মালতি একটা লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করল। ধৈর্য ধরছিল না সুমন্তর। মালতিকে মাঝপথে বাধা দিয়ে সে বলল—এখন তাহলে ভালোই।

হ্যাঁ, সামলে নিয়েছেন—মালতি বলল।

তাহলে উদ্বেগের কোনো কারণ নেই।

না থাক। আমি কিন্তু মঙ্গলবারের আগে রানাঘাটে ফিরছি না।

সে কথা নয়, সে কথা নয়, বলছিলাম কি, বাবার শরীরটা যখন ভালোই আছে, তখন একটু ঘাটশিলা বেড়িয়ে এলে হয় না? —সুমন্ত মিন মিন করে বলল।

তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। এখানে কি আমরা ফুর্তি করতে এসেছি? বাবাকে দেখতে এসে ঘাটশিলা বেড়াতে যাবো—এ কোনো মেয়ে বলতে পারে? তাছাড়া, টাকা পয়সা কোথায়? যখন শ্বশুরবাড়ি আসো তখন তো টাকা-পয়সা গুণে নিয়ে আসো। গাড়ি ভাড়া অতো, রিক্সা ভাড়া অতো, বাবার ফল কিনে দেওয়ার পয়সা অতো —ভাইবোনকে নিয়ে একটা সিনেমা দেখার পয়সাও হাতে থাকে না। মালতি খানিক ভ্যানর ভ্যানর করল। ওর আক্ষেপের কোনো শেষ নেই, সুমন্ত জানে।

সবাই যাব না, আমি একা যাব—সুমন্ত বলল।

একা যাবে? আমাকে নিয়ে যাবে না?

বুঝতেই পারছ, বাবাকে দেখতে এসে যদি দুজনেই বেড়াতে যাই লোকে নিন্দে করবে। তার চে' বরং একা যাওয়াই ভালো। তুমি আমাকে কুড়িটা টাকা দাও।

তুমি খুব চালু মাল। ধন্যবাদ তোমাকে, আমার মাথায় যখন ঝামেলা জোটে ঠিক তখনই তোমার বেড়াবার সাধ হয়। সেবার আমার পেটে যখন ছেলে এল, তখন তুমি দার্জিলিং বেড়িয়ে এলে। আমার অসুখ করল যখন, তখন তুমি দীঘা বেড়াতে গেলে। আমি বুঝি না? আমাকে সঙ্গে নিতে তোমার চিরদিন আপত্তি।

শোনো মালতি, এবার টাকা-পয়সা জমিয়ে পুজোর আগেই আমরা পুরী বেড়াতে যাব, কেমন? কুড়িটা টাকা দাও।

কোথায় পাব কুড়ি টাকা? আর কুড়ি টাকাতে তোমার হবে?

আমরা দিব্যেন্দুর কারে যাব। হাত খরচের জন্যে কুড়ি টাকা লাগবে।

দিব্যেন্দু আবার কে?

আমার বন্ধু। বিরাট অফিসার। ওর বৌ ইতিহাসের অধ্যাপিকা। সল্টলেকে বাড়ি। ওর গাড়ি আছে।

কিন্তু কুড়ি টাকাই বা এখন কোথা থেকে পাব?

যা হয় করে ম্যানেজ করো।

টাকাটা তো আর তোমার এখুনি লাগছে না, সকালে দেখব খন।

এখুনি লাগবে।

এখুনি ?

হ্যাঁ, এখুনি। বাইরের ঘরে বরুণ বসে আছে। ওর সঙ্গেই আমি ওদের বাড়ি চলে যাব। রাতে ওখানে থাকব। ভোর ৬-২০-র ট্রেন ধরব। দাও, প্লিজ, টাকাটা দিয়ে দাও।

পার বটে তুমি, মিনতি একটু রাগ করল, বলল—বাইরের ঘরে বন্ধুকে বসিয়ে রেখেছ, সে কথা তো আমাকে কিছু বলো না। একটু চা না করে দিলে কি ভাববে—

রাখো তুমি ওসব। আগে টাকাটা দাও। আর এখুনি বাড়িতে কিছু বলো না, আমি চলে যাওয়ার পর বলো। নইলে লজ্জায় পড়ে যাব—

মা তোমার জন্যে আম, আনারস এনে রেখেছেন, খেয়ে যাবে না ?

প্লিজ, মিনতি, টাকাটা দিয়ে দাও।

বাব্বাঃ, একটু তর সইছে না। ধন্য মানুষ তুমি। নিজের ফুর্তির বেলায় ঠিক আছে। দাঁড়াও, দেখছি। তোমার মতো মানুষ আমি কোথাও দেখিনি বাপু—

মিনতি কুড়িটা টাকা এনে গজ গজ করে সুমন্তর সামনে দাঁড়াল। হাতে টাকাটা দিয়ে বলল—কুড়িটা টাকাই দিলাম। জানি এতে তোমার অসুবিধে হবে, কিন্তু আমার আর কিছু করার নেই।

বিন্দুমাত্র না দাঁড়িয়ে সুমন্ত ছুটে বেরিয়ে এল বাইরের ঘরে। বরুণকে ডেকে নিয়ে সোজা এয়ারপোর্ট হোটেলের সামনে এসে ৪৫ নং বাস ধরল।

বরুণ আর সুমন্ত বরুণের ফ্ল্যাটে এসে বেল টিপতেই ইলা এসে দরজা খুলে দিল। দরজা খুলেই ইলা বরুণের মুখের কাছে, একেবারে ঠোঁটের কাছে নাক নিয়ে বলল, খেয়েছ ?

মাত্র দু পেগ জিন খেয়েছি, জিন যে মদ নয় তা তুমি জানো—

আমাকে শেখাচ্ছ, মদ নয়। জানেন, ও আজকাল খুব দুষ্টুমি করছে। বাইরে থেকে মদ গিলে আসছে। আমি যা সইতে পারিনে—

শালা, কি নাক মাইরি, জিনেও গন্ধ পায়। বরুণ ইলাকে ঠেলে ঠেলে ঘরে ঢুকল। বরুণের পিছু পিছু সুমন্তও ঘরে ঢুকল। এবং দরজায় ছিটকিনি তুলে দিয়ে ইলাও ওদের পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকল।

বরুণের দুখানি ঘরের একখানি ওদের শোবার ঘর। অন্যটি বসবার ঘর এবং অতিথি এলে তাদের থাকবার ঘর। দ্বিতীয় ঘরটিতে ওরা তিনজনে জটলা করতে করতে ঢুকে গেল। বরুণ এবং সুমন্ত ধপাধপ সোফার উপর বসে পড়ল। ইলা ফ্যানটা চালিয়ে দিল। একখানা এল পি চাপানো ছিল রেকর্ড প্লেয়ারের উপর, খুব মৃদু সুরে সেটা বাজ-ছিল। ইলা ওটা বন্ধ করে বলল—পাকা—

হুম

তাহলে শুনি—ইলা ঠ্যাং ছড়িয়ে মেঝেতে বসে পড়ল। খুব চটপটে আর জড়তা শূন্য মেয়ে ইলা। প্রাণ খোলা। মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। অবশ্য বরুণের হাতে তৈরিই বলতে হয়। মাত্র ষোলো বছর বয়সে বরুণের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে এবং তখন থেকেই ইলা স্বাধীনভাবে বরুণের সঙ্গে থাকে। ওকে নিম্ন মধ্যবিত্ত, গ্রাম্য, যৌথ পরিবারের বাঙালী সংসারে বৌ হয়ে কোনো দিন কাটাতে হয়নি। ফলে, ইলার নারীত্বে একরকম মুক্ত সৌন্দর্য তৈরি হতে পেরেছে। এবং সুমন্তর সঙ্গে ওর সম্পর্ক বেশ খোলামেলা। আনুষ্ঠানিক বন্ধুপত্নীসুলভ আচরণ ও কখনো সুমন্তর সঙ্গে করে না। কলকাতায়, বিশেষত শ্বশুরবাড়িতে এলে সুমন্ত বরুণের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেই। এই ঘন ঘন যাতায়াতের ফলে ইলার সঙ্গে ওর একরকম সম্ভ্রম যুক্ত বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। অনেক তুচ্ছ, খুঁটিনাটি, ব্যক্তিগত আলাপচারিতাও ওদের মধ্যে হয়—এসব কোনোটাই আনুষ্ঠানিক নয়। ইলাকে সুমন্ত নানা কারণে বেশ পছন্দ করে। ইলার মধ্যে কিছু অসাধারণত্ব আছে। অতি সাধারণ একটি ঘরোয়া, অল্প শিক্ষিতা মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও, ওর রুচি, রসবোধ, বুদ্ধি কি করে যেন ভারি মার্জিত হয়েছে। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। অবশ্য, বরুণের অবদান এ বিষয়ে অনস্বীকার্য, কিন্তু, আধার ভালো না হলে কেউ কিছু গড়তে পারে না।

ইলা সটান বসে বলল—তা হলে তোমরা যাচ্ছ। দিব্যেন্দুর স্ত্রী ওঁর পতিদেবতাকে ছাড়লেন—

ছাড়বেন না মানে ! বরুণ সগর্বে ঘোষণা করল—

থাক বরুণ, গোপনীয়তা ফাঁস কোরো না। তাহলে ইলার কাছে আমি লজ্জায় পড়ে যাব।

বরুণ চোখ মিটমিট করে বলল এই মহাকবিকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে এক গপ্প ফেঁদে তবে ব্যবস্থা করেছি।

সে আমি বুঝতে পেরেছি। তোমরা যা রাক্যবাগীশ। তবে, আমারও কিছু বলার আছে—

হ্যাঁ বলো—সুমন্ত বলল। ইলার সঙ্গে গভীর ভাব থাকায় সুমন্ত ইলাকে 'তুমি' সম্বোধন করে।

শুনেছি আর বইতেও পড়েছি, ইউরোপের ছেলেরা নাকি বেড়াতে যাওয়ার জন্যে মেয়ে সঙ্গী খোঁজে। আমাদের দেশের আউল-বাউল মরমী সাধকদের তো সাধনসঙ্গী ছাড়া চলেই না—

তা হয়ত খোঁজে। কিন্তু, ভয় পেয়ো না ইলা, আমাদের সঙ্গে কোনো মেয়ে সঙ্গী যাচ্ছে না

হুম। গেলে ভালোই হতো।—ইলা মুচকি মুচকি হেসে বলল, সেটাই বোধ হয় সুস্থতা। আমি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের সঙ্গে মেয়ে সঙ্গী নেই, এটা ভাবতেই পারি না। আপনারা তিনজন বেটা ছেলে যাবেন, সঙ্গে কোনো মহিলা থাকবে না—এটা আমার কেমন নোংরা লাগে, খুব যে আপনারা স্ত্রী স্বাধীনতা স্ত্রী স্বাধীনতা করেন, কিন্তু এদিকটা একবার ভেবে দেখেছেন ? ইলা সরাসরি এবং খুব দৃঢ়তার সঙ্গে সুমন্তকে বলল।

তা, তুমি কথাটা ঠিক বলেছ কিন্তু, বেশ ভালো করে ভাবার বিষয় —সুমন্ত বলল।

এমন কি, হিপিরাও দেখেছি কখনও দুজন পুরুষ একসঙ্গে ফেরে না। একজন পুরুষ এবং একজন মেয়ে হিপির দৃশ্যই আমরা সব জায়গায় দেখেছি।

তুমি কি সেক্সুয়াল পারভারশনের কথা বলছ ?—বরুণ বলল।

হ্যাঁ। মদ্যপান করলে অবশ্য তোমার মাথাটা বেশ খোলে। ইলা বলল।

রাখো, আমাদের দেশের কটা মেয়েই বা পুরুষের সঙ্গী হওয়ার উপযুক্ত। বরুণ বলল—

তোমরা চাওনি, তাই হয়নি। তোমরা হোমো-সেকসুয়াল। পার-ভার্ট। ইলা যেন বাঘিনীর মতো বরুণের উপর লাফিয়ে পড়ল।

কি বদ বুদ্ধিরে বাবা। সারা বিকেল ও এসব ভেবেছে, বুঝলে সুমন্ত। নাচার হয়ে বরুণ বলল।

তোমরা কি একটু চা খাবে ?—ইলা বলল, সুমন্তদা, চা করব ?

না, বরং তুমি তোমার কথা চালিয়ে যাও—সুমন্ত ইলাকে অনুভব করতে চাইল।

দেখুন সুমন্তদা, যদি রাগ না করেন তো একটা কথা বলি, প্রকৃতি পুরুষের বন্ধু হওয়ার জন্যে নারীকেই সৃষ্টি করেছে, পুরুষকে নয়, কিন্তু আপনাদের যা আচরণ, দেখে আমার খুব রাগ হয়। আপনারা মেয়েদের শয্যাসঙ্গীর বেশি কিছু ভাবেন না। আর সেই জন্যেই আপনারা একটা পুরো নারীকে কখনও পান না। আধখানা, কিংবা সিকিভাগ নারী পান, আর সেই জন্যেই 'মেয়ে জাতটা অতি বিরক্তিকর' ভাবেন। ভাবেন আমরা বিড়ম্বনা।

এটা এমন একটা ব্যাপার যে একে সামাজিক সমস্যা বলাই ভালো ইলা। সুমন্ত কথা না বাড়িয়ে বরং তর্কের গোড়ায় জল ঢেলে দিয়ে ক্ষান্ত হতে চাইল। কারণ, ইলা একটা মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা করেছে। এ প্রশ্ন সুমন্তর মনেও আছে। অবশ্য, বিপরীত বিন্দু থেকে। আমাদের দেশে নারী-পুরুষের সম্পর্ক শারীরিক, তা এখনও মানসিক স্তরে উন্নীত হয়নি। এবং তারজন্যে কেবলমাত্র পুরুষরাই দায়ী নয়। সুমন্ত একজন নারীকে মানসিক সঙ্গী হিসেবে পেতে চেয়েছিল,

কিন্তু পায়নি কেন ? এ ব্যাপারে তার যথেষ্ট বলার কথা আছে। ইচ্ছে করেই সে সব জটিল প্রশ্ন সুমন্ত বরাবর এড়িয়ে যায়। সুমন্ত কেবল বলল,—ইলা, মেয়েরা যতদিন পুরুষের আর্থিক সঙ্গতিকেই পৌরুষ বলে ভাববে, ততদিন তারা কখনও পুরুষের মানসিক সঙ্গী হওয়ার উপযুক্ত হবে না। আর এটা হলো আবার আমাদের মধ্যবিত্তদেরই সমস্যা। একেবারে খাঁটি মধ্যবিত্তদের সমস্যা। তুমি যখন তোমার ভাইয়ের জন্যে বা বোনের জন্যে বিয়ের যোগাযোগ করো, তখন তুমি কী জাতীয় কথা বলো ঘটকের সঙ্গে ? একবারও কি ভাবো যে তাদের জন্যে তুমি মানসিক সঙ্গী জোটাতে চাইছ ? খবরের কাগজে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনে কি দেখ তুমি ? কি পড়ো ? 'আমার মেয়ে পরমাসুন্দরী। গিটার বাজাতে জানে. তার জন্যে ইঞ্জিনীয়ার বর চাই। কিংবা আমার ছেলের মাসিক আয় ২৫০০ টাকা। তার জন্যে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া প্রকৃত রূপবতী কনে চাই'—এসব কথার মানে কি ? মানে হচ্ছে যে, পুরুষের আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে মেয়েদের শারীরিক যৌন যোগ্যতার সম্পর্ক। অর্থাৎ পুরুষের অর্থ ও নারীর যৌন যোগ্যতা। তুমি হিপি-হিপিনীর কথা বলেছ, কিন্তু তুমি আমাদের দেশের শ্রমজীবী মানুষের কথা বলো নি। আমি আমাদের খামারের শ্রমিকদের দেখেছি একেবারে কাছ থেকে। যে খামারে আমি চাকরি করি সেখানে কিছু পাহাড়ী শ্রমিক আছে। ওরা স্বামী-স্ত্রীতে একসঙ্গে কাজ করে। দুজনের ব্যক্তিত্ব সমান মাপের। একদিন দেখলাম কাজের শেষে দুজনে ঝগড়া করতে করতে বেরিয়ে গেল। অফিস ছুটির পর যখন আমি বাড়ি ফিরছি, খানিকটা পথ আমাকে মাঠ-ঘাট দিয়ে হাঁটতে হয়, আমি দেখলাম মেঠো পথের একপাশে তারা বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে, পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধরে। তাদের উপর ঝরে পড়ছে গাছের পাতা। চমৎকার না ?

দেখুন সুমন্তদা রাগ যদি না করেন

—এই হলো নারী-পুরুষের সম্পর্ক। কোনো বিকার নেই, অন্ধকার নেই, দুজনের মধ্যে দূরত্ব নেই। এবার আমাদের মধ্যবিত্তদের দাম্পত্য জীবনের কথা ভেবে দেখ। অসভ্যতা বলে মনে হবে। আর ঘেঁটে কাজ নেই ইলা। এ কোনো পুরুষের ব্যাপার নয়, কোনো মেয়েরও ব্যাপার নয়। এ হলো সামাজিক বোধ বুদ্ধি এবং রুচির ব্যাপার। দেখ, আন্দোলন করে, আইন করে সতীদাহ বন্ধ করা, বহুবিবাহ বন্ধ করা যায়, বাল-বিধবার বিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু আইন করে তো আর মধ্যবিত্তদের যৌন রুচি বদলানো যায় না। এটা চিন্তা-চৈতন্যের ব্যাপার। এ প্রসঙ্গে আমি আর কিছুই বলতে চাই না।

কিন্তু, আপনারা হচ্ছেন স্থবির। একচুলও নড়তে চান না।

মধ্যবিত্ত সমাজটাই স্থবির। ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজের কথা বলছি এর কালচারের কথা বলছি। এসব ব্যাপার নিয়ে তর্ক আর একদিন করা যাবে ইলা। আজ এ প্রসঙ্গ থাক। আমার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা খুব খারাপ। সে সব আমি ব্যাখ্যা করে দেখেছি। আমাদের যৌন স্বাধীনতা নেই, জানো ? সমাজের রুচি আর অবদমন আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি পিতামাতার অবদমনের শিকার হতে হচ্ছে তাদের ছেলেমেয়েদের—।

আপনাদের প্রেম করে বিয়ে করা উচিত ছিল। —ইলা বলল।

তাহলেও কি সমস্যা মিটতো ? মিটতো না। আমি ভেবে দেখেছি—

হুম, ইলা গম্ভীর হলো।

প্রসঙ্গটা এখানেই চাপা পড়ল। কেউই এখন গুরু-গম্ভীর সামাজিক জটিলতা নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। বিষয়টাও খুব ক্লান্তিকর এবং দুরূহ।

আপনারা হাত-মুখ ধোননি এখনও। ধুয়ে আসুন। আপনাদের খেতে দিই। —ইলা ওদের হাত-মুখ ধুতে যাওয়ার জন্যে বলল।

রাত প্রায় ন'টা বাজে। বরুণের পুত্রটি ওদের শোবার ঘরে ঘুমিয়ে আছে। আগে বরুণ ও পরে সুমন্ত বাথরুমে গেল। ওরা হাত-মুখ ধুয়ে এসে আবার সোফায় বসল। ইলা একটা আফ্রিকান ফোক মিউজিকের এল পি, রেকর্ড প্লেয়ারে চাপিয়ে দিয়ে রান্না ঘরে গেল। খুব মৃদু শব্দে মিউজিকটা চলছে। ভারি মাদকতা আছে মিউজিকটাতে। ইলা রান্নাঘর থেকে ঘুরে এসে বলল—একটা প্রস্তাব আছে সুমন্তদা।

কি ?

আমরা এ ঘরের মেঝেতে বসে তিনজনে একসঙ্গে খাবো। খাবো আর গল্পজাবো, —রাজি-?

তোমার মর্জি। এতে আর আপত্তির কি আছে—

ইলা খাবার-দাবার এনে দ্রুত সাজিয়ে ফেলল। এবং তিনজনে খেতে বসে গেল। বরুণের এই ঘরটি ভারি চমৎকার সাজানো। রুচিশীল বাঙালী মধ্যবিত্তের বসবার ঘর যেমন হয়। ফ্ল্যাট বাড়ির আঁটো জায়গায় ছবির মতো ঘরটা সাজানো। দেওয়ালে টাঙানো

সর্বাধুনিক কিছু পেইন্টিং। ঘরের এক কোণে বই-এর আলমারীতে পারিবারিক পুস্তক সংগ্রহটিও দেখবার মতো। বরুণের সংগ্রহে আধুনিকতম বাঙালী কবিদের কবিতার বই পর্যন্ত রয়েছে। ইলা এবং বরুণ কাব্য সাহিত্যের চর্চা করে নিষ্ঠার সঙ্গে। কিছু লিটল ম্যাগাজিনও আছে। পছন্দ হলে বরুণ কিনে পড়ে লিটল-ম্যাগ। ইলাকে পড়ায়। এখনও বরুণ মাঝে মাঝে কবিতা লেখে। ওর মনের সজীবতা যে হারিয়ে যায়নি, তা এতেই বোঝা যায়। কিছুদিন আগে বরুণের একটা কবিতা-পুস্তিকা ইলা ছেপে দিয়েছে। ঐ পুস্তিকায় কয়েকটি ভালো কবিতা আছে, সুমন্ত পড়ে দেখেছে। তার কৈশোরের, তার প্রথম-যৌবনের আবেগ-অনুভূতিটুকু এভাবেই রক্ষা করছে বরুণ আজও। তা ডাল-পালায় ছড়িয়ে না পড়লেও, একেবারে শুকিয়ে যায়নি। এভাবে জীবনের একটা আঙ্গিক সে লালন করে চলেছে। খানিকটা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, ইলার সমর্থন সহযোগিতা প্রশ্রয় বরুণকে বেশ চাঙ্গা রেখেছে এ ব্যাপারে। আজও বরুণ কবিতা লেখে। এটা বড়ো কম কথা নয়। ত্রিশের গিট পার হয়েছে বরুণ। হয়ত ওর টিকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে যথেষ্ট। কত ছেলে-মেয়েই তো পদ্য লিখতে আসে, কিন্তু ত্রিশ পার করতে পারে ক'জন? সব ঝরে যায়। বহু আগেই ঝরে যায়। সংসার হলে তো আর কথাই নেই। তখন তারা হয়ে পড়ে বাংলা কবিতার সেরা নিন্দুক। যাই হোক, বরুণ রক্ষা পেয়েছে। বরুণের উপর সুমন্তর আকর্ষণটা সে কারণেই খানিকটা বেশি। দিব্যেন্দু ক্রিয়েটিভ ছেলে নয়। দিব্যেন্দু আঁতেল। এটা ওর বয়স্যের পরিচয়। কাজেই ওর ঝরে যাওয়ার কোনো ঝুঁকি ছিল না। বরং, বলা চলে বয়সের বুদ্ধির সাধারণ মানের ছেলে হিসেবে দিব্যেন্দু ওয়েল এস্টাব্লিশড। বিশেষত ওর স্ত্রী-ভাগ্য তো যে-কোনো মাঝারি মাপের মধ্যবিত্ত তরুণের কাছে ঈর্ষণীয়। সুমন্ত এক ঝলক ভেবে নিল। তুলনামূলকভাবে ভেবে নিজের বুকটা ছেলে-মানুষের মতো মুচড়ে উঠল। এক্ষেত্রে সুমন্ত একেবারেই ব্যর্থ। অপদার্থের মতো ব্যর্থ। তার স্ত্রী নিরেট, রুগ্ন, নিম্নমানের কলোনীর মেয়ে। অবশ্য; পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কেরাণীর স্ত্রী আর এর বেশি কি হবে। ওর স্ত্রী মাত্র তিনজন কবির নাম শুনেছে। মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ আর নজরুল। তিনজনই মৃত। ওর ধারণা কবিরা মৃত হয়। কোনো জ্যান্ত কবি হাট বাজার করছে, তা ও ভাবতেই পারেনা। বাচাল, কিন্তু, এর মধ্যেও সে বেশ টনটনে। তার বান্ধবীদের কি সুন্দর পয়সা-আলা লোকের ঘরে বিয়ে হয়েছে, সে সংবাদ মাঝে মাঝেই সুমন্তকে দেয়। অন্যের স্বামীর সঙ্গে সে সুমন্তকে তুলনা করে। যদিও তার দারিদ্র হজম করার সহজাত শক্তিই তাকে সুমন্তর কাছে বরেণ্য করে তুলেছে। ভাই-বোন-মা-বাবা নিয়ে সুমন্ত এজমালি আর যৌথ পরিবারে থাকে। এর মধ্যে সে বেশ মানিয়ে নিয়েছে। ভাবতে ভাবতে সুমন্ত একসময় নিজের কাছে নিজেই পরাজিত অপরাধী হয়ে দাঁড়াল। না—এভাবে আর নয়। আবার ফিরে যেতে হবে কবিতার মধ্যে, নিজের আশ্রয় নিজেকে খুঁজে নিতে হবে, সুমন্ত মনে মনে বলল 'আর এই অন্তঃসারহীন জৈবিক জীবন টানতে পারছি না আমি, যে-কোনো মুহূর্তে আমি ধসে পড়ব। তার আগেই আমাকে আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে।'

কি ভাবছেন, সুমন্তদা—ইলা বলল।

ভাবছি, খাওয়া সেরে তোমার পতি-দেবতার পদ্য পড়তে হবে। আমিও আবার পদ্য লেখা ধরব ভাবছি। মধ্যে মধ্যে পদ্য লেখার জন্যে মনটা উসখুস করে—

বাঃ ভালো কথা। কিন্তু আমার পতি-দেবতা তো আর লিখছেন না আজকাল। এসব উনি ছেড়ে দেবেন ভাবছেন। —ইলা বলল।

সে কি! কেন? —উদ্বিগ্ন হয়ে সুমন্ত বলল।

তা উনিই জানেন। উনিই বলবেন। —ইলা বলল।

কি ব্যাপার বরুণ, তুমি কবিতা লেখা ছেড়ে দেবে কেন? —সুমন্ত বলল।

ছারপোকা—বরুণ খেতে খেতে খুব সংক্ষেপে জবাব দিল। এ জবাবের কিছুই বুঝল না সুমন্ত।

উনিই জামাপ্যান্টে বয়ে আনেন, তো আমি কি করব! —ইলা বরুণকেই অভিযোগ করল।

আমি ব্যাপারটা বুঝলাম না বরুণ—সুমন্ত বলল।

হুম, সে এক এপিসোড. পরে বলব। এই যে সোফা সেট দেখছ, এর আনাচে কানাচে ছারপোকা লুকিয়ে থাকত। হয়ত আমিই দায়ী—বরুণ আবার একই কথা বলল। হেঁয়ালী ভাঙল না।

তবে কে দায়ী। —ইলা ফুঁসে উঠে বলল, কে আমাকে মদ ঢেলে পরিবেশন করার জন্যে বলত, শুনি। কবিতা। সব দোষ আমার তাই না? সংস্কার মুক্ত কে হতে চেয়েছিল?

থাক ইলা! থাক বরুণ। —সুমন্ত থতমত খেয়ে প্রসঙ্গটা ঘোরাতে গিয়ে বলল, ভ্যানগখ কিংবা গঁগা, ডস্টয়েভসকি কিংবা টলস্টয়—এদের দুঃখ যন্ত্রণার তাৎপর্য এই যে এঁরা তা থেকে নিঙড়ে মানব সভ্যতাকে কিছু বোধ, কিছু শিল্প দিয়ে গেছেন। নইলে দুঃখ তো মানসিক। দুঃখ তো পাপ। দুঃখ মানুষকে নোংরা করে, ছোটো করে, হীনমন্য করে। আর সমাজ সে সব মানুষের উপর চাপিয়ে দেবেই। কেবল কিছু প্রাণবন্ত সৃজনশীল মানুষই পারে তাকে অতিক্রম করে যেতে।

উম, ভারি আমার টলস্টয়, ভ্যানগখ। —ইলা নাক কুঁচকে বলল, আমি তো বলেইছি, ঘরে বসে মদ খাও, ঘরে বসে কবিতা লেখ, শিল্প চর্চা করো। আমি টাকা জমিয়ে তোমার বই ছেপে দেব। কিন্তু সোফায় যেন ছারপোকা না ধরে। সে ছারপোকা যেন আমাকে না কামড়ায়—

আচ্ছা, ঐ পেইনটিংগুলো কে পছন্দ করেছে? মনে হচ্ছে আধুনিক ভারতীয় শিল্পীদের কাজ ওগুলো—সুমন্ত পূর্ব-প্রসঙ্গটিকে পুরোপুরি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যে বলল।

আমরা দুজনেই। খুব সস্তায় কেনা। একজিবিশন থেকে। সত্যি, এ দেশে আর যাই হোক, কবিতা, ছবি এগুলো কিন্তু ভারি সস্তায় পাওয়া যায়। এত লেখা হয়, এত আঁকা হয়—কিন্তু বিকোয় না। আপনিই বলুন ৪০/৫০ টাকা করে দাম, অরিজিন্যাল ছবি, নামকরা শিল্পীদের আঁকা—ভাবা যায়! তাও বিকোয় না। কিনবে কে? পয়সা আর রুচি দুটোই থাকা চাই তো! ইলা বলল।

ঠিকই বলেছ—সুমন্ত বলল—কবিতার বইও তাই। ভালো ভালো তরুণ কবিদের এক হাজার বইও বিকোয় না।

অনেকক্ষণ ধরে নানান উল্টোপাল্টা গল্প বলতে বলতে ওরা খাওয়া শেষ করল। এল পি-টা কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চালিয়ে দিচ্ছিল ইলা। খুব মৃদু বিদেশী মিউজিকের শব্দ, খাওয়া, গল্প করা—এসব মিলে মিশে বেশ চমৎকারভাবে কাটল সময়টুকু। খাওয়া শেষ হলে ইলা রেকর্ড-প্লেয়ার বন্ধ করে দিল।

তিনজনে হাত-মুখ ধুয়ে আবার এসে ঘরে ঢুকলো। ইলা খুব দ্রুত মেঝে পরিষ্কার করে ফেলল। সোফাটা আসলে সোফা-কাম-বেড। সোফাটাকে খুলে বেড বানানো হলো। ইলা ওর উপর একটা চাদর বিছিয়ে দিয়ে একটা বালিশ দিয়ে এক মুহূর্তে সুমন্তর শয্যা বানিয়ে ফেলল।

বরুণ এবং সুমন্ত সিগ্রেট ধরাল। ইলা এসে মেঝের উপর বসল।

কাল কখন বেরুবে? —ইলা বরুণকে জিজ্ঞাসা করল।

খুব ভোরে। সাড়ে চারটেয়। প্রথম বাস ধরতে হবে। একটু চা করে দিতে পারবে তো? —বরুণ বলল।

হ্যাঁ, দেব। তার মানে চারটের সময় উঠতে হবে তো? এলার্ম দিয়ে রাখব। —ইলা বলল।

তুমি শুয়ে পড়গে—বরুণ ইলাকে বলল।

তোমার বিছানা কি সুমন্তদার কাছে করে দেব? —ইলা বরুণকে জিজ্ঞাসা করল।

তোমার মর্জি। —বরুণ বলল।

আমার আবার মর্জি কি—

একটু আগে যে কথা শুনিয়েছ, তাতে ভয় লাগছে। কি করে আমি বলি যে আমি সুমন্তর কাছে থাকব। —বরুণ বলল।

যাও; ফাজলামী কোরো না। —ইলা গজ গজ করে ওদের শোবার

ঘরে গেল। একটা বালিশ এনে বরুণের গায়ের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল—এখানেই থাকো।

ঠিক চারটের সময় ইলা উঠে জল খাবার তৈরির প্রস্তুতি নিয়েছে। বরুণ ও সুমন্তকে ডেকে দিয়েছে।

ইলার কল্যানে একখানা ভরপেট টিফিন এবং চা খেয়ে বেরিয়ে পড়ল বরুণ ও সুমন্ত। এখন ঠিক পাঁচটা বাজে। হাতে এক ঘন্টার বেশি সময়। ভোর পাঁচটাতেই কলকাতা নড়েচড়ে উঠে বেশ সরব হয়েছে।

ওরা রাস্তায় বেরিয়ে একটা সোজা হাওড়া যাওয়ার বাস পেয়ে গেল।

দিব্যেন্দু তার কথা মতো প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাওড়া স্টেশনের ওয়েটিং রুমের সামনে। বরুণ আর সুমন্তকে পেয়ে ও উল্লসিত হলো এবং তিন জনে ছুটল স্টীল এ জায়গা ধরতে।

উফ—সব ঠিক ঠাক প্ল্যান মাফিক হয়েছে!—দিব্যেন্দু উচ্ছল হয়ে বলল।

তুমি যে সত্যি সত্যিই এত সকাল সকাল এসে লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কেটে তৈরি হয়ে থাকবে, এতটা ভাবিনি। অত ভোরে বৌ'র কোলের ওম থেকে জাগলে কি করে—উম—বরুণ বলল।

আর কি সেদিন আছে। পুচকেটা ভোর রাতে জেগে যায়, আর তাকে খেলা দিতে হয় সঙ্গ দিতে হয় আমাকেই। ওর মা তো তখন ঘুমোয়—দিব্যেন্দু উত্তর করল, বলল—শোনো, আমরা এখন থেকে ব্যাচেলার, বুঝলে, কেউ যেন না বুঝতে পারে যে আমরা বিবাহিত।

বেশ, তোমার উপর লিডারশিপটা আমরা ছেড়ে দিলাম। যেমন চালাবে, তেমন চলব। কি বল সুমন্ত। বরুণ বলল।

হ্যাঁ, তাই হোক। তবে কিনা সবসময় ব্যাচেলার হয়ে থাকা যাবে কিনা তাই ভাবছি—সাইকোলজির ব্যাপার তো—সুমন্ত বলল।

সে আমি ম্যানেজ করে নেব। তোমরা কেবল আমার অনুসরণ করবে। দিব্যেন্দু বলল। সুমন্ত এক মনে সিগারেট খাচ্ছিল। সে ওদের কথায় বিশেষ কান না দিয়ে সদ্য ঘুম থেকে উঠে ছুটতে ছুটতে আসা যুবতীদেরই বরং সে মন দিয়ে দেখছিল। দেখছিল, আর ভাবছিল, দেশে এতো সুন্দরী মেয়ে আছে যে সারা জীবন দেখেও শেষ করা যাবে না। সুমন্ত বিনীতভাবে বলল—আমাকে বরং যুবতী-টুবতী দেখতে দিও, সুন্দরী মেয়েদের দেখতে আমার বড় ভালোলাগে—এ ব্যাপারে আমি ব্যাচেলার হয়ে থাকতে রাজি আছি, বুঝলে বরুণ—।

ট্রেন ছাড়ার সময় হয়েছে।

ওরা তিনজন ট্রেনে উঠে বসল। ওদের মনে, ওদের স্বভাবে সেই মফস্বলের তরুণ তিনটি উঁকি মারছে এখন।

হাওড়া থেকে ঘাটশিলা পৌঁছুতে ঠিক চার ঘণ্টা সময় নিল। যখন ওরা ঘাটশিলা পৌঁছুল তখন বেলা দশটা বেজে কুড়ি হয়েছে।

সময়টা মোটেও ঘাটশিলা বেড়াবার পক্ষে উপযুক্ত নয়। বৈশাখ মাসের শেষ। প্রখর রোদে আকাশ ঝলমল করছে। পাথুরে দেশ। রোদের জিভ লক লক করছে সর্বত্র। কিন্তু এই রুক্ষতা, এই তীব্র হুঙ্কারও একটা রূপ আছে। দূরে ধূসর টিলাগুলিতে সবুজ নিঃশেষিত। নীলচে ধূসর আভায় দূরান্তের রেখা দৃষ্টি কেড়ে নেওয়া এক চমৎকার রূপ নির্মাণ করেছে। ফাঁকা মাঠ, ফসলহীন। ধূ ধূ করে, প্রসারিত, নীরব।

সুমন্ত খানিক বিস্মিত হয়ে বলল—বাঃ!

স্টেশন থেকে নেমে তিনজনে একটা চায়ের দোকানে উঠল।

চা খেতে খেতেই ওরা স্থির করল—সুবর্ণরেখার তট, সুবর্ণরেখাই তাদের প্রথম আকর্ষণ এখানে। চা খাওয়া শেষ করে পয়সা মিটিয়ে দিয়ে ওরা তিনজন হুড়মুড় করে ছুটল সুবর্ণরেখার দিকে।

তামা আর অভ্রের দেশ।

সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে মাটি। চষা ক্ষেতের উপর বৃষ্টি হয়ে গেছে গতকাল। তামার রেণু, অভ্রকণা, আর নানা বর্ণের খনিজ কাঁকরে মিশ্রিত মাটিতে সূর্যের রশ্মি প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে এই চষা ক্ষেত থেকে নানা বর্ণ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ঝলমল করছে ক্ষেতের মাটি। দূরে ভেসে আছে গাছের সবুজ ছায়া, নীলচে-ধূসর ঢেউ খেলানো টিলার নীরব গাম্ভীর্য। এই উজ্জ্বল সূর্যের দেশ শেষ বৈশাখের নির্মেঘ আকাশ থেকে করে পড়া সূর্যকিরণে জলজ্বল করছে।

এ যে দেখছি রূপকথার দেশ—সুমন্ত মোহিত হয়ে বলল।

কেমন, নির্বাচনটা ঠিক হয়নি? এ সময় কেউ ঘাটশিলা বেড়াতে আসে না, গরমের ভয়ে। কিন্তু এ সময়টাই সবচেয়ে ভালো। এত সূর্যের আলো। অন্য সময় থাকে না। আর তার ফলে ঘাটশিলার রুক্ষ সৌন্দর্য, এই জ্বলে ওঠা অন্য সময় তেমন ফোটে না—দিব্যেন্দু গর্বিত ভাবে বলল।

বুঝলে সুমন্ত আমরা চোখ বুঁজে যে দেশের কথা ভাবি, ঠিক সেই দেশেই আজ চলে এসেছি—বরুণ বলল।

তিনজন যুবকের মন চনমনে হয়েছে। ওরা প্রায় ছুটতে ছুটতে হাঁটছে। একসময় সুবর্ণরেখার আভাস পেয়ে ওরা লাফিয়ে উঠে বলল—সুবর্ণরেখা। সুবর্ণরেখা!

এখানে, সুবর্ণরেখার তটে সোনা আছে। কোন আদিম কাল থেকে চালু আছে এই কিংবদন্তি। এখানে সুবর্ণরেখার দুপাশের তটের বালি থেকে মানুষ কোন আদিম কাল থেকে সোনা খুঁটে খুঁটে কুড়িয়ে আসছে, জানো. জানো বরুণ। দিব্যেন্দু বলল।

ওরা তিনজন ক্ষনিক দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কিছুটা জিরিয়ে নিল। আবার হাঁটতে লাগল।

চলো চলো, এই ঢেউ খেলানো চষা জমিটা পেরুলেই সুবর্ণরেখা—দিব্যেন্দু বলল, এবং তিনজনে আবার ছুটতে লাগল।

আমার তো ভয় লাগছে—বরুণ বলল।

কেন? সুমন্ত জিজ্ঞাসা করল।

এত আগ্রহ, এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে? সুবর্ণরেখাই তো আমাদের প্রধান আকর্ষণ—বরুণ বলল।

না, শেষ হবে না, এখানকার প্রকৃতি অশেষ। এ তো তোমার কলকাতার পার্ক নয়—এ হলো মহাকাব্য, এর কোনো শেষ নেই—সুমন্ত কি বরুণকে আশ্বস্ত করল।

ওরা কিশোরের মতো, বালকের মতো হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ করে ছুটতে লাগল। উচ্ছ্বসিত হয়ে কেউ বা কুড়িয়ে নিচ্ছে একটা রঙিন কাঁকর, কেউবা একটা পাখির পালক, কেউ বা ভেঙে নিচ্ছে পিপল গাছের কচি ডাল। আর আবেগে উচ্ছ্বাসে কেউ বা এক চক্কর ঘুরে পাক খাচ্ছে, কেউ ছোট্ট একটা খাদে হুড়হুড় করে নেমে পড়ছে, কেউবা গম্ভীর ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে একটা শ্বেত-পাথরের খুবলে নেওয়া অংশের মিছরির দানার মতো শরীরে সূর্যের বর্ণালী বিচ্ছুরণ দেখছে।

এই পাথরের চাঁইটা খোবলাল কেন?—সুমন্ত বলল।

কোনো ভাস্কর কোনো দেবী গড়বার জন্যে কেটে নিয়ে গেছেন—বরুণ উত্তর দিল।

প্রাচীন ভারতের কথা ভাবো,—এরকম পাহাড়, টিলা দেখলেই হাজার হাজার ভাস্কর ছেনি আর হাতুড়ি নিয়ে বসে যেতেন তাদের স্বপ্ন, তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলোকে ঐ সব টিলা আর পাহাড়ের গায়ে কুঁদে দেওয়ার জন্যে—

তারা ছিলেন প্রকৃতির শিল্পী।

ওরা একসময় সুবর্ণরেখার তীরে এসে থামল।

আঃ, সুবর্ণরেখা!—সুমন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। অল্প একটু সময় ওরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

চলো, ঐখানে যাই—দিব্যেন্দু বলল।

কোনখানে?

ঐ খানে, ঐ যে নদীর উপর ছোট্ট শাদা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। কোনো মানুষজন নেই বলে মনে হচ্ছে, চলো ঐখানে গিয়ে বসি—

ওরা নদীর পাড়ের উপর গড়ে তোলা হালকা একটা শাদা রং-এর ছাউনির কাছে এল। পাশাপাশি দুটি ছোট্ট ঘরের ছাউনি মাত্র। বাড়ি নয়। সামনে একটা সাইনবোর্ড ঝোলান আছে। ওরা সাইনবোর্ড

পড়ে বুঝতে পারল—যে কেন্দ্রীয় সরকারের বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের স্থানীয় ছোট্ট অফিস বাড়ি এটি। তালা ঝুলছে। আজ রবিবার ছুটির দিন। ঘর দুটির সামনে এক ফালি নিচু ঝকঝকে বারান্দা আছে। ওরা ঐ বারান্দার ছায়ায় বসল।

তিনটি সিগারেট বের করল দিব্যেন্দু। সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ বসে রইল তিনজন সুবর্ণরেখার দিকে তাকিয়ে।

বেশ চওড়া নদী। এখন প্রখর গ্রীষ্ম। নদীর বুকের মাঝখান দিয়ে ঝর্ণাধারার মতো তির তির করে জল বয়ে যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে যে, নদীটা জীবন্ত। দুপাশের চওড়া নদীবক্ষ ঝকঝকে সোনালি বালিতে মোড়া। মাটি নেই, কাদা নেই, আর নদীর বুকের মধ্যে এখানে ওখানে জেগে আছে ছোটো ছোটো টিলা আর পাথরের চাঁই।

পাথরকে কখনো জ্বলতে দেখেনি সুমন্ত। ভাবেওনি।

এই বৈশাখের প্রখর রোদ্দুরে এখানে না এলে এ অভিজ্ঞতা তার কখনও হতো না। নদীর বুকের ঐ নানান ধাঁচের ছোটো ছোটো পাথরের টুকরোগুলো জ্বলছে। বিকিরণ ছড়াচ্ছে।

বর্ষায় এ নদী ভয়ানক হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে খরস্রোতা, যুগ যুগ ধরে তার আঘাত, তার ঘর্ষণ, তার আবেগ সহ্য করে করে ঐ পাথরের চাঁই-গুলির শরীরে নানা মাপের বিমূর্ত শিল্প তৈরি হয়েছে। প্রকৃতির নিজের খেয়ালে তৈরি হওয়া ভাস্কর্য। ঐ সব টিলায় অভ্র আর তামার

তিনজন যুবক ছাড়া একটিও মানুষ নেই এই দৃশ্যের মধ্যে

কণিকা স্তরে স্তরে সাজান। অভ্র আর তাম্রময় শিলাখণ্ডে তৈরি ঐ ভাস্কর্যের উপর বেলা এগারোটার নির্মেঘ আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে ভারতীয় গ্রীষ্মের সূর্য-কিরণ। এই নির্জন নদীর বুকে, পিছনে সার সার থাক থাক সাজান, নীলচে মেটুলি রং-এর সুদূর অনন্তে মিশে যাওয়া পাহাড়ের শান্ত বিশাল গাম্ভীর্যের প্রেক্ষাপটে, ঐ অত্যাশ্চর্য শিল্পগুলি বিকীর্ণ হচ্ছে। নীরব ধ্বনি, প্রাণ পূর্ণতায় থম থম করছে সমস্ত পরিবেশ। প্রসারতাময় বিশাল ব্যঞ্জনায় থৈ থৈ করছে এই ভূগোল, যতদূর চোখ যায়, তত দূর।

তিনজন যুবক ছাড়া একটিও মানুষ নেই এই দৃশ্যের মধ্যে। এত সৌন্দর্য, এত নীরবতা, নির্জনতা যে সহ্য করা যায় না। দূরে, বেশ অনেকটা দূরে ভারতের বিখ্যাত সেই তামার কারখানার গঠন-শিল্পের আভাস চোখে পড়ছে। ঐ কারখানায় আকাশের দিকে উঠে যাওয়া কয়েকটি চোঙ দিয়ে শাদা ধোঁয়ার রেখা বেরিয়ে আকাশের নীলে মিশে যাচ্ছে। বাঁ দিকে হয়ত শ্মশান, বহুদূরে, সেখান থেকে কয়েকটি কালো রেখায় ছড়িয়ে পড়ছে শ্মশানের ধোঁয়া। আর কোন অন্তরাল থেকে ভেসে আসছে মাইক্রোফোনের সুর—লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠের গান। কোন সুদূর অন্তরাল থেকে, তা বোঝার উপায় নেই। ঐ পাগল করা হিন্দী গানের মিষ্টি কলি—'ও বসন্ত, পবন-পাগল'—মৃদু, তার চেয়েও মৃদু। স্বপ্নের ঘোরে শোনার মতো। কখনো কখনো হারিয়ে যাচ্ছে, ইথারের ঢেউ আর দক্ষিণের বাতাস আবার তা খুঁজে আনছে এক লহমার জন্যে।

পৃথিবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ জায়গা কি আর কোথাও আছে?—ওরা তিনজন বিমূঢ় হয়ে বসে আছে এই অগাধ সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনার মধ্যে। ওদের বাকশক্তি নেই আর।

এই, এই—সুমন্ত বরুণকে ধাক্কা দিল।

কি হলো—বরুণ বলল।

ঐ দেখ, ও পারের পাহাড়ের আড়াল থেকে নদীর পাড়ের ঢালুতে একটি সাঁওতাল যুবতী মেয়ে নামছে।

তাইতো—

চুপ কর—ওকে এই দৃশ্যের মধ্যে হেঁটে যেতে দাও।

চুপ কর—একটা সাত্যিকারের মেয়ে। জ্যান্ত মেয়ে। ওর শরীরও ঝলমল করছে। দেখ, ওর গায়ে লেগে আছে সোনার টুকরো, তামার রেণু, অভ্রের কণা—দিব্যেন্দু বলল।

তরুণীটি আস্তে আস্তে নদীর চড়া ধরে নেমে এল 'সুবর্ণরেখার বুকে। ঐ শিল্পী ও শিলাখণ্ডের কাছে এসে দাঁড়াল। ঐ শিলাখণ্ড চিরে ঝর্ণা ধারার মতো দুপাশে নদী বয়ে যাচ্ছে। মেয়েটি এক মুহূর্ত দাঁড়াল ঐ ভাস্কর্যের পাশে। চারিদিকে একবার তাকাল। তারপর কাপড় খুলে ফেলল।

ঐ প্রাণময় শিলাখণ্ডের অল্প আড়ালে দাঁড়িয়ে নিরাবরণ হয়ে সে তার কাপড়টি শিলাখণ্ডের উপর রাখল। হাত দিয়ে ছুঁয়ে দিলে ঐ শিলার ভাস্কর্য।

প্রকৃতির গড়া আদি ভাস্কর্য, জলন্ত, বিকিরণময় এবং নিরাবরণ আদি নারী।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ইমেজ—বরুণ ফিস্ ফিস করে বলল।

চুপ, শব্দ ভেসে যাবে ওর কানে, শহুরে মানুষের কর্কশ শব্দ—দিব্যেন্দু বলল।

মেয়েটি জলে নামল। নদীতে হয়ত ঐখানেই খানিকটা বেশি জল আছে। এক কোমর। মেয়েটি ঐ এক কোমর জলেই অবগাহন করল। নিজের স্তনের দিকে নিজেই কিছুক্ষণ বিমোহিত হয়ে তাকিয়ে রইল। আবার চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

ইস, এক্ষুণি ফুরিয়ে যাবে—সুমন্ত হতাশ সুরে বলল।

দেখলে, এই কত সৌভাগ্য।—দিব্যেন্দু বলল।

ওঁ নমঃ—বরুণ বলল।

ওঁ নমঃ—তিনজনে ফিস ফিস করে উচ্চারণ করল।

মেয়েটি খুব ধীরে সুস্থে স্নান সেরে ঐ পাথরের আড়াল থেকে মুক্ত, উজ্জ্বল রোদে এল। এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে মাথার চুল ঝাড়ল, মুছল। ওর পা ছুঁয়ে বয়ে যাচ্ছে তিরতিরে সুবর্ণরেখা নদী। স্বচ্ছ, টলটলে। ওর পায়ের নিচে সোনালি বালি। পাশে ঐ ভাস্কর্য—যা ধবক ধবক করে উগরে দিচ্ছে বর্ণালী-বিচ্ছুরণ।

মেয়েটি শিল্পীত শিলাখণ্ড থেকে ওর কাপড়টি টেনে নিয়ে পরল। তারপর ধীরে ধীরে সোনালি বালির উপর দিয়ে বেশ খানিকটা হেঁটে পাড়ে উঠে ঐ ধূসর-মেটুলি রং-এর টিলা আর পাহাড়ের মধ্যে কোথাও বিলীন হয়ে গেল।

আচ্ছা, ঐ মেয়েটি কোথায় গেল।—বরুণ বিস্মিত হয়ে বলল। এখনও ওর 'শক' কাটেনি।

পাহাড়ের আড়ালের কোনো গ্রামে। শ্রমিকের মেয়ে, হয়ত কাজ করতে করতে দুপুরের স্নানটা সেরে নিল।

ও আর এখন ফিরবে না?—বরুণ দুঃখিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

ওকে কি আমরা ফিরতে বলেছি?—দিব্যেন্দু হতাশ হয়ে বলল।

বেশ কিছুক্ষণ প্রকৃতির বিশালতা, সৌন্দর্য, রুক্ষতা এবং নির্জনতার মধ্যে আর ঐ মেয়েটির গড়ে যাওয়া ইমেজের স্মৃতির চাপে ওরা তিনজন বিমূঢ় হয়ে বসে থাকার পর দিব্যেন্দু বলল—এবার?

চলো নদীতে স্নান করি—বরুণ বলল এবং সুমন্ত বরুণের প্রস্তাবকে সমর্থন করল।

ওরা তিনজন অফিস বাড়ির বারান্দা থেকে উঠে চলে এল একেবারে সুবর্ণরেখার খাড়াই ঢালু পাড়ে। তারপর জামা প্যান্ট সব খুলে ফেলল তিনজনই। কেবল ওদের পরনে জাঙিয়া রইল। তিনজনই পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে নিচের সুবর্ণরেখার নদীর বুকে তাকিয়ে রইল। বালি আর বালি। সোনালি বালির উপর ঝাঁ ঝাঁ দুপুরের রোদ পড়ে হল্কা উঠছে।

কি করে নিচে নামব? কোনো পথ তো নেই।—বরুণ বলল।

চলো, আশেপাশে কোথাও আছে, খুঁজে দেখি—সুমন্ত বলল।

দূর! চলো, এক কাজ করি। আমরা বরং এখান থেকেই হড়হড় করে গড়িয়ে নেমে পড়ি।—দিব্যেন্দু বলল।

না, কোথাও হয়ত চোরা পাথরের চাঁই লুকিয়ে আছে—সুমন্ত বলল।

ঐ তো, ওখানটা দিয়ে মানুষ ওঠা-নামা করে। একটা পথের আভাস আছে। বরুণ আঙুল তুলে দেখাল। ওরা তিনজনে জায়গাটায় গিয়ে দেখল—এই নামা-ওঠার পথটাও সমান ঢালু। দিব্যেন্দু কোনো কথা না বলে জামা প্যান্ট গুটিয়ে বগলে নিয়ে বরুণ ও সুমন্তকে উৎসাহিত করার জন্যে নিজে হড়হড় করে গড়িয়ে নেমে পড়ল। দিব্যেন্দুর পিছনে পিছনে সুমন্ত এবং বরুণও একই কায়দায় নামল।

ওরা বালির উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে এগুতে লাগল ঐ ভাস্কর্যের দিকে যার ব্যঞ্জনা একটু আগেই ঐ তরুণী বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়ে চলে গেছে।

যেতে যেতে বরুণ বালির ভিতর থেকে হাওয়াই চপ্পলের একটা স্ট্র্যাপ কুড়িয়ে নিয়ে উঁচু করে ধরে বলল—এই দেখ—

কি?

ঋত্বিক ঘটকের হাওয়াই চপ্পলের স্ট্র্যাপ।

করেক্ট এখানে 'সুবর্ণরেখা'র সুটিং-এর সময় ওঁর হাওয়াই চপ্পল ছিঁড়ে গিয়েছিল, তাই না বরুণ?—সুমন্ত বলল।

হ্যাঁ—

এই গরম বালির মধ্যে খালি পায়েই উনি সুটিং চালিয়ে গিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, আর তা কেবল ঋত্বিকই পারতেন, কি বলো—

আর ঐ টিলার উপর, যেখানে ঐ মেয়েটি স্নান করে গেল, ঐ ভাস্কর্যের উপর মাধবী বসে অল্প একটু সময় বিশ্রাম নিয়েছিলেন—তাই না বরুণ?—সুমন্ত বলল।

হ্যাঁ, তিনি সিকোয়েন্স ভেবে নিচ্ছিলেন, হাওয়ায় ওঁর চুল উড়ছিল, শাড়ির আঁচল উড়ছিল, এবং শিল্প তৈরির গর্বে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলছিলেন—বরুণ বলল।

আর ঐ দেখ ঘন পাতার গভীর ছায়ার পিপল গাছ। ওখানে বসে থাকতেন বিভূতিভূষণ—

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে—

বিভূতিভূষণ মানেই বিস্ময়।

চলো,—বরুণ বলল।

কোথায়?

ঐ মেয়েটার গ্রাম দেখে আসি।

হায়।—তার চেয়ে বরং এই বালির মধ্যে গড়াগড়ি দাও। দিব্যেন্দু বলল।

হ্যাঁ, কিন্তু এখন গড়ালে আমাদের শরীরে ফোসকা পড়ে যাবে—

বরং বিকেলে গড়াব—

চলো—বরুণ বলল।

কোথায়?

ঐ মেয়েটার সঙ্গে ভাব করে আসি।

আমরা এখানে এসেছি পাপ করতে, ভুলে যেও না। কোনো কিছুই আমরা ভালোবাসব না, কিছুতেই আমরা মুগ্ধ হব না—দিব্যেন্দু বলল।

এখানে আমরা আদিম হব, সুন্দর হব। বরুণ বলল—এখানে তো ভাই পাপপুণ্য কিছুই নেই দেখছি, কেবল বিস্ময়কর সুন্দর পৃথিবী রয়েছে।

ওরা ঐ ভাস্কর্যের কাছে এসে দাঁড়াল।

একমুঠো বালি তুলে নিয়ে বরুণ হাওয়ায় ছড়িয়ে দিল। সুমন্ত দিল দিব্যেন্দু দিল।

এই আমাদের অস্তিত্ব, এখানে ছড়িয়ে দিলাম
এই অস্তিত্ব এখানে ছড়িয়ে দিলাম
ছড়িয়ে দিলাম আমাদের অস্তিত্ব

ওরা প্রথমে ওদের জামা প্যান্টগুলো, যা ওদের বগলে ছিল, সব ঐ শিলাখণ্ডটির উপর রাখল। তারপর জাঙিয়া খুলে রাখল। ওরা তিনজন স্নান করল। অনেকক্ষণ ধরে শরীর ডুবিয়ে রাখল জলে। পাতলা ঢেউ। স্বচ্ছ জল। শীতল স্রোত।

আমার বড় ইচ্ছে করছে—জলে শরীর ডুবিয়ে বরুণ বলল।

কি ?

ঐ মেয়েটাকে ছুঁয়ে দেখতে।

সেক্স ?

না, আকাঙ্ক্ষা। পুরুষের লোভ। সেক্সের তো ছড়াছড়ি কলকাতায় —এখানে তার খোঁজে এসে লাভ কি।

অবদমন—বরুণ—এ তোমার অবদমন। শান্ত হও।—দিব্যেন্দু বলল।

ওরা স্নান সেরে জামা-প্যাণ্ট পরে ধীর পায়ে সুবর্ণরেখা থেকে উঠে এল পাড়ের ঐ অফিস ঘরটির বারান্দায়।

বারান্দায় এসে গা-এলিয়ে বসল ওরা।

দিব্যেন্দু পকেট থেকে গাঁজার পুরিয়া বের করল। সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করল। সিগারেট থেকে মশলা বের করে তার খানিকটা নিয়ে গাঁজার সঙ্গে মিশিয়ে নতুন মশলা তৈরি করল। সেই মশলা সিগারেটের কাগজের খোলে পুরে নতুন সিগারেট বানাল তিনটে। ঐ নতুন সিগারেট ওরা টানতে লাগল।

আঃ—সিগারেট টেনে ধোঁয়া ছেড়ে বরুণ কথা বলল—আমার যদি অমন একটা বৌ থাকত—ঐ আদিম যুবতীটির মতো—

রোমান্স!—দিব্যেন্দু ধমক দিল—এ বয়সে মানায়, বরুণ—

দিব্যেন্দু, তোমাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না, আমি খুব টায়ার্ড, আমার আর কোনো অ্যামবিশান নেই, বুঝলে। ভেবেছিলাম একটা কিছু গড়ে তুলব, একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকব—যেমন ছিলেন ঋত্বিক, যেমন ছিলেন বিভূতিভূষণ—বুঝলে দিব্যেন্দু—কিন্তু কোনো আশ্রয় পাচ্ছি না, কোনো সংযুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না—কেন এমন হলো দিব্যেন্দু—বরুণ বলল—

জানি না।

এ কি করছি বলতো, আমাদের জীবন-যাপনের কোনো ফর্মুলা তোমার জানা আছে দিব্যেন্দু!

না, আমি কখনো জানার চেষ্টা করিনি

তুমি জানো সুমন্ত

না, আমি কখনো জানার চেষ্টা করিনি—

বাঃ, আমরা কখনো কিছু জানার চেষ্টা না করেই কাটিয়ে দিলাম।

হ্যাঁ, এবং কাটিয়ে দেব—

যাচ্ছেতাই—

নোংরা—

কাল থেকে আবার 'ওষুধ নেবেন' 'ওষুধ নেবেন'—করে দুয়োরে দুয়োরে ঘোরা। বাড়ি ফিরে এসে বৌর সঙ্গে ফ্রিজ না মোটর সাইকেল —তার লটারি করা, ঘরের জানলায় হাল ফ্যাশনের পর্দা টাঙানোর চেষ্টা করা—

বৌকে তোষামোদ করা। 'ঈশ্বরের মতো ক্ষমাহীন বৌয়ের মনে করুণার উদ্রেক ঘটানোর চেষ্টা করা—

বৌর ভাই জার্মান গিয়েছে, আমি কেন পারি না

শালির বর জমি কিনেছে ভি আই পি-তে আমি কেন পারি না

পাশের ফ্ল্যাটে ফোন এল, আমি কেন পারি না—

বাড়িওয়ালার বৌ নিজের কারে চেপে বিউটি পার্লারে যায়— আমার স্ত্রী কেন পারে না—

কত লোক কবি হলো, কত ছেলে ছোকরাদের পদ্য বড় বড় কাগজে ছাপা হলো, আমি কেন পারি না—

এই নাভিশ্বাস প্রতিযোগিতায় আমরা কিছুই পারি না

আমার মেধার সম্পূর্ণটা নিঙড়ে ডব্লু-বি-সি-এস হলাম। এ ব্যাপারে কোথাও আমার ফাঁকি ছিল না, তবু কেন আমি আই এ এস নই—

প্রাণপণ চেষ্টায় ওষুধের হকারি করে প্রমোশনের লাইন পরিষ্কার করেছি—

আঃ

কি হলো সুমন্ত ?

আমি প্রতিযোগিতার মধ্যেই আসতে পারিনি। আগেই ডিস-কোয়ালিফায়েড হয়ে গেছি—

আমার ডানলোপিলোর সোফার আড়ালে ছারপোকা এসে লুকিয়ে থাকে। সেই ছারপোকা আমার বৌ-র রক্ত খেতে চায়—

আমার বৌ-র দিকে ফিরেও তাকায় না কেউ।

আমার বৌ আমার কাছ থেকে কী পেতে চায়, তা আজও আমি বুঝলাম না—

আর আমার কী করার আছে ?

আর আমার কী করার আছে ?

এই সিলেবাসে ফেলে আমাদের ছেলেদের মানুষ করতে হবে।

দ্বিতীয় কোনো সিলেবাস নেই—

সাপলুডো খেলার মতো—কেঁচে গেলে ঘরপচা—

কুলন্ত মধ্যবিত্ত

দর্শনহীন, আলম্বহীন

সংকীর্ণ, আত্মকেন্দ্রিক, মূল্যাবোধহীন

আমাদের মুক্ত হওয়ার চেষ্টা ভয়ঙ্কর

আমাদের সাহস নেই, ধৈর্যও নেই—

ফাঁপা, বায়বীয়—

আমার স্ত্রী চায় একজন আদর্শ মানুষ—

আমি জানি না আদর্শ মানুষ কাকে বলে—

আমি সব সময়ই তটস্থ হয়ে থাকি শালির দেওর আর খুড়োশ্বশুরের ভয়ে। ওরা আমার স্ত্রীর কাছে আদর্শ মানুষ।

আমরা আমাদের সেই তরুণ বয়সটা আর ফিরে পেতে পারি না, বরুণ

ফিরে পেলে তুমি কি করবে ?

এই মধ্যবিত্ত রিং-এর বাইরে থাকব। পদ্য লিখব। কখনই, কিছুতেই এই রিং-এ ঢুকব না—

সিলেবাস তোমাকে ঢুকিয়ে দেবে। মেকলের সিলেবাস।

আমরা এক অন্তহীন গাড্ডায় পড়ে গেছি—

আধুনিক মানুষের সংজ্ঞা কি, তা জান তুমি, সুমন্ত—

শ্রেণী সচেতনতা, শ্রেণী সংগ্রাম

রাধাকৃষ্ণাণ বলেছেন—'জ্যাক অব অল ট্রেড'

বাট মাস্টার অব নান

শ্রেণী সংগ্রাম, শ্রেণী সচেতনতা

রাজনীতি ?

না, দর্শন—

দর্শন ?

না, বোধ

বোধ ?

না অনুভূতি।

হ্যাঁ, অনুভূতি, জাতীয় অনুভূতি, ভারতের জাতীয় অনুভূতি

আমাদের জাতীয় অনুভূতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে—

আমরা পাপ করতে এসেছি, মনে রেখ—

এক মাত্রার জীবনে দ্বিতীয় মাত্রার খানিকটা যাত আমাদের সৃষ্টি করতেই হবে—

আমরা স্ত্রীদের নিন্দা করি, এস—

আমার স্ত্রী নিন্দারও অনুপযুক্ত। সে কেবল আমার সন্তানের জননী

আমার মা ছিলেন আমার বাবার সন্তানের জননী।

আমার বাবা ছিলেন আমার মার সন্তানের জনক

আমার সন্তানের কাছে আমি তার মার স্বামী

আমার স্ত্রীর কাছে আমি তার সন্তানের জনক

স্বামী, স্ত্রী, সন্তান—

প্রেম

মনগড়া কিছু গড়ে নাও—। না হলেও চলে—

আমাদের বুদ্ধির মধ্যে বালি পুরে দেওয়া হয়েছে, বরুণ—

আমাদের স্বপ্নের মধ্যে ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে—সুমন্ত

আমাদের বিশ্বাসের মধ্যে গ্লানিই ঢোকান হয়েছে, দিব্যেন্দু

চলো—

কোথায় ?

ঐ মেয়েটার বাড়ি যাই—। ওর উঠোনের ছায়ায় কিছুক্ষণ বসে থাকি গে—

রোমান্টিক হয়ে পোড়ো না, বরুণ, গাঁজা খাও—

কেন রোমান্টিক হব না ? এখানে হেঁটে গেছেন ঋত্বিক, বিভূতিভূষণ—

আধুনিক সাহিত্যিকরা এখানে আসেন উপন্যাসের মশলা জোগাড় করতে—

কলকাতার বাবুরা আসেন মেয়েছেলে নিয়ে ফাস্টি-নস্টি করতে—

বিপ্লবী তরুণেরা আসেন শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আগ্রহ নিয়ে

সত্যিই, জায়গাটা রোমান্টিক। মন খুলে কথা বলার মতো জায়গা—

তিনজন আস্তে আস্তে বারান্দায় শুয়ে পড়ল।

মুক্ত সুবর্ণরেখার তটের গরম হাওয়া ওদের শরীরের উপর দিয়ে বয়ে যেতে লাগল।

যতক্ষণ ওরা শুয়েছিল জানে না। ওরা জেগে উঠল একজন লোকের পায়ের শব্দ শুনে। লোকটি অফিস বাড়ির ফাঁকা উঠোনে খানিক অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার পরণে ভিজে গামছা, হাতে ভিজে পাৎলুন। সুবর্ণরেখা থেকে এখুনি স্নান সেরে লোকটি উঠে এসেছে দেখলেই বোঝা যায়। খুবই রোগা লোকটি, গায়ের রং তামাটে। ওর চোখে বিস্ময়ের ঘোর লেগে আছে। দুটি চোখ অদ্ভুত ধরনের দু রকম। ডান চোখটি স্বাভাবিক, আর বাঁ চোখটা ট্যারা, ঝুলে পড়া। যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তার চোখ দেখে মোটেও বোঝার উপায় নেই যে সে কোন মনোভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দিব্যেন্দু হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ওর সামনে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বলল—আপনি কি কিছু বলবেন ?

না না, ঠিক আছে, বিশ্রাম নিন। কলকাতা থেকে বেড়াতে আসছেন ?—লোকটি বলল।

হ্যাঁ। আপনি বুঝি কাছে পিঠেই থাকেন।

হ্যাঁ। কাছেই আমার বাসা। আমি এই অফিসের গার্ড।

ও। দিব্যেন্দু গলায় একরকম শব্দ করে লোকটার দিকে এগিয়ে গেল। কোনো রকম চঞ্চলতা নেই দিব্যেন্দুর আচরণে। সুমন্ত ও বরুণ চুপচাপ বারান্দায় বসে রইল। দিব্যেন্দু সোজা লোকটির কাছে এগিয়ে গিয়ে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ওর হাতে দিতে গেল।

না না, ঠিক আছে, আপনারা বিশ্রাম করুন। লোকটি সিগারেট নিতে দ্বিধা করল এবং এক পা দু পা করে এগিয়ে এসে ছায়ায় দাঁড়াল।

আরে নিন না। দিব্যেন্দু লোকটির হাতে সিগারেট গুঁজে দিয়ে দামী একটা সিগারেট লাইটার বের করে ফস করে জ্বালিয়ে ওর সিগারেটটা ধরিয়ে দিল। লোকটি সিগারেটে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া গিলে সেটা উগরে দিয়ে বলল—আপনারা বিশ্রাম করুন—

আমরা এক্ষুণি চলে যাব।

না না, চলে যাবেন কেন! বিশ্রাম করুন না। আমি এক্ষুণি কাপড় পাল্টে ফিরে আসব।

আমরা নতুন এসেছি। এখানকার কিছুই জানি না। আচ্ছা, বলতে পারেন, এখানে ড্রিংক-ফ্রিংক কোথায় পাওয়া যাবে ?—দিব্যেন্দু বিন্দু মাত্র দ্বিধা না করে সরাসরি বলে ফেলল।

ওরা জেগে উঠল একজন লোকের পায়ের শব্দ শুনে

লোকটা প্রথমে একটু থতমত খেল। তারপর নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে বলল—জানেন না, বিহার গবমেন্ট মদ বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে? জনতা গবমেন্ট এসব পছন্দ করে না, আপনি জানেন না?

ওসব ছেঁদো কথা শুনিয়ে লাভ কি গুরু।—বলেই দিব্যেন্দু আর একটা সিগারেট বের করে ওর হাতে গুঁজে দিল। আগের দেওয়া সিগারেটের অবশিষ্ট কেবলই সে মাটিতে ফেলেছে। তা থেকে এখনো ছোট্ট ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে।

মাইরি স্যর, খুব কড়াকড়ি। সন্ধ্যের আগে কিছুতেই জোটানো যাবে না।

আপনিও আমাদের সঙ্গে একটু সঙ্গ দেবেন শুন। বরুণ বারান্দায় বসে বসেই টোপ ছুঁড়ল।

হেঃ হেঃ, হলে তো ভালোই হতো। আপনাদের জ্যোতি বসু কত ভালো মানুষ। জনতা গবমেন্টকে পাত্তাই দিল না।···হেঃ হেঃ, আসলে জ্যোতি বসু শ্রমিকদের নেতা তো বোঝেন সবই—

আপনি গুরু পলিটিক্যাল রোমান্টিসিজম-এর কথা বলে সব এলে বেলে করে দিতে চাইছেন। আপনি যদি পারেন তো একটু জোগাড় করে আনুন, তারপর আপনার এই বারান্দায় বসে চার ভাই বেরাদারে এক সঙ্গে বসে—

হেঁ-হেঁ স্যর, আমার চাকরি চলে যাবে স্যর।—লোকটির ঢালু বাঁ চোখটি কেঁপে উঠল।

কে আপনার চাকরি খাবে? আমার মেজো মেসো সেন্ট্রালের বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি—। আপনার চাকরি খায়, কার সাধ্যি—

তাই নাকি, কি নাম আপনার মেজো মেসোর?—লোকটির ঢালু চোখটি আবার সতেজ হলো।

অমিতাভ বসু। সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর ভাইপো—বরুণ বলল।

আপনার নাম?

অরুণ বসু। বরুণ লোকটিকে কব্জা করার জন্যে ওর এক বন্ধু অরুণ বসুর সাম্প্রতিক প্রকাশিত একটি কবিতার বই সাইড ব্যাগ থেকে বের করে দেখাল। দেখিয়ে বলল—আমার বই, পড়ে দেখুন।

লোকটি তাজ্জব হয়ে বইটি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে বলল—আপনি বুঝি সাংবাদিক?

হ্যাঁ। কবিও। সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর নাম শুনেছেন? উনি হলেন আমার রিলেটিভ।

আপনারা তিনজনই সাংবাদিক? কোন কাগজের সাংবাদিক? লোকটি বলল।

পি.টি আই। আমরা কবিও, বলছি না।

ও, আপনারা সাংবাদিক, কবি। এখানে অনেক সাংবাদিক আসেন।

আপনি তো বাঙালী, বাংলা সাহিত্যের কিছুই খবর রাখেন না দেখছি! বরুণ লোকটির ব্যক্তিত্বকে নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে একেবারে নস্যাৎ করে দিয়ে বলল, যা ব্যবস্থা করার আপনিই করুন—এই আমরা গ্যাঁট হয়ে বসলাম। বরুণ বারান্দায় নড়েচড়ে বসল।

আপনার নামটা তো শোনা হয়নি, দাদার—এবার দিব্যেন্দু লোকটিকে ধরল।

মধু মিত্তির—

বাড়ি কোথায়?

কটক

আপনি বাড়ির কাছে বদলি হতে চান না?

চাইতো, কিন্তু কে করে দেবে?

এই অরুণ, দাদার নামটা টুকে রাখ তো। নামের চারদিকে একটা গোল দাগ দিস।

ওনার নাম অরুণ, কিন্তু আপনাদের নাম?

দিব্যেন্দু, সুমন্ত?—কি চেনা চেনা লাগছে, না? আমরা কাগজে আর্টিকল লিখি।

লোকটি এবার ওদের মুখে কালো মেঘের ছায়া দেখল ঢং-এ বলল, কলকাতা থেকে রিপোর্টাররা আসার সময় তো ড্রিঙ্ক সঙ্গে নিয়ে আসেন। আপনারা আনেননি কেন?

দিব্যেন্দু একটু ঘাবড়ে গেল, কিন্তু ঝটপট সামলে নিয়ে বলল—আরে ভাই যদি আনব তো আপনাকে তোষামোদ করি? আপনি কেমন মশায়—এটুকু বোঝেন না? গতকাল ছিল শনিবার। আর শনিবার হলো কলকাতায় ড্রাই ডে, বুঝলেন, তাই আনা সম্ভব হয়নি। আর, তাছাড়া, কে জানে বাপু, ঘাটশিলায় আপনার মতো লোক থাকতে মাল জুটবে না—

মাইরি স্যর, এখন কোথাও পাবেন না—সন্ধ্যের পর হলে জোটানো যাবে—এখন পারব না—লোকটা থেমে থেমে বলল—একটা কথা বলব—

বলুন—

মহুয়া খাবেন?

মহুয়া? বরুণ তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে বলল—গুরু, আপনি এতক্ষণ বলেননি কেন?

মহুয়া যদি খান তো এখুনি ব্যবস্থা করা যায়, খাবেন তো—

খাবো না মানে? মহুয়াই খাবো অন্য কোনো মাল পেলেও খাবো না। ঐ অ্যাবঅরিজিন্যাল কান্ট্রি লিকার খাওয়ার চান্স ছাড়ে? যাও, বোলাও—বরুণ লাফিয়ে উঠে বলল।

কিন্তু মহুয়া কি মদ নয়? ওর ওপর নিষেধাজ্ঞা নেই?

হ্যাঁ, আছে, কিন্তু কেউ মহুয়া ধরতে আসে না। গোপনে ওটা চালু আছে। ধরতে এলেও তেমন কড়াকড়ি করে না। সামান্য কিছু পেলেই—

অ, তা বেশ, কিন্তু মহুয়া কোথায়, গুরু, একটু আনানোর ব্যবস্থা করুন মশায়—

আনাতে-টানাতে হবে না, এখানেই বসুন, দিয়ে যাবে—। একটু অপেক্ষা করুন, বাড়ি থেকে জামা-কাপড় পাল্টে আমি আসছি।

আবার আসছেন কেন দাদা—থেকে যান, আমাদের ব্যবস্থাটা করে দিয়ে যান মাইরি—আপনার কথা মেজো মেসোকে বলব, আর আপনাকে নিয়ে কাগজে একটা আর্টিকল করব—নাম দেব 'অতন্দ্র প্রহরী'—বরুণ মিনতির সুরে বলল।

আমার পরণের গামছা যে শুকিয়ে গেল। আমাকে এই আধ ঘণ্টার জন্যে ছাড়ুন স্যর। আমি ঘর খুলে দিয়ে যাচ্ছি, আপনারা বিশ্রাম করুন। কিছু পয়সা দিন, ডিম কিনে বাড়ি থেকে ভেজে আনব। দুটো খেতে আমার যা দেরি হবে—দুপুরের খাওয়াটা সারতে হবে তো—

না, খাওয়া চলবে না। আমাদেরও দুপুরের খাওয়া হয়নি। আমরা চার দাদায় একসঙ্গে খাব—রাজি?

আচ্ছা, তাই হবে। পয়সা দিন, ডিম ভেজে আনব। তার জন্যে যেটুকু সময় লাগবে, এই যা—লোকটির কোমরে ঘরের চাবি ছিল। ও একটা ঘর খুলে দিল। এটা অফিস ঘরের সঙ্গে লাগোয়া স্টোর কাম প্রহরীর রাত্রিবাসের ঘর। জল মাপার নানারকম যন্ত্রপাতি এবং কাঁচের চোঙ, জার, নেট, শিকল এসব রয়েছে। লোকটা তিনজনকে ভিতরে ডেকে আরাম করে বসতে বলল। খুবই বিচিত্ররকমভাবে এদের তিনজনকে লোকটি বিশ্বাস করেছে। লোকটি বলল—ঐ যে, বাংলো দেখছেন, ওর পাশেই আমার বাসা। দু-মিনিটের পথ। ডিম কিনতে একটু হাঁটতে হবে এই যা।

কিন্তু, মহুয়া কোথায় পাওয়া যায় এখানে, খুব দূরে নয়তো—বরুণ বলল।

ঐ তো সামনেই। এপারে আমরা, ঠিক সামনের ওপারেই মহুয়া। এখুনি দেখবেন মহুয়া ধুতে আসবে সব। এখানে বসেই সব দেখতে পাবেন। বড় বড় কলসিতে করে সুবর্ণরেখার জলে ওরা মহুয়া শোধন করতে আসে—লোকটি বলল।

গুরু, আপনি সত্যিই গুরু। সামনে একটা কান্ট্রি লিকারের ব্রুয়ারী নিয়ে বসে আছি, এ যে অবিশ্বাস্য সংবাদ—বরুণ বলল।

স্যর—

বলুন—

একটা কথা। এটা যেন কাগজে তুলে দেবেন না।

কোনটা—

ঐ মহুয়া তৈরির ব্যাপারটা—

বরুণ তার জিভটা লম্বা করে বের করে দাঁতে কাটল। দু হাত কানে দিয়ে চোখ বুজে বলল—কাগজে তুলি তো গো-মাংস খাই।

লোকটাকে দিব্যেন্দু আর একটা সিগারেট দিল। লোকটি সিগারেট টানতে টানতে চলে গেল। যাওয়ার সময় কিছু ডিম কিনবার পয়সাও দিব্যেন্দু লোকটিকে দিয়ে দিল।

কটা সিগারেট ধ্বংস করলে দিব্যেন্দু? —বরুণ বলল।

তিনটে। কিন্তু তা হোক, লোকটিকে দিয়ে অনেক কাজ করানো যাবে। প্রায় প্রতিটি টোপই ও গিলেছে। —দিব্যেন্দু বরুণকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল।

চনমন করছে মধ্যগ্রীষ্মের রোদ। ঝিলমিল করছে সুবর্ণরেখার চারপাশ। গরম বাতাস বয়ে যাচ্ছে হু হু করে।

সত্যি, ভারতবর্ষ বেশ রঙিন উজ্জ্বল দেশ। —সুমন্ত বলল। হিম এবং গ্রীষ্মের দেশ, পর্বত এবং সমুদ্রের দেশ। কত রকম রঙিন মানুষ আছে এই ভারতবর্ষে। অন্যসব দেশের কথা ভাবো। এক রঙা দেশ। হয় সাদা, নয় কালো, নয় হলুদ। আমাদের দেশের প্রতিটি মানুষের রঙ আলাদা। চেহারা বিশিষ্ট, সুন্দর কিন্তু একজনের সঙ্গে আর এক-জনের মিল নেই।

সত্য-সেলুকাস, বড় বিচিত্র এই দেশ। —বরুণ বলল।

হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন দেশের মানুষ এদেশে আশ্রয় নিতে এসেছে, এসে এদেশের মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, তাই এই বৈচিত্র্য। —দিব্যেন্দু বলল।

হুগলীর কোন একটা গ্রামে নাকি বেশ খানিকটা 'ডাচ' জিন রেখে গেছে পর্তুগীজরা—

হ্যাঁ, ঐরকম কোথায় যেন পড়েছি—

ঐ দেখ

কি?

লোকটা বলেছিল ঠিক তাই—মহুয়া

সত্যিই তো! লোকটাকে এখন বিশ্বাস করা যায়—

তিনজন সাঁওতাল মেয়ে তিনটি বড় কলসি নিয়ে নেমে এল সুবর্ণরেখার জলে। ওরা যে অফিস ঘরে বসে আছে, ঠিক তার সামনে নদীর বিপরীত পাড়ে। হাঁটুর উপর কাপড় তুলে ওরা জলে নামল। মহুয়ার হাঁড়ি জলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরিশোধন করছে ওদের নিজস্ব কায়দায়। আবার একজন এল। তার পিছনে দু'জন পুরুষ। কালো, বলিষ্ঠ দেহের পুরুষ। বেশ কিছু হাঁড়ি জমে গেছে পাড়ে। ওরা ওগুলো পালা করে পরিশোধন করছে। কোমরে শক্ত করে কাপড় বেঁধে, উপুড় হয়ে, একেবারে জলের কাছাকাছি নত হয়ে ওরা হাঁড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মহুয়া পরিশোধন করছে। দেখবার মতো কাজ। পুরুষ দুটি বাঁকে করে চারটে পরিশোধন মহুয়ার হাঁড়ি নিয়ে উপরে উঠে গেল। পরপর মহুয়ার হাঁড়ি নিয়ে পুরুষ ও মেয়েরা নেমে আসছে এবং উঠে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে একেবারে জনশূন্য সুবর্ণরেখায় একটি ঘাট হঠাৎ বেশ কর্মমুখর হয়ে পড়ল।

কটেজ ইণ্ডাস্ট্রি—বরুণ বলল।

এত কাছে যে মহুয়ার ব্রুয়ারী আছে, তা তো স্বয়ং ঈশ্বরও আবিষ্কার করতে পারত না। সুমন্ত বলল।

এই অভিজ্ঞতা ওদের তিনজনকে বেশ রোমাঞ্চিত করল। ওরা চুপচাপ ঐ মহুয়া পরিশোধনের কাজ লক্ষ্য করতে লাগল।

ঐ তো, দেখ, লোকটি আসছে—দিব্যেন্দু বলল

কে?

আমাদের মধু মিত্তির—

বাঃ, লোকটিকে ভালোই বলতে হয়, খুব তাড়াতাড়ি এসেছে—

তোর মেজো মেসোকে একটু বলে দিস বরুণ—দিব্যেন্দু চোখ টিপে হাসল।

সত্যি, লোকটিকে যে আমরা চিট করছি, এটা ও একেবারেই ধরতে পারেনি। খুবই সরল মানুষ—বরুণ বলল।

লোকটিকে আমি অনেক কাজে লাগাব। দিব্যেন্দু গর্বিতভাবে বলল—তোমরা যেন কাঁচা করে দিও না লোকটাকে—

বলেইছি তো, তুমি আমাদের টিম লীডার। যেভাবে চালাবে, আমরা চলব—

লোকটি উঠোনে এসে দাঁড়াল। তার হাতে চারটে ডিম ভাজা আছে। সঙ্গে একটি সাঁওতাল কিশোরকে ও নিয়ে এসেছে। লোকটি এসেই বলল—কত আনতে বলব স্যার?

আমরা তো ঠিক জানি না। কতটা আনতে হবে আপনিই ঠিক করে দিন। কেবল দেখবেন, যেন আউট না হয়ে যাই। আউট হয়ে গেলে আপনাকেই বিরক্ত করব। দিব্যেন্দু বলল।

মহুয়ায় ঠিক মদের মতো নেশা হয় না। বেশি লাগে। তিন ভাঁড় আনতে বলি? লোকটি দিব্যেন্দুর সম্মতি চাইল।

তাই হোক। কত লাগবে?

কিশোরটি এগিয়ে এসে বলল—কাঁচি না পাক্কি? পাক্কি খুব পরিষ্কার হবে বাবু—

পাকি? কত করে?

সাড়ে চার করে ভাঁড়—কিশোরটি বলল।

দারুণ সস্তা—দিব্যেন্দু পনর টাকা দিয়ে বলল। তিন ভাঁড়, জলদি আনবি। কিশোরটি চলে গেল।

বাঃ ছেলেটা তো বেশ বাংলা বলে। ব্যবহার করা যাবে দেখছি—দিব্যেন্দু ইতিমধ্যেই ছেলেটিকে ব্যবহার করার পরিকল্পনা এ'টে ফেলেছে।

হ্যাঁ, ওর কারবার তো বাঙালী বাবুদের সঙ্গেই। এখানে এক বাঙালী বাবুর বাড়িতে ও তিন চার বছর কাজ করেছে—মধু মিত্তির বলল।

মধু মিত্তির ঘরে প্রবেশ করে টেবিলে ডিম ভাজাগুলো রাখল। তারপর র‍্যাকে গুছিয়ে রাখা কাঁচের জার নামাল চারটে। জল মাপার জার। সেগুলো টেবিলে গুছিয়ে রেখে একটা বালতিতে করে কাছের একটা টিউবওয়েল থেকে জল আনল।

বাঃ চমৎকার। এ বিষয়ে দেখছি আপনার দৃঢ় অভিজ্ঞতা আছে দিব্যেন্দু বলল।

হেঃ হেঃ, আমরা তো জানেই—তাছাড়া, আমাদের অফিসাররা এলেও তো ব্যবস্থা করে দিতে হয়—মধু মিত্তির গর্বিতভাবে বলল।

কথা বলতে গিয়ে মধু মিত্তিরের ঝুলে পড়া বাঁ চোখটি আহ্লাদে টসটস করতে লাগল।

আচ্ছা, সাঁওতাল মেয়েছেলে পাওয়া যায়?—বরুণ দুম করে বলে ফেলে মধু মিত্তিরের দিকে আগ্রহে তাকিয়ে রইল।

আঃ, বরুণ, ধীরে আমার উপর বিশ্বাস রাখ।—দিব্যেন্দু বরুণকে একটা ধমক দিল।

হেঃ হেঃ, তাও পাওয়া যায়—মধু মিত্তির মিন মিন করে বরুণের কথার উত্তর দিল। বলল—ঐ ছোকরাটাকে যদি ভালো করে ধরতে পারেন! তবে সার—মধু মিত্তির বেশ গম্ভীর হলো—বলল, এখানে এলে মেয়েছেলে সঙ্গে করে আনাই ভালো।

কেন? কেন?—দিব্যেন্দু বলল

সাঁওতাল মেয়েছেলে নিয়ে বড় ঝুট ঝামেলা হয়। গত বছর ওরা এক সাঁওতাল মেয়েছেলেকে আর এক বাবুকে ধরে খুব মেরেছে। মেরেই ফেলত—

উউম—বরুণ বিরক্ত হলো, বলল, আমরা কি ওদের কাছ থেকে মেয়েটাকে কেড়ে কুড়ে নিয়ে যাব? একটু সঙ্গ দেবে আমাদের, এই যা—

দেখুন, ঐ ছোকরাটা ওসব হদিস রাখে—ওকে ধরে দেখুন—

আপনার এই অফিস ঘরটা তো বেশ গোপন জায়গা—এখানেই না হয়—

উফ—স্যার, আমার চাকরি চলে যাবে—

বললাম তো, আপনার চাকরি খাওয়ার সাধ্যি কারো নেই, যতক্ষণ আমার পিসেমশায় আছেন—দিব্যেন্দু মধু মিত্তিরকে আশ্বস্ত করল।

নিন, ধরুন, একটা সিগারেট খান—দিব্যেন্দু মধু মিস্তিরকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে নিজেরাও সিগারেট ধরাল।

পাপের পথ মোটামুটি পরিষ্কারই থাকে। সুমন্ত বলল

পারবে কিনা সেটাই কথা—দিব্যেন্দু বলল

আলবৎ পারব। বরুণ জিদ ধরল—

তা হলে সবই হবে, কি বলেন গুরু!—দিব্যেন্দু মধু মিস্তিরকে সাক্ষী মানল।

এই তো সেদিন, এক বাবু একটা মেয়েছেলে নিয়ে এসে উঠল ঐ ডাক বাংলায়। ঠিক রাত ন'টার সময়। মাল খেয়ে একেবারে চুর হয়ে আছে। পড়ে রইল ডাক বাংলোর বারান্দায়। কেয়ার টেকার বাংলো খুলবে না, কিছুতেই খুলবে না। আগে থেকে বুক করা নেই। তাছাড়া চিঠি এসেছে কোন এক অফিসার ঐ বাংলোয় আসতে পারেন। ঐ মেয়েছেলেটা তো হাউ-মাউ কান্না জুড়ে দিল। সিগারেট টানছে আর কাঁদছে। আমার দেখে বড় মায়া হলো। মেয়েছেলেটার রূপ কি। খুব বড় বাড়ির মেয়েছেলে হবে। বাবুটিও তেমন। আমি ওদের টানতে টানতে নিয়ে এলাম আমার অফিসে। খুলে দিলাম এই ঘর। ওঁরা যাওয়ার সময় আমাকে বখশিস দিয়ে গেছেন—মধু মিস্তির বলল—

দেব, আমরাও দেব—দিব্যেন্দু বলল

হেঃ হেঃ তবে আর একটা গল্প বলি, শুনুন—

পরে শুনব—বরুণের এসব গল্প একদম ভালো লাগছিল না, ও বলল—তাহলে, মাঝে মধ্যে আপনার এদিক ওদিক কিছু হয় দেখছি—

ছিঃ ছিঃ স্যর—একি কথা বলছেন—মধু মিস্তিরের বাঁ চোখ চমকে উঠল

আঃ, অরুণ—দিব্যেন্দু ধমক দিল বরুণকে। মধু মিস্তিরের সামনে ও বরুণকে অরুণ বলে ডাকল। ও, হ্যাঁ—এই আমি কথা বন্ধ করলাম—বরুণ চুপ করল

আপনারা বিয়ে করেননি স্যর?—

না, করিনি—সেরকম মেয়ে পাওয়া গেলে করব। আছে খোঁজে?

আপনাদের বৌ হওয়ার মতো মেয়ে আর আমি কোথা থেকে জোটাবো স্যার। তবে, আমি ঠিকানা দিয়ে দেব। বিয়ের পর দিদিমণিদের সঙ্গে নিয়ে এখানে বেড়াতে আসবেন, আসার আগে আমাকে চিঠি দেবেন। আমি বাংলো বুক করা থেকে মহুয়া পর্যন্ত জোগাড় করে রাখব।

খুব ভালো পরামর্শ। আপনার ঠিকানাটা দেবেন তো—

সাঁওতাল কিশোরীটি একটা কলসী মাথায় করে গুটি গুটি এগিয়ে আসছে, দেখা গেল।

আমরা তিন ভাঁড় আনতে দিয়েছিলাম না? দিব্যেন্দু মধু মিস্তিরকে জিজ্ঞাসা করল।

হ্যাঁ। ওতেই আছে। ভাঁড় হচ্ছে একটা আন্দাজ মাপ। প্রায় সিকি কলসী—মধু মিস্তির বুঝিয়ে বলল। কিশোরীটি এসে প্রায় পুরো এক কলসী মহুয়া ঘরের মেঝেতে রাখল। ফিরতি পয়সা দিব্যেন্দুকে ফেরৎ দিতে গেলে দিব্যেন্দু ওকে বলল—তুই রাখ। আর শোন, বাইরে বস, কথা আছে। তোকে আরো বকশিস দেব—হোটেলে খাবি তুই আমাদের সঙ্গে—কেমন? কিশোরীটি চুপচাপ বারান্দায় গিয়ে বসল।

মধু মিস্তির জল মাপার ঐ কাঁচের জার চারটিতে মহুয়া ঢালল। প্রচুর মহুয়া। সুমন্ত এত মহুয়া দেখে ভয় পাচ্ছিল। বরুণও। —কিছু হবে না। মহুয়ায় নেশা কম হয়। স্বাস্থ্য ভালো হয়—মধু মিস্তির বিশেষজ্ঞের মতো বলল।

মহুয়ার হাঁড়িতে হাত দিয়ে মধু মিস্তির অসম্ভব চটপটে, বুদ্ধিমান এবং সক্রিয় হয়ে উঠল। ওর ঐ বিখ্যাত এবং একেবারে নিজস্ব বাঁ চোখটি আলোয় দীপ্ত হয়ে উঠল। ওকে আর ন্যালাখ্যাপা মনে হলো না। ওর মুখে একরকম অসাধারণ ব্যগ্রতা আর বুদ্ধির ঝলক বয়ে গেল। কখন যে কার বুদ্ধি খোলে বলা মুশকিল। হাঁড়ি উপুড় করে সে নিঙড়ে নিঙড়ে প্রতিটি ফোঁটা মহুয়া চারটি জারে সমানভাবে ঢালল। দিব্যেন্দু, সুমন্ত এবং বরুণের ব্যক্তিত্ব ম্লান হয়ে গেল ওর কাছে এখন। প্রতিটি মানুষেরই ব্যক্তিত্ব থাকে—সেই ব্যক্তিত্ব কোথাও কোথাও অসাধারণও হয়ে উঠতে পারে। মধু মিস্তিরই এখন চারজনের দলের নেতা। দিব্যেন্দু এবং বরুণ—যারা এতক্ষণ খুব চঞ্চল ছিল। এখন নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে। ওরা ধরেই নিয়েছে—এক এক ভাবের রাজ্যে এক একজন রাজা হয়ে থাকে। মধু মিস্তিরের রাজত্বে তাকেই ফুটে উঠতে দেখা যাচ্ছে। মধু মিস্তির বলল—টাটকা, এখনও গরম আছে। নিন চুমুক দিন—চারজনে ডিম ভাজা দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে মহুয়া খেল। সিগারেট ধরিয়ে টানল।

এখন প্রায় দেড়টা বাজে।

তিন বন্ধুতে প্রায় ঘন্টা চারেক এই ঘাটশিলার সুবর্ণরেখার পাড়ে কাটিয়ে দিল। কী ভাবে যে চারটি ঘন্টা কেটে গেল। ওরা বুঝতে পারল না। বরুণ একবার কাতরস্বরে বলল—সেই মেয়েটিকে আর কোনোদিন দেখা যাবে না, আঃ, ঐ অবগাহন দৃশ্যের পর পৃথিবী স্থির হয়ে যেতে পারত।

হুম—দিব্যেন্দু পিঠে থাপ্পড় দিয়ে বলল—অরুণ, হবে হবে, ঐ মেয়েটি না হলেও ওরকম একটি মেয়েকে জুটিয়ে দেব আমি। দিব্যেন্দু বরুণের নকল নাম ভুলে যায়নি। যতক্ষণ মধু মিস্তিরের সঙ্গে আছে ততক্ষণ বরুণকে অরুণ বলেই ডাকতে হবে, সে জানে।

ক'টা বাজে?

একটা পঁচিশ।

এই বার?

হোটেলে যেতে হবে।

আর মেয়েছেলে জোগাড় হবে কখন?

হবে হবে—মধু মিস্তির ফিক ফিক করে হাসল।

চলুন, খেতে যাই—দিব্যেন্দু মধু মিস্তিরকে বলল।

কোন হোটেলে যাব আমরা? —সুমন্ত বলল।

এখানে চক্রবর্তী বাবুদের হোটেল আছে—খুব চালু হোটেল। বাঙালীবাবুরা এখানে এসে ওখানেই ওঠেন—মধু মিস্তির বলল।

তবে তাই চলুন—সুমন্ত বলল।

তাড়াতাড়ি কাজ সেরে পাঁচটা কুড়ির স্টীল ধরতে হবে—দিব্যেন্দু বলল।

সে দেখা যাবে, ফিরতেই যে হবে তার কি মানে আছে। আপনার এখানে, মানে এই অফিস ঘরে থাকা যাবে না? বরুণ মধু মিস্তিরকে জিজ্ঞাসা করল।

আপনারা থাকতে চান? —মধু মিস্তির বলল।

যদি প্রয়োজন হয়। সামান্য সময় আছে হাতে। এরমধ্যে মেয়েছেলে জোগাড় করে ফুর্তি-ফার্তা শেষ করে যদি ট্রেন ধরা না যায়—

থেকেই যান, অমন তাড়াহুড়ো করে কিছু হয় না। এসব কি ঘড়ি ধরে করার কাজ। এ হলো ফুর্তি-ফার্তা—মধু মিস্তির এবার ওদের জ্ঞান দিতে আরম্ভ করেছে।

যা করেন, গুরু, মেজো মেসোকে সত্যি আপনার কথা বলব। কাগজে আর্টিকেল করব আপনাকে নিয়ে—দিব্যেন্দু মিন মিন করে কথা বলছে। তিনজনই মহুয়া খাওয়ার পর মাথায় অল্প ঝাঁকুনি খেয়েছে।

এখন বাংলো জোগাড় করা যাবে?

চেষ্টা করে দেখতে হবে। বুক না থাকলে কেয়ার টেকারকে দু' পাঁচ টাকা ঝাড়তে হবে—মধু মিস্তির বিজ্ঞের মতো বলল। —তাছাড়া আমি তো আছিই স্যার—

ওরা চারজন অফিস ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। বারান্দায় বসে থাকা ঐ সাঁওতাল কিশোরীটিকে সঙ্গে ডেকে নিয়ে ওরা হোটেলের উদ্দেশে পা বাড়াল।

মোট পাঁচজনের একটা দল হলো। ওরা সুবর্ণরেখার পাশ দিয়ে চষা ক্ষেত, মাঠ-ঘাট টপকে একটা সোজা পথ ধরার চেষ্টা করল। যেতে যেতে দিব্যেন্দু ঐ সাঁওতাল কিশোরীটির সঙ্গে ভাব জমানোর

চেষ্টা করল'।

তুই বাংলা জানিস?

হ্যাঁ, জানি, বলতেও পারি—

বাঃ, চমৎকার। তোর নাম কি ভাই?

রূপলাল, রূপলাল পাহাড়িয়া—

তুই সাঁওতাল নস?

না, আমরা পাহাড়িয়া—ঐ সব গাঁয়ে থাকি।

তোদের দেশ, তোদের গ্রামগুলো ভারি সুন্দর রে রূপলাল। তোরাও বড় সুন্দর মানুষ, —এবার আসব তোদের দেশে—আমাদের একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তোদের গ্রাম দেখাবি?

দেখাবো! কি দেখবেন বাবু, ঝুপড়ি ঘর—পাথুরে দেশ—ফসল হয়না—বড় কষ্ট—

থাক বলিসনে। আমার শুনতে খুব খারাপ লাগে। একদিন তোরা সুখী হবি রে রূপলাল—

হবি হবি—শোন—সাঁওতাল বা পাহাড়িয়া মেয়েছেলে পাওয়া যায় রে রূপলাল—একটু ফুর্তি-টুর্তি করতাম—দিব্যেন্দু বলে দিল।

কিশোরটি কোনো উত্তর দিল না। চুপ করে রইল। ওদের সঙ্গে সঙ্গে চুপচাপ হাঁটতে লাগল।

কি রে—দিব্যেন্দু উসকে দিল।

না—খুব কঠিন গলায় কিশোরটি 'না' শব্দটা উচ্চারণ করল।

আচ্ছা—ঠিক আছে—থাক—। চলতো, আগে হোটেলে খাইগে—

ওরা পাঁচজনে চক্রবর্তী হোটেলে এসে উঠল।

হোটেলের সামনে কলকাতা থেকে রাঁচি যাওয়ার রাষ্ট্রীয় পরিবহন দপ্তরের সবুজ রং-এর দূরপাল্লার একটি বাস দাঁড়িয়েছে। ঐ বাসের সব লোকের উপচে পড়েছে ঐ হোটেলে। বাঙালী খানার ব্যবস্থা আছে এখানে। সস্তায় মাছ-ভাত পাওয়া যায়। ওরা প্রায় ঠেলে-ঠুলে হোটেলে ঢুকল। এই ভিড়টা—বোঝা যাচ্ছে—বাসের জন্যেই। হোটেলের ভিতরে ঢুকে দিব্যেন্দু এদিক সেদিক লক্ষ্য করল—দেখল—মেয়েদের জন্যে আলাদা জায়গায়—কেবিনের দিকটায় বিশেষ ভিড় নেই। দিব্যেন্দু বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে দলের নেতৃত্ব দিয়ে ঐ কেবিনের ফাঁকা জায়গায় চলে গেল। ঐ কেবিনের এক কোণে বসে একজন যুবতী মহিলা একটি শিশুকে নিয়ে বসে খাচ্ছেন। দিব্যেন্দু ঐ ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রকাশ করে বলল—বড্ড ভিড়, এখানটায় বসতে পারি?

নিশ্চয়—ভদ্রমহিলা খুব সহজেই অনুমতি দিলেন।

বরুণ এবং সুমন্ত লুকিয়ে লুকিয়ে ভদ্রমহিলার দিকে তাকাল, দেখল। দিব্যেন্দু হোটেলের পরিচারকের সঙ্গে দরদাম ঠিক করতে লাগল। মধুমিস্তির এবং রূপলাল হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে বসেছে, সামনের একটা টেবিলে শ্বেতপাথরে মোড়া ছোটো ছোটো টেবিলের দুটি ওরা দখল করেছে। ঐ ভদ্রমহিলার থেকে একটা টেবিল ফাঁক রেখে সুমন্ত এবং বরুণ ঐ ভদ্রমহিলার সামনাসামনি বসেছে।

ভদ্রমহিলার বয়স ওদেরই সমান, কিম্বা সামান্য দু-এক বছর বেশি হবে, কিন্তু ওঁর মুখের গাম্ভীর্য ওঁকে বেশ ভারিক্কি করেছে। তিরিশ-বত্রিশ বছরের যুবক এবং যুবতী একরকম হয় না। মেয়েরা ঐ বয়সে বেশ প্রাপ্তবয়স্কের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব পেয়ে যায়। ভদ্রমহিলার শরীরে অল্প পাতলা চর্বি জমেছে। এবং গরমে ওঁর মুখে একটা লালচে আভা তৈরি করে দিয়েছে, ফলে ওকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। এমনিতেই ভদ্রমহিলা বেশ সুন্দরী। এবং সুসভ্য বলে মনে হয়। একটা হাল্কা আকাশি রং-এর শাড়ি পরেছে। গায়ে শাদা ব্লাউজ। পিঠে ফাঁপানো এক বেণী করা চুল। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ। পাতলা ঠোঁট। পাতলা ভুরু। চিকন আর নরম নাক। নাকে একটি ছোট্ট মোতি বসানো অলংকার আছে। নিটোল কপাল। একটু সাহসী গ্রীবা। চোখ দুটি টলটলে এবং গভীর। মার্জিতা, বুদ্ধিমতী এবং সুন্দরী। খাঁটি বাঙালী চেহারা। কপালে সিঁদুর নেই। বরুণ বারবার ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে সিঁথিতে সামান্য একটু সিঁদুরের আভাস পেয়ে গম্ভীর হয়ে গেল। ভদ্রমহিলার সঙ্গের শিশুটির বয়স বছর ছয়েক, প্রায় বরুণের সন্তানের সমবয়সী।

সুমন্ত বরুণকে বুঝতে পেরেছে। ও বরুণের কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বলল প্রাকৃত, আদিম সুন্দরীর উপর তোমার মোহ এখুনি কাটিয়ে দিচ্ছিলেন ঐ ভদ্রমহিলা—যদি—না সিঁদুরের রেখাটি তুমি দেখতে পেতে—

ঠিকই বলেছ। দারুণ। আঃ, কতো নির্ভার যৌবন, প্রাণ—কিন্তু—ছেলেটি ওঁরই—

হ্যাঁ।

ভদ্রমহিলা চকিতে একবার বরুণ ও সুমন্তর দিকে তাকিয়ে খাওয়ায় মন দিলেন। ওঁর ঐ চাউনির মধ্যে শাসন না প্রশ্রয় লুকিয়ে আছে কিছুই বুঝতে পারল না বরুণ কিংবা সুমন্ত।

দিব্যেন্দুর স্ত্রী সুজাতার কিছু কিছু আভাস আছে ওঁর মধ্যে—দেখেছ? বরুণ বলল।

ইলার মতো গ্রীবা—সুমন্ত বলল।

তোমার স্ত্রীর চোখের মতো ওঁর চোখ অনেকটা—বরুণ বলল।

সকলের ভালোগুলো মিশেছে ওঁর মধ্যে—সুমন্ত বলল।

এবার সুমন্ত বেশ জোরে—যাতে হোটেলের হৈ চৈ টপকে তার কথা ঐ ভদ্রমহিলার কানে যায় এইভাবে বলল—ওঁকে আমরা আমাদের ট্রেন থেকে নামতে দেখেছি, তাই না—

হাঁ—বরুণ আলটপকা সুমন্তকে সমর্থন করল।

দিব্যেন্দু অর্ডার দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এতক্ষণে এসে গেছে।

পরিচারক ওদের খাবার দিয়ে গেল।

কিন্তু ভদ্রমহিলার এতক্ষণে খাওয়া হয়ে গেছে। তিনি হাত-মুখ ধুয়ে বিল শোধ করে ছেলেটির হাত ধরে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে চকিতে একবার বরুণের উপর দিয়ে তিনি চোখ বুলিয়ে নিলেন।

মহিলাটি উঠে যাওয়ার পর দিব্যেন্দু লক্ষ্য করল—ওঁর ছেড়ে যাওয়া টেবিলের নিচে ওঁর ছেলেটির একটা খেলনা পড়ে আছে। দিব্যেন্দু সেই খেলনাটিকে কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে বাইরে গেল। ভদ্রমহিলা বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটা রিক্সার সঙ্গে দরদাম করছিলেন। দিব্যেন্দু তাঁর কাছে গিয়ে ছেলেটিকে বলল—'কাকু, তুমি এই খেলনাটি ফেলে এসেছ, নাও—'

ছেলেটি খুব খুশি হলো। এবং ভদ্রমহিলা সকৃতজ্ঞভঙ্গিতে দিব্যেন্দুর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে রিক্সায় উঠে পড়লেন।

সিঁথিতে সিঁদুর,—বরুণ বলল, বিড়বিড় করল,—পরনে ঢাকাই শাড়ি—

তাতে কি হয়েছে, ভদ্রমহিলার জাত গিয়েছে? স্ত্রীলোক—স্ত্রীলোকই দিব্যেন্দু ঝাঁঝ ঝাঁকিয়ে বলল। এবং দিব্যেন্দু রূপলালের কাছাকাছি খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল। খেতে খেতে দিব্যেন্দু রূপলালের সঙ্গে কথা আরম্ভ করল। সুমন্ত এবং বরুণ দিব্যেন্দুর নাছোড় ভাবখানা দেখছে। পারেও বটে দিব্যেন্দু! কি করে যে দিব্যেন্দু ঐ কিশোরটির কাছে মেয়েছেলে সংগ্রহের প্রস্তাব দিতে পারে, তা সুমন্ত এবং বরুণ বুঝে পেল না। কিন্তু, ও বিনা দ্বিধায় ঐ কিশোরটিকে প্রায় বন্ধু বানিয়ে ফেলেছে। বেশ গম্ভীরভাবে দিব্যেন্দু রূপলালের সঙ্গে কথাবার্তা বলে যাচ্ছে।

দিব্যেন্দু ওকে ফিস ফিস করে কি বলছে সুমন্ত, তুমি ফলো করতে পারছ? —বরুণ বলল।

না। তবে ও জয়ী হবে, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই, কেমন ফ্লেক্সিবল চরিত্র দিব্যেন্দুর ভেবে দেখ, কোনো সংস্কার নেই। আমরা হলে পারতাম? ও চাকরিতেও প্রতিষ্ঠা অর্জন করবে, দেখে নিও। —সুমন্ত বলল

হুম। সুমন্ত—বরুণ বলল—যা খুশি ও করুক আমি এখন ঐ ভদ্রমহিলার কথা ভাবছি। ঐ যে ভদ্রমহিলাকে দেখলে—ও যদি তোমার প্রেমিকা হতো, তাহলে নির্ঘাত তুমি কবি হয়ে যেতে—তেমন পূর্ব শর্তে আমি বিশ্বাস করি না। তুমি হয়ত ঠিকই বলেছ, তবে, তুমি ভিক্টোরিয়ান যুগের ইউরোপের মানসিকতার কথা বললে। তারপর যুগ তো অনেক পাল্টেছে। বালজাক-বোদলেয়র নতুন মূল্যবোধ গড়ে দিয়েছেন। এখন আর কেউ ভাবেন না যে সুন্দরী, বিদুষী,

রতিনিপুণা প্রেমিকা থাকলেই কবি হওয়ার প্রেরণা পাওয়া যায়। তাছাড়া ঐ ধরনের মেয়েরা যে কবিদের খুব প্রশ্রয় দেয় আজকাল— এমন ভাবার কারণ নেই। ওরা বরং নিশ্চিন্ত সুখের জন্যে ভোঁতা কিংবা একমুখী, বিকারহীন চরিত্রের 'গুড' বরদেরই বেশি পছন্দ করে। আমরা তো কেউ 'গুড' বয় নইরে ভাই—সুমন্ত আক্ষেপের সুরে নিজের যুক্তিকে সমর্থন করল। আমার তো মনে হয় মধ্যবিত্ত জীবনের গণ্ডীবদ্ধতা থেকে সরে না দাঁড়ালে এদেশে ভালো কবি হওয়া সম্ভব নয়। আমি মধ্যবিত্তের সীমাবদ্ধতাকে খুবই ঘেন্না করি, কিন্তু কিছুতেই সেখান থেকে সরে দাঁড়াতে পারছি না। সেইজন্যেই আমি প্রথাবদ্ধ মামুলী পদ্য ছাড়া লিখতে পারি না। সেই আক্ষেপে পদ্য লেখাই ছেড়ে দিয়েছি।

তোমার এত রাগ কেন, মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের উপর? —বরুণ জিজ্ঞাসা করল।

প্রতিযোগিতায় এ'টে উঠতে পারিনি বলে। আমাকে জীবন থেকে বিযুক্ত করে ফেলেছে বলে। জানো তো, ইউরোপে মধ্যবিত্তের ভিত্তি তৈরি হয়েছে শিল্পবিপ্লবের পটভূমিতে। আমাদের দেশের মধ্যবিত্তদের ভিত্তি তৈরি হয়েছে ভূমির উপর সাম্রাজ্যবাদী সংস্কারের ফলে। পার্মানেন্ট সেটলমেন্টের ফলে যে হাজার গণ্ডা উপসত্বভোগীর জন্ম হয়েছিল, আমরা তাদের বংশধর, সেইজন্যেই আমাদের মধ্যে চিন্তার বদ্ধতা রয়েছে। আমাদের মধ্যবিত্ত মানসিকতা সাম্রাজ্যবাদকে পুষ্ট করেছে। সামন্ততন্ত্রকে পুষ্ট করেছে—সুমন্ত একটানা বলে গেল।

তা বেশ তো, তুমি ঘেন্না কর, অথচ সরে দাঁড়াতে পার না কেন? —বরুণ বলল।

এটা আমার চরিত্রের দুর্বলতা। এই দুর্বলতা মানুষকে সমালোচক করে, ক্রিয়েটিভ করে না। তাছাড়া এই মধ্যবিত্ত সমাজের ভিতরে ডুবে থাকব এবং একে আঘাত করব, এ হয়না। তুমি ভালো করে লক্ষ্য করে দেখ—কেবল রবীন্দ্রনাথের কিছু নারী চরিত্র ছাড়া, আমাদের সাহিত্যে কোনো বিদ্রোহী চরিত্র নেই—না, পুরুষ চরিত্র তো একটিও নেই। তুমি তুর্গেনিভের ফাদারস্ অ্যাণ্ড সন্স পড়েছ?

পড়েছি—

বাজারভের কথা মনে পড়ে, কিম্বা দস্তয়েভস্কির পুরুষ চরিত্রের কথা?

হুম। কিন্তু ও'রা তো খৃষ্টীয় মানবতাবাদের কথা বলেছেন—

শিল্পবিপ্লবের পর রুশবিপ্লব পর্যন্ত ওটাই ছিল আধুনিকতা—সেই আধুনিকতাকে ও'রা ধরেছিলেন, তাই ঐ রকম চরিত্র গড়তে পেরেছেন —সুমন্ত বলল।

হুম, আমাদের ভালো করে ভাবতে হবে। স্বাধীনতার পর নতুন মূল্যবোধ কিছু তৈরি হলো কি না—

কি হবে বরুণ, —এসব আলোচনা ছাড়ো, —আমি আজকাল পড়াশুনো করার চেয়ে ঘুমুতে বেশি ভালোবাসি।

হাঃ হাঃ

কি হলো?

সবাই আমরা ঘুমুতে ভালোবাসি এবং বড় বড় কথা বলতে ভালোবাসি—

ঠিক বলেছ—সুমন্ত বলল।

ছাড় এখন, দিব্যেন্দুর দিকে লক্ষ্য কর—ও রূপলালকে মনে হয় ম্যানেজ করে ফেলেছে—

ও বেটাকে ধরে সেটা নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করে। দিব্যেন্দু যদি ক্রিয়েটিভিটির মধ্যে থাকত, দেখতে ও কিছু করতে পারত—সুমন্ত বলল।

ওদের খাওয়া হয়ে গেল।

দিব্যেন্দু বরুণের কাছ থেকে কিছু পয়সা কড়ি নিয়ে হোটেলের বিলটা দিল।

ওরা পাঁচজন হোটেলের বাইরে, রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

র'াচি যাওয়ার বাসটি ছেড়ে চলে গেছে। ফলে হোটেলের সামনে ভিড় নেই। রাস্তাটা হা হা করছে দুপুরের গরম আর রোদে। বাতাসে বিন্দুমাত্র জলীয়বাষ্প নেই। ঘাম হয় না। গরম হাওয়ার ঝাপট সু'চের মতো বিঁধতে থাকে।

ওরা পাঁচজন বাইরে, একটা ঝাঁপ গোটানো টিনের ছাউনির নিচে এসে দাঁড়ায়। চারজনে চারটে সিগারেট ধরাল।

শোন—দিব্যেন্দু, সুমন্ত এবং বরুণকে উদ্দেশ্য করে বলল।

বল—

রূপলাল বলছে হবে, তবে সন্ধ্যের আগে নয়। দিনের বেলায় আসবে না মেয়েটা।

আমাদের যে পাঁচটা কুড়ির ট্রেন ধরতে হবে রূপলাল—বরুণ রূপলালকে বলল।

দিনের বেলায় ও কিছুতেই আসবে না বাবু, ওর ভয় করে—রূপলাল বলল।

ভয় কি, আমরা তো ওকে বেশিক্ষণ আটকে রাখব না—

যদি কেউ দেখে ফেলে, তা হলে আপনাদেরও ছাড়বে না, ওকেও গ্রাম থেকে মেরে তাড়াবে। ওকে একবার গ্রাম থেকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল—ঐসব করার জন্যে—

তা হলে? —বরুণ হতাশ হয়ে বলল।

সন্ধ্যের জন্যেই 'বুক' করি, কি বল? মেয়েটির অসুবিধের দিকটাও দেখতে হবে তো। —দিব্যেন্দু উদার হয়ে বলল।

ঠিকই। —বরুণ সমর্থন করল—তাছাড়া সঙ্গে যখন মধুবাবু আছে, তখন আর অসুবিধের কি আছে—ওর অফিস ঘরটাই ব্যবহার করা যাবে, কি মধুবাবু? —বরুণ মধু মিস্তিরের দিকে তাকিয়ে বলল।

হেঃ হেঃ স্যার, ঠিক আছে, অসুবিধের কিছু নেই। আমি আপনাদের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে তালা মেরে বাইরে বসে থাকব। কেউ কিছু বুঝতেই পারবে না। —মধু মিস্তির বলল।

কোথায় আছে মেয়েটি, রূপলাল?—দিব্যেন্দু রূপলালকে বলল।

ও এখন কাজ করছে, তামার কারখানার কাছে মাটি কাটছে—রূপলাল বলল।

কি রূপলাল, একবার অন্তত মেয়েটিকে দেখিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা কর ভাই।—দিব্যেন্দু মিনতির সুরে বলল।

না বাবু, হবেক না—রূপলাল বলল, এখন দেখা হবেক না—

দূর, কেবল হবেক না, আর পারবক না—চল চল, দেখিয়ে দেবে চল—এখুনি 'বুক' করার জন্যে কিছু অ্যাডভানস করব। তুমি মেয়েটাকে দিয়ে দেবে খন, আর তোমাকে দু'টাকা এখন বকশিস দেব, ওসব হয়ে গেলে তুমি আরো দু'টাকা পাবে—বলে দিব্যেন্দু রূপলালের হাতে নতুন, নির্ভাজ দুটো একটাকার নোট গু'জে দিল।

দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে কিন্তুক—কাছে যাওয়া চলবে না—রূপলাল বলল।

বেশ তো, তাই দেখব। দূরে দাঁড়িয়ে দেখব। কেউ বুঝতেই পারবে না যে আমরা ওকে দেখছি—দিব্যেন্দু বরুণ এবং সুমন্ত মেয়েটিকে দেখবার জন্যে উতলা হয়ে উঠল। ওরা রিকসা ধরার জন্যে এগুতে লাগল।

তামার কারখানা ফুলডুংরির কাছে। ফুলডুংরিতে ওরা এমনিতেই বেড়াতে যেত। এটা এ অঞ্চলের একটা স্পট। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্যে বিখ্যাত। অতএব, গোটা ব্যাপারটা—বেশ ভালোই জমল।

আমাদের সঙ্গে ঘণ্টা খানেক কাটালে কি অসুবিধে হবে মধুবাবু? দিব্যেন্দু মধু মিস্তিরকে জিজ্ঞাসা করল।

না না, আজ তো তালা বন্ধ রাখার দিন, অসুবিধে হবে না—

তবে চলুন—দিব্যেন্দু নেতৃত্ব দিতে লাগল।

কেমন বয়স হবে রে রূপলাল?—বরুণ জিজ্ঞাসা করল।

আমার চেয়ে এক বছরের বড়—রূপলাল বলল।

তা হলে তো কিশোরী, দারুণ জুটিয়েছ রূপলাল—দিব্যেন্দু বলল।

ওর শরীরে জঙ্গলের শ্যাওলা আর তামা পাহাড়ের গন্ধ আছে নিশ্চয়—

ওর শরীর সূর্যের তাপে ট্যান করা, মাজা—

ওর হৃদয়ে সুদূর আদিম কালের বনজ রহস্য, গুহার চিত্রশিল্প আছে

ওর বুকে ফুলডুংরির লতা পাতা, ফুলের চুমকি বসান ঘন ছায়াময় শিলা-শৃঙ্গ—

কিশোর রূপলাল ফ্যাল ফ্যাল করে এই তিনজন যুবকের দিকে

তিনজন যুবক কখনো চায়না কোন গভীর দুঃখে ডুবে যেতে

তাকিয়ে রইল। কিছুই বুঝল না, তবু ওর মনে হলো, এরা বড় অসহায়, অস্থির। ওর মনে একরকম দয়া হলো। ও ভাবল, এই তিনজন যুবক—দালালীর জীবনে নতুন অভিজ্ঞতা। এদের ও ভালো মানুষ বলেই মনে করল। ওরা দুটি রিকসা ধরল, এবং ফুলডুংরি ও তামার কারখানার দিকে চলল।

এই তিনজন যুবক চঞ্চল, মুখর, দিলখোলা। তিনজন যুবক কখনো চায়না কোনো গভীর দুঃখে ডুবে যেতে। জীবনের বিষাদময় অভিজ্ঞতাগুলি নিয়ে জ্ঞানী মানুষ হয়ে প্রাজ্ঞ এক মনগড়া সুখের মধ্যে থাকতে চায়নি এরা কোনোদিন। সব সময়ই স্পন্দনশীল এই যুবক তিনটির হতাশা কোথায়, কেন, তা নিয়ে ওরা খুব একটা মাথা ঘামায়নি কোনো দিন। জীবনের উদ্দেশ্য কী, জীবনের আনন্দ কোথায়—এসব আজ পর্যন্ত ওদের কেউ ভালো করে বুঝিয়ে দিতেও পারেনি। কোনো কাপালিকতা বা কোনো সন্ন্যাস, কোনো গম্ভীর প্রাজ্ঞতা বা কোনো বুদ্ধিজীবীর ফানুষ—এদের বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট করেনি। মাত্র চারজন মানুষকে ওরা পৃথিবীর সেরা মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধা করে—এঁরা হলেন বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ এবং মার্কস। তাছাড়া, যদি শ্রীকৃষ্ণ কোনো জ্যান্ত মানুষ হন—তবে তাঁকেও এঁরা শ্রদ্ধা করে। একদা পদ্য লিখত এরা—সেই সময় আদি বাঙলা কবিতার চর্চা করতে গিয়ে মহাসুখবাদী লুইপাদকে ওদের ভালো লেগেছিল। লুইপাদ, কাহ্নপাদ, কুক্কুরিপাদ—বৌদ্ধ দর্শনকে নিজেদের মতো করে গড়ে নিয়েছিলেন এঁরা। তারপর এল বাঙলা কবিতায় বৈষ্ণব ইনটেলেকচুয়ালরা। আর ইউরোপ মানেই তো খ্রীস্টিয় মানবতা বাদ—এবং সাম্রাজ্যবাদ। কার্লমার্কস কি খ্রীস্টিয় মানবতাবাদী নন? তাঁর বোধের ভিত্তি কি খ্রীস্টিয় মানবতাবাদ নয়? জীবন এবং সমাজের কোনো স্থায়ী সংবিধান নেই—সবই তাৎক্ষণিক। কেবল মহাসুখবাদী লুইপাদ জীবনের একটা স্থায়ী বোধ দিতে চেয়েছিলেন। অতি সাধারণ অথচ স্পন্দনশীল এই তরুণ তিনজনই বিবাহিত। প্রত্যেকেই একটি করে সন্তানের জনক, একটি করে সংসারের কর্ণধার। কী ভাবে সংসার গড়ে ওঠে সে বিষয়ে তাদের কোনো মৌলিক ধারণা নেই। প্রবহমান সমাজ থেকে সংসার জীবন সম্বন্ধে ওরা একটা ধারণা করতে পারে মাত্র। একটি আবাস, কিছু আসবাবপত্র, স্ত্রী-পুত্র, রান্নাঘর, বাথরুম-পায়খানা, হাঁড়ি-কুঁড়ি, বাক্স-পোর্টম্যান,—তারপর প্রতিযোগিতা—গ্যাস, ফ্রীজ, পদোন্নতি, মোটর সাইকেল, টি ভি, রেকর্ডপ্লেয়ার। আরো প্রতিযোগিতা-কালো টাকা, কার, বিদেশগমন, অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন, দাসত্ব প্রথার স্বপক্ষে সওয়াল—আরো প্রতিযোগিতা—জাতীয় প্রতিযোগিতা-নিউট্রন বোমা—তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মানুষের অস্তিত্বকে নস্যাৎ করে দিয়ে দানব, বর্বর, পশুর শবনৃত্য। আসলে, গোটা পৃথিবী এখন কাপালিকদের হাতে। সংসার গড়ার ফর্মূলা কী? সংসার গড়ার আগে বা সংসার গড়ার পরেও তা তারা ভালো করে জানেনি, জানে না! ওদের ধারণা হয়—সংসারের মূল বীজ রয়েছে একজন পুরুষ ও একজন নারীর জৈবিক ও মানসিক ঐক্যের কেন্দ্রে। এটা বোধহয় লুইপাদ ভালো করে জানতেন। জানতেন ভারতের লোকায়ত দর্শনের প্রবক্তারাও। কিন্তু, পরস্পরের এই ঐক্য, এই নির্ভরশীলতা কী ভাবে গড়ে উঠবে? পৃথিবীর বর্তমান স্বীকৃত সমাজে? যার উপর খাঁড়ার মতো ঝুলে আছে ভয়, অত্যাচার প্রতিযোগিতা, জীবনের অনিশ্চয়তা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং নিউট্রন বোমা। সবকিছু তছনছ হয়ে যাচ্ছে। সব কিছুই। সংসার গড়ার আগে এসব ভাবলে সংসার গড়া যায় না, সংসার গড়ার পরে এসব ভাবলে সংসার বিষাক্ত হয়ে পড়ে। ওদের রিক্সা ফুলডুংরিতে চলে এল। হোটেল থেকে রিক্সায় কুড়ি পঁচিশ মিনিটের পথ মাত্র। চারিদিক ঝকঝকে, ফাঁকা, সুন্দর। মাঝা রাস্তার সঙ্গে অন্য একটি রাস্তা এসে মিশেছে এখানে। মনোরম পরিবেশ উঁচু নিচু টিলায় সবুজের আড্ডা। খুব কাছে, সুবর্ণরেখার পাড়ে তামার কারখানা। রিক্সা ওদের ওখানেই নামিয়ে দিল।

দেখ দেখ—কী চমৎকার ডাকবাংলো—সুমন্তর নজর গেল ঝোপ-ঝাড় আর নানান ফুলগাছ ঘেরা একটা টিলার উপর—পি ডব্লিউ ডি-র ডাকবাংলোটির দিকে, ও বলল—চল, ওখানে গিয়ে বসে থাকি।

দাঁড়াও, আগে মেয়েটাকে দেখে নিই—দিব্যেন্দু ওকে বাধা দিয়ে বলল।

তা বেশ,

দিব্যেন্দু ওর হিপ-পকেট থেকে খস করে এক টাকার একটা জ্যান্ত নোটের তাড়া বের করল। ঐ তাড়ার পিন থেকে দিব্যেন্দু সাতটা একটাকার নোট বের করে রূপলালকে দিয়ে বলল—ওকে পাঁচ টাকা অ্যাডভান্স দেবে, তুমি দু'টাকা বকশিস নেবে। যাও—রূপলাল ওদের দাঁড়াতে বলে গেল। রূপলাল নির্দেশ দিল আপনারা রাস্তার এপাশের গাছতলায় বসুন। ও আসবে। এসে ওপারে দাঁড়াবে। আপনাদের দেখা হয়ে যাবে। ও এসে অল্প একটু দাঁড়াবে—

আচ্ছা, তাই হবে, তুমি ওকে নিয়ে এস—

বৃপলাল চলে গেল।

ওরা চারজন গাছতলায় বসল।

ওরা চারজন নির্বাক, হিম হয়ে বসে থাকে।

দিব্যেন্দু, সুমন্ত এবং বরুণের বুকের ভিতর চনমন করছে, আত্মহননের, পাপের আস্বাদ পাওয়ার জন্যে। 'পাপই বা কেন?' ওরা তিনজনই মনে মনে ভাবছে, বরং বলা উচিৎ 'অসামাজিকতা।'—কিম্বা, কিছুই না, লুইপাদ কথিত মহাসুখ। এই শান্ত, সুন্দর, থমথমে পরিবেশের মধ্যে মাঝে মাঝে সাইকেল চেপে একটি দুটি লোক চলে যাচ্ছে। খানিকটা দূরে চা আর তেলে ভাজার দোকানের বাঁশের চটা দিয়ে তৈরি বেঞ্চিতে বসে দু'একজন আদিবাসী মানুষ ঢুলছে। একটি দু'টি কুকুরও ঘুমুচ্ছে এ দোকানের আনাচে কানাচে। তিন চার জনের ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে সাঁওতাল মহিলারা যাচ্ছে বাজারে। তাঁদের মাথায় আনাজ-পত্রের ঝুড়ি। কয়েকটি কুঁকড়ো একটা ঝুপড়িতে পুরে মাথায় নিয়ে চলে যাচ্ছে—এক সবল সুন্দর সাঁওতাল পুরুষ। নম্র, সুন্দর, সজীব এদের চলা-ফেরা। অকৃত্রিম, আড়ষ্টতাহীন।

খুবই কাছে ঐ ডাকবাংলো। আধুনিক স্থাপত্য রুচির বিশিষ্ট নিদর্শন যেন। চারিদিকে গোলাকার ঢালু টিলার মাথায় ঐ সুন্দর ডাকবাংলোটি নীরব, শান্ত। কোনো লোকজন নেই ওখানে। কৃষ্ণচূড়া আর গুলমোহর গাছে থৈ থৈ করছে ফুল ঐ বাংলো ঘিরে। গ্রীষ্মকাল লাল-ফুলের কাল। সবুজ আর লালের মধ্যে মেটুলি রং-এর ডাকবাংলোটি অসম্ভব প্রাণ পেয়েছে যেন।

বিরাট আকাশ, বিশাল সুন্দর প্রকৃতির মধ্যে মানুষ খুব ঝরঝরে হয়ে পড়ে।

বরুণ, দিব্যেন্দু এবং সুমন্ত এখন অনেক ঝরঝরে আর সুখী বোধ করছে। ওদের স্নায়ুর জড়তা অনেকটা হাল্কা হয়ে গেছে এখন।

বরুণ! সুমন্ত বরুণকে হাল্কাভাবে ধাক্কা দিল।

কি?

ঐ দেখ, বৃপলাল আসছে, মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে—

বাব্বাঃ, বাঁচলাম, এতক্ষণে। সেই সকাল থেকে আমাদের জীবনে কোনো মেয়ে ছিল না, মেয়ের স্মৃতিও ছিল না—দিব্যেন্দু বলল।

ওরা তিনজনে অপলকে বৃপলালের সঙ্গে ঐ সাঁওতাল তরুণীটিকে আসতে দেখল।

আঃ

চমৎকার। ফুল অব ভাইটালিটি। বাডিং

স্মার্ট। জ্যান্ত। দেখ, শরীরে ওর পাহাড়ি কাদা মাটি মাখান আছে।

বিউটি। অ্যাবঅরিজিন্যাল বিউটি—। সুপ্রাচীন কালের ভারতের ঘন বনানী আর হিমালয় থেকে ভেসে আসা মেঘের শান্তি ওর সারা শরীরে আজও রয়েছে—

আমাদের প্রপিতামহী

একটা নোংরা কাপড় পরণে আছে মেয়েটির। কাপড় জড়িয়ে আঁটোসাটো করে বাঁধা বুক আর কোমর। মাথার চুল গামছা দিয়ে জড়ান। মিষ্টি, পাতলা ঠোঁট। শরীরে কোনো বক্ষ আবরণী না থাকায় ধুলো মাখানো স্তনের আভাস ওর কাপড় ভেদ করে বেরিয়ে আসছে। রাস্তার ঠিক বিপরীত দিকে তরুণীটি ওদের দৃষ্টির অভ্যন্তরে স্পষ্টভাবে প্রবেশ করে দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা নিচু, মাটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে মেয়েটি। সমস্ত শরীর থেকে ওর যৌবন বিচ্ছুরিত হয়ে পরিবেশকে মাদক করে তুলেছে। অল্প একটু লজ্জার ভাব রয়েছে ওর আচরণে।

হে দেবী, প্রকৃতির স্নায়ু-রসে গড়া সুন্দরী, আমাদের স্বপ্ন দাও

আকাশ, পাহাড় আর মহুয়ার বাতাসে নির্মিত বিদ্যা,

আমাদের শান্তি দাও

পৃথিবীর আদিমতম রক্তের উষ্ণতা রয়েছে তোমার শরীরে,

আমাদের তুমি

উষ্ণ কর, সজীব কর আমাদের আকাঙ্ক্ষা।

বিড় বিড় করে দিব্যেন্দু, বরুণ ও সুমন্ত ঐ তরুণীর বন্দনা করল।

ওদের বন্দনা শেষ হতেই মেয়েটি চলে গেল। একটা বাঁকে, পাহাড়ী খাদ আর বনজঙ্গলের আড়ালে তরুণীটি হারিয়ে গেল।

কি বলল, বৃপলাল? —দিব্যেন্দু বৃপলালকে জিজ্ঞাসা করল।

সন্ধ্যে ছটার সময় ও-যাবে। ওকে বলেছি জলমাপা অফিস ঘরের পিছনে যেতে।

গুরু, তাহলে সব ঠিক রইল, কেমন?

—দিব্যেন্দু মধু মিস্ত্রিকে বলল। মানুষকে সাধন্তে আনতে দিব্যেন্দুর কোনো জুড়ি নেই। দিব্যেন্দুর মধ্যে এত প্রতিভা আছে—তা সুমন্ত বা বরুণও জানত না। দিব্যেন্দু এবার সিগারেট বের করে তিন বন্ধুতে ধরাল এবং মধু মিস্ত্রিকে দিল। তারপর পকেট থেকে একটা কুড়ি টাকার নোট বের করে মধু মিস্ত্রিরের হাতে দিয়ে বলল—এটা রাখুন। এ অঞ্চলটা ঘুরে আমরা ছটার আগেই আপনার সঙ্গে দেখা করছি। ব্রাদার, আপনি কিছু খাবার-দাবার আর দু হাঁড়ি মহুয়ার ব্যবস্থা রাখবেন। আমরা চার ভাই

তরুণীটি ওদের দৃষ্টির অভ্যন্তরে...

একসঙ্গে আজ রাত কাটাব, কেমন ?

একটা রিক্সা ডেকে দিব্যেন্দু মধুমিত্তির আর রূপলালকে তুলে দিল। রূপলালকে বলল, সন্ধ্যের সময় দেখা করিস, বকশিস দেব।

কেমন লাগছে এবার ? —দিব্যেন্দু বলল—সবকিছু কি সুন্দরভাবে ব্যবস্থা করে ফেললাম, দিব্যেন্দু নিজেকে নিজেই প্রশংসা করার মতো করে বলল।

সত্যিই, তোমার কোনো তুলনা হয় না—বরুণ বলল।

মাথায় এখন আর কোনো চাপ নেই, সব ব্যবস্থা পাকা—এবার তাহলে চল—ঐ বাংলোর চত্বরে, ছায়ায় খানিকটা বসে থাকি গে। —দিব্যেন্দু বলল।

এই হলো সেই বিখ্যাত ফুলডুংরি,—আমরা বিভূতিভূষণের লেখায় পড়েছি।

চল, চল—

ওরা তিনজন ঐ টিলার মাথার সুন্দর বাংলোটির দিকে হাঁটতে লাগল।

টিলার মাথায় পাহাড়ী বনানী আর ফুল গাছের মধ্যেকার এই হাল ফ্যাসনের সুন্দর সরকারী বাংলোটির সামনের দিক সোনালী হলুদ নুড়িতে মোড়া। এই নুড়ি মোড়ান ঢালু গোল চত্বর ভেঙে ওরা বাংলোর সামনে একটা গাছের ছায়ায় গিয়ে বসল। জায়গাটি টিলার মাথা এবং সে কারণেই উঁচু। দুপাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে সাপের মতো হিলে হিলে লম্বা সড়ক। ডানদিকে চমৎকার একটি বাঁকের আভাস। আঁকা বাঁকা পাহাড়ী ভূমির উপর দিয়ে ডানদিকের রাস্তাটা এগিয়ে গিয়ে ক্রমশ উঁচুতে উঠে মিলিয়ে গেছে এক বাঁকে। এই বাংলোর চত্বরে বসে মনে হয়, রাস্তাটা আকাশের কোথাও গিয়ে মিলেছে, মানুষের দৃশ্যের আড়ালে। সুমন্তর মধ্যে মধ্যে বিভ্রম হয়। ঐ উঁচুতে উঠে যাওয়া রাস্তা দেখে তার দীঘার সমুদ্রের কথা মনে পড়ে। কোনো এক পূর্ণিমায় দীঘা গিয়েছিল সুমন্ত। বান আসার সময় হয়েছে। সুমন্ত দাঁড়িয়ে ছিল সমুদ্র এবং তটরেখার বালির সঙ্গমে। ওর হঠাৎ মনে হলো—সমুদ্র উঁচুতে উঠে আকাশে মিশেছে। পিছনে তাকিয়ে দেখল প্রশস্ত তটরেখাও যেন জনপদ নিয়ে আকাশ ছুঁয়েছে। ক্রমশ নির্জন হয়ে গেছে বেলাভূমি। সুমন্ত বিমোহিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একা। এক বন্ধু ছুটে এসে ওকে হাত ধরে টেনে নিয়ে দৌড়েছিল। নইলে বানের ঢেউ এসে ওকে হয়ত ভাসিয়ে নিয়ে যেত। এখন, ঐ বাঁকের রাস্তা ধরে হেঁটে আকাশে উঠে যেতে ইচ্ছে হলো সুমন্তর। সে বরুণকে বলল,—বরুণ চল না, ঐ বাঁকের রাস্তা দিয়ে আমরা খানিক হাঁটি।

হ্যাঁ, যাব।—দিব্যেন্দু বলল, হাতে আমাদের প্রায় দু ঘন্টা সময় আছে, একটু এখানে বসে জিরিয়ে নিই। এতক্ষণ যা টেনশনের মধ্যে ছিলাম—

তোমার নিষ্ঠারই জয় হয়েছে, যাই বল—আমরা পারতাম না—সুমন্ত বলল।

দিব্যেন্দু গর্বিতভাবে সিগারেট টানল।

বাংলোর সামনের গোল ঢালু চত্বরের সোনালী নুড়ির উপর রোদ পড়েছে। ঘাটশিলা জায়গাটা গ্রীষ্মে বেশ ঝলমলে হয়ে পড়ে। ঐ নুড়িগুলোও বর্ণ বিচ্ছুরণ করছে। ঐ নুড়ির মধ্যেও অভ্র বা তামার কণা আছে। বরুণ এক মনে দেখছিল। দেখছিল অকুতোভয় ছোট ছোট পাখিদের, ঐ কৃষ্ণচূড়া আর গুলমোহর ফুলগুলি আর বাংলোয় সাজিয়ে রাখা নানা জাতের ক্যাকটাস। এখান থেকে ওর উঠতেই ইচ্ছে করছিল না। এতক্ষণ পরে বরুণও অনেক হাল্কা বোধ করছে। সুমন্তও। সুমন্তকে টানছে ঐ আকাশের দিকে ধাবমান বাঁকের রাস্তাটি। দিব্যেন্দু হাত পা এলিয়ে দিয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল গাছের ছায়ায়, নুড়ির উপর। বুকের উপর দুলছে নাম-না জানা এক পাহাড়ী গাছের ডাল। ঘন পাতায় ঢাকা ডালটি হাল্কা বাতাসে কাঁপছে। ছোট ছোট রঙিন পাখি এ ডাল ও ডালে উড়ে বেড়াচ্ছে। দিব্যেন্দু গাছের তলায়, নুড়ির উপর আকাশের নিচে শুয়ে লম্বা একটা হাই তুলে বলল : তাহলে শেষ পর্যন্ত রাতে থাকতেই হবে।

তা তো হবেই। কিন্তু বৌকে বলে আসিনি, ও দুশ্চিন্তা করবে না ? বরুণ বলল।

বৌর কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিলেই হবে।—সুমন্ত বলল।

হাঃ হাঃ—দিব্যেন্দু হাসল

হাসলে কেন, দিব্যেন্দু।—বরুণ বলল।

বৌকে গিয়ে বলবখন, যে, চরিত্র নষ্ট করার জন্যে আমরা একরাত ঘাটশিলা থেকে আসতে বাধ্য হয়েছে।—দিব্যেন্দু রসিকতা করে বলল।

বাংলোর সামনে দিয়ে চলে গেছে রাঁচি রোড। একটা সরকারী বাস ফিরে চলেছে কলকাতা। পথে ছোট ছোট দলে মাঝে মাঝেই সাঁওতাল, পার্বত্য আদিবাসী মহিলা পুরুষ হেঁটে চলেছে। চমৎকার তাঁদের শরীর স্বাস্থ্য। তাঁরা সম্ভবত হাটে চলেছে। কাছে পিঠেই একটা গ্রাম্য হাট আছে, মধু মিত্তির বলেছিল। এখান থেকে মাত্র বারো তেরো মাইল দূরে মেরি টেইলারের সেই বিখ্যাত যদুগোদা। মেরি টেইলার আমেরিকা থেকে এসেছিলেন ভারতে বিপ্লব করতে। যদুগোদাতে ভারতের প্রধানতম ইউরেনিয়াম খনি আছে। খনির দেশ সিংভূম। একদা এই সিংভূম, মানভূম আর ছোটনাগপুর ছিল বাংলার মধ্যে। ভাবা যায়—সেই বাংলার কথা। ত্রিপুরার সীমা পর্যন্ত, চট্টগ্রাম ছুঁয়ে ব্রহ্মদেশের সীমানা পর্যন্ত। বিশাল বিরাট এক দেশ। সমতলের সবুজ প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপন্ন করে, ভারতের শ্রেষ্ঠতম খনিজ অঞ্চলে পাওয়া যায় লোহা, তামা, কয়লা—কলকাতা আর আসানসোল ঘিরে এত আধুনিক শিল্পের কেন্দ্র এসব আজ টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। ওরা স্মৃতিচারণ করল কিছুক্ষণ।

তাহলে রাতে এখানে থাকতেই হবে ? ঐ যে দেখলাম, এরপর আর কি করার আছে মেয়েটাকে নিয়ে।—বরুণ মিন মিন করে বলল।

সে কি, এত চেষ্টা করে যে ব্যবস্থা করলাম, তা কি ইয়ার্কি মারার জন্যে ?—দিব্যেন্দু একটু রেগে গিয়ে বলল।

তাছাড়াও একটা ব্যাপার ভেবে দেখতে হবে। জানো তো, শহুরে বাবুরা চিরকাল এই আদিবাসী মানুষগুলোকে নিয়ে বিলাসিতা করে এসেছে। আমরাও তার শরিক হব কি ?—সুমন্ত বলল।

আমরা বিলাসিতা করছি কি ? আমরা সজ্ঞানে একটু পাপ করব বলেই তো এসেছি।—দিব্যেন্দু বলল।

আমার তো খুব একটা পাপ-টাপ কিছুই মনে হচ্ছে না। একটা আদিবাসী তরুণীকে উপভোগ করার মধ্যে আর পাপের কি আছে। আমার মনে হচ্ছে এ একরকম বিলাসিতা। শহুরে মনের বিকার এবং বিলাসিতা।—সুমন্ত

তাহলে, আমাকে তোমরা চাগালে কেন ? সেটাও বিলাসিতা, তাই না ? সেই তখন থেকে আদিম রমণীকে বুকে জাপটে ধরে ধন্য হব বলে কত না আক্ষেপ করছিলে। ওসব জানি না, ওকে আমরা এনজয় করব—ব্যাস।—দিব্যেন্দু সোজা বলে দিল।

আর একটা কথাও ভেবে দেখতে হবে দিব্যেন্দু! যদি কিছু ঘটে যায় ? —বরুণ মিন মিন করে বলল।

কি ঘটে যায় ? —দিব্যেন্দু জিজ্ঞাসা করল।

ধর, যদি সাঁওতাল গ্রামের মানুষগুলো জেনে ফেলে যে, শহরের তিনজন বিলাসী যুবক তাদের একটি মেয়েকে নোংরা পথে নামিয়েছে। তাকে এনজয় করছে, তা হলে ? —বরুণ বলল।

তাহলে কি হবে ? ও তো কিছু এমন সতী সাধ্বী নয়। মাঝে মাঝেই ও শহুরে ছোকরাদের এনজয়মেন্ট দিয়ে থাকে। —দিব্যেন্দু বলল।

সে ওরা বুঝবে না। জানো তো, ওরা তীর ছুঁড়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে। তাছাড়া, আরো ঝামেলা আছে। যদি মেরে নাও ফেলে, তবু, থানা পুলিশ হতে পারে। আমরা চাকরি করি। আমাদের ঝুঁকি অনেক, দিব্যেন্দু। বৌ-দের কাছে চিরকাল লজ্জিত হয়ে থাকতে হবে—এসব ভেবেছ। বরুণ বিড় বিড় করে বলল।

উঃ। পাতি-বুর্জোয়া সেন্টিমেন্ট। একটা মেয়েকে এনজয় করবে তাতে এত ভয়। সব সময়ই সারেণ্ডারিং অ্যাটিচিউড। তুমি কার কাছে সারেণ্ডার করবে শুনি ? যাদের উপর তুমি বিরক্ত, তাদের কাছে

সারেগুমারের কোনো মানে হয়। —দিব্যেন্দু বরুণকে চাঙ্গা করার জন্যে বলল।

সবই বুঝলাম, কিন্তু আর একটা কথাও ভাবার আছে। যদি সত্যি সত্যিই তীর-ধনুক নিয়ে আমাদের তাড়া করে, তাহলে আমাদের কে ঠেকাবে। দিব্যেন্দু ? —সুমন্ত তার ভয়ের কথাটি স্পষ্ট দিব্যেন্দুকে জানিয়ে দিল।

হাঃ হাঃ—দিব্যেন্দু একটু হাসল, হেসে বলল, তুমি আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পার। কিছু ভয়ের নেই। যারা মাথা মোটা, পাপ করতে গিয়ে তারাই ধরা পড়ে। ঐ যে সুন্দর, বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের তরুণী মেয়েটিকে দেখলে তুমি, এই পাহাড়ী জল হাওয়ায় মানুষ, অমন তুমি আর কোথাও পাবে না সুমন্ত। একেবারে আদিম কাম-কলায় নিপুণা ঐ মেয়ে—এ আমি বলে রাখলাম। এ সুযোগ ছাড়া ঠিক হবে না, বুঝলে। —দিব্যেন্দু ওদের দোদুল্যমান মনকে সংহত করার চেষ্টা করল।

যাইহোক, তোমার নেতৃত্ব যখন আগাগোড়া মেনে নিয়েছি, এখনও নেব। —বরুণ বলল।

চল উঠি। সাড়ে তিনটে বাজে। তামার কারখানার ওদিকটা একবার ঘুরে আসি। ওখানে সুবর্ণরেখা নাকি আরো চমৎকার। মধু মিস্তির বলেছে। —সুমন্ত উঠে দাঁড়াল। বরুণ এবং দিব্যেন্দুও উঠল।

ওরা সোনালী-হলুদ নুড়িগুলোর উপর দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটল। নিচে নেমে একটা চায়ের দোকান থেকে প্রচুর খাঁটি দুধ দিয়ে তৈরি ঘন চা খেল। তিনজনে তিনটে সিগারেট ধরিয়ে তামার খনি আর সুবর্ণরেখা নদীর দিকে যাওয়ার ঢালু রাস্তাটি ধরল। দিব্যেন্দু তার ঘড়ি দেখে বলল, এখন পোনে চারটে বাজে। ছ'টার মধ্যে আমাদের মধু মিস্তিরের অফিসের কাছে পৌঁছুতে হবে।

ওরা ঢালু দিয়ে নেমে ডান দিকে তামার কারখানা রেখে বাঁ-দিকে সুবর্ণরেখার বুকে নেমে যাওয়ার পথটি ধরল। উপরে গম্ভীর পাহাড় সুবর্ণরেখার পাড় থেকে খাড়াই উঠে কত দূর-দূরান্তে চলে গেছে। হয়ত রাঁচি, হয়ত বদুগোদা। ওরা তিনজনে ঐ সুবিস্তৃত গম্ভীর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

একদিনের রোমান্টিসিজম, একদিনের পাপ, তাও আমাদের এত ভয়—সুমন্ত নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলার মতো বলল, আমাদের পালিয়েও নিস্তার নেই—

আমরা আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা—বরুণ সুমন্তকে সমর্থন করার মতো করে বলল।

ওসব আর ভেবো না, ভাবলে মন দুর্বল হয়ে পড়বে। মধ্যবিত্ত কুসংস্কার আর ভয় এসে মনে জাঁকিয়ে বসবে। তখন কিছুতেই তার হাত থেকে রেহাই পাবে না তোমরা। —দিব্যেন্দু দৃঢ়তার সঙ্গে বরুণ এবং সুমন্তকে সাহস জুগিয়ে যাচ্ছে।

উফ। কয়েক মিনিট মাত্র আমরা টেনশন থেকে মুক্ত ছিলাম, তাই না বরুণ? সুমন্ত বলল,—ঐ মেয়েটিকে দেখার পর মাত্র কয়েক মিনিট তাই না ?

হ্যাঁ—বরুণ সুমন্তকে সমর্থন করল, বলল, যতক্ষণ আমরা আদি সৌন্দর্যের অনুভূতির মধ্যে ছিলাম। আমাদের জন্যে রূপলাল ভারি সুন্দর একটা যৌনসঙ্গী জুটিয়ে দিয়েছে কিন্তু—

আমাদের ভয়, পাপবোধও তার পিছু পিছু ধাওয়া করে আসছে —সুমন্ত বলল।

বরুণ, সুমন্ত, তোমরা এত নড়বড়ে তা তো জানতাম না। কি হয়ে গেছ তোমরা? কতকগুলো পুরনো মূল্যবোধ আর অমূলক ভয়ে তোমরা দেখছি কাতর হয়ে পড়লে। জান আমাকে কত টাকা খসাতে হয়েছে। আমি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে চাই না। কেন তাহলে কাল গোড়া থেকেই কারচুপির আশ্রয় নিলে ? একটি দিনও কি আমরা আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের টেনশন থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারব না? ওসব চলবে না। মনকে শক্ত কর। —দিব্যেন্দু একটা ছোটোখাটো বক্তৃতা দিয়ে ওদের আবার সংযত করতে চাইল।

ওরা এবার নেমে যেতে লাগল সুবর্ণরেখার বুকে।

আরে! —বরুণ বিস্মিত হয়ে শব্দ করল।

কি হলো—

দেখ, দেখ—

কি ?

ঐ দেখ। —বরুণ হাত তুলে দেখাল।

ওরা তিনজনে একসঙ্গে তাকিয়ে দেখল, বেশ খানিকটা দূরে একটা পিপুল গাছের নিচে একখণ্ড পাথরের উপর সেই হোটেলে দেখা মহিলাটি বসে আছে। ওর আকাশী রং-এর শাড়ির আঁচল লুটিয়ে পড়েছে শিলাখণ্ড থেকে সোনালী বালি পর্যন্ত। শান্ত, স্তব্ধ আর মগ্ন হয়ে সবুজ, ধূসর আর সোনালী রং-এর প্রকৃতির মধ্যে একবিন্দু অকল্পনীয় সৌন্দর্য তৈরি করে বসে আছে। যেন সে মিশে আছে প্রকৃতির সঙ্গে। এতই মগ্ন সে, যেন সে কোনোক্রমেই আর জগৎ-সংসারকে ভ্রূক্ষেপ করে না।

কিরে বাবা, সুইসাইড-ফুইসাইড করবে না তো—দিব্যেন্দু ওর তন্ময়তায় ভয় পেয়ে বলল।

কি করে করবে ?, জল কোথায় ? সুবর্ণরেখায় তো এখন একহাঁটু জল আছে—

অন্য অনেক উপায় আছে। আমার ভয় করছে, চল পালাই। —দিব্যেন্দু বলল।

কিছুই বোঝা যাচ্ছে না! মহিলাটির কি মাথা খারাপ ? এখানে একা এভাবে বসে আছে! হোটেলে দেখে তো ওকে স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল—বরুণ বলল।

বরং চল না, একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি। —সুমন্ত বলল।

দূর! যেতে হবে না। কোথায় কোন বাজে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে আসল কাজের অসুবিধে হবে। চল, বরং কারখানার দিকটা ঘুরে দেখে আমরা মধু মিস্তিরের অফিসের দিকে যাই। —দিব্যেন্দু বলল।

কি আছে, চলই না, একটু এগিয়ে চল, বরুণ বলল এবং পা বাড়াল।

ওরা তিনজন ঐ ভদ্রমহিলার বসে থাকার দিকে হাঁটতে লাগল।

ছেলেটি আপন মনে পিপুল গাছের ছায়ায় খেলা করছে। পাথরের উপর উঠছে, লাফিয়ে নিচে নামছে। খানিকটা হেঁটে এসে ওরা ঐ ভদ্রমহিলার পিছনে দাঁড়াল। ভদ্রমহিলা কিছুই বুঝতে পারেনি। ওদের তিনজনের কারো সাহস হলো না ভদ্রমহিলার তন্ময়তা ভাঙতে।

ছেলেটি খেলতে করতে করতে ওদের লক্ষ্য করেছে।

ছেলেটি ডাকল—'কাকু, এসো'—

দিব্যেন্দুর সঙ্গে ছেলেটির খেলনা নিয়ে ভাব হয়েছিল হোটেলে। সে সেকথা মনে রেখেই খুব পরিচিত মানুষের মতো দিব্যেন্দুকে ডাকল —এসো না কাকু। ছেলেটির কথায় ভদ্রমহিলার ধ্যান ভাঙল। চকিতে পিছনে তাকিয়ে একটু বিস্মিত হলো। বিস্ময় কেটে গেলে ভদ্রমহিলা ওদের জিজ্ঞাসা করল—এদিকে কোথায় চললেন ?

আপনাকে দেখেই তো এলাম আমরা—বরুণ বলল।

যেভাবে ধ্যানস্থ হয়ে বসেছিলেন, তা দেখে আমরা তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম—সুমন্ত বলল।

ভয় ? কেন ?—ভদ্রমহিলা বিস্মিত হলো।

এমন নির্জন, এমন সুন্দর জায়গায় একাকী কোনো মহিলাকে ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকতে দেখব বলে আশা করিনি বলেই হয়ত। যাই হোক, আপনাকে বিরক্ত করলাম—দিব্যেন্দু সবিনয়ে বলল।

না না, বিরক্তর কি আছে। বসুন না, বরং একটু গল্প করি। —ভদ্রমহিলা ওদের বসতে বলল।

দিব্যেন্দু, সুমন্ত এবং বরুণ মহিলাটির সবলতা এবং সাহস দেখে মুগ্ধ হলো। বুঝতে পারল, মহিলাটি ঠিক সৌখিন, ঘরকুনো মহিলা নয়।

ভদ্রমহিলা একটু সরে বসে পাথরটার উপর ওদের জায়গা করে দিল। ওরা তিনজন ঐ পাথরের চাঁইয়ের উপর পাশাপাশি গা-ঘেঁষে বসল।

আপনি একা এসেছেন ?—দিব্যেন্দু বলল।

হ্যাঁ ?

কলকাতা থেকে ?

না, খড়্গপুর থেকে। আমি খড়্গপুরে থাকি।

ঘাটশিলা জায়গাটা ভারি চমৎকার, তাই না ? শর্ট-ট্রিপের পক্ষে খুব যুৎসই—দিব্যেন্দু ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ করার সুরে কথা বলল।

হ্যাঁ, আমি তো এই নিয়ে পাঁচবার এলাম।

খুব বেড়ান বুঝি ?—দিব্যেন্দু জিজ্ঞাসা করল।

তা বলতে পারেন। মাসে অন্তত একবার।

মিস্টার আসেননি ?

না।

ভালো বলতে হয়।

কেন ?

আপনাকে একা ছেড়ে দেন সাহস করে।

মিস্টাররা যখন একা বেরোন, তখন মিসেসদেরই বা ছাড়বেন না কেন ?

এটা নেহাৎই মধ্যবিত্ত সংস্কার, তাই বললাম—দিব্যেন্দু নিজেকে সামলে নিল।

অমন তন্ময়ভাবে বসে থাকতে দেখে তো আমরা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কি ভাবছিলেন আপনি ? —বরুণ সরাসরি ভদ্রমহিলাকে প্রশ্ন করল।

ভদ্রমহিলা একটু বরুণের দিকে তাকিয়ে খানিক চুপ করে থেকে বলল—এমন সদ্য পরিচিতা কোনো মহিলাকে কেউ কি এমন প্রশ্ন করে ?

ভদ্রমহিলার কথা শুনে বরুণ একটু থতমত খেল। বরুণের অবস্থা বুঝে ভদ্রমহিলা ওকে আশ্বস্ত করার মতো করে বলল—তা প্রশ্নটা কিন্তু আপনি বেশ সাহস করেই করেছেন। আমার ভাবনার অনেক কিছুই আছে। সেসব শুনে আপনাদের কোনোই লাভ নেই,—তবু, একটা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। ভাবছিলাম আপনাদের কথাই—

আমাদের কথা ? মানে ? —দিব্যেন্দু যেন চমকে উঠল। দিব্যেন্দুর মনে হলো ভদ্রমহিলার কাছে আজকের দিনের সব কথা ফাঁস হয়ে গেছে।

আপনারা কি বিবাহিত ?

হ্যাঁ। —ভদ্রমহিলার কাছে ওরা গোপন করতে পারল না নিজেদের।

মিসেসদের আনেননি কেন ? —ভদ্রমহিলা আবার প্রশ্ন করল।

মানে, ওরা সংসার নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে, যে—

ওসব ফাঁকির কথা। বলুন, ওদের ফাঁকি দিয়ে একা একা এসেছেন। একা একা আসতেই আপনারা চেয়েছেন।

আপনার নামটা আমাদের জানা হয়নি—বরুণ বলল।

ধীরা গুহ, একটা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করি। খড়্গপুরে বাপের বাড়িতে থাকি। আপনাদের নাম ?

দিব্যেন্দু, বরুণ, সুমন্ত—

বাঃ নামগুলো বেশ ভালো তো—

আপনার নামটাই বা মন্দ কি! —বরুণ বলল।

প্রশংসার-পাল্টা প্রশংসা করা বোকামী, জানেন না ?

অত ঘুরিয়ে কথা বলার কি আছে ? আপনার নামটাও বেশ, এই শুনে রাখুন—দিব্যেন্দু লড়াকু ছেলের মতো বলল।

আচ্ছা, আচ্ছা, আমার অন্যায় হয়েছে। বলুন কেমন বেড়ালেন—ধীরা বলল।

আমরা তো শুধু বেড়াতেই আসিনি, আমরা কিছু পাপও করতে এসেছি—বরুণ বলল।

বোঝা গেছে—

কি ?

পাপ কেউ বলে কয়ে করে না। তো কি পাপ শুনি—

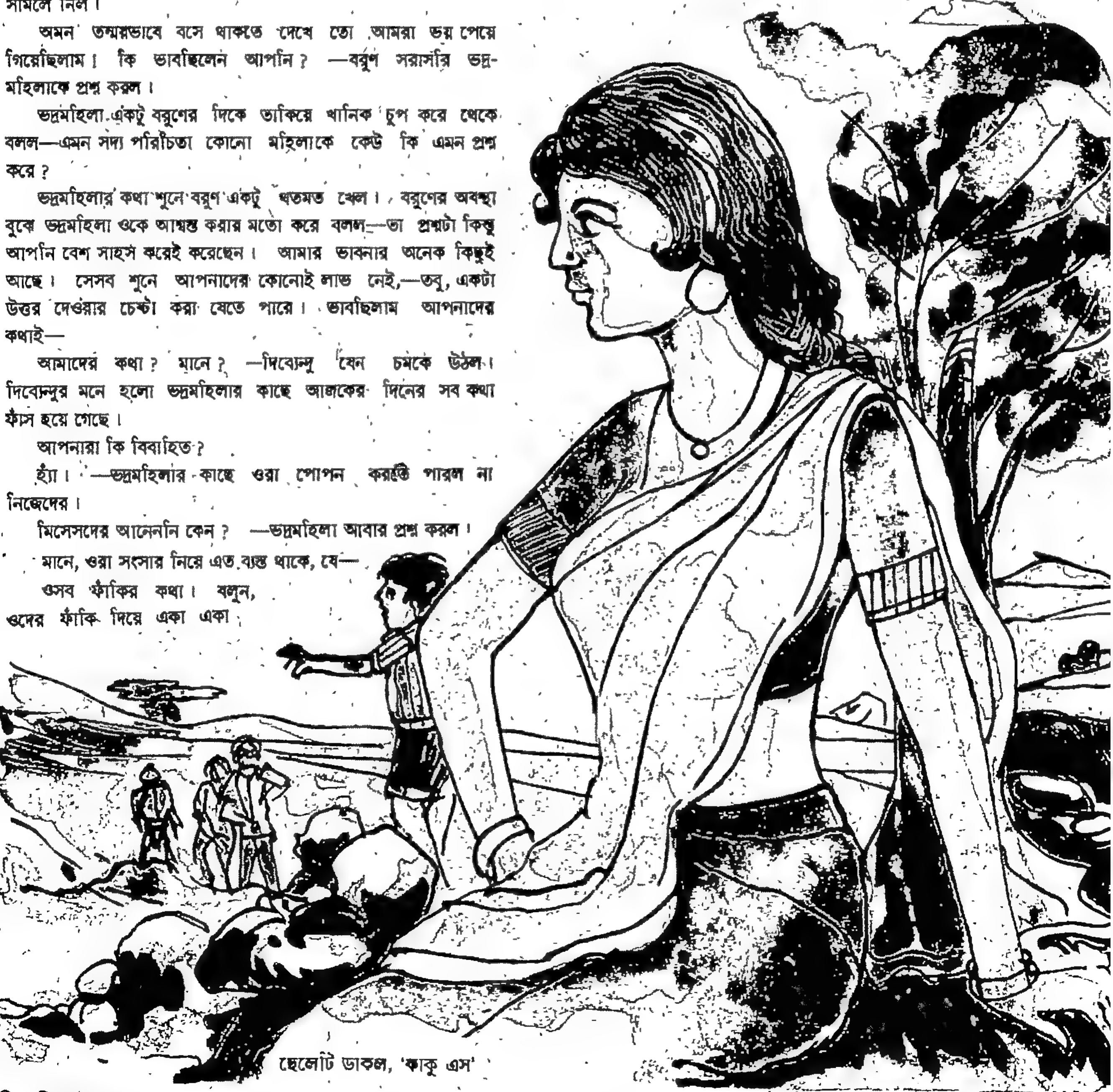

ছেলেটি ডাকল, 'কাকু এস'

আপনার শুনে কাজ নেই—বরুণ মিন মিন করে বলল।

ভদ্রমহিলা দুটো হাঁটু এক করে দু হাতে তা জড়িয়ে ধরে অদ্ভুত কায়দায় মৃদু দোল খেতে লাগল। ওর ঐ নির্বিকারত্ব, নির্ভীকতা দিব্যেন্দুর আগাগোড়া খারাপ লাগছিল। ওর ব্যক্তিত্বের উপর চাপ সৃষ্টি করছিল। এই হঠাৎ জুটে যাওয়া মহিলাটিকে আয়ত্তে আনার জন্যে ও উসপিস করছিল।

সবিনয়ে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি? —দিব্যেন্দু বলল।

পারেন।

আপনার বাপের বাড়ি তো খড়্গপুর শুনলাম, কিন্তু আপনার স্বামীর বাড়ি কোথায়, সেটা জানতে পারলাম না এখনও—

কি হবে জেনে? ওটা আমিই ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছি—ধীরা বলল।

ও, দিব্যেন্দু খুব ঘাবড়ে গেল। ওর মাথায় সিঁদুর দেখে ও আরো ঘাবড়ে গিয়ে বলল—সিঁদুর রয়েছে সিঁথিতে, তাই, প্রসঙ্গত স্বামীর বাড়ির কথা ওঠেই—

ঠিকই। কিন্তু সে একটা এপিসোড। আপনাদের শুনাতে চাই না। তাহলে অবলা নারীর প্রতি হয়ত আপনাদের করুণা জাগ্রত হবে। আচ্ছা, বলুনতো, এই করুণার মুখাপেক্ষী হয়ে আমরা কতকাল থাকব? —ধীরা পাল্টা প্রশ্ন করল।

বাচ্চলে, এ প্রশ্নের উত্তর তো সমাজ-বিজ্ঞানীরাও দিতে পারে না, আমরা কি করে পারব। —দিব্যেন্দু এড়িয়ে যাওয়ার মতো করে বলল—এসব খুবই ব্যক্তিগত ব্যাপার।

ওরা সবাই সামনের পাহাড় এবং সুবর্ণরেখার দিকে চুপচাপ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তিন বন্ধুর বুঝতে বাকি রইল না যে আপাত সুখী এই সুন্দরী মহিলাটির মনে কোথাও তীব্র ক্ষত আছে, আর সেখানে প্রলেপ দেওয়ার জন্যেই ওকে এই প্রকৃতির কাছে আশ্রয় নিতে আসতে হয়।

এই অসুখের বীজ, তাহলে, বেশ ছড়িয়ে পড়ছে।

দুঃখ টুঃখ এই তিন বন্ধুর ভালো লাগে না। তাই ঐ ভদ্রমহিলাকে ওরা আর নাড়া-ঘাঁটা করতে চাইল না। কিন্তু, একরকম সহমর্মিতায় ওরা এই ভদ্রমহিলার সাহচর্য, সঙ্গ এড়িয়ে যেতেও পারছে না। ওদের এখুনি উঠে পড়া উচিত। একমাত্র দিব্যেন্দু এখনও বেশ জেদী হয়ে তাদের পরিকল্পিত পাপের আকর্ষণে নিজেকে খানিকটা ঠিক রেখেছে। বরুণ ও সুমন্ত ইতিমধ্যে বহু আগেই নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। বরুণ তো এই মহিলার প্রতি মনে মনে আকৃষ্ট হয়েই বলে দিল—আপনার স্বামী হয়ত বোকা।

কি করে বলব? ধীরা মন্তব্য করল, তার অ্যামবিশন অন্যরকম, তার সঙ্গে আমি মানানসই নই, এমনও হতে পারে। আমি আসলে তো গ্রাম্য, এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। আমারও কিছু সহজাত দুর্বলতা আছে। অতএব থাক ও কথা। —ধীরা বলল। ভদ্রমহিলা ওর ভ্যানিটি ব্যাগের ভিতর থেকে কয়েকটা টফি বের করে বলল, নিন, খান। জল পিপাসা পেলে ব্যবহার করি আমি।

ওরা ভদ্রমহিলার হাত থেকে টফিগুলো তিনজনে নিল। ভদ্রমহিলা বাচ্চাটাকে একটা দিয়ে নিজেও একটা মুখে পুরল।

টফি চুষতে চুষতে ভদ্রমহিলা বলল—আপনারা পাঁচটা কুড়ির ডাউন স্টীল একসপ্রেস ধরবেন তো?

ঠিক নেই, আমরা থেকেও যেতে পারি—দিব্যেন্দু বলল।

ভদ্রমহিলা আর কোনো প্রশ্ন করল না। নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, চলুন, উঠি। একটু চা খেয়ে রিক্সা ধরে স্টেশন যাব। আমাকে পাঁচটা কুড়ি ধরতে হবে। আমি আপনাদের চা খাওয়াব। শুনেছেন তো, আমি চাকরি করি?

বেশ তো চলুন—

ভদ্রমহিলা বাচ্চাটার হাত ধরে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। ওর সঙ্গে সমানতালে হাঁটতে লাগল সুমন্ত, বরুণ এবং দিব্যেন্দু।

সাঁওতালদের তীরের ভয়ে বহু আগেই সুমন্ত এবং বরুণের পাপ করার মোহ অনেকটা কেটে গিয়েছিল। এখন, এই ভদ্র মহিলার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর ওরা আরো দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই মহিলার প্রতি একরকম সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েছে ওরা দু'জন ইতিমধ্যেই। ওদের স্ত্রীর কথা মনে পড়ে গেছে। এবং সেই সঙ্গে নানান পাপ-পুণ্য বোধের সংস্কার। পিছুটান।

এই অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে বরুণ এবং সুমন্ত তাদের গণ্ডীবদ্ধ, নাভিশ্বাস ওঠা, একমুখী সংসারের আশ্রয়কেই সেরা আশ্রয় ভেবে সেখানে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠল।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে উঠে এল ফুলডুংরির ডাকবাংলোর সামনের সেই চায়ের দোকানে। সেখানে গোল হয়ে বসে ওরা চা খেল।

চা খাওয়া শেষ হলে ভদ্র মহিলা বলল, আপনারা কি এখানেই থাকবেন এখন? নাকি স্টেশনের দিকে যাবেন? যদি ওদিকে যান তো চলুন, এক সঙ্গে যাই—

বেশ তো, চলুন, যাই—বরুণ বলল।

দিব্যেন্দু বরুণের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। ওর একটু রাগ হয়েছে। দুটো রিক্সা ডেকে ওরা রিক্সায় উঠে পড়ল।

একটাতে উঠল বরুণ এবং ধীরা। ধীরার বাচ্চাটা। অন্যটাতে উঠল দিব্যেন্দু এবং সুমন্ত।

বরুণদের রিক্সাটা বেশ খানিকটা এগিয়ে চলেছে।

শালা, দিব্যেন্দু সিগারেট ধরিয়ে বলল, বরুণ ঐ মহিলার প্রেমে পড়ে গেছে সুমন্ত। থাক ও ওর সঙ্গে। চল আমরা মধু মিত্তিরের ওখানে যাই—

বরুণকে ফেলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? বরং স্টেশনে ঐ মহিলাকে সি-অফ করে আমরা মধু মিত্তিরের ওখানে যাব। পাঁচটা কুড়িতে তো ট্রেন। আমাদের হাতে অনেক সময় থাকবে—সুমন্ত বলল।

কি আমাদের গরজ পড়েছে ওকে সি-অফ করার! দিব্যেন্দু রেগে গিয়ে বলল।

গরজের কি আছে দিব্যেন্দু। নেহাৎই সৌজন্যের ব্যাপার। যাই হোক, ঐ মহিলা আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশেছে, চা খাইয়েছে—সুমন্ত নরম গলায় বলল।

বানিয়ে বানিয়ে গল্প শুনিয়েছে! তোমাদের মতো দুটো কবির মাথা খেয়েছে!

আঃ, দিব্যেন্দু, বি কাইণ্ড টু হার! সুমন্ত বলল।

তাহলে, ঐ যে সাঁওতাল মেয়েটাকে আমরা টাকা দিলাম। ওকে প্রলুব্ধ করলাম, ওর উপরই বা আমরা কাইণ্ড হব না কেন? ওই মেয়েটিকে তো আমরা ভালোইবেসেছি—

তীরের ভয় একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিদেশ জায়গা। একটা ঝামেলা হলে কে ঠেকাবে দিব্যেন্দু! সুমন্ত তার ভয়ের জায়গা থেকে এক পা'ও সরতে ইচ্ছুক নয়।

আমার কি, পাঁচটা কুড়ির ডাউন স্টীল ধরলেই আমার বরং সুবিধে, বৌ রাতে একা থাকতে ভয় পায়। আমি পৌঁছে যেতে পারব।

সেই ভালো দিব্যেন্দু, চল, আমরা পাঁচটা কুড়ির ট্রেনটাই ধরি, কেমন? সুমন্ত মিনতির সুরে বন্ধু দিব্যেন্দুকে বলল।

দিব্যেন্দু সিগারেটের ছাই ঝেড়ে রিক্সার উপর শক্ত হয়ে বসে বলল, আমরা তো পালিয়ে যেতে বরাবরই ওস্তাদ সুমন্ত।

রিক্সা দুটি একটানা স্টেশনের দিকে ছুটতে লাগল।

সমাপ্ত

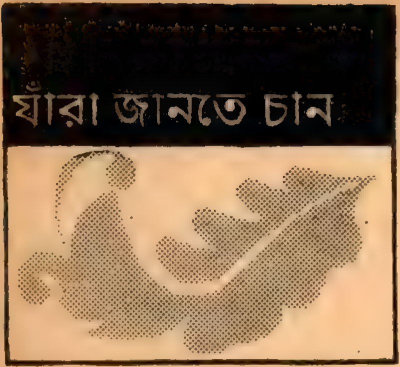

প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র

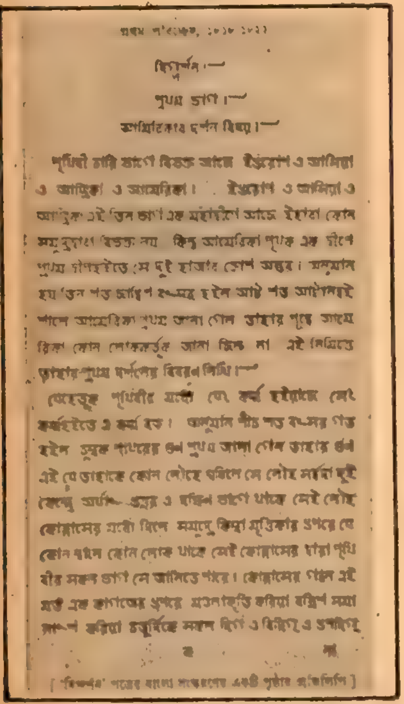
প্রথম সংস্করণ, ১৮১৮ ১৮২১

দিগ্দর্শন।—

প্রথম ভাগ।—

আমেরিকার দর্শন বিষয়।—

পৃথিবী চারি ভাগে বিভক্ত আছে ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা ও আমেরিকা। ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা এই তিন ভাগ এক মহাদ্বীপে আছে ইহারা কোন সমুদ্রদ্বারা বিভক্ত নয় কিন্তু আমেরিকা পৃথক এক দ্বীপে প্রথম [illegible] সে দুই হাজার ক্রোশ অন্তর। অনুমান হয় তিন শত [illegible] বৎসর হইল [illegible] আমেরিকা প্রথম জানা গেল তাহার পূর্ব্বে আমেরিকা কোন লোককর্ত্তৃক জানা ছিল না এই নিমিত্তে তাহার প্রথম দর্শনের বিবরণ লিখি।—

যেহেতুক পৃথিবীর মধ্যে যে কর্ম্ম হইয়াছে সেই কর্ম্মহইতে এ কর্ম্ম বড়। অনুমান পাঁচ শত বৎসর গত হইল চুম্বক পাথরের গুণ প্রথম জানা গেল তাহার গুণ এই যে তাহাতে কোন লৌহে ঘষিলে সে লৌহ সর্ব্বদা দুই [illegible] উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে থাকে সেই লৌহ কোম্পাসের মধ্যে দিলে সমুদ্রে কিম্বা মৃত্তিকার উপরে যে কোন স্থানে কোন লোক থাকে সেই কোম্পাসের দ্বারা পৃথিবীর সকল ভাগ সে জানিতে পারে। কোম্পাসের গড়ন এই মত এক কাগজের উপরে [illegible] করিয়া বত্রিশ সমান [illegible] করিয়া চতুর্দ্দিকে নাম দিয়া ও [illegible]

২

['দিগ্দর্শন' পত্রের বাংলা সংস্করণের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি]

বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িক-পত্র প্রকাশ করেন শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায়। প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দ। সম্পাদক জোশুয়া মারশম্যানের পুত্র জন ক্লারক মারশম্যান।

এ পর্যন্ত যা জানা যায়, তাতে দেখা গিয়েছে 'দিগদর্শন'-এর পঞ্চম সংখ্যা—পঞ্চম ভাগ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথমে দিগদর্শন বাংলা পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হয়। তখন এদেশে নির্দিষ্ট পাঠ্য বই বা প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ছিল না। পাঠকদের চাহিদার জন্য ইংরেজি ও ইংরেজি-বাংলা সংস্করণও হয় পরে। তখন পুরাতন সংখ্যাগুলি পুনর্মুদ্রণে কিছু পরিবর্তনও করা হয়। এর কারণ ছিল কলকাতার 'স্কুল বুক সোসাইটী'র পাঠ্য-পুস্তকরূপে প্রচলনের জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়। দেশীয় ছাত্রদের তখন এগুলি ছিল পাঠ্য।

'দিগদর্শনে'র কলেবর পূর্ণ ছিল 'যুবগণের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ'। যে-যে সংখ্যার পুনর্মুদ্রণ হয়েছে মূল সংস্করণের সঙ্গে সেগুলির রূপান্তর লক্ষ্য করা যাবে। এই রূপান্তর হয় পাঠ্য-পুস্তক হিসেবে প্রচলনের জন্য।

'দিগদর্শনে'র প্রথম দু-সংখ্যার সূচীপত্র—

প্রথম ভাগ—পৃষ্ঠা (১-১৬)

আমেরিকার দর্শন বিষয়।—

হিন্দুস্থানের সীমার বিবরণ।—

হিন্দুস্থানের বাণিজ্য।—

বেলুনদ্বারা সাদলর সাহেবের আকাশ গমন।—

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বিবরণ।—

শঙ্কর তরঙ্গের কথা।—

দ্বিতীয় ভাগ পৃষ্ঠা (১৭-৩০)

উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে প্রথম আসিবার কথা।—

ভারতবর্ষে জন্মে অথচ ইংলনডে না জন্মে যে ২ বৃক্ষ তাহারদের বিবরণ।—

ইংলনডের বাদশাহের পৌত্রীর মৃত্যু বিবরণ।—

বাষ্পের দ্বারা নৌকো চালানোর বিষয়।—

কোমিল্লার পাঠশালার বিষয়।—

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়বাহাদুরের কথা।—

প্রথম বাংলা পাঠ্য বই

রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র

কলকাতায় ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রবেশক কর্মচারীদের সার্থক শাসক-রূপে তৈরির জন্য নভেম্বর, ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সৃষ্টি হয়। শাসক ইংরেজ ছাত্রদের বাংলাশিক্ষার পাঠ্যবই হিসাবে ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে এই বই প্রকাশিত হয়। ছাপা হয় শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে।

রেভারেণ্ড উইলিয়ম কেরি শ্রীরামপুর মিশনের অন্যতম কর্তাব্যক্তি। সরকারের ডাকে কেরি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দেশীয় ভাষা শিক্ষার অন্যতম প্রধান শিক্ষাদাতা হিসেবে নিযুক্ত হলেন। সঙ্গে যোগদান করেছিলেন তাঁর মুন্সি রামরাম বসু। কেরির ব্যবস্থাপনায় বাংলার ইতিহাসের অন্যতম পুরুষ রাজা প্রতাপাদিত্যের জীবনী নিয়ে এই গ্রন্থ লিখলেন রামরাম বসু। এর আগে কোনো সম্পূর্ণ যথাযথ বাংলা বই লেখা বা ছাপা হয়নি। সেই হিসেবে রামরাম বসু ও তাঁর বই ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছে।

এছাড়া উইলিয়ম কেরির ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব প্রতিভাত হয়েছে এই কাজের মাধ্যমে। রামরাম বসু তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী। কেরি রামরামকেই অগ্রাধিকার দিলেন বই লেখার ও ছাপার। এই যথাযথ ঘটনা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখকেরা উল্লেখ পর্যন্ত করেননি।

প্রথম বাংলা সংবাদপত্র

বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র সমাচার দর্পণ। শ্রীরামপুর মিশন প্রকাশিত—প্রথম প্রকাশ ২৩ মে ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দ। সম্পাদক: জে সি মার্শম্যান।

প্রথম সংখ্যার বিজ্ঞপ্তি ছিল এইরকম:

'ইহার নাম সমাচার দর্পণ।—

এই সমাচারের পত্র প্রতি সপ্তাহে ছাপান যাইবে তাহার মধ্যে এই ২ সমাচার দেওয়া যাইবে।

১ এতদ্দেশের জজ ও কলেক্টর সাহেবদের ও অন্য রাজকর্মাধ্যক্ষরদের নিয়োগ।—

২ শ্রী শ্রীযুত বড় সাহেব যে ২ নূতন আয়িন ও হুকুম প্রভৃতি প্রকাশ করিবেন।

৩ ইংগ্ণ্ড ও ইউরোপের অন্য ২ প্রদেশ হইতে যে ২ নূতন সমাচার আইসে এবং এই দেশের নানা সমাচার।

৪ বাণিজ্যাদির নূতন বিবরণ

৫ লোকেরদের জন্ম ও বিবাহ ও মরণ প্রভৃতি ক্রিয়া।

৬ ইউরোপ দেশীয় লোক কর্তৃক যে ২ নূতন সৃষ্টি হইয়াছে সেই সকল পুস্তক হইতে ছাপান যাইবে এবং যে ২ নূতন পুস্তক মাসে ২ ইংগ্ণ্ড হইতে আইসে সেই সকল পুস্তকে যে ২ নূতন শিল্প ও কলা প্রভৃতির বিবরণ থাকে তাহাও ছাপান যাইবে।

৭ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও বিদ্যা ও জ্ঞানবান লোক ও পুস্তক প্রভৃতির বিবরণ।...'

তিনটি পর্যায়ে সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হয়—

১ প্রথম পর্যায় ১৮১৮-৪১

২ দ্বিতীয় পর্যায় ১৮৪২-৪৩

৩ তৃতীয় পর্যায় ১৮৫১-৫২

যারা বাংলা জানে না তাদের জন্য চিন্তা ক'রে—(১) সমাচার দর্পণে'র ফার্সী সংস্করণ 'সোমবারে শ্রীরামপুর' ও ইংরেজি ভাষীদের জন্য বাংলা-ইংরেজি দ্বিভাষিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ফার্সী সংস্করণের প্রকাশকাল ৬ মে ১৮২৬ ও ইংরেজি-বাংলা সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮২৯ খ্রীঃ।

সমাচার দর্পণ সরকারী কাজের আনুকূল্য প্রভূত পরিমাণে করেছিল।

প্রাচীনতম মুদ্রিত বাংলা বই

কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ

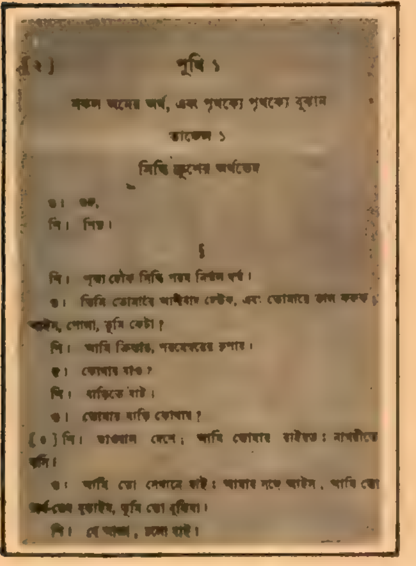

[২] পুথি ১

তাজেল ১

যতদূর জানা যায় এটাই প্রাচীনতম মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থ। রচয়িতা পোর্তুগীজ রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী মানোএল, দা—আসসুম্প-সাম। সজনীকান্ত দাস 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'র ১২ সংখ্যায় এর যথাযথ পুনর্মুদ্রণ করেন। তাতে জানা যায় এই পুস্তকের মুদ্রণকাল ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দ। রচনাকাল, ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণার নগরীতে ১৭৩৪-৩৫ খ্রীস্টাব্দ। গ্রন্থটি ছাপা হয় পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে। রোমান অক্ষরে। কারণ বাংলা অক্ষর তখনো তৈরি হয়নি। এদেশে তখন কোনো ছাপাখানা ছিল না।

গুরু-শিষ্যর কথোপকথন রূপে খ্রীস্টধর্মের গুণকীর্তনই গ্রন্থটির প্রধান বিষয় ছিল। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই গ্রন্থের 'প্রবেশক' অর্থাৎ ভূমিকা লিখে দেন। এর সারাংশ—

১ বাংলা ভাষার প্রথম ছাপা বই

২ আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগের কালের বাংলা গদ্যের রূপ।

৩ ইউরোপীয়দের মধ্যে বাংলা চর্চার সার্থকতম প্রথম পরিচয়।

৪ বাংলা ভাষায় খ্রীস্টতত্ত্ব বিষয়ক আদি গ্রন্থ।

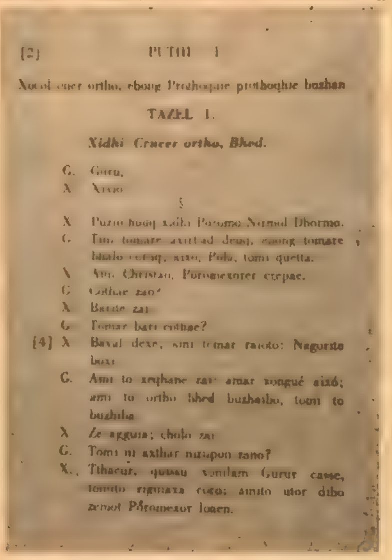

[2] PUTHI 1

TAZEL 1.

Xidhi Crucer ortho, Bhed.

G. Guru.

X. Xixio

§

X. Puzio hoiq xidhi Poromo Nirmol Dhormo.

X. Ami Christan, Poromexorer crepae.

X. Barite zai

G. Tomar bari cothae?

[4] X. Baval dexe, ami tomar raioto: Nagorito boxi

C. Ami to xephane zai: amar xongue aixó; ami to ortho bhed buzhaibo, tomi to buzhiba

X. Ze agguia; cholo zai

G. Tomi ni axthar nixapon zano?

X. Tihacur, quasau vonilam Gurur caxe, tomito rigmaxa coro; amito utor dibo xenot Poromexor louen.

৫ আড়াইশো বছর আগের সাধু ও চলিত ভাষার নিদর্শন।

৬ রোমান অক্ষরে পোর্তুগীজ ভাষায় উচ্চারণ লেখার নিদর্শন।

মূল বই-এর পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৮৩ বা ৩৮৪। পৃষ্ঠার মুদ্রিত অংশের পরিমাপ ৫×৩ ইঞ্চি। এর অর্ধেক ১৯২ পৃষ্ঠা বাংলা অংশ।

এই বই-এর দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দ বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ করেন ফরাসী পাদ্রি জাকবছ, ফ্রাঁছিসকস, মারিয়া গেরেঁ—(Jacobus Franciscus Maria Gverin) শ্রীরামপুরে ছেপে চন্দননগর থেকে প্রকাশ করেন।

এই দ্বিতীয় সংস্করণে 'অর্থভেদ' শুদ্ধ করে অর্থবেদ করেছেন। 'অর্থবেদ'-এর অর্থ বোঝা যায় না। অর্থভেদ সার্থক শব্দ, 'অর্থের ব্যাখ্যা হিসেবে' গৃহীত হতে পারে।

প্রথম বাংলা টাইপ নির্মাতা

পঞ্চানন কর্মকার

ন্যাথনিয়েল ব্রাজ হালহেড ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ছাপালেন A Grammar of Bengal Language। এই বই-এর জন্য বাংলা অক্ষর তৈরির কাজে তখনকার নামী কারিগর পঞ্চানন এসেছিলেন। মাঝে মধ্যে এর পর পঞ্চাননের ডাক পড়েছিল অক্ষর তৈরির কাজে। কারণ দেখা গিয়েছিল কাছে-পিঠে সস্তায় হুকুম মাফিক কাজে পঞ্চানন দক্ষ। তারপর দেখা গেল যখন শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃপক্ষ ছাপাখানা স্থাপন করলেন; তখন পঞ্চানন সার্থকভাবে কাজে যুক্ত হলেন।

ছাপার অক্ষর তৈরি ও ছাপার নানারকম কাজে রপ্ত হয়ে পঞ্চানন অক্ষর তৈরির এক সার্থক কর্মকার হলেন। তাঁর উপাধিও ছিল কর্মকার। ক্রমে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হলেন মনোহর—তাঁর একমাত্র কন্যা লক্ষ্মীমণির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেন ও নিজের সহায়ক হিসেবে নিযুক্ত করেন।

মিশন প্রেসের কাজ শিথিল হলে মনোহর টাইপ তৈরি ও ছাপাখানা ব্যবসা হিসেবে চালু রেখেছিলেন। তাঁর পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র নাকি সবচেয়ে গুণী ছিলেন।

বড়ই পরিতাপের বিষয়—পঞ্চানন-

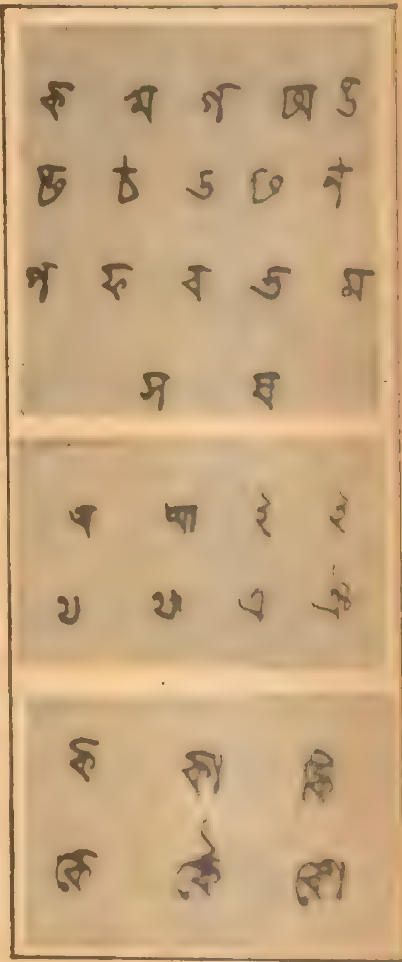

মনোহর বা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী ও কীর্তিকথা কেউ লেখেননি। হাতড়ে যেটুকু পাওয়া যায় সেটাই অবলম্বন। কৃষ্ণচন্দ্রের অকাল মৃত্যু হয়। এই সময়ে পঞ্চাননের বড় ভাই-এর বংশধরেরা টাইপ তৈরির ব্যবসা করেন। এটি 'অধর টাইপ ফাউণ্ড্রি' নামে পরিচিত ছিল। শোনা যায় এই ব্যবসা নাকি এখনো চালু আছে।

সনৎকুমার গুপ্ত

প্রতিবেশী গল্প

দুই বোন

উমাশঙ্কর যোশী

তাহলে আমি চলি সূর্ধা,—গোপীকান্ত উঠে দাঁড়িয়ে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল। কাছে বসে থাকা ললিতারও অনুমতি প্রার্থনায় গোপীকান্ত চোখের ইশারা করল। দেখতে পেয়েও সূর্ধা কিছু বলতে পারল না। ললিতা দিদি সূর্ধার সাহায্যে এগিয়ে এসে বলল, 'বসুন না, একটু পরেই না হয় যাবেন। এখনও তো আপনার আমেরিকা ভ্রমণের গল্প শেষই হলো না।'

আচ্ছা বেশ, তাহলে একটা কাজ করা যাক না,—বলল গোপীকান্ত, 'কাল বিকালে আমাদের বাড়িতে চলে এস না, সান্ধ্য আসরেই গল্পটা শেষ করা যাবে। এখন চলি—'

সূর্ধা চট করে পাশের ঘর থেকে বটুয়াটা হাতে ঝুলিয়ে এসে বলল, 'আমাকে একটু ফিরোজার বাড়িতে নামিয়ে দেবেন তো।'

গোপীকান্ত বলল, 'ললিতাও যদি যেতে চায়—'

একটু মৃদু হেসে দিদি সূর্ধা বলল, 'ওকে তো চারটেয় বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে যেতে হবে পড়াতে।'

ললিতা নীরব স্মিত হাস্যে ওদের বিদায় জানায়।

যেতে যেন ইচ্ছে করছিল না গোপীকান্তর। কে যেন তাকে জোর করে ঠেলে নিয়ে চলল।

বয়স্কদের সাক্ষর করে তোলার কাজকে এতদিন ললিতা গর্বের বলে মনে করে এসেছে। এখন ললিতা বসে বসে ভাবে, দূর ছাই, বয়স্ক শিক্ষার নিকুচি করেছে।

★

বছরের পর বছর পার হতে কতটুকু আর সময় লাগে? সূর্ধা-গোপীকান্তর জোড়টিকে সকলেরই বেশ ভালো লাগত। কিন্তু বিধি বাম; কী যে হলো! সূর্ধা-গোপীকান্তর এক সান্ধ্য ভ্রমণের সময় গোপীকান্তর গাড়ি এক পথচারিণীকে বাঁচাতে গিয়ে ধাক্কা মারে ল্যাম্পপোস্টে। আহত হয়ে জ্ঞান হারায় সূর্ধা। হাসপাতালে সূর্ধার জ্ঞান ফিরলে

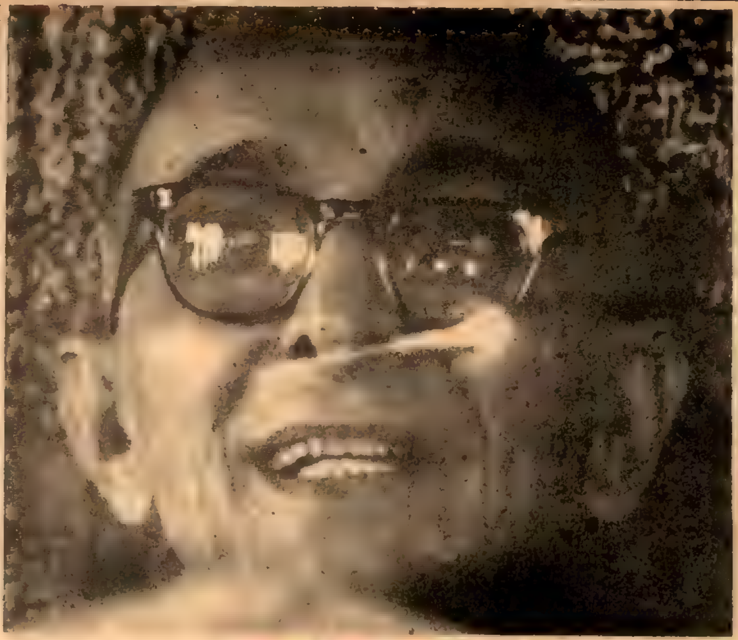

উত্তর গুজরাতের ইদর অঞ্চলের বামনা গ্রামের স্কুলের শিক্ষক জেঠালাল যোশীর ছেলে উমাশঙ্কর জেঠালাল যোশীর জন্ম ১৯১১ সালে। বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান, ইকনমিকস নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে বি এ (অনার্স) উত্তীর্ণ উমাশঙ্কর গুজরাতি ভাষা ও সাহিত্যে এম এ পাশ করেন বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কাকাসাহেব কালেলকারের ছাত্র ছিলেন তিনি। শিক্ষকতা করেছেন বোম্বে ভিলে পার্লের স্কুলে। অধ্যাপনা করেছেন আমেদাবাদের গুজরাত বিদ্যা সভা-য়। উপাচার্য হয়েছেন গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের। এখন আচার্য বিশ্বভারতী-র। সভাপতি সাহিত্য অকাদেমি-র। সম্মানিত ডক্টরেট পেয়েছেন মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন ১৯৭১-১৯৭৭। স্বদেশী আন্দোলন করতে গিয়ে জেলও খাটেন একসময়। গবেষক হিসাবেও তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত।

আজকের গুজরাতি সাহিত্যে যে-কয়েকজন কবি-সাহিত্যিকের নাম করতে হয় তাদের মধ্যে প্রধানতম উমাশংকর কবিতা লিখতেন ছোটবেলা থেকেই। জেলে বসে লেখা তাঁর একাঙ্ক 'শহীদের স্বপ্ন' (১৯৩২) রাজরোষের ভয়ে প্রকাশিত হতে পারে না। ১৯৪৯ সালে নাটকটি প্রকাশিত। খ্যাতি তাঁর কবি হিসাবে হলেও, 'বিশ্বশান্তি' কাব্যগ্রন্থের জন্য 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার পেলেও, আজকের গুজরাতি নাট্যকারদের মধ্যেও তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। তাঁর একাঙ্ক দরজায় করাঘাত, খেতের মাঝে, নাট্য সংকলন-সাপের কুণ্ডলী (১৯৩৬), সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গল্প-রচয়িতা, প্রবন্ধ-লেখক, সাহিত্য-সমালোচক, ঔপন্যাসিক উমাশঙ্কর সংস্কৃত থেকে গুজরাতিতে উত্তররামচরিত এবং শকুন্তলা অনুবাদ করে অনুবাদক হিসেবেও তাঁর নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর সাহিত্য-সমালোচনা গ্রন্থ 'কবিনি শ্রদ্ধা' সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করে ১৯৭৩-এ। 'দুই বোন' (১৯৪৮) গল্পটি 'বিশ্রামস্থল' (১৯৫৯) গল্প সঙ্কলনের একটি শ্রেষ্ঠ গল্প। মানুষের জীবনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়ের বিচিত্র রূপ-রীতি একটি মিষ্টি আমেজে ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পটিতে উমাশঙ্কর।

জ্ঞানপীঠ এবং সাহিত্য অকাদেমি ছাড়াও তিনি এ পর্যন্ত লাভ করেছেন গুজরাতি সাহিত্যে অবদানের জন্য খুব অল্প বয়সেই রঞ্জিৎরাম সুবর্ণ পদক পুরস্কার, ভারতীয় সাহিত্যে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য সোভিয়েতদেশ নেহরু পুরস্কার ১৯৮০, গুজরাতের শ্রেষ্ঠ নাগরিক হিসেবে বিশ্বগুর্জরী পুরস্কার (১৯৮১)।

লেখার জন্যই চাকরি ছাড়েন। লেখেন গুজরাতি ভাষায়। মাঝে মাঝে ইংরাজিতে। বাংলা, হিন্দি, মারাঠি জানেন।

১৯৪৭ থেকেই প্রথমে মাসিক, এখন ত্রৈমাসিক গুজরাতি সাহিত্য পত্রিকা 'সংস্কৃতি' নিয়মিত সম্পাদনা করে চলেছেন গুজরাতি সাহিত্যের এই প্রবাদ-পুরুষ উমাশঙ্কর যোশী।

ললিতা বলল, 'তোকে না কতবার বারণ করেছি দিদি, এ সময়ে অত ঘোরাঘুরি করিস না।' ডাক্তার অপারেশন করে শিশুটিকে বাঁচায়, কিন্তু জীবন সংশয় দেখা দিল সূর্ধার। ললিতা সর্বক্ষণের জন্য দিদির শয্যাপার্শ্বে। সেবায়-যত্নে যে ভাবেই হোক দিদিকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে। সূর্ধা একসময় তার ক্লান্ত বিষণ্ণ চোখ দুটি তুলে তাকায়। ইশারায় ললিতাকে কাছে ডাকে, বলে: বোন তোর হাতেই ওকে সঁপে যাচ্ছি। ললিতা ব্যস্ত হয়ে বলে: দিদি, এসব কী বলছিস তুই, কালই তো তুই ভালো হয়ে উঠবি। তবে হ্যাঁ, সোনামনিকে কিন্তু আমিই নেব, কী সুন্দর! সূর্ধা বলল: দূর বোকা! আমি কি সোনার কথা বলছি? আমি ও'র—তোর জামাইবাবুর কথা বলছি। বলে সূর্ধা তার ডান হাতটি বাড়াবার ভঙ্গিতে যেন বলতে চাইল: তুই আমায় কথা দে ললিতা। দিদির পাণ্ডুর মুখ দেখে করুণা হলো ললিতার, নিরুপায় হয়ে হাতে হাত রাখল ললিতা। সূর্ধার জীবনদীপ নিবে যায়। ফুঁপিয়ে কাদতে থাকে ললিতা।

বিয়ের পর ললিতা আর গোপীকান্তর মধ্যে প্রায়ই কথা কাটাকাটি হতো। দিদির কাছে দেওয়া কথা নিয়ে পরস্পর দোষারোপ। ললিতা বলত: সোনামনি যাতে ভালো থাকে সে জন্যেই তো দিদি তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের এই ব্যবস্থা করে গেল। গোপীকান্ত বলত: তোমার আমায় মধ্যে কী সম্পর্ক ছিল তা তোমার দিদি জানত বলেই না এই বিয়ে। সোনামনির জন্যে নয়। ললিতা বলত: যাও, আমার মধ্যে কিছুই ছিল না। গোপীকান্ত বলত: কিন্তু আমার তো ছিল। ললিতা বলত: লজ্জা করে না তোমার।

লজ্জা তোমারই করা উচিত। সূর্ধার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা পাকা হয়ে যাওয়ার পর আমি চলে গেলাম আমেরিকা। সূর্ধা তৈরি হতে থাকে বিয়ের জন্য। আর তুমি, সেই ফাঁকে আমাকে ভালোবাসতে থাকলে। তোমাকে বঞ্চিত করার সাধ্য কি সূর্ধার?—বলত গোপীকান্ত।

ললিতা বলত: দুষ্টু কোথাকার। তাই আমেরিকা থেকে ফেরার পর তোমার ভাবভঙ্গি আমার ভালো লাগছিল না। বেশ বোঝা যাচ্ছিল—

★

'এই যে দিদিমনি, তোমার বুড়ো ছাত্ররা যে তোমার জন্যে বসে বসে হাঁপিয়ে উঠেছে, দেখ তো ঘড়িতে কটা বাজে? চারটে 'পনের'—বলে কেউ যেন ললিতার গালে মৃদু টোকা দিল। ললিতার স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে সামনে দাঁড়িয়ে দিদি সূর্ধা। লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে মুখ। ধড়মড়িয়ে উঠে ছুটে বেরিয়ে যায় কলতলায় চোখেমুখে জল দিতে। যেন দিদির কাছ থেকে লুকাতে চায় নিজেকে।

শিক্ষাকেন্দ্রে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে বের হওয়ার মুখে দিদি বলল, 'একটু দাঁড়া তো ললিতা, যদি তোর খুব দেরি না হয়ে গিয়ে থাকে। দেখ তো বিয়ের জন্য এই শাড়িটা মানাবে কিনা? গোপী পছন্দ করেছে! আমাকে ফিরোজার বাড়িতে নামতে দিল না। নিয়ে গেল ওদের বাড়িতে। ওর মা বললেন, এই নবমীতে খুব একটা ভালো দিন আছে। তারপর সবাই আমরা বাজারে গেলাম। উনি বলছিলেন, ললিতাও যদি সঙ্গে থাকত ভালো হতো। দেখ তো শাড়ির পাড়টা, ডিজাইনটা ভালো লাগছে তোর?'

উল্টেপাল্টে দেখেটেখে খিলখিল করে সুখের হাসি হেসে ললিতা বলল, 'পছন্দ তো হলোই, কিন্তু শাড়ির পাড় আর ডিজাইনের চেয়েও তোমার মুখের আদলটুকু আমার এখন আরও ভালো লাগছে—' বলে ললিতা দিদির গালটি একটু টিপে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়।

মূল গুজরাতি থেকে অনুবাদ
শিবকুমার যোশী
অনুলিখন: তাপসকুমার ভট্টাচার্য

ব্যবসা ছিল রবীন্দ্রনাথের রক্তে, কিন্তু হলেন কবি

রবীন্দ্রনাথের জীবনের মূল স্রোতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগ যদিও বেমানান, তবুও এটা নিতান্ত সত্যি আর কৌতুককর যে এক সময়ে তিনি প্রত্যক্ষভাবে ব্যবসাবৃত্তির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে, কলকাতা নগরী স্থাপনের সমসময়ে রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষেরা কলকাতায় এসেই জড়িয়ে পড়লেন এখানকার নির্মীয়মান বাণিজ্যচক্রের সঙ্গে। তাঁর পূর্বপুরুষ পঞ্চানন কলকাতায় বসবাস শুরু করে বিদেশাগত জাহাজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহের ব্যবসা শুরু করলেন। পঞ্চাননের পৌত্র গোবিন্দরাম ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মাণের কনট্রাক্ট পেয়ে বহু অর্থ উপার্জন করেন। গোবিন্দরামের সহোদর নীলমণি আর তাঁর পুত্র রামমণিরও বড় কারবার ছিল। রামমণির পুত্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর। দ্বারকানাথ প্রথমে কোমপানির দেওয়ান থাকলেও পরে স্বাধীন ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হন। তিনিই ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম কোমপানি স্থাপন করে যৌথ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। একে একে অনেক অংশীদারী ব্যবসাই চালু করলেন অথচ অংশীদারী আইন তখনও চালু হয়নি। ফলে দ্বারকানাথের মৃত্যুর পূর্বেই (১৮৪৬) প্রায় সবকটি কোমপানিই ফেল পড়ল। এই দৃষ্টান্তই দেবেন্দ্রনাথকে ব্যবসাবিমুখ করে ভূ-সম্পত্তি বাড়ানোর কাজে প্রবৃত্ত করেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অল্পদিনের জন্য হলেও ব্যবসায়ে নেমেছিলেন। এর মূলে অবশ্য

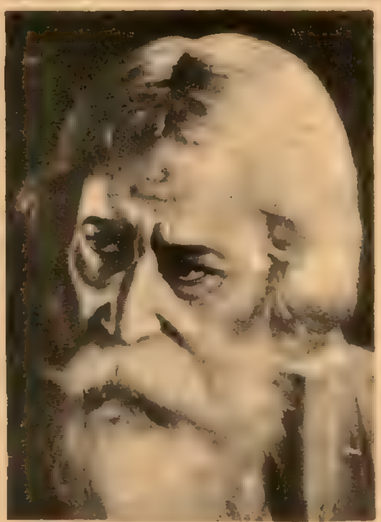

ছিলেন তাঁর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ।

বলেন্দ্রনাথ ছিলেন কল্পনাবিহারী আশাবাদী যুবক। বাংলা সাহিত্যে তার প্রমাণ যথেষ্ট। আর সুরেন্দ্রনাথেরও স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল সাহিত্যে, ব্যবসায়ে নয়। তাঁরা উভয়ে মিলে কুষ্টিয়ায় 'ঠাকুর অ্যাণ্ড কোমপানি' নামে কারবার খুললেন। প্রথমে ধান পাট ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের কারবার। পরে ইংরাজ কোমপানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আখমাড়াই কল আর গুড় তৈরির কাজে হাত দিলেন। প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ শুধু পরামর্শদাতা ছিলেন এই ব্যবসায়ের। পরে হিন্দুস্থান ইনসিওরেনস কোমপানিতে যোগ দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ কলকাতায় চলে এলে রবীন্দ্রনাথ দাঁড়ালেন বলেন্দ্রনাথের পাশে। কিন্তু অনভিজ্ঞ দুই মালিককে ঠকিয়ে ম্যানেজার মৈত্রেয় প্রভৃত অর্থ নিয়ে সরে পড়লেন। এরপর বলেন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৮৯১)। ব্যবসাটি বাঁচানোর চেষ্টা করলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু পরিবর্তে প্রভূত ঋণের বোঝা এসে পড়ল তাঁর ঘাড়ে। যজ্ঞেশ্বর নামে এক সাধারণ কর্মচারির সাধুতায় মুগ্ধ হয়ে তিনি সমস্ত ব্যবসাটি তুলে দিলেন তার হাতে। পরবর্তীকালে যজ্ঞেশ্বরের হাতেই এই ব্যবসা স্ফীতিলাভ করেছিল। অবশ্য ব্যবসাক্ষেত্রে কবি ব্যক্তিগতভাবে যতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকুন না কেন সমগ্র পৃথিবীর মানুষ এতে লাভবান হয়েছেন। কারণ শেষ পর্যন্ত তিনি হয়েছেন কবি।

দেবীদাস আচার্য

বাংলা পুঁথির জ

ছাপা বই-য়ের যুগে জন্মে আমরা ভুলতে বসেছি যে, এক সময়ে বিদ্যা-চর্চার প্রধান অবলম্বন ছিল পুঁথি। রাজার প্রাসাদে, পুণ্যবান অথবা পুণ্যকামী ধনী-নির্ধনের বাড়িতে, মন্দিরে-মসজিদে-বিহারে, টোল-চতুষ্পাঠী-মক্তবে, বৈষ্ণব-বাউলের আখড়ায়, কবিরাজ-হাকিম-ওঝার বাড়িতে, ভাট-ঘটক-দৈবজ্ঞের কাছে পুঁথি বিরাজ করত। বাংলা ভাষা-সাহিত্যের উদ্ভবকাল থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে এবং তার পরেও কিছুকাল ছাপা বইয়ের প্রতি-দ্বন্দ্বীরূপে পুঁথি ছিল সকল শিক্ষার বাহন; তারপর ধীরে ধীরে ছাপানো বই তার স্থান দখল করেছে, আর পুঁথি নির্বাসিত হয়েছে বিভিন্ন পুঁথিশালায় অথবা অরক্ষিত পড়ে আছে আবর্জনার মতো।

পুঁথি হাতে লেখা প্রাচীন বই। শ্রুতি-স্মৃতির যুগ ও বর্তমানের বিশাল মণের (১০ম শতকে) পরে ভারতে এই শিল্প প্রবর্তিত হয় (কাগজ শব্দটি পারসিক)। যে-ভাবে এবং যখনই শুরু হোক না কেন, মোগল আমলেই ভারতে এই শিল্পের যথার্থ প্রসার ঘটে। জাহাঙ্গীরের আমলে একমাত্র শিয়াল-কোটেই বছরে নয় লক্ষ টাকার তুলট কাগজ তৈরি হতো। শিখদের আমলে সেখানে কাগজের ব্যবহার ও জনপ্রিয়তা সম্প্রসারিত হয়।

মধ্যযুগে যাঁরা কাগজ তৈরি করতেন তাঁদের বলা হতো কাগজী। এঁরা সাধারণত জাতিতে মুসলমান ছিলেন। গ্রামের একটি নির্দিষ্ট অংশে বা পৃথক গ্রামে ছিল এঁদের বাস। পশ্চিমবঙ্গে মৈনান (হাওড়া), ম্যাললক (দেউলটি, হাওড়া), কলসা-ফরিদপুর (হুগলি)' ইত্যাদি গ্রামে কাগজীদের বসতি এখনও আছে।

কাগজে লেখা প্রাচীনতম পুঁথির হতো কাঁচা কালি।

পুঁথি যখন অনেকগুলি লেখাপাতার সমষ্টি তখন একে ভালোভাবে বাঁধার প্রয়োজনীয়তাও ছিল। তুলট কাগজের পাতাগুলি অনেক সময়েই আলগা, কখনো সখনো মাঝে ফুটো করে একসঙ্গে সুতো দিয়ে বাঁধা। প্রবাদে বলা হয়েছে, পুঁথিকে পুত্রের মতো আদর করবে ও শত্রুর মতো বাঁধবে। তুলট কাগজের পুঁথি দুদিকে দুটি শাল বা সেগুন কাঠের পাটা দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হতো। পুঁথির শত্রু মূলত তিনটি: আলো, বাতাস ও পোকামাকড়।

পুঁথি অতি আদরণীয় ও পরম শ্রদ্ধেয় বস্তু ছিল। তাই লিখিত বা অনুলিখিত হওয়ার পর ধান, দূর্বা, সুপারি ইত্যাদি দিয়ে মঙ্গলাচরণের পর তার বহিরাবরণে সুতোর বাঁধন পড়ত এবং নতুন গামছা, কাপড়, চেলি বা নামাবলিতে জড়িয়ে তাকে রাখা হতো

ভাষার পরম গৌরব যে, জন্মকাল
বাংলা ভাষা বঙ্গাক্ষরে লিখিত
আসছে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের
নিদর্শন চর্যাগীতির একটি সং
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল রাজদ
পুঁথিশালা থেকে পুঁথিখানি আ
করে 'হাজার বছরের

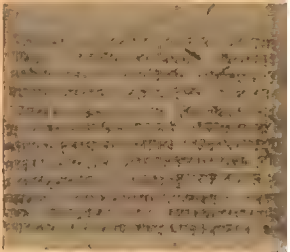

গঙ্গ

বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও
সংক্ষেপে 'বৌদ্ধগান ও দোহা'
প্রকাশ করেন। মোট ২৪ জন
৪৬টি পূর্ণ এবং একটি খণ্ডিত
গানগুলির সাধারণ দৈর্ঘ্য ১০
১২ লাইন, দু-একটি দীর্ঘতর। ভ
রচয়িতার নামও প্রাচীন রীতি অ
পাওয়া যাচ্ছে।

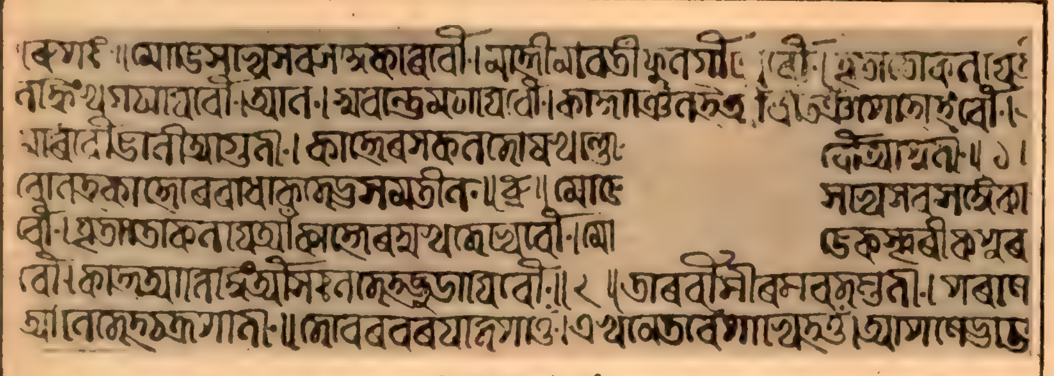

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি

কাল পর্বের মানুষের কামনা-বাসনা, আনন্দ-বেদনা, ধর্মীয় ও সামাজিক বিবর্তন, জ্ঞানের ক্রমবিকাশ, লিপি-লেখন-লেখনী ভাষায় ক্রমরূপান্তর, চারু-শিল্প-চিকিৎসা- জ্যোতির্বিদ্যা - গণিত-রসায়নশাস্ত্রের ক্রমোন্নতি বা কোনো বিশেষ সময়ের রাষ্ট্রিক ইতিহাস, ভাষায় আগন্তুক শব্দের নিঃশব্দে প্রবেশের কাল ইত্যাদি সভ্যতা-সংস্কৃতির অনেক তথ্যের ভাণ্ডার পুঁথি। ছাপা বইয়ের কোনো সংস্করণের সব কপিই একরকম, কিন্তু কোনো বিষয়ের পুঁথি এবং অনুলিখিত পুঁথি অর্থাৎ কোনো দুটি পুঁথিও একরকম হয় না।

পুঁথি প্রধানত লিখিত হয়েছে তুলট কাগজে। এই কাগজ তৈরির পদ্ধতি চীনে আবিষ্কৃত হয় আনুমানিক ১০৫ খ্রিস্টাব্দে। চতুর্থ শতকে তিব্বতে কাগজের ব্যবহার দেখা যায়। তিব্বত, নেপাল হয়ে কোনো এক সময়ে মতান্তরে গজনীর সুলতান মামুদের ভারত আক্র-

নিদর্শন রাজেন্দ্রলাল মিত্র দেখেছিলেন কাশীতে, জনৈক হরিশ্চন্দ্রবাবুর কাছে। এটি ১৩৬৭ সংবতে লিখিত ভাগবতের পুঁথি।

কালির আর এক নাম মসি। মস্ + ই যা গুঁড়ো করা হয়। সুতরাং অঙ্গার গুঁড়িয়ে যে কালি, তা ব্যুৎপত্তি থেকেই জ্ঞাতব্য। আবার কালির অন্য নাম মেলা। অর্থাৎ অনেক কিছু মিশিয়ে কালি তৈরি হতো। গোমূত্রে কাঠকয়লার গুঁড়ো ফুটিয়ে পাকা কালি তৈরি হতো। কিন্তু এটা ছিল সহজ-তম পদ্ধতি। নানারকম গাছের ছাল ও প্রদীপের ভুষো বা কাঠকয়লার গুঁড়ো পরিমাণমতো জলের সঙ্গে ফুটিয়েও কালি তৈরি হতো। গাছের ছাল অর্থাৎ কলাগাছের শুকনো বাকল, শিমূল, বাবলার ছাল, ত্রিফলা ইত্যাদিও পাকা কালি তৈরিতে কাজে লাগত। আটা, চিনি ইত্যাদি চটচটে জিনিসের সঙ্গে কাঠকয়লার গুঁড়ো মিশিয়ে তৈরি

ঠাকুরঘরে বা চণ্ডীমণ্ডপের কুলুঙ্গিতে।

ভারতে প্রচলিত অন্যতর প্রাচীন লিপি ব্রাহ্মীলিপি আনুমানিক সপ্তম শতকে তিনটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে—শারদা, নাগর ও কুটিল। এই 'কুটিল' রূপভেদ থেকেই বাংলা লিপির জন্ম। বাংলা

অনুমান করা হয়, বাংলা
উদ্ভব হয়েছিল দশম শতকে।
সাহিত্যের প্রাচীন যুগ আনুমানিক
থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ। তারপর
আদি-মধ্যযুগ। এ যুগের সাহি
নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ১৯০৯
বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রাম
বসন্তরঞ্জন রায় উদ্ধার করেন। পু
খণ্ডিত ও নামহীন। খণ্ডিত
পুঁথিটির পদসংখ্যা ৪১৭।
থেকে জানা যায় রচয়িতার নাম
চণ্ডীদাস।

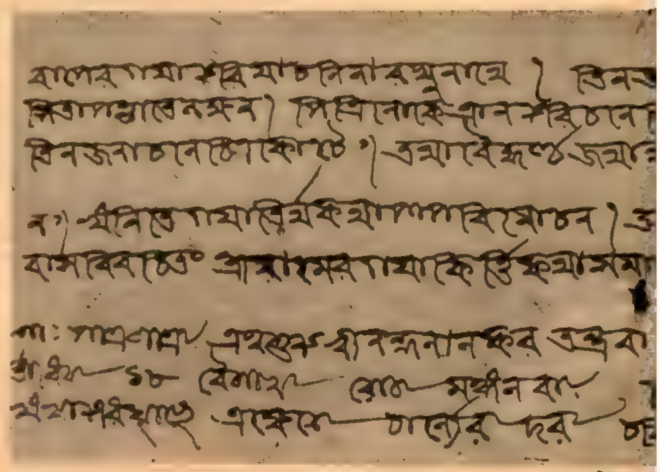

কৃত্তিবাস

এক অন্য অভিজ্ঞতা

বাংলা ভাষার মধ্যযুগের কাব্যসম্পদ বিষয়বৈচিত্র্যে এবং স্মরণীয় কবিদের আবির্ভাবের ফলে গর্ব ও গৌরবের বিষয়। মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্রের মতো কবি, মনসা-চণ্ডী-ধর্মঠাকুরের উপাখ্যান, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ, নাথসাহিত্য, পীরসাহিত্য, কল্পিত অন্যান্য উপাখ্যান, মহারাষ্ট্র পুরাণের

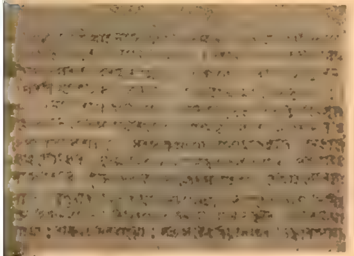

…রাষ্ট্রপুরাণ

মতো ইতিহাস, সর্বোপরি বৈষ্ণব-পদাবলী ও চরিত সাহিত্য—সব মিলিয়ে বাংলা ভাষা-সাহিত্য চর্চাকে তখন বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করা যেত বলে মনে হয়। রাজা, জমিদার বা সম্পন্ন গৃহস্থ যেমন কবিদের আশ্রয় দিয়ে পুঁথি রচনায় উৎসাহিত করতেন, অক্ষম, বৃদ্ধ ও নিরাশ্রয় কিশোর তখন তেমনি পুঁথি লিখেই জীবিকা অর্জন করতেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে পুঁথি লেখা, রাখা ও রচনাকে পুণ্যের কাজ মনে করতেন।

পুঁথির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর লিপি। ধর্মীয় কাজ মনে করা হতো বলে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আসনপিঁড়ি হয়ে বসে গোটা গোটা অক্ষরে সুন্দর করে পুঁথি লেখার কাজ করা হতো। অবশ্য দায়সারা কাজও যে ছিল না তা নয়। পুঁথি-রচয়িতারা যেমন অধিকাংশই ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ, লিপিকরেরা অধিকাংশই তেমনই ছিলেন স্বল্পশিক্ষিত। সুতরাং 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং' করতে গিয়ে অর্থহীন শব্দ, অর্থহীন বাক্যও লিখে ফেলতেন। এই শব্দ ও অর্থবিকৃতি থেকে সম্ভাবিত পাঠোদ্ধার বর্তমানে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বানান ভুল তো যত্রতত্র এবং অজস্র। পরের অনুচ্ছেদে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত সহজেই চোখে পড়বে!

পুঁথি আরম্ভ হয় দেব বন্দনা দিয়ে, শেষ হয় লেখক বা লিপিকারের আত্ম-পরিচয় এবং পুঁথি রচনার কাল, স্থান, কারণ, স্বত্ব, দাম, দক্ষিণা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে। এই অংশকে বলা হয় পুষ্পিকা (colophone)। সমসাময়িক কালের ইতিহাস বা তার সংকেতও পুষ্পিকা থেকে জানা যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা পুঁথি-শালায় রক্ষিত দু-একটি পুঁথির পুষ্পিকা অংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

ইতি শ্রীকির্ত্তিবাস বিরচিতং শ্রীরামের গয়াকির্ত্তি কথা সমাপ্ত। গয়ার পালা সমাপ্ত।

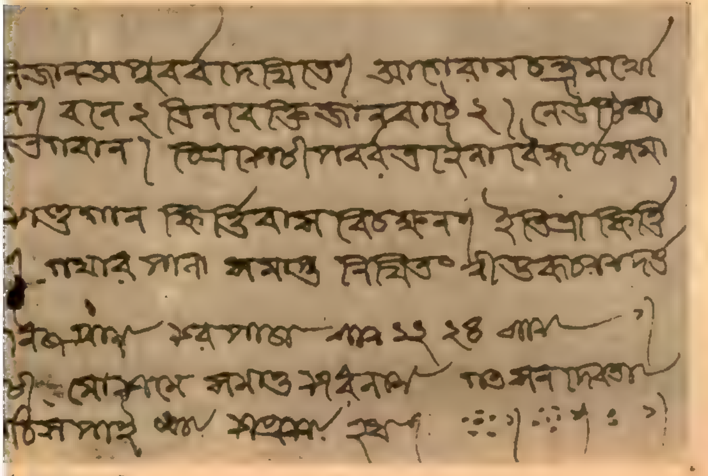

(গয়াপালা)

লিখিতং শ্রীগুরুচরণ দত্ত সাং পাত্রসায়র এ পুস্তক শ্রীনন্দলাল কর তন্তুবা [য়] সাং নিজগ্রাম করপাড়া সন ১২২৪ সাল। তারিখ ১৮ বৈশাখ রোজ মোঙ্গলবার নিজবাটী মোকামে সমাপ্ত করিলাম।

গত সন দেবতা সুখা করিয়াছে এক্ষেনে চার্লের দর চর্ব্বিস পচিস পাই তার কী প্রকার হয়। [পুঁথি নং ৪৯]

উদ্ধৃতি থেকে জানা যায় পাত্রসায়র, বাঁকুড়ায় ১২২৩ বঙ্গাব্দে অজন্মা হওয়ায় পরবর্তী বছরে (১৮ বৈশাখ, ১২২৪) চালের দাম বেড়ে হয়েছে টাকায় ২৪/২৫ সের এবং আরও দাম বাড়ার সম্ভাবনা আছে।

পুষ্পিকা অংশের একটি কৌতুককর ঘটনা চোরের উদ্দেশ্যে গালাগালি। পুঁথি চুরির অপরাধ যে মহাপাপ তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নানা ধরনের ভয় দেখানো হয়েছে:

এই পুস্তক জে চুরি কোরিবেক আর জে চুরি কোরে না দিবেক শে মাতৃহরণ করিবেক আর জে পুথী পড়িতে আর জে লিখীতে নিএ জে দিবেক নাই সে গুরু-পত্নী হরণ করিবেক ইহাতে ভেদ নাই ॥ [পুঁথি নং ১৩৫৩]

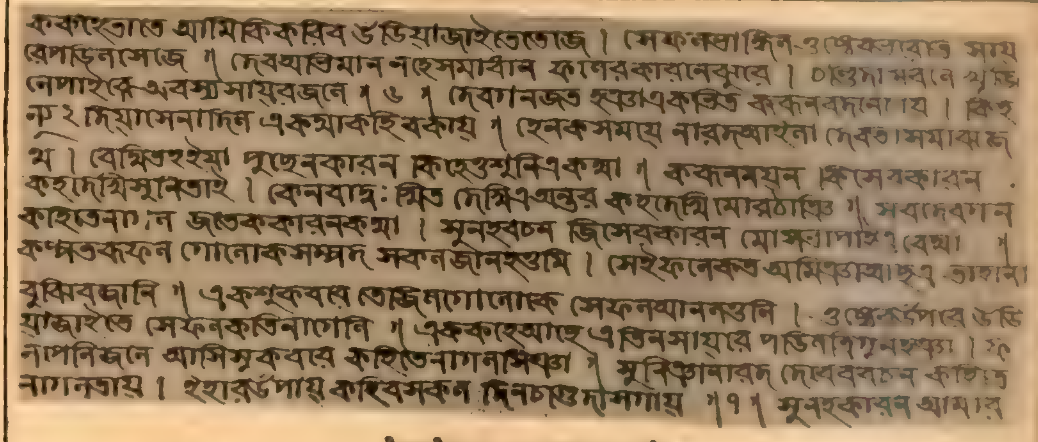

দীনচণ্ডীদাসের পালাগানের পুঁথি

পুষ্পিকা মানেই পুঁথির শেষ পাতা। অযত্নে যখন খসে যায় অথবা নষ্ট হয়, তখন শেষ পাতাটাই সবার আগে যায় অর্থাৎ পুঁথির পরিচয় লোপ পায়।

কিনে ও দান হিসেবে পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে। কেনার আগ্রহ থাকলেও বিক্রির আগ্রহ দেখা গেছে খুব কম। কারণ, পুঁথি পারিবারিক সম্পদ, পূর্বপুরুষের আশীর্বাদস্বরূপ : তাকে দান বিশেষত বিক্রি শুধু অসম্মানীয় নয়, পরিবারের পক্ষে অমঙ্গলজনকও। এই ভ্রান্ত ধারণায় বহু পুঁথি নষ্ট হয়ে গেছে, আজও হচ্ছে। তবু পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে এবং তার প্রধান উপায় কৌশলে কেনা। মূল্যহীন (?) হাতে-লেখা পুঁথির বদলে ঝকঝকে, তকতকে ছাপা ছবিওয়ালা বটতলার বই পাওয়া যাবে এই লোভ দেখিয়ে পুঁথি সংগ্রহ করতেন ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের ভৃত্য রামকুমার দত্ত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, নগেন্দ্রনাথ বসু, চিত্তরঞ্জন দাশ, ব্যোমকেশ মুস্তাফী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন দের জন্যে অনেক পুঁথি তিনি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। এইসব সংস্থা ও ব্যক্তির চেষ্টাতেই গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন সংগ্রহশালা। [illegible] এর প্রয়োজনের দিকটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর মতো করে দেখিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু তাদের চেষ্টার প্রতি মর্যাদা দিয়ে পুঁথিশালাগুলিতেও পুঁথিরক্ষার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে এমন নয়।

পূর্ণাঙ্গ বাঙালির ইতিহাস রচনা করতে হলে অপঠিত পুঁথির সাহায্য নিতেই হবে, অথচ সেজন্য উল্লেখযোগ্য কোনো বড়ো সম্ভাবনা দেখা যায় না। যদি মনে হয় যে 'সুদিন' এখনো আসেনি, তবে সেই অনাগত কালের জন্যে অন্তত পুঁথিগুলিকে রক্ষার আয়োজন করতে হবে। [illegible] প্রয়োজনে গৃহ [illegible] অধিকাংশ পুঁথিই বিনষ্ট হয়েছে। বাঙালির ঘরে ঘরে মিথ্যা সংস্কার ও অভিমানের শিকার হয়ে প্রতিদিনই কিছু কিছু পুঁথি বিনষ্ট হচ্ছে। [illegible] সংগৃহীত পুঁথিও [illegible] অবহেলায় নষ্ট হয়. [illegible] আমাদের ইতিহাস চেতনায় নিশ্চয়ই উল্লসিত হবে না।

তুষারকান্তি মহাপাত্র

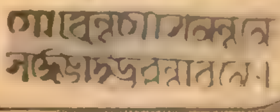

বাংলা ছবির চিত্রনাট্য

দৃশ্য—৪০

শট—১

সময়—সন্ধ্যা।

অস্তমিত সূর্যের লাল আলো সমুদ্রের তীরে এসে পড়েছে, সেখানে বহু মানুষের আনা-গোনা।

ক্যামেরা আস্তে আস্তে বাঁ দিকে প্যান

প্রসঙ্গ ঃ আদালত ও একটি মেয়ে

কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ, সংগীত ও পরিচালনা ঃ তপন সিংহ
প্রযোজনা ঃ ধীরেশ কুমার চক্রবর্তী
চিত্রগ্রহণ ঃ বিমল মুখোপাধ্যায়
সম্পাদনা ঃ সুবোধ রায়
অভিনয়ে ঃ তনুজা, মনোজ মিত্র, পতঞ্জলি গুহঠাকুরতা, নির্মলকুমার, উজ্জ্বল সেনগুপ্ত, দেবিকা মুখার্জি, ভারতী দেবী, পদ্মা দেবী, কুমকুম ভট্টাচার্য, প্রদীপ মল্লিক, যীশু দাশগুপ্ত, সুধীর রায় ও রজত চক্রবর্তী।
দৈর্ঘ্য ঃ ১২ রীল
কাহিনী ঃ মধ্যবিত্ত পরিবারের এক তরুণী নির্জন সমুদ্রসৈকতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হবার পর তার মানসিক পরিবর্তন, আত্মীয়-পরিজন ও সমাজকর্তৃক তরুণীটির প্রতি বিদ্রূপ-দৃষ্টিপাত এবং ধর্ষণের মামলাটি আদালতে উঠলে জনসমক্ষে সেই তরুণীটির 'ধর্ষিত' হবার কাহিনী পুনর্বার বর্ণনার নির্লজ্জ ভঙ্গিতে সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশের প্রতি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সুর ও নগ্ন এক সত্যকে তুলে ধরা হয়েছে।

আদালত ও একটি মেয়ে

তপন সিংহ

করল। দেখা যায় একটি বাড়ির বারান্দায় সমুদ্রের দিকে মুখ করে উর্মিলা, নীলা এবং শীলা তিনজনে দাঁড়িয়ে আছে। এদের সংলাপের সঙ্গে দূর থেকে সমুদ্রের গর্জন শোনা যাবে।

নীলা ঃ দারুণ! সন্ধ্যেবেলায় সমুদ্র যে এত সুন্দর হতে পারে, না দেখলে ভাবাই যায় না।

শীলা ঃ অ্যাই, আমি একবার খুব ছোটবেলায় সমুদ্র দেখেছিলাম, জানিস। কিন্তু তার সঙ্গে এর কোনরকম মিলই পাচ্ছি না।

নীলা ঃ কোন সমুদ্র?

শীলা ঃ ডায়মণ্ডহারবার।

নীলা ঃ জ্বালাসনে, ডায়মণ্ডহারবার! ওটা আবার সমুদ্র! যা বলেছিস বলেছিস, আর বলিস না। শুনলে স্কুল থেকে তোর চাকরি যাবে। অ্যাই উর্মি, উর্মি, শুনছিস, কী বলছে?

শট—২

ক্যামেরার সামনে ঊর্মিলা।

ঊর্মিলা : উঃ আমার এক্ষুনি জলে নামতে ইচ্ছে করছে।

ক্যামেরা শীলার উপর যায়।

শীলা : অ্যাই নীলা, ও কী বলছে শোন ? এই অন্ধকারে জলে নামবে। আমি বাবা দিনেও নামছি না।

ক্যামেরা এবার নীলার উপর যায়।

নীলা : আমি চান-টানের মধ্যে নেই বাবা ! দূর থেকে সমুদ্রকে গড় করছি। ক্ষমা ঘেন্না করে নিও বাবা !

কাট—টু

দৃশ্য—৪১

শট—১

সমুদ্রতীর। একই সময়। অন্ধকার একটু বেশি ঘনিয়ে এসেছে। একটা ঢেউ সমুদ্র থেকে তীরে আছড়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা পিছিয়ে যায়। আর দেখা যায় অমল, নির্মল, কমল এবং দাদা চারজনে বালিতে বসে মদ্যপান করছে। টেপ রেকর্ডার থেকে একটা আধুনিক মিউজিক বাজছে। এবং সামনে আগুন জ্বালিয়ে একটি মাছকে পোড়ানো হচ্ছে।

অমল : ঐ ব্যাটা পুলিশ অফিসারকে একবার কলকাতায় পাই, ওরই রিভলবার দিয়ে ওরই কপাল যদি ফুটো না করি—

নির্মল : (জড়িত কণ্ঠে) খবরের কাগজে চিঠি দেবো, ছাত্রদের উপর পুলিশের জুলুম। নিখিল ভারত ছাত্র সংঘের সেক্রেটারির কাছে একটা কপি পাঠাবো।

কমল : আরে দূর ! ও সব কিছু করতে হবে না। কলকাতায় ফিরি, তারপর ব্যাটাকে দেখাচ্ছি।

শট - ২

দাদা একদৃষ্টে পাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

শেষ সংলাপটি এল।

কমল : বাবাকে বলে ব্যাটার চাকরি খাবো।

দাদা নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে আছে পাড়ের দিকে।

শট—২-এ

ঊর্মিলা, শীলা এবং নীলাকে দেখা যাচ্ছে দূর বারান্দায়।

শট—২-বি

দাদা মদ্যপান করল।

শট—৩

লাল আগুনে মাছটা পুড়ছে।

দৃশ্য—৪২

সময়—রাত্রি।

হোটেল রুম। তিন সীটের একটি ঘর। সমুদ্রের ঝোড়ো আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। শীলা মাথার চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ঊর্মিলার কাছে গেল। ঊর্মিলা একটি বই পড়ছে।

শীলা : বই পড়ার শুধু শুধু ভাণ করছিস কেন ? ভাবছিস তো সুজিতবাবুর কথা !

ঊর্মিলা : এতক্ষণ ভাবিনি। তুই মনে করিয়ে দিলি, এবার ভাববো

কাট—টু

দৃশ্য—৪৩

ফ্ল্যাশব্যাক।

হর্টিকালচার গার্ডেন। পেছনে গোলাপী ফুলের স্তূপ। সুজিত এবং ঊর্মিলা হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছে।

সুজিত ঃ কন্‌গ্র্যাচুলেশনস, ডবল কনগ্র্যাচুলেশনস! পাশ করে বেরিয়েই একবারে চাকরি। মেয়ে হয়ে জন্মেছো বলেই পেলে। ছেলে হলে জুতোর শুকতলা ছিঁড়ে যেত।

ঊর্মিলা ঃ শুধু মেয়ে বলেই নয়। রেজাল্টও ভালো করা হয়েছে।

সুজিত ঃ আরে, তোমার থেকে অনেক ভালো রেজাল্ট করা ছেলে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখন মেয়েরা হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাশ সিটিজেন। আমরা হচ্ছি সেকেণ্ড ক্লাশ।

ঊর্মিলা ঃ হাজার হাজার ছেলে আমার চাইতে কম নম্বর পেয়েছে।

সুজিত ঃ তোমাদের ওয়ান ডায়মেনশনাল মাইণ্ড। পড়ছো তো পড়ছোই, পড়ছো তো পড়ছোই। ছেলেদের মতো একস্ট্রা ক্যারিকুলার অ্যাকটিভিটি আছে?—চায়ের দোকান, খেলার মাঠ, স্টুডেণ্টস ইউনিয়ন, সিনেমা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি—

ঊর্মিলা ঃ সেখানেই ইতি—একটা গণ্ডীর মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছো চক্রাকারে, আর চক্রাকারে সকলকে গালাগাল দিচ্ছো। এখন বলো তলব কিসের?

সুজিত ঃ তলব একটা চিরন্তন মতলবের।

কাট—টু

দৃশ্য—৪৪

হোটেল রুমে ঊর্মিলা ভাবছে পুরনো দিনের কথা। দূর থেকে সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে।

কাট—টু

দৃশ্য—৪৫

শট—১

সকালবেলা। ঝলমলে রোদ্দুর। বিদেশী বাজনার সঙ্গে নাচতে নাচতে সিলুটে অমল, কমল প্রভৃতি সমুদ্রের দিকে ছুটে যাচ্ছে বালিয়াড়ির উপর দিয়ে।

শট—২

সমুদ্রতীর। ঊর্মিলা, শীলা ও নীলা হেঁটে আসছে।

ঊর্মিলা ঃ অ্যাই, তোরা সত্যি চলে নামবি না?

শীলা ঃ ডুবে মরি আর কি!

নীলা ঃ দেখ দেখ, কি সুন্দর একটা ছোট্ট নৌকো! আমরা মার্কেটিংয়ে যাব।

ঊর্মিলা ঃ নতুন কী পাবি? সবই তো কলকাতায় পাওয়া যায়।

শীলা ঃ ছোটখাট একটা তিমি মাছ।

নীলা ঃ আমি ভাই একটা দক্ষিণমুখী শংখ কিনবো। গুডলাক আনে।

ঊর্মিলা ঃ মরগে যা!

শট—৩

ঊর্মিলা একা। আস্তে আস্তে হেঁটে চলে জলের দিকে।

শট—৪

সমুদ্রের জল ঊর্মিলার পা ছুঁয়ে যায়।

শট—৫

একটু নিরালায় ঊর্মিলা দাঁড়ায়। পিছনে লাইটহাউস। সমুদ্রের গর্জন শোনা যায়। হঠাৎ সমুদ্রের গর্জনের সঙ্গে মিশিয়ে একটা বিদেশী মিউজিক শোনা যায়, ঊর্মিলা ভ্রূ কুঁচকে দাঁড়ায়।

শট—৬

দাদা, অমল, কমল, নির্মল। ওদের চোখে গগলস, মাথায় টুপি। সুইমিং ট্রাংক পরে বালিয়াড়ির গা বেয়ে ঊর্মিলার দিকে ছুটে আসে সবাই। পোরটেবল টেপ রেকর্ডার থেকে বাজনা বাজতে থাকে।

শট—৭

ঊর্মিলা ভয়ে ঘুরে তাকায়।

শট—৮
দাদা এবং অন্যান্যরা তীরবেগে ছুটে গিয়ে ঊর্মিলাকে ধরে। পিছনে সমুদ্র। গর্জন শোনা যায়।
শট—৯
একটা হাত ঊর্মিলার ঠোঁটে টেপ (ল্যুকো-প্লাসট) লাগিয়ে দেয়।
শট—১০
চারজন মিলে তাকে টানতে টানতে সমুদ্রের দিকে নিয়ে যায়। সমুদ্রের আওয়াজের সঙ্গে মিশিয়ে সংলাপ শোনা যায়—
'চলুন বৌদি, আপনাকে সাঁতার শেখাবো। চিৎ-সাঁতার।'
একটা বিরাট ঢেউ এসে তটের উপর আছড়ে পড়ে।
শট—১১
ক্যামেরা জলের নিচে। ঊর্মিলা হাত-পা ছোঁড়ে। এবং এরা সবাই তাকে চেপে ধরে থাকে।
ওরা সবাই উপরে উঠে আসে।
শট—১২
ক্যামেরা জলের উপরে। ঊর্মিলাকে ঘিরে সবাই নাচতে থাকে। তীর থেকে টেপ-রেকর্ডারের বাজনা শোনা যায়।
শট—১২
স্নানরত এক ভদ্রলোক ওদের আওয়াজ শুনে ওদের দিকে এগিয়ে যায়।
ভদ্রলোক : ও দাদারা, কী হচ্ছে কী?
কমল : ভয় নেই, বৌদিকে সাঁতার শেখাচ্ছি।
অমল : উনি আপনার চেয়েও স্মার্ট।
ভদ্রলোক : বেশিদূর যাবেন না, মেয়েটি সঙ্গে আছে।
নির্মল : উনি ইংলিশ চ্যানেল পার হবার মহড়া দিচ্ছেন।
শট—১৩
ভদ্রলোক : যা খুশি করো বাবা! আজ-কালকার ছেলে! কথা কি আর শুনবে?
ক্যামেরা ডান দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়।
শট—১৪
দাদা ঊর্মিলার পা তুলে ধরে এবং শাড়ি সায়া তুলতে থাকে।
শট—১৫
অমল, কমল ও নির্মল ঊর্মিলাকে জোর করে ধরে রাখে। সংলাপ সমুদ্রের আওয়াজের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে শোনা যাবে।
কমল : আহা! অমন করে পা ছুঁড়বেন না, পা ছুঁড়বেন না। সাঁতার শিখবেন কী করে? চিৎ-সাঁতার দিন, চিৎ-সাঁতার।
শট—১৬
টেপ রেকর্ডার থেকে বাজনা শোনা যায়। ঊর্মিলার খোলা পা উরু পর্যন্ত নিষ্ফল প্রচেষ্টায় আকাশে ছোঁড়ে। কিন্তু বেশিক্ষণ পারে না।
ক্যামেরা পা থেকে দাদার মুখে এসে পড়ে। দেখা যায় সে জোর করে ঊর্মিলার পা দুটোকে চেপে ধরে রেখেছে।
শট—১৭
ল্যুকো প্লাসট মারা ঊর্মিলার মুখের উপর

দাদা ঝাঁপিয়ে পড়ে। হঠাৎ একটা ঢেউ এসে ওদের উপর আছড়ে পড়ে।

শট—১৮

জলের নিচে ক্যামেরা, ঢেউ-এর দাপটে সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দাদার মুখ জলের তলা থেকে উপরে উঠে আসে।

শট—১৯

ক্লোজ শট। দাদা ঊর্মিলার উপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে।

শট—২০

কমল ঊর্মিলার হাত মুচড়ে ধরে।

শট—২১

বিগ ক্লোজ শট

ঊর্মিলা নিঃশ্বাস নেবার জন্য লড়তে থাকে।...

শট—২২

দাদা জাপটে ধরে থাকে ঊর্মিলাকে।

শট—২৩

ঊর্মিলা আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে পড়ে।

শট—২৪

জলের নিচে ক্যামেরা। ঊর্মিলার শরীর স্থির হয়ে যায়।

শট—২৫

যখন উপরে উঠে আসে তখন দেখা যায় দাদার বদলে কমল উঠে এল। বিরাট একটা ঢেউ সমুদ্রের পাড়ে আছড়ে পড়ে।

শট—২৬

নিষ্কলংক সমুদ্রতীর— সাদা ফেনায় ভরে যায়।

শট—২৭

ঊর্মিলার অচেতন দেহ অমল, কমল, নির্মল ও দাদা ঢেউ-এর উপর দিয়ে টেনে নিয়ে এসে তীরে শুইয়ে দেয়। এবং সবাই তার পাশে শুয়ে পড়ে ক্লান্ত স্নানার্থীদের মতো।

শট—২৮

টেপ রেকর্ডার বাজতেই থাকে। একটু পরেই অমল, কমল এবং নির্মল আস্তে আস্তে ওঠে ও চলে যায়।

শট—২৯

মাছ-ধরা জালের ভিতর দিয়ে দেখা যায় ওরা পাড়ের দিকে যাচ্ছে।

নির্মল: অ্যায়সা আঁচড়েছে না, রক্ত থামছে না। তার উপর লোনা জল, হাত জ্বলে যাচ্ছে মাইরি!

কমল: দাদা বলেছে কোনরকম এক্সাইটমেণ্ট দেখাবি না। ধীরে সুস্থে এখান থেকে কাটতে হবে, যেন কিছুই হয়নি।

শট—৩০

ঊর্মিলার অচৈতন্য দেহের পাশে দাদা বসে থাকে। তারপর এধার ওধার দেখে আস্তে আস্তে উঠে ক্যামেরার বাইরে চলে যায়।

শট—৩১

ক্যামেরার সামনে অচৈতন্য ঊর্মিলা উপুড় হয়ে পড়ে থাকে।

শট—৩২

সেই স্নানার্থী ভদ্রলোক স্নান শেষে গা মুছতে মুছতে তীর দিয়ে হেঁটে আসেন।

ভদ্রলোক: সমুদ্র-স্নানের মতো জিনিষ নেই। শরীরটা কী রকম একেবারে ফ্রেশ··· কথা অসমাপ্ত রেখে তিনি ক্যামেরার ডানদিকে তাকান, যেখানে ঊর্মিলার অচৈতন্য দেহটা পড়ে আছে।

শট—৩৩

ভদ্রলোক: কী হয়েছে মা, তুমি এভাবে শুয়ে আছ যে! কী হয়েছে?

এই কথা বলে ঊর্মিলার মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নেন।

শট—৩৪

বিগ ক্লোজ শট।

প্রায় মৃত, রক্তহীন ফ্যাকাশে ঊর্মিলার মুখ ক্যামেরার সামনে দেখা যায়।

চিত্রনাট্য: নির্মল ধরের সৌজন্যে

আলোকচিত্র: এস রায়।

ইতিহাসের এম-এ ই চায় লিখেছে ? বাংলার এম-এর কোনো সুযোগ নেই ?

হরিহর বলল, সুযোগ থাকবে না কেন ? খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে যাও—একদিন না একদিন লেগে যাবে।

আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললাম। বললাম, না—আমার কিছুই জুটবে না। তাছাড়া আমার তো আর ১৮০ সেন্টিমিটার উচ্চতা নেই। আমার উচ্চতা মাত্র একশো চল্লিশ। ত্রিদিব মেসোও আমার নেই।

হরিহর বলল, আরে আগে আমি চাকরি একটা পেয়ে নিই। ত্রিদিব মেসো তো আরও পনের বছর পর রিটায়ার করবেন—একটা না একটা কিছু জোগাড় হয়েই যাবে তার মধ্যে। হ্যাঁ, একটা কথা তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছি—যোগ্যতার মধ্যে হিন্দী জানার ব্যাপারটাও আছে।

হিন্দী জানা ? আমি বলি। আমি তো হিন্দী জানি না, তুমি জানো বুঝি ?

জানব না ? চাকরি পেতে গেলে আজকাল মাতৃভাষা না জানলেও চলে, কিন্তু হিন্দী চাইই। সে জন্যই তো আমি সপ্তাহে দুটো করে হিন্দী ফিলম দেখি, রেডিয়োয় হিন্দী প্রোগ্রাম শুনি। তাছাড়া হিন্দী পরীক্ষায় পাস করে একটা ডিপ্লোমা আর দুটো সার্টিফিকেটও যোগাড় করে রেখেছি।

আমি চুপ করে থাকি।

হিন্দী একটা খুব শক্ত ভাষা নয়। হরিহর আমাকে সান্ত্বনা দেয়। দেখো, ইংরেজরা সেই কত হাজার মাইল দূর থেকে এদেশে আসার দু মাসের মধ্যেই চলনসই হিন্দী বাগিয়ে নিত। আর তাতেই আমাদের দেশের কত হাজার কোটি টাকা নিজেদের দেশে নিয়ে যেতে পেরেছিল। আর তুমি পারবে না ?

আমি বললাম—পারব না কেন ? তবে এই বয়সে কি ভালো লাগে ?

হরিহর উপদেশ দেয়—শেখার এই তো বয়স। তাছাড়া একটা কথা, শেখার জন্য কোনো বিশেষ বয়স লাগে মনে কোরো না। জোসেফ কনরাড তো মাত্র তেইশ বছর বয়সে ইংরিজী শেখেন, কিন্তু তাতে তাঁর অসুবিধে তো কিছু হয়নি। দিব্যি তো মেরে বেরিয়ে গেলেন।

আমি আর কি বলব। আমার বাক্য সরে না।

একটু পর হরিহর বলে, এবারে বল আমার এই চাকরিটা পাওয়ার চানস কতখানি ?

মানে ?

বুঝতে পারছ না ? আমি হিন্দী জানার ফলে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সংখ্যা আরও কমে গেল না ?

তা গেল। আমি বললাম। তোমার উচ্চতা, তোমার অ্যাকাডেমিক কোয়ালি-

বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত প্রার্থীরা

ফিকেশন, তোমার স্বাস্থ্য, তোমার বয়স, তোমার মেসো—না একশো আটত্রিশ জনের কেন, যদি মাত্র একজনের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো তাহলেও জয়মাল্য বা মুকুট তোমারই গলায় বা মাথায় এসে পড়ত। না ভাই, তুমি দারুণ, দারুণ সৌভাগ্যবান।

আমি বেরুচ্ছি এখন। হরিহর বলল। দুপুরে আর এই মেসে খাবনা। বোধ হয় রাত্রেও না। প্রথমে ত্রিদিব মেসোর অফিস যাব—আমার আবেদন পত্রখানি তাঁর হাতে একেবারে পৌঁছে দিয়ে সোজা চলে যাব—

কোন্নগর ? আমি বলি।

অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হরিহর আমার দিকে বঙ্কিম দৃষ্টিতে তাকায়। তুমি মানুষের মনের ভিতরটা দেখতে পাও তো বেশ। কেমন করে জানলে যে আমি কোন্নগরে যাব ?

ওর নামে মাঝে মাঝে যে নীল রঙের খাম আসে, আর তার উপরে ডাকটিকিটে যে ছাপ থাকে তাতেই আমি বুঝি। আমি এটাও বুঝি যে মেয়েটি ছন্দা, কেননা ছন্দার সঙ্গে ওকে দু-একবার দেখেছি। ছন্দা কোন্নগরে থাকে সেটাও আমার জানা ছিল। কিন্তু ওর কথায় আমি চুপ করে থাকি—একটু রহস্যময় হাসি হেসেই জবাবটা দিই। কিন্তু হরিহর এখন খুব ফুর্তিতে আছে বলে আমাকে আর চাপ দেয় না। তাড়াতাড়ি জামা-টামা পরে নেয়, কেটে নেয় খবরের কাগজ থেকে বিজ্ঞাপনটা। তারপর বলে, ফিরতে ফিরতে রাত দশটাও বেজে যেতে পারে। একথা বলেই কেটে পড়ে। দুপুরের খাদ্যটা খাওয়ার আগে আমার নামেই ডোনেট করে দেয়।

আমি চান করে খাওয়া দাওয়া সেরে দুটো উপন্যাস পড়ে শেষ করে ফেলি। আজকালকার উপন্যাস, তিন লাইন পড়ি তার ছ লাইন ছাড়ি, তাতেই টের পাই সং-সাহিত্য আমাদের এই বাংলা ভাষায় এখনও দারুণ সৃষ্টি হচ্ছে। প্রায় প্রতি পাতায় খুন, এবং নারী—প্রেম এবং বলাৎকার। বাস্তবের আঁচে ভাজা পাঁপরের স্বাদ এনে দেয়। বিভূতিভূষণ, শরদিন্দু এবং তারাশংকর, মানিক এবং সতীনাথের পর কে—আর প্রশ্ন নয়। অন্তত ছত্রিশজন তাঁদের স্থানচ্যুত করেছেন দেখতে পাই সাময়িকপত্রের পাতায় পাতায়। তারপরই ঘুম পেয়ে যায় দারুণ। ঘুমুতে ঘুমুতে সন্ধ্যে হয়। এক কাপ চা আর দুটো বিস্কুট খেয়ে পাশের বাড়ির পায়রাদের ফিরতে দেখি। তারপর পড়াতে চলে যাই।

পড়াতে পড়াতে রাত ন'টা বাজে। ফিরতে ফিরতে দশটা হয়ে যায়। এসে দেখি ঘরে আলো। হরিহর বিছানায় চিৎ হয়ে এবং ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। কড়িকাঠ গুণছে বলেও মনে হলো না। কেমন যেন একটা অসুস্থ হতাশ দৃষ্টি। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেও সে আমার দিকে তাকায় না পর্যন্ত। আমিও তাকে বিরক্ত করি না। এইভাবে চুপচাপ কয়েক মিনিট কাটে। আমি একখানা বই নিয়ে বসি। একটু পরে হরিহর উঠে বসে। দেখি তার চোখ দুটো চমৎকার আপেলের মতো লাল। বললাম, কী হয়েছে তোমার ? চাকরির দরখাস্তটা জমা দিয়েছ তো ? তোমার ত্রিদিব মেসো কি বললেন ?

হরিহর আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। ওকে দেখে আমার কষ্ট হলো। বললাম—মেসো কিছু করবেন না এই বলেছেন তো ? ওরকম মেসোর সঙ্গে না মেশাই ভালো।

উঁহু ঠিক তা নয়। হরিহর একটু ধাতস্থ হলো বুঝি। আমার ত্রিদিব মেসোর কোনো দোষই নেই। তবে চাকরিটা আমার

এবার আমাকে পায় কে ?

হবে না।

কেন ?

চাকরির বিজ্ঞাপনের তলায় খুদে খুদে অক্ষরে যে সব লেখা ছিল সেগুলো আমি পড়িনি প্রথমে। ওতেই যত গোলমাল হয়ে গেল।

খুদে খুদে অক্ষর গোলমাল বাধাল কেমন করে? বড় বড় অক্ষর তোমাকে আশ্বাস, অভয় এমনকি চাকরি পর্যন্ত দিল—আর খুদে খুদে লেখা গোলমাল বাধিয়ে দিল ?

ঠিক তাই। হরিহর বলল।

ব্যাপারটা কি খুলে বলবে ? আমি বলি।

নিশ্চয়ই। খুলেই বলব। খুদে লেখা মানুষকে কী ভাবে সর্বনাশ করে দেয় সেকথা তোমাকে বলব।

আমি বললাম, বল, শুনি।

হরিহর বলল, আমি তো দেখিনি—একশো আটত্রিশ জনকে নিতে হলে যে সব কোয়ালিফিকেশন অথবা গুণপনা থাকা দরকার সে সব গুণপনা বেশ বড় অক্ষরে লেখা ছিল। কিন্তু ভাই—তারপরই পড়ে গেলাম খুদে অক্ষরের গর্তে !

খুদে অক্ষরের গর্তে ? আমি বলি।

হ্যাঁ ভাই গর্তে। শোনো তারপর। খুদে অক্ষরে লেখা আছে দেখলাম, মানে আমার ত্রিদিব মেসো দেখিয়ে দিলেন—এই একশো আটত্রিশ জনের মধ্যে শতকরা অন্তত ষাট জনকে নেওয়া হবে বিশেষ তালিকাভুক্ত সম্প্রদায় থেকে। ঐ সম্প্রদায়ের প্রার্থী পাওয়া না গেলে তবেই অন্য সম্প্রদায়ের কথা বিবেচনা করা হবে। অর্থাৎ একশো আটত্রিশের মধ্যে বাদ পড়ে গেল ধরো গিয়ে তেরাশি জন।

তেরাশি জন ? আমি বলি। তাহলে তো ভাবনা নেই তোমার। এখনও তো রয়ে গেল পঞ্চান্ন জন।

হরিহর বলল, দাঁড়াও, খুদে লেখায় আরও জানানো হয়েছে বাকি জনের মধ্যে অন্তত ত্রিশ জনকে নেওয়া হবে যারা সামরিক বাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেছে।

আমি বলি, আরে তাতেই বা ক্ষতিটা কি ? এখনও তো পঁচিশ জন রয়ে গেল না ?

হরিহর বলল, ওদের মধ্যে পনের জনকে নিতে হবে ঐ সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পুত্র, কন্যা—না থাকলে ভাইপো ভাগনে হলেও চলবে।

আমি বললাম, বল কি ? এতো সাংঘাতিক ব্যাপার। কিন্তু এখনও তো পনেরটি পোস্ট রয়ে গেল না ?

হরিহর বলল, তাদের মধ্যে এগার জনকে নেওয়া হবে যারা শরণার্থী হিসেবে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অন্তত দশ বছর আগে এদেশে এসেছে। প্রার্থীরা নিজেরা না হলেও চলবে, শরণার্থীদের মধ্যে তাদের বাবা-মা, বা বাবা-মায়ের মধ্যে একজন হলেও চলবে।

মামা চলবে না ?

না। সেটা হলে তো ভালই হতো। আমার দুই মামা সাবেক পূর্ব পাকিস্তান থেকে শরণার্থী হয়ে এসেছিলেন।

আমি বললাম, তবু তো চারটে পোস্ট রয়ে গেল !

চেয়ার যখন মাথা ভাঙে···

হরিহর বলল, উঁহু ! সে গুড়েও বালি। ওদের মধ্যে তিন জনকে নিতে হবে প্রতিবন্ধীদের মধ্যে থেকে।

কী সর্বনাশ, বল কি ? কিন্তু তবু তো একটা পোস্ট রয়ে গেল। তা, তোমার যা কোয়ালিফিকেশন, তাতে তুমি সকলের উপর দিয়ে টেক্কা মেরে বেরিয়ে যাবে।

উঁহু ! সেখানেও ঝামেলা রয়েছে।

কী রকম ?

ত্রিদিব মেসো বললেন, ঐ একটি পোস্টের জন্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর মশাই তার এক বন্ধুর ছেলেকে নেবার কথা ভাবছেন।

আমি বললাম, দুঃখের কথা সবই, সন্দেহ নেই—কিন্তু একটা কথা আমার মনে হচ্ছে। যে কোয়ালিফিকেশন চেয়েছে তাতে কয়েকজনের বেশি পাবে না। ফলে তোমার চানস তো রয়েই গেল !

হরিহর বলল—আরে সে কথা কি আমি জানি না নাকি ? কিন্তু বিশেষ তালিকাভুক্তদের জন্য কোয়ালিফিকেশনের স্ট্যানডার্ডই অনেক কমানো রয়েছে।

কেমন ?

ধরো বয়স। বিশেষ তালিকাভুক্তদের জন্য বয়সের সীমা ছাব্বিশ নয়, ছাপান্ন।

ছাপান্ন ? আমি আঁতকে উঠি। কিন্তু এ কি উচিত ?

উচিত কি অনুচিত জানি না, যা খুদে অক্ষরে রয়েছে তাই বলছি। এরপরও আছে—উচ্চতায় যদি একশো কুড়ি সেণ্টিমিটার হয় তাহলেই বিশেষ তালিকাভুক্তরা এবং প্রতিবন্ধীরা পার পেয়ে যাবে।

একশো কুড়ি ? বলছ কি ?

ঠিকই বলছি। শরণার্থীদের ক্ষেত্রে তা আরও শিথিল করা হয়েছে। তাদের একশো দশ হলেই চলবে, আর বিশেষ তালিকাভুক্ত এবং শরণার্থী হলে মাত্র একশো পাঁচ হওয়া দরকার।

সর্বনাশ ! আর শিক্ষাগত যোগ্যতা ?

হরিহর বলল, দাঁড়াও, আরও বলে নি—শরণার্থী যদি প্রতিবন্ধী হয় এবং বিশেষ তালিকাভুক্ত হয় তাহলে একশো সেণ্টিমিটারই যথেষ্ট।

আমি বললাম, কিন্তু আইনের চোখে সকলেই সমান নয় ?

হরিহর বলল, মন্তব্য করার আগে আরও শোনো। তুমি শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা বলছিলে না ? আমার তোমার জন্য এম এ পাস হতেই হবে, ইতিহাসেই হতে হবে, কিন্তু অন্যান্যদের জন্য বি এ পাস হলেই হবে—এমনকি প্রতিবন্ধীদের এবং শরণার্থীদের ক্ষেত্রে তারও দরকার নেই। কেবল ম্যাট্রিক বা তার সমপর্যায়ে পরীক্ষা দিয়েছে এমন প্রমাণ পেলেই চলবে।

আমি বললাম, কিন্তু কেন, কেন এই অবিচার ?

হরিহর জবাব দিল না। পোশাক বদলে সে তার খাটিয়ায় শুয়ে পড়ল। তাকে কোন্নগরের কথা জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম, কিন্তু না, বেচারাকে আর বিরক্ত করতে মন চাইল না।

আলো নিভিয়ে দিয়ে আমিও শুয়ে পড়লাম।

ব্যঙ্গচিত্র ঃ লাহিড়ী

নোবেল প্রাইজের লেখক

কিপলিং, কিম, পূর্ব-পশ্চিম

রাডিয়ার্ড কিপলিং। জন্ম ৩০ ডিসেম্বর ১৮৬৫, বোম্বে। মৃত্যু ১৮ জানুয়ারি ১৯৩৬, লণ্ডন। জাতি ঃ ব্রিটিশ। সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ ঃ ১৯০৭।

ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী

কিপলিং-এর যথার্থ মূল্যায়ন এদেশে হয়নি। তাঁর খ্যাতি বা অখ্যাতি ভারত বিদ্বেষী হিসেবে যতটা আছে, সৃজনশীল লেখক হিসেবে ততটা নেই বললেই চলে। কিপলিং-এর বাবা ছিলেন ভারতীয় শিল্প-কলার একজন রসজ্ঞ সমঝদার। বোম্বে শহরে কিপলিং ছেলেবেলার অনেকটা অংশ কাটান পথে ঘুরে ঘুরে ও এদেশের ভাষা শিখে। ১৮৭১ সালে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ইংল্যাণ্ডে—এক কড়া অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে।

ডিভনের অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান স্কুলে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে গরিব ছাত্র ও খেলাধুলোয় একেবারে আনাড়ি। স্কুলের দিনগুলো তাঁর কী ভাবে কেটেছে 'স্টকি অ্যাণ্ড কোম্পানি' (১৮৯৯)-তে জানা যায়। বিলেতের ছাত্র-জীবন নিয়ে লেখা যত বই আছে, এটি তার মধ্যে ক্লাসিক পর্যায়ের।

বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়ে, স্কুল জীবন শেষ করেই কিপলিং ১৮৮৩ সালে আবার ভারতে ফিরে আসেন ও লাহোর থেকে প্রকাশিত সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারি গেজেট দৈনিকে সাংবাদিকের কাজ নেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভারতে ইংরেজ সৈনিকদের জীবন নিয়ে গল্প লেখা শুরু করে দেন। প্লেন টেলস ফ্রম দি হিলস (১৮৮৮), সোলজার্স থ্রি ও আণ্ডার দি দেওদারস গল্পগুলিই তার প্রমাণ।

১৮৯২ সালে তাঁর কবিতার বই বেরোয় ঃ বারাক-রুম ব্যালাডস।

এই কটি বইয়ের জন্যেই কিপলিং-এর সাহিত্যিক খ্যাতি ইংরেজি-জানা আন্তর্জাতিক পাঠক মহলে ছড়িয়ে পড়ে।

অতঃপর, তিনি এলাহাবাদের পাইওনিয়র দৈনিকে ১৮৮৯ সাল অবধি চাকরি করে আবার ইংল্যাণ্ডে ফিরে যান। তারপরই তাঁর আরও বিখ্যাত দুটি উপন্যাস দি লাইট দ্যাট ফেলড (১৮৯০) ও ক্যাপটেনস কারেজাস (১৮৯৭) তাঁকে আরও বিখ্যাত করে তোলে। ১৯০১ সালে প্রকাশিত তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি 'কিম'। এছাড়া, তাঁর ইফ গঙ্গা ডান কবিতা, কিম-এর মতোই বহু আলোচিত। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা কিপলিং শেষের দিকে ভীষণ-

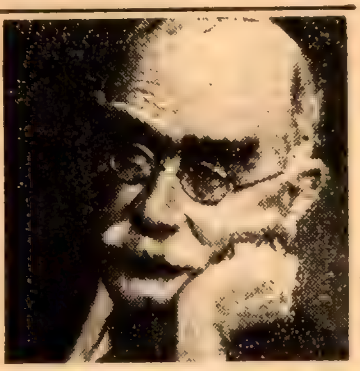

কিপলিং

ভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন—সম্ভবত প্রথম যুদ্ধে তাঁর সন্তান মারা যাওয়ার জন্যে।

দি লাইট দ্যাট ফেলড প্রায়-আত্মজীবনী-মূলক। ডিক হেলডার শিল্পী, খাতুনের পতনের সঙ্গে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন, কিন্তু তলোয়ারের ঘায়ে চোখে আঘাত লাগার ফলে চোখ নষ্ট হয়ে যেতে থাকে আস্তে আস্তে। ডিক মানুষ হয়েছিলেন শ্রীমতী জেনেট নামে একজন ধার্মিক কিন্তু হৃদয়হীনা মহিলার কাছে। নেইজি নামে আর একজন অনাথ—ডিককে শিল্পচর্চায় আগ্রহী করে তোলে। খাতুনে সংবাদদাতার কাজ করতে করতে ডিক জেনারেল গর্ডনের কিছু ছবি এঁকে ইংল্যাণ্ডে পাঠাতে প্রায় রাতারাতি নাম করে ফেলেন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি কমে আসতে থাকে। নেইজি তাঁকে ছেড়ে চলে আসেন, যাকে মডেল করে ডিক তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবিটি আঁকছিলেন, সে হঠাৎ ঈর্ষান্বিত হয়ে ছবিটি নষ্ট করে দেয়। অন্ধ ডিক—মিশরে গিয়ে শত্রুপক্ষের গুলি-গোলা চলার পথে সোজা দাঁড়িয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন। ক্যাপটেন কারেজাস গল্পের হার্ভে —একটি ইঁচড়ে পাকা আমেরিকান ছেলে। একটি স্টিমার থেকে জলে পড়ে যেতে—গ্লাসস্টারের কিছু জেলে তাকে উদ্ধার করে। পুরোপুরি জেলের ছেলেদের মতোই মানুষ হতে হলো তাকে বছর বছর পর বাবার সঙ্গে যখন পুনর্মিলন হলো, হার্ভে তখন পুরোপুরি বদলে গেছে একেবারে অন্য এক ব্যক্তিত্বে।

কিম

প্রধান চরিত্র ঃ

কিমবল ওহারা ঃ লাহোরের রাস্তায় মানুষ পনেরো বছরের একটি বেজায় বুদ্ধিমান ছেলে।

তেস্যু লামা ঃ তিব্বতের এক ধর্মীয় তীর্থযাত্রী—সর্বরোগহর এক নদীর খোঁজে ভারতে এসেছেন।

মহবুব আলি ঃ ঘোড়া বিক্রি করেন। আসলে ব্রিটিশ গুপ্তচর।

কর্নেল কটন ঃ ব্রিটিশ গুপ্তচর। সংস্থার প্রধান।

হরিচন্দ্র মুখার্জি ঃ ব্রিটিশ গুপ্তচর।

ফাদার ভিকটর ঃ ক্যাথলিক যাজক।

লুরগান ঃ রত্ন ব্যবসায়ী—কিমকে গুপ্তচর-বৃত্তি শেখান।

কাহিনী

পুরো নাম কিমবল ওহারা। সংক্ষেপে কিম। লাহোরের স্বপ্নময় রাস্তায় ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেছিল। অনাথ এই বালকের বাবা—ম্যাভেরিক রেজিমেন্ট—ভারতের আইরিশ ফৌজীদের সার্জেন্টের কাজ করতে করতে মারা যান। মা—খুব অল্প বয়সে মারা যান। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এক মহিলার কাছে কিম থাকে। পথে পথে ঘুরে, রোদে পুড়ে কিমের গায়ের রং কালো হয়ে গেছে। কে বলবে কিম ইংরেজ বাচ্চা? তার উপর, যত ভালো না ইংরিজি বলতে পারে, তার চেয়ে অনেক ভালো পারে হিন্দুস্থানী বলতে।

একদিন লাহোরের জাম-জাসমা কামানের কাছে কিম চুপচাপ বসে আছে—এমন সময় সেখানে এলেন এক তিব্বতী লামা। লাহোরের আঁকা বাঁকা পথে লামা রাস্তা ভুলে গেছেন। তিনি ভারতবর্ষে এসেছেন পাঁচ-তীর নদীর খোঁজে—উদ্দেশ্য ঃ সেখানে অবগাহন করে সমস্ত পাপ ধুয়ে ফেলবেন। কিম লামার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিতে বিশেষ দেরি করল না, উপরন্তু জানাল, তিনি যে নদী খুঁজছেন তা আছে বেনারসে। এবং কিম লামার সঙ্গে বেনারসের পথে এগলো। পথে পথে লামার জন্যে ভিক্ষা, আর অন্য সব পথে-ঘোরা ছেলে-পুলেদের হাত থেকে লামাকে রক্ষা করাই হয়ে উঠল তার প্রধান কাজ।

এইসময় মহবুব আলি—অতিশয় ধূর্ত এক অশ্ব ব্যবসায়ী কিন্তু ব্রিটিশ গুপ্তচর, কিমের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার হাতে একটি সাংকেতিক লিপি দিল আমবালার ব্রিটিশ কম্যাণ্ডের হাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে। কিম কী ভাবে যেন বুঝতে পেরেছিল সাংকেতিক লিপিটি খুবই জরুরী। আর ঘোড়া বিক্রির কথাবার্তা লেখা থাকলেও—তার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো গোপন অর্থ আছে।

কিম ও লামা রেলে চেপে আমবালায় পৌঁছল। লিপিটি যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে একটি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে—কিম আড়ি পেতে অফিসারদের কথাবার্তা শুনতে লাগল। পুরো ব্যাপারটা এবার তার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। মহবুব সেই সাংকেতিক লিপিতে আট হাজার সশস্ত্র ফৌজ পাঠাতে বলেছে যাতে সীমান্তের

বিদ্রোহীদের আক্রমণ দমন করা সম্ভব হয়। বিদ্রোহীরা নাকি ভীষণভাবে জোট বাঁধছে।

এইসব শুনে, কিম তার লামা সঙ্গীকে নিয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড ধরে এগিয়ে চলল ১৫০০ মাইলের জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে ঘনিষ্ট হতে। এদিকে, গুরু ও চ্যালা—সবারই বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে জনপ্রিয়ও হয়ে উঠল। কুলু উপত্যকার জনৈক মহিলাও তাঁর মেয়েকে নিয়ে ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তীর্থ করতে। তিনি গুরু-চ্যালার সঙ্গ আর ছাড়তে চান না। বকবক করে লামাকে তিনি বিরক্ত করে তুললেন, তাঁর ধারণা লামা মহারাজ সদয় হলে অসম্ভবকে-সম্ভব-করা তাবিজ মাদুলি ইত্যাদি পাওয়া যাবে। তবে গুরু-চ্যালার একটি সুবিধে হলো এই মহিলার জন্যে—পথে খাওয়া দাওয়ার অভাব হলো না।

এইভাবেই, একদিন সন্ধ্যের দিকে রাস্তায় ছাউনি ফেলা ভারতের একটি ম্যাভেরিক রেজিমেণ্ট কিমের চোখে পড়ল। চমৎকার একটি পতাকার উপর লাল রঙের ষাঁড়—কিমের নজর কেড়ে নিল। লুকিয়ে ছাউনির কাছে আসতে দুই যাজক—রেভারেণ্ড বেনেট ও ফাদার ভিকটর—কিমকে পাকড়াও করল। কিমের গলা থেকে একটি বিরাটাকৃতি তাবিজ খুলতে, তার ভিতর থেকে কিমের পরিচয়পত্র পাওয়া গেল। যাজকরা অবাক হয়ে গেলেন, হ্যাঁ—পাককা ভারতীয় ছোকরা। এটি মৃত সার্জেণ্ট ও হারার ছেলে!

এখান থেকেই কিমের স্বাধীনতা ছারখার হয়ে গেল। ঠিক হলো তাকে এবার স্কুলে পাঠান হবে। কিম অভয় দিল লামাকে: 'গুরু-ঘাবড়াও মৎ! আমি ঠিক কেটে চলে আসব।' সেই মহিলাই হলেন এবার লামার সহযাত্রী।

লামা ফাদার ভিকটরের নাম ঠিকানা জোগাড় করে জানালেন, কিমের লেখাপড়া শেখার জন্যে আমি কিছু কিছু টাকা পাঠাব।

ওদিকে কিম একদিন সৈনিকদের তাজ্জব করে দিল, 'খুব শিগগির আট হাজার লোককে যুদ্ধে যেতে হবে'—ভবিষ্যদ্বাণী করে। প্রথমটা সবাই হাসলেও, হঠাৎ নির্দেশ আসতে অবাক হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে ফাদার ভিকটরও অবাক হয়ে গেলেন। লামা তিনশো টাকা পাঠিয়ে জানিয়েছেন, সেণ্ট জেভিয়ারস স্কুলে কিমের টুইশন ফি বাবদ তিনি বছরে এই টাকাটা পাঠাবেন। লামার মতো একজন দরিদ্র সাধুর এই বদান্যতায় ফাদারকে আশ্চর্য হতে হলো মানুষের বিচিত্র মনস্তত্ত্ব রহস্যে।

ফৌজীদের আস্তানা থেকে পালাবার চেষ্টা করতে কিম ধরা পড়ে গেল। ফৌজীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন তার কাছে বিষময় হয়ে উঠল। মহবুব আলিকে সে চিঠি দিল এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে। মহবুব এসে কিমকে নিয়ে চলে গেল—কিম ভাবল: বাঁচা গেল! মহবুব কিন্তু কিমকে পৌঁছে দিল কর্ণেল ক্রেটনের কাছে। ক্রেটন নানা কায়দায় কিমকে স্কুলে যেতে রাজী করালেন।

কিম স্কুলে পড়ছে খুবই অসুখী হয়ে। মাঝে মাঝে স্কুল থেকে পালিয়ে লামার সঙ্গে দেখা করে আসে। গরমের ছুটিতে সে করল কি, গায়ে কালো রঙ মেখে—মাথায় পাগড়ি চাপিয়ে মহবুবের কাছে গিয়ে আর্জি জানাল: 'আমি তোমার সঙ্গে ঘুরব।' এর মধ্যে মহবুবকে খুন করার যে চক্রান্ত চলছে তাও সে ফাঁস করে দিল।

মহবুব এবার কিমকে 'রহস্যময়' মিস্টার লুরগানের কাছে নিয়ে গেল। লুরগান বড়ই বিচিত্র ব্যক্তিত্ব—দোকানে নানারকম পাথর সাজিয়ে বসে থাকেন বিক্রি করার জন্যে। বাড়তি আকর্ষণ হিসাবে একটি ফোনোগ্রাফও আছে। আসলে লুরগান—ব্রিটিশ গুপ্তচর সংস্থার একজন সক্রিয় কর্মী।

অতঃপর লুরগান কিমকে তার ছেলের সঙ্গে গুপ্তচরবৃত্তির নানা কায়দা-কৌশল শেখাতে লাগলেন। এখানে কিমের সঙ্গে দেখা হলো হরিচন্দ্র মুখার্জির। হরিবাবুও গুপ্তচর। তিনি কিমকে বোঝালেন: স্কুলের পড়াশোনা চালিয়ে গেলে তুমিও স্পাই হতে পারবে।

কিম আবার ফিরে এল স্কুলে। বছর দুয়েক পড়ার পর ভৌগোলিক পর্যবেক্ষকের চাকরি নেওয়ার উপযুক্ত হলো। 'ভৌগোলিক পর্যবেক্ষণ' গুপ্তচরদের সবচেয়ে সুবিধের পেশা। মহবুব ক্রেটনকে জানিয়ে দিল: কিম তৈরি।

কিম করল কি, পুরোপুরি ভারতীয় সেজে তার গুরুর সঙ্গে দেখা করে দিল্লির দিকে এগুলো পাঁচ-তীর নদীর খোঁজে। গুরু এতদিন চ্যালার স্কুলের মাইনে নিয়মিত দিয়ে এসেছেন।

ট্রেনে কিমদের সঙ্গে দেখা হলো ই-থ্রিরে। সেও একজন ভারতীয় গুপ্তচর—দিল্লি থেকে পালাচ্ছে গুপ্ত ঘাতকের চোখ এড়িয়ে। কিমের সহযোগিতায় সেই গুপ্তচর এমন নিখুঁত ছদ্মবেশ ধরল যে কেউ তাকে চিনতে পারল না।

কিম আর তার গুরু এবার হাঁটা পথ ধরে চলল।

পথে আবার দেখা হলো সেই বকবকম কুলু মহিলার সঙ্গে। ইতিমধ্যে হরিবাবুও এসে হাজির হলেন সেখানে। তিনি কিমকে জানালেন, দুজন রুশ গুপ্তচর—একজন রাশিয়ান ও অন্যজন ফরাসি—উত্তর সীমান্তে ঢুকে পড়েছে—তাদের ধরা দরকার। কিম ও তার লামা গুরু এবার হিমালয় এলাকার মধ্যে প্রবেশ করল। সাদাসিধে গুরুকে কিম বুঝিয়ে দিল: বাঞ্ছিত নদীটি এখানেই পাওয়া যাবে। হিমালয়ের পাহাড়ী পথে গুরু অভ্যস্ত, কাজেই অসুবিধে হলো না—কিন্তু বিচিত্র গিরি-কন্দর ও বরফের পথে কিম বেচারা বেশ বেকায়দায় পড়ে গেল।

অন্যদিকে হরিবাবু সেই রুশ গুপ্তচরদের পথপ্রদর্শক সেজে তাদের কাছ থেকে মানচিত্র ও কিছু মূল্যবান নথিপত্র আত্মসাৎ করে নিয়ে কিম ও লামার খপ্পরে তাদের ফেলে দিলেন। গুপ্তচর দুটি লামাকে আক্রমণ করে বসতে—কিম আর সহ্য করতে পারল না, একজনকে সে বেশ গুরুতর আঘাত দিল।

হরিবাবু গুপ্তচর দুটিকে গ্রেপ্তার করে তাদের নিয়ে হিমালয় এলাকার বাইরে চলে এলেন। আহত কিম ও অসুস্থ লামাকে সেবা শুশ্রূষা করে স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনার জন্যে কুলুর সেই মহিলা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে হরিবাবু ও মহবুব কিমকে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। সেই মহিলা কিমকে পোষ্য-পুত্র নিলেন—আর লামা সহসা বাঞ্ছিত নদীটি আবিষ্কার করে ফেললেন ঐ মহিলার বসতি সংলগ্ন জমিতে। পুণ্য নদীতে পুণ্যবানের পাপ ধুয়ে গেল।

কিম কিশোর পাঠ্য সেই অর্থে হাকলবেরি ফিনকে কিশোর-পাঠ্য বলা যায়, সাধারণ অ্যাডভেঞ্চার গল্প থেকে এই বই দুটির গভীরতা অনেক বেশি। হাক ও কিমের মধ্যে চারিত্রিক সাদৃশ্যও আছে অনেকখানি। দুজনই দুষ্টু, কিন্তু খোলা-মন। দুজনই 'সভ্যতা'র শৃঙ্খলবিরোধী—মুক্ত প্রান্তরের ভক্ত। হাকের অভিযান মিসিসিপি নদীর উপর, কিমের গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোডে। অনেকখানি আত্মজীবনীভিত্তিক—কিম কিপলিং-এর প্রতিচ্ছায়া।

কিমের আখ্যানভাব মাঝে মাঝে বিরক্তিকর ও দীর্ঘসূত্র। অনেক বিচ্ছিন্ন ঘটনা লামা অথবা কিমের সুবিধার জন্যই একসূত্রে গ্রথিত করা হয়েছে। তবে প্রতিটি ঘটনা উত্তেজনাময় হওয়ার জন্যই অসংলগ্নতা চট করে টের পাওয়া যায় না। (প্রসঙ্গত কিপলিং ছোট গল্পের ক্ষেত্রে অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। মম কিপলিংকে 'ছোটগল্পের গুরু' বলে মনে করতেন। অনেক সমালোচক লরেন্সের মুন্সিয়ানা কিপলিং-এর সমতুল্য বলে মনে করেন)।

উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে কিপলিং-এর অস্বস্তি বেশ স্পষ্ট হলেও কিম তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা, কেননা ভারতবর্ষের যে চেহারা তিনি উপস্থিত করেছেন, অন্য কোনো ইংরেজ লেখক তা পারেননি। ভারতবর্ষকে যে তিনি কত গভীরভাবে ভালোবাসতেন, তার প্রমাণ এই বইতে থেকে গেছে। কিপলিং-এর ইস্ট ও ওয়েস্ট নিয়ে যে বিখ্যাত উক্তিটি আছে—তার অপব্যাখ্যা হয়েছে। তিনি কখনও বলেননি পশ্চিমের সংস্কৃতি প্রাচ্যের চেয়ে বড়। মহবুব আলি ও হরিবাবু যে বুদ্ধিগতভাবে যে কোনো ইংরেজের চেয়ে অনেক উপরে—কিম তা প্রমাণ করেছে। ভারতীয়-ইংরেজি সাহিত্য যে কত আকর্ষণীয় হতে পারে—তথাকথিত শুদ্ধ ইংরেজির চেয়ে—কিম-এর ছত্রে ছত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব-পশ্চিমের মিলই হলো কিম। □

বাঙালী ব্যক্তিত্ব

‘ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশে যদি কোনদিন যুদ্ধ লাগে সন্ধিপত্র লেখা হবে ইংরিজিতে’ — অন্নদাশঙ্কর রায়

‘সত্যাসত্য’র লেখক প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে বলেছিলেন, ‘বিশ্ব ব্যাপারের সর্বত্র দুই বিরুদ্ধ মহাশক্তি সর্বদা সক্রিয় রয়েছে। প্রাচীনরা তাদের দেবাসুর আখ্যা দিয়েছিলেন। দেশান্তরে তারাই God এবং Satan. তাদের নিয়ে প্যারাডাইস লস্ট রচিত হয়েছে। আধুনিক মন ও-সব নাম পছন্দ করে না। তাই তাদের বলে সত্য-অসত্য।’

‘সত্যাসত্য’র লেখক যিনি সেই বাঙালী ব্যক্তিত্ব অন্নদাশঙ্কর রায়ের সমস্ত জীবনটাই ক্লান্তিহীন সত্যের অন্বেষণ।

বাংলার মাটিতে তাঁর জন্ম নয়। ছেলেবেলা কেটেছে ওড়িশায়। কিন্তু ষোল-আনা-বাঙালী অন্নদাশঙ্কর কোনো গণ্ডির মধ্যে নিজেকে বেঁধে রাখেননি। নিজেকে যুক্ত করেননি কোনো ‘স্থির’ রাজনৈতিক মতবাদে বিবেক ও প্রজ্ঞা, ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে সামগ্রিক প্রয়োজনের মূল্য মানুষটির কাছে অনেক বেশি।

ঢেঙ্কানলের স্কুল থেকেই ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কটকের Revenshaw কলেজ থেকে আই এ পাস করলেন। গোল্ড মেডেল পেলেন পাটনা কলেজে ইংরেজি অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে। ইংরেজিতে এম এ পড়তে পড়তে আই সি এস পরীক্ষায় সফল হলেন, ভারতে প্রথম স্থান অধিকার করে, ১৯২৭। ১৯২৭-২৮ ইউরোপে কাটালেন। বাংলাকেই কর্মস্থল বেছে নিয়েছিলেন।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে মুর্শিদাবাদে প্রথম। বহরমপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, নদীয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর—অবিভক্ত বাংলার নানা জায়গায় কর্মজীবন কাটিয়ে অবশেষে যখন ১৯৫১-তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জুডিসিয়াল সেক্রেটারি তখন চাকরি ছাড়লেন। শান্তিনিকেতন হল তাঁর দ্বিতীয় বাসভূমি।

১৯২৯ থেকে ১৯৫১—তাঁর সরকারি চাকরির জীবন। সেই সময়ে সিংহভাগ ছিল ইংরেজ শাসনের অধীনে। কর্তব্যে অবিচলিত থেকেছেন। সাহিত্যের সব শাখাতেই পদচারণা করেছেন ‘আপস’ নামক শব্দটিকে পরিহার করে।

‘বাবা স্বর্গত নিমাই চরণ রায় গৃহদেবতার আরতির সময় আবৃত্তি করতেন বিদ্যাপতি। মা (প্রয়াত হেমনলিনী দেবী) গাইতেন জয়দেব।’ এই ভাবেই ছোটবেলার থেকেই সাহিত্যের সঙ্গে, গানের সঙ্গে আত্মীয়তা। তৈরি হয়েছে ছন্দের কান।

চাকরি জীবনে conlfict ছিল। অন্নদাশঙ্কর বলেন, ‘রাজশক্তির সঙ্গে দেশভক্তির conflict।’ জনসাধারণের প্রতি যথোচিত কর্তব্য করার চেষ্টা করেছেন। আর যা কিছু বৈসাদৃশ্য, কৌতুককর—যখন দেখেছেন, শুনেছেন, তার অনুভব ও উপলব্ধি ছেলেবেলার তৈরি কান ও ছন্দের আশ্রয়ে ছড়ার রূপে এসে ধরা দিয়েছে। স্বাধীন হল দেশ। অন্নদাশঙ্কর লিখলেন : ‘তেলের শিশি ভাঙল বলে খুকুর পরে রাগ করো / তোমরা যে সব বুড়ো খোকা / ভারত ভেঙে ভাগ করো / তার বেলা!’ এই ভাঙাভাঙির খেলায় স্বভাবত তিনি নির্বাক দর্শকের ভূমিকা নিতে অপারগ। সেই জন্যে ব্যক্তিত্ববান মানুষটির আত্মসমীক্ষা : স্বভাবত আমি ‘পলাতক’। বাড়ি থেকে দেশ থেকে। সকলে যা করে আমি তা করিনি। করছি না।

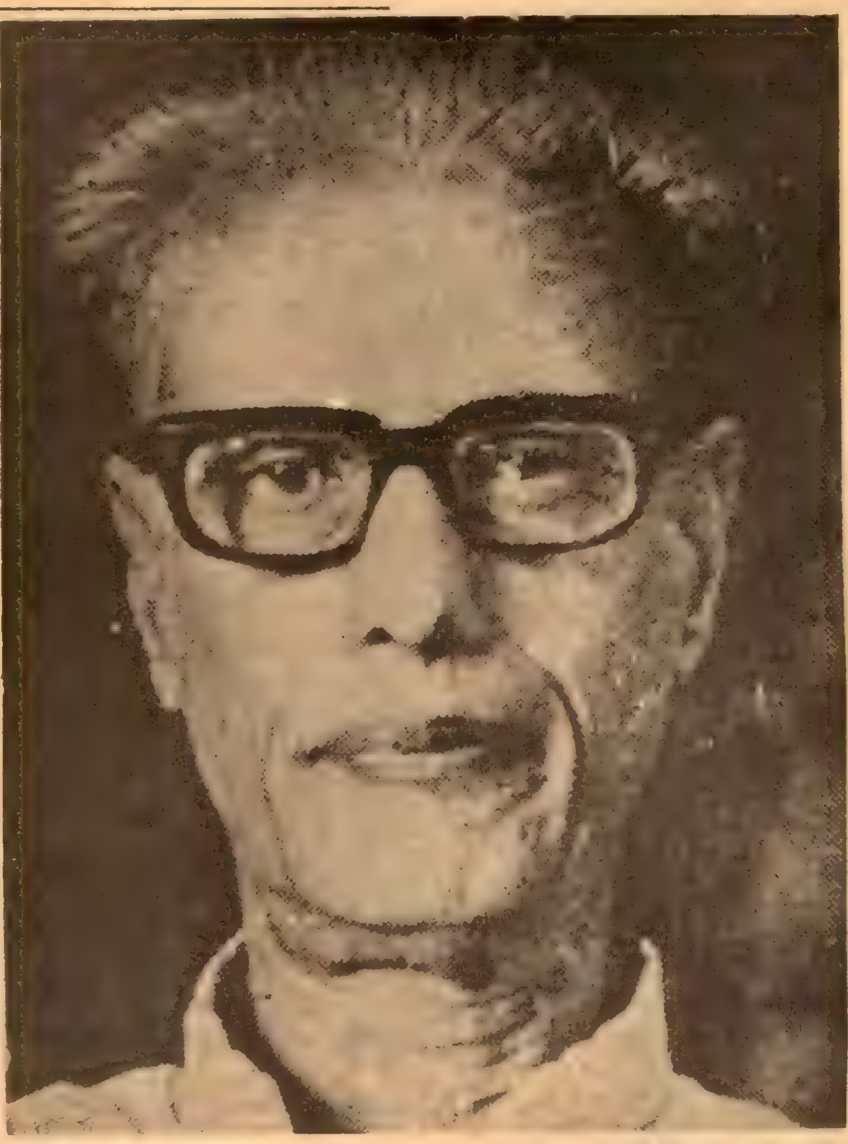

করেনওনি। স্বাধীন ভারতেও তাঁর কাছে যেটা অসত্য সেটা অসত্যই।

অন্নদাশঙ্করের গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। ইউরোপে থাকতে

১৯২৮-এ প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রন্থ 'তারুণ্য'। ১৯২৯-এ কবিতা গ্রন্থ 'রাখী'। দেশে ফিরে ১৯৩০-এ উপন্যাস 'আগুন নিয়ে খেলা'। ইউরোপ থেকে ফেরার পর ১৯৩১-এ ভ্রমণ-কাহিনী 'পথে প্রবাসে'। লেখাটি বিচিত্রায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৭ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত। ১৯৩৪-এ ছোটো গল্পের সংকলন 'প্রকৃতির পরিহাস'। ১৯৪২-এ ছড়ার বই 'উড়কি ধানের মুড়কি'। ছোটোদের জন্য ভ্রমণ কাহিনী 'ইউরোপের চিঠি' ১৯৪৩-এ। রচনা ১৯২৭-২৮-এ, ইউরোপে। ১৯৪৭-এ ধরা পড়ল ছোটো-বেলার কাহিনী—ছোটোদের জন্যে 'পাহাড়ী'। গ্রন্থটি রচিত ১৯৩২-৩৩-এ। বিভিন্ন সময়ে ওড়িয়া ভাষায় রচিত (১৯২১-২৬) তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি নিয়ে প্রকাশিত রচনাবলী 'সবুজ অক্ষর-'এর প্রকাশকাল ১৯৬৬।

১৯৩২-এ প্রকাশিত হলো 'যার যেথা দেশ'—'সত্যাসত্য' এপিক উপন্যাসের প্রথম খণ্ড। একাদিক্রমে রচিত অন্য খণ্ডগুলি : অজ্ঞাতবাস (১৯৩৩), কলঙ্কবতী (১৯৩৪), দুঃখমোচন (১৯৩৬), মর্ত্যের স্বর্গ (১৯৪০), অপসারণ (১৯৪২)। তালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই! বরং মুখোমুখি বসা তাঁর, অন্নদা-শঙ্করের, একটি বিশিষ্ট বাঙালী ব্যক্তিত্ব নিঃসন্দেহ। আমার সমস্ত জীবনটাই ক্লান্তি-হীন সত্যের অন্বেষণ। এবং সেটা সম্পূর্ণ অহেতুক। 'সত্যাসত্য'র ভূমিকা উল্লেখ করে প্রশ্ন করেছিলো 'আপনার জীবনও কি সত্যের পক্ষে, অসত্যের বিপক্ষে?' সেই কথাই বলছি। বস্তুত এটি আমার আত্মজীবন সমীক্ষা।

এই অন্বেষণ অহেতুক এই কারণে যে কোনো কিছু পার্থিব প্রাপ্তির জন্যে আমি উৎসুক ছিলাম না। এর জন্যে আমাকে নানা রকম প্রলোভনে পড়তে হয়েছে। বার বার বিপদও বরণ করতে হয়েছে। তিক্ততাও কম পোয়াতে হয়নি। কিন্তু শেষ ফল মোটের উপর শুভই হয়েছে। মনে হয় অদৃশ্য এক শুভশক্তি আমাকে সাহায্য করেছে।

সত্যের অন্বেষণের সঙ্গে সঙ্গে আর এক অন্বেষণ আমার জীবনে এসেছে। তার নাম রূপের অন্বেষণ। রূপের অন্বেষণ করতে করতে আমি আমার সত্যকে, কবিতায়, উপন্যাসে ও প্রবন্ধে অক্লান্তভাবে রূপায়িত করেছি। আমি ধনের জন্যে সাহিত্যের সাধনায় নিযুক্ত হইনি। খ্যাতির জন্যেও নয়। সম্মানের জন্যও নয়। এসব আপনা আপনি এসেছে। আর আমার এই যুগল সত্য রূপ—অন্বেষণই আমাকে এনে দিয়েছে অপ্রত্যাশিত ও অপরিমিত শ্রদ্ধা প্রীতি ভালোবাসা। এখনো পথ অনেক বাকি।

সাধারণত আমি অশুভ শক্তির সঙ্গে বিবাদে বলক্ষয় বা আয়ুক্ষয় করতে চাইনি। তবুও আমায় তা করতে হয়েছে কর্তব্যের অনুরোধে এবং তার জন্যে দুঃখ পেতে হয়েছে। কিন্তু সেই দুঃখ পরে সার্থক হয়েছে, কারণ যে সব কাজ নিয়ে আমি লড়াই করেছি সে সব পরে জয়ী হয়েছে বা হবে বলে আমার বিশ্বাস। জানত কোনো অন্যায়ের জন্য আমি লেখনী ধরিনি। দলবদ্ধও হইনি। কিন্তু জীবনে কারো প্রতি অবিচার করিনি এমন কোনো দাবি আমি করব না। কারণ আমার জীবিকা ছিল শাসন ও বিচার সংক্রান্ত। তাতে ভুল-ভ্রান্তি ঘটা বিচিত্র নয়। পরবর্তীকালে আমার মাঝে মাঝে আফসোস হয়েছে। এমন কিছু কিছু কাজ আমাকে করতে হয়েছে যা অত্যন্ত বিপদজনক।

কিন্তু সবচেয়ে বিপদজনক কাজটা আমি করিনি। সে কাজ করলে হয়তো প্রচুর রক্ত-ক্ষয় হতো। করতে অস্বীকার করেছি। কাজটা কেবল বিপদজনকই ছিল না, কাজটা ছিল ঘোরতর অন্যায়। আমার বিবেক পরিষ্কার রেখেই আমি চাকরি করেছি এবং চাকরি থেকে অকালে বিদায় নিয়েছি।

—অন্নদাশঙ্করের চাকরি থেকে অকালে বিদায় নেওয়ার কারণটা আরো একটু স্পষ্ট করে বলে নেওয়া যাক। অন্নদাশঙ্কর সরকারি চাকরির জীবনে কর্তব্য পালন করেছেন, কিন্তু সুখী হতে পেরেছেন কি? বোধ হয় পারেননি। চাকরির জীবনের conflict-এর কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। এছাড়া তাঁর একুশ বছরের চাকরি জীবনে একুশবার বদলি হয়েছেন। স্থিতি হয় তো আসেনি কিন্তু একটা লাভ হয়েছে দেশ দেখা, মানুষ চেনা। পারিবারিক দায় দায়িত্ব ছিল। যেদিন একটু হালকা হলো সেই দায়িত্ব—বুঝলেন যে, সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে পুরোপুরি সময় দিতে পারছেন না। এবং দুটি দিক যদি পাশাপাশি চালাতে হয় সেখানে অবশ্যম্ভাবী অনিচ্ছাকৃত ফাঁকি আসতে পারে। বিলম্ব না করে চাকরি ছাড়লেন। একুশ বছর উত্তীর্ণ হওয়ায় পেনসনও পাবেন—অন্তত পায়ের তলার মাটিটুকু থাকবে। ছেলেমেয়েরা তখনো ছাত্রছাত্রী।

একদা অন্নদাশঙ্কর লিখেছিলেন 'আমরা ইংরেজকে চাইনে, কিন্তু ইংরেজিকে চাই। আমরা কায়ায় ইংরেজ নই কিন্তু মনোবাক্যে ইংরেজ।' স্বাধীনতার ত্রিশ বৎসর পরেও কি অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে? স্বভাবতই অন্নদাশঙ্করের কাছে এই প্রশ্ন রাখতে হয়।

: স্বাধীনতার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের দেশ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। এই তিনটি খণ্ডকেই আমি সমান ভালোবাসি। এবং মনে মনে এক বলেই ভাবি। কিন্তু এই তিনটি দেশের কোনো সর্বজনস্বীকৃত ভাষা নেই। যেমন হিন্দি বা উর্দু।

জোর করে সরকার থেকে একটা ভাষা চাপিয়ে দেওয়া যায় না। সেটা করতে গেলে কী হয়, তা বাংলাদেশে দশ বছর আগে ঘটে গেছে। যতদিন না ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশের জনগণ সাধারণবোধ্য ভাষায় কথা বলতে শেখে ততদিন পর্যন্ত নেই-মামার চেয়ে কানা-মামাই ভালো। অর্থাৎ ইংরেজি। যা আমাদের কারুরই ভাষা নয় অথচ কাজকর্ম চালাবার পক্ষে কাজের লোকদের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধেজনক। এই ভাষাতেই শুধু তিন দেশের মন্ত্রীরাই কথাবার্তা বলেন না, বুদ্ধিজীবীরাও ভাব-বিনিময় করেন। শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য নয়, যদি কোনো দিন যুদ্ধ লাগে—তবে এই তিন দেশের সন্ধিপত্রও রচিত হবে এই ভাষাতেই। সুতরাং এ ভাষা আপাতত আমাদের Lingua franca থাকলেই ভালো। একদা ফরাসী ভাষা যেমন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সর্বসম্মত সাধারণ ভাষা ছিল।

একটু থামলেন অন্নদাশঙ্কর। কারণ এরই ফাঁকে মানুষজনের যাতায়াত। সৌজন্য-সাক্ষাৎ। লেখার জন্যে অনুরোধ। পত্রিকার জন্যে লেখা নিয়ে যাওয়া। সকলের সঙ্গেই কথাবার্তা, মুখে স্নিগ্ধ হাসি। তারপর এক সময়…

: যে কথা বলছিলাম। ভারতের মতো বহুভাষী দেশে সংস্কৃত ফার্সীর পরে ইংরেজি ভাষা যে কাজটি করেছে সেটাকে ইংরেজ শাসনের ভালো দিক বলে স্বীকার করতে হবে। যেটা ভালো সেটাকে বর্জন করা স্বাধীনতা নয়। যেটা মন্দ সেটাকে অবশ্যই বর্জন করেছি বা ক্রমে ক্রমে করছি। যেমন তাদের সাম্রাজ্যবাদ বা ধনতন্ত্রবাদ। কিন্তু ইংরেজ শাসনের অবসানের পর তাঁদের গণতন্ত্র আমরা বর্জন করিনি। আরো একটা ভালো জিনিস : ইংলণ্ডের লিবারাল ঐতিহ্য। নিখুঁত না হলেও ইংরেজদের আইন আদালত ব্যবস্থা মারাঠা অথবা মোঘল-দের থেকে ভালো। সেই জন্যে সেটাকে আমরা আঁকড়ে ধরে রয়েছি। যথাসাধ্য সংশোধন করছি। এ ছাড়া তাঁদের প্রবর্তিত স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির সাহায্যেই আমরা আধুনিক যুগের আলো বাতাস পেয়েছি—পাচ্ছি। তাই দেশের লোক মাদ্রাসা বা চতুষ্পাঠীর বিস্তার চায় না। চায় স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির বিস্তার।

কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ শহরগুলি ইংরেজদের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার। আরো এক উত্তরাধিকার Indian Army প্রমুখ যাবতীয় Indian Service. আর সবচেয়ে বড়ো উত্তরাধিকার আমার মতে Indian National Congress, যার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মিস্টার হিউম। ইনি উচ্চ সরকারি পদ ত্যাগ করে ভারতীয়দেরকে সংঘবদ্ধ করার জন্যে তৎকালীন সরকারের বিরাগভাজন হয়েও সর্ব প্রদেশের শিক্ষিত ভারতীয়দের সংঘবদ্ধ করেন। ভারতীয়দের ইচ্ছায় বিশ বছর ধরে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকও ছিলেন। আরো কয়েকজন ইংরেজ কংগ্রেসে ছিলেন এবং কংগ্রেসকে গণতন্ত্রের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। এরা সবাই মডারেট হলেও সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন না। ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দেবার কথা শতাধিক বর্ষ পূর্বে তৎকালীন বড়লাট লর্ড রিপন দেশে ফিরে গিয়ে বলেন। কাজেই আমরা আমাদের মোগল উত্তরাধিকারের মতো ব্রিটিশ উত্তরাধিকারকেও যথাযোগ্য মূল্য দেব—না দিলে আমাদের ক্ষতি। তাদের কোনো ক্ষতি হবে না। ইংরেজদের অধীনতায় থাকা এক জিনিস, আর তাদের কাছ থেকে যুগোপযোগী শিক্ষা ও সংস্কৃতি লাভ আরেক জিনিস। কিন্তু তাই বলে মনেপ্রাণে আমাদের ইংরেজ হতে হবে না। সেটা হাস্যকর।

চোখের থেকে চশমাটা নামিয়ে হাতের রুমালটা দিয়ে কাচ দুটো পরিষ্কার করছিলেন অন্নদাশঙ্কর। গুরুরূপে যে-দুজনকে বরণ করে নিয়েছিল তাঁদের একজন রবীন্দ্রনাথ: 'রবীন্দ্রনাথের বাণী সর্বদেশের সর্বকালের বাণী।' আর মহাত্মা গান্ধী। সরকারের উচ্চপদে যখন অন্নদাশঙ্কর আসীন, তখনই পরাধীন ভারতে আনুগত্য জানিয়েছেন গান্ধীর প্রতি। তাঁর লেখায়।

'ব্যাসদেব যদি বিংশ শতাব্দীর মহাভারত লিখতেন তো তার নায়ক করতেন এ যুগের যুধিষ্ঠিরকে। গান্ধীজীকে।' অন্যত্র অন্নদাশঙ্কর লিখছেন, 'ইতিহাসের গান্ধীযুগ শেষ হয়নি, শেষ হতে অন্তত এক হাজার বছর।' অন্নদাশঙ্করের জীবনে গান্ধীবাদ কতখানি জায়গা জুড়ে আছে? গান্ধীবাদ কি আজও সর্বত্র স্বীকৃত?

: অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজীর প্রভাবে আসি। খদ্দর ধরি। সঙ্গে সঙ্গেই হই রবীন্দ্রনাথের শিষ্য। দুই গুরু নিয়ে আমার দোটানা ছিল। কার কথা শুনব? দেশের দিক থেকে তথা জনগণের দিক থেকে বিচার করলে গান্ধীপন্থাই ছিল বরণীয় পন্থা, কিন্তু বিশ্বের দিক থেকে তথা যুগের দিক থেকে বিবেচনা করলে রবীন্দ্রপন্থা ছিল আমার কাছে শ্রেয়স্কর পন্থা।

পুরোপুরি গান্ধীবাদী কোনোদিন হইনি। হতে পারিনি। গান্ধীজীকে শুধুমাত্র স্বাধীনতা—যোদ্ধা হিসেবে দেখেছি তা নয়। সেরকম স্বাধীনতা-যোদ্ধা ভারত-ইতিহাসে অনেকেই আছেন। তাঁর মতো অহিংসাবাদী ভারতের ইতিহাসে অনেকেই ছিলেন। কিন্তু যেটা অভিনব তা হলো: ভারতবর্ষের নিরস্ত্র মানুষকে, দুঃস্থ শোষিত লাঞ্ছিত মানুষকে তিনি অস্ত্রশিক্ষা দিলেন। বন্দুক বা রিভলবারের দরকার নেই। কেবল Soul force থাকলেই হবে। আত্মার জোর। আপাতত দেশ স্বাধীন হয়েছে। আর্থিক স্বাধীনতা আসেনি। হয়তো এইভাবেই আসবে। যে সব সংগ্রাম জনগণের জীবনে বাকি আছে সেসব সংগ্রাম একে একে সত্যাগ্রহের রূপ নেবে। এই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে অনেক সময় লাগবে। শোষিত শাসিত সমগ্র বিশ্বের মানুষদের কাছে 'সত্যাগ্রহ'ই উপযুক্ত অস্ত্র। এই অস্ত্রের সম্যক প্রয়োগ করতে ও সুফল পেতে আরো এক শতাব্দী বা তার চেয়েও বেশি সময় লাগতে পারে। জনগণকে পরিপূর্ণরূপে মুক্ত করতে যদি কয়েক শতাব্দী লাগে তবে সেটা এমন কিছু বেশি সময় নয়। আবার কিছু কম সময়ও লাগতে পারে।

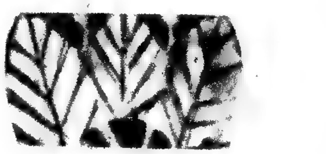

'যেখানে যা কিছু ঘটে অনিষ্ট/সকলের মূলে কমিউনিস্ট।' অন্নদাশঙ্করের ছড়া পড়ে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগতে পারে তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের বিষয়টি নিয়ে। হেসে অন্নদাশঙ্করের জবাব; কৌতুক করে লেখা। 'না, আমি কমিউনিস্ট নই। অ্যান্টি-কমিউনিস্টও নই। বরঞ্চ বলা ভালো রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রে আমি স্বাধীন।'

বঙ্গবিভাগ তথা ভারত বিভাগের পর অন্নদাশঙ্করের অনেক লেখাই প্রতিবাদের দলিল বলে মনে হয়। সেই অন্নদাশঙ্কর যখন লেখেন বঙ্গ বিভাগের পর 'তুমিই মোদের মেলাবে/আমরা তোমারি তো সন্তান।' তখনই মনে হতে পারে আজও কি অন্নদাশঙ্কর এই সত্যে বিশ্বাসী?

: আজও এই সত্যে আমি বিশ্বাস করি। বাঙালী একটা ঐতিহাসিক জাতি। এক হাজার বছর, আরো একটু সময়টাকে বাড়ালে দেড় হাজার বছর বাঙালীর বয়স। এই জাতির ভাগ্য ১৯৪৭-এ চিরকালের জন্যে নির্ধারিত হয়ে গেল! এ কখনোই হতে পারে না। আমাদের সামনে যদি আরো হাজার বছর থাকে তবে এভাবে চিরকাল থাকব না।

অস্বীকার করে লাভ নেই, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এক সময় অনাত্মীয় ভাব ছিল। আমি বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের কথাই বলছি। বাঙালী মানে হিন্দু এইটা প্রচ্ছন্নভাবেই আমাদের মনে কাজ করছিল। এক সময় মুসলমান বাঙালীদের ignore করা হয়েছে। ওঁরাও বাঙালী বলতে হিন্দুই বুঝতেন আর নিজেদেরকে উর্দুভাষীদের সঙ্গে একাত্ম ভাবতেন। তাঁদের নেতারা নিজেদের বাঙালী বলে পরিচয় দিতেন না। মুসলমান বলে পরিচয় দিতেন। তাঁদের এই 'বাঙালী বোধ' এল বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে। কার্জন-কৃত বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনার এটাই বোধহয় সবচেয়ে সুফল।

একটা ঘটনা উল্লেখ করি। শান্তিনিকেতনে আসতেন এক মৌলবী সাহেব। তাঁর কাছে শোনা। ভাগলপুরে থাকতেন এক বাঙালী মুসলমান উকিল। মুর্শিদাবাদের লোক। চোস্ত উর্দুতেই বাড়ির বাইরে কথাবার্তা চলে। নিজেকে উর্দুভাষী পশ্চিমা মুসলমান বলেই পরিচয় দেন। একদিন কোনো মৃত্যু সংবাদে বাড়িতে মেয়েদের কান্নাকাটি শোনা গেল এবং সেই কান্নাটা বাংলা ভাষায়। মৌলবী সাহেব সেদিন উকিলবাবুকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, সেই শোকের সময়েই—তা হলে তোমাদের কাজ-কর্মের ভাষা উর্দু কিন্তু কান্নার ভাষা বাংলা! এই ঘটনার উল্লেখ করলাম এই কারণে যে শুধু ঐ উকিল পরিবারটি নয়—বাঙালী মুসলমানদের মধ্যেও একটা ভাষাঘটিত দোটানা ছিল। সেই জন্যেই তাঁরা পাকিস্তান চান ও পরে পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসে স্বতন্ত্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেন।

পুনশ্চ প্রশ্ন: প্রগতিশীল সাহিত্য কি লেখা হচ্ছে? পশ্চিমবঙ্গে যখন প্রগতিশীল সরকার তখন যথেষ্ট পরিমাণে প্রগতিশীল লেখকদের দেখা যাচ্ছে কি? না পারিপার্শ্বিক ও রাজনৈতিক চাপেই প্রগতিশীল সাহিত্যের জন্ম?

: প্রগতিশীল সাহিত্য? নিশ্চয়ই, আগে হয়েছে, এখনো হচ্ছে। সে সব বিষয় কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডিতে বাঁধা নয়। বিষয়ের দিক থেকে বৈচিত্র্য এসেছে। ব্যাপ্তির দিক বেড়েছে। মেয়েরাও লিখছেন যথেষ্ট। নিশ্চয়ই প্রগতিশীল সাহিত্য হচ্ছে কিন্তু আগের মতো বিরাট কোনো কীর্তি হচ্ছে না।

সাহিত্যে 'শ্রেণী সংগ্রাম' কথাটিও খুব

চলছে। গল্পে উপন্যাসে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এ বিষয়ে অন্নদাশঙ্করের বলিষ্ঠ বক্তব্য: 'চিরন্তন সাহিত্যের সংজ্ঞা এত সংকীর্ণ নয়। এ দিয়ে ক্ষণকালের সাংবাদিকতা হয়—কিন্তু চিরকালের সাহিত্য নয়। সাহিত্যে গভীরতর সত্যের অন্বেষণ চাই।'

আজকের বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা সম্বন্ধে অন্নদাশঙ্কর বলেন, 'আমার কাজ আমার নিজের কাজ। তাঁরাও তাঁদের নিজেদের বিবেক অনুযায়ী কাজ করছেন।' বক্তব্যটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

গানের প্রতি অন্নদাশঙ্করের সহজাত আকর্ষণ আছে। লালন ফকিরকে নিয়ে লিখেছেন বিভিন্ন প্রবন্ধ। বাংলার লোকসংগীত কি অন্নদাশঙ্করের প্রিয় জিনিস অথবা তার মধ্যে কেবলমাত্র বাউল গান?

: বাউলটা লোকসংগীত কি না তর্ক আছে। আমি বলব তত্ত্বসংগীত। নিশ্চয়ই আমার ভালোলাগে। বাউল গান আবদ্ধ রয়েছে সাধারণ লোকের মধ্যে। শিক্ষিত লোক বাউল হয়ে বাউল-গান গান না, বোধহয় গাইবেন না। তাঁরা বরঞ্চ বৈষ্ণব হয়ে কীর্তন গাইবেন। পথেও গাইতে নামবেন। অথচ বাউল গানটা আমাদের একটা সম্পদ। আমার নিজেরই একটা জিজ্ঞাসা আছে। চণ্ডীদাসের গান কেন লোকসংগীত নয়?

সমকালীন কথা সাহিত্যিক ও কবিদের বিষয় নিয়ে প্রশ্নের ক্ষেত্রেও অন্নদাশঙ্কর তাঁর ভালোলাগা মন্দ লাগার চেয়ে মূল্য দেন পারস্পরিক সম্পর্ককে। 'সমকালীনদের কথা বলা উচিত নয়। অনেকেরই লেখা ভালো লাগে।'

এবার ছড়া প্রসঙ্গ। অন্নদাশঙ্করের বহু ছড়া পড়ে মনে হয় যে কথা অন্নদাশঙ্কর সাহিত্যের অন্য মাধ্যমে লিখতে গেলে যখন মনে করেছেন গুরু গম্ভীর হয়ে যাবে, অথচ বিবেক ও সত্যের খাতিরে লিখতেই হবে—সেখানেই ছড়া এসেছে। কী ভাবে? আজকের ছড়া সম্বন্ধে অন্নদাশঙ্করের অভিমত? ছড়ার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রভাব?

তিন প্রশ্নের উত্তরে অন্নদাশঙ্করের বক্তব্য: 'আমার ছড়া লেখার অনুপ্রেরণা যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমনির ছড়া' গ্রন্থটি। রবীন্দ্রনাথ নন। তাঁর ছড়া বরঞ্চ আমার কাছে কৃত্রিম লাগে। আমি তাঁকে অনুসরণও করিনি। আর ছড়া ব্যাপারটা পুরো গ্রামীণ সাহিত্য। বাড়ির বউ, রাখাল—মুখে মুখে ছড়া বানাত। লিখত না। অনেক সময় মিলের জন্যে কথা, অর্থের পারম্পর্য হারিয়ে গেছে। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত। আজকের শহুরে ছড়া বড়ো কৃত্রিম। বিভিন্ন কারণে ছড়ার আশ্রয় নিয়েছি। ছড়াকে নিয়ে experiment করেছি।

সিনেমা খুব কমই দেখেন অন্নদাশঙ্কর। 'যা দেখি তা সাধারণত সত্যজিৎ রায়ের ছবি।' আজকের চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে: 'আমার পক্ষে

পুরো নাম :
অন্নদাশঙ্কর রায়।

জন্ম মাস / বর্ষ :
১৫ মার্চ, ১৯০৪।

জন্মস্থান :
ঢেঙ্কানাল, ওড়িশা।

স্ত্রীর নাম :
লীলা রায়।

আদি বাসস্থান :
কোতরং, হুগলী জেলা।

জীবিকা :
ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস থেকে অবসৃত পেনসন এবং লেখা।

লেখার সময় :
যখনই লেখার মুড আসে।

নেশা :
একমাত্র চা।

পছন্দ :
এককালে টেনিস খেলা। এখন একটু হেঁটে বেড়ানো।

অপছন্দ :
কোলাহল এবং অসৎ লোক।

প্রিয়জন :
আমি যে ধরনের কাজ করি সেই ধরনের কাজে যাঁদের উৎসাহ।

বন্ধুবান্ধব / ঘনিষ্ঠজন :
জন-কয়েক আছেন। যেমন মনীন্দ্রলাল বসু, ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি হরিহর মহাপাত্র, কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী এবং ওড়িশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবকৃষ্ণ চৌধুরী।

ভয় :
যাঁরা ক্ষমতার আসনে বসে ক্ষমতার অপব্যবহার করেন তাঁদের।

আনন্দ :
আমি যখন নতুন কিছু সৃষ্টি করি—সেই সৃষ্টির আনন্দেই আমার জীবনের আনন্দ।

প্রিয় খাবার :
নানারকম ফল।

প্রিয় গ্রন্থ / লেখক :
চেখভের গল্প। টলস্টয় ও ডস্টয়ভস্কির উপন্যাস। গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর রচনা।

আনন্দদায়ক স্মৃতি :
যৌবনে বিভিন্ন নারীর সঙ্গে প্রেম। স্থান-কাল-পাত্র উহ্য থাক।

বেদনাদায়ক স্মৃতি :
দ্বিতীয় পুত্র চিত্রকামের শৈশবে অকাল মৃত্যু।

সাহিত্যে অনুপ্রেরণা :
প্রধানত প্রেমই প্রেরণা দিয়েছে। দ্বিতীয়ত দেশভ্রমণ। পরবর্তীকালে স্ত্রীর প্রেরণা।

সখ :
সব ধরনের গান-বাজনার রেকর্ড কেনা।

প্রিয় গান :
বৈষ্ণব পদাবলী ও রবীন্দ্রসংগীত।

প্রিয় কবি :
শেলী আর কীটস। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ।

প্রিয় গদ্য লেখক :
টলস্টয় ও প্রমথ চৌধুরী।

স্মরণীয়তম অভিজ্ঞতা :
দেশ যেদিন স্বাধীন হয় সেদিন হাওড়া ময়দানে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্যে নিয়ে যান সেখানকার বিশিষ্ট নাগরিকেরা। একজন সরকারী কর্মচারী বা জেলা-জজ বলে নয়, আমি একজন দেশপ্রেমিক বলে।

বলা ঠিক হবে না'—বললেন অন্নদাশঙ্কর।

ঃ নাটক ? বর্তমানে বাংলা সাহিত্যে মৌলিক নাটকের অভাব অনুভব করেননি ?

ঃ নাটক দেখি। ধরে-টরে নিয়ে যায়। বহুরূপী, নান্দীকার, নান্দীমুখ—আর সবিতাব্রত দত্তর দল, কি নাম—হ্যাঁ, রূপকার, এ'দের নাটক দেখেছি।

বাংলাদেশে নাটক লেখা কোনো কালেই হতো না। নাটুকেপনা একটা জিনিস, নাটক আরেক জিনিস। যথার্থ নাটক ? এই মুহূর্তে মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'। নাটক যে কেন হয় না, জানি না। আমার লেখার ইচ্ছে ছিল ; কিন্তু সময়ের অভাবে হয়ে ওঠেনি। মনীন্দ্রলালকেও বলেছিলাম। আসলে যাঁদের কলমের জোর আছে, নাটক হয়তো ভালো লিখতে পারতেন তাঁরা কিন্তু উপন্যাসের প্রলোভন ত্যাগ করতে পারেন না।

পাবলিক স্টেজে ভালো নাটক ? অসম্ভব। সেখানে কে নাটক লিখছেন বড়ো কথা নয়, কে কে অভিনয় করছেন বড়ো কথা। নাটুকে-জাতীয় নাটক স্টেজে হিট করে, তার ফিল্মও হয়। বিদেশে ইবসেন বা বার্নার্ড শ দু'দিক মেলাবার চেষ্টা করেছেন। আমাদের কিন্তু সত্যিকারের নাটক লেখবার ট্রাডিশন আগে বেড়ে ওঠেনি।

এই প্রসঙ্গে নাট্যকার অন্নদাশঙ্করের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ১৯৫৪-তে প্রকাশিত কাব্যনাট্য 'রাতের অতিথি'। ১৯৫৫-তে চারটি নাটকের সংকলন 'চতুরালি'। চারটি নাটকই কৌতুককর : দম্পতি, ওলটপালট, হাসব না কাঁদব, হাওয়া বদল। নাট্যকাব্য লেখার ইচ্ছা ছিল অন্নদাশঙ্করের। 'কিন্তু সম্ভব হয়নি'

আজকের বহুল-প্রচারিত 'অপসংস্কৃতি' কথাটি সম্বন্ধে অন্নদাশঙ্করের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট : 'এ-বিষয়ে বলতে গেলে কমার্শিয়াল সেক্স-এর প্রসঙ্গ এসে পড়বে। ভালো কিছু করতে হয় করুন। কিন্তু কিছু করতে না পেরে যৌনবিষয়কে মূলধন করে নাটক করা সাহিত্য করাকে আমি অপসংস্কৃতির মধ্যে ফেলব। কিন্তু এ-সব বিষয়ে সরকারই প্রকৃষ্ট বিচারক নন। এমনও হতে পারে অশ্লীলতার দায়ে তাঁরা ভালো নাটককেও অপসংস্কৃতির কোটায় ফেলবেন।

ঃ আজকের যুবমানস ?

ঃ ভীষণ প্রাণবন্ত। কিন্তু ভালো guidance পাচ্ছে না। এ যেন অন্ধ চালাচ্ছে অন্ধকে। শান্তিনিকেতনের কথাই ধরা যাক। শান্তিনিকেতন দিনে দিনে অচলায়তন হচ্ছে। চারদিকে বেড়া। কারণ সব ধ্বংস করা হচ্ছে। আমি কি করেছি ? যখন কেউ লিখত না, আমি লিখেছি। প্রতিবাদ করেছি। সভা করেছি।—কিন্তু এটা তো শেষ কথা হতে পারে না।

ঃ এখন কী করছেন ?

ঃ বড়ো উপন্যাস লিখছি। চার খণ্ডে। মোটামুটি সময়সীমা ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৮। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায়। গান্ধীজী আছেন। সেই সঙ্গে স্বাধীনতার যুদ্ধ। হিন্দু-মুসলমানের কথা এবং ব্যক্তিগত কথা।

'কেমন ছিলেন, কেমন আছেন ?' এই শেষ প্রশ্নের উত্তরে অন্নদাশঙ্কর বললেন, 'এ-প্রশ্নের কোনো সঠিক উত্তর কি এত অল্পে দেওয়া যায় ? একটু থামলেন মানুষটি। রুমাল নয়, পাঞ্জাবীর প্রান্ত দিয়ে চশমাটার কাঁচ মুছতে মুছতে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'সবই পালটাচ্ছে। মানুষের মূল্যবোধও। নানা ভাঙাগড়া, নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেমন থাকার কথা তেমনি আছি।

চোখ তুলে তাকালেন অন্নদাশঙ্কর যে চোখ দুটি গভীর আত্মপ্রত্যয়ের দর্পণ। কী ভাবছিলেন মানুষটি ? মনে মনে স্মরণ করছিলেন কি নিজেরই লেখা সেই দুটি ছত্র : 'ভাগাভাগির ভাঙাভাঙির / চলছে যেন হরির লুট।

সাক্ষাৎকার ঃ সুমিত মজুমদার

আলোকচিত্র ঃ সুধীর চ্যাটার্জি

মানুষ কেন মুখোশ বানিয়েছিল ?

আদিম মানুষ প্রথম মুখোশ পরেছিল সম্ভবত শিকারের প্রয়োজনে। ঠিক মুখোশ নয় একটা পশুর মাথা বা চামড়া। কিন্তু উদরপূর্তির পরেও অন্য উদ্দেশ্য আকাঙ্ক্ষা রয়ে যায় মানুষের। ক্রমে ইচ্ছাপ্রণোদিতভাবেই সে তৈরি করল খাঁটি মুখোশ। এর পিছনে কাজ করেছে দুটি বিশ্বাস—অ্যানিমিজম বা সর্বপ্রাণবাদ আর টোটেমিজম বা গোষ্ঠীচিহ্ন। আদিমরা বিশ্বাস করত মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা অদ্ভুত আকৃতির পাথর বা কাঠের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে সমাজের অনিষ্ট করে। এই ভৌতিক আত্মার প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পূজারী বা জাদুবিদদেরও হতে হলো দৈবশক্তির অধিকারী। আর আত্মার সঙ্গে কাজকারবার চালানোর জন্য তৈরি হলো মুখোশ। অপর-দিকে, গোষ্ঠীসংখ্যা যেই বাড়তে থাকল প্রয়োজন হলো গোষ্ঠীচিহ্নের। চিহ্নস্বরূপ গৃহীত হলো পশুপাখির আকৃতি। আর মুখোশ হলো সেই চিহ্নেই। বস্তুত মুখোশের আড়ালে প্রাচীন মানুষ খুঁজেছিল নিরাপদ আশ্রয়। ক্রমে তাদের সামাজিক জীবন ও আমোদ-প্রমোদে মুখোশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিল।

অতি প্রাচীন মিশরে 'ওসিরিস প্যাশন প্লে'র অভিনেতারা বিভিন্ন পশুপাখির মুখোশ পরে নিত। দেবোপম বীরচরিত্র বা দেবতারা পরতেন বাজপাখি, গোরুর মুখোশ। শত্রু পক্ষীয়রা ছিল মুখোশহীন। গ্রীসেও প্রাথমিক

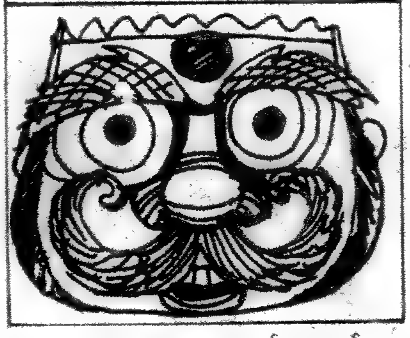

খোরাসের নাচের আসরে পুরোহিতের পরিধেয় ছিল ছাগচর্ম আর মাথা। ট্রাজেডিতে ব্যবহার হতো গভীর বিষাদময় ভাবদ্যোতক মুখোশ। জাপানের 'ক্ল্যাসিকাল' নাটকেও উন্নত ধরনের মুখোশ ব্যবহৃত। তাছাড়া ভারতের 'কথাকলি' নাচে আজও এর প্রয়োজন। ইউরোপীয়রা মুখোশ পরেছে এই বিংশ শতাব্দীতেও বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় ও পেগান উৎসবে ; ইতালীতে পরেছে 'কম্মেদিয়া দেল আর্তের' অভিনেতারা।

এযাবৎকাল বহু বিচিত্র জিনিষে মানুষ মুখোশ বানিয়েছে। যদিও কাঠই ছিল সবচেয়ে প্রিয়, তবুও চামড়া, খণিজ দ্রব্য, পাথর, কচ্ছপের খোলা, মাটি, কাপড়, চট, নারকেলের ছোবড়া, পাখির পালক—এমনকি মানুষের মাথার খুলিও লেগেছে একালে। নিগ্রো আর এস্কিমোরা ছিল এ বিষয়ে সবচেয়ে পটু। মায়া, টেলটেকস আর অ্যাজটেকস জাতিরা শান্ত, সুন্দর করে গড়ে তুলত মুখোশ। তারা মুখোশ বানাতো অবসিডিয়ান, জাড, গ্রানাইট প্রভৃতি পাথরে ; কখন বা কাঠ বাঁকিয়ে তাতে উজ্জ্বল পাথরের মীনা করে। আমেরিকার রেড-ইনডিয়ানদের চামড়ার মুখোশে বিচিত্র ইঙ্গিতবহ চিহ্ন আঁকা থাকত। উত্তর প্রশান্ত-মহাসাগরীয় রেড-ইনডিয়ানদের মধ্যে আজও মুখোশের ব্যবহার বহুল। ক্যানাডার দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে, আলাস্কায় আজও পুরো মুখোশ নাটকের অভিনয় হতে দেখা যায়।

বিশিষ্ট বাঙ্গালী কবি ঃ নির্বাচিত কবিতা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কবির জন্ম ১৯০৪ সেপ্টেম্বর ঃ বারাণসী। পিতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র, মাতা সুহাসিনী। কোন্নগরের মিত্রবংশোদ্ভূত প্রেমেন্দ্রর শিক্ষা শুরু উত্তরপ্রদেশের মীর্জাপুরে—দাদামশায় ডাঃ রাধারমণ ঘোষের কাছে থেকে। পরে পড়েন বীরভূমের নলহাটি, কলকাতা ও ঢাকায়, কখনো কলাবিভাগে, কখনো বিজ্ঞানশাখায়। উচ্চতর অধ্যয়ন অসমাপ্ত। প্রথম যৌবনে দারুণ দারিদ্র্য ও নিয়ত অস্থিরতার মধ্যে লেখক-জীবন ও জীবন-সংগ্রাম একত্র-সূচিত : —'কল্লোল'-'কালিকলম' যুগ-প্রতিনিধিত্ব তখনকার। প্রাণপণ বন্ধুপ্রেম বা 'কমরেডশিপ' ও 'বোহেমিয়ানিজম'-এর একটা আশ্চর্য হাওয়া এসেছিল সে-যুগে। তার ছায়ায় প্রেমেন্দ্র প্রভৃতির উত্থান ও অভ্যুদয়। জীবিকাক্ষেত্রে প্রথম ও মধ্যপর্ব কবির অতিক্রান্ত হয়েছে অনুরূপ অনিয়মে, বেপরোয়া বিশৃঙ্খলায়। টালিখোলার সামান্য কাজ, স্কুল-মাস্টারি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ দীনেশ সেনের গবেষণা-সহকার, সুভাষচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত 'বাংলার কথা' দৈনিকের সহ-সম্পাদক ১৯২৮ ; পরে 'বঙ্গবাণী'র সম্পাঃ ; 'কবিতা' পত্রিকার ১ম বর্ষে বুদ্ধদেব-প্রেমেন্দ্র যুগ্ম-সম্পাদনা ১৯৩৫ এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্য-সহকারিত্বে, 'নিরুক্ত'র। আধুনিক রবীন্দ্রোত্তর কাব্যান্দোলনে তাই অন্যতম পথিকৃতের সম্মান তাঁরও। এদিকে বাংলা সিনেমা জগতেও কবি জড়িয়েছেন নিজেকে। কাহিনী ও গান দিয়ে, চিত্রনাট্য লিখে, ছবির পরিচালনা-প্রযোজনা করেও। একটি ফার্মাসিউটিক্যালস-এর প্রচারসচিবত্ব ; পরে আকাশবাণীর প্রোডিউসার ও অবশেষে পূর্বাঞ্চলীয় সলাহকার বা অ্যাডভাইসাররূপে অবসৃত। কিছুদিন হলো বিপত্নীক ঃ স্ত্রী বীণা সামাজিক-পারিবারিক দিক থেকে সুগৃহিণী ছিলেন।

১৯৩২ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। কালানুক্রমিক ঃ প্রথমা, সম্রাট, ফেরারী ফৌজ, সাগর থেকে ফেরা, হরিণ চিতা চিল, কখনো মেঘ, অথবা কিন্নর, নদীর নিকটে, নতুন কবিতা। সংকলন ঃ শ্রেষ্ঠ কবিতা, ছয় দশকের কবিতা।

'সাগর থেকে ফেরা' সাহিত্য অকাদেমি কর্তৃক পুরস্কৃত (১৯৫৭)। তাছাড়া বিভিন্ন উপলক্ষে শরৎ, রবীন্দ্র, সোভিয়েতদেশ নেহরু, আনন্দবাজার এবং এ বর্ষের শরৎ সমিতি পুরস্কার পেয়েছেন। বেলজিয়ামের ব্রাসেলস-এ 'ওয়ারলড পোয়েট্রি ফেসটিভ্যাল'-এ ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব এবং আমেরিকা-রাশিয়ায় আমন্ত্রিত অতিথি।

বাংলা ছোটগল্প ও কথাসাহিত্যে প্রথম সারির প্রধান ব্যক্তি প্রেমেন্দ্র রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় একটি বহুশ্রুত প্রতিশ্রুতি-প্রত্যয়ের নাম, প্রতিষ্ঠা। বিশের দশক (১৯২৫-২৬) থেকে এ-পর্যন্ত তিনি ক্রমাগত 'রাত্রির প্রহরী'কে দ্বার খুলতে বলেছেন স্পর্ধায়, সাহসে—দেশকালপাত্র মূল্যায়নে ও আত্মবিশ্লেষণে সেসব অমোঘ। বুদ্ধিবিদ্যাজীবী-মধ্যবিত্তের শক্ত স্বতোবিরোধ ও আত্মখণ্ডন, 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' বাধ্যবন্দীত্ব, 'শ্মশানে-বন্দরে' নিঃসঙ্গ নাবিকি এবং 'বিদ্যুৎ-বিস্ময়', আধুনিক জীবনের গ্রন্থিল জটিলতায় 'নেশা' ও 'পরম পাওয়ার এষণা'-সংযোগ, প্রাচ্য ঋষি ও পাশ্চাত্য মনীষীদের (ফ্রয়েড, মার্কস প্রমুখ) অনুপ্রেরণায় যুগপৎ সমাজ ও আত্মসমীক্ষার 'অন্বয়'-'প্রত্যয়'। ফলে তাঁর অভীষ্ট-অন্বিষ্টে ক্রমাগত 'গূঢ় অনুভব', 'গূঢ় সত্তার পরিচয়', 'গূঢ় এক দীপ্ত অনুভব' বাগর্থমালা ; যার পুনরাবৃত্তি- প্রয়োগে তাঁর মৌলিক স্বাক্ষর, শিলমোহর বিম্বিত। নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের আমেদাবাদ অধিবেশনে 'কবিদের জবানি'তে প্রেমেন্দ্র ঃ 'নিছক নতুনের নেশায় বিচার-বুদ্ধি যাঁদের আচ্ছন্ন নয়, হুজুগের স্রোতকে ঠেকাতে ধ্রুব শিল্পসত্যের উপর দৃঢ়পদে এগিয়ে নয়, পিছিয়ে দাঁড়াবার সাহসই···দরকার।' এই 'দৃঢ়পদে' 'পিছিয়ে দাঁড়াবার সাহসী' কবিদলে আলোচ্য কবি একজন প্রকৃষ্ট-প্রবল অগ্রণী। সঙ্গে মিলেছে তাঁর বিশ-শতক-স্বভাবী 'বিষয়ীর' চেয়েও 'বিষয়ের আত্মতা'।

সম্রাট

সমবায় সমিতির সদস্য,
বিরাট যৌথ কারবারের ভগ্নাংশের অংশীদার !
লাভের অংশ মেলে, তার ঘোচে দুর্ভাবনা।
সমবায়ে সুখ আছে আর আছে শান্তি
যত পারো গড়ো সমবায় সমিতি সুতরাং।
কিন্তু সাম্রাজ্যও যে চাই আমার।
তোমার আমার সকলের চাই সাম্রাজ্য।
শুধু সদস্য আমরা নই, আমরা যে সম্রাট !
শুধু লভ্যাংশে মন ভরে না, চাই সাম্রাজ্য
বিধাতার সাথে সেই তো আমাদের চুক্তি !

একচ্ছত্র অধীশ্বর আমার সাম্রাজ্যের—
সে সিংহাসন থেকে আমায় চেও না হটাতে :
সমবায় সমিতি সেখানে যেন না দেয় হানা,
তাহলেই বাধবে কুরুক্ষেত্র।

এখনও কুরুবর্ষ আছে পড়ে—অজেয় আত্মার
অরণ্য-পর্বত !

বেড়া দিয়ে তাকে জরিপ করা যায় না,
সমিতির শাসন মানে না সে সীমাহীন 'স্টেপ'
বশ মানে না তার বন্য ঘোড়া !
সেখান থেকে শক হূন তাতারের বন্যা
আবার আসবে নেমে,
ভেসে যাবে নগর, ভেসে যাবে সভ্যতা,
সমিতি আমার সাম্রাজ্য যদি না মানে।

পলাতক

বজ্রগর্ভ মেঘ এক কাল রাত্রে এসেছিল
নগরের 'পরে,
ক্ষিপ্ত দানবের মতো ঘুরে ঘুরে কারে যেন
করিল সন্ধান।
রুদ্ধশ্বাস নগরের দীপগুলি গেলো নিভে
সভয়ে কম্পিত ;
বিছানায় জেগে বসে শুনিলাম ফুকারিছে
যেন কার নাম।

অন্ধকার চূর্ণ করে বজ্রাগ্নি জ্বালিল কত,
ব্যর্থকাম তবু
ফিরে গেলো অবশেষে, শেষ অভিশাপ রেখে
অশান্ত তুফানে।
ঘুম আর এলো নাকো ; ঝটিকার আস্ফালনে
সারা নিশি ভোর
সমস্ত আকাশে যেন মুহুর্মুহুঃ উচ্চারিত সেই
এক নাম।

সে নাম শুনিনি কভু, তবু যেন মনে হয়,
নয় সে অচেনা :
এই নগরের পথে তারে যেন কোনোদিন
দেখেছি কোথাও।
কোন্ স্বর্গ-বঞ্চনার পাতকে সে পলাতক
দেবরোষ হতে,
বজ্রগর্ভ মেঘ কাল শঙ্কিত নগরে যার
হেঁকে গেলো নাম !

ইঁদুরেরা

ইঁদুরেরা সারারাত অন্ধকারে চরে।
ঊর্ধ্বশ্বাস ছোটা আর রুদ্ধশ্বাস থামা,
দুরুদুরু বুক নিয়ে বিস্ফারিত চাওয়া—
ইতস্ততঃ বিতাড়িত যেন সব
ছোট-ছোট হীন তুচ্ছ ভয়,
জীবনের সূত্রে গাঁথা, তবু মৃত্যুময়।

সারারাত অন্ধকারে
শুনি তারা করে খুটখাট,
দুর্বল লোভের গ্রাসে লুট করে
ভাঁড়ার ও মাঠ
তারপর কণা-কণা রাত্রি মুখে করে
ফিরে যায় আপন বিবরে।

কোন্ এক আদি যুগে আশ্চর্য সকাল
হঠাৎ ছড়িয়ে দিয়ে রোদ মাখা উৎসুক দিগন্ত.
এদেরও তো দিয়েছিলো ডাক!
পাখিদের ঝাঁক
সহসা ডানার শব্দে সচকিত করেছে প্রান্তর।
একবার চোখ তুলে ভীত ত্রস্ত পায়ে
এরা ফের খুঁজেছে বিবর।
রাত্রির সঞ্চয় নিয়ে
এই সব শঙ্কাতুর আবছায়া মন
শুধু প্রাণ-দ্রোহ করে সুগভীর আঁধারে লালন।
দিনের তপস্যা হতে যত বাড়ে উজ্জ্বল প্রহর
ভরাট হয় না তবু জীবনের আদিম বিবর।

মুখ

একটা মুখ কাঁদায় হয়ে শীতের রাতে
পথে অনাথ শিশু,
মেলায় বাজিকরের খেলায় একটা মুখ
মুখোস পরে হাসায়।
খেয়ার নায়ে ওপারে যেতে হবে যে কোন ভিড়ে
একটা মুখ এক নিমেষে অকূল স্রোতে ভাসায়!
কার সে মুখ, কার?
জানে কি তারা-ছিটোনো অন্ধকার!

সে মুখ যারা দেখেনি তারা জানে না জ্বালা
নিদান যার নেই।
শীতের দিনে পোহায় রোদ উঠোনে বসে
আরামে কাঁথা গায়,
ঝুমকো লতা দেয়ালে তোলে, মরাই রাখে ভ'রে,
ফল কি ফুল পাড়তে শুধু নাগাল ডাল নামায়।
হোক সে-মুখ যার,
অনিদ রাতে কাঁপে না অন্ধকার।

সে মুখ যার পড়েছে চোখে ঘরেই থাকে
যায় না সেও বনে,
বসত করে পাঁচিল ঘিরে, হিসেব করে পুঁজি
যা আছে ভাঁড়ায়
তবুও কোন হতাশ হাওয়া একটা ছেঁড়া ছায়া
তারার ছুঁচে সেলাই ক'রে রাত্রি জুড়ে টাঙায়।
কার সে ছায়া, কার?
প্রাণেশ্বরী পরমা যন্ত্রণার।

ছোঁয়া

সারাদিন ঘেঁষাঘেঁষি মানুষের ভীড়ে
কত ছোঁয়া লাগে সারা হৃদয়ে শরীরে।

রাত হলে একা ঘরে এসে
একে একে সব দাগ মুছে দেখি শেষে,
একটি গভীর ছোঁয়া তবু লেগে আছে
হৃদয়ের একেবারে কাছে।
যে শহরে শুধু ধুলো ধোঁয়া,
সেখানে কোথায় এই ছোঁয়া
লেগেছিলো কার?
কত ভাবি তবু মনে পড়ে নাকো আর।
অপরিচিতের এই উদাসীন অচেনা নগরে
কাটালাম বহুদিন প্রবাসীর মতো,
শুনেছি অনেক নাম, ভুলে গেছি কত,
একা একা হেঁটে হেঁটে গেছি কত দূর,
তবু এতদিন দেখা পাইনি সে একটি বন্ধুর।

চোখ তারে চেনে নাকো
মন তার জানে না প্রমাণ।
চেতনার অন্য পিঠে শুধু
আজীবন বয়ে ফিরি সুগোপন এক অভিজ্ঞান।
অগণন মানুষের ভীড়ে
কখন সে অভিজ্ঞান হলো বিনিময়
আনমনা জানে না হৃদয়।
তারপর নগরের দুটি বাতায়নে
একটি অতল রাত্রি বয় দুটি মন থেকে মনে।

দুপুর

রাস্তা পিচের, বাসটা নতুন
ঝাঁকানি নেই।
ভীড় কি ছিল?
ফোস্কা-পড়া তাত,
হলকা-ওঠা আগুরা-রাঙা ডাঙা
চোখ ঝলসায়, মন ঝিমঝিম
কোথায় যে গেছলাম!

নেইকো মনে। অনেক যাওয়া-আসায়
জলন্ত এক ছায়া-শোষা তেষ্টা-ফাটা দুপুর।
শেষ নেইকো ঊর্ধ্বশ্বাসের পারেও।

ভাঙা ঘরটা, চাল নেইকো, দরজা হাঁ হাঁ
ফোকর,
শুকনো নালা, ন্যাড়া সজনে, ধ্বসা ইটের পাঁজা,
খাঁ খাঁ রোদে ঝিমোয় দূরে গ্রাম।
দিক-ভোলানো দুপুর বেলায়
কোথায় যে গেছলাম!

ঠিকানা আজ না থাক মনে
স্মৃতির তেপান্তরে,
হারিয়ে-যাওয়া সেই দুপুরের
আগুন ঝরে।
শ্যাওলা ঘাটের কত দীঘির
শীতল কালো জল,
কত নদীর হঠাৎ অবাক নীল
ঘন মেঘের সবুজ আঁধার
লেপে লেপেও তবু
জ্বালার আরাম কই!

দারুণ দিনের সেই যাওয়া যে কাকে খুঁজতে
যাওয়া
নেইকো মনে, জ্বলে শুধু আজও
খোঁজ-না-পাওয়া।

অন্ধকার

ওরা অন্ধকার বেচে।
বিক্রি হয় অন্ধকার
প্রকাশ্য ও গোপন বাজারে
নানান মোড়কে মোড়া রঙীন লোভন,
কত না লেবেল-এ!
এ নয় সে তমস্বিনী, আদিম অশেষ,
কোটি কোটি নীহারিকা গর্ভে ধরা
সৃষ্টির জননী:
কিংবা নয় আমাদের খদ্যোত-আয়ুর
ক্লান্ত ক্লিষ্ট চেতনায় নিরাময় পবিত্র গাহন—
নক্ষত্র ছিটানো মহানিশা।
আর-এক অন্ধকার,
পৈশাচিক মস্তিষ্ক ও মেশিনে প্রস্তুত
তাল তাল, ফেরি করে সুচতুর বণিকের চর।
আমাদের চিন্তায় ও ধ্যানে
স্বপ্নে জাগরণে
তিল তিল ক'রে তাই
মিশিয়ে দেয় সংক্রামক জীবাণুর মতো।
বিস্ফোরিত প্রজননে সেই বিষ-বীজ
শিরায় শিরায় প্রবাহিত,
আমাদের চৈতন্যের রক্তে রক্তে শনি হয়ে থেকে
সব আলো একে একে শোষে।
শতাব্দীর চতুর্থ প্রহরে,
আঁধারের বণিকেরা এখনো অবাধে
হাটে হাটে সওদা নিয়ে ফেরে!
কই, কোথা সংশপ্তক সেনা?

নির্বাচন ও সম্পাদনা:
নিখিলকুমার নন্দী

সাহিত্য বিতর্ক

বঙ্কিমচন্দ্র কি ইসলাম বিরোধী ছিলেন ?

মোল্লাবাদ ও ইসলাম এক নয়

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদনা করেন ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল থেকে ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের মার্চ পর্যন্ত। 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতটি সম্ভবত রচনা করেন ১৮৭৫-এ, পরে গানটি আনন্দমঠে ব্যবহৃত হয় ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে। মুসলমানরা এই গানটি গ্রহণ করলেন না, কেন না গানটির মধ্যে দেশকে জননী হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে এবং এর মধ্যে প্রতীকবাদ বিদ্যমান—মুসলমানরা প্রতীকত্বে বিশ্বাসী নন। ইসলাম ধর্মের মূল কথা, আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, তিনি নিরাকার, তিনি সর্বজ্ঞ, তিনিই বিশ্ব-মহাবিশ্বের স্রষ্টা, পালনকর্তা এবং ধ্বংসকারী —তিনি নিজে কারো সন্তান নন, তাঁরও কোনো সন্তান নেই—যদিও তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকে তিনি মমত্ব দিয়েই সৃষ্টি করেছেন : মুহম্মদ তাঁর প্রেরিত-পুরুষ এবং সর্বশেষ পয়গম্বর—তাঁর পূর্বেও আরো অনেক প্রেরিত পুরুষকে তিনি পাঠিয়েছেন। মানুষ তাঁর সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী—জিন এবং ফেরেস্তাগণও তাঁরই সৃজিত, ফেরেস্তাগণ তাঁর আজ্ঞাবাহী। অর্থাৎ ইসলাম একেশ্বরবাদী ধর্ম। অথচ ইসলামে প্রতীকবাদ একেবারে নেই একথা বলা চলে না। মুছা আল্লাহর দর্শন পেয়েছিলেন, মুহম্মদও মেরাজে গিয়ে তাঁর দর্শন লাভ করেন—এই দর্শন কি নিরাকারের দর্শন ? তাছাড়া দেশকে জননী হিসেবে কল্পনা করবার প্রয়াস প্রচ্ছন্ন ভাবে কোরানে আছে—রসুলের বাণী, যার নাম হাদিস, সেখানেও আছে। আল্লাহ শব্দটির ইতিহাস বিশ্লেষণ করলেই আমরা দেখতে পাই, শব্দটি নিরাকার কোনো অস্তিত্বের সাথে নয়, বরঞ্চ সাকার-এর সাথেই একদিন জড়িত ছিল—শব্দ মাত্রেই বস্তু বা ভাবসাপেক্ষ—ভাবও বস্তুনিরপেক্ষ নয়। তথাপি একথা মানতেই হবে যে, স্রষ্টার নিরাকারত্বের দৃঢ়-প্রত্যয় নিয়েই ইসলামের যাত্রারম্ভ। কিন্তু দেশকে জননী ভাবলেই সেই নিরাকারত্বে আঘাত লাগবে, এ শিক্ষাও ইসলামের নয়। গোঁড়া মোল্লাদের। মোল্লাবাদ ও ইসলাম এক নয়। ইসলাম যখন পারস্যে এসেছে, পারস্যের এমন অনেক চিন্তাভাবনা, আচার-অনুষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে মুসলমানগণ আপন করে নিয়েছেন যার মধ্যে আল্লার এককত্বে আস্থা সত্ত্বেও অনেক প্রতীকত্বই প্রবেশ লাভ করেছে। ফারসী খোদা শব্দটি তো প্রতীকবাদী। ফারসী নমাজ শব্দটি সংস্কৃত নমস (যা থেকে নমস্কার) শব্দ থেকে উদ্ভূত। অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে যখন ইসলাম এসেছে ভারতবর্ষে। ভারতীয় মুসলমানদের আচার-অনুষ্ঠানে, চেতনায়-বিশ্বাসে, সামাজিক রীতি-নীতিতে এবং সংস্কৃতিতে ভারতীয় ঐতিহ্যের বলিষ্ঠ ছাপ অব্যাহত। তথাপি, দুর্ভাগ্য যে, বঙ্কিমের বন্দেমাতরম সঙ্গীতটি মুসলমানদের দ্বারা গৃহীত হলো না। দেশ জননীর বন্দনায় তাঁরা অংশ নিলেন না।

অথচ মধ্যযুগের সমগ্র বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের প্রতীকত্ব সম্পর্কে এমন গোঁড়ামী কোথাও ছিল না। দৌলত উজির বাহরাম খান তাঁর লায়লামজনু কাব্যে (আনুমানিক ১৫৪৫-৫৩) পুত্রকামনায় কএসের পিতার প্রার্থনায় যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা এরকমের 'নিরঞ্জন নাম জপে জানিয়া সফল,' অথবা, 'ধর্মপদ ভাবএ সারতত্ত্ব জ্ঞানে'। এই কাব্যে জন্মান্তরবাদ, অদৃষ্টবাদ এবং আল্লাহ শব্দের স্থানে সর্বত্র বৌদ্ধ প্রভাবজ ধর্ম, নিরঞ্জন ব্যবহৃত হয়েছে, আরাধনার কথা বলতেই দেবধর্মের কথা উল্লেখিত হয়েছে। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের রচয়িতা শা'বিরিদ খান (আনুমানিক ১৫৩০-৫০ খ্রীঃ), সর্বত্র প্রণাম, প্রভু, ব্রহ্ম অরবিন্দ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন। বিখ্যাত কবি দৌলত কাজীর সতীময়না ও লোর চন্দ্রানী (১৬৩০-৩৮) কাব্যের প্রথমেই কবি বলেছেন

বিসমিল্লা প্রধান এক নাম নিরঞ্জন
যে-নাম স্মরণে কার্য সিদ্ধি সর্বস্থান।

তিনি যেমন বলছেন যে, খোদা 'অনুপাম নীরূপ নীরেখ নিরাকার', তেমনি পরক্ষণেই আবার একথাও উল্লেখ করেছেন, 'খোদার সদয় ছায়া' সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। যিনি নিরূপ, তাঁরও ছায়া ? এখানে প্রতীকত্ব নেই ?

মধ্যযুগের বিশিষ্ট কবি আলাওল তাঁর পদ্মাবতী কাব্যের (১৬৪৫-৫২) প্রারম্ভেই খোদার বর্ণনায় বলেছেন :

বিছমিল্লা প্রভুর নাম আরম্ভ প্রথম
আদ্যমূল-শির সেই শোভিত উত্তম।

এখানে প্রভু বা খোদার মস্তক উত্তমভাবে শোভিত বর্ণনাটি নিশ্চয়ই দেশকে জননী হিসেবে কল্পনার চেয়ে অনেক বেশি প্রতীকত্ব-ময়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এই সমস্ত কাব্য বাংলাদেশের ঘরে ঘরে পঠিত হতো, এখনো পঠিত হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই সমস্ত কাব্যে যে ব্যাপক প্রতীকত্ব বিদ্যমান সে সব নিয়ে কোনো দিন কোনো প্রশ্ন ওঠেনি, সর্বত্র সমাদর লাভ করেছে এবং বৃটিশ আমলের শিক্ষিত মুসলমানগণ এই কাব্যগুলোকে জাতীয় মহাকাব্যের মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু যেই-মাত্র বঙ্কিমের দেশজননীর বন্দনাগীত, স্বাধীনতা সংগ্রামের অমর-মন্ত্র 'বন্দেমাতরম' প্রকাশ পেল এবং সর্বত্র সশ্রদ্ধ ও স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি লাভ করল, অমনি মুসলমানগণ হৈ হৈ করে উঠলেন, গেল গেল, ধর্ম গেল মুসলমানিত্ব ডুবল। কি অবাস্তব, অ-ইস-লামী এবং ঐতিহ্য-বিরোধী প্রতিক্রিয়া ! তারা পালটা শ্লোগান উচ্চারণ করলেন, আল্লাহ আকবর, অর্থাৎ আল্লাহ শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ, তাঁর বন্দনা সর্বত্র সর্বক্ষণ গাইতে হবে, কিন্তু সেই বন্দনার সাথে দেশজননীর বন্দনাতে বিরোধ কোথায়, গরমিলটাই বা কোনখানে ? বন্দেমাতরম বলেছেন বলেই বঙ্কিম ইসলাম বিরোধী কাজ করেছেন ? দেশপ্রেম ইসলাম ধর্মের একটি বড় স্তম্ভ, একটি মহান শিক্ষা। বঙ্কিম বন্দেমাতরম সঙ্গীতের মাধ্যমে এদেশের মুসলমানদের সেই শিক্ষাতেই দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন।

দেশকে ভালোবাসা ইমান বা খোদাতে বিশ্বাসেরই একটি অঙ্গ, এও ইসলামেরই কথা। বন্দেমাতরমের মধ্যে তারই প্রতিধ্বনি আছে। মুসলমানরা এর প্রতি মুখ ফিরিয়ে রইলেন—বঙ্কিম তাঁদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হলেন। বঙ্কিমের এ এক দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। অথচ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর প্রতি, ভারতবর্ষের প্রতি এক গভীরতম মমত্ব-বোধ নিয়েই তিনি এই গানটি জাতিকে দান করেছিলেন। আল্লাহ আকবর-এর কোনো বিকল্প হতে পারে না—তাঁর মর্যাদা অন্যত্র, অন্য প্রসঙ্গে—দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নয়। মুসলমানগণ তখন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির ভেদ-বুদ্ধি-কৌশলের শিকার।

শুধু মধ্যযুগের কাব্যে নয়, যে কাব্যগুলো এখনো গ্রাম বাংলার মুসলমানদের প্রিয়গ্রন্থ—একালের মুসলমানগণও বন্দেমাতরমের চেয়েও অনেক বেশি প্রতীকধর্মী-সঙ্গীতকে প্রাণের সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে 'জয়বাংলা' শ্লোগানের সাথে যুক্ত হয়েছিল, আমার সোনার বাংলা, ও আমার দেশের মাটি, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি প্রভৃতি সঙ্গীত। তখন দেশকে জননী বলে 'তোমার পরে ঠেকাই মাথা' বলতেও দ্বিধা রইল না। এখন বাংলা-দেশের এক কোটি হিন্দুর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আট কোটি মুসলমান হৃদয় উজাড় করে প্রতি-দিন গাইছে—

ও তোর মুখের হাসি আমার প্রাণে
লাগে সুধার মতো

মা তোর বদনখানি মলিন হলে
আমি নয়ন জলে ভাসি।

নয় কোটি বাঙালীর জাতীয় সঙ্গীত। অথচ সামান্য বন্দেমাতরমে কি নিদারুণ আপত্তিই না ছিল। দুর্ভাগ্য বঙ্কিমের। আমরা মুসলমানরা এই মহর্ষিকে একদিন আমাদের দরজা থেকে ফিরিয়েছি—পরে কবিগুরুর হাত ধরে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলুম'।

দোষ শুধু মুসলমানদের নয়। বাংলায় যে নবজাগৃতি এল, যে রেনেসাঁর সূত্রপাত উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে প্রচণ্ড রূপ ধারণ করল, বাঙালী মুসলমানদের স্থান সেখানে ছিল নগণ্য। এর পিছনে ঐতিহাসিক কারণ ছিল। বৃহত্তর হিন্দু-সমাজের কোনো দোষই ছিল না, একথাও বলা যাবে না। রেনেসাঁর মাধ্যমে যে-চেতনা, যে-মূল্যবোধ, যে-সাংস্কৃতিক দীপ্তির উৎসারণ ঘটল, এ দেশের মুসলমানগণ তাকে আপন করে হৃদয়ের নিকট টেনে নিতে কুণ্ঠাবোধ করেছে, সংকোচের বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন হয়েছে। এই কুণ্ঠাবোধ দূরীকরণে এবং সংকোচের অবসানে তাদেরকে হাত ধরে কেউ সাহায্য করেনি, না শাসক বৃটিশ চক্র, যাদের মধ্যে ভেদবুদ্ধিই ছিল প্রখর, না অগ্রণী হিন্দু-সমাজ।

মুসলমানদের প্রধান আপত্তি ছিল 'রাজ-সিংহ' উপন্যাসটি সম্পর্কে। এই উপন্যাসে ঔরঙ্গজেবের চরিত্রকে যে ভাবে অঙ্কন করা হয়েছে তা ইতিহাস সম্মত তো নয়ই, বরং ইতিহাসের বিকৃতি।

বঙ্কিমচন্দ্র যেসব ঐতিহাসিক গ্রন্থ মূলত অনুসরণ করেছেন সেগুলোর মধ্যে প্রিঙ্গেল কেনেডির 'এ হিস্ট্রি অব দি গ্রেট মোগলস', জেমস টড লিখিত 'দি অ্যানালস অ্যানড অ্যানটিকুয়িটিস অব রাজস্থান', ওমরে রচিত 'হিসটরিক্যাল ফ্র্যাগমেনটস অব দি মোগল এমপায়ার' 'মানুচ্চি রচিত 'স্টোরিয়া ডু মোগোর', এফ এফ কাট্রো রচিত 'দি জেনারেল হিসটরি অব দি মোগল এমপায়ার' প্রভৃতির নাম করা যায়। সুতরাং রাজসিংহ উপন্যাসে ইতিহাসের বিকৃতি যদি কোথাও ঘটেও থাকে, তবে সে দায়িত্ব সামগ্রিকভাবে বঙ্কিম-চন্দ্রের নয়। ঔরঙ্গজেব সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার এসব বিচার-বিবেচনা করেই তাঁর সুচিন্তিত মন্তব্য করেছেন, 'যদিও বঙ্কিমের যুগে বাদশাহের সহিত রাজসিংহের মহাযুদ্ধের কোনো 'পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস' রচিত হয় নাই বা রচিত হওয়া সম্ভব ছিল না, তাহা হইলেও বর্তমানে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায় যে, বঙ্কিম কল্পনার বেগে সত্যকে অতিক্রম করেন নাই, সত্যকে জীবন্ত আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন মাত্র।' আচার্য সরকার ছোটখাটো ঐতিহাসিক কিছু বিচ্যুতির উল্লেখ অবশ্য করেছেন, তথাপি 'রাজসিংহ'-এ ঔরঙ্গজেব চরিত্রাঙ্কন সম্পর্কে বলেছেন যে, এদিক থেকেও বঙ্কিম 'প্রকৃত ইতিহাসকে লঙ্ঘন করেন নাই।' সুতরাং মুসলমানদের অসন্তোষের কারণ যে খুব শিথিল, একথা বলতে দ্বিধা নেই।

আনন্দমঠকে নিয়ে মুসলমানদের আরেকটি প্রচণ্ড আপত্তি। এই উপন্যাসে কিছু কিছু উক্তি আছে যা মুসলমানদের আহত করেছে। যেমন—'ইংরেজ আমাদিগের শত্রু নহে, আমাদিগের শত্রু মুসলমান'; কিংবা 'গ্রাম্য লোকেরা মুসলমান দেখিলেই তাড়াইয়া মারিতে যায়। কেহ কেহ সেই রাত্রে দলবদ্ধ হইয়া মুসলমান-দিগের পাড়ায় গিয়া তাহাদের ঘরে আগুন দিয়া সর্বস্ব লুটিয়া লইতে লাগিল। অনেক যবন নিহত হইল—অনেক মুসলমান দাড়ি ফেলিয়া গায়ে মৃত্তিকা মাখিয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিল, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে লাগিল, মুই হেঁদু।' উপন্যাসটির শেষ দিকে বঙ্কিম অবশ্য কৈফিয়ৎ দিয়েছেন যে, ক্ষয়িষ্ণু ও হৃতগৌরব মুসলিম শক্তির স্থানে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত ইংরেজ-শক্তির আধিপত্যই তখন হিন্দুদের কাম্য ছিল। তাঁর মতে 'অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব।' বঙ্কিমের এই উক্তি নিশ্চয়ই তাঁর গভীর জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনার ফসল। কিন্তু তিনি ভুল করেছেন যে, এদেশের মুসলমানগণ বিদেশি নহেন। এদেশেরই মানুষ, ধর্মান্তরিত। সুতরাং যে বহির্বিষয়ক জ্ঞান হিন্দুদের জন্যে কল্যাণকর, মুসলমানদের জন্যেও তা মাঙ্গলিক। মুসলমান শাসক এবং মুসলমান অধিবাসী এক নয়—শাসকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কাম্য, কিন্তু মুসলমান অধিবাসীগণের নিধন ও সর্বস্ব লুণ্ঠন, কেবলমাত্র এই কারণে যে তারা মুসলমান, বঙ্কিমের এই আদর্শ অভিপ্রেত হতে পারে না। বঙ্কিমকে নিবিড়ভাবে পাঠ করে একথাও উপলব্ধ হয় যে, তিনি বোধকরি এই সত্যটি অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছিলেন যে, মুসলমানগণ বাইরে থেকে এসে এদেশ দখল করলেও তাঁরা ধীরে ধীরে এদেশেরই অধিবাসী হয়ে গিয়েছিলেন—ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁরা একাত্ম হয়েছেন এবং এসব ক্ষেত্রে তাঁদেরও একটি অবদান আছে। আনন্দমঠে বঙ্কিমের এই ব্যর্থতা প্রকট। এখানে তাঁর উক্তিতে এমন সব উপাদান আছে যা সেদিনের সদ্য-শিক্ষিত ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ মুসলমানগণ সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি।

বঙ্কিমচন্দ্র যে হিন্দু জাতীয়তাবাদের দিকে অধিক পরিমাণে ঝুঁকে পড়েছিলেন এর জন্য তাঁর পরিবেশ এবং কাল দায়ী ছিল। ১৮২০—১৯২০ যে শতাব্দীটি বঙ্কিমের মনন-শীলতাকে পরিপুষ্ট করেছিল, তার একদিকে যেমন ছিল বাঙালীর জাগরণ, অন্যদিকে তেমনি হিন্দু-মধ্যবিত্ত প্রাধান্যের যুগ ছিল, একথা বলা যায়। উনিশ শতকের প্রথম থেকে ইউরোপীয় সভ্যতার আলোকে এদেশের সংস্কারে, ধর্ম-বিশ্বাসে ও সংস্কৃতিতে যে ভাঙাগড়া শুরু হয়, যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়, তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হিন্দু মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়। রামমোহন, অক্ষয় দত্ত, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তি এবং হিন্দুসভা, তত্ত্ববোধিনী সভা, ইয়ং বেঙ্গল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান একই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত—তাঁদের লক্ষ্য হিন্দু-ধর্ম, হিন্দু-সংস্কৃতি এবং হিন্দু-সমাজ। মুসলমান বলে যে একটি বিরাট সমাজ এদেশে বাস করছে এ সম্পর্কে তাদের সচেতনা খুব বলিষ্ঠ ছিল না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতি-জাত প্রেরণা কখনও সূক্ষ্মভাবে, কখনও বা পরোক্ষ উপায়ে এই প্রক্রিয়াকে সাহায্য করেছে। বঙ্কিম যখন এই তরঙ্গে এসে যোগ দিলেন তখন তিনিও ভিন্ন স্রোত-প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারেননি—তেমন মানসিকতাও তাঁর ছিল না। এখানেই তাঁর দুর্বলতা।

অবশ্য একথাও স্বীকার্য, মুসলমানগণ বঙ্কিমকে লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিয়েছেন। আমরা একথা কি করে বিস্মৃত হব যে, বঙ্কিমের হাত দিয়েই ওসমান, আয়েষা, দলনী, দরিয়া, মোবারক, চাঁদশাহ ফকির প্রভৃতি চরিত্রের সৃষ্টি হয়েছে, যাঁরা বঙ্কিম সাহিত্যে যেমন, তেমনি সমগ্র বাংলা কথা-সাহিত্যে বিশিষ্ট আসন লাভ করেছেন। কোনো মুসলমান ঔপন্যাসিকের হাত দিয়ে এ'দের চেয়ে বলিষ্ঠ ও বাস্তব কোনো চরিত্রের সৃষ্টি আজো পর্যন্ত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। মুসলমানদের প্রতি যদি তিনি বিদ্বেষ ভাবই পোষণ করতেন, এমন রক্ত-মাংসের ও মানব-হৃদয়ের অধিকারী চরিত্রের সৃজন তাঁকে দিয়ে সম্ভব হতো না।

তাঁর রচিত বিশাল প্রবন্ধ-সাহিত্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অহেতুক অপবাদ দিয়ে কিংবা ইসলাম ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হয়ে বঙ্কিম কিছু লিখেছেন বলে আমার জানা নেই। 'ভারত কলঙ্ক' প্রবন্ধে তিনি ভারতীয়দের গৌরব ও দুর্বলতা দুই-ই বিশ্লেষণ করেছেন এবং সুদীর্ঘকাল সংগ্রাম করেই যে মুসলমানদের এদেশে প্রবেশ করতে হয়েছে, ইতিহাস থেকে তা তিনি প্রমাণ করেছেন। অতঃপর, মুসলমানগণও ভারতীয় হয়ে উঠেছেন। 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' প্রবন্ধেও তিনি হিসেব করেই কুতুবুদ্দিন, ঔরঙ্গজেব এবং আকবরের

সময়ের ভারতবর্ষের তুলনায় নেমেছেন এবং আকবরের সময়ের ভারতকে স্বাধীন ভারত বলে উল্লেখ করেছেন। বাঙালীর ইতিহাস বা বাঙালীর গৌরব প্রসঙ্গে আলোচনায় বঙ্কিম যে একজন প্রবল জাতীয়তাবাদী বাঙালী একথা অনুধাবন করা যায় এবং এই কারণেই এসকল প্রবন্ধে তিনি প্রয়োজনে মুসলমানদের প্রতি কটাক্ষ করেছেন এবং প্রশংসাও করেছেন—কটাক্ষ বা প্রশংসা দুই-ই ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতেই তিনি করেছেন, আবেগের বশবর্তী হয়ে নয়।

বঙ্কিম ইসলাম বিরোধী কখনই ছিলেন না—ইসলাম ধর্মের প্রতি কোনো নিন্দা বাক্য তিনি উচ্চারণ করেননি—তাঁর যা কিছু বক্তব্য, যেগুলো নিয়ে এক সময়ে মুসলমানগণ জিগির তুলেছিলেন, তা মূলত মুসলমানদের সম্পর্কে। ইসলাম আর মুসলমান এক নয়। প্রাথমিক যুগে মহম্মদের প্রিয় শিষ্য তিন খলিফাকে যারা হত্যা করেছিল, তারা মুসলমান, কারবালা প্রান্তরে যারা নিষ্ঠুর ভাবে হত্যালীলায় মেতেছিল, তারা মুসলমান, ভারতের সিংহাসনের জন্যে যিনি নিজের ভাইদের হত্যা করে পিতাকে কারাগারে রেখেছিলেন, তিনিও একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান, ইন্দোনেশিয়াতে এই সেদিন যারা কয়েক লক্ষ স্বদেশবাসীকে হত্যা করেছে, তারা মুসলমান, আবার বাংলাদেশের ত্রিশ লক্ষ মানুষকে যারা হত্যা করেছে, হাজার হাজার মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করেছে, তারাও মুসলমান। এইসব মুসলমানের নিন্দা করলেই ইসলামকে নিন্দা করা হয় না—বঙ্কিম তাই করেছেন। দুর্ভাগ্য যে তিনি হিন্দু, তাই মুসলমানদের আঁতে ঘা লেগেছে।

বঙ্কিম ইসলাম বিরোধী ছিলেন না—মুসলমানদের কিছু কিছু বর্বরোচিত কাজের নিন্দে করেছেন—তার নাম মুসলমান-বিদ্বেষ নয়। কাজী নজরুল ইসলামও তাই করেছিলেন—তাঁকে কাফের বা অবিশ্বাসী বলা হয়েছিল। পরে আবার সেই ইসলাম-পছন্দের দল তাঁকে মহাকবি বানিয়ে ছেড়েছে। ইবনে খালদুনকে দেশত্যাগ করতে হয়েছিল। এখন তিনি মহামানব। এমন শত শত দৃষ্টান্ত দেয়া যায়।

মযহারুল ইসলাম

যাহার ধর্ম আছে সেই শ্রেষ্ঠ

গত বছর বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাস পড়ে আমার মেয়ে (মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী) আপনাদের মতোই আমাকে প্রশ্ন করেছিল—'বঙ্কিমচন্দ্র কি ইসলাম বিরোধী লেখক ছিলেন?' কয়েকটি উপন্যাসে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে 'যবন' 'নেড়ে' প্রভৃতি শব্দগুলির প্রয়োগ তার কাছে অস্বস্তিকর ও পীড়াদায়ক মনে হয়েছিল। ফলে, সেদিন তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোচনা করতে বাধ্য হয়েছিলাম। সুখের কথা—আলোচনা শেষে তার সংশয় দূর করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসের কিছু চরিত্র, কিছু কথোপকথন আপাতদৃষ্টিতে মুসলমানদের কাছে কিছু পীড়াদায়ক মনে হয়; বিংশ শতাব্দীর দৃষ্টিভঙ্গীতে উল্লিখিত অংশগুলি সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট মনে হয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগ ও কালের পটভূমিকায় তাঁর উপন্যাসগুলির চরিত্র চিত্রণ করেছিলেন সে যুগ ও কালের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং অপ্রীতিকর পরিবেশের কথা আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ করা প্রয়োজন। সে কালে গোঁড়ামি ও জাত্যাভিমানের সহস্র সংস্কার হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল। এক শ্রেণীর মুসলমান শাসকের উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, অত্যাচার ও নিপীড়ন এই গোঁড়ামিকে হিন্দু সমাজের গভীরে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিল। ফলত, কোথাও কোথাও উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িক বিভেদের সূত্রপাত ঘটেছিল। সুতরাং বঙ্কিম সাহিত্যের কয়েকটি চরিত্রে তার প্রতিফলন দেখা গেলে আশ্চর্য হওয়া বোধহয় সঙ্গত হবে না। আলোচ্য সাহিত্য বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিম চরিত্রের মূল্যায়ন করার আগে একথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

রাজসিংহ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—'তিনি (ঔরঙ্গজেব) কোরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, ইসলাম ধর্মানুসারে তিনি অগ্রজ পত্নী বিবাহে বাধ্য।' যদিও ঔরঙ্গজেবের বিচিত্র চরিত্র সম্পর্কে বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ আছে, 'বাধ্য' শব্দটির প্রয়োগ অনেকের কাছে অস্বস্তিকর মনে হতে পারে এবং বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে অনেকে সন্দিহান হতে পারেন। কিন্তু উপন্যাসটির উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন: 'গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোনো পাঠক না মনে করেন যে, হিন্দু-মুসলমানে কোনোপ্রকার তারতম্য নির্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।'....'হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না; অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল-মন্দ উভয়ের মধ্যেই তুল্যরূপেই আছে।'...'অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম আছে হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, সেই শ্রেষ্ঠ।'...

উল্লিখিত উপসংহারের পর বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কারও মনে আর কি কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকা উচিত?

মমতাজ হোসেন, বীরভূম।

শিলাদিত্য

যাঁরা লেখা পাঠাতে চান

শিলাদিত্য নবপর্যায়ে তিনটি সংখ্যা বেরিয়েছে। পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে একটা পূর্বনির্দিষ্ট ছকে এবং স্পষ্ট পরিকল্পনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন উঠছে, এ কাগজে যাঁরা লিখতে চান তাঁরা কী লিখবেন? না, যেমন-তেমন লেখা পাঠাবেন না। গল্প-কবিতা পাঠান আপত্তি নেই। কিন্তু ফিচার বা বড় প্রবন্ধ বা হালকা নিবন্ধ বা নতুনতর কিছু বিষয়ে লেখা পাঠাবার আগে বরং আমাদের সঙ্গে একটু পত্রালাপ করে নিন। জানান: কী বিষয়ে লিখতে চান, কত তার দৈর্ঘ্য, তার বিষয়গত অভিনবত্ব কোন খানে। সম্ভব হলে লেখাটার সংক্ষিপ্তসার বা স্কিমটা আগে পাঠান। তারপরে আমাদের অনুকূল মত পেলে মূল লেখাটা পাঠান।

এইভাবেই নতুন নতুন লেখক উঠে আসবেন। শিলাদিত্য হবে সত্যিকারের প্রতিভাবান লেখকদের মঞ্চ। তবে আপনারাও যত্নশীল হোন। যে কোনো লেখাই পাঠিয়ে দেবেন না। পাঠান, আপনার সেরা লেখাটি। □

ইত্যাদি প্রকাশনী (প্রাঃ) লিমিটেড।
কলকাতা-৭২

কবিতা

নীল লণ্ঠন জ্বালিয়ে সে ডেকে গেছে

কৃষ্ণা বসু

আজ জল-সরে-যাওয়া পারিসীম সিঁড়িগুলি
চুপ করে আছে হতমান নতমুখ মেয়েটির মতো !

আবেগের উচ্চাবচ ঢেউগুলি মুছে গেছে
বাতাসের সামর্থ্যের থেকে ;—
এখন জল সরে যাওয়া সিঁড়ি থেকে,
রূঢ় সূর্য তাপ সওয়া, অসমর্থ অকিঞ্চন দেখা,
কতদিন এই ভাবে পড়ে আছি একা,—
বিজন বনের থেকে ডেকে গেছে কেউ,
নীল লণ্ঠন জ্বালিয়ে সে ডেকে গেছে
অরণ্যের দিকে,

আমি সেই ডাক শুনিনিকো :—
যেন এইমাত্র বাসা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে গৃহস্থ মানুষ,
একা, হিম, নিরালায়, হাহা জানলা খোলা,
সেই পুরনো বাড়ির মতো এই পড়ে থাকা ;—
তেমনি খেলাভাঙা, ধুলোমাখা, ঠাণ্ডা অবেলায়
মৃদু কুয়াশায় আছি।
বড় একা আছি—

তৃষিত সিঁড়ির থেকে
ঠোঁটের বিশুষ্ক কাতরতা থেকে
চিনে নাও, ডেকে নাও তাকে।

আমার অসুখ

পরিমল চক্রবর্তী

আমার অসুখ বাড়ে সভ্যতার সংকটের মতো।
কেবল শরীরে নয়, ক্রমশ তা আত্মায় ছড়ায় ;
ছড়াতে-ছড়াতে শেষে অস্তিত্বকে কুরে-কুরে খায় ;
যেন বা কর্কট বীজ, কোষে-কোষে সমুখ, সতত।

এই ব্যাধি কার পাপে ? কার পাপ এই নিয়তিকে
শিরোধার্য করে আমি বেঁচে আছি রুগ্ন সভ্যতার
মুমূর্ষু অন্তিম লগ্নে ? বলো, কেন মৃত্যুর পাহাড়
অতিক্রম করতে গিয়ে আর্তনাদ শুনছি দিকে-দিকে ?

উত্তর দেবেন হয়তো অতি বৃদ্ধ ঈশ্বরমশাই ;
কিন্তু তিনি মহপ্রাজ্ঞ, অতএব নিতান্ত নির্বোধ।
রিরংসা-জুগুপ্সা-ঈর্ষা কিংবা অন্য বন্য মূল্যবোধ
অক্লেশে স্বীকার ক'রে, আমরা তবু তাঁরই কৃপা চাই।

আত্মায় দুর্বহ গ্লানি, ক্লিষ্ট দেহে মারাত্মক ক্ষত—
আমার অসুখ বাড়ে সভ্যতার সংকটের মতো ॥

আমার একলা আমি

দীপায়ন নন্দী

আমি আর আমার একাকিত্ব
আমি আর আমার নিঃসঙ্গতা
আমি আর আমার এই একলা আমি।

আমরা নিরিবিলি কথা বলি
আমি আর আমার নির্জন অভিমান
আমরা পরস্পর নির্নিমেষ।

দিন আসে তাই দিন যায়
ফুল ফোটে তাই ফুল ঝরে
আমি আর আমার স্বগত আলাপ
রিনরিন স্রোতের ধারায় কলস্বন।

তবু সেই আমাব একলা আমি
আমি আর আমার বিরহী সংলাপ
আমি ও আমার প্রতিচ্ছবি।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চার

মনীষীরা আবশ্যি ভালো বই লিখবে, নেতারা বিমিশ্র ভাষার কাঁচা বিবৃতি দেবে—পাকাতে পারবে, কবি-বিজ্ঞানীদের একটা বড় স্বৈরী অংশ সূর্য-স্বপ্ন দেখবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ মরে যাচ্ছে; পৃথিবীর থেকে শেষ বিদায় নেবার আগে হিংসার পরিবর্তে হিংসা ফিরিয়ে দেবার বিজাতীয় লোভে দুর্বল ঠোঁট কেঁপে উঠছে কারু; রিরংসাকেই জীবনে সফল করে ভয়াবহ বৃষ-গর্দানের দোষে রক্তের চাপে মরে যাচ্ছে কেউ। আশেপাশে, 'এই তো তাকে দেখেছিলুম, তাকে দেখছি না আর'; কারা যেন বলে যাচ্ছে দিনরাত দেয়ালে অনর্গল ছায়ার চারণায় তোমাকে আমাকে সকলকে মুহূর্তের মধ্যে ছায়ায় দাঁড় করিয়ে আছে, আলো আছে, ইতিহাসে কত বিখ্যাত যুগ কেটে গেছে, উদয় হবে না কি অতীতকে ভালো করে চিনে নিয়ে আরো বিশ্রুত সময়ে আরো ভালো আলোয়। কিন্তু আজকের যুগের ইতিহাসের খাতায় যে অঙ্ক লেখা আছে এর নিরেট সিদ্ধান্তকৌমুদীর পথে গরমিল লাগিয়ে ফূর্তি করতে গেলে সেটা ফুর্তির ভুল—অঙ্কের ভুল নয়। তাই না কি নিশীথ?

ঠিক করে অঙ্ক কষেও কে তবু উৎসব আনতে পারবে? কোথায় সেই মহানুভব দিকনির্ণয়ীরা। সেই শিব অনির্বচনীয় প্রাণঘন আন্দোলন? কোথাও আছে বলে মনে হচ্ছিল না নিশীথের। কবি সে; বিক্রাশী মনের অথল উৎসের স্ত্রী ছাড়া কি আর কবির মন? নির্ভুলভাবে এ শতাব্দীর এ আবর্তের শোকাবহ অঙ্ক কষে—এরি ভিতর যে উৎসব রয়েছে তবুও, তাই মজা করে জীবনের পথ থেকে একদিন সরে যেতে হবে তাকে।

জলপাইহাটি থেকে চলে যাচ্ছে নিশীথ, এখানে ফেরার কথা নেই আর। জিতেনের ওখানে মাসখানেক থাকবে। জিতেনকে বলে ভালো চাকরি পাওয়া গেলে ভালো; পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। মোটা রকমের ধার পাওয়া যাবে না। দেখা যাক কি হয়। ডাক্তার মজুমদারের চিকিৎসার মেয়াদ কাটিয়ে সুমনা যদি বেঁচে থাকে তাহলে ফিরে এসে তাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে। নাহলে স্ত্রীর শ্রাদ্ধশান্তির জন্য হয়তো বা জলপাইহাটিতে দু-চারদিনের জন্য আসবে নিশীথ—হয়তো আসবে না।

এরকম অন্তিম অবস্থায় স্ত্রীকে ফেলে চলে যাচ্ছে কেন নিশীথ? এটা কি এ যুগের শোকাবহ অঙ্ক কষবার পথে একটা নিতান্তই ছোটখাট ধাপ নিকেশ করে নির্ভুল একটা যোগ কি বিয়োগ? ঠিক তাই।

কলকাতায় যাওয়া ছাড়া নিশীথের আর কোনো উপায় নেই। নিশীথের হাতের সব টাকা ফুরিয়ে গেছে, জলপাইহাটিতে কারু কাছে তেমন কিছু ঢালাও ধার পাওয়া যাবে না, পেলেও শোধ করে দেবে কি করে সে? কলেজের উপর নির্ভর করা চলে না এখন আর। অনেক দিন থেকেই কলেজের কর্তৃপক্ষকে সে কথা সে বলবে ভেবেছিল—কিন্তু দু পক্ষেরই শান্তি ও মেধাবৃত্তি ভাঙবার ভয়ে কিছুটা অবিচার ও লাঞ্ছনা সহ্য করেও ব্যাপারটা চেপে চেপে যাচ্ছিল—সে কথাটা বাস্তবিকই এতদিন পরে তাদের বলে ফেলেছে সে—হয়তো অতিরিক্ত জোর দিয়ে। বলেছে দেড়শো টাকা মাইনেতে পোষাবে না তার, সোয়া দুশো-আড়াইশো, অন্তত দুশো কি দিতে পারবেন ও'রা? না দিতে পারলে দুঃসময়ে নিজের পথ দেখা ছাড়া কি আর করবে নিশীথ? নিশীথ ছুটির দরখাস্ত দিয়েছে, কি কারণে দরখাস্ত, পরিষ্কার করে ব্যক্ত করেনি; ডাক্তারের সার্টিফিকেটও জুড়ে দেয়নি। কর্তৃপক্ষ মুখফোঁড় নিশীথকে কোনোকালেই বিশেষ পছন্দ করে না। এবারে নাকচ করে দেবে। দিক। যা করেছে ঠিকই করেছে নিশীথ।

সুমনাকে দেখবার জন্যে রইল ডাক্তার মজুমদার আর তার কমপাউনডার জ্যোৎস্না। ডাক্তারি করে মোটা টাকা পাচ্ছে বলে নয়, এমনিই ওর মন খুব পরিষ্কার—বেশ প্রশান্ত। ডাক্তারটি নিশীথের নিজের দাদার মতো, কমপাউনডার জ্যোৎস্নার উপর ষোলা আনা নির্ভর করতে পারা যায়; মজুমদার প্রায়ই বলে। সুপারিশটাকে নিশীথ খতিয়ে দেখেছে; অনুভব করেছে, হ্যাঁ; এতেই হয়ে যাবে; আর কী।

মহিম ঘোষাল আর তার পরিবার তো সুমনার সঙ্গেই রইল এ বাড়িতে। মহিমের মাথাটা লজিক—মানে কলেজের লজিক দিয়ে শানানো—বুদ্ধি দিয়ে নয়; বেকুব নয় তাই বলে মহিম; বিবেচনা শক্তি—মনে হয় যেন আছে বেশ; খুব হাতে কলমে না থাকলেও; ভিতরটা ভালো—তবুও সেটাকে যেন আরো ভালো করতে চাচ্ছে মহিম; এ জিনিসটা ফিটফাট ভালোর চেয়ে ভালো।

মফস্বল কলেজের কর্তৃপক্ষ এরকম খানদানী মানুষকে ঠকিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিল: পনের বছরের সার্ভিস; মোটে একশ তিরিশ টাকা মাইনে। এসব জিনিসের একটা বিধান হবে না এখনো? মহিমের মতো বিবেচনা না থাকলেও, এর চেয়ে বেশি বুদ্ধি আছে (মহিমের স্ত্রী অর্চনার (তাকে অর্চিতা ডাকে নিশীথ), বুদ্ধিটা নিজের স্বার্থকে কেন্দ্র

করেই। কিন্তু তাই বলে পরের ক্ষতি করবার কোনো মতলব নেই; পরের উন্নতি দেখলে তার খারাপ লাগে না। কুঁড়ে মানুষ; মাঝে মাঝে কেমন গোরু-হরিণের মতো চোখ তুলে তাকায়; কেমন একটা বিসদৃশ সাদৃশ্য এসে পড়ে। কিন্তু এটা ঠিক—নিশীথের মতো, গাই গোরু দেখার ছলে অবিনশ্বর কৌতুকে অর্চিতার দিকে তাকাবার মতো লোক এ পৃথিবীতে কেউ নেই—কেউই নেই আর। অর্চিতাকে ভালো করে বলে দিয়েছে নিশীথ সুমনার কথা; সুমনাকে দেখতে শুনতে বলে দিয়েছে।

কিন্তু তবুও এ সময়ে তুমি থাকলে ভালো হতো নিশীথদা।

আমি তো আছিই।

কেন, তুমি কলকাতায় যাচ্ছ শুনলাম?

তোমরা চিঠি লিখলেই চলে আসব। দরকার হলে মহিম যেন টেলিগ্রাম করে—

বলেছ ওঁকে?

বলব।

কিন্তু কলকাতায় কেন যাচ্ছ?

এখানকার কলেজের সঙ্গে বনল না।

ছুটি নিয়ে যাচ্ছ?

খুব সম্ভব কাজ ছেড়ে দিতে হবে।

ছেড়ে দেবে? তাহলে আমাদের কি হবে? জলপাইহাটিতে সুমনাদি, হারীত—তোমরা থাকবে না আর!—

এর উত্তর কি দেবে নিশীথ? এতক্ষণ একটা ধূসর গোরুর, হয়তো হরিণীর সান্নিধ্য অনুভব করছিল; গোরুটা বছরের পর বছর ধূসরতর হয়ে যাবে। নিশীথ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছিল, অর্চিতার সঙ্গে কথা বলবার সময় তার মুখের দিকে তাকায়নি। মাঠের উপর শুয়ে আছি শুয়ে আছি; চোখ বুজে; কেমন একটা গন্ধ পাওয়াতেই টের পাওয়া গেছে শাদাটে গোরুটা এসেছে—গোলাম কিউবিয়ার; কাছের। পুকুরে জল খাচ্ছে; কেমন একটা ফোঁস ফোঁস শব্দ হচ্ছে; মাঠ পুকুরে গায়ের গন্ধ শব্দ—সবই যেন একটি মানুষের মধ্যে দানা বেঁধে কাছে দাঁড়িয়ে আছে; ভূতত্ত্বের প্রাণবিজ্ঞানের লক্ষ কোটি বছরের ইতিহাস সত্ত্বেও জানিয়ে দিচ্ছে; মাটি মাঠ গোরু মানুষ একই জিনিস—একই সূর্যখণ্ডের থেকে জেগে উঠে একই বরফের দেশে লীন হয়ে আছে সব।

একই জিনিস অর্চিতা।

কিসের কথা বলছ?

না, এমনিই; আমি ভেবে দেখছিলাম।

অর্চনা একটু কাছে এগিয়ে এসে দু একপা পিছে সরে গিয়ে বললে, —'কলকাতায় যাওয়া আর না যাওয়া? একই জিনিস।' তা বটে তো। কেন যাচ্ছ তাহলে সে গাঁটকাটার দেশে। চার হাত পায়ে যেতে ফিরে আসতে কম সে কম পঁচাত্তর তো বটেই।'

একই তো জিনিস, মাঠ আর গোরু।

মাঠ আর গোরু? নতুন শাস্তর বার করলে বুঝি। না যাও তুমি, কলকাতায় ঘুরে এসো, মাথায় একটু হাওয়া লাগিয়ে এসো।

অর্চিতার দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠল নিশীথ। এতক্ষণ অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে ছিল সে, এইবারে মাঠ দেখেছে, গোরু দেখে ফেলেছে। অর্চিতা নিশীথকে ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল প্রায়—হাসির হল্লায় দু'তিন পা পিছিয়ে গেল। ভাসা ভাসা বড় চোখের গবাক্ষ পথ দিয়ে নিশীথের দিকে তাকাল, ঠোঁটের উপর একটু আঁচল টেনে কি না টেনে। —'হাসছ যে। হাসবার কথা কি হলো। হেসে উড়ে গেলে দেখছি।'

নিশীথের হাসি থেমে গেছল, বললে—'এই মাঠ ঘাট আকাশ বাতাস আর দেখব না; এখানে চল্লিশ বছর ছিলাম। চেন কি গোলাম কিউবিয়াকে অর্চিতা?'

সে কে?

আছে—বললে নিশীথ। 'আছে একজন মুসলমান মহাজন, পদ্মা—এপারের দেশে সম্প্রতি এসেছে—ওপারের থেকে—'

অর্চিতা নিশীথের কথার ধারা লক্ষ্য করছিল; কি যে বলছে? কি না বলছে। তার অধ্যাপক স্বামীর সঙ্গে অনেক দিন ধরে থাকতে থাকতে দু-চারটে ইংরেজি কথা সে শিখে ফেলেছে। এমনি অর্চিতা ক্লাস নাইন অব্দি পড়েছিল। ভাবছিল লেগপুলিং করছে না তো নিশীথ। মহিমের চেয়ে বেশি বুদ্ধি রাখে অর্চিতা।

কালিজিরা নদীর তীরে একটা মাঠ আছে, মাঠে একটা ধুলো রঙের গোরু থাকে। গোলাম কিউবিয়ার গোরু। মাঝে মাঝে মাঠের উপর একজন মানুষ শুয়ে থাকে—বলে নিশীথ অর্চিতার দিকে তাকাল। মনে হলো নিশীথের ইঙ্গিত ধরে ফেলেছে যেন এই ক্ষমাহীনভাবে বুদ্ধিমতী মেয়েটি। কিন্তু তবুও ধরে ফেলেছে কি? গোরু দেখার ছলে সারাৎসার কৌতুকে মাঝে মাঝে অর্চিতার দিকে তাকায় মহিম—আহা, জলপাইহাটির এ একটা কিরকম চমৎকার ফসসানির জিনিস ছিল। অথচ বারো মাস এদেশের আকাশ বাতাস নদী নক্ষত্র কলেজের কাজ কথাবার্তা বাড়িতে। ফিরে এসে সুমনা রাণু ভানুর সঙ্গে আলাপচারি তারপরে ইংরেজি ফরাসি বই-নভেল নিয়ে ডেকচেয়ারে পড়ে থাকার সঙ্গে নিখুঁতভাবে বিমিশ্রিত হয়ে। কি অপরূপা, কি অপরূপ গভীর ছিল সব—একই অন্তঃসারের তবু অনেক। বর্ণালির বারোমাসের সব; নিরবচ্ছিন্ন। সারাৎসার। একে একে ছিঁড়ে গেল সব। শুকিয়ে গেল, ফুরিয়ে গেল। নিশীথ ইচ্ছে করেই ঘটিয়েছে কি সব? না ইতিহাস ঘটিয়েছে? সময়ের হাতে আঁকিবুঁকি অবোলা বাতাস ধুলোর গুঁড়ো—নিশীথ আর তার পরিবার—সকলের পরিবার—সমস্ত ব্যক্তির। সমস্ত পৃথিবীর।

কিন্তু তবুও নিজে যতটা সে লুণ্ঠিত হয়েছে; নির্মূল হয়েছে, আবর্তিত—পরিবর্তিত হয়েছে, মহিম—অর্চিতাদের বা কলেজের বা বাইরের অন্য সব নরনারীদের বেলা সময় ততখানি অশ্লীল অস্থির-পনায় সক্রিয় হয়ে ওঠেনি। এখনও যেন আট-দশ বছর আগের পৃথিবীতে পড়ে আছে মহিম; সেই যুদ্ধের আগের জলপাইহাটিটাকে খুঁজে বার করে ঢেলে সাজাচ্ছে অর্চিতা। সাজাবারও দরকার নেই; কোনো প্রয়াসের প্রয়োজন নেই যেন, নেই কোনো উদ্ভাবনা, এমনিই হয়ে যাচ্ছে সব।

নিজে নিশীথ এদের মতন অচেতন থাকলেই তো পারত। কেন দেখতে বুঝতে অনুভব করে নিতে গেল। সময়ের আঙুলের নির্দেশে সেই বিম্বিসারের থেকে আজকের স্ট্যালিন-ট্রুম্যানের কবলিত মানুষদের যত পথ থেকে পথান্তরে স্ফুলিঙ্গ বিবর্তিত নীত নিহত হতে রাজি হয়ে গেল সে—যা নেই সেই অমতের নিরবচ্ছিন্ন বধিরতার বিনিময়ে ব্যক্তিকে বিক্রি করে অচেতন অন্ধকার সময়কে মর্যাদা দেবার জন্যে।

তুমি দাঁড়িয়ে আছ অর্চিতা এখনও। চলে গেছ ভেবেছিলুম।

কি যেন ভাবছিলে তুমি।

খুব লক্ষ্মী মানুষ তুমি। —নিশীথ বললে,

'আমি কলকাতায় চললুম। সুমনাকে দেখো তুমি আর মহিম। হারীত যদি আসে'—থেমে গেল নিশীথ।

হারীত আসবে? কোথায় সে?

কোনো খোঁজখবর পাই নি। যদি আসে এখানেই থাকতে বোলো তাকে। সুমনার একটা এসপার ওসপার কিছু হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত। নিশীথ একটু ভেবে বললে 'অন্তত আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত—'

কোথায় আছে হারীত?

জানি না। তবে আমি বাড়ির থেকে বেরিয়ে গেলে সে বাড়িতে ফিরবেই একবার। কতদিন আস্তানা গেড়ে থাকবে বলতে পারছি না। তবে আসবেই—আমি বেরিয়ে গেলে—শীতের শেষে কুমোর পোকার মতো একটা ছ্যাদা খুঁজে নিতে এ দেশে। ওকে বলে কয়ে রেখে দিও তো ওর মার কাছে—অর্চিতার দিকে তাকিয়ে নিশীথ বললে।

মার এরকম অবস্থা দেখলে এমনিই থাকবে। তুমি চলে না গেলেও ঘরে ফিরবে না, বাপে-ছেলেতে এই রকম সম্বন্ধ। আজীবন মাস্টারী করে কি শেখালে—কি হলো তোমার? কি ছেলে তুমি নিশীথদা।

এই তো হলো, যা দেখছ সব হলো।

শুনে সুবিধার লাগল না অর্চিতার ; অর্চিতার দুটো ভুরুর নিচে দুটো ভাসা ভাসা শফরীক্রীত পথে চারিদিককার আকাশ বাতাস ঝাউ জারুল শিশু শিমূল তুলোর শাদা আকাশযান জ্যামিতির বাধা উপচে পড়া কেশরাশির মতো ঘরদোর পুকুরের টলটলানি। চারিদিকে কাকের ডাক কেবলি হাত থেকে ফসকে দোয়াতের কালি ছিটকে পড়ার মতো নষ্ট দিন। মৃত ভাঁড়ার নতুন ফসল, সার্থক শত্রু অন্ধ রাত্রি খেলে যেতে লাগল।

ভানু কাঁচড়াপাড়ায় কেমন আছে ?

নাঃ বিশেষ ভালো না। বেঁচে উঠলেও আশান হওয়া কঠিন, আঠারো ঘা লেগে থাকবে। দুর্ভাগা তো।—নিশীথ কথা বলতে বলতে আধো হাঁ করে রইল—একটা ভরদুপুরের দাঁড়কাকের মতো।

যক্ষ্মার নতুন নতুন ওষুধ বেরুচ্ছে। আগের মতন নেই—ও ঠিক হয়ে যাবে সব।

নিশীথ কোনো কথা বললে না।

তোমাদের তো কারো এই রোগ ছিল না কোনোদিন। বৌদির বাপের বাড়ি ছিল ?

কৈ জানি না তো।

রাণুর কোনো খবর পেলে ?

না।

ঘাস খেতে খেতে হঠাৎ চুণাপাথরের মতো রঙের এক একটা গাভী যেমন নাড়ীর টানে চোখ তুলে মুখ তুলে দাঁড়ায়, খুঁটোর টান পড়ে গলায় টান পড়ে, দড়িটা একেবারে টান টান হয়ে গেছে বলে, অর্চিতা তেমনি কেমন একটা নিস্তব্ধ অব্যক্তভাবে দু এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। গলার দড়িতে টান পড়েছে প্রায়—খুঁটোটা মাটির ভিতরে অনেক দূর ডাবানো, খুব শক্ত ; মুহূর্তের মধ্যেই এই বিদঘুটে অস্বস্তির ভাবটা ঢিলে হয়ে গেল—নিজের সহজ সত্তায় ফিরে এসে অর্চিতা বললে, 'আশ্চর্য—একেই বলে হাওয়া হয়ে যাওয়া। তুমি আমি কাকের ডানা, ঘাসের শিস কেউ কিছু জানল না, পুলিশে কোনো কিনারা করতে পারল না। জলপাই-হাটি থেকে বেরুবার দুটো তো পথ—একটা স্টিমার লাইনে, একটা ট্রেন লাইনে। উনি বলেছেন এ দুটো দিয়ে স্টেশনের কোনো লোকই রাণুকে বেরিয়ে যেতে দেখেনি। রাণু স্টেশন দিয়ে যদি যায় সে তো দেখার জিনিস ; নদীর শুশুকগুলো অব্দি ঝুপঝুপুর করে চোখ পালটে দেখে যায়। কিন্তু কেউ দেখল না'—

কে জানে গেছে কিনা। গেলে কি আর স্টেশন দিয়ে যাবে। নদীতে ডুবে গেলে কে খোঁজ পাবে তার—

উঠবে তো গিয়ে কোথাও দেহটা।

কে জানে।

আমি অবিশ্যি একটা কথা শুনেছি কাউকে বলবে না বল।

কার ? রাণুর কথা ? কি শুনেছ ?

এদিকে এস—এই করমচা গাছগুলোর জঙ্গলের ভিতর—ঐ দেয়ালটার পিছনে। নিরিবিলি কথা বলবার জায়গা। কেউ দেখবে না। সামনে ধুপসি তেপান্তর—নিশীথ নিঃস্পৃহ মুখে রোদের বেলার দিকে তাকিয়ে বলল 'না গো, কি বলবে এখানেই দাঁড়িয়ে বল।'

ওখানে কি কাঁটা ফুটবে। না গোখরো আছে ?

এখানেই দাঁড়িয়ে বল—

আমার কথা তুমি শুনবে না ? কাল তো কলকাতায় যাচ্ছ চলে। আর তো—

দূরে মহিমের ছায়া দেখা গেল, লম্বা চওড়া, খালি গায়ে, পিঠে পৈতে—লজিক হাতে। মহিম এদিকে আসতেও পারে—নাও আসতে পারে। নিশীথদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে—একটা অদৃশ্য শুঁড় তুলে আছে যেন বাতাসের ভিতর। হাতীর কায়দা। দল ছাড়া হাতীও বটে। নিশীথদের গন্ধ নাকে গেলে কি করবে বলা যায় না। তবুও এমনই বেকুব নিশীথ যে করমচা জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে ঘণ্টা দুই কাটিয়ে দেবার কথা ভাবতেও গেল না।

নিশীথ এখানেই দাঁড়িয়ে আছে, মহিম ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে। চমৎকার স্যানডউইচের মশলা মনে করতে লাগল অর্চিতা নিজেকে (সুমনা তাকে বছর দুই আগে ডিমপাঁউরুটির স্যানডউইচ বানাতে শিখিয়েছিল)।

জিনিসটাকে খুব ক্ষমার চোখে দেখলে নিজেকে মশলার পুর মনে করে একটা উদ্ভুটে তামাসা বোধ করা চলে বটে। কিন্তু সে চোখে সে দেখছে না। সমস্ত দোষ নিশীথেরই। বিষাক্ত চোখে সে নিশীথের দিকে তাকাল। টের পেল নিশীথ।

মহিমের শুঁড়ও গন্ধ পেয়েছে যেন। অর্চনাও শাড়িটা ভালো করে জড়িয়ে সড়িয়ে সাবধান হয়ে সরে দাঁড়াল।

যেন তুমি সাপ বৌমা।—অর্চিতার দিকে তাকিয়ে নিশীথ বললে।

তার মানে ? আমাকে বৌমা বলছ কেন ?

সাপও তো বলেছি। তার চেয়ে বড়ো গাল হলো বৌমা বলা ?

সাপ ?

সাপ-। চমকে গিয়ে তেজ বেঁধে সরে দাঁড়ালে তো সাপের মতো খুব হুঁশিয়ার হয়ে ? যেন ধুলো উড়ে আসছে অনেক দূরের থেকে। মহিম! ও মহিম।—নিশীথ গলা ছেড়ে ডাক দিল।

কিন্তু অর্চিতা ও নিশীথ কেউই দেখেনি—লজিকের বই হাতে নিয়ে মহিম অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। এইবারে মোড় ঘুরে বিশুদের কুল তেঁতুলগাছের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল ; খুব সম্ভব বনবিহারীবাবুর ছেলেকে লজিক বুঝিয়ে দিতে যাচ্ছে। বনবিহারীবাবু কলেজ কমিটির খুব হাঁটাহাঁরি মেমবার। তাঁর ছেলেকে লজিক সিভিক্স পড়িয়ে দেবার সুবুদ্ধি মাঝে মাঝে চেপে বসে মহিমের মাথায় ; বিনি পয়সায় পড়ায়। বিনিময়ে সে কোনো পুরস্কার আশা করে না। পায়ও না। অনেক বছর চাকরির পরে মাইনে এখনো একশো ত্রিশ টাকা।

পড়িয়ে তৃপ্তি মহিমের—কলেজ কমিটির মোড়ল মেমবারের ছেলে নিত্যোনকে পড়িয়ে তৃপ্তিটা নাভির ভিতর থেকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, যেন সমস্ত শরীরে অনেকক্ষণ টিঁকে থাকে। বড়োলোকেরা কাউকে কিছু দেয় না, জানে নাকি মহিম ? তবুও ও সব মানুষকে নিষ্কাম খোসামোদ করতে খুব ভাল লাগে।

ওঁকে ওরকম হাঁকডাক করে ডাকলে যে তুমি ?—অর্চিতা বললে।

তুমি আমি আকাশ বাতাস মহিম-এর ভিতর ডুকরে উঠতে ভালো লাগে ঐ নীল জলজঙ্গলের ডাকপাখিটার মতো। শুনেছ সে ডাক ; চকচকে রোদে, বেশি রাত্রের নক্ষত্রে ? কোথায় গেল মহিম ?

নিত্যোনদের বাড়ি।

লজিক পড়াবে ?

পড়াবার তারিখ কাল। আজ হয়তো এমনিই গেল। আগের থেকে না জানিয়ে রাখলে, নিত্যোন অনেক সময়ে ভুলে যায়, তাই মনে করিয়ে দিতে গেল হয়তো। গেল যখন দুএক পাতা পড়িয়েও আসতে পারে। তোমাকে রাণুর কথা বলব বলেছিলাম।—

বল।

রোদ চড়েছে এখানে। চল করমচার বনে।

নিশীথ গড়িমসি করতে লাগল আবার। বললে, 'আচ্ছা, যাচ্ছি। এসো এই ছায়ায় বসা যাক। জাম তেঁতুলের ছাবা পড়েছে এখানে। লোকজন চলছে ফিরছে বটে সব. চারিদিকে—কিন্তু আমাদের কথায় কান দেবার কে আছে। শান বাঁধানো রোয়াকের উপর বস তুমি, আমি এই গাছের গুঁড়িটায়—অ্যা—হ্যাঁ।—বলে, একটা শব্দ করে নিশীথ গুঁড়িটার উপর বসে পড়ল, 'নাও নবৌ, এখন বৌনি কর।' অর্চিতা গোঁজ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ।—'নবৌ কেন ?'

মহিম তো আমার চেয়ে ছোট। যেন মহিম আমার ছোটভায়ের ন'দাদা। তাহলে তুমি নবৌ হবে না আমার ?

ও—অর্চিতা একটু তেরছা কামিক মেয়ে বললে, কিন্তু লোকে দেখলে তোমাকেই ন'ভাই বলবে বড় দাদার।'—মধুবিষ দৃষ্টিতে অর্চনা তাকাল নিশীথের দিকে।

কি হয়েছে রাণুর। কি শুনেছ তুমি বল।

আমি শুনেছি—

চলো করমচা বনেই যাই। ধসা দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘাসের উপর বেশ আরাম করে বসা যাবে। কোথাও কেউ নেই—থম থম থিম থিম করছে তেপান্তর।

গাছের গুঁড়িরা নিশীথকে বিঁধছিল; নারকোলের গুঁড়ি, খোঁচা খোঁচা এবড়ো খেবড়ো, কোথাও এমন একটু জায়গা নেই যেখানে বসে স্বস্তি পাওয়া যায় একটু—

না, যাব না।—খুব বীতকাম দৃঢ়তায় অর্চিতা বললে।

কেন যাবে না? চলো যাই—নিশীথ উঠে দাঁড়াবার উপক্রম করল।

সে হয়না। তুমি যেতে পার, আমি যাব না। সংকল্পের চেয়ে ওর গলার কঠিনতাটা—নিশীথের মনে হল—এমন অস্তিত্বে ঠেকেছে যে এবার আঁট শোনপাপড়ির মতো চুর চুর করে ভেঙে পড়বে সব।

গুঁড়িটার উপর একটু সুবিধে করে বসবার চেষ্টা করে নিয়ে নিশীথ বললে, 'বলো দেখি কার কাছে কি শুনলে?'

স্টেশন দিয়ে যায়নি। রাণুকে ওরা ফুসলেফাসলে গঙ্গাসাগরের মেলায় নিয়ে গেছল। অন্ধকার রাতে গা ঢাকা দিয়ে নৌকোয় বকচরের খাল দিয়ে। বলে পীরবদরের কুদরতিতে পালিয়েছে।

ওরা? ওরা কারা?—নিশীথ চারিদিকে তাকিয়ে অর্চিতার কাছ ঘেঁষে এসে বসল রোয়াকের উপর।

সেই গঙ্গাসাগরের মেলার থেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল কলকাতায়। কলকাতায় তখন দাঙ্গা—বড় দাঙ্গাটা—আগস্ট মাসের। রাণু কাটা পড়েনি। রাজাবাজার জানবাজার বেকবাগান চিৎপুর হয়ে এখন কোথায় আছে তা কেউ জানে না। কিন্তু আছে।

নিশীথ খানিকটা সরে বসে হেসে বললে, 'এসব কে বললে তোমাকে?'

বিশ্বাস হচ্ছে না?

নাম বললে না তো কারো।

যে বলেছে তার নাম দিয়ে কি হবে। কে করেছে দেখ।

কে করেছে? কার কথা বলে ওরা?

অর্চিতা যেন তার দুটো চোখ সামদান করে তাকাল নিশীথের দিকে; বললে, 'বলব তোমাকে। তোমার কাছে তো না বলার কিছু নেই আমার। জানি তুমি বলবে না কাউকে। কোনো কিছু কুলকিনারা না করে আমলা হামলা করবার মানুষ তুমি নও। নাম বলছি—চলো করমচাতলায় যাই—বড্ড রোদের হল্কা এখানে।'

দূরে মহিমের ছায়া দেখা দিল—লজিকের বই হাতে নিয়ে ফিরছে। লজিক কি, লজিক কেন, সমস্তই যথাসাধ্য বুঝিয়ে দিয়ে আসবার চেষ্টা করেছে।

উনি এসে পড়েছেন।—অর্চিতা পা বাড়িয়েছিল করমচা বনে যাবার জন্যে, ফিরে এল; রোয়াকের উপর বসল।

উনি এসেছেন তো কি হয়েছে। চলো—

না। ওঁর চোখে লাগে।

ঐ তো মহিম মোড় ঘুরল দেখছি। বাড়ি এল না। কোথায় যাচ্ছে?

মুরলীবাবুর লাল ইঁটের বড়ো দালানটার দিকে যাচ্ছে। তুমিও তো দেখছ। এলাহাবাদ থেকে মুরলীবাবুর মেয়ে এসেছে—এখানে কাকার বাড়িতে থাকে, প্রাইভেট বি এ দেবে এবার—

তাকে ফিলজফি পড়াতে হবে?

তা তো হবে। কিন্তু এটাও খুব সম্ভব অন্যাহারী; আচ্ছা মানুষই বটে। আমার কপালে আর ওঁর কপালে; একেবারে ধুলোর আটা দিয়ে। কোনো খণ্ডন নেই।

নিশীথ একটু হেসে বললে, 'গঙ্গাসাগরে কে নিয়ে গেছল রাণুকে?'

বরেণ মিত্তির।

বরেন মিত্তির। নরেনের ভাই?

হ্যাঁ হ্যাঁ, নরেন মিত্তিরের মেজো ভাই।

কোন নরেন মিত্তির? যে সুমনাকে রক্ত দেয়।

আস্তে আস্তে। হ্যাঁ সেই নরেন। কেউ কেউ বলে বরেন টরেন নয়। এ নরেন মিত্তিরের নিজের কাজ।—

নিশীথ হাঁ করে দাঁড়িয়েছিল। হাঁ-টা বুজে দাঁতে দাঁতে খিল লেগে গেল যেন; চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠতে লাগল। ঢিলে করে দিতে চাইল চোয়াল, দাঁত। কিন্তু আরো শক্ত আরো সমগ্র হয়ে উঠতে লাগল সব; সমস্ত শরীর ছেয়ে পড়তে লাগল।

অর্চিতা এসে তার হাত ধরে টেনে বললে, 'কী হলো তোমার। আচ্ছা মানুষ তো তুমি, নাও ধুলো ঝেড়ে ওঠো তো এখন।'

কিছু হয়নি। ঠিক আছে। বসো তুমি।

এখুনি তুমি কিছু করতে যেও না। এখন রাগ করলে ভেস্তে যাবে সব। পুলিশটুলিশ সব ওদের হাতে। নরেনের বাবা বড় উকিল মানুষ গভর্নমেন্টের পি পি—

নিশীথ যেন আরেক রাজ্যে চলে গিয়েছে; ডুবুরির মতো সমুদ্রের অনেক নিচের থেকে অন্ধকারের থেকে যেন বললে, 'পি-পি-পি নয়তো?'

সে আবার কি?

পারফোরেটেড পাবলিক প্রসিকিউটর।

জানালার ভিতর দিয়ে উঁকি মেরে সুমনা বললে 'কারা কথা বলছে গো এতক্ষণ ধরে। যেন টাপুর টুপুর টুপুর টাপুর টোপাকুল পড়ছে তো পড়ছেই—পড়ছেই—পড়ছেই, বোস মল্লিকদের খিড়কীর পুকুরে। কে গো? ও তুমি আর অর্চিতা, মহিমবাবু কোথায়?'

মহিম পড়াতে গেছে। কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ?

আমি সুমন্তর মার ওখানে গিয়েছিলাম—

বাপস, হেঁটে না রূপপায়? নরেনের রক্তের জোর আছে বলতে হবে, কোথায় যাচ্ছ?

চান করতে যাচ্ছি, বিশুবাবুর দীঘিতে। তিনদিন চান করিনি··· হাত পিঠ মুখে খড়ি উড়ছে—চিঁচিয়ে চিঁচিয়ে বলতে বলতে চান করতেই বোধহয় বেরিয়ে গেল সুমনা—উত্তরের দরজা দিয়ে—

নিশীথ গলা ছেড়ে চিৎকার করে বললে, 'দেখো আবার, বিশুবাবুর দীঘির চিংড়ি মাছে না খেয়ে ফেলে যেন।'

অর্চিতা চেঁচিয়ে বলল, 'দেখো সুমনাদি, আবার জলপিপিতে ভাসিয়ে না নিয়ে যায় যেন। আমরা এখানে স্থলপিপির কথা বলছি।'

সুমনা চলে গেছে। এসব হাঁক হাঁকড় তার কানে পৌঁচেছে কি না সন্দেহ।

নরেনের কলকাতার ঠিকানা তোমাকে আমি দিয়ে দেব। কোথায় ফরডাইস লেনে না কোথায় থাকত—গিরিধাবুর লেনে গিয়েছে। নাকি আগের জায়গাতেই আছে। আমি টুকে এনেছি সব—নরেনের কালুখুড়োর কাছ থেকে। নরেনের বাপটা যেমন জোচ্চোর—ওর খুড়ো তেমনি ভদ্র ভালো বিশ্বাসী মানুষ—

কলকাতায় যাবার আগে দিও নরেনের ঠিকানা আমাকে, কিন্তু কী হবে। যা নয়, তাই অর্চিতা। নরেনরা এর মধ্যে নেই। রাণুর আর কিছু একটা হয়েছে। তাকে ফিরে পাওয়ার কোনো কথা নেই।

নিশীথের ওসব বোকা কথা, কালো কথা শুনবার কোনো প্রয়োজন আছে স্বীকার না করে অর্চিতা বললে, 'বোশেখ মাসে নরেন কলকাতায় যাচ্ছে। ঠিক করে যাবে, গিয়ে কদিন থাকবে তোমাকে পরে জানাব আমি। কার বাড়িতে উঠবে তুমি কলকাতায়?'

আমি খুব সম্ভব বালিগঞ্জে থাকব। জিতেনের ওখানে। মস্ত বড় সাহেব তো আজকাল জিতেন। বিয়েও করেছে। জিতেনের বাড়ি ক'দিন থাকা হয় বলতে পারি না।

কলকাতায় নরেনের বাড়িতে গিয়ে জিনিসটা নিয়ে কোনো হই-হল্লা কোরো না। জিতেনবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে তোড়জোড় করে লোকজন মোতায়েন রেখে নরেনকে চা খাওয়াতে ডেকে নিয়ে যেও তোমাদের বাড়িতে।

কি করা যাবে তারপর?

তারপর কথা বের করে নিতেই হবে—যে করেই হোক। ও সব জানে, ব্যাটা ছুঁচোর ব্যাটা। হাড় ক'খানা আস্ত থাকতে দেবে না। কথা না বার করে ছেড়ে দেবে না।

আমার সঙ্গে তুমিও কলকাতায় চল অর্চিতা।

চল করমচা তলায়, উঃ বড্ড রোদ এখানে।

লজিক হাতে মানুষটি কোনোদিকে নেই তো। না নেই। চারিদিকে ভালো করে চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিল তারা। নিশীথরা এগিয়ে পড়ছিল; কিন্তু খানিকটা দূর যেতে না যেতেই অর্চিতাকে কেটে পড়তে দেখে নিশীথ পিছু ফিরে তাকিয়ে দেখল জাম তেঁতুল সরবতি লেবুর ঝাড়ের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসছে মহিম; নিশীথকে দেখেনি, অর্চিতাকে দেখেনি। না দেখবার আগে পাশাপাশি দুটো অর্জুন গাছের পিছনে সরে গেল অর্চিতা। তারপর সময় হলে বেরিয়ে নিরালা পথ দিয়ে সাঁ করে চলে গেল কেমন যেন অপরূপ পিয়াসিনীর মতন। নিশীথ ছাড়া কেউ দেখল না তাকে।

নিশীথ নরেনদের বাড়ির দিকে যাবে কি না ভাবছিল। কলকাতা রওনা হবার আগে রাণুর সম্বন্ধে বিশেষ কোনো সন্দেহ মনের মধ্যে দানা বেঁধে না উঠলেই ভালো। এ সম্বন্ধে সে পরিষ্কার হয়ে নিতে চাচ্ছিল। বারবার নিজের মনকে বলেছে সে, তার স্ত্রীকে, আরো দুচারজন লোককেও বলেছে যে, রাণুকে কোথাও পাওয়া যাবে না, এরকম উপলব্ধি দিয়ে মনটাকে শক্ত করে বেঁধে নেওয়া ভালো, কারণ, যা নেই তাকে কী করে পাওয়া যাবে। এ পৃথিবীর নিয়মই হচ্ছে এই যে, এখানে ক্ষুরধারে শ্রীহাঁদের মননের সব স্নিগ্ধ জিনিস হারিয়ে যায়; হারিয়ে গেলে আর আসে না, কোনো সুবলয়িত সৎ প্রশ্নেরই সদুত্তর পাওয়া যায় না মানুষের জীবনে। কেউ বলে উত্তর পাওয়া যাবে সেবায়েতদের কাছ থেকে। কিন্তু এরা বা বিজ্ঞানীরা যে উদ্দেশ্যের ভিতর কাজ করে তার বাইরে অনেক দরকারী নির্দেশের কোনো খোঁজ রাখে না তারা; বলে জানি না; অলৌকিকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখলে তারা বলে, আমরা নেই। নেই, এই কথাই ঠিক। নেই, কোনো উত্তর নেই। যা চাই তা নেই, যা শুভ্র ও শূন্য তাকে আহ্বান করে নিজের মনকে সুস্থ করে নেওয়া দরকার সুমনার—অর্চিতার; কিন্তু নিশীথের মনের সুস্থতার দাবি আর-একরকম। ভাবতে ভাবতে হাসি পাচ্ছিল নিশীথের।

গা ঝাড়া দিয়ে নরেনদের বাড়ির রাস্তা ধরে চলল নিশীথ।

কে আছে বাড়িতে? নরেন আছে?

নিশীথবাবু যে। আসুন। আজ কলেজ ছুটি বুঝি? নরেনের কাকা কালু মিত্তির নিশীথকে বাড়ির ছোট বৈঠকখানায় নিয়ে গেল। আর কেউ ছিল না সেখানে, 'কলেজ আজ ছুটি?'

জানি না তো আমি। নিজে ছুটি নিয়েছি আমি।

ছারপোকার চেয়ারে বসেছেন। বেতের ইজিচেয়ারটায় বসুন। ওটাকে দুদিন ধরে ডিডিটি দিয়ে ঠিক করে নেওয়া হয়েছে।

বেশ ফরাসেই বসা যাক না কেন। চমৎকার ধপধপে ফরসা কালু-বাবু, দিব্যি বসেছেন আপনি—

বসুন বসুন—তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসুন। ভেবেছিলুম ইজিচেয়ারে বেশি আরাম পাবেন।

তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসল নিশীথ। এভাবে বসবার প্রয়োজন হয়নি কোনো দিন। কেমন একটা নবাবী জমিদারীর তেলচিটে ঠেকারের ফেনায়, ফেনিলতায় ফরাস তাকিয়া উপচে উঠত তার মনে, যখনই এ জিনিসগুলোর উপর দৃষ্টি পড়ত।

আরাম পাচ্ছেন নিশীথবাবু?

পাচ্ছি। প্রকাশবাবু বাড়ি আছেন?

না। কেন বলুন তো?

পাবলিক প্রসিকিউটার হয়েছেন না তিনি?

সে তো প্রায় দুবছর হতে চলল—

বরেন কোথায়?

বরেন বাড়িতে নেই—জলপাইহাটিতেও নেই। গোল্ডফ্লেক টিনের মাথায় দেশলাই চাড়িয়ে নিশীথের দিকে এগিয়ে দিয়ে কালুবাবু বিদরির নলটা মুখের কাছে নাড়তে নাড়তে বললে: 'বরেন মেহেরপুর গেছে দিন দুই হলো।'

কবে ফিরবে?

বলতে পারি না তো।

ও তো কলেজে পড়ছিল—

হ্যাঁ, বি এ ফেল করল এবার।

কী করে আজকাল?

নিশীথের দিকে সুস্থ ধীর চিলের মতো চোখে তাকিয়ে একআধ মুহূর্ত নল টেনে নিয়ে চুপ করে কথা ভাবল যেন কালুবাবু। 'করে। হিঁয়াকা মাটি হুঁয়া ফিকো, হুঁয়াকা মাটি হিঁয়া—এই করে আর কি।'

নিশীথ হেসে বললে 'তা বটে। কলেজে পড়বে না আর?'

পড়ে কি করবে? আপনাদের চোখে ধুলো দিয়ে কত তোড়জোড় করে বি এ পরীক্ষা দিল। আঙুলের বড় বড় চওড়া নখে মিনে কেটে প্রশ্নের উত্তর লিখে নিল, ঢাকাই মসলিনের মতন একরকম কাগজ খুঁজে বের করেছে কোত্থেকে—হয়তো অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়েছে—একটা আফিমের গুলির মতো পুঁটুলিতে এক মাইল কাগজ আঁটে—তাইতে আপনাদের বি এ এগজামিনে দরকারী যত শাস্ত্র ঘেঁটিয়ে লিখে নিল—ধরতে পেরেছিলেন আপনারা?

নিশীথ অভিনিবিষ্ট হয়ে শুনছিল, জানাশোনা কথা তো সব; যে ছেলেরা বছরের পর বছর পরীক্ষা দেয় বাইশ-চব্বিশ বছর ধরে তাদের তো ঘাঁটিয়ে আসছে নিশীথ। তবুও একেবারে হালে যে-রকম রকমারি বাড়ছে ছেলেদের।

তারপরে ঘণ্টায় একশোবার করে জল খেতে আর ফেলতে বাইরে গিয়ে নোট আর তোতাপুরী ছুটিয়ে জয়হিন্দ বলে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ত—কি করতে পেরেছিলেন আপনারা। পরীক্ষার সময়ে গার্ড দিয়েছিলেন তো এদের বডিগার্ড হিসেবে।

কালুবাবু নলটা মুখে নিতে গিয়ে সরিয়ে রেখে বললে, 'আমাকেও গার্ড দিতে হয়েছিল আপনাদের কলেজের বি এ পরীক্ষায়। আপনাদের প্রিন্সিপাল লিখে পাঠালেন, আসুন একটু পাবলিক সার্ভিস করে যান। টাকা দিতে পারব না। কিন্তু, মিষ্টি খেতে দেব রোজকার ইনভিজিলেশনের পারিশ্রমিক হিসেবে। ওকালতি করে খাই, আজকাল মন্দা পড়ে এসেছে, ভাবলুম যাই-ই, একটু পাব্লিক সার্ভিস করে আসিগে। যে রুমে বরেন পরীক্ষা দিচ্ছিল সেখানেই গার্ড দেবার জন্যে ফেললে আমাকে। মিনিট পাঁচেশেক পায়চারি করে দেখছিলুম। দেখলুম, সকলেই টুকছে, সকলেই গাঁট কাটছে, আমাকে দেখে চক্ষুলজ্জার খাতিরে বরেন সুবিধা করতে পারছে না। তবে হ্যাঁ, নখগুলো বার করে দেখছে, ঢাকাই মসলিনও মাঝে মাঝে বেরুচ্ছে'।

কি করলেন আপনি?

কি আর করব। এক ছোঁয়ে দশ-বারোটা ছেলেকে বার করে দিতে হয়। এদের তাড়িয়ে দিলে বরেনকে বাদ দেওয়া চলে না। ঘরের বারান্দার দিকে দরজার কাছে বেয়ারাকে বললুম চেয়ারটা রেখে দিতে। খবরের কাগজে মুখ ঢেকে চেয়ারে গিয়ে বসলুম—নিশীথ বিষণ্ণ নিস্তব্ধভাবে কালুবাবুর চোখের নাকের আদলে পরিস্ফুট রোগা রোঁয়া ঝরা চিলের দিকে তাকিয়ে রইল। যা বললেন কালুবাবু নিশীথ জানে সব। জেনে জেনে এত ঘাগি হয়ে গেছে যে কালুবাবুকেই দেখছিল নিশীথ, তার কথাগুলোকে ততটা আর নয়।

আমাদের কলেজের একজন অধ্যাপককে দেওয়া হয়েছিল আমার সহযোগী হিসেবে। তিনিও ঐ রকম জোড়াতাড়া দিয়ে তিন ঘণ্টা কাটিয়ে দিলেন আর কি—

কালুবাবু নল মুখের থেকে নামিয়ে নিয়ে বললে, 'জানেনই তো নিশীথবাবু, সব। সে ঘরে প্রায় দেড়শো ছেলে ছিল—আমি ঘুরে ঘুরে দেখলুম, ওদের মধ্যে সত্তর-পঁচাত্তর জনকে বের করে দিতে হয়, সার্জারির কাঁচি দিয়ে কান কেটে পাছার উপর স্টেইটর লিখে। কে করবে তা? গোবেচারী প্রফেসররা না তাদের প্রিন্সিপাল? তবেই হয়েছে। জানেন না, কী ভীষণ ট্রেড ইউনিয়ন ওদের'।

ট্রেড ইউনিয়ন?

সবচেয়ে দুর্বার ট্রেড ইউনিয়ন। ওদের ব্যাপারে বেশি নাক ডোবাতে গেলে ঘরে বাইরে রাস্তাঘাটে হায়রান করে ছাড়বে মাস্টারমশাইকে—

সেঁটে ঘুষি জমিয়ে দেবে। —একটি বারো-চোদ্দ বছরের ছেলে দোরগোড়ার থেকে বললে।

ওরে হরেন—সেই ছেলেটিকে লক্ষ্য করে কালুবাবু বললে, 'তোর নরেনদা বাড়িতে আছে নাকি রে ?

না নেই—ছেলেটি ফেঁসে খসে পড়তে পড়তে বললে।

কখন আসবে ? কখন ফিরবে বাড়ি ?

নাগালের বাইরে চলে যেতে যেতে গলা বাজিয়ে হরেন বললে, 'গোরাচাঁদ কখন বাড়ি ফিরবে, শুধোচ্ছে আমাকে। ভকত ভবনের ছ্যাঁদায় পাম্প না ঢুকিয়ে, পেট না ফুলিয়ে ও ফিরছে আর।'

দেখলেন তো নমুনা,—কালুবাবু বললে।

প্রকাশবাবুর ছেলে বুঝি ?

হ্যাঁ পিনডির ছেলে বুঝি। পাম্প ঢোকাবার কথা বলছে।

ওর সাহস তো কম নয়। এ বাড়িতে কেউ নেই আর ?

কালুবাবু হাতের নলটার দিকে তরাসে পাখির মতো খুব তাড়াতাড়ি তেরছা তীক্ষ্ণ চোখ মেরে বললে, 'আপনি মাস্টার মশাইয়ের মতো কথা বললেন নিশীথবাবু। আজীবন ছেলে নিয়ে আপনাদের কারবার, অথচ চিনলেন না ওদের। নরেনের কথা কি বলছিলুম আপনাকে ? আপনাদের প্রিন্সিপাল প্রফেসর—কে পেরেছে তার সঙ্গে ? হরেন তো তার ভাই'—'

নল মুখে টেনে নিয়ে গোল্ডফ্লেকের টিনটা নিশীথের দিকে এগিয়ে দিয়ে কালুবাবু চোখ বুজে নল টানতে লাগল। টিনের থেকে একটা সিগারেট বের করে নিল নিশীথ।

এ বাড়িতে আপনি বসে আছেন, প্রফেসর মানুষ। আমি আছি—তবুও হরেন মুখ খিস্তি করে গেল। আপনারা যখন ছোট ছিলেন এরকম হতো ?

সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিল নিশীথ। তাদের ছোটবেলাকার কথাই। পৃথিবীতে তখন নানারকম অভাব-অসঙ্গতি ছিল বটে। কিন্তু মানুষের মন ঢের বেশি স্নিগ্ধ ছিল ; কুড়ি-পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেকার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল নিশীথের।

নরেনকে দিয়ে কী দরকার আপনার ? —কালুবাবু জিজ্ঞেস করল।

নরেন কি করছে সেটা আরো খুলে বলুন কালুবাবু।

ঐ তো এখানের মাটি ওখানে রাখছে—

মেহেরপুর গেছে কিসের জন্যে ? কিসের ব্যবসা ওর ?

ব্যবসা তো বাবার হোটেলে খাওয়ার। পাড়ার মেয়ে দেখে বেড়াবার—

শুনে ছ্যাঁৎ করে উঠল নিশীথের রক্তের ভিতর।

মেহেরপুর কেন গেছে বলতে পারি না—কালুবাবু একটা ঢেকুর তুলে বললে।

পাড়ার মেয়েদের দেখেই কি শুধু ?

না, নিরেমিষ দেখে চোখ জুড়োবার দিন নেই এখন নরেনের, নরেনের। সেটা হরেনের এলেম হয়ে আসছে।

সিগারেটের ছাই কোথায় ঝাড়ি—অ্যাশট্রে দেখছি না।

চোখের সামনেই তো রয়েছে আপনার।

কোথায় ?

এই যে আমার কলকেটা, এরি ভিতর ছাই ঢেলে দিন। নরেন মেয়ে দেখতে মেহেরপুর গেছে কিনা আমি বলতে পারি না। তবে এদের ভাগ্যে নানারকম শিকে ছেঁড়ে বটে—

কী রকম ?

টাকা পায়, আদর পায়। হ্যাঁ, উকিল সরকারের ছেলে বলে খানিকটা বটে। তবে নিজেদেরও কেরামৎ আছে—

মেয়েরা ওদের আমল দেয় ?

কালুবাবু নল টানছিল। কলকেটার দিকে একবার তাকিয়ে খানিকটা মিঠে ধোঁয়া মুখ দিয়ে বার করতে করতে ফেলে দিল নলটা ফরাসের উপর। সেটা আবার তুলে ধরে বললে, 'পৃথিবীতে সব জিনিসেরই জুড়ি রয়েছে। বিয়ে করবার দরকার নেই, নরেনকে নিয়ে একটু ফুর্তি করবে, এরকম মেয়ের অভাব এই জলপাইহাটিতে নেই, কলকাতার কথা ছেড়ে দিন। সে তো সোনার দেশ। ওরে হুকুম।

হুকুম করে উঠতেই চাকর এসে হাজির হলো। কালুবাবুর দিকে, নিশীথের দিকে কোনোদিকেই তাকালে না সে, নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে কলকেটা খসিয়ে নিয়ে চলে গেল।

জলপাইহাটিতে নেই ?

বাংলাদেশের কোনো গাঁ-মহকুমায় নেই। মেয়ে দরকার আপনার ?

হ্যাঁ, স্ত্রী মরছে—এইবারে এক-আধটি দেখে রাখলে হতো। নিশীথ তার নিস্তব্ধ নিঃস্পৃহ মুখে একটু হাসির আঁচ ফুটিয়ে বললে।

নরেনের সঙ্গে এই দরকার ছিল—

কখন ফিরবে তা তো বলতে পারি না—

এ বেলা ফিরবে তো ?

সেটা বোতল না দেখলে বলতে পারি না। ড্রাই জিনটিন হলে শীগগিরই ফিরবে, বেশি কিছু হলে দু-একদিন দেরি হতে পারে। —কালুবাবু বললে, টিনের থেকে একটা সিগারেট বার করে তার সিগারেট জ্বালিয়ে নিতে নিতে।

জলপাইহাটিতে আছে ?

হ্যাঁ এখানেই।

হুকুম কলকেটা সাজিয়ে এনে বসিয়ে দিয়ে গেল। সিগারেটটা নিভিয়ে ফেলে নল টেনে নিয়ে কালুবাবু বললে, 'একটা মোকদ্দমায় আটকে পড়েছে। সই জাল করে একটা মোটা চেক ভাঙিয়ে নেবার চেষ্টায় ছিল—ব্যাংক ধরে ফেলেছে। কিন্তু বড়লোকের ছেলে। জিনিসটা চাপা পড়ে যাবে। সে ব্যাংকে দাদার প্রায় দু লাখ টাকা আছে। ডিরেক-টারদের মধ্যেও দাদা আছেন, তবুও তো ওকে ধরল ব্যাংকের ছেলেরা। মোকদ্দমা অবধি করল। দাদা রোজগেরে মানুষ বটে কিন্তু হুঁশিয়ার নন। ওর ছেলেমেয়েরা ওকে নাকানি চোবানি দিয়ে, একশেষ করল। কখন যে কোনদিক ঢুঁসি মারবে—ভাবতে ভাবতে ওর ইউরিন তো অমৃত হয়ে উঠল। ইনসুলিনে কিছু হচ্ছে না—ঘুম হচ্ছে না—রোজ কড়া ওষুধ খেয়ে ঘুমোতে হয়।'

মুখের সিগারেটটা ফেলে দিল নিশীথ। কালুবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল ভদ্রলোক একটু চিন্তিত। অর্চিতা বলেছে, খুব সৎ, সত্যাশ্রয়ী মানুষ কালুবাবু, সে যাই হোক। এর ভাইপোরা অন্যরকম, প্রকাশবাবুও।

নরেনকে তো পাওয়া যাবে না এবেলা—

কেন, আপনার স্ত্রীর জন্যে তো ? তাকে রক্ত দিচ্ছে নরেন—

কথাটা ভুলেই গেছল প্রায় নিশীথ, মনে পড়ে গেল। তবুও এমন একটা কি বিশৃঙ্খলতায় মন ভরে গেছে তার—সে রক্তের বদলে নরেন যেন তার স্ত্রীকে শূন্যতা দিচ্ছে। কেবলই, এমনই একটা অদ্ভুত উপলব্ধিতে মুখটা কেমন যেন দেখাতে লাগল নিশীথের। কালুবাবু তাকিয়ে দেখল।

হ্যাঁ, রক্ত দিচ্ছে বটে। কিন্তু আপনি কাউকে বলবেন না, দু-একটা কথা জানতে চাই আপনার কাছে—

খুব গোপন কথা ? এদিকে একটু সরে বসুন। বলুন।

নরেনের রক্তে কোনো দোষ নেই তো ?

সে তো ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছেন। দোষ থাকলে ওর রক্তে চলতো তো। ডাক্তার কে ? সিভিল সার্জন ? মজুমদার ?

হ্যাঁ

তিনি দেখছেন, ঠিক আছে। না দেখেশুনে কিছু করবার মানুষ তিনি নন।

তা তো ঠিক। কিন্তু নরেন এত আঘাটা ঘাঁটিয়ে বেড়ায়—

ডাক্তার যখন রক্ত পরীক্ষা করে নিয়েছেন তখন আমাদের কিছু বলার নেই।

না না রক্তের কথা নয়। কথাটা হচ্ছে কি—নিশীথ একটা সিগারেট বার করে নিয়ে বললে : 'আপনার ভাইপোরা কেমন তালেবর তা আপনার চেয়ে বেশি কে আর জানে। সবই তো জানেন আপনি।

কিন্তু তবুও বলছি আপনাকে—নরেনদের সম্বন্ধে এমন অনেক কথা কানে আসে যা সত্যিই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, মেয়েদের ব্যাপার নিয়ে কোনো মোকদ্দমায় জড়িত হয়ে পড়েনি ওদের কেউ কোনোদিন?'

কালুবাবু নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে 'পড়েছিল।'

কেন, কী করেছিল?—

খুড়োর কি রটিয়ে বেড়ানো উচিত ভাইপোদের গুণথুরি—'কালুবাবু কিছু বলবে কি না বলবে ইতস্তত করতে লাগল কিছুক্ষণ। 'পরে নিশীথকে এসব জিনিসের থেকে আলগা গোবেচারী মাস্টার অনুভব করে নিয়ে বললে,—'গাঁয়ের মেয়েদের নিয়ে ধানক্ষেতে ছেলে কি করেছে না করেছে জানি না। তা নিয়ে মোকদ্দমা হতে পারেনি। গোঁফ চেঁচে পিছলে এসেছে। জলপাইহাটিতে মেয়েদের অনুমতিতে তাদের সঙ্গে কাজকর্ম করে ওরা, জোর জবরদস্তি করে না। কাজ শেষ হলে যে যার নিজের ঘর আলো করে বসে থাকে গিয়ে, আত্মীয়-স্বজনেরা কখনো কখনো সন্দেহ করে বটে, কিন্তু হাতে হাতে ধরতে পারে না। এখানকার ভদ্রলোকেরা আজকাল খুব হুঁসিয়ার হয়ে গেছে—প্রায় কোনো বাড়িতেই ঢোকবার উপায় নেই' নরেনদেরও চোখ তুলে কালুবাবু জিজ্ঞেস করলেন নিশীথকে। 'আপনাদের বাড়িতে যেত?'

যেত একসময়। —কিন্তু যখন যেত তখন তো কিছু শুনতে পায়নি নিশীথ। রাণুকে ওদের সঙ্গে মিশতে তো দেখেনি কোনোদিন। কি জানি, কলেজের কাজে লাইব্রেরি-র নতুন নতুন বই-জার্নালে, লেখায় পড়ায়, নিজের মনে-ভাবাবেগে এতই কি বিমুগ্ধ হয়েছিল নিশীথ যে কিছু টের পায়নি? চোখে পড়েনি তো কিছু ওর কোনোদিন। তাছাড়া কালুবাবুকে আসল কথা বলতে আসেনি তো নিশীথ। কালুবাবুকে সে জানতে দেবে না ঠিক কি সে জানতে চায়।

নরেনরা যেত একসময়। কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারত না।

কেন?

মেয়েরা ভিতরে থাকত। বড্ড লাজুক। ছেলেদের দিকে ঘেঁষত না।

ও!

দু-একটি মেয়েকে সরিয়ে ফেলবার চার্জে মোকদ্দমা হয়েছিল—কালুবাবু গর্দানে হাত বুলোতে বুলোতে আস্তে আস্তে বললে।

কবে?

বছর দেড়েক আগে—

কোথাকার মেয়ে?

একটি বারুণীপুরের আর একটি জলপাইহাটির—

জলপাইহাটির? শুনিনি তো—

শুনবেন যদি তাহলে পাবলিক প্রসিকিউটার আছে কি করতে।

নিশীথের হাতের সিগারেটের আগুনটুকু নিভে গেল নিশীথ টান দিতেই। দেশলাইটা কুড়িয়ে নিয়ে নিশীথ বললে, 'এইসব চালানির কারবার করে নরেন?'

এখন করে কিনা জানি না। তবে একসময় ঐ করে লাল হবার চেষ্টায় ছিল।

শুনে হৃৎপিণ্ডটা যেন বসে গেল নিশীথের। কিছুক্ষণ সে কোনো কথাই বলতে পারল না। ডান হাত তুলে বুকের উপর রেখে চেপে বসে থেকে বাঁ হাতের উপর ভর রেখে কাত হয়ে রইল। কিন্তু এরকমে তো চলবে না। শক্তি সঞ্চয় করে নেবার একটা অসাধ্য-সাধন সাঙ্গ করতে করতে নিশীথ বললে,—'গঙ্গাসাগরের চয়ে গিয়েছিল গতবছর?'

নরেনরা? মনে নেই তো। সব জায়গায়ই তো যায়।

কলকাতার বড় দাঙ্গার সময় কোথায় ছিল?

কলকাতায় ছিল।

হৃদয়টা কেমন করে উঠল যেন আবার, একটু সামলে নিয়ে সে বললে, 'গঙ্গাসাগরের মেলা ছিল না তখন। মেলা হয় কি মাসে? না, মেলার ভিড়ে নয়, তখন চেনা লোক চোখে পড়ে যেতে পারে। শুনেছি নরেনরা'—নিশীথ চুপ করল। শার্টের পকেট থেকে বের করে একটা ক্যাফটিনা পিল খেল। দু-তিন বছর খায়নি গত কয়েকদিন থেকে পিলগুলো খেতে হচ্ছে আবার। হার্টে অসুবিধে।

কালুবাবু বললে, 'মাঝে মাঝে সাগর দ্বীপে নৌকো করে যায় নরেনের দল। সেটা আমি জানি। মেলা থাকে, মেলা থাকে না। খুব হৈ হৈ করে গিয়ে সেখানে গা ঢাকা দিয়ে।'

গা ঢাকা দেবার খুব ভালো ঘাঁটি বুঝি?

মেয়ে-টেয়ে ছিনিয়ে আনলে কত দ্বীপ আছে—কত ঘাঁটি আছে সমুদ্রে। সেখানে দিনকে রাত করে দেওয়া যায়।

কালু নিশীথের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কোনো খোঁজখবর পেলেন?'

কিসের?

রাণু কোথায় আছে বের করতে পারলেন না এখনও?

কেউই বলতে পারে না।

নরেন হয়তো জানতে পারে—

আপনাকে কে বললে?

আমি নিজেই অনেকবার ভেবেছি। আপনি নানাদিকে তদ্বিরে ছিলেন—

তামাক টানতে লাগল কালুবাবু। কোণঠাসা হয়ে পড়েছে হৃদযন্ত্রটা। নিশীথের সিগারেট খাওয়া ভালো নয়। সিগারেট খাবার কোনো রুচিও নেই তার।

গভীর জলের মাছ। আবার বেন্দাবনের ঘাটের কচ্ছপজীও বটে নরেন; নরেন-রাণুর ব্যাপার নিয়েই অনেকদিন থেকে ওকে প্যাঁচে ফেলবার চেষ্টা করছি। কিছুতেই পারছি না।

রাণু কি বেঁচে আছে?

আছে হয়তো।

কি করে বুঝলেন?

ওকে তো কারু মেরে ফেলবার কথা নয়—

ও সেই কথা। —নিশীথ হেসে বললে, 'কিন্তু মানুষ মুখ দিয়ে কথা বলে না আজকাল, চোখে মুখ রেখে কথা বলে। যারা মেয়েটাকে এরকমভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে, তারা কী না পারে। আমাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। আমি অনেক আগেই বুঝেছি যে শূন্যকে কোটি কোটি দিয়ে গুণ করে সেই অদ্ভুত শূন্যের ভিতর থেকে কোটিকে ফিরে পেতে চাইছি। কিন্তু শূন্য কি করে কোটিকে দেবে? সে তো শূন্য।'

মনোযোগ দিয়ে নিশীথের কথা শুনে কালুবাবু বললেন, 'আমি তো এককে কোটি দিয়ে গুণ করছি, কোটিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি এক। নরেনের বাবা কুড়িকে কোটি দিয়ে গুন করছে কুড়ি কোটিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে কুড়ি। নরেন তো পঞ্চাশকে কোটি দিয়ে গুণ করছে, পঞ্চাশ কোটিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে পঞ্চাশ। শূন্য নয়, এক, দুই, কুড়ি, চল্লিশ 'আছে' 'হবে' এগুলোকে স্বীকার করে নিয়ে কাজে নামতে হয়। রাণুকে পেতে হলে নরেনকে ঢোঁড়া হতে দিতে হবে। আমি ওকে পাঁকালে আটকাবো।'

আমি কলকাতায় যাচ্ছি—

কবে?

দু একদিনের মধ্যেই।

কদিন থাকবেন?

সম্প্রতি এক মাস তো বটে—

কালুবাবু ঠোঁটে নল ছুঁইয়ে রাখল, তামাক টানছিল না, বললে, 'আমি আপনাকে জানাবো। দিন পনেরো কুড়ির ভিতরেই—'

এক বছরের মধ্যে যে জিনিসের কোনো কূল কিনারা হলো না, পনেরো কুড়ি দিনের মধ্যে কালুবাবু তার একটা কিনারা করে ফেলবেন। এরকম কত প্রতিশ্রুতি কত মানুষের কাছে পেয়েছে নিশীথ জীবনের কত পথে বাঁকে। প্রতিশ্রুতি পেয়ে ফলের জন্য অপেক্ষা করে করে টের পেয়েছে ফল আর-এক জিনিস। মানুষের, বড় মানুষের, সৎ মানুষের মুখের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কেন মানুষ এটা করে দেব, সেটা করে দেব, এরকম আশ্বাস দেয় মানুষকে? আশ্চর্য, অনায়াসে আরামে প্রতিশ্রুতি ভেঙে ফেলে। তাকিয়েও দেখতে যায় না কি বিষম আলাখোলা সরলতায় তারা বসে আছে যারা প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল।

আমি উঠি কালুবাবু।

আচ্ছা আসুন। —নিশীথের দিকে না তাকিয়ে ফরাসের উপর ছড়ানো কতগুলো নথিপত্রের দিকে চোখ রেখে অন্যমনস্কভাবে হাত তুলে নিশীথকে বিদায় দিল কালুবাবু।

বাড়ির দিকে ফিরে যেতে যেতে নিশীথের মনে হলো রাণুর সম্পর্কে নরেনকে সন্দেহ করে কথাটা কালুবাবুকে বলে মোটেই ভালো করেনি সে। অর্চিতা বলেছিল, কালুবাবু খুব খাঁটি মানুষ। অর্চিতা নিজেও কি খাঁটি? এই দুই খাঁটিতে মিলে নিশীথকে কেমন নিভৃম নিরঝুম করে রাখেনি কি—হৃদয়ের ভিতর কোটি দিয়ে গুণ করা শূন্য বললে তাকে।

পথ দিয়ে ফিরতে ফিরতে মনে হলো চোতের বাতাসের মতো তাকে ব্যজন করে চলেছে যেন সমস্ত ব্যাপ্ত নীলাকাশ; শেফালির জঙ্গলে বড় বড় বোলতার চাক সোনালী রোদে ছায়ার নক্ষত্রের মতো যেন; কত শত পতঙ্গ কেমন মিলে মিশে প্রেমে-পরিকম্পনায় সমবেদনায় উৎসারিত হয়ে মানুষের হাতে চূর্ণ নগরগুলোকে ঠাট্টা করছে মানুষের হাতে নিহত মানুষ-রাশিকে। আকাশে ফিঙে উড়ছে, হরিয়ালেরা চলেছে চোখে ঠোঁটে জলের গন্ধ নিয়ে কোনো নিকটতম নিরালা জলের মহানুভব শান্তির দিকে। যদি না মানুষের গুলি-গুলতি এসে কাউকে কাউকে উপড়ে অন্ধকারের দিকে ফেলে দেয়; মাথার উপরের সূর্যের দিকে তাকায়নি নিশীথ কিন্তু দীঘির পাড়ের খই রঙের হাঁসটা চোখ পাঁজলে দেখে নিচ্ছে সূর্যকে; অপরূপ নারী কামিতার মতো যেন; মস্ত বড় শিমুল গাছের থই থই পাতার ভিতর কতগুলো স্নিগ্ধ নিঃশব্দ কবুতর বসে আছে, হঠাৎ ধপধপে শাদা একটা কবুতর উড়ে গেল। পাখিটার ডানার আলোর ঝিলিক নিশীথের চোখে এসে লাগল—টের পেল সে মহত্তর সূর্য কোথাও অদৃশ্য থেকে সেবা করে যাচ্ছে, সুধা দিচ্ছে, অমেয়, শালীন আলোক দান করে চলেছে।

তুমি কোত্থেকে এলে? —হাসি মুখে বললে অর্চিতা।

কালুবাবুর কাছে গিয়েছিলাম।'

কেন?

রাণুর কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলাম—

আর নরেনের? —অর্চিতা বিরক্ত হয়ে বললে, 'এক্ষুনি জিজ্ঞেস করতে গেলে কেন?'

কেন কি হয়েছে? তুমি না বললে খুব ভালোমানুষ কালুবাবু—

অর্চিতা ভ্রূকুটি করে হেসে বললে, 'তোমার চেয়ে ভালোমানুষ তল্লাটে নেই। আচ্ছা যাও, যা হবার হয়েছে—আমাকে গিয়ে ঠিক করে দিতে হবে। কিছু জানতে পারলে রাণুর কথা?'

না।

গোরু। তবে যে সব গাইগোরুর মুখ হরিণীর মতো অর্চিতা অনেকটা সেই রকম। তাকিয়ে দেখছিল নিশীথ একটা হরিণী সেঁমিজ পরে মহিষের শরীরের ভিতর দিয়ে দেওয়ালের ভিতর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল যেন কোথায়। না, অদৃশ্য হয়নি তো, ঐতো দাঁড়িয়ে আছে; হরিণীর শরীরের ভিতর দিয়ে ছলছল করে উঠছে জল নদীর, রাত্রির, যেখানে সূর্য নেই, শুদ্ধ দেশের রাত্রির জল ছলছল করে উঠছে—তারার ফাঁকে ফাঁকে যে অন্ধকার আছে সেগুলোকে জলোচ্ছ্বাসিত করে—কতশত তারার শরীর, কতশত অন্ধকার নদীর এলোপাথাড়ির ভিতর জল শুধু এখন, রাত্রি শুধু—শাশ্বত রাত্রি।

* *

নিশীথের কলেজ কমিটির সেক্রেটারি হরিলালবাবুর বাড়িতে কলেজ কমিটির প্রায় সব মেম্বারই এসে জড়ো হয়েছিলেন। কলেজের গভর্নিং বডির কোনো মিটিং নেই আজ। চার পাঁচদিন পরে মিটিং। হরিলাল-বাবু এদের ডেকে আনেননি। এমনি সারাদিনের কাজকর্মের পর বেড়াতে বেড়াতে হরিলালবাবুর বাড়িতে এসে জুটেছেন তাঁরা।

হরিলালবাবুর সুন্দর চালতে ফুলের রঙের নতুন বড় দালানটার দোতলার হলঘরে বসে কথা হচ্ছিল। হরিলালবাবু এখানকার বার লাইব্রেরির একজন বড় বুড়োটে উকিল। যখন এদেশে উকিল-টুকিল বেশি ছিল না তখন প্র্যাকটিশ শুরু করে, সঙ্গে সঙ্গে নানারকম হোসিয়ারী ব্যবসা চালিয়ে অনেক টাকা কামিয়ে গিয়েছেন। কলকাতায় বাড়ি আছে হরিলালবাবুর, ভুবনেশ্বরে আছে। হরিলালবাবু যদি আজকের দিনে ওকালতি শুরু করতেন তাহলে—লোকে বলে—এ'টোকাঁটাও জুটত না তার, শামলা এ'টে বটতলায় দাঁড়িয়ে দিন কাটিয়ে দিতে হতো। কিন্তু যে লোকটা ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করে গুছিয়ে নিয়ে সকলের ঘাড়ে পা লটকে বেড়াচ্ছে তার সম্বন্ধে ধোঁয়াটে কথা পেড়ে কি লাভ এখন তার।

কলেজ কমিটির সেক্রেটারি হবার কথা কলেজের প্রিন্সিপালের। কিন্তু জলপাইহাটিতে কলেজের প্রিন্সিপাল কালীশঙ্করবাবু এখানকার লোক নন। কিন্তু এখানকার মানী মানুষকে মর্যাদা দেবার জন্যে আগ বাড়িয়ে হাত কচলাবার মতো জুড়ি নেই এদেশে কালীশঙ্করের। কি করে হরিলালকে একটু সুবিধে করে দেওয়া যায়, কি করে এখন একটু পিছিয়ে থেকে নিজের আখেরের সুবিধা করে নেওয়া যায়। এজন্যে সবসময়ই চোখ কান খাড়া কালীশঙ্করবাবুর। বছর তিনেক আগে ছমাসের জন্যে কলেজ কমিটির সেক্রেটারির কাজ চাপিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু দেখেছিলেন যে কমিটির মিটিংয়ে গভর্নিং বডির মেম্বারেরা সকলেই প্রায় হরিলালের দোহাই দিয়ে কথা বলে, মুখ চেয়ে থাকে হরিলাল চাটুয্যের। মেম্বাররা সকলেই প্রায় ষাটের কাছাকাছি—কেউ কেউ সত্তর ঘেঁষে। ইয়ং ব্লাডের অভাববোধ করছিলেন কি কালীশঙ্করবাবু? কি জানি, এ বিষয়ে তিনি মনে মনে কিছু স্থির করে উঠতে পারেননি। ভাবছিলেন হয়তো কমিটিতে উকিল ছোকড়ারা এলে অবস্থা আরো খারাপ হবে। বাংলাদেশে মফস্বল কলেজ কমিটিতে অন্তত—বারো আনি চোদ্দ আনি জায়গা উকিলদের ছেড়ে দিতে হবে। তুমি আমি দিচ্ছি না এটা অলিখিত চুক্তি অনেক দিনের—কিন্তু কার সঙ্গে? জানা নেই। কিন্তু ছেড়ে দিতে হবে। কে চালাবে দেশ উকিলরা ছাড়া? উকিলদের মামলা মিটিয়ে কলেজ কমিটির বাকি জায়গাটা মুখচেনা ডাক্তার বা জমিদারের ঝাড় বংশের জন্যে ছেড়ে দিতে হবে। শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপার—কিন্তু শিক্ষাদাতাদের জায়গা কোথায় কলেজ কমিটিতে? ওদের? ওদের নিয়ে কী হবে? ওরা তো সোয়াশো দেড়শো টাকার মাস্টার। ওরা আর হোমিওপ্যাথ ডাক্তাররাই তো স্বাধীন ব্যবসা চালাচ্ছে দেশে—সব ঘাটের জল খেয়ে তারপর ছোট শিশির জল ধরেছে। কেউ কেউ কলেজে ঢুকে পড়ছে।

যখন একা চুপচাপ বসে থাকেন নিজের বাড়িতে দোতলার বারান্দায়—ইজিচেয়ারে—তখন তার মনে এরকম দু-চারটে কথা নড়াচড়া করে বটে, কিন্তু তিনি নিজে তো চারশো টাকা মাইনে পাচ্ছেন—শীগগিরই পাঁচশো হরিলালবাবুকে একটু তাঁবে রাখলে সাড়ে পাঁচশো হয়ে যাবার সম্ভাবনা—সোয়া পাঁচশো হয়ে যাবে এই যে মাসের গভর্নিং বডির বাসন্তী-নিদাঘ বৈঠকে। কথা দিয়েছেন হরিলালবাবু। খোকা হ্যাঁচকা ইশারাগুলোর গলা টিপে শেষ করে ফেলেন কালীশঙ্করবাবু। প্রিন্সিপাল তার নিজের নিরালা কোয়ার্টার্সও পাবেন—মস্তবড় কলেজ ময়দানের একটেরে—নিম ঝাউ আমলকী জামগাছের ছায়া রোদের ভিতর বেশ বড়সড় সুন্দর একটা কাঠের বাংলোবাড়িতে। অ্যাসবেসটসের ছাদ। একতলা বাড়ি—অনেক উঁচুতে মেঝের পাটাতন। চমৎকার চঙের মতো কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হয়—যেন সুখী স্মিতকাম শান্তিপ্রাণ শ্রমণ তার নির্জন আশ্রম মন্দিরে প্রবেশ করছে। আঃ আ-হ্-হ্—হা-হা-হা। চোতের বাতাসে পিঠ বুক জুড়িয়ে নিতে নিতে ভাবছিলেন। কালীবাবু তো এই পদ্মার পারের দেশের লোক নন। তিনি এসেছেন বেহার-বাংলার প্রত্যন্তে থেকে অথচ এ দেশের লোকের মন মজিয়ে তিনি এদেরই মামা-মেসোর চেয়েও গলায় গলায় আজ। সবসময়ই জলপাইহাটির নিঃশ্রেয়স (শব্দটি সম্প্রতি কলকাতার তাস-সিগারেট-বই-বুকনির দু-চারজন বৃত্তান্ত পাণ্ডিতের কাছ থেকে শিখে এসেছেন) নিঃশ্রেয়সের চিন্তা মানে ঠিক কল্যাণ কামনা করেন।

[ক্রমশ]

বাংলাদেশের সাহিত্য

কেনাকাটার সম্পর্কে

সৈয়দ শামসুল হক

বস্তুতপক্ষে আজকাল তার কোনো প্রকাশক নেই। লেখাটা শেষ করে মাহমুদ এখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিজেকেই বলল, 'আরো একটা ভার বৃদ্ধি হলো।'

বাইরে তাকিয়ে সে দেখতে পেল, দুপুরের আলোয় ফিকে গোলাপী আভা। এখন ঠিক ঠিক বাজে একটা উনত্রিশ মিনিট। এখুনি সূর্যাস্তের রঙ ধরে গেছে: দেখতে দেখতে আলোটা আরো গোলাপী হয়ে উঠল। মাহমুদ ভাবল, আত্মরক্ষার জন্যে একটা পিস্তল কিনতেই হয়।

বন্দুকের দোকানে গিয়ে একটা পিস্তল পছন্দ করে রাখলে মন্দ হয়না। লাইসেন্স পাওয়া গেলে তখন কেনা যাবে। লেখাটায় স্বাক্ষর করে তুলে রাখতে যাবে, হঠাৎ কলমটা পড়ে গিয়ে নিব ভেঙে গেল। অনেকদিন সঙ্গী ছিল কলমটা। সেও এখন তাকে ছেড়ে গেল। ফেরার পথে একটা কলম কিনতে হবে।

বাইরে আলোটা এখন যে মাত্রায় গোলাপী হয়েছে, দেখে মনে হয়, সূর্যের সামনে কে একটা রঙিন পরকলা পরিয়ে দিয়েছে।

বন্দুকের দোকানে মাহমুদের পছন্দ হলো ঝিনুক বসানো বাঁটওয়ালা ছোট্ট একটা পিস্তল।

"আচ্ছা, লাইসেন্স হয়ে গেলে এটা নিয়ে যাবো।'

'আপনি এখুনি নিতে পারেন।'

দোকানদারের কথায় অবাক হলো মাহমুদ। দোকানদার তখন দেয়ালে একটা নোটিশের দিকে মাহমুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে বলল, 'ঐ দেখুন, সরকার আগ্নেয়াস্ত্রের উপর থেকে লাইসেন্স তুলে নিয়েছেন। আজ সকাল থেকে।'

পিস্তলটা পকেটে পুরে বেরলো মাহমুদ।

এই তো কলমের দোকান। সোনার, রুপোর, নানা রঙের, নানা মাপের কলম। একেবারে ঝকঝক করছে। একই কোম্পানীর কলম সে আজীবন ব্যবহার করে আসছে। তাই পছন্দ করতে সময় লাগল না। অবিকল আগের মতোই একটা কলম দেখিয়ে দাম জিজ্ঞেস করল সে। বছর দশেক আগের চেয়ে দাম এখন দ্বিগুণ। তা তো হবেই। টাকার দাম কমছে বই বাড়ছে না।

'দিন এটা।'

দোকানদার জিজ্ঞেস করল 'লাইসেন্স আছে?'

আরো একবার একজন দোকানদার তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল দেয়ালে ঝোলানো নোটিশের দিকে। এটাও আজ সকালে জারী হয়েছে। ঘন গোলাপী আলোতেও স্পষ্ট পড়া গেল।

কণ্ঠস্বর, ঢাকা, এপ্রিল '৮১

কৌতুকী

এক বোকা চাষী মাঠে লাঙল দেবার সময় একদিন চকচকে একটা আয়নার টুকরো পেল। সে আয়না চিনত না। মুখের সামনে ধরতেই চাষীর বিশ্বাস জন্মাল—এটা তার মৃত বাবার প্রতিবিম্ব। ফলে, ভক্তি সহকারে সেটা বাক্সে রেখে গোপনে সকাল-সন্ধ্যায় প্রণাম

জানাতে লাগল। ব্যাপারটা চাষী-বৌ একদিন দেখে ফেলল। চাষীর অবর্তমানে সেটা একদিন সে বার করে দেখল এবং স্বগতোক্তি করল: তাই ভাবি, দু'বেলা এত আঠা কিসের —এই রাক্ষুসীর খপ্পরে পড়ে ডুবে ডুবে জল খাওয়া।

★

একজন উঠতি তরুণ কবি তার অধ্যাপকের বাড়ি গিয়ে বলল: দুটো দারুণ অগ্নিগর্ভ কবিতা লিখেছি। আপনি শুনবেন? দুটোর মধ্যে যেটা আপনার ভাল লাগবে সেটাই পত্রিকায় পাঠাবো।

অধ্যাপক ব্যস্ত ছিলেন, তবু, নিস্পৃহভাবে বললেন, 'পড়ো'। ইনিয়ে বিনিয়ে আধ ঘণ্টা ধরে প্রথম কবিতা পাঠ সাঙ্গ হতেই অধ্যাপক বললেন: আর পড়তে হবে না। দ্বিতীয়টাই পাঠাও।

★

সব সময়ে টাটকা চিন্তা করতে পারেন নবীনবাবু। অফিসের সহকর্মী অসিতের ছেলে হয়েছে। সে নবীনবাবুকে বললো: একটা টাটকা নাম দিন দেখি আমার ছেলের। একেবারে ব্র্যানড নিউ নাম। কেউ ইউজ করেনি এমন।

নবীনবাবু বললেন: নাম রাখো এসমো'।

★

ক্লাসে দু'টি ছেলের গণ্ডগোলে বিরক্ত হয়ে শিক্ষক বিষয়টা জানতে চাইলে একজন দাঁড়িয়ে বলল: ও বলছে, লাথি মেরে আমার মাথা ফাটাবে।

শিক্ষক হেসে বললেন: ওরে নির্বোধ, লাথি মেরে মাথা ফাটান যায় না।

উত্তেজিত ও ভীত ছাত্রটি: আপনি জানেন না স্যার—ওর কাঠের পা।

★

সংবাদপত্রের কার্যালয়ে ফোন করছেন এক ভদ্রমহিলা: দেখুন, কাল রাতে আমাদের গাড়িটা চুরি গেছে—আপনাদের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে চাই. রেটটা জানাবেন?

উত্তর: প্রতি আড়াই সেন্টিমিটারে চল্লিশ টাকা।

—ভদ্রমহিলা: দুঃখিত, বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্ভব হলো না—আমাদের গাড়িটা সাড়ে চার মিটার লম্বা। অনেক টাকা লাগবে।

★

বাড়ির কাছেই ডাক বাক্স। চিঠিটা ফেলার মুহূর্তে আকস্মিক ঝড়ের

ঝাপটায় সেটা হাত ফসকে উড়ে চলল এলোমেলোভাবে। চিঠির পিছনে ছুটতে ছুটতে একসময় সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল। হা-ক্লান্ত হয়ে বসে পড়তেই একজন বললেন: যেতে দিন, সম্ভবত স্বাভাবিক সময়ের আগেই এবং হয়তো নিশ্চিতভাবে ওটা গন্তব্যে পৌঁছে যাবে।

★

ডাক্তারের পরামর্শে বাচ্চা মেয়েটাকে চশমা দিতেই হলো। প্রথমদিন আমি উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করছি, কখন স্কুল থেকে ফিরবে—চশমার কারণে বিভ্রাট হলো কিনা।

এমন সময় সে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘরে ঢুকতেই জিজ্ঞাসা করলাম: হ্যাঁ রে, চশমা চোখে কিছু পার্থক্য বুঝলি?

উত্তর: হ্যাঁ, আন্টিদের হাতের লেখা অনেক ভালো হয়ে গেছে।

★

আমাদের নিয়মিত আড্ডায় একজন বন্ধু ক'দিন অনুপস্থিতির পর সেদিন এসেই উত্তেজিত হয়ে বলল: আঠারো হাজার, ভাবতে পারিস আঠারো হাজারের প্রাণ নেই—নির্বাক-নিঃস্পন্দ। সবাই বিমূঢ় বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম: সে কী? কোথায়? কেমন করে? কবে?

বন্ধুটি উদাসীনভাবে বলল: আমি এইমাত্র দিল্লি থেকে আসছি, সেখানে আঠারো হাজার টেলিফোন কাজ করছে না—মৃত।

★

পারিবারিক শিক্ষককে ছাত্রীর প্রশ্ন: মাস্টার মশাই, বি. এ-তে কি কি নেব?

শিক্ষকের তাৎক্ষণিক উত্তর: তোমরা তো বরপক্ষ নও যে বিয়েতে পণ হিসাবে নগদ, টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি পাবে। অতএব, সব মেয়েই যা নেয়—শাড়ি, গয়না, প্রসাধন-সামগ্রী এই সবই নেবে।

★

শিক্ষক: বলতো রবি, একটা পাকা কলার দাম পাঁচ পয়সা হলে এক টাকায় কটা কলা হবে?

রবি বলল: অঙ্কে ভুল আছে স্যার! কলার জোড়া চল্লিশ পয়সা।

সংকলিত

গল্প

প্রতিকৃতি

'ঐ ছেলেটিকে তুই দিনের পর দিন পঙ্গু করে দিচ্ছিস। এখন থেকে পয়সা দিয়ে লোভ বাড়িয়ে রাখলে ও আর কোনোদিন পরিশ্রম করতে চাইবে না।' সহকর্মী থেকে আরম্ভ করে বন্ধু-বান্ধবেরা সবাই সুবিনয়কে বলেছে একথা।

সুবিনয়ও কথাটা চিন্তা করেছে অনেকদিন। প্রতিদিন ভেবেছে, একটা পয়সাও ওর হাতে দেবে না। কিন্তু ছেলেটিকে দেখা মাত্র সুবিনয়ের হাত আপনা আপনি পকেটে চলে যায়। একগোছা পয়সা তোবড়ানো অ্যালু-মিনিয়মের বাটিতে ঝনাক শব্দ করে ওঠে।

সেদিনের সেই উলঙ্গ ছেলেটি এখন দড়ি লাগানো প্যাণ্ট পরে, প্রতিদিন নলহাটী পশ্চিম রেলগেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। অফিস ফেরতা বাবুদের দিকে অ্যালুমিনিয়মের বাটিটা এগিয়ে দেয়। কেউ কেউ দু'চার পয়সা দেয়। অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নেয়। তবুও সে ক্লান্ত হয় না। দানাপুরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। সে জেনেই গিয়েছে, একজন তার তোবড়ানো বাটিতে একগোছা পয়সা দেবেই।

ছেলেটির নাম জানে না সুবিনয়। বাঙ্কা বলে ডাকে। উত্তরও দেয় ছেলেটি। আজও যথারীতি দাঁড়িয়ে আছে বাঙ্কা। নবাগতা স্ত্রী রমলাকে নিয়ে ট্রেন থেকে নামে সুবিনয়। বিকেলের পড়ন্ত রোদ গায়ে মেখে ওরা হাসতে হাসতে এগিয়ে যায় রেলগেটের দিকে। সামনে এসে দাঁড়ায় বাঙ্কা। হঠাৎ হাসি থেমে যায় সুবিনয়ের। ডান হাতটা যন্ত্রচালিতের মতো প্যাণ্টের পকেটে চলে যায়। তারপরই ঝনাক শব্দ ওঠে অ্যালুমিনিয়মের তোবড়ানো বাটিতে।

এগিয়ে চলেছে সুবিনয়। রমলা বলে, 'একটা ছেলেকে অতগুলো পয়সা দিয়ে কী লাভ?' উত্তর খুঁজে পায় না সুবিনয়। বাড়িতে এসে পুরনো অ্যালবামটা খোলে। দেখে, মায়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকা সেই ছোট্ট সুবিনয়, অনেকটা বাঙ্কার মতো। বুকটা ভারি হয়ে ওঠে। একটা অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে সুবিনয়। গরম শলাকার মতো কানে এসে বেঁধে ছ'বছর আগের একটি মেয়েলি কণ্ঠস্বর: 'এ আপনি কী করলেন! জানেন তো আমি বিধবা।'

সীতা

আজকাল চিন্তাটা বেশ জট পাকিয়ে ওঠে। প্রথমে এতটা ভাবেনি ভুলু।

চোদ্দ বছর আগে ভোরের দিকে মাঠে লাঙল নিয়ে যেতেই বিলের ধারে কাঁদতে দেখেছিল, ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মতো একটি সদ্যজাত মেয়েকে। নিঃসন্তান ভুলু বুকে জড়িয়ে ধরে ঘরে ফিরেছিল। সরমার কোলে দিয়ে বলেছিল: 'সীতামাকে আনলাম। যত্ন করিস।'

সেই থেকেই সীতা…।

সীতা যৌবনে পা দিয়েছে। সরমা উঠে পড়ে লেগেছে তার বিয়ের জন্য। কিন্তু বিয়ে দেওয়ার টাকা কোথায় ভুলুর! পরের জমি চষে যা পায় তাতে কোনো রকমে দিন চলে যায়। কিন্তু বিয়ের টাকা…

আজ ভুলু ভাবে, এইসব সীতাদের লেগে কুনু রাম কি জন্মায়নি, যারা পণের ধনুকটারে ভাঙতি পারে…!

অরুণ মুখোপাধ্যায়

পুরোনো বই : নতুন পাঠক

অসাধু সিদ্ধার্থই বাংলা সাহিত্যের প্রথম খলনায়ক

যুদ্ধ পরবর্তী পৃথিবীর জীবন ধারায় তখন ভাঙনের ঢল নেমেছে। য়ুরোপীয় ন্যাচারালিজমের মোহে মুগ্ধ 'কল্লোল', 'কালিকলম'-এর লেখকরা সদ্য বড় বড় চুল রাখতে আর পাঞ্জাবীর কাঁধ ছিঁড়তে শুরু করেছেন। জোলার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্রোলেতারিয়া, হাক্সলির বুদ্ধিজীবি ধুতি-শাড়ি, কোর্তা-কাঁচুলির খোলশ বদলাচ্ছে মাত্র, আরও কি, স্কান্দিনেভীয় ভবঘুরে নায়কেরা রাতারাতি বাংলা সাহিত্যের জমিতে ঘাঁটি গাড়লেন। যে শর্ত য়ুরোপীয় সমাজ কাঠামোর সে শর্ত যে এখানে বেতর-বেথাপ্পা-বেশর্ত, একথা তাঁরা চেপে গেলেন বেমালুম। এতদিনে 'কল্লোল' 'কালিকলম'-এর লেখকরা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তথাকথিত অ-রাবীন্দ্রিক ঝড় তুলে অথচ রোমান্সের পুতুপুতু ভাবালুতা আশ্রয় করে ছোটো বড় গল্প-উপন্যাস লিখছিলেন। কৃত্রিম রোমান্টিক জীবন ও ড্রয়িংরুমের আলাপচারিতা, মর্বিড বিষণ্ণতা একটা নতুন আদর্শ স্থাপন করতে চাইলেও, প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ বাস্তবতা, প্রাণ-ভরা সহানুভূতি সত্ত্বেও জীবন সম্পর্কে সামগ্রিক বোধের অভাবে, এ'দের লেখা-লেখি সেই যুগে কিছুটা জনপ্রিয় হলেও, পরে তার প্রভাব ক্ষীণতর হয়ে আসে। ঠিক সেই যুগে, যেন অনিবার্য ছিল, জগদীশ গুপ্তের (১৮৮৮-১৯৫৭) Bizarre বা Uncanny মৌলিকত্ব যা পাঠকের চোখের আঁশ খুলে দিল।

জগদীশ গুপ্ত-র 'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশক রাখহরি শ্রীমানী অ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা। প্রকাশের তারিখ নেই। খুব সম্ভবত উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ সালে। ক্রাউন, ১৯৩ পৃষ্ঠা। মূল্য : একটাকা চার আনা। উৎসর্গ—ছায়াপথ যার আভরণ, ধূমকেতু যার কলঙ্ক, সেই শূন্য-কে।

বাংলা সাহিত্যের নবীন পাঠকদের কাছে জগদীশ গুপ্ত কী এক অজ্ঞাত কারণে, আজও অনালোচিত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাংলা সাহিত্যের পালাবদলের ইতিহাস যাঁরা অনুসন্ধান করবেন, তাঁরা স্বীকার করবেন পাঠকের কাছ থেকে আরও বেশি মনোযোগ তাঁর পাওনা ছিল। তবে তিনি যেহেতু লেখক, নট নন—আশার কথা এই যে নগদ বিদায় না পেলেও দেহাবসানে তাঁর সব লেখা হারিয়ে যায়নি। নতুন যুগের পাঠক আজ হয়তো আবার নতুন করে জগদীশ গুপ্ত বিষয়ে উৎসাহী হবেন।

কথা উঠতে পারে জগদীশ গুপ্ত বিষয়ে আমাদের উৎসাহ কি তবে নিতান্ত ঐতিহাসিক কারণে? সোজা কথা—সমকালে উপেক্ষিত লেখক বিষয়ে উত্তরকালে পাঠকের হঠাৎ উৎসাহী হবার তাৎপর্যটা কী? সেটা নানা কারণে হতে পারে। প্রথমত, যদি সেই লেখক চিন্তাধারায় তাঁর যুগ থেকে এগিয়ে থাকেন। দ্বিতীয়ত, সমকালীন কোনো প্রভাবশালী লেখকের বিপুল জনপ্রিয়তা যদি বিপরীত ধারার কোনো লেখক বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে। তৃতীয়ত, সময় বা যুগের বদলের সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে প্রাসঙ্গিকতা প্রয়োজন ও সম্ভব বলে।

জগদীশ গুপ্ত-র 'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাসটির নায়কই সম্ভবত বাংলা সাহিত্যের প্রথম খল-নায়ক। অসাধু সিদ্ধার্থ কপট ও দুষ্ক্রিয়াসক্ত। 'সিদ্ধার্থ' তার নামই নয়। তার নাম নটবর, নিরলঙ্কার নটবর…কেবল নটবর, প্রয়োজন বোধ করিলে মাত্র দাস শব্দটা জুড়িয়া দিত অতিশয় বিনয়বশত। কিন্তু বহুদিন হইতে নটবর সিদ্ধার্থ নামেই অবাধে চলিয়া আসিয়াছে।

এই গোপনচারিতা কেউ টের পায় নাই, তাই অনুসন্ধিৎসু হইয়া আজ ঐ পরিবর্তন

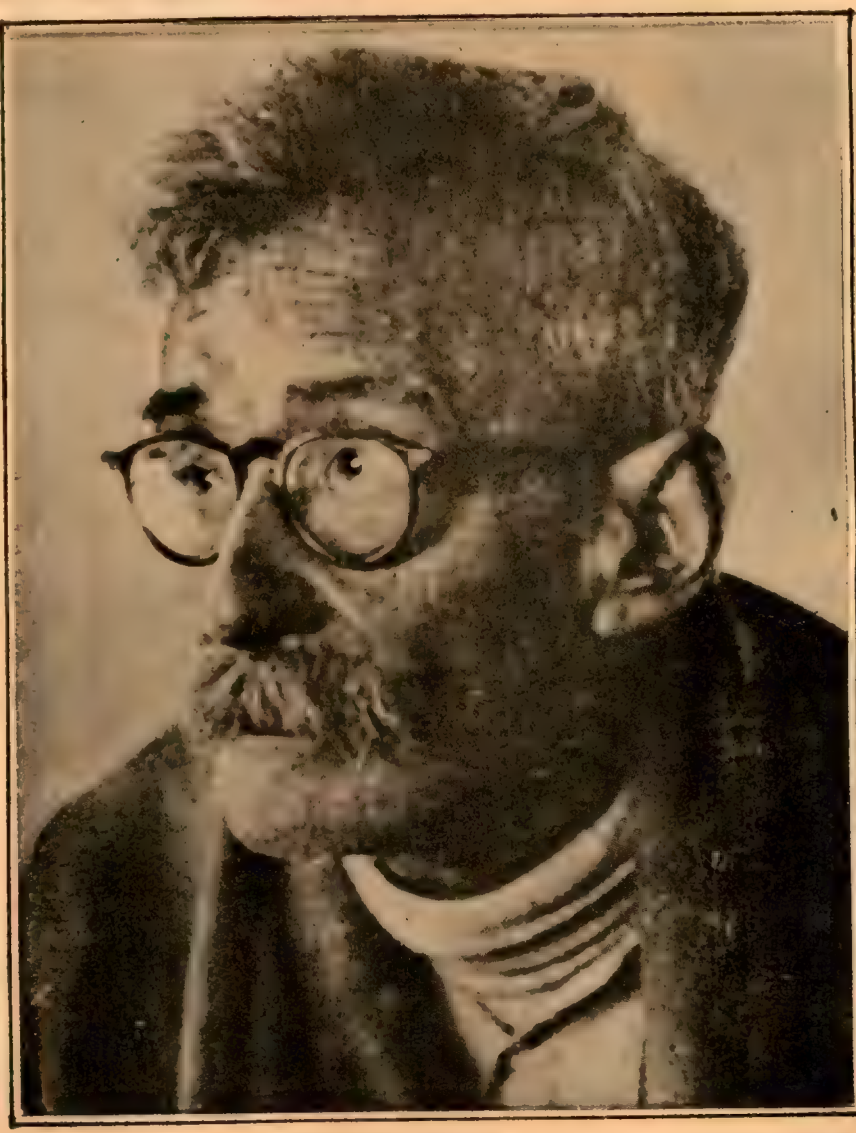

জগদীশ গুপ্ত

সম্পর্কে কেহ প্রশ্ন করে নাই।

নিজের মনে তার বিবিধ প্রশ্ন জাগে—'

সিদ্ধার্থর বড় টাকার অভাব। ঋণ মিলছে না, মিলছে কেবল ঋণ পরিশোধের জন্য অসহিষ্ণু কঠিন তাগিদ। এমনি সময়ে পাওনাদার রাসবিহারী রায়ের পরামর্শ সিদ্ধার্থকে ভাবিত করে। পলাতক সিদ্ধার্থের মনে হয় 'সে যেন গলিত কর্দমকুণ্ডের কৃমি, মানুষের পাদস্পর্শের যোগ্য সে নয়, কোথায় একটু দুর্বলতার ফাঁক ছিল, তাহারই সুযোগ লইয়া দুনিয়া তাহাকে ভুলাইয়া ফুসলাইয়া প্রবঞ্চক ইতর সাজাইয়াছে—তারপর তাহাকে গায়ের জোরে ভদ্রসীমার বাহিরে ঠেলিয়া দিয়াছে।' সিদ্ধার্থ পাহাড়ী প্রপাতের খাদে আত্মহত্যা করতে যায়। 'সে জলে আকাশের প্রতিবিম্ব নাই। কিন্তু যেন আকাশ ছাড়াইয়া পরলোকের প্রতিবিম্ব তাহার অন্তরে সজীব হইয়া উঠিয়া আকর্ষণ করিতেছে, কেবলি বলিতেছে 'আয়! আয়!'

অতলে গর্জন করিতেছে মৃত্যু।

কিন্তু সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া গেল অশেষ জীবনের নিগূঢ় ইঙ্গিত—অসীম আঁধার সাগরের উপর জ্যোতির্ময় শতদল ফুটিয়া উঠিয়া তাহারই অঙ্গপ্রভায় দিগন্ত পর্যন্ত স্বর্ণপ্রভাতের মতো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সম্মুখে কত রঙের মেঘ স্তরে স্তরে সাজান, রঙের আর শেষ নেই—স্তরের প্রান্তরেখায় তরল সোনার ঢেউ; পীত মেঘের গর্ভান্তরাল হইতে অসংখ্য সূক্ষ্ম রশ্মির সূত্রগুলি ছুটিয়া বাহির হইয়া আকাশের মধ্যস্থল অমনি একটু স্পর্শ করিয়াই মিলাইয়া গেছে, সুপ্ত সন্তানের মুখের উপর জননীর নিঃশ্বাসের মতো বায়ু অতি সতর্ক; পুষ্পতর হিল্লোলে হিল্লোলে আকাশের গা বাহিয়া ক্রমে ঊর্ধ্বে উঠিয়া দিক-সীমানায় লীন হইয়া গেছে। এই ছবিটা সিদ্ধার্থের আগে চোখে পড়ে নাই।

তাই সিদ্ধার্থর মরা হইল না।'

পরবর্তী অধ্যায়ে সিদ্ধার্থের বেঁচে ওঠার পৃথক গল্প। সে অজয়ার প্রেমে পড়ে বা বলা যায় অজয়ার জন্য সে ধীরে ধীরে বিস্তার করে কারুকার্যময়, রহস্যের সূক্ষ্ম জাল। এখানে তার কপটতা থাকলেও তা অন্তর্লীন, ক্ষমার যোগ্য। কারণ তার প্রেমে কোনো খাদ ছিল না, যা ছিল তা কেবলমাত্র দেশ-প্রীতি, সমাজ-সংস্কার, বিচার-বুদ্ধি, ভূয়োদর্শন, বাকচাতুর্য, অভিনয় ইত্যাদি বাহারী তাসের ম্যাজিক। এখানে সে আত্মমগ্ন হয়, শুনতে পাই:

'জীবনযুদ্ধে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা কীট-পতঙ্গে আছে—সেটা বিধিদত্ত প্রেরণা। তবে আমি মানুষ হয়ে কেন টিকে থাকতে চাইব না? ...আলবৎ চাইব।' কীট-পতঙ্গ, উদ্ভিদ রং বদলায়। আমি একটু নাম বদলেছি; কিন্তু মানুষ ত' আমি সে-ই আছি। ধরণী সব সুখ কৃপণের মত লুকিয়ে রেখেছিল—এতদিন পরে তার অঞ্জলি তপস্যার ফলের মতো আমার সম্মুখে ছড়িয়ে দিয়েছে। কেন আমি তা' দু'মুঠো ভরে কুড়িয়ে নেব না! দেবতা পূজান্তে আমায় বাঞ্ছিত বর দিয়েছে; আমি কেন তা প্রত্যাখ্যান করবো! কেউ কখনো তা করেনি। আচার্য সেদিন বক্তৃতায় বলছিল, পাপ একবার প্রবেশ করলে সে ক্ষত খনন করেই চলে—সে-ক্ষতের ধন্বন্তরি প্রেম। প্রেমই বটে। আজ আমার মনে হচ্ছে—অতীত আর বর্তমানের মাঝখানের একটা পূর্ণচ্ছেদের রেখা টেনে দিই আমি—'

সিদ্ধার্থ ভুলতে চায় তার অতীতকে, যা বিকৃত। সে এখন সর্বত্যাগী মহাপুরুষ সিদ্ধার্থ বসুর লাঠি আর নাম নিয়েছে। তারই ভূমিকা অভিনয় করে মুগ্ধ করেছে একটি নারীকে। সিদ্ধার্থ বাঁচতে চায়। অথচ তার জন্মে অভিশাপ আছে। অথচ তার চোখে এখন রয়েছে দুঃস্বপ্ন। শ্মশানে চিতা জ্বলছে। চিতায় আগুনে ধোঁয়া নেই, কিন্তু তার অবিশ্রান্ত সোঁ সোঁ শব্দ নিবিড় নিস্তব্ধ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে যেন তরল আগুনের একটা স্রোতের মতো বয়ে চলেছে। চিতায় শোয়ানো শবটি দেখা যাচ্ছে। পুড়তে পুড়তে শবটি কাঠের শয্যার উপর উঠে বসে—ধীরে ধীরে মাটিতে পা রেখে নেমে দাঁড়ায়—আগুনের ভিতর থেকে বাইরে এল। চোখ তার নির্নিমেষ। সে এসে সিদ্ধার্থর সামনে দাঁড়াল, বলল—'চিনতে পারছ?'

—না, কে তুমি?

—আমি সিদ্ধার্থ। আমার প্রত্যাবর্তন আশা করনি বুঝি?

—তুমি ত' মৃত।

—না, আমি জীবিত। বিবাহ করতে যাচ্ছি। আমার পরিচয় চুরি করে যাকে তুমি মুগ্ধ করেছ, সে ত' আমার। তুমি তার কে?

এমনি সময়ে অজয়া আসিল। কপোলে তার প্রথম অভিসারের প্রগাঢ় লজ্জা।

হাতে তার সদ্যস্ফুট শুভ্র মল্লিকার একগাছি মালা। অজয়া হাসিমুখে তাহারই দিকে অগ্রসর হইতেছিল। শবটি হাত তুলিয়া নিষেধ করিল; বলিল - তুমি ওকে ভালবাসো না; তুমি ভালবাসো আমার গল্পটিকে। জানো না লোকটা জারজ, অর্থ লোভে কুরূপা বৃদ্ধা বারাঙ্গনার সেবা করতো। তুমি তার গলায় এসেছ মালা দিতে! —বলিয়া দেহ হাত বাড়াইয়া দিলো।

অজয়ার শান্ত স্বপ্নালস চোখে হাসির দীপ্তি ঝলকিয়া উঠিল। সে সেই হাতের হাড় জড়াইয়া ধরিল।

অসহ্য যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত হইয়া সিদ্ধার্থ শবটিকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইতেই পিছন হইতে কে মার মার করিয়া উঠিল—মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব তোর। চমকাইয়া পিছন ফিরিয়া সিদ্ধার্থ দেখিল, যার দোকানে সে বালক ভৃত্য ছিল, সেই মুদি—লাঠি তুলিয়া তাড়িয়া আসিতেছে। পলায়নের উদ্দেশ্যে ছুটিবার উপক্রম করিতেই সিদ্ধার্থ মাটিতে পড়িয়া গড়াইয়া চলিল—যোয়া শেষ হইলে লাটিম যেমন করিয়া গড়াইয়া ছোটে। অজয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। সেই হাসির শব্দ কানে লইয়া সিদ্ধার্থ ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে।'

তারপর আসল সিদ্ধার্থের মাতামহ এলেন একদিন। বিয়ের ঠিক আগে। সিদ্ধার্থ বসু ওরফে নটবর দাসকে দেখে বৃদ্ধ হাত চাপড়ে বললেন—'কিন্তু সিদ্ধার্থের যে আর একদণ্ডের পরমায়ু; সে যে বাঁচবে না......তোমরা সিদ্ধার্থ বলছ কাকে? ওর নাম নটবর, বৈষ্ণবীর গর্ভে এক ব্রাহ্মণের জারজ পুত্র ও......এক বৃদ্ধা বেশ্যার শয্যাচর ছিল অর্থলোভে।'

সবশেষে নটবর দাসের সেই অসংকোচ স্বীকারোক্তি 'ভগবান জানেন আমি নিরপরাধ। নিয়তির চক্রান্তে ভালোবেসেছিলাম। ভালোবাসার তাড়নায় আর প্রতিদানের লোভে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি। কিন্তু আমি তো সেই মানুষ!...তার কি ক্ষমা নেই!'

কিন্তু জগদীশ গুপ্ত প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের মতো 'ক্ষমাসুন্দর চোখে' পৃথিবীকে দেখেননি। তাঁর মেজাজের সঙ্গে পরিচিত না হলে তাঁকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা। কেননা চটক বা চমক সৃষ্টির আগ্রহ তাঁর ছিল না, সেকথা রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করে গেছেন। প্রচণ্ড তিক্ততা নিয়ে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব কি না তা নিয়ে তর্ক চলতে থাকুক, কিন্তু সস্তা রিয়ালিজমের মোহে বিভ্রান্ত হবার মতো লেখক জগদীশ গুপ্ত ছিলেন না। সিদ্ধার্থ কপট ও দুষ্ক্রিয়। কিন্তু সব অসাধুতা সত্ত্বেও নঞর্থকভাবে শেষ ইস্তক সে শহীদ ও সাধক হয়ে ওঠে। প্রচলন-নির্ভর উপন্যাসের সমস্ত ধারাকে ভেঙে ফেলে হিংস্র একটি প্রাসাদ গড়ে উঠেছে, আস্তে আস্তে যার ভিতরে দমবন্ধ স্বাভাবিকতা এক অসাধারণ অভিজ্ঞতার চাপে টান টান হয়ে ওঠে এবং ছিলা কেঁপে উঠে টংকার দেয় সকল হতাশা ও ব্যাধির ভিতর, দিগন্ত পেরিয়ে অন্য আকাশ থেকে আলো এসে পড়ে। যেখানে কোনোখান থেকেই আলো এসে পড়ে না, সেখানে এক ভয়ংকর গহ্বরে সিদ্ধার্থর বাঁকাচোরা তোবড়ানো শক্ত শরীর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। জগদীশ গুপ্ত তাই বলেছেন: কিছুতেই বাঁচা যায় না।

স্বপন সরকার

সাম্প্রতিক বই

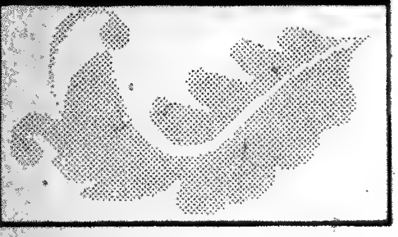

কীর্তির্যস্য ঃ ভবতোষ দত্ত।
অনিমা প্রকাশনী, কলকাতা॥
বারো টাকা।

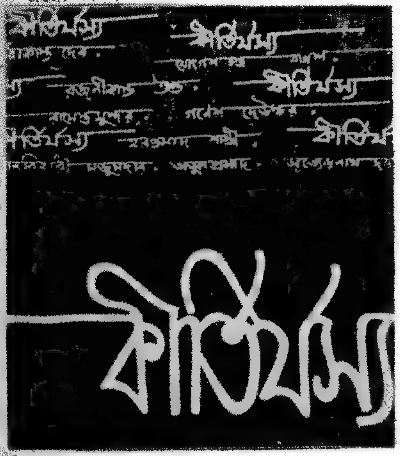

ভবতোষ দত্ত

বইয়ের নামেই এর পরিচয় ঃ কতিপয় কীর্তিমান বাঙালি বিদ্বজ্জনের কথা লেখকের আলোচ্য। লেখাগুলি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধাকারে নানা উপলক্ষ্যে রচিত। তাই সব মিলিয়ে কোনো সংহত বক্তব্য এখানে ঠিক প্রত্যাশিত নয়। আলোচ্য কীর্তিমানদের মধ্যে আছেন রাধাকান্ত দেবের মতো বিদ্বান সমাজনেতা এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রজনীকান্ত গুপ্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন, যোগেশচন্দ্র বাগল ও বিমানবিহারী মজুমদারের মতো চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক। আছেন সখারাম গণেশ দেউস্করের মতো দেশহিতৈষী এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অতুলপ্রসাদ সেন ও প্রমথ চৌধুরীর মতো কবি, গীতিকার ও প্রাবন্ধিক।

এই বই প্রসঙ্গে একটা কথা প্রথমেই লক্ষ্য করা প্রয়োজন। উনিশ শতকের নবজাগরণ ও সাধারণভাবে বঙ্গসংস্কৃতির আলোচনায় যাঁদের নাম অনবরত উচ্চারিত হয় তাঁদের প্রসঙ্গ এখানে তেমন নয়। আলোচ্য সংকলনের পিছনে তাই এক অনুচ্চারিত লক্ষ্য কাজ করেছে বলে মনে হয়। যাঁদের বিষয়ে আমাদের মনোযোগ তুলনায় কম অথচ যাঁদের কৃতিত্ব তুচ্ছ করার মতো নয় এমন কয়েকজনকেই যেন চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। একথা তো মানতেই হবে যে, এমনকি রাধাকান্ত দেব সম্বন্ধেও আমাদের চর্চায় এখনো পর্যন্ত কিছুটা কার্পণ্য রয়েছে। সিপাহি যুদ্ধের ইতিবৃত্তকার রজনীকান্ত গুপ্ত সম্বন্ধেও বা কজনে তেমন খোঁজখবর রাখেন? রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও সাধারণ পাঠকের কাছে শুধুমাত্র ছাত্রপাঠ্য বিজ্ঞান প্রবন্ধের লেখক। রামেন্দ্রসুন্দরের 'জিজ্ঞাসা' যে যুগজিজ্ঞাসা এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে ভবতোষ দত্ত তাঁর আলোচনায় ত্রিবেদী মনীষার এক পূর্ণাঙ্গ রূপ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের বহুচারী মনন মূলত একটি বিশেষ বিন্দুতে সংহত ছিল, তা বিগ্রস্ত জ্ঞানচর্চা মাত্র নয়। সেই কারণেই তাঁর আলোচনায় স্থান পেয়েছে এমন কিছু প্রসঙ্গ যা মানবচিন্তায় perennial পর্যায়ভুক্ত। রামেন্দ্রসুন্দর প্রবন্ধে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের আভাস আছে, যদিও লেখক এটিকে বিস্তৃত করেননি। রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তায় আধুনিকতা ও অদ্বৈতবাদের সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে। সমন্বয়ের স্বরূপ স্পষ্ট নির্দেশিত হয়নি। অন্তত এই সমন্বয়ের পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা থাকলে তা প্রয়োজনীয় হতো। মার্কস ও বেদান্তের সমন্বয়ের কথাও তো ইদানীং কারো কারো চিন্তায় পাওয়া যাচ্ছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বেলাতেও ভবতোষবাবু তাঁর বহুশ্রুত কীর্তি চর্যাগীতি ছাড়িয়ে অন্যত্র দৃষ্টি দিয়েছেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত আবিষ্কার হরপ্রসাদের প্রত্নসন্ধানের অন্যতম ফসল। এই প্রসঙ্গে পালযুগের ইতিহাস উদ্ধারের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। হরপ্রসাদের এই ঐতিহাসিক কৃতিত্বের সঙ্গে তাঁর 'বেনের মেয়ে' কেও মিলিয়ে নিয়েছেন লেখক।

একটি তথ্যের বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। রাধাকান্ত দেবের জন্ম সালটি ঠিক কী? ভবতোষবাবু লিখছেন ঃ রামমোহনের দশ বৎসর পরে রাধাকান্তের জন্ম। কিন্তু রামমোহনের জন্ম-সাল তো বিতর্কিত—১৭৭২ না ১৭৭৪? মনে হয় ভবতোষবাবু ১৭৭৪-কেই গ্রহণ করেছেন। সেই হিসেবে ওঁর মতে রাধাকান্তের জন্মসাল ১৭৮৪। যোগেশচন্দ্র বাগলের মতও তাই। কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'-এ এই সাল দেওয়া হচ্ছে ১৭৯৩। মৃত্যু ১৮৬৭তে। তখন ওঁর বয়স নাকি ৭৫ বছর হয়েছিল। মৃত্যু সাল বাগলের মতেও ১৮৬৭। মৃত্যুকালে রাধাকান্তের বয়স সম্বন্ধে যোগেশচন্দ্র কিছু বলেননি। এই দুই সালের মধ্যে হয়ত যোগেশচন্দ্রের সালই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু একটু অসুবিধে আছে। ভবতোষবাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রের রচনা বলে ১৮৬৭-র Calcutta Review-এ প্রকাশিত Life of Raja Radhakanta Deb নামে একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন। ১৮৬৭-র Calcutta Review (Vol. XLV, No. Xc, Art III.)-এ Radhakanta Deb নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধে লেখকের নাম ছিল না। লেখাটি যে কিশোরীচাঁদ মিত্রের, ভবতোষবাবু সেরকম কোনো তথ্য উল্লেখ করেননি। সে যাই হোক, ঐ প্রবন্ধে বলা হচ্ছে ঃ 'Radhakanta Deb was born at his uncle's house at Simlah, Calcutta, on the 1st choitro, in the Saka' 1705, corresponding with 10th March, 1783 A.D.' (পৃ. ৩১৭)। ১০ মার্চ তারিখটা যোগেশচন্দ্রও বলেছেন। তবে এক বছর পরে—১৭৮৪। এই গোলমালটা কি শকাব্দ থেকে খ্রিস্টাব্দে পরিবর্তন করার জন্য হতে পারে? বিশেষ করে সন্দেহ হয় এই জন্যে যে, শব্দকল্পদ্রুমের ভূমিকাংশে শ্রীকালীপ্রসন্ন শর্ম্মণের নিবেদনে পাওয়া যায় ঃ 'গ্রন্থকর্ত্তুর্জন্ম। ১৭০৫ শকাব্দে চৈত্রস্য প্রথম দিবসে জাতঃ শ্রীরাধাকান্তদেবঃ। 1784 A.D.'

সমাজপ্রশ্নে রাধাকান্তের রক্ষণশীলতাই আমাদের মনে যাতে বদ্ধমূল না হয়, সেজন্য ভবতোষবাবুর দু'একটা মন্তব্য খুব প্রয়োজনীয়। শব্দকল্পদ্রুমকে 'মানবিকী বিদ্যার' দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থিত করা কিংবা ভাষামাধ্যম প্রশ্নে রাধাকান্তের মত তুলে ধরা এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই সহায়ক। ভাষার প্রশ্নে রাধাকান্তের মত এখনো বা এখনই যথেষ্ট আধুনিক বা প্রগতিশীল মনে হতে পারে।

সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রসঙ্গে শ্রীদত্ত লিখছেন ঃ 'ধর্মের সাহায্যে জাতিগঠন কল্পনা রবীন্দ্রনাথেরও ছিল (পৃ ৭৯)। এ-মন্তব্য কিছুটা বিভ্রান্তিকর। ৮১ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের ধর্ম বিষয়ে যে মন্তব্য আছে তার আলোতেই এই সমীকরণ আপত্তিজনক নয় কি? ঐ প্রবন্ধের ৮৩ পৃষ্ঠায় আছে ঃ 'ধর্ম ও সামাজিক সংস্কারের দ্বারা একদিন রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হবে—রামমোহনের এই বিশ্বাসের মধ্যে নিহিত ছিল সুদূর ভবিষ্যতের একটি পরম আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন।' এই স্বপ্ন কি স্বাধীনতা? তা যদি হয়, তাহলে রামমোহনের চিন্তায় তার স্বরূপ কি খুব স্পষ্ট ছিল? এই ধরনের আরো কিছু কিছু মন্তব্যে বর্তমান সমালোচকের খুঁতখুঁতি থেকে যায়। রজনীকান্তর গদ্যশৈলীর খুব সংক্ষিপ্ত হলেও, যে-বিশ্লেষণ আছে, তা মনোজ্ঞ। আমাদের চারিপাশে শিথিল রচনার যে আবর্ত, সেজন্য এর তাৎপর্য আরও গভীর।

যোগেশচন্দ্র বাগল প্রসঙ্গে লেখক যোগেশ-

চন্দ্রের 'ঐতিহাসিকের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টি'র উপর জোর দিয়েছেন। ঠিকই করেছেন। সর্বসাকুল্যে বইটি পড়ে উপকৃত হই নানা চিন্তা ও প্রশ্নের উদ্রেক ঘটে।

সৌরীন ভট্টাচার্য

আলোক বর্ষ ঃ অমর মিত্র।
অন্বেষা, কলকাতা। নয় টাকা।

অমর মিত্র নবনিরীক্ষার লেখক। পূর্ব প্রকাশিত 'মাঠ ভাঙে কালপুরুষ', 'পাহাড়ের মানুষ', ও 'বৃদ্ধ' উপন্যাসে তাঁর শাস্ত্রবিরোধী চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। প্রথাসিদ্ধ গল্প বলাই যে লেখকের নির্ধারিত কর্তব্য নয়, সে কথা আবার প্রমাণিত হলো তাঁর 'আলোকবর্ষ' উপন্যাসে।

লেখক-সমালোচক ফর্স্টারের 'yes—oh dear yes—the novel tells a story' —ইত্যাদি মন্তব্য আধুনিক উপন্যাসের মূল্য বিচারে যে এখন কত অপ্রাসঙ্গিক, তা আর আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। স্যামুয়েল বেকেটের 'Malone Dies' উপন্যাসে তাই সন্নিবিষ্ট মৃত্যুশয্যায় শায়িত একটি মানুষের বিবশ স্মৃতি, বিচ্ছিন্ন চিন্তার ইন্দ্রজাল। অথবা আলবেয়ার কামু-র 'The Fall' উপন্যাসে প্রধান উপজীব্য ঠিক কোনো ঘটনা প্রবাহ নয়; বরং দু-একটি ঘটনার মাধ্যমে একটি মানুষ তার অস্তিত্বে, অবস্থার পর্যালোচনায় কী ভাবে চরম আত্মজিজ্ঞাসায় পৌঁছে যায়—এই সমীক্ষাতেই লেখক নিযুক্ত। বেকেট বা কামুর সঙ্গে একত্র অনুচ্চারণীয় হলেও, অমর মিত্রের 'আলোকবর্ষ' উপন্যাসেও, অমিতাভ রায় চরিত্রটি ঠিক যেন কোনো ঘটনার সিঁড়ি পার হয় না কখনো। তার বিষাদ, ব্যর্থতা, তিক্ততা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য হয়েছে। অমিতাভর স্ত্রী করুণা, তার পূর্ব পরিচিত বন্ধুরা, মানসিক রোগগ্রস্ত মা ইত্যাদি কেউই যেন নির্দিষ্ট ঘটনায় আবদ্ধ হয়ে পাঠকের চোখের সামনে আসে না। অনেকাংশেই এরা অমিতাভর স্মৃতির কবর খুঁড়ে পাওয়া অভিজ্ঞতার ফসিল। তমলুকের মহাপ্লাবন, নীলাম্বরের টাকার শোকে পাগল হওয়া, করুণার অকালপ্রসব ইত্যাদি বিচ্ছিন্ন ঘটনাপ্রবাহ যেন অনেকটাই অমিতাভর বিশিষ্ট মানসিকতায় বিধৃত।

পড়তে পড়তে মনে হয়, অমর মিত্র এক্সপ্রেশনিজম ও সুররিয়্যালিজম এই দুটি ধারাকে যেন মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, যদিও উপস্থাপনা কখনো বা খানিকটা কৃত্রিম ঠেকেছে। গটফ্রিড বেন এক্সপ্রেশনিজম রীতির মাধ্যমে সভ্যতার যে অশান্তি ও অসুস্থতাকে প্রতিভাত করেছিলেন, তা বাংলা সাহিত্যেও কম প্রভাব ফেলেনি। সত্তর দশকের মানসিক, রাজনৈতিক অস্থিরতা, অসহায়তাকে যেন এক্সপ্রেশনিজম রীতির সাহায্যে অমর মিত্র অনেকটা সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। অমিতাভ আর করুণা তাই সর্বক্ষণ ভয়, সংশয়, অনাস্থা নিয়ে বেঁচে থাকে। বন্যা অমিতাভর মা-কে পাগল করে দিয়ে গেছে। স্বামী-স্ত্রী ভূমিকম্পের ভয়কে বুকে পুষে রাখে। Yeats-এর ভাষায় একেই বুঝি বলে ঃ 'Things fall apart; the centre cannot hold'. এমনকি অনাগত শিশুকেও যেন পৃথিবীতে স্থান দেওয়া অসম্ভব মনে হয় ঃ 'আমরা দুজনে কাঠ হয়ে শুয়ে আছি। অসহ্য গুমোট। এখনো গর্ভপাতের সময় আছে।' এই একই অস্থিরতার শিকার সার্ত্র-র 'The Age of Reason' উপন্যাসে ম্যাথু ও মার্সেল। প্রায় একই ভাবে তারা গর্ভপাতের কথা ভাবে ঃ 'Well—I suppose one gets rid of it, eh?' 'Right. I've got an address', said, Mercelle'. অমিতাভ-করুণার বন্যা-ভূমিকম্পের ভয় যেন আদৌ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের নয়। বরং এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দুঃস্বপ্ন অনেকটাই যুগের মানসিক বিপর্যয়ের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রসঙ্গে বারবার মনে পড়ে যায় কামু-র 'The Plague' উপন্যাসটির কথা, যেখানে মহামারি প্রকৃত মূল্যবিচারে একটি প্রতীক ছাড়া আর কিছুই নয়। আলোকবর্ষ উপন্যাসে সুররিয়্যালিস্ট রীতির প্রভাবও সুস্পষ্ট। সুররিয়্যালিস্ট রীতির ধরনে তাই লেখক অবিরাম চেষ্টা করেছেন অমিতাভর মগ্নচৈতন্যে ডুব দিতে। সৃষ্টি করেছেন Internal Monologue-ধর্মী আত্মকথন, দ্রুতদর্শন রীতিতে অবিরত, হঠাৎ (abrupt) পাল্টেছেন স্থান, কাল, পাত্র; বিষয়কে বিধৃত করেছেন স্বতন্ত্র নিয়মে। এই তরুণ লেখকের স্বকীয়তা শক্তি ও নৈপুণ্য অভিনন্দনযোগ্য।

তবে বর্গভীমার Myth টিকে স্থানিক পর্যায় থেকে আরো সার্বিক গুরুত্বে স্থাপন করলে বোধহয় সুপ্রযুক্ত হতো। মলাটে সুবোধ দাশগুপ্তর ভূগর্ভের পটভূমিকায় পড়ন্ত ছিন্নভিন্ন উদভ্রান্ত মানুষ, নিষ্পত্র গাছের প্রচ্ছদ বিষয়ানুগ এবং প্রশংসনীয়।

দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিয়মাবলী

যাঁরা লেখা পাঠাবেন

- লেখা কপি রেখে পাঠাবেন। আমাদের পক্ষে কোনো লেখা ফেরত দেওয়া বা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়।
- লেখা সম্পর্কে মতামত জানার জন্য জবাবী খাম, পোস্টকারড বা ডাকটিকিট পাঠানোর দরকার নেই। লেখা মনোনীত হলে কিংবা বিবেচনাধীন থাকলে আমরাই চিঠি দেব এক মাসের মধ্যে। তবে অমনোনীত কবিতা এবং গল্প সম্পর্কে কোনো চিঠি দেওয়া হয় না।
- বিবেচনাধীন বা মনোনীত লেখা কবে কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হবে, সে সম্পর্কে কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব নয়।
- হালকা নিবন্ধ দু'হাজার শব্দের মধ্যে এবং প্রবন্ধ সাড়ে তিনহাজার শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- সব রচনাই চলিত ভাষায় লিখতে হবে।
- তরুণ লেখকদের কবিতা, গল্প, হাসির গল্প ও রসরচনা সাদরে গৃহীত হবে।
- প্রয়োজনবোধে লেখা সংক্ষেপ করা কিংবা পরিমার্জনের অধিকার সম্পাদকীয় দপ্তরের থাকবে। কোনো লেখকের সে বিষয়ে আপত্তি থাকলে স্পষ্ট করে জানাবেন।
- লেখা ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় বামদিকে মার্জিন রেখে কালিতে লিখবেন।
- লেখার শেষ পৃষ্ঠায় পুরো নাম-ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। পুরো ঠিকানা দেওয়া না থাকলে লেখা বাতিল করা হবে।
- লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ সম্পাদক, শিলাদিত্য। ইত্যাদি প্রকাশনী (প্রাইভেট) লিমিটেড। ৪৭ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭২।

লিটল ম্যাগাজিনের পাতা

বাংলাভাষায় নিয়মিত ও অনিয়মিতভাবে অনেক লিটল ম্যাগাজিন বেরোয়। অনেক তরুণ সাহিত্যসেবীর আন্তরিক শ্রম ধৈর্য রক্ত ও ভালোবাসায় এসব পত্রিকা প্রাণবান। কিন্তু বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠী এ সব পত্রিকার বিভিন্ন স্বাদ ও বিচিত্র রচনাগুলির আস্বাদ পান না নানা কারণে। আমরা প্রতি সংখ্যায় আমাদের পছন্দমতো কিছু রচনা বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিন থেকে এখানে উৎকলন করব। প্রথাবিরুদ্ধ, অবাণিজ্যিক, তেজী ও সংস্কারমুক্ত এ জাতীয় রচনায় যে বিশিষ্টতা তা সহজলভ্য নয়।

আবুল বাশারের গল্প

চোর

নজর আলি চোর নয়, জোচ্চোরও নয়। নজর আলি ক্ষেতমজুর, জনমুনীশ। কিন্তু ইটে-সরানের কামুমণ্ডলের বাড়ি দক্ষিণ-খাটতে এসে ধরা পড়ল চুরির দায়ে। সামান্য চুরি। ছিঁচকে চোরের মতো তার বদনাম হয়ে গেল। থালা বাসন বাটি ঘটি, ছিঁচকেরা এর বেশি ওঠেনা। তার বেশি উঠলে তারা সামলাতে পারে না। তাদের লোভ বেশি, ক্ষমতা কম। কিন্তু প্রায় নির্লোভ নিরীহ বেচারা নজর কেন যে অমন মুখ-হাসানো চুরিতে প্রলুব্ধ হলো, গগন কিংবা শারাফৎ বুঝে পেল না।

ওরা তিনজন, নজর, শারাফৎ আর গগন একটা টীম। প্রতিবারের মতো এবছরও ওরা দক্ষিণে জন-খাটতে এসেছিল দূর পূর্বাঞ্চল শাদিখাঁর দিয়াড় থেকে মুর্শিদাবাদের আর এক প্রান্তে।

বাইরে আসা মানেই; ওরা বলে, দক্ষিণে আসা। ইটে-সরান তাদের অঞ্চল থেকে পশ্চিমে না দক্ষিণে ওরা জানে না।

যাই হোক পেটের দায়ে উপায় থাকে না বলেই চৈতালী ওঠার আগে বেকার টাইমে ওদের ঘর ছেড়ে আসতে হয়। এসময় সরকারী রিলিফ-ওয়ার্কে কুলান হয় না, তাছাড়া সে-কাজের নিশ্চয়তাই বা কোথায়!

ওরা এসেছিল। কাজ শেষে ফিরছিল।

গতকাল সন্ধ্যায় ওদের এখানের কাজের মেয়াদ শেষ। কাক-আঁধারী ভোরেই ওরা মণ্ডলবাড়ি ত্যাগ করেছিল। বাড়ির মনিবকে কোনো জানান না দিয়ে এভাবে পালানো কেন? শারাফৎকে নজর বুঝিয়েছিল—গত রাতেই মণ্ডলকে সে জানিয়ে দিয়েছে, ভোর ভোর না গেলে বাস পেতে দেরি হবে, পথে অনেক ঝামেলা, তাছাড়া এক মাসের উপর হয়ে গেল, বাড়ির জন্য জান পুড়ে যাচ্ছে। ভোরে হয়ত আর দেখা হবে না। মণ্ডল-পরিবার যেন কোনো দুঃখ না পায়।

শারাফতের মন খুঁৎ খুঁৎ করছিল। ওদের বলে আসা হলো না। ভাবতে ভাবতে ওরা গাঁ পেরিয়ে চলেছে। ঠিক মাঝ পথেই বিপত্তি। পিছন থেকে তেড়ে এসে মণ্ডলের ছেলে আলতাফ ওদের পাকড়াও করল। নজরের ঝুলি-ঝম্পায় হাত ঢুকিয়ে আলতাফ মণ্ডল একটা ফুল-কাঁসার দুধ থালা বার করে ফেলল। এই থালায় করে ডেলি ওদের তরকারি আর খেজুর গুড় জলখাবার রুটি-সহ দেওয়া হতো! কী লজ্জা! শেষে গেরস্তের ঘরে চুরি! এত বড় অবিশ্বাস, নেমকহারামী কাজ!

রাগে ক্ষোভে দুঃখে শরমে বুড়ো শারাফতের জী-জান মুষড়ে তেঁতো হয়ে গেছে। নজরকে তার দলের, তার গেরামের লোক বলে পরিচয় দিতেও ঘেন্না হয়।...

ধরা পড়ার পর নজরের চোখে মুখে কোনো ত্রাসের, লজ্জা বা পরিতাপের ভয়ডর দুর্দশার চিহ্ন মাত্র ছায়া পড়েনি দেখে শারাফৎ, গগন অবাক হয়ে গেল। আলতাফও কিঞ্চিত আশ্চর্য হলো। গাঁয়ের লোকের সামনে বুক ফুলিয়ে একটা খুব ভালো কাজ করার সাফল্যে গর্ব-স্ফীত যুবক নজর আলি কেমন অদ্ভুত চোখ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

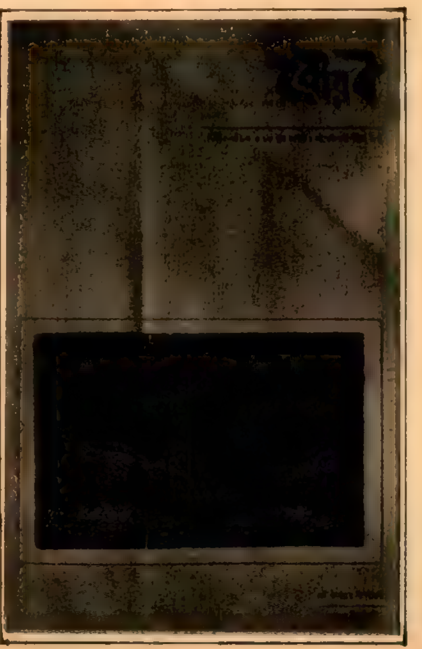

গাঁয়ের লোকের একাংশ মণ্ডলের বাহির পালাঙ্গায় (উঠোনে) জড়ো হলো, অদ্ভুত এই চোরটাকে দেখতে। এই চোরটার নাক কান কেটে দিলে কেমন হয়?

দাগী চোরের বেলা থানা পুলিশ জেল-হাজৎ হলে গেরস্তের মনে শান্তি আসে। হাড়-গোড় গুঁড়িয়ে দিলে মনে সুখ লাগে। কিন্তু যে এখনও চোর হয়ে ওঠেনি, হাত-খড় করতে প্রথম চান্সেই ফেঁসে গেছে, যে এখনও বেশির ভাগটাই সৎ; তার বেলা শাস্তির বহর নিয়ে নানা রকম মতান্তর দেখা দেবেই। সে যেন আর কখনই চুরি না করে সেটা যেমন দেখতে হবে, তেমনি শাস্তিও খুব কঠোর হলে চলবে না। আবার তাকে খালি খালি ছেড়ে দিলেও চুরির অভ্যাসে উৎসাহ দেওয়া হয়।

নাক কান কাটা? তা যেন বড়ই নিষ্করুণ এবং অতিরিক্ত। দাগ দিলে সে তখন দাগের নির্লজ্জায় চুরির কলংকে নির্ভয় হয়ে পাকা চোর বনে যাবে।

অতএব ওকে মারো। কিল ঘুসির সতর্ক ব্যবহার দিয়ে জব্দ এবং কলংক মুক্ত কর। হাতের থালাটা মুচড়ে কেড়ে নাও।

বল কেন তুই চুরি করেছিলি? তোর বদনামের ভয় নেই? চোর চুরি করে, বেশ লাগে। তুই কেন করবি? তুই না দরিদ্র জন-মুনীশ! তোর ঘর-সংসার ছেলে বউ নেই? তাদের তুই মুখ রাখলিনে। তোর পাপ হবে না?

নজর বললে—আমি চুরি করিনি। আমি চোর লই।...

তুই তবে কে? কী তুই?

আমি সন্তান। মায়ের পোলা।

কে তোর মা? এখানে মায়ের কথা উঠছে কেন? 'মা' বলে কেঁদে ওঠা অনেক চোরের ধম্ম বলে শুনেছি। মায়েদের মন গলিয়ে বাঁচার পথ খুঁজছো তুমি? তোকে এবাড়ির মেয়েরা সন্তানের মতোই বিশ্বাস করেছিল, কাঁসার বাসনে খেতে দিয়েছে, কাঁসার গেলাসে পানি দিয়েছে, ঘরের মানুষের মতো যত্ন আত্তি পেয়েছিস, তার পরও তুই চুরি করলি কেন?

নজর বললে—মাকে আমি ঢের ডাকলাম, মা সাড়া দিলে না। মোর দুকখু হবে নে? মা সামনে সামনে ঘুরল, মায়ের রাঙা পা, কপালে লাল টিপ, সুনার গড়ন মা আমার, কথা কয় না। দুকখু হবে নে? মাকে ঢুঁড়াচি কত মুল্লুক। এই গিরামের অন্দর মহলে

সন্ধান লিয়ে মাকে দেখলাম, মা স্লাড়া দিলে না, সন্তানকে ছুয়াগ দিলে না, মা কুনু কুশল লিলে না, আমার দুকখু লাগবে নে ?…

দরোজার আড়ালে, বৈঠক খানায় বাড়ির মা বোনেরা এসে দাঁড়িয়েছে। তারা দেখছে এ এক আজব দৃশ্য। চোরের এত বড় স্পর্ধা মানুষ কখনও দেখেনি।…

তাহলে তুই মায়ের ঘরে চুরি করলি ? 'মা' 'মা' ডাকটা তো খুব শিখেছিস নজর ?

নজরের গর্বিত ঈষৎ ফাঁকা হয়ে থাকা বাঁকা ঠোঁটে এবার একটু হাসির ছোঁয়া লাগে। এদিক ওদিক চেয়ে উদ্ধত মাথা বাঁদিকে হেলে কাত করে দেয়। সে তার মাকে খুঁজতে থাকে বৈঠকের দরোজার আড়ালে লালপাড় শাড়ীর আঁচলের ইশারায়।

আলতাফের হাতে আঁকড়ে ধরা দুধ-থালার, চমক দ্যাখে রোদের ঝিলিক লেগে ওঠা ঝলকানী লাগে চোখে। চোখে তার আশ্চর্য লোলুপতা চমকায়। লোকেরা তার চারপাশে ঘন হয়ে ঘিরে চেপে ধরে বেষ্টনীর বেড়া তুলে। তাকে ওরা পালাতে দেবে না। নজরের হাসি-চাউনী পাগলের মতো স্ফুরিত হয়। শারাফৎ আর গগনকে সে চেয়ে দেখে মনে মনে বলে—'আহম্মক !'

শারাফৎ শেষ অব্দি অনুনয়ের ভাষায় আবেদনের সুরে সব দোষঘাট মাফ চেয়ে বলে—মুগুল বাবাজী ! লজর ছেলে মানুষ, ইবারের মত্তন ক্ষ্যামা ঘেন্না করে দ্যান, সাত জন্মেও ও ব্যাটা চুরি-চামারী করবে না, গাঁয়ে লিয়ে গিয়ে ব্যাটাকে মুই এক-হপ্তা 'আটক' রাকব, মাথায় ঘোল ঢালব, এই পিতিজ্ঞা করচি বাবা !

নজর কটমট করে শারাফতের মুখ পানে চেয়ে বিরক্ত হয়। একজন তা দেখে বলে—বেশরম।

আর একজন বলে—কদাকার !

আর একজন বলে—মেজাজের দাম লাখ টাকা। শালা জমিদার ! মারো শালাকে ! ইজ্জতে ঘা দাও। শালা বুঝুক, ফুল কাঁসার থালার কিমতি কত !

একজন বুড়ো মতো বলে ওঠে ঃ ছোকরার মাথার দোষ আছে। চোর নয়। আর এক-জন বলে—চোর নয়ত কি ? ওকি দরবেশ ?

নজর বলে—আমি গরিব ! মা আমার বড় নোক ! তাই এত ঘেন্না দিলে জানে !

ঘেন্নার কাজ তুমি করলে কেন ? বড়-লোকের হেঁসেলে তুমি হাত দিলে, তোমার শালা জেল হওয়া উচিত।

আলতাফ মায়ের উদ্দেশ্যে হেঁকে ওঠে ঃ মা ! ওর মাথা নেড়া করে একটা কান কেটে দি ? কী বল ?

মায়ের কোনো হুকুম আসে না।

বলো তুমি ! ওর হালুয়া টাইট করে দি !…ওরে চমৎকার, আয় তো এদিকে ! দুটো রাম ঘুসি ছাড়ত !…

নাহ !—গর্জে ওঠে নজর। হাত বাড়িয়ে আলতাফের বুকে থালার উপর ছোঁ মারে। থাবা দিয়ে থালা কেড়ে নেবার চেষ্টা করতেই ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়।

আলতাফ বলে—ছেড়ে দে থালা ! বেল্লিক ! জোচ্চোর ! শুয়ার !

নাহ !—ঘনঘন উত্তেজিত নিশ্বাস ছাড়ে নজর। থালা ছিনিয়ে নিয়ে বুকে আঁকড়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে। সবাই তার পাগলামীতে আশ্চর্য হয় এবং রেগে ওঠে। বার বার তাকে থালা গেরস্তের কাছে ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করা হয়। মোড়ল নরম সুরে তাকে থালা ফেরত দিতে বলেন। বাচ্চা জেদি শিশুর মতো নজর আলি মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। ওঠে না।

এমন সময় মেজ ছেলে রাজ্জাক ভিড় ঠেলে ঢুকে অকস্মাৎ কাঁচা কঞ্চির ছড়ি দিয়ে বেদম প্রহার শুরু করে। শালা চোর ! চোরের এত জারিজুরি, পাকামো ! শালাকে আজ খেয়ে ফেলব আমি ! আমি আলতাফ নই, মায়ের হুকুমের তোয়াক্কা করিনে।

মারের চোটে ক্ষতবিক্ষত নজর মাটিতে গড়াগড়ি দেয়, আত্মরক্ষার জন্য উঠে দাঁড়ায়, ফের রাজ্জাকের হাতের জোর ধাক্কায় শুয়ে পড়ে। চেঁচায় না। মৃদু গোঙায়। এবং এক সময় তার কপাল ফেটে, ঠোঁটের কষ গড়িয়ে রক্ত ঝরতে শুরু হয়।

সে কাঁদে, মা আমার বড় নোক। আমি কাঙাল।… ওরে শালারা, ওরে রেজ্জাক দুশমন ভাই আমার, থাম তুই !… মায়ের পায়ে বেটার বেহেশ্‌ত্‌ ! ক' তুই—নয় ?… মা বুলুক, এ দুধ-থালি কার ?

বুলুক মা ! তুই যেমুন মায়ের পোলা, আমিও মায়ের পোলা ! মাকে ডেকে লিয়ে আন, মা গায়ে হাত দিয়া কসম করুক, আমি তার কেউ লই, বুলুক ! আমারই এ'টো মাই চুসে তুই শালা আলতাফ এত বড্ডা হইচিস। এ দুধ-থালি আমার ! আমার পুব্ব-জন্মের মুখ দেখানী চেন্নাই। মুখ ভাসানী রোশনীদার ফুল-কাঁসার আরসি ! মুই ছাড়ব না। ই হকের দান। নানীজানের দান।…

আমি লজর ! মা গো। আমি লজর মা !

বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে নিঃসাড় হয়ে যায় নজরের রক্তাক্ত দেহ, হাতে জাপ্টানো থালাখানি বুক থেকে মাটিতে খসে পড়ে। সেজ ছেলে ইমানুল, বয়স খুব কাঁচা, সেটা হাতে উঠিয়ে নিয়ে দৌড়ে মায়ের কাছে ছুটে যায়।

মা মানে এ সংসারের পাটরানী, মালকিন। আফলাতুন্নিশা বিবি ছাহেবা। কানুমণ্ডলের তৃতীয় পক্ষ।

বিছানায় লুটিয়ে পড়ে ছটফট করছিল। একটু আগে বৈঠকখানার দরোজায় দাঁড়িয়ে চোরকে পেটাতে দেখেছে। সে ছটফট করছে, কিন্তু চোখে তার পানির উৎসে আলোড়ন নেই। ইমানুল মায়ের সামনে হাসতে হাসতে থালাটা মেলে ধরে। টলটলে থালায় আফলা-তুনের বিমর্ষ বিষন্ন মুখের আদল প্রতিফলিত হয়। সে চেয়ে দেখতে দেখতে চমকে ওঠে, সেই থালার ভিতরে হঠাৎ ভেসে ওঠে একটি দু'বছরের শিশুর করুণার্ত মুখ। সে সেই ছায়া-শিশুকে চুম্বন করতে গিয়ে লক্ষ্য করে, ফোঁটায় ফোঁটায় চোখের পানি থালার উপর ঝরে পড়ছে। থালার মেঝেতে খোদাই করা আছে শিশুর নাম, প্রথম স্বামীর, যে স্বামী তাকে অযথা তালাক দেয় প্রথম যৌবনের প্রত্যুষে, তার পুত্র নজর আলি।

নজর আলি।

সাকিম—শাদীখাঁর দিয়াড়।

মুর্শিদাবাদ।

সে ছটফট করে কাঁদে, পর্দা-ঘেরা সংসারের সচ্ছল অন্তঃপুরে। বাইরে ছুটে এসে কেঁদে উঠতে পারে না—

আহা ! বাপ আমার, নজর ! আমি তোর মা ! তোকে আমি চিনতে পেরেছি, বাছা !…

* * *

শারাফৎ তার টিম নিয়ে ইটে-সরান পেরিয়ে গেছে কতক্ষণ, এ বাড়ির মালকিন তা জানে না।

রৌরব / দ্বিতীয় বর্ষ,
আগসট/সেপটেমবর, '৮৯

যাঁরা লিটল ম্যাগাজিন বার করেন তাঁদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গা থেকে অনেক তরুণ সাহিত্য সংস্কৃতিসেবী অনেক শ্রম স্বীকার করে নিঃস্বার্থভাবে লিটল ম্যাগাজিন বার করছেন। আমরা তাঁদের প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাই। আগামী সংখ্যা থেকে শিলাদিত্য পত্রিকায় নিয়মিত লিটল ম্যাগাজিনের খবর ও সম্ভবক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য রচনার পুনর্মুদ্রণ থাকবে। তাই অনুরোধ, লিটল ম্যাগাজিন যাঁরা বার করেন আমাদের দপ্তরে এক কপি করে তাঁদের পত্রিকা পাঠান।

সাহিত্য-ধাঁধা

সাহিত্য ধাঁধার এই চতুর্থ আসরে আমরা পাঠকদের আহ্বান করছি উদ্ধৃত গদ্যাংশগুলির সনাক্তী করণ। ভাবোপযোগী বাংলা গদ্যের মণ্ডনক্রিয়া যে সব কারিগরের হাতে ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে সুসম্পন্ন হয়, তাদের মধ্যে জনাকয়েকের রচনা নিদর্শনই আমরা দিতে পারলাম। স্বয়ন্তর রবীন্দ্রনাথকে উহ্য রাখা হলো। **লেখার স্টাইল দেখে পাঠক সনাক্ত করুন লেখককে, এইটুকুই আমরা চাইছি। রচনা বিশেষের বা গ্রন্থের নাম দিতে পারলেও, ক্ষতি নেই। কাব্যগ্রন্থ বা কবিতা বিশেষের নামোল্লেখে সাধারণ পাঠক যে অসুবিধা বোধ করেছিলেন, তার কথা আমাদের স্মরণে আছে।**

১ ॥ অর্জন এবং ক্ষতি, উভয়েই সংসারের নিয়ম, কিন্তু ক্ষতি অপেক্ষা অর্জন অধিক, ইহাও নিয়ম। তুমি জীবনের পথ যতই অতিবাহিত করিবে, ততই সুখদ সামগ্রী সঞ্চয় করিবে। তবে বয়সে স্ফূর্তি কমে কেন? পৃথিবী আর তেমন সুন্দরী দেখা যায় না কেন? আকাশের তারা আর তেমন জ্বলে না কেন? আকাশের নীলিমায় আর সে উজ্জ্বলতা থাকে না কেন? যাহা তৃণপল্লবময় কুসুমবাসিত, স্বচ্ছ-কল্লোলিনী-শীকরসিক্ত, বসন্ত-পবন-বিধৃত বলিয়া বোধ হইত, এখন তাহা বালুকাময়ী মরুভূমি বলিয়া বোধ হয় কেন?

২ ॥ কি আশ্চর্য! চিত্রদর্শনে চিরাতীত জনস্থান বৃত্তান্ত বর্তমানবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। দুরাচার মারীচ হিরন্ময় মৃগের আকৃতি ধারণ করিয়া যে অতি বিষম অনর্থ ঘটাইয়াছিল, যদিও সম্পূর্ণ বৈরনির্যাতন দ্বারা তাহার যথোচিত প্রতিবিধান হইয়াছে, তথাপি স্মৃতি-পথে আরূঢ় হইলে মর্মবেদনা প্রদান করে। এই ঘটনার পর আর্য মানবসমাগমশূন্য জনস্থান ভূভাগে বিকলচিত্ত হইয়া যেরূপ কাতরভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা অবলোকিত হইলে, পাষাণও দ্রবীভূত হয়, বজ্রেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

৩ ॥ রাস্তার ধারের ফোড়ের দোকান, পচা নিচু ও আঁবে ভরে গ্যালো। কোথাও একটা কাঁটালের ভুতুড়ির উপর মাছি ভ্যান ভ্যান কচ্চে, কোথাও কতকগুলো আঁবের আঁটি ছড়ানো রয়েচে, ছেলেরা আঁটি ঘসে ভেঁপু বাজাচ্চে। মধ্যে এক পসলা বিষ্টি হয়ে যাওয়ায় চিৎপুরের বড় রাস্তা ফলারের পাতের মত দ্যাখাচ্চে কুঠিওয়ালারা জুতো হাতে করে বেশ্যালয়ের বারাণ্ডার নীচে আর রাস্তার ধারের বেনের দোকানে দাঁড়িয়ে আছেন—আজ ছক্কড় মহলে পোহাবারো!

৪ ॥ একটু একটু মেঘ হইয়াছে—একটু বৃষ্টি পড়িতেছে—গোরু দুটা হন্‌হন্ করিয়া চলিয়া একখানা ছকড়া গাড়িকে পিছে ফেলিয়া গেল। সেই ছকড়ায় প্রেমনারায়ণ মজুমদার যাইতেছিলেন—গাড়িখানা বাতাসে দোলে—ঘোড়া দুটা বেটো ঘোড়ার বাবা—পক্ষিরাজের বংশ—টংয়স টংয়স ডংয়স ডংয়স করিয়া চলিতেছে—পটাপট পটাপট চাবুক পড়িতেছে—পটাপট পটাপট চাবুক পড়িতেছে কিন্তু কোনোক্রমেই চাল বেগড়ায় না।

৫ ॥ আমাদের সঙ্গে বড় বড় শিল্পীদের তফাত এইটুকু যে তাঁদের হাতে এক করতে আর হয় না। সম্ভবত এই কারণে কলারাজ্যের মহাপুরুষদের যা-খুশি-তাই-করবার যে অধিকার আছে, ইতর শিল্পীদের সে অধিকার নেই। স্বর্গ হতে দেবতারা মধ্যে মধ্যে ভূতলে অবতীর্ণ হওয়াতে কেউ আপত্তি করেন না, কিন্তু মর্ত্যবাসীদের পক্ষে রসাতলে গমন করাটা বিশেষ নিন্দনীয়।

গতবারের ধাঁধার প্রথম নির্ভুল উত্তর দিয়েছেন প্রশান্ত দাশগুপ্ত, ১৬৬ বোস-পুকুর রোড, কলকাতা-৭০০০৩৯।

সাহিত্য ধাঁধা (৩) উত্তর

১। আন্তন চেখভের সোয়ান সঙ অবলম্বনে নাটকটি রূপান্তর করেন 'অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়'। রূপান্তরিত অবস্থায় নাটকটির নামকরণ করা হয় 'নানা রঙের দিন'। নাটকে এই কথাগুলো 'রজনী চট্টোপাধ্যায়ের'।

২। মনোজ মিত্রের লেখা 'সাজানো বাগান' নাটক থেকে নেওয়া হয়েছে। নাটকে একথা বাঞ্ছারাম নকড়ি গিন্নীকে বলেছিল। প্রথম ৭ নভেম্বর ১৯৭৭ সন্ধ্যা সাতটায় মুক্তাঙ্গনে 'সুন্দরমের' প্রযোজনায় 'মনোজ মিত্রের' নির্দেশনায় অভিনীত হয়।

লোভ, ভোগের আকাঙ্ক্ষা, বেঁচে থাকার ইচ্ছে, স্বার্থ, মানুষের চরিত্রে এই সব চিরন্তন পরিচিতি এ নাটকে পরিষ্কার। মানুষ যে অবস্থাতেই থাকুক সুযোগ পেলেই মানুষ মানুষকে শোষণ করে এটাই নাটকের মূল কথা।

৩। ল্যু স্যুন অনুপ্রাণিত পূর্ণাঙ্গ নাটকটি রচনা করেন 'অরুণ মুখোপাধ্যায়'। নাটকটির নাম 'জগন্নাথ'। নাটকে এই কথাগুলো 'জগন্নাথ' চরিত্রের। প্রথম নাটকটি ১৯৭৭ সালে ৮ ফেব্রুয়ারী অকাদেমিতে অভিনীত হয়।

৪। নাট্যকার 'মনোজ মিত্র'। নাটকের নাম 'চাক ভাঙা মধু'। উল্লেখিত কথাগুলো নাটকে 'শংকর' নামক চরিত্রের। শংকর এই কথাগুলো 'দাক্তাকে' বলেছিল। নাটকটি প্রথম 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' ১৬ মে ১৯৭২ সালে 'রঙ্গনায়' অভিনয় করেছিল।

সাহিত্য ধাঁধার নতুন নিয়ম

১। এখন থেকে সাহিত্য ধাঁধা বিভাগে একমাত্র তাঁদের উত্তরই গ্রহণ-যোগ্য হবে যাঁরা এই পৃষ্ঠায় মুদ্রিত কুপনটি পূরণ করে উত্তরের সঙ্গে পাঠাবেন।

২। এখন থেকে কলকাতা ও হাওড়ায় পাঠক-পাঠিকাদের উত্তর পাঠাতে হবে পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে এবং মফস্বলের ক্ষেত্রে ১৫ দিনের মধ্যে।

৩। এবার থেকে সাহিত্য ধাঁধায় প্রতিযোগীদের দু'টি পুরস্কার দেওয়া হবে। কলকাতা-হাওড়ার উত্তর দাতাদের মধ্যে থেকে একজনকে এবং মফস্বলের উত্তর দাতাদের মধ্যে থেকে একজনকে। দুটি পুরস্কারের অর্থমূল্য হবে কুড়ি টাকা করে।

৪। পুরস্কার যিনি পাবেন তাঁকে পত্রিকা দপ্তর থেকে ডাকযোগে পুরস্কার মূল্য পাঠানো হবে পত্রিকা প্রকাশের বারো সপ্তাহের মধ্যে। এ ব্যাপারে তাগাদার প্রয়োজন নেই।

সাহিত্য ধাঁধা ৪

নাম...

ঠিকানা...

পাঠানোর তারিখ....................................

মুদ্রাকর ও প্রকাশক অরুণকুমার পাল কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩ (ফোন ২৪-৫৫২০), থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৭, বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২ (ফোন ২৭-৩৩১৬, ২৭-২১৬৯), থেকে প্রকাশিত

KHELAR AASAR
India's highest circulated sports magazine
ITYADI PRAKASANI (P) LTD.
47 Biplabi Anukul Chandra Street
Calcutta 700 072.

Declaration No. 146/81 dt. 26.6.81, Siladitya/October 1981, Postal Registration No. WB/CC70/81 Rs. 3.50

ইত্যাদি প্রকাশনীর দুটি অসাধারণ সাপ্তাহিক

পরিবর্তন
বের হয় প্রতি বুধবার

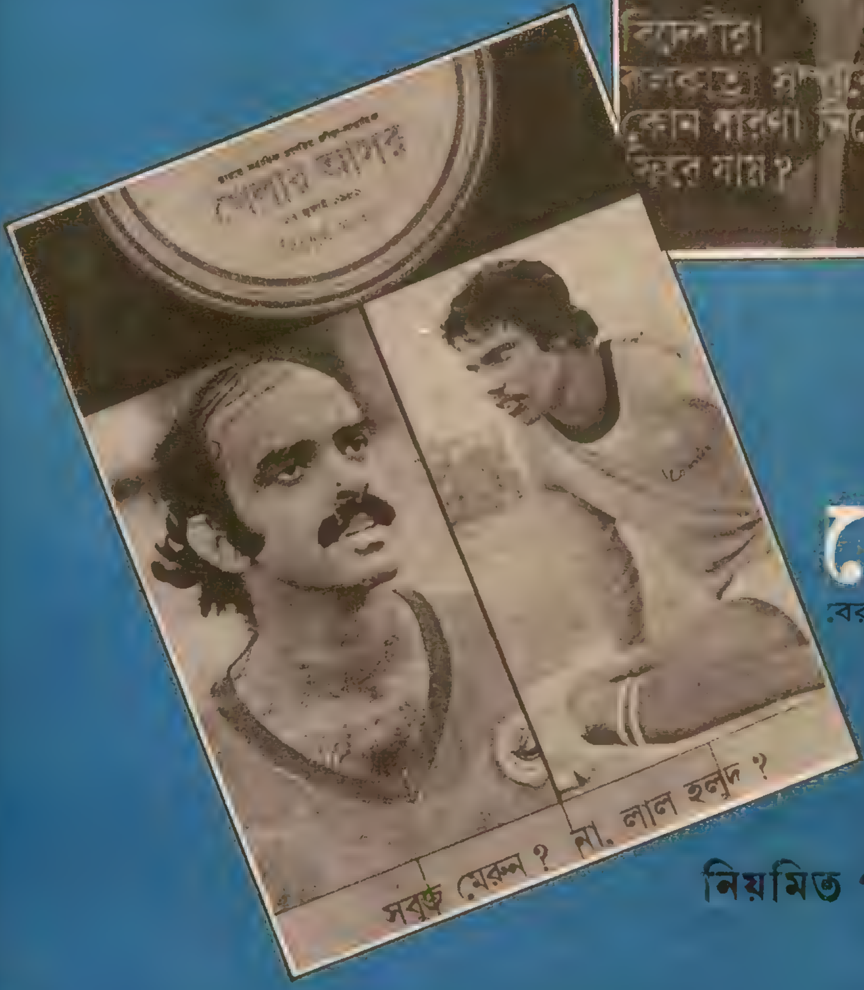

খেলার আসর
বের হয় প্রতি শুক্রবার

নিয়মিত পত্রিকা পেতে হলে হকা
বা এজেণ্টকে বলে রাখু

ইত্যাদি প্রকাশনী প্রাইভেট লিঃ, ৪৭ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭২, ফোন ২৭-৩৩১৬, ২৭-২

শিলাদিত্য

খেলার আসর

৪ ডিসেম্বর সংখ্যা থেকে

দলীপ সিংজী

দলীপ সিংজী নামটি পরিচিত ক্রিকেট অনুরাগীদের মধ্যে শুধু নয়, ক্রিকেটের ধারে-কাছেও যারা যান না, তারাও জানেন এই নামটি। শুধু ক্রিকেটার হিসাবে নন, কেমন মানুষ ছিলেন জামনগর রাজবংশের কুমার দলীপ সিংজী। রণজিৎ সিংজীর ভ্রাতুষ্পুত্র দলীপ সিংজীর ক্রিকেটে ব্যাপ্তি ও খ্যাতি ছিল দিগন্তব্যাপী। আপন বৈশিষ্ট্যে মহান, কৃতিত্বে কীর্তিমান। নিজের নৈপুণ্যে ইংল্যাণ্ডের টেস্ট দলে স্থান করে নিয়েছিলেন এবং পিতৃব্য রঞ্জির মতই টেস্ট আবির্ভাবেই শতাধিক (১৭৩) রান করে বরেণ্যদের মধ্যে স্থান করে নেন। কেমন মানুষ দলীপ সিংজী, কেমন ক্রিকেটার দলীপ সিংজী। তার খেলা ও তার খেলার বাইরে—দুই জীবন নিয়ে অনবদ্য ধারাবাহিক রচনা বেরোবে খেলার আসরে, ৪ ডিসেম্বর থেকে—'দলীপ সিংজী'।

লিখেছেন প্রবীণ ক্রীড়া সাংবাদিক শচীন সেন

সাহিত্য - শিল্প - সংস্কৃতিবিষয়ক মাসিক পত্রিকা **শিলাদিত্য** নব পর্যায় প্রথম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা নভেম্বর ১৯৮১

সম্পাদকীয়

একটি রুচিশীল সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে শিলাদিত্যের আবির্ভাব ঘটেছে। চারটি সংখ্যার বিন্যাসে ও বৈচিত্র্যে নিশ্চয়ই কোনো স্পষ্টতা ও প্রত্যয় ছিল, যার সানন্দ স্বীকৃতি মিলেছে অগণিত পাঠক পাঠিকার চিঠিতে। আমাদের প্রথম সাফল্য এক উজ্জ্বল, সতর্ক ও আশাবাদী পাঠকগোষ্ঠীর সৃষ্টি।

আমাদের আকাঙ্ক্ষা এক সৃজনশীল পরিমণ্ডলের এবং সেই সঙ্গে নবীন প্রবীণের সাযুজ্য। উৎসুক পাঠকের উদ্যত ভর্ৎসনা, সংশয়ী শুভার্থীর দুশ্চিন্তা, স্বতঃস্ফূর্ত পাঠার্থীর আনন্দের প্রতিবেদন—সবই [illegible] মনস্কতার সঙ্গে গ্রহণ করছি। তাঁদের পরামর্শ ও যুক্তি, নিন্দা ও সংশয়, উৎসাহ ও উল্লাস—সবই আমাদের পত্রিকার প্রবল অস্তিত্বের স্মারক।

পত্রিকাকে আরও ভালো করতে হবে। আরও ঝকঝকে, আরও আধুনিক এবং মননঋদ্ধ। [illegible] অনেক অনুকম্পায়ী, অনুভূতিপ্রবণ এবং পরিশ্রমী। এ সবই আমাদের চেতনা ও বিশ্বাসের অন্তর্গত। কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা আশা রাখি সকলের শ্রেষ্ঠ রচনাটিই এখানে প্রেরিত হবে। শুধু রাশি রাশি শুষ্ক কুসুম দিয়ে [illegible] গাঁথা যায় না!

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ শিল্পী : [illegible]

৪

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর প্রিয়শিষ্য ও আপনজন বিশ্বশ্রুত শিল্পী রবিশঙ্কর ভারতীয় সঙ্গীতের এক প্রবাদপুরুষ। কিন্তু ব্যক্তিমানুষ রবিশঙ্কর কেমন?—এ প্রশ্ন নিশ্চয় থেকে যায়। রবিশঙ্করের জীবনচর্যার এক উজ্জ্বল আলেখ্য সন্ধ্যা সেনের লেখা 'অন্তরঙ্গ রবিশঙ্কর'।

১০

এবার সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন ইলিয়াস কানেত্তি। লাজুক প্রচারবিমুখ এবং অন্তর্মুখী এই লেখক সম্পর্কে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা এখনও পর্যন্ত বাংলা ভাষায় হয়নি। তরুণ লেখক অতনু রায় কানেত্তির সাহিত্যকর্মের উপর আলোচনা করেছেন; 'সাহিত্যে এবারকার নোবেল লরিয়েট ইলিয়াস কানেত্তি' লেখাটিতে।

৩৮

বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ও ভাস্করদের প্রেরণাদায়িনী সেইসব নেপথ্যনায়িকারা আজ নেই, কিন্তু আছে তাঁদের শিল্প ও ভাস্কর্যে সেইসব শরীরিণীর রূপলাবণ্যের অম্লান আভা। পিকাসো, সালভাদর ডালি, আন্তোনিও কালেভার জীবনে জড়িয়ে আছে সেইসব নায়িকার দেহজ-ভালোবাসার গোপন কথা। 'দৃষ্টিগান্ধর্ব' পর্যায়ে এবার ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী লিখেছেন সেই অকথিত কাহিনী।

১৪

পরিচিত পরিধির বাইরে নিষিদ্ধ এক পল্লীতে জীবিকার সন্ধানে চলে আসে এক যুবক। জীবন ও যৌবনের এক ভিন্নতর উপলব্ধি-লাভ করে। বিপ্লবী যুবক ও এক পণ্যানারীর সঙ্গে অলীক আবর্তে জড়িয়ে পড়ে তার জীবন। তারপর অজানা এক জীবনের [illegible] পদক্ষেপের কাহিনী 'রক্তের [illegible]' [illegible] লেখক অশোক চট্টোপাধ্যায়ের [illegible]

কবিতা/দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] মলয় সিংহ, রমা ঘোষ, আশিস সান্যাল, সঞ্জীব প্রামাণিক, ভাস্কর মিত্র, [illegible]
উল্টোপুরাণ/ইলিয়াস কানেত্তি/১২
দ্বিজেন্দ্রলালের 'আনন্দ বিদায়' কি সত্যই [illegible] ব্যাঙ্গ করে লেখা?/নীরদ হাজরা/৩৪
তারাশঙ্করের পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গে/নিতাই বসু/৪[illegible]
চিত্রনাট্য/গরম ভাত/৪২
বাঙালী ব্যক্তিত্ব/প্রবোধচন্দ্র সেন/সাক্ষাৎকার [illegible] সুশান্ত বসু/৪৭
বিশিষ্ট বাঙালী কবি : নির্বাচিত কবিতা/অরুণ মিত্র/৫২
জলপাইহাটি/জীবনানন্দ দাশ/৫[illegible]
প্রতিবেশী গল্প/বানিয়া চলে গেল/[illegible] অনুবাদ : সুকন্যা জাভেরী ও দীপেন চক্র[illegible]
বাংলা বানান সংস্কার কি জরুরী/[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষুদিরাম দাস, [illegible] মহাশ্বেতা দেবী, পবিত্র সরকার/সাক্ষাৎকার [illegible] তাপসকুমার ভট্টাচার্য/৬৪
সাহিত্য বিতর্ক/বঙ্কিমচন্দ্র কি ইসলাম [illegible] ছিলেন/৬৭
গল্প/কুয়োতলার কাব্য/শ্রীশোক কুণ্ডু/[illegible]
রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রথম প্রকাশক [illegible] বারিদবরণ ঘোষ/৭৩
পুরনো বই : নতুন [illegible]
[illegible]
[illegible] রায়/৭৮
পাঠকের চিঠি/৮০

প্রতিসংখ্যা সাড়ে তিন টাকা
বিমান মাশুল পূর্বাঞ্চলে ৩০ পয়সা
ভারতের অন্যান্য স্থানে ৪০ পয়সা

সম্পাদক : অশোক চৌধুরী

শিল্প-নির্দেশক : [illegible]

সমুদ্র ১৯৭০

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

জটা পড়া শ্মশ্রু চুল, বন্য আতুর—মুখোমুখি চেয়ে আছে।
দীর্ঘ দিনমান ভরা অপূরণ ক্ষুধা—যৌবনের।
জমাট কপিশ ওঠাপড়া অস্থিরতা—
ঝাউয়ের শাখায় জল ধু ধু করে গায়ে—
হৃৎপিণ্ডে গনগন করছে আগুনপিণ্ডের মতো কাম···
এত চাওয়া, অপূরণ চাওয়া—
আকণ্ঠ আকণ্ঠ পুড়ে সারাদিন ক্লান্তিবিষাদে
প্যাত হয়ে পড়ে আছে সমুদ্রকাপিশ···

হিম রোগা চাঁদ শেষ শিখরচুড়োয়,
চেয়ে আছে। ঝাউয়ের একলা কোলে মুখ গুঁজে
ফুলে ফুলে ওঠো—কষ বেয়ে জতু, কোল ভিজে যায়—
হুঁশ নেই সমস্ত আকাশ
শত চোখে চেয়ে, হুঁশ নেই আমি ঝাউয়ের পুঞ্জ শর
দু হাতে মন্থন করে নামছি, পা ভরে
ভিজে শাদা তাপ, আমার কাঁধ মুখ বাহু গনগন করছে—সর্বস্ব পোষাক
গায়ের উন্মাদ রোষে ছিঁড়ে খসে যায়, পায়ে ঠেলে
শূন্যে উড়িয়ে দিলাম—যেন খোলসের
চাপ ভিন্ন করে আমি ক্রমাগত বাড়ছি—শিখরচুড়োর খুব কাছে—
সারা গায়ে পুড়ে ওঠে টিপটিপ চাঁদের ফোসকা···

সুন্দর বিশাল ন্যুড, মন্দ্রছন্দে

মঞ্জুভাষ মিত্র

সুন্দর বিশাল ন্যুড মন্দ্রছন্দে বেজে ওঠো স্বর্ণময় মাথায় ভিতর
রঙের নদীর বুকে ফলের মতন গোল অতিশয় স্নিগ্ধ মায়াবিনী
হাজার তরঙ্গ তোলো পরিপক্ক প্রজ্ঞাবতী মনে হয় বুঝি ফেটে যাবে
মনে হয় এ মুহূর্তে ভাবমুগ্ধ পুরুষের অন্তর্লীন আলিঙ্গন পাবে
মহামানবীর মতো। উরুতলে চিত্রগৃহ উপত্যকা পর্বত ফোটাও
সমুদ্র লুকিয়ে রাখো বুকে ঠোঁটে বহুস্তর; শরতের শান্ত কুসুমিকা
শীতঋতু শেষ করো অবশেষে হয়ে ওঠো ধীরে ধীরে উদগ্র গোলাপ
ধানের তুষের মতো সহজে পৃথক করো আমাদের পুণ্য আর পাপ
তোমার প্রচণ্ড তীরে অন্তরঙ্গ বাসা বেঁধে অতি শুদ্ধ সৌন্দর্যের ধ্যানে
দিবস কাটাবে বলে সুকঠিন প্রতিজ্ঞা করেছিল আত্মবিদ যারা
তারা আজ হয়ে গেছে বিভিন্ন রঙের আত্মা নীল, লাল অথবা খয়েরী
শিল্পীর তুলি থেকে দশদিকে ঝরে রূপ শরতের বৃষ্টির মতন
উরুতলে চিত্রগৃহ ফুলেফলে সমর্পিত একনিষ্ঠ ছবির বাগান।

আজ আর বাজিয়োনা

মলয় সিংহ

যত কিছু সুখ ছিল তার একদিন রঙিন খামে
পাঠান হলো তোমাকে; তুমি বলেছিলে
সুখের দিনগুলো পাঠিও—হয় তো হলো না
আর।

যতো বেশি দুঃখ এল বর্ষা রাতের মতো
নিরুপায়, নিদারুণ ব্যথা—করুণ শঙ্খের রাগে
বাজে—কতোদিন বাজিয়ে বলতে নুয়ে পড়,
নতজানু হও, এই সন্ধ্যেয়—আজ আর মনে
নেই, না?

দূর মহুয়ার জঙ্গলে তোমার স্তনের রঙের
মহুয়া ফুলের রঙ এল, দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ
কোথায় কেমন করে রাখব? হৃদয়
রাঙাতে চাই
কোয়েলের নদীপাড় এখন যেমন।
তখন ফাল্গুন মাস।

রোদমোছা কুঁড়েঘর আছে, নিকোনো উঠোন চাঁদ
তারপাশে এলোচুল মেয়ে, কুরচি গাছের ফাঁকে
নিবিড় সন্ধ্যা মাখা রূপ-রঙ;
ঠিক তুমি যেন দাঁড়ালে কাছে।

ব্যথার বীণাখানি হাতে—দোহাই, আজ আর
বাজিয়ো না।

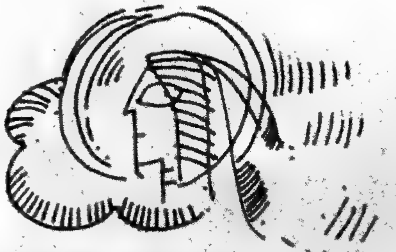

অশরীরী রাত

রমা ঘোষ

ঝুড়ি ভরা বিষণ্ণ বেতস ফল আর কিছু নেই,
চাঁদের প্রাচীনা নারী বসে আছি একা,
তুষারের ফুলগুলি কঠিন কাঁটার বাণ, তুষারের ঝড়···
কতদিন দেখিনি যে গাছ পাখি, কতদিন প্রিয় স্নিগ্ধ মুখ!
দেবে কি আমার নামে চিঠি কোনো! দেবে না অক্ষর!

পাকা চুল এক বুড়ি বসে আছে, তার ছিল নবীনা বয়স,
সে আর রাধিকা নয়, যশোদাও নয় কারো, নয় প্রভাবতী!
কী করে নামাবে মেঘ! তার তো নয়ন নেই, কোমলতা নেই!
চিঠি নয়, ছবি নয় কোনো,
কেবল আসবে ভেসে হাওয়া ভারি অশরীরী রাত।

অন্তরঙ্গ রবিশঙ্কর

সন্ধ্যা সেন

'কি ? গন্ধ নাকে গেছে ? গাড়িটা থামিয়ে তাহলে ব্যবস্থা কার ?' রবুকাকা কৌতুকে চোখ নাচিয়ে প্রশ্ন করেন তাঁর আদরের ভাইপো ও বন্ধু ভূদেব এবং কে ডি-কে (সেনগুপ্ত), এয়ারপোর্ট থেকে আসবার পথে উত্তর কলকাতার মাড়োয়ারী পাড়ার কোনো এক বিখ্যাত খাবারের দোকানের পাশ দিয়ে আসতে আসতে। এবং এটা নিছক কৌতুক নয়। সত্যিই। আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা হয় চূপড়িভরা কচুরীর।

'রবুকা ঐ রকমই।' নিজে যে ওসব জিনিস খুব খেতে ভালোবাসেন তা নয়, কিন্তু আমরা কে কি খেতে ভালোবাসি সে বিষয়ে ওঁর স্মরণশক্তি যেমন প্রখর তেমনই তৎপরতা। বেনারসে থাকবার সময় বেড়াতে বেরিয়ে জমিয়ে নানারকম গল্প করতে করতে চলেছি, কিন্তু অত হৈ চৈ-এর মধ্যেও উনি ভোলেন না আমরা ফুচকা, দইবড়া খেতে ভালোবাসি এবং ওখানে এসব জিনিস অপূর্ব।' উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন ঝর্ণাশংকর, সেদিন আমাদের আলুর পরোটা আর গরম চায়ের জমজমাট আড্ডায়।

পৃথিবীর সবচেয়ে গ্ল্যামারাস পার্সোনালিটির অন্যতম হলেও রবুদা খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কিন্তু মশলাদার রাজকীয় ভোজনের পক্ষপাতী নন। এখানে যখন আসেন ভূদেবদা, কল্পনাদি কি প্রেসিডেন্সি কোর্টেও যখন উনি আর দিদি (অন্নপূর্ণা দেবী) থাকতেন দেখেছি সবসময় চাইতেন ছোট মাছের ঝাল বা টক, শুকতো, মুগের ডাল, বড়ি সিমের ঝোল দিয়ে ভাত খেতে। উনি যখন যে দেশে থাকেন সে দেশের সাবেকী, সনাতন খাবার খেতে ভালোবাসেন। দিল্লি, বোম্বে, বেনারসে তো খাবার সঙ্গে টক দই চাই। কিন্তু কলকাতার মিষ্টি দই ও'র দারুণ প্রিয়। ও'র মতে কোনো দেশের সাবেকী খাওয়ার মধ্যেই সে দেশের মাটির সঙ্গে সংস্কৃতির একাত্ম হওয়ার অনুভূতিটি মেলে।

গুরুপাক মাছ, মাংস, বিরিআনি, কাবাব হলে খান না তা নয়। তবে খুব পরিমিত। ও'র আর একটি প্রিয় খাবার হল্যো নরম পাকের মিষ্টি। খেজুর গুড়ের হলে তো কথাই নেই। বাইরে কোথাও বাজাতে বা বেড়াতে গেলে সঙ্গে নেওয়া হয় সন্দেশ, কলা, পাঁউরুটি, মাখন। এসব জিনিস তৃপ্ত করে খান। কিন্তু হাজার প্রিয় খাবার হলেও পরিমাণে বেশি ও'কে কেউ খাওয়াতে পারে না। মঙ্গলবার উনি নিরামিষাসী।

ওঁর সমমানের শিল্পীদের দেখেছি পানাসক্ত হতে, দেখেছি পান, সিগারেট, চা, নস্যি, জরদা আরও কত কীতে মেতে যেতে। রবিশঙ্করের কিন্তু এধরনের কোনো নেশা নেই। মাঝে মাঝে খুব বেশি রাত জেগে প্রোগ্রাম করবার সময় এক আধটা পান খেতে দেখেছি।

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য একটি সংবাদ হল এই যে আগে প্রতিটি কনফারেন্সের প্রতিটি অধিবেশনই ছিল সারারাতব্যাপী। এই ধরনের সারারাতের আসরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কলকাতার ক্ল্যাসিক্যাল আসরে মধ্যরাত্রি ব্যাপী বা সান্ধ্য অধিবেশনের প্রথম প্রচলন করেন স্বয়ং পণ্ডিত রবিশঙ্কর। শুধু তাই নয়। শিল্পীদের পাবলিক স্টেজে ক্ল্যাসিক্যালের গানবাজনার ক্ষেত্রে কোনো শিল্পীর একক আসরের চল পণ্ডিত রবিশঙ্করেরই অবদান।

রবুদা তার আগে প্রায় বলতেন পরের পর সাতদিন, দশদিন রাত জেগে গানবাজনা শোনাটা শ্রোতাদের পক্ষে ফিজিক্যালি

বেনারসের গঙ্গা বক্ষে বজরার উপর রবিশঙ্করের জন্মদিন

নৃত্যরত উদয়শঙ্কর পিছনে কিশোর রবিশঙ্কর সঙ্গত করছেন

ইমপসিবল। জিদের মাথায় যদি বা জাগেন সারারাত একটানা শুনতে পারেন না। বসে বসে ঢোলেন। তাতে শারীরিক কষ্ট, সঙ্গীতের যথার্থ রসোপভোগও ঘটে না।

তাছাড়া একটা সারারাতের প্রোগ্রামে একজন নৃত্যপটীয়সী নেচে গেলেন, একজন ওস্তাদ গেয়ে গেলেন, এক তবলচী লহরা শোনালেন, এক যন্ত্রী বাজিয়ে গেলেন, এতে কোনোটার এফেক্টই মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠতে পারে না। তার ফলে মনের মধ্যে কোনো লং স্ট্যাণ্ডিং ইমপ্রেশন সৃষ্টি হতে পারে না।

শিল্পীদের তরফ থেকেও রাত জাগার ক্লান্তি বা অসুস্থতা থাকতে পারে যার ফলে ইউ ক্যান্ট গেট দি বেস্ট অফ অ্যান আরটিস্ট।

রবিশঙ্কর শুধু শিল্পীই নন। সংগঠন পরিকল্পনার ব্যাপারেও তাঁর ভূমিকা যথেষ্ট।

গত বছর (১৯৮০ তে) রবুদার ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে বিরাট উৎসব হয়েছিল ও'র বেনারসের শিল্প প্রতিষ্ঠানে রিম্পায়। ১৯২০ সালের ৭ এপ্রিল ও'র জন্ম। সে সময় ভূদেবদাও গিয়েছিলেন। আর ও'র কাছে সবচেয়ে থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল রবুকার সঙ্গে ও'দের বেনারসের বাড়ীতে যেয়ে যে ঘরটায় উনি জন্মেছিলেন সেটা দেখে আসা।

এখনও প্রায় সেই রকমই আছে। ঐ ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রবুকা মার কত কথা বলছিলেন। এ বিষয়ে ও'র স্মৃতিশক্তি খুব

আনন্দশঙ্করের সঙ্গে

তীক্ষ্ণ। বাবা ঝালোয়ার এস্টেটের বিরাট [illegible] ছেড়ে ব্যারিস্টারি করতে গিয়েছিলেন সুদূর সাগরপারে। সেইসময় মা যেমন যত্ন করে মানুষ করেছিলেন! কত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল তাঁর ছেলেদের স্বাস্থ্য, লেখাপড়া, [illegible] দিকে প্রবণতা সেদিকে সব খুঁটিনা[illegible] ওপর।

ওঁদের বাড়ীতে পাশ্চাত্য সঙ্গী[illegible] চর্চা ও সমাদর থাকলেও [illegible] মাধ্যমের ক্ষেত্রে ও'রা দু-ভাই'ই ছিলেন [illegible] ভাবে ভারতীয়। উদয়শঙ্কর [illegible] নৃত্য রচনা কিংবা নৃত্যসঙ্গীতে কোনো পাশ্চাত্য-ভাব বা যন্ত্র ব্যবহার করতেন না। রবিশঙ্করও ঠিক সেইরকম গোঁড়া তাঁর বাজনা [illegible] ইম্প্রোভাইজেশনের ক্ষেত্রে তিনি [illegible] বাজনার প্রবক্তা এবং উদ্যোক্তা দুই-ই।

[illegible] ক্ল্যাসিক্যাল [illegible] সঙ্গে এক্সপেরিমেণ্টাল মিউজিকের কথাও তিনি ভেবেছেন এবং এ বিষয়ে গঠনমূলক [illegible] অনেক করেছেন যার জন্য [illegible] মানুষ ভারতীয় সঙ্গীতে আকৃষ্ট [illegible] এবং জিজ্ঞাসু। [illegible] আর্টসের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের তুলনামূলক আলোচনা [illegible] সঙ্গীতের গতি প্রকৃতি চরিত্র বিচার কিংবা যে কোনো সিমপোজিয়াম-এ এ বিষয়ে যে কোনো প্রশ্নের উত্তর—তিনি সারা ভারত থেকে [illegible] পৃথিবীময় ব্যাপ্ত করেছেন। এডিনবরা [illegible] ভ্যাল-এ ইণ্ডিয়ান মিউজিক সম্বন্ধে ঔৎসুক্যের সৃষ্টির মূলে ছিল তাঁরই সুবিস্তৃত কাজ।

রবিশঙ্করই সেতার [illegible] সরোদকে জ[illegible] করেছেন। তাছাড়া সন্তুর, বেহালা, [illegible] ফোকসং থেকে শুরু করে পলঘট [illegible] তালবাদ্যমের অনুষ্ঠান ওখানে করেছেন [illegible] এসব কিছু নিয়ে এল পি ডিস্কও [illegible] করেছেন।

ও'রা যখন ক্লাসিক্যাল মিউজিক শিখতে চেয়েছিলেন, তখন খুব সীমিত [illegible] রবিশঙ্কর কাজ শুরু করেছিলেন। [illegible] সীমিত শিক্ষার্থীর পরিধি বাড়তে [illegible] বিরাট হয়ে উঠল। ১৯৬৮ [illegible] শংকর যখন আমেরিকা [illegible] রবুকাকা প্রচণ্ড পরিশ্রম করছেন ও'দের খাঁটি ভারতীয় পদ্ধতিতে রাগসঙ্গীত [illegible] সরোদ শেখাতে। [illegible] ক্যারেকটর, প্যাটার্ন, এক্সপ্রেশন [illegible] জন্য কণ্ঠে ধ্রুপদ গেয়ে শোনাচ্ছেন। [illegible] নাদধ্বনির সঙ্গে ওঙ্কারনাদ, [illegible] সম্পর্ক। বোঝাচ্ছিলেন ভা[illegible] কীভাবে তার ধর্মের সঙ্গে একাত্ম।

রবুকাকে তিনি প্রশ্ন [illegible] 'তুমি যে [illegible] [illegible]

ভারতীয় সঙ্গীতের বিরাট শিল্পী হবে ?'

সঙ্গে সঙ্গেই পণ্ডিতজীর কাছ থেকে আসে সুচিন্তিত উত্তর : এরা কেউ বিরাট সরোদী, সেতারী কিংবা তবলিয়া হবে না আমি জানি এবং সে আশা নিয়ে আমি শেখাইওনি। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি দে আর লুকিং ফর সামথিং নিউ হুইচ ইজ নট ইন দেয়ার মিউজিক অ্যাণ্ড আওয়ার ইণ্ডিয়ান মিউজিক মেসমেরাইজড দেমস বোথ ফর ইটস অরিজিনালিটি অ্যাণ্ড নভেলটি অফ একসপ্রেশান। কিন্তু ইণ্ডিয়ান মিউজিকের নামে এতরকম সব চলছে যে, সত্যিকারের ভারতীয় সঙ্গীতের রূপটি চেনা বিদেশীদের পক্ষে মুস্কিল। আমি চাই ইণ্ডিয়ান মিউজিক এরা যতটুকু শিখবে জানবে, তার খাঁটি ট্র্যাডিশনাল রূপটিকে যেন মোটামুটি জানে। আমাদের সঙ্গীতের এতবড় কনভেনশনের যেন বিকৃতি না ঘটে।

এইটেই হল পণ্ডিত রবিশঙ্করের সঙ্গীতের ব্যাপারে সংস্কার। ইম্প্রোভাইজেশনের ক্ষেত্র-উনি আলাদা করে রেখেছেন—সেখানে রসসৃষ্টির জন্য কিছু নিয়ম পদ্ধতির হয়তো শিথিলতা করা যায়। কিন্তু রাগসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এতটুকু শৈথিল্য তাঁর মতে অমার্জনীয় অপরাধ। ইহুদী মেনুইনের সঙ্গে যখন উনি দ্বৈত বাজনে বসেন তখন মেনুইন সাহেবও আচারনিষ্ঠ হিন্দুর মতই আলাপ-আওচার, জোড়, ঝালির ক্রমাগ্রসর মেনে চলেন। এ-বিষয়ে পণ্ডিতজী অন্তপুরচারিনীর মতই পর্দানশীন। অর্কেস্ট্রেশন বা অন্যান্য সঙ্গীতে স্বাধীনতা নিলেও কান পাতলেই শোনা যায় সেখানেও একটা চিন্তার বিন্যাস, যেটা পুরো-পুরি ভারতীয়।

সঙ্গীতচিন্তায় যিনি এত সিরিয়াস, রিল্যাকসেশনের সময় তিনি কিন্তু আর

যামিনী গাঙ্গুলী ও হীরু গাঙ্গুলীর সঙ্গে

পাঁচজন সাধারণ মানুষের চেয়েও প্রাণবন্ত। কেউ যদি সুন্দর একটা শাড়ি পরে গেল, অমনি কৌতুহলী প্রশ্ন : বাঃ! সুন্দর শাড়িটা ত! কোথায় কেনা? তারপর টাঙ্গাইল, ধনেখালি, ডুরে এবং চেকের প্যাটার্ন ইত্যাদি নিয়ে অন্ততঃ পাঁচ মিনিট উনি একাই আলোচনা চালিয়ে যাবেন। রীতিমত ওয়াকিবহাল আলোচনা। কারও হাতে সুন্দর ব্যাগ দেখলেও তাই।

একবার উনি গ্র্যাণ্ড হোটেলে উঠেছিলেন। ওখানে থাকলেও খাওয়া কিন্তু যেত বাড়ি থেকে টিফিন কেরিয়ারে। নিতান্ত ঘরোয়া রান্না। তো জগুদা টিফিন কেরিয়ারে করে খাবার নিয়ে গেছেন আর বলছেন, 'রবু, আজ একটা ভাল জিনিস আছে। কালো জিরে, কাঁচালঙ্কা দিয়ে পাবদা মাছ।'

রিয়ালি? ওঃ ফাইন। বলেই উনি বলতে শুরু করলেন, কবে দেশের বাড়ি না চেঙ্গাইলে কাঁচা আদাবাটা দিয়ে কী লাভলি পাবদা মাছ খেয়েছিলেন!

রবুদা আড্ডা দিতে দারুণ ভালবাসেন। তবে ওঁর সঙ্গী সাথী খুব বাছাই করা। বিমানদা (ঘোষ) জ্ঞানদাকে ওঁর গানের আসরে চাই-ই। তাছাড়া ওঁর আগে জগুদা এবং এখন ভূদেবদাকে এ দেশে আসার আগেই বলা থাকে প্রোগ্রাম ছাড়াও দুটো তিনটে দিন যেন আড্ডার জন্য রাখা হয়। সেই দুটো, তিনটে দিন হয় নাটক দেখতে যাবেন নয় সিনেমা,—বিশেষ করে বাংলা ছবি, নয় কোথাও খেতে বা কারো বাড়ি নিমন্ত্রণ রাখতে। কার নাটক? বহুরূপী, নান্দীকার হলে তো কথাই নেই। মনে আছে বহুরূপীর 'ডাকঘর' দেখার পরদিন অবধি ওঁর মনটা খুব অভিভূত ছিল। গত বছর 'নামজীবন' নাটকে সৌমিত্রবাবুর অভিনয় ওঁর খুব ভাল লেগেছিল। উনি খুব তারিফ করছিলেন ঐ নাটকটির বুদ্ধিদীপ্ত প্রযোজনা। ছবির ক্ষেত্রে সত্যজিৎবাবু ওঁর স্পেশাল লাইকিং হলেও বিষয় বস্তুর ঝকঝকে উপস্থাপনার জন্য তপনবাবু, তরুণ মজুমদার ওঁর পছন্দ।

সেবার মমর (মমতাশঙ্কর) বিয়েতে আমরা সবাই মিলে কী হৈ-হৈ টাই না করলাম! ওদিকে বিয়ে হচ্ছে।, তারই সামনের হলঘরে বসে আমরা সবাই। আমি, বিমানদা, সুকোমলদা (সুকোমল কান্তি ঘোষ), ভূদেবদা, বিমানদা, ঝর্ণাদি। লক্ষ্মী বৌদি (লক্ষ্মীশঙ্কর), কমলাদি। ভূদেবদা সেদিন কোঁচানো ধুতি পরে বিরাট কোঁচা গোল করে ছড়িয়ে বসেছিলেন।' ভূদেব তোমার কোঁচাটা 'বড্ড জায়গা নিচ্ছে ভাই একটু গোটাও।

মমতাশঙ্করের বিয়েতে সামাজিক রবিশঙ্কর

নইলে পা ছড়িয়ে বসা যাচ্ছে না (আড্ডার সময় ভাইপোও ওঁর কাছে ভাই)। তারপরই নানা হাসি গল্পের মাঝখানে হঠাৎ সেদিনের একটি ইংরেজি দৈনিকে আমার একটি রিভিউ-এর উল্লেখ করে বললেন 'ভাই, লেখা ভাল হলে কী হবে এতগুলো স্পেলিং ভুল ছাপা হয়েছে এতবড় কাগজে হওয়া উচিত নয়।'

'কী করব? সবসময় টাইপ করিয়ে দেওয়া যায় না। তাছাড়া আমার হাতের লেখারও গুণ আছে। সে জন্যই এই বিপত্তি ঘটে।'

'তাহলে এক কাজ কোরো। অমুক, অমুক, রাগ (ভৈরব, তোড়ি, মারবা ইত্যাদি) এবং আর্টিস্ট (যেগুলোর বানানোর ঝামেলা আছে) প্রত্যেকটি ব্লক লেটার-এ লিখো। কাছে কাগজ আছে? দেখি।' বলে নিজে ব্লক লেটার দিয়ে লিখে দেখালেন বিশেষ বিশেষ রাগ ও আর্টিস্টের নাম।

ওধারে ছাদনাতলায় শুভদৃষ্টির পর্ব চলছে। তনুশ্রী, আনন্দ এবং বৌদির (অমলাশঙ্কর) নাচের ছাত্রীরা অনুষ্ঠানের সঙ্গে ছন্দোবদ্ধভাবে থেমে থেমে হাততালি দিচ্ছে, তার সঙ্গে বয়ে চলেছে অজস্র হাস্যকৌতুকের ঝর্ণা।

হঠাৎ রবুদা মুচকি হেসে বললেন 'কী সন্ধ্যা? এসব দেখেও বিয়ে করতে ইচ্ছে যায় না?'

এমনই ডায়নামিক পার্সোনালিটির মানুষ আমাদের ঘরোয়া রবুদা, যিনি আড্ডায় বসলে শিক্ষকতা, রসিকতা দুই-ই সমান দক্ষতায় চালাবার শক্তি ধরেন।

ওঁর অবসর কাটানোর আর একটি প্রিয় বিষয় হল নতুন শিল্পীদের গান-বাজনার রেকর্ড বা রেডিও প্রোগ্রাম শোনা। হয়ত শুনলেন নতুন শিল্পীদের মধ্যে ক্ল্যাসিক্যাল কৃষ্ণা চক্রবর্তী ভাল গাইছে, প্রণবাংশু কিংবা শ্রীকুমার ভাল সরোদ বাজাচ্ছে বনশ্রী সঙ্গে মান্না দে-র ময়নামতী নদীর তীরে গানটা খুব মিষ্টি, হৈমন্তী এখন দারুণ ম্যাচিওর, অরুন্ধতী মাত্র ক' বছরেই টপ র‍্যাঙ্কিং প্লে ব্যাক সিঙ্গার হয়ে গেছে। কিংবা এক বড় লোকের বিটি-লো গেয়ে স্বপ্না চক্রবর্তী রাতারাতি সকলের নয়নমণি হয়ে উঠছে, অমনই আগ্রহে টগবগিয়ে উঠলেন, শোনাও না আমায় ওদের? যথা-সময়ে অবসর থাকলে রেডিওর নব ঘুরিয়ে শুনতে বসলেন কিংবা ডিস্ক পেলে দিলেন চেঞ্জারে চাপিয়ে।

লাঞ্চের আগে কিংবা প্রোগ্রাম না থাকলে ডিনারের পরে একরাশ ম্যাগাজিন নিয়ে শোওয়া ওঁর চাই-ই। মাঝে সামান্য একটু ঘুমিয়ে নিয়ে আবার চলল পড়া। সেই সন্ধ্যে অবধি। গ্রীষ্মকাল হলে মাঝে হয়ত একটু সফট ড্রিঙ্কস খেয়ে নিলেন। ওঁর ফেভারিট ড্রিঙ্ক হলো লেমন স্কোয়াস।

উনি খুব ছিমছাম সৌখিন ডিসিপ্লিনড মানুষ। ভাল সেন্ট, আতর, ধূপ। (সে যত দামেরই হোক) উনি কিনবেন এবং আশে পাশে প্রিয়জন যাঁরা থাকবেন তাঁদেরও দেবেন। জামা কাপড়ের সখও ওঁর অসাধারণ। ভাল প্যান্টের কাপড়, চওড়া পাড় ধুতি, পাঞ্জাবী সার্টের জন্য সুন্দর মটকা, গরদ, কিংবা সিল্ক, কোথাও ভাল পাওয়া যাচ্ছে শুনলেই সঙ্গে সঙ্গে টাকা বার করে বরাত দেওয়া হয়ে গেল। বোম্বে, কলকাতা, বেনারস, মাদ্রাজ সবত্র যখন যেখানে থাকেন।

আর এক অভ্যেস হরদম পোশাক পাল্টানো। কোথাও প্রোগ্রাম থাকলে ইন্টার ভ্যাল-এ একবার বেশ পরিবর্তন করবেনই।

'মাত্র সাতদিনের জন্য কোথাও গেলেও রবুকা অলওয়েজ পেজ [illegible] ঝর্ণাদি হাসতে হাসতে বলছিলেন। [illegible]

ভক্ত রবিশঙ্কর—তারকেশ্বরে

করতেন, সঙ্গীত শিক্ষা দেবার আর্জি জানিয়ে। তার আগে দাদার দলে তিমিরবরণ, শিশিরশোভন প্রমুখ বাঘা বাঘা শিল্পী এবং অতিথি শিল্পীদের গান বাজনায় আকৃষ্ট হয়ে আপন মনে অবসর সময়ে বসে সরোদ, সেতার, পিয়ানো বাজানো প্রভৃতি সব যন্ত্রই বাজাতেন।

আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবকে ট্রুপে এনে পিতার মত সম্মানে উদয়শঙ্কর রেখেছিলেন। এবং আজ যে শিল্পীমহল তাঁকে 'বাবা' বলে উল্লেখ করে থাকেন এই 'বাবা' ডাক উদয়শঙ্করেরই সৃষ্টি।

যাই হোক, পরে তাঁর কন্যা অন্নপূর্ণা দেবীর বাজনা শুনে, তাঁর বিনম্র স্বভাব ও সাধিকার মত জীবন উদয়শঙ্করকে মুগ্ধ করে। ও'র ইচ্ছেতেই সিমকী রবুর সঙ্গে অন্নপূর্ণার বিবাহের প্রস্তাব করেন বাবার কাছে। বাবাতো নারাজ। প্রথমেই তোলেন জাতের পার্থক্যের প্রশ্ন। শিল্পী উদয়শংকর ও-প্রশ্ন উড়িয়ে দিলেন, শুধু প্রখর যৌবনের দুর্দান্ত শক্তিমত্তায় নয়। জাতশিল্পীর, ধ্যানগভীর দিব্যদৃষ্টির বরেই বুঝেছিলেন শিল্পধর্ম মানুষের গড়া জাতধর্মের উর্ধ্বে।

বাবার দ্বিতীয় শঙ্কা: 'বাবা বিবাহের পর তুমি অন্নপূর্ণাকে নাচ শিখিয়ে তোমার ট্রুপের নৃত্যশিল্পী করতে চাইবেনা তো? রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠানের জন্য ওকে তৈরি করিনি। কারণ সে-প্রকৃতি ওর নয়। ওর সঙ্গীত একান্তই ঈশ্বরপূজা।'

উদার উদয়শঙ্কর অভয় দিলেন অন্নপূর্ণাকে তাঁর প্রকৃতি অনুযায়ী চলতে দেওয়া হবে। শুধু দুটি শিল্পীচিত্ত মিলুক সঙ্গীতের মোহানায়।

এই হল প্রাথমিক নৃত্যশিল্পী রবিশঙ্করের বিশ্বজয়ী সেতারীতে পরিণত হবার পশ্চাপৎট।

আনন্দের স্মৃতি? তার কি সীমা পরিসীমা আছে? তবু ভুবনজয়ী রবিশঙ্করকে ছোট শিশুর মতোই আনন্দে অস্থির হতে দেখা গিয়েছিল ১৯৬৮ সালে দাদা উদয়শঙ্কর মৃত্যু শংকট কাটিয়ে মাণ্ডিয়া থেকে একমাসের জন্য যখন তাঁর আদরের রবুর লস এঞ্জেলসের বাড়িতে বিশ্রাম নিতে গিয়েছিলেন। সেই প্রথম দাদার সঙ্গে নিজের বাড়িতে একসঙ্গে থাকবার এবং তাঁকে সেবা করবার সুযোগ মিলল। 'রবুকা যে কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না।' ভূদেবদা বলছিলেন আমেরিকা থেকে ফিরে। 'এই একভাবে দাদার থাকবার ঘর সাজাচ্ছেন, পছন্দ হচ্ছে না। পরমুহূর্তেই অন্যভাবে। বিছানাটা কীভাবে দাদার কাছে কমফরটেবল করা যায়, কী কী রংয়ের পর্দা, বেডকভার দাদার চোখে সুদিং লাগবে। দাদার জন্য হরেক রকমের স্লিপিং স্যুট, ড্রেসিং গাউন, তোয়ালে, পারফিউম রঙীন টি ভি, রেকর্ড চেঞ্জার, রেকর্ড কিনেও স্বস্তি নেই। আর কী হলে দাদা খুশি হবেন সেই চিন্তায় ছটফট করছেন।'

'সত্যি সে আনন্দ ভাবা যায় না।' উদয়শঙ্করের গলফ ক্লাব রোডের বারান্দায় বসে বলছিলেন রবিশঙ্কর ও'র এক জন্মদিনে। 'একে দাদা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলেন তার ওপর আমার কাছে আসছেন বিশ্রাম নিয়ে সেরে উঠতে।'

যাকে ভালোবাসেন রবিশঙ্কর এমনি করে তাঁকে উজাড় করে দিতে চান। ভূদেবদার বিয়ে হয়েছিল ১৯৫৯ সালে। 'কি উপহার নেবে? জিজ্ঞেস করতে ওরা চেয়েছিলেন রবুদার যত রেকর্ড এদেশে ওদেশে বেরিয়েছে স-ব। সেই ১৯৫০ সালে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের তবলা সঙ্গতে বাজানো ৭৮ স্পীডের প্রথম রেকর্ড থেকে ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত প্রথম ই পি এবং ওদেশে প্রকাশিত প্রথম দুটি এল পি ডিস্ক।

ও'র প্রিয় গায়ক গায়িকা অনেকেই। আবদুল করিম খাঁ সাহেব, ফিয়াজ খাঁ, গোলাম আলি, আমীর খাঁ, কুমার গান্ধর্ব, পালুসকার, কেশর বাঈ, বেগম আখতার। এক একজন এক একটা বৈশিষ্ট্যের জন্য। এদিকে লতা, কাননদেবী, আশা, প্রতিমা, উৎপলা, সতীনাথ।

সুরকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের ওপর ও'র শ্রদ্ধার অন্ত নেই। কারণ স্বভাবে, প্রকৃতিতে, ধ্যানে চিন্তায় উনি ধ্রুপদী। কিন্তু ধ্রুপদ-অঙ্গের গানে ও'র সুর যেমন ম্যাজেস্টিক, তেমনি মধুর 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে' কি 'ওগো বধূ সুন্দরী' ধরনের গানে। এমন কোনো অনুভব নেই যাকে কেন্দ্র করে গান রচনা করেননি এবং যে গানে যে সুর দিয়েছেন তার চেয়ে বেটার কিছু ভাবা যায় না।

ও'র প্রিয় লেখক? বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র থেকে হাল আমলের সবার বই উনি পড়েন। শংকর, সমরেশ, সুনীল, শীর্ষেন্দু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়— সবার ভালো বই ও'র পছন্দ। কার বেশি ভালো? বলতে পারব না। এক একজন এক একটা দিক নিয়ে ডিল করেছেন। যিনি যেটাতে যত বেশি সাকসেসফুল তার লেখা তত বেশি ভালো লেগেছে।

মোটকথা রুচির ক্ষেত্রে, বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে উপভোগের ক্ষেত্রে এবং প্রেমের ক্ষেত্রেও রবিশংকর বহুমুখী। বৈচিত্র্যবিলাসী মন তাঁর এক জায়গায় স্থির থাকে না। প্রেমের প্রসঙ্গে প্রশ্ন করায় (১৯৫৭ সালে) উনি আমায় একবার বলেছিলেন. 'আই হ্যাভ লাভড মোর দ্যান ওয়ান্স অ্যাণ্ড এভরি টাইম উইথ ইকুয়াল সিরিয়াসনেস অ্যাণ্ড ফ্রেসনেস।'

সবচেয়ে বিষাদময় স্মৃতি? অবশ্যই দাদার মৃত্যু। গুরু আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের মৃত্যুও নিঃসন্দেহে দুঃখদায়ক। কিন্তু তাঁর বয়স হয়েছিল। কাজেই ও ঘটনার জন্য মনটা অনেকটা তৈরিই ছিল। কিন্তু দাদা? 'একাধারে আমার বাবা, বন্ধু, হিরো, গুরু, আমার সঙ্গীতের প্রেরণা, কর্মজীবনের দিশারী। তিনি যাওয়া মানে আমার জীবনের অনেক কিছুই চলে যাওয়া।' বলেছিলেন রবিশঙ্কর।

আলোকচিত্র লেখিকা কর্তৃক সংগৃহীত ও গৃহীত

রসিক রবিশঙ্কর

সাহিত্যে এবারকার নোবেল লরিয়েট ইলিয়াস কানেত্তি

লাজুক, অন্তর্মুখী, প্রচারবিমুখ

অতনু রায়

অনেক সুচিন্তিত বিশ্লেষণ, মতামত ও জল্পনা-কল্পনার উপর যবনিকা টেনে ১৯৮১ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন লনডন প্রবাসী বুলগেরিয়ান সাহিত্যিক ইলিয়াস কানেত্তি। পুরস্কারের মূল্য এক মিলিয়ন ক্রোনা। অর্থাৎ প্রায় পনের লক্ষ টাকা। কিন্তু অর্থমূল্যটাই সব নয়, সঙ্গে আছে অভাবনীয় প্রশংসা আর সম্মান। একজন অনতিখ্যাত সাহিত্যসাধককে তাঁর চতুষ্কোণ ঘর থেকে বের করে এনে সম্রাটের সিংহাসনে বসিয়ে বিশ্বের পাঠকদরবারের কাছে উপস্থাপিত করা হলো। অন্তত ইলিয়াস কানেত্তির সম্বন্ধে কথাটা সবচেয়ে বেশি খাটে।

আগেও নোবেল পুরস্কার ঘোষণার পর আমরা অবাক প্রশ্ন করেছি, চেসলো কী? ওদেসিয়ুস কোথাকার? ব্যাশেভিস কে? কিন্তু এবার যেখানে কানেত্তি গত তেতাল্লিশ বছর যাবৎ বাস করছেন, সেই লনডন শহরের লোকদেরও চকিত জিজ্ঞাসা, ইলিয়াস কোনজন? তাঁর বইয়ের প্রকাশক ও হাতগুনতি বন্ধু-বান্ধবদের মতে কানেত্তির মত লাজুক, অন্তর্মুখী, প্রচারবিমুখ সাহিত্যিক আর দুটি নেই। এনসাইক্লোপিডিয়া দূরে থাক সর্বশেষ Who's Who বইতেও তাঁর নাম নেই। প্রতিনিধিস্থানীয় তাঁর যে দুটি বই-এর কথা সুইডিশ অ্যাকাডেমি সসম্ভ্রমে উল্লেখ করেছেন, সে-দুটি বহু বছর যাবৎ বাজার ছাড়া। ইউনিভারসিটির গণ্ডীর বাইরে তাঁর নাম শুনেছেন খুব কম লোক।

এহেন কানেত্তির নোবেল পুরস্কার পাওয়ায় প্রতিক্রিয়া কী? বলা গেল না। কেননা স্যামুয়েল বেকেটের মত নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই তিনি নিরুদ্দেশ। দিনকয় বাদে সাংবাদিকরা যখন তাঁকে আবিষ্কার করলেন বাভারিয়া-র একটি ছোট স্বাস্থ্যনিবাসে, তিনি কারুর সঙ্গে দেখা করতে নারাজ। শুধু বলেছেন, নভেম্বরের শেষাশেষি স্টকহোমে পুরস্কার নিতে তিনি যাবেন। বেকেটের সঙ্গে শুধু ওখানেই তফাৎ।

ইলিয়াস কানেত্তির জীবনটা বড় অদ্ভুত। জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯০৫ সালের পঁচিশে জুলাই বুলগেরিয়ায় ড্যানিউব নদীর ধারে রুজে শহরে। বাবা-মা ছিলেন স্প্যানিশ-ইহুদী, তাঁর

মাতৃভাষাও ছিল মধ্যযুগীয় স্প্যানিশ। তাঁর যখন দু'বছর বয়স, তখন পরিবারসুদ্ধ সবাই চলে এলেন ইংলণ্ডে। সেখানে কিছুদিন থাকার পর বাবা মারা গেলেন। মা কানেত্তিকে নিয়ে পালিয়ে এলেন ভিয়েনায়, এবং কানেত্তি সেখানেই লেখালেখি শুরু করলেন তাঁর তৃতীয় ভাষা জর্মনে, এবং ঐ একটি ভাষাতেই তিনি আজও লিখে চলেছেন।

দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন সময়ে ভিয়েনায় কানেত্তির উপর দিয়ে গেছে নৃশংস অত্যাচারের ঢেউ। জীবনের সেই হতাশ, অন্ধকারময় রূপ তাঁর মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ভিয়েনায় থেকে তিনি পালিয়ে এলেন ইংলণ্ডে।

১৯২৯ সালে বার্লিন ঘুরে আসার সময়ই কানেত্তি ঠিক করেছিলেন বালজাকের 'কোমেদি-উমেইন'-এর ঢঙে আটটি উপন্যাসের একটি সিরিজ লিখবেন। 'আমার মনে হয়েছিল, গোটা পৃথিবীটাকে কলমের ডগায় ধরতে গেলে চলতি রিয়্যালিস্টিক উপন্যাস দিয়ে আর চলবে না। পৃথিবীটা যেন বড় বেশি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে—টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন দিকে।'

আটটির মধ্যে একটি মাত্র উপন্যাসই লেখা হয়েছিল—'দি ব্লেনডুং' (Die Blendung), ব্রিটেনে প্রকাশিত হয় Auto da fe' নামে। কানেত্তি বলেছিলেন, তাঁর সব কথাই তিনি এই উপন্যাসটির মধ্যে বলতে পেরেছেন।

গল্পটা হলো একজন বিদ্বান স্বল্পভাষী অন্তর্মুখী চীন সভ্যতার অধ্যাপককে নিয়ে, যাঁর কাছে একটা কফির কাপ তুলে ধরাও অদ্ভুত সব অনুষঙ্গ বহন করত। ভদ্রলোকের নাম পিটার কিয়েন। তিনি তাঁর সমস্ত জীবনটা পড়াশোনা নিয়েই কাটিয়েছেন। কিন্তু মাঝবয়সে তাঁর জীবনের ছকটা হঠাৎ বদলে গেল একটা ঘটনায়। নিতান্ত হঠকারিতার বশে তিনি বিয়ে করে বসলেন তাঁর দজ্জাল বাড়িউলীকে। কিন্তু বিয়েটা শেষঅব্দি যখন কি অর্থনৈতিক কি শারীরিক কোনদিক থেকেই তেমন লাভজনক প্রতিপন্ন হলো না, তখন ভদ্রমহিলা, যাঁর নাম থেরেস, রেগে আগুন হয়ে উঠলেন। কিয়েন সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁর জীবন থেকে মেয়েটিকে তিনি সরিয়ে দেবেন—নিজেকে 'প্রস্তরীভূত' ক'রে। তিনি হবেন নীরব, স্পন্দনহীন, পাথরের মতো স্থাণু। কিন্তু যখন তাঁর বৌ শেষে তাঁর ব্যাঙ্কের পাসবইটাও কেড়ে নিতে চাইল, হাটকাতে লাগল দেরাজের মধ্যে রাখা মূল্যবান পাণ্ডুলিপিগুলো, তখনই তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হলো—

কিয়েন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন। এতক্ষণ তিনি ছিলেন চুপচাপ। এবার তৈরি হলেন সর্বশক্তি নিয়ে থেরেস-এর উপর লাফিয়ে পড়ার জন্যে। দাঁত আর জিভ দিয়ে শক্ত ক'রে চেপে-ধরা ঠোঁটদুটো। রাগে চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'আমি একটা পাথর নই।' জিভটা শক্ত হয়ে উঠল দাঁতের আড়ালে।

ব্যাঙ্কের পাসবইটা কোথায়? এক পা এগিয়ে এল থেরেস। ভেঙে পড়ার আগে প্রাণপণ চীৎকার করে উঠল, পাসবইটা কোথায়? মাতাল-জোচ্চোর-লম্পট। পাসবইটার জন্যে তখনও সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। কিয়েন হো-হো করে হেসে উঠলেন তার শেষ কথাটায়।

কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে গেল না। থেরেস হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল তার চুলের মুঠিটা, তারপর ঠেলে নিয়ে চলল পড়ার টেবিলের দিকে। চিৎকার করে বলল, বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে। তার কাঁধের কাছটা খামচে ধ'রে ঝাঁকুনি দিতে লাগল পাগলের মত। থুঃ করে একদলা থুতু ফেলল কিয়েনের মুখে। কিয়েন শুধু দেখলেন। সব। বড় কষ্ট। তিনি তো সত্যিই পাথর নন। এত সহজে ভেঙে পড়া উচিত হয়নি থেরেসের। এভাবে সে কাণ্ডজ্ঞান হারাবে? সমস্তই মিথ্যে, ঠিকই, কিন্তু সামান্য বিশ্বাসও কি নেই? বোধহয় ঈশ্বর বলেও কেউ নেই। প্রায় হাল ছেড়ে দিচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু তবু শেষবারের মতো নিজেকে সামলে পিছনে সরে এলো। রাগে কাঁপতে কাঁপতে থেরেসের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন—তাঁর হাড়েও যথেষ্ট ধার আছে।' পৃঃ— ১৪৬

শেষ পর্যন্ত অবশ্য থেরেসই জয়ী হলো—কিয়েনকে সে বের করে দিল, রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিল তার কোট, টুপি, ব্রীফকেস। যদিও ব্যাঙ্কের পাসবইটা তখনও কিয়েনের পকেটে।

পুরো উপন্যাসটাই এ ধরনের ঝাঁকুনি দেওয়া ছোট ছোট বাক্যে লেখা—যা জর্মন সাহিত্যে এর আগে আমরা পাইনি। বিবৃতিকারের নিজস্ব বক্তব্য, কার প্রতি তাঁর সহানুভূতি—এসব কিছুই বোঝা যায় না। পাঠক এক বাক্য থেকে আর এক বাক্যে নাচানাচি করেন।

কিয়েন আর থেরেস কেউই যেন মানুষ নয়, বড় বেশিরকম জান্তব।

বিপ্লবী হয়ে গেছি।

সিতাংশুর বুকে এই নরম করে বলা কথাটাই প্রচণ্ড বিস্ময় নিয়ে ছিটে গুলির মতো আঘাত করল। অনেকক্ষণ হাঁ করে অবনীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর একটু সহজ হয়ে আবার খাটিয়ার উপর এলিয়ে পড়ল। তারপর স্লোগান দেওয়ার মতো বলল, সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করতে হবে।

অবনী বলল, গ্রাম দিয়ে শহরকে ঘিরতে হবে, আমি গ্রামে চললাম।

সিতাংশু বলল, তুই কেমন বিপ্লবী রে, মেকী না আসল? শুনেছি এ লাইনে এখন অনেক বেনোজল ঢুকে গেছে। ফলে আসল ব্যাপারটাই নাকি গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

অবনী ভাবলেশহীন গলায় বলল, আমরা সাচ্চা, বাকি সব প্রতিক্রিয়াশীল।

নাসিমা মুখ নিচু করে পেরেক বাছছিল। বছর বারো-তেরোর মেয়ে। এর মধ্যে বিবাহ এবং স্বামী পরিত্যক্তা হয়েছে। বাপের ঘরে ফিরে এসে দু-পয়সা রোজগারের ধান্দা করছে। পেরেক বেছে দিলে দেড় দু-টাকা সিতাংশুর কাছ থেকে পায়। ফাই ফরমাস খাটার জন্য আরো আট আনা।

সিতাংশু তার উরুতে জোরে একটা চাপড় মারতেই নাসিমা মুখ তুলে তাকাল। সিতাংশু হাত ইশারায় নাসিমাকে কাছে ডেকে একটা পাঁচ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বলল, দো পাকিট আউর এক শলাই।

অবনী ব্যস্ত হয়ে বলল, মেয়েটাকে পাঠালি? রাস্তায় তো নেকড়ের ছড়াছড়ি। ছিঁড়ে খুঁড়ে খেয়ে না ফেলে। নারকেলের কচি শাঁসের মতো মেয়েটা সবে যৌবন পাচ্ছে।

সিতাংশু বলল, ভাগ শালা, সব কিছুরই একটা এথিকস আছে জানিস, জঙ্গলেরও আইন থাকে। নাসিমার কিছু হবে না। নেকড়ে ফেকড়ে যাদের বলছিস, সে লোকগুলোও খুব ভীতু। উলটো পালটা হিড়িক দেওয়া হয়ে গেলে, খাল খিঁচে নেওয়ার লোক অনেক আছে।

সিতাংশু আর অবনী যেখানে বসে আছে, তার পর থেকেই ঢালু পাড়, মিশেছে টালির নালার সঙ্গে। লোকে বলে ছোট গঙ্গা। অনেকটা কাদা মাটি পেরিয়ে এক চিলতে নোংরা জলের ফালি। সি এম ডি এ কী সব কাজ করছে, তাই নালায় বাঁধ দেওয়া না কি হয়েছে। জমা জল পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

অবনী নাক কুঁচকে বলল, পচা গন্ধ বেরুচ্ছে। পুরো সোসাইটিটাই পচে গোবর হয়ে গেছে। আমরা ফ্রেশ অক্সিজেন নিয়ে আসব।

নাসিমা সিগারেট এনে সিতাংশুকে দিল, কিছু খুচরো পয়সা। দু বন্ধু সিগারেট ধরিয়ে বড় করে ধোঁয়া টানল। অবনী সিতাংশুর পাঁজরে আঙুলের খোঁচা দিয়ে বলল, তুই চিরকেলে গুড বয়, হঠাৎ একেবারে রেড লাইট এরিয়ায় চায়ের পেটি বানাতে চলে এলি?

সিতাংশু জ্বলন্ত সিগারেট ধরা হাতটা এমনভাবে অবনীর চোখের কাছে নিয়ে গিয়ে নাচালো, যেন সে ছ্যাঁকা দিয়ে দেবে। ঝাঁঝালো গলায় বলল, বেশ করেছি এখানে ব্যবসা করতে এসেছি। কার বাপের কী?

অবনী শেয়ালের মতো খিক খিক করে হাসলো। রেগে গেছিস, মানে তুই এই বেশ্যাপট্টিতে খুব একটা সুখে নেই, স্বাভাবিক। মধ্যবিত্ত ধ্যান ধারণাগুলো পায়ের শেকল, ওগুলো সহজে ছেঁড়া যায় না। আমি মেদিনীপুরে দু রাত্তির একটা মেয়ের ঘরে ছিলাম। মেয়েটা দারুণ রাঁধতো।…কি ভাবছিস? কিছু মিছু হয়েছিল কি না? হয়নি, তবে হলেও দোষের কিছু ছিল না। মেয়েটাকে আমার বেশ ভালোও লেগেছিল। তবে ভি ডির ভয়ে ছুঁইনি। ওর ঘরে একটা রিভলভার হাতে আসার কথা ছিল।—পাইনি, বিচ্ছিরি হাঙ্গামা হুজ্জুত হয়েছিল। পুলিশে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা পর্যন্ত হয়েছিল। মেয়েটা বহুৎ খচ্চর, মারপিটের সময় আমার কোমরে একটা খেঁটে লাঠি দিয়ে দমাম করে মেরেছিল। উঃ, ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম।

সিতাংশু চোখ ছোট ছোট করে বলল, তুই এখানে এসেছিস কেন? তুই তো অনেকদিন লোক্যালিটি ছেড়েছিস। আমি যে এখানে বিজনেস করছি, সে খবর তোকে কে দিল? তোর মতলবটা কি?

অবনী একটু কি যেন ভাবলো। তারপর সিতাংশুর দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলল, একটা উপকার করবি? করতেই হবে। অ্যাবাভ অল উই আর ওল্ড ফ্রেণ্ডস। আমার কাছে ছ খানা রিভলবার। আজকেই হাতে এসেছে। আমি পরশুদিন কলকাতা ছাড়বো. সে পর্যন্ত এই মালগুলো তোর কাছে রাখতেই হবে।

অবনী তার সাইডব্যাগে হাত ঢোকালো। সিতাংশু সন্দেহের চোখে সেদিকে দেখতে দেখতে আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, গেট আউট, গেট আউট, আই সে গেট আউট ফ্রম হিয়ার… !

সিতাংশুর চিৎকার ও খাটিয়া ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠা দেখে মিস্ত্রিরা কাজ বন্ধ করে তাকিয়ে রইল। ততক্ষণে অবনী খাটিয়ার উপর হেসে গড়িয়ে পড়েছে। চোপ শালা, তোর মতো ডরপোকের হাতে এই ভুবনের কোনো ভারই নেই। দেখ সাইডব্যাগের মধ্যে কি আছে, বলে অবনী সাইড ব্যাগটা কাঁধ থেকে নামিয়ে সিতাংশুর দিকে ছুঁড়ে দিল।

সিতাংশু ব্যাগটা লুফে নিয়ে একটু বোকার মতো হাসলো। যাই হোক আমরা পুরনো বন্ধু, সরি। তবে তুই চলে যা অবনী। তুই থাকলে হয়তো গন্ধে গন্ধে পুলিশ আসবে। বিপ্লবী মানেই লাইভ ওয়্যার, আমার ভয় করছে।

অবনী বেশ কড়া গলায় জিগ্যেস করলো, কিসের ভয়?

জীবনের, জীবিকার। আমার বন্ধুরা সবাই যে যার কাজকর্মে ঢুকে গেছে—ব্যাঙ্কে, রেলে, পোস্টাপিসে, মার্চেন্ট ফার্মে। সুজন আই এ এস হয়েছে, মৃত্যুঞ্জয় জজকোর্টে ভালো প্র্যাকটিশ করছে। এমনি সব আর কি। আমি শুধু বাড়ি বাড়ি ঘুরে লক্ষ্মীপুজোর মতো ট্যুইশানি চালিয়ে যাচ্ছিলাম। বিজনেসটা নিয়ে ছমাস ধরে লড়ে যাচ্ছি। টাকা নেই, পয়সা নেই, বুদ্ধি নেই, বোলচাল নেই। ছেড়েই দেবো ভাবছিলাম। এভাবে বিজনেস করা যায় না। ঠিক সে সময় সেজো মাসীর সুপারিশে হাওয়ার্ড জনসন থেকে এই ভালো অর্ডারটা পেয়ে গেলাম। এতদিনে আমি পাড়ের সন্ধান পেয়েছি। তুই এসে নৌকো ফুটো করে দিবি, তা আমি সহ্য করবো না।

অবনী সিতাংশুর দিকে ভালো করে দেখলো, সিতাংশু ভয় পেয়েছে। অন্যদিকে মুখ করে সিগারেট টানছে চোখে মুখে স্মার্টনেস ফিরিয়ে আনার জন্য।

অবনী ঢালু পাড় বেয়ে বেশ খানিকটা নেমে গেল অন্ধকারে পেচ্ছাপ করতে। ফিরে এসে নিচু স্বরে বলল, নরক! নরক!

সিতাংশু কথাটা শুনেই চট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, দেবদূতের নরকে থাকার দরকার কি?

দূর মাইরি! তুই খালি ঝামেলা করছিস। আমি যা দেখেছি, তুই দেখলে তোরও ঘেন্না হতো। ফিরে আসছি, দেখি একটা ধুমসো মেয়ে উদোম হয়ে ইয়ে করছে। ওই অন্ধকারেই দেখলাম, আমার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া মাত্র হাসলো। ওয়াক—! অবনী সত্যি সত্যি বমির ভাব করে কালী সিং-এর মোষের খাটালটার দিকে সরে গেল।

সিতাংশু তা দেখে হো হো করে হেসে উঠল। শালা বুর্জোয়া! অবনী সিতাংশুর কথায় একটু থমকে গিয়েও পর মুহূর্তেই আরো জোরে হেসে উঠল। ইয়ারকি নয়, শ্রেণী শত্রুদের খতম করা চলছে চলবে। তারপর জজ সাহেবের রায় দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, শ্রীসিতাংশু সরকার সান অব সাম হোয়াট সরকার……আফটার গিভিং ডিউ কনসিডারেশন টু অল দ্য প্রসেস অ্যাণ্ড বিহেভিয়ার, আই হিয়ারবাই ডিক্লেয়ার হিম টু বি আ হেটেড ক্লাস এনিমি অ্যাণ্ড রিঅ্যাকশনারি…অতএব তার পেটে ইঞ্চি ছয়েক লম্বা একটা ইসপাতের ধারালো ফলা ঢুকিয়ে একটু এধার ওধার করে দাও। আমাদের জনতার আদালতে এভাবে রায় দেওয়া হয়।

বরজান মিস্ত্রি আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে উঠে এল। দিন একটা সিগ্রেট দিন। জোর খাটুনি যাচ্ছে. পঞ্চাশটা পেটি আপনার কমপ্লিট হয়ে গেছে।

সিতাংশু একটু চিন্তিত মুখে বলল, মিস্ত্রি কি বুঝছো, ডুববো না তো? এই পঞ্চাশটা নিয়ে মাত্র একশোটা চেস্ট তৈরি হলো। পরশু

সকালের মধ্যে পাঁচশো চেস্ট রেডি করতে হবে। তুমি আরো দুচারটে একসট্রা লোক লাগাও বরং…

বরঞ্জান সিগারেট কষে টান দিয়ে বলল, বরঞ্জান কনট্রাকটর কখনো কথার খেলাপ করেনি, ফুরনের কাজ ঠিক টাইমে করে দেবো। আপনার সব মিলিয়ে দশদিনের মধ্যে দু-হাজার পেটি সাপ্লাই দিতে হবে তো ? একবার হ্যারিসন ক্রসফিল্ডের অর্ডার এনেছিল ছোটুলাল। তিন দিনের মধ্যে তিন হাজার উনিশ চব্বিশ সাইজের পেটি বানিয়ে দিয়েছিলাম। তা আবার কতো বায়নাক্কা তক্তা, বাটাম, প্যানেল সব আই এস আই ছাপ মারা চাই। নয়া জাগজগা। ভেবে দেখুন, তিন দিনের মধ্যে সব জোগাড় করা, মাল বানানো, ঠেলায় চাপানো, সে এক এলাহি কাণ্ড। ছোটুলাল তখন সবে এক মাস রক্ত আমাশায় ভুগে উঠেছে। চিঁ চিঁ করে কথা বলে, অন্য কেউ হলে ওরকম অর্ডারই নিত না। ব্যাটার এমন পয়সার লোভ। সব তো আমিই সামলালাম।

সিতাংশু বরজানের কথাটার মানে বুঝল। ও মনে মনে ভাবল পড়েছি যবনের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে। ব্যাটারা যা বোঝাবে তাই বুঝতে হবে।

বরঞ্জান ঘন ঘন কয়েকটা টান দিয়ে সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে দিল অন্ধকারের দিকে। তারপর নস্ট্যালজিক ভাব এনে বলল, ভৃগুবাবু তখন এসব অর্ডার নিয়ে আসতো। সাব কনট্রাক্ট নিয়ে সব লাল হয়ে যেতো। ছোটুলালের অর্ডারটা তো ভৃগুবাবুই এনে দিয়েছিল। আপনি বড় দেরিতে এলেন। বছর পাঁচেক আগে এলেও ভৃগুবাবুকে পেতেন। লেখাপড়া জানা ছেলেকে এ লাইনে দেখলে উনি খুশীই হতেন। আচ্ছা সিতুবাবু আপনি কি কলেজের পরীক্ষাও পাশ করেছেন ?

সিতাংশু ঘাড় নাড়লো অল্প করে বরঞ্জান প্যাকেট থেকে আরেকটা সিগারেট নিয়ে মুখে পুরল। সিতাংশু আড়চোখে দেখে একটা গোটা ও একটা আধখালি প্যাকেট, দুটোই পকেটে রাখল। তা'লে গ্র্যাজুয়েট না কি বলে, আপনি তা-ই। ভালো—ভালো—।

বরঞ্জান হেডমিস্ত্রি, বাকিরা তার আণ্ডারে, পিস রেটে কাজ করে কাজ সাময়িক বন্ধ রেখে মিস্ত্রিরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে বিড়ি টানছিল। নাসিমা কালো ঝুল একটা তোবড়ানো কেটলি নিয়ে চা আনতে গেছে।

বরঞ্জান হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এইভাবে সিতাংশুকে বলল, আপনার জগজগা তো কম পড়ে যাবে। আজ রাতে যদি আর একশো বাক্সও তৈরি হয়…

সিতাংশু সত্যিই খুব অবাক হয়েছে, বলো কি মিস্ত্রি, ত্রিশ কেজি ফ্রেশ জগজগা, এর মধ্যে শেষ হয়ে গেল, কটা বাক্স হয়েছে ?

বরঞ্জান বেশ গম্ভীর গলায় বলল, আপনি পণ্টু দাসের কাছ থেকে হিসাব নেওয়া শিখেছেন। আপনার হিসাবের সঙ্গে আমারটা মেলেনা, বলেই আধখাওয়া সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বেশ রাগ দেখিয়ে চলে গেল।

সিতাংশু দাঁত চেপে অবনীকে বলল, দেখ শালা আমি মালিক আর ও শ্রমিক, কে কাকে এক্সপ্লয়েট করছে। নির্বাৎ কেজিদশেক অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল বেচে দিয়েছে।

অবনী হেসে বলল, তুই মালিক না ঘোড়াডিম। অর্থনীতির নানারকম প্যাঁচ পয়জার আছে। অত সহজে শ্রেণী নির্ণয় হয় না। তোকে আমি একদিন সব বুঝিয়ে দেব। হায়ার স্টাডির জন্য বিশুদা আছে।

দয়ারানী গজগজ করতে করতে এসে সিতাংশুকে একটা দু টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বলল, খুদরা হোগা ? …আজসে রেট বাঢ়া দিয়া। সিতাংশু শরীরটা বাঁকিয়ে চুরিয়ে পকেট থেকে পার্সটা বের করে গুণেগেঁথে দু টাকার খুচরো পয়সা দিল। রেট কত বাড়ল রে ? আগে তো দালালীর মজুরী ছিল এক টাকা।

পানসিকা কর দিয়া বাবু। পয়সা গুণতে গুণতে দয়ারানী চলে গেল।

অবনী বলল, কি রে এরা তোর ফ্রেণ্ড ?

সিতাংশু অন্যদিকে তাকিয়ে জবাব দিল, ক্ষতি কী ?

না, ক্ষতি কিছু না, এমনি বলছিলাম। এদের রোজগারপাতি কেমন রে ?

তোর অত ইন্টারেস্ট কেন ? তার আগে একটা কথা, সন্ধ্যা থেকে এখানে ঘাপটি মেরে পড়ে আছিস কেন বলতো ?

অবনী বড় করে হাই তুলল, আড়মোড়া ভাঙল, তারপর বলল, বৃষ্টি-টিষ্টি না হলে এই উঠোনেই দিব্যি শোয়া যায় মনে হচ্ছে। আমি তোর নিউলি অ্যাপয়েন্টেড ম্যানেজার। আমার নাম বলরাম। আগাম মাইনে হিসাবে আজ এক্ষুনি আমাকে পাঁচশো টাকা দিবি।

সিতাংশু অবনীর কথায় বেশ রেগে গেল। মাইরি, কী মজাকি শুরু করেছিস বলতো ? বেরো এখান থেকে, না হলে তোর পেছনে লাথি মেরে বের করবো।

কেমন বুঝছেন ? আপনাদেরই জাতের, হিঁদু

অবনীর এ সব কথায় এতটুকু বিকার নেই। ও বেশ পরামর্শ করার ভঙ্গিতে বলল, তার চেয়ে এক কাজ করা যাক। যেভাবেই হোক, কটা দিন আমাকে এখানে থাকতেই হবে। একটা ব্যাপার আছে। তুই আমাকে কিছু টাকা দে আমি কোনো একটা মেয়ের ঘরে থেকে যাই। কাপ্তান বাবুদের মতো মদ খাব ফূর্তি করব।

সিতাংশু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই সফির গলা পেল। খোদার মেহেরবানি একেই বলে। মেঘ না চাইতেই পানি। তাহলে বাবু বৌনিটা আপনিই করুন।

অবনী কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে অপরিচিত লোকটির দিকে তাকালো। ধবধবে গায়ের রং, টিকলো নাক, একমাথা ঝাঁকড়া চুল, সুর্মা টানা চোখ, ঠোঁটে পানের দাগ। সব মিলিয়ে লোকটার মধ্যে অদ্ভুত একটা মেয়েলি লাবণ্য আছে। তার পেছনে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে। হাতে টিনের সুটকেস ঝোলানো, কাঁধে একটা বড় পুঁটলি। সাদামাটা ক্ষীণ স্বাস্থ্যের মেয়েটাকে দেখলে মনে হয় লোকের বাড়ি বাসন মাজা মেয়েদের মতো কেউ।

সফি সিতাংশুকে বলল, কেমন বুঝছেন? আপনাদেরই জাতের, হিঁদু। গড় কর। মেয়েটি তার জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে সিতাংশুর দিকে এগিয়ে গেল প্রণাম করার জন্য। সিতাংশু প্রবল আপত্তি করাতে মেয়েটি থমকে দাঁড়াল শ্বেত শিরীষের তলায়। আর অমনি চাঁদের আলো ছায়ায় মেয়েটির চেহারা বদলে গেল। সিতাংশু বলল, অপূর্ব।

খুব আস্তেই বলেছিল, সফি শুনতে পারনি। বলল, কেমন দেখছেন কত্তা। একে দিয়ে কপাল ফিরবে তো? নাম হলো ঝিল্লু। ওটা বদলাতে হবে।

ঝিল্লু! ঝিল্লু কারো নাম হয় নাকি? অবনী বিস্ময় প্রকাশ করতেই বাকি তিনজন অবনীর দিকে তাকালো।

সিতাংশু বলল, হয়তো ঝিল্লি। সংস্কৃত শব্দও এঁকে বেঁকে কোথায় কীভাবে আটকে আছে।

অবনী দাঁত আর জিভ দিয়ে একটা আওয়াজ করে বলল, ঝিল্লি—? না, বড় বেশি রোমান্টিক লাগছে। কিন্তু ব্যাপারখানা কি বলতো। রংরুট?

সিতাংশু অবনীর কথায় হো হো করে হেসে উঠল, সফি ভাইয়ের এক দারুণ দুঃখের কিসসা আছে। ওরও আমার মতো অবস্থা। কিছুতেই কেরিয়ার তৈরি করতে পারছে না।

সফি বলল, রাতে আলো জ্বেলে কাজ হচ্ছে? সেই বড় অর্ডারটা পেলেন নাকি?

সিতাংশু হেসে বলল, হ্যাঁ, বেড়ালের ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত সিকে ছিঁড়ল। তবে বরজান মিস্ত্রি বহুত ট্রাবল দিচ্ছে। মাল সরাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কাজ তুলে দিতে পারবে কিনা বুঝছি না। তাই তো আজ থেকে নতুন এক ম্যানেজার রেখেছি। বলরাম, আমার ছেলেবেলার প্রাণের বন্ধু।

অবনী আর সিতাংশুর একবার চোখাচোখি হলো।

সফি বলল, তা বেশ করেছেন। কিন্তু ওই বরজানের কথা বলছিলেন, শালা নেড়ের বাচ্চা বহুৎ খচ্চর। আমার আগেই সন্দেহ ছিল ও আপনার মাল কম বেশি হাপিস করে। আসলে কি জানেন, নয়া মানুষকে পেলে সবাই একটু ঠোকরায়। না হলে আমার বাপের ফলাও ব্যবসা। বাপ মারা যাওয়ার পর নাবালক ছিলাম বলে বছর আটেক পাড়া ছাড়া হয়েছিলাম। এসে যেই বিজনেসে ফের ঘেঁষতে গেছি, অমনি সবাই মিলে পিছনে লেগে গেল। পুলিশের হুজ্জুত। টাকা পয়সার শ্রাদ্ধ। বিলেতি সিগ্রেট খাবেন? স্টেট এক্সপ্রেস, হংকং মাল।

শার্টের ভিতর হাত ঢুকিয়ে গেঞ্জির তলা থেকে প্যাকেটটা বের করে দুজনকে সিগারেট দিল। ঝিল্লু খাবি নাকি একটা?

ঝিল্লু হাত বাড়িয়ে একটা সিগারেট নিল। বেশি কড়া নয় তো? আমার আবার কাশির ব্যারাম আছে।

সিতাংশু বলল, ভেটারেন মাল বুঝি? একসপিরিয়েনস্ড?

ইংরেজি কথা দুটো সফি না বুঝলেও, সিতাংশু কী বলতে চাইছে আন্দাজ করতে পারল। ব্যস্ত কেন, বলব সব কথা। ততক্ষণে চাবিটা দাও ঘর খুলি। আচ্ছা ভালো টনিক কি আছে? ঝিল্লুটা বড় রোগা, ওকে খাওয়াবো। অনাদি ডাক্তারের কাছেও একবার নিয়ে যাব। মনে হয় পেটে কৃমি আছে। ঘুমের মধ্যে দাঁত কিড়মিড় করে। কাল রাতে একসঙ্গে ছিলাম।

অবনী বলল, তার মানে রাক্ষুসী, তোমার হাড়মজ্জা চিবিয়ে খাবে।

অবনীর কথা সফি বেশ শব্দ করে হেসে উঠতে গিয়েও থেমে গেল। ঝিল্লু বোধহয় রেগেছে, পা দিয়ে ইচ্ছে করে টিনের সুটকেসে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিল। সফি তাড়াতাড়ি সেটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বলল, চাবিটা দ্যান, বিবিকে পিঠিষ্ঠে করি।

দুই

অবনীর ঘুম ভাঙতে একটু দেরি হয়ে গেল। বেশ চড়া রোদ উঠে গেছে। খাওয়া দাওয়ার পর শুতে শুতে কাল প্রায় দুটো বেজে গিয়েছিল। মিস্ত্রিরা তখনো কাজ করছিল। সিতাংশু সিগারেট খেয়ে আর হাই চেপে কোনরকমে জেগেছিল। মিস্ত্রিদের ধুম ধাড়াক্কার মধ্যে কখন যে অবনী ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই। ঘুম ভেঙে দেখলো শরতের সোনালী রোদে চারদিক ভেসে যাচ্ছে। ওর মুখের সামনে খাটিয়ার পাশে লম্বা করে সাজানো বাক্সের থাক। প্লাইউডের কেমন একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ আসছে। আড়মোড়া ভেঙে অবনী উঠে বসল, এদিক ওদিক তাকিয়ে সিতাংশুকে খুঁজল। কেউ নেই। সিতাংশু, তার মিস্ত্রি, এমন কি অন্য লোকজনও কেউ নেই। সিতাংশুর মূল ঘরটায় একটা পলকা তালা আটকানো।

উঠোন পেরিয়ে সামান্য একটু স্যাঁতসেঁতে গলি পথ। সেটুকু পেরোলেই রাস্তা। রাস্তার দুপাশে সারবাধা টালি বা খাপরার ঘর। মাঝে মাঝে দু-একটা পুরনো পাকা বাড়ি। মেয়েরা থাকে। ওরই ফাঁকে ফাঁকে চায়ের দোকান, চুল কাটার সেলুন, কামারশালা, সাইকেল সারানোর দোকান, গরু মোষের খাটাল। মাথায় টিনের ছাত বেটপ সাইজের গম্ভীর চেহারার ওয়্যার হাউস।

অবনী পকেটে হাত দিয়ে একটা সিকি পেল। হাতটা আরো বার কয়েক নাড়াচাড়া করেও আর কিছু পাওয়া গেল না। অবনী বিরক্ত হলো, আর দশটা পয়সাও কি থাকতে নেই? তাহলে চা আর সিগারেটের জন্য ভাবতে হতো না। এখন আবার পনের পয়সায় কোথায় চা পাওয়া যায়, তা খুঁজে দেখতে হবে।

এখনো পাড়াটা জাগেনি, সারি সারি বন্ধ দরজা। হাতে ঘড়ি নেই অবনীর। আন্দাজে সময় বোঝার চেষ্টা করল। আটটা বেজে গেছে, সাড়ে আটটা হবে। একটা ভাঙাচোরা চায়ের দোকান বের করলো অবনী। দম রান্না হবে বলে আলু ছাড়ানো হচ্ছে। কেটলিতে চায়ের জল ফুটছে। অবনী দোকানীকে সিকিটা দিয়ে বলল, একভাঁড় চা আর একটা সিগারেট হবে এতে? আর পয়সা নেই।

লোকটা কোনো কথা না বলে একভাঁড় স্বাদহীন গরম চা আর একটা চারমিনার এগিয়ে দিল। অবনী দু চুমুকে চাটা শেষ করে সিগারেট টানতে টানতে উঠোনে ফিরে এলো। অবনীর এখন একটা মগ বা কৌটো প্রয়োজন।

ঠিক এ সময় সফি চোখ ডলতে ডলতে ঘর থেকে বেরলো। অবনীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই একগাল হাসলো। ভাবছি ঘরটায় লালচে গোলাপী রঙ করবো। একটু আধটু সারাইও করতে হবে। একটা লাল রঙের জিরো পাওয়ারের বালব লাগিয়ে দেবো। একদম ফাস-কিলাস হয়ে যাবে।

সারারাত ধরে কি এই ভাবলেন?

কত্ত কি ভাবলাম! কখন ঘুম থেকে উঠলেন? গিয়েছিলেন গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে?

অবনী প্রথমে সফির কথাটা বুঝতে পারেনি. তারপর মৃদু হেসে বলল, যাবো। একটা মগটগ খুঁজছি।

নদীর ধারে আবার মগ লাগে নাকি? চলুন আমিও যাবো।

ওই পচা জলে? বলেন কি?

বুঝেছি। দাঁড়ান আসছি। [illegible] সফি অবনীর হাতে একটা কিং সাইজ বিলেতি সিগারেট [illegible] আবার ঘরের দিকে ফিরে গেল।

একটা মাটির তিজেলে জল ভরে ফিরে এলো। রাখেন, এটা আপনার। চলুন যাওয়া যাক। এরপরে মেয়েগুলো এসে গেলে, আপনি আর পারবেন না। বলে সফি খুব অর্থপূর্ণ একটা হাসি দিল।

অবনী জিগ্যেস করল, সিতাংশুকে দেখছি না।

সিতুবাবু হয়তো বাড়ি গেছেন। একেবারে সব কিছু সেরেসুরে চান টান করে ফিরবেন। সকালে পাঁচটা নাগাদ তো দুঠেলায় একশোটা পেটি গেল। তখন আমি একবার উঠেছিলাম। আল্লা করে, সিতুবাবুর বিজনেসটা লেগে যায়।

সফির সঙ্গে রাস্তার কলে স্নান করে, পরিপাটি করে চুল আঁচড়ে ব্রেকফাস্ট করতে গেলো। চা পাঁউরুটি আর গোলাপী রঙের জিলিপি দিয়ে। সফি জিগ্যেস করল, আমার ধান্দাটা কি আপনি ঠিক বুঝতে পেরেছেন ?' অবনী বলল, খানিকটা আন্দাজ করেছি।

ওই যে আপনার বন্ধুর ঘরটি, উঠোনের ওপর আরো দুটো ঘর, সব আমাদের; রাস্তার ওপর আরো চারটে ঘর এক সময় আমাদের ছিল। আমার বাবা ডকে কাজ করতো। খুব বড় একটা যুদ্ধ গেল, তখন বাবার হাতে খুব কাঁচা পয়সা। তারপর ফুফা আবার তার সম্পত্তির একটা ভাগ দিয়েছিল। বসিরহাটে আমাদের ভিটের লাগোয়া একটা দুবিঘের ওপর জায়গা নিয়ে পেয়ারা বাগান ছিল। সেটা বিক্রি করে, সব পয়সা টয়সা একত্তর করে বাবা এই সম্পত্তিটুকু কিনল। সে সময় ডকের ধারে এ বিজনেসে জোর পয়সা। বাবা বিজনেসে নেমে পড়ল। বাড়িতে এ নিয়ে খুব অশান্তি হয়েছিল। বাবা সে সব কথায় কান দেয়নি। ডকের চাকরিও ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর তো বাবা ক'বছর আগে খামকা খামকা ছুরি খেয়ে মরল।

সফি অবনীকে জিগ্যেস করলো, আপনি এসব কথায় বিরক্ত হচ্ছেন ? অবনী এমনভাবে ঘাড় নাড়লো, যার মানে হ্যাঁ বা না দুটোই হতে পারে।

আমার চার দাদা। তারা কোনদিন বসিরহাট ছেড়ে কলকাতায় আসেনি। বাবাকে তারা ঘেন্না করতো। মা-ই শিখিয়েছিল। বাবা মাঝে মাঝে দেশের বাড়ি যেত। আর কি ঝগড়া হতো। কাক চিল বসতে পারতো না। আমার তখন বছর বারো বয়স, বাবা একবার আসার সময় আমার হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এলো। সাগনের এটাতো কাটি গঙ্গা, বড় গঙ্গার ধারে রেল লাইনের পাশে আমাদের একটা ঘর ছিল। বাবা আমাকে এই পট্টিতে আসতে দিত না। ইস্কুলেও ভরতি করে দিয়েছিল। সেভেন পর্যন্ত পড়েছিলাম।

অবনী ঠিক মন দিয়ে শুনছিল না। সফির প্যাকেট থেকে একটার পর একটা সিগারেট টানছিল। রাস্তার ওপর চায়ের দোকানে তখন সবে ভিড় লাগতে শুরু করেছে। এক বিগত যৌবনা, বুকের কাছে সায়ার দড়ি গিঁট বাঁধা, বসন বলতে ওইটুকুই। আধুলি ছুঁড়ে দিয়ে একটা অ্যালুমিনিয়ামের ছোট্ট ক্যানে চা নিয়ে চুমুক দিতে দিতে রাস্তা পেরিয়ে চলে গেল।

...তা বুঝলেন, বাপ মরার পর আমরা দু দাদা এসে জলের দরে রাস্তার ওপর চারটে ঘর বিক্রি করে দিয়ে গেল। আর আমাকে বলল দেশে চল, গুড়ের বিজনেসে খাটবি। এই নোংরা নর্দমার মধ্যে পড়ে থাকবি কেন ? বাবা নেই দাদারাই গার্জেন। চলে গেলাম। উঠোনের দিকে ঘরগুলো বিক্রি হলো না, ওগুলো নিয়ে একটু গোলমাল ছিল। আসলে ও ঘরগুলো তো পোর্টকমিশনের জায়গায়। দাদারা অতশত বুঝতো না।

রাস্তা দিয়ে একটা লোক যাচ্ছে। ধবধবে সাদা ধুতি পাঞ্জাবী, কাঁচা পাকা ঝাঁকড়া গোঁফ, হাতে পাকানো বেতের লাঠি। হাবভাবে বেশ একটা মস্তানিভাব আছে। সফি চাপা স্বরে বলল, সালা শিউপূজন, কিস্তিওয়ালা। ধার দেনায় অর্ধেকের বেশি লোকের ওর কাছে টিকি বাঁধা। আমাদের উঠোনের দিকের ঘরগুলো ও ব্যাটা গাঁড়ামারার তালে ছিল। বাবা বারন করলেও আমি তো পট্টিতে রেগুলার আসতাম। শেষ দিকে বাবা জানতে পেরেও কিছু বলত না। তখন থেকেই আমাকে অনেকে ভালো-টালো বাসতো, তারাই...

সফির কথার মাঝখানেই অবনী উঠে দাঁড়াল। যাই দেখি গে সিতাংশু এলো কি না।

সফিও উঠলো, দাঁড়ান আমিও যাবো, এ্যাই আট আনার জিলিপি দাও তো। ঝিল্লু নিশ্চয় এতক্ষণে ঘুম থেকে উঠেছে।

অবনী অন্যমনস্ক ভাবে পকেটে একবার হাত দিয়েই দ্রুত হাতটা বের করে নিল। সফি সেটা খেয়াল করে বলল, ঠাকুর আট আনা করে দু ঠোঙায় জিলিপি দিও।

দুজনে ফিরতে ফিরতে অবনী বলল, কিস্তিওয়ালার নামটা যেন কী বললেন ?'

শিউ পূজন। ভারি বদ লোক।

অবনী দেখলো সিতাংশু খাটিয়ার ওপর গম্ভীর মুখ করে বসে আছে। অবনী একগাল হেসে বলল, ব্রেকফাস্ট করতে গিয়েছিলাম। মাইরি আমাকে গোটা পাঁচেক টাকা অন্তত হাত খরচার জন্য দিস। পকেটটা একেবারে খাঁ খাঁ করছে।

সফি এক ঠোঙা জিলিপি সিতাংশুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, আপনার বন্ধু বলরাম বাবু যে খুব ভালো লোক, তা আমি বুঝে গেছি।

অবনী এক দফা গলা চড়িয়ে বলল, সফি ভাই-এর তুলনা হয় না। ফ্রম প্রাতঃকৃত্য টু প্রাতরাশ আমাকে যা হেল্প করেছেন, ভাবা যায় না।

সিতাংশু গজগজ করে উঠল, রতনে রতন চেনে। বলরাম তোর সঙ্গে আমার বিজনেসের ব্যাপারে জরুরী কথা আছে।

সফি অমনি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বলল, আমি চলি। আপনারা কথা বলুন। ঝিল্লুকে জাগাতে হবে তো।

সফি চলে যাওয়ার পর অবনী বলল, এই মালটাকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। বেশ্যার দালাল সম্বন্ধে বই পত্তর পড়ে আমার অন্যরকম একটা ধারণা ছিল। এ দেখছি চাকর বাকরেরও অধম।

সিতাংশু বলল, ও ঠিক দালাল নয়। বলতে পারিস ও একটা স্বাধীন বিজনেস করছে, যার কাঁচা মালটা হল ওই ঝিল্লু। ওর বাপ খুব ডাকসাইটে লোক ছিল দারভাঙ্গা, নেপাল থেকে সব দেহাতী মেয়ে আমদানী করতো। জমজমাট ব্যবসা ছিল। সবই শোনা কথা। তবে ছেলেটি তেমন হয়নি। এই তো কিছুদিন আগে একটা মেয়ে নিয়ে জোর ফেঁসে গিয়েছিল। মেয়েটার বাবা এলাহাবাদ না না কোথাকার কোর্টের উকিল। মেয়ে বোম্বে যাচ্ছিল হেমা মালিনীর ভাত মারবে বলে। পথে দ্রুত দু-তিন হাত বদল হয়ে সফির হাতে এসেছিল। পুলিশ মেয়েটাকে খুঁজে বের করলো সফির ডেরা থেকে। মনে হয় যারা বেচেছিল, নষ্টামিটা তাদেরই। পুলিশকে খবর তারাই দেয়। বহু ঝামেলা আর বিস্তর পয়সাকড়ি খরচ করে সফিকে বাঁচতে হয়েছিল।'

একটা মেয়ে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় ঘর থেকে উঠোনে বেরিয়ে সিতাংশুর চোখাচোখি হওয়া খদ্দের ধরার ভঙ্গিতে চোখ টিপে আড়-মোড়া ভাঙল। অবনী বেশ আহত স্বরে বলল, এসবের মধ্যে তুই আছিস কি করে ? মেয়েছেলে সম্বন্ধে আমার বিতৃষ্ণা এসে যাচ্ছে।

সিতাংশু দার্শনিকের মত বলল. সমাজের এটাও একটা টুকরো। কমরেড দেখেনে। বদল করতে হলে সবকিছুই বদলাতে হবে। অত সহজে ঘেন্না পেলে চলবে কেন ?

বাঃ বেশ জ্ঞান দিচ্ছিস তো।

জ্ঞান নয়। প্রথম প্রথম আমারো খুব কষ্ট হত। তারপর আস্তে আস্তে অনেক কিছু বুঝে ফেললাম। আমি এখন ওদের মুখের আধ-খাওয়া সিগারেটও খেতে পারি। একটা কথা তোকে বলার ছিল। সফির সঙ্গে অত মিশিস-টিশিস না। পুলিশের খাতায় সফির নাম আছে। তাছাড়া এখানে মাঝে মাঝেই পুলিশের ঝামেলা হয়। তোকে একবার কোন কারণে ধরলে তুইতো ফাঁসবিই, আমিও ফাঁসবো।

অবনী বলল, আমাকে এখানে ঠিক কদিন থাকতে হবে জানিনা। ক্যালকাটা পোর্টে হংকং থেকে একটা জাহাজ আসছে। সেটায় একজন একটা ফরেন মাল নিয়ে আসবে। আমি সেটা ডেলিভারি নেব। তারপর মালটা এক জায়গায় পৌঁছে দিয়ে আমার ছুটি।

কি মাল আসবে, রিভলবারটার ধরণের কিছু ?

তা জানিনা। মানে আমাকে জানানো হয়নি।

তুই যে এখানে ডেরা বেঁধেছিস সেকথা জাহাজের লোকটা জানবে কি করে ?

সেটা আমার হেডেক নয়। যার জানাবার কথা, ঠিক জানিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়।

সিতাংশু হাসতে হাসতে বলল, মন্দাইলা লঙ্কাপুরী, মজিলা আপনি। তোর জন্য বিজনেসটা চৌপাট হয়ে যাবে। আর পুলিশের গুলি খেয়ে মরাটাতো তোর কপালেই লেখা আছে। বেহালা না কোথায় বোধহয় তোদের পার্টির কটা ছেলে দেওয়ালে আলকাতরা দিয়ে স্লোগান লিখছিল, পুলিশ গুলি করেছে। সবই শোনা কথা, সত্যি মিথ্যে জানিনা।

অবনী জিজ্ঞেস করলো, তোর মিস্ত্রিরা আজ আসবে না ? প্রায় দশটা বাজে।

ওরা আজ একটু দেরিতে আসবে। ফুরনের কাজ ওদের এসে বসে থাকলে চলে না। এই দ্যাখ না কতগুলো বাক্স ডাঁই হয়ে রয়েছে। বেলা বারোটার পর ঠেলা ছাড়বে, তখন ক্লিয়ার হবে। মাল ক্লিয়ার না করে নতুন বাক্স বানাবো কি করে ? রিস্ক নিয়ে সারারাত খোলা আকাশের তলায় ফেলে রেখেছিলাম। হঠাৎ বৃষ্টি এলে যে কী করবো জানিনা। এক আধ পশলা বৃষ্টিতো এখনো হচ্ছে।

বাব্বাঃ তোদের বিজনেসে তো বেজায় ধকল। এত সব বাজে ঝক্কি পোহাস কী করে ?

সিতাংশু একটা মোলায়েম অশ্লীল কথা বলে গাল দিল অবনীকে। তোদের আর কি, খাচ্ছিস দাচ্ছিস, রাজনীতির বুলি কপচাচ্ছিস। চলবে না চলবে না বলে মিছিল মিটিং করছিস। আর পুলিশ খুন করছিস নয়তো পুলিশরা তোদের খুন করছে। বড় একটা দায়িত্ব পালনের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রেখে, সবচেয়ে ফাঁকিবাজির কাজ করিস তোরা।

অবনী বিন্দুমাত্র উত্তেজিত হয় না, আমি বা আমরা তেমন কিছু মহৎ কাজ করছি বলে মনে করি না। সমাজে ডাক্তার, এঞ্জিনিয়র, জমাদার, নাপিত যেমন দরকার আছে তেমনি কিছু ফুলটাইম পলিটিক্যাল ওয়ার্কার দরকার। আমরা সামাজিক অসঙ্গতি দূর করার জন্য লড়ছি, লড়াইয়ের রসদ জোগাচ্ছিস তোরা। ঠিক ওইভাবে আমাদের ফাঁকিবাজ বলিস না। একজন পলিটিক্যাল ওয়ার্কার কখনই সোসাইটির প্যারা-সাইট নয়। তুই একটু সিনিক হয়ে গেছিস। বাক্স বানাতে তোর প্রেস্টিজে লাগছে।

সিতাংশু দু'হাতের চেটোয় মুখটা ঢেকে কিছুক্ষণ থম মেরে বসে রইল, বি এ পাশ করে চাকরির অনেক ধান্দা করেছিলাম। ব্যাঙ্কের পরীক্ষায় বসেছিলাম, পি এস সি-র পরীক্ষা দিয়েছি, এক বছর ল'য়ে ক্লাস করেছিলাম। কোনটাই ঠিক ক্লিক করলো না। চাকরি বাকরির বাজার খুব খারাপ। শিডুল্ড কাস্ট, ট্রাইবস, হ্যানা ত্যানা— ডিজগাস্টিং।

অবনী শিতাংশুর পিঠে একটা জোর ঘুঁষি চালিয়ে বলল, শালা শহুরে শয়তান। নিজের ভালো ছাড়া আর কিছু বুঝিস না।

সিতাংশু আড়মোড়া ভেঙে বলল, চল একটু টহল দিয়ে আসি। দু'একটা জিনিস কেনার দরকার আছে। উল্টোডাঙার একটা ফোন করতে হবে, ব্যাটাদের প্যানেল দিয়ে যাওয়ার কথা, কখন আসবে জেনে নিই।

পাড়াটা জেগেছে। মেয়েরা সব ঘুম থেকে উঠে যে যার দরজার কাছে বসে, দাঁড়িয়ে। চুল খোলা, চোখের কোণে পিচুটি এক হাতে চায়ের গ্লাস। এরই মধ্যে কেউ উকুন বাছাছে। সাত সকালেই একজনের একটা খদ্দের জুটে গেল। গোবেচারার বিহারী লোকটা বোকার মত গামছায় মুখ মুছতে মুছতে ভেতরে ঢুকে গেল।

রাস্তায় সফির সঙ্গে দেখা। বগলে একটা প্যাকেট নিয়ে দ্রুত যাচ্ছে। সিতাংশুদের দেখে দাঁড়ালো। এই কাপড়টা কিনে আনলাম। ম্যাক্সি হবে ঝিল্লুর জন্য। ঘরের ভেতরটা লাল রং করবো, একটা লাল বাতি জ্বলবে, আর লাল ফুল ফুল ম্যাক্সি পরে ঝিল্লু লাল পরী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। দেখবেন সব লোকসান আমি ছ'মাসে মেকাপ করে নেব।

সফি চলে যেতেই সিতাংশু বলল, মেকাপ করবে না ঘোড়াডিম করবে। লোকটা ঝিল্লুর খুব ন্যাওটা হয়ে পড়েছে। ওর কপালে দুঃখ আছে। ওর আরেকটা ঘর আছে, সেখান থেকেও দিনে দশ বারো টাকার বেশি রোজগার হয় না। ওর কিন্তু বিজনেসে ট্র্যাডিশন ছিল।

সিতাংশু অবনীকে বলল, আমার ধারণা ছিল তোদের মত বিপ্লবীরা বোধহয় সব সময় ছদ্মবেশ নিয়ে ঘোরে। হ্যাঁরে তোকে হঠাৎ পুলিশ ধরতে পারে না ?

ছদ্মবেশ ধরা মানে কি ? মুখের মধ্যে এক বোঝা দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে, কালো চশমা পরে ঘুরে বেড়ানো। ওসব সিনেমা, গল্পের বইতে হয়। পুলিশ তো আর সবার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে নেই, আর সবাইর মুখও চিনে বসে নেই। সন্দেহজনক কিছু না করলেই হল।

যাই বল একটা আলাদা থ্রিল আছে। তুই মরতে ভয় পাস না ?

অবনী হো হো করে হেসে উঠল, পাই, খুব পাই। একবার আমার আঙুল সামান্য ছুঁয়ে বন্দুকের গুলি চলে গিয়েছিল। খুব বেঁচে গিয়েছিলাম। আঙুলটা জাস্ট একটু ছড়ে গিয়েছিল, দ্যাখ দাগ আছে অবনী বাঁ হাতের আঙুল তুলে দেখালো। সেদিন আমি খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। বেঁচে থাকায় আলাদা একটা সুখ আছে। সব সময় মনে হয় আমি আছি।

সিতাংশু বলল, সুখ ! সুখ কিছু বুঝি না। বাঁচাটা আমার প্রয়োজন। আমার খুব স্বচ্ছলতার মধ্যে বাঁচতে ইচ্ছে করে। বাড়ি, গাড়ি, লিপস্টিক লাগানো বউ। স্বপ্নে আমি মাঝে মাঝেই একটা বিরাট মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে যাই। সে সময় কত অজস্র চেকে সই করি। দাঁড়া এ দোকান থেকে একটা ফোন করবো।

অনেকক্ষণ ধরে টেলিফোনের চাকা ঘুরিয়েও লাইনটা পেল না সিতাংশু। সিতাংশু বিরক্ত হয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে আসছিল, এমন সময় প্রায় কুঁচকির কাছে আঁট করে বাঁধা ধুতি টেরিলিনের অত্যন্ত সস্তা দরের জালি গেঞ্জি পরা একটা লোক নোংরা তেলচিটে গামছা দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে সিতাংশুর দিকে এগিয়ে এলো। সিতাংশু কিছু না বলে লোকটার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়।

অবনী আন্দাজ করে লোকটা হয়ত ঠেলাওয়ালা হবে। লোকটা একটা হলদে বিলের মত কাগজ এগিয়ে দেয়। অবনী এক ঝলক দেখে বোঝে, ওটা মাল বুকে পাওয়ার রসিদ। মুখার্জিবাবু আপকো এক দফে ভেট করনে কে লিয়ে বোলা। সিতাংশু রসিদটা ভালো করে দেখে ভাঁজ করে পকেটে রাখতে বলে, ঠিক আছে। আর শোন্ দু গাড়ি মাল দুপুরে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেছিলাম। কখন আসছিস ? লোকটা নিঃশব্দে মাথা নাড়ে।

না কি রে ? তোকে তো আগেই বলে রেখেছিলাম।

দুসরা কাম হ্যায়।

সিতাংশু ওর সামনেই গালাগাল দেয়। শালাদের নিয়ে হয়েছে এই এক ঝামেলা। গরজ বুঝলেই বেঁকে বসবে।

ঠেলার লোকটা চলে যেতেই আরেকজন এলো। একে সিতাংশুও চেনেনা বলে মনে হল, কালো কুচকুচে গায়ের রঙ। বেঁটে খাটো চেহারা, গায়ে বেগুনি শার্ট।

আপনার নাম সিৎতাংশু সরকার ? নমস্কার। আমি উল্টোডাঙার নদের চাঁদ প্লাইউড ফ্যাক্টরির এজেন্ট। তবে সঙ্গে আরো কোনো কোনো জিনিসের দালালি করি। ছুট-ছাট যা জুটে যায় আর কি। আপনি তো শুনলাম হাওয়ার্ড জনসনের অর্ডার পেয়েছেন। শুরু হিসাবে মন্দ অর্ডার নয়। সব নতুন প্যানেল, নতুন জগজগা, নতুন ব্যাটামের, মাল অত সস্তা রেট দিলেন কেন ? আপনি হেসে খেলে উনিশ টাকা পঁচিশ ত্রিশ পয়সা রেট দিতে পারতেন। মাত্র চোদ্দ টাকা ত্রিশ পয়সায় আপনি যে কি করে পোষাচ্ছেন জানি না।'

সিতাংশু একটু বাঁকা হয়ে বলে, 'একটুও পোষাচ্ছে না।' ভাহা

লোকসান হচ্ছে। কিন্তু আপনাকে মুখ চেনাও লাগছে না। এ লাইনে তো আমার ছ'মাস কেটে গেল।

আমার নাম হীরু বর্মন। যাকে জিগ্যেস করবেব, চিনবে। শুনুন একদম ফ্রেশ কিছু সেকেণ্ড হ্যাণ্ড প্যানেল আছে। কেজি তিরিশেক ঝগঝগা। নেবেন তো বলুন। খুব সস্তায় ছাড়ছি। তবে রসিদ ফসিদ পাবেন না। মালটা···। এ পর্যন্ত বলে হীরু বর্মন কিছু একটা টেনে বার করার ভঙ্গি দেখালো।

ওরা কথা বলতে বলতে তখন দোকানের বাইরে বেরিয়ে এসেছে। হীরুই ওদের দুজনকে জোর করে একটা উলিঝুলি চায়ের দোকানে বসালো। 'আপনি তো রবিন এজেন্সির কাছ থেকে প্লাই নিচ্ছেন। ও তো আপনাকে সিক্সটি ডেজ ক্রেডিটে দিচ্ছে, বাজারে এ মুহূর্তে আপনার যা গুডউইল, আপনাকে আমরা নাইনটি ডেজ ক্রেডিট ফেসিলিটি দেবো। সে কথা ছাড়ুন, আমার পার্সোনাল বিজনেসের কথায় আসি। অন্য যে মালের কথা বললাম সেটা কিন্তু নগদেই দিতে হবে। বাজার দরে প্রায় হাজার তিনেক টাকার মাল আছে। তবে হাজার দুয়েক পেলেই ছেড়ে দেবো। আপনার ঘরে তো এখন জোর কাজ হচ্ছে। একবার বাক্সে সেঁটে বেরিয়ে গেলে আর কে দেখছে?'

সিতাংশু বলল, 'আমি চোরাই মাল কিনি না।

আরে দূর্মশাই। পবিত্র গঙ্গাজলের বিজনেসে পর্যন্ত দু নম্বরী চলছে, আর এতো মার্কা মারা চোর চোট্টাদের কারবার। পুরোটাই দু নম্বরী। ওই যে মশাই গঙ্গার ধারে বেচা সরকারের গ্যো ডাউনে কি হয়েছিল জানেন সিক্সটিসিক্সে? একদম টপ গ্রেড বাক্স তৈরির অর্ডার ছিল তক্তা, প্যানেল, বাটাম সব আই এস আই ছাপ মারা হওয়া চাই। অত ছাপ ছোপ জুটবে কোথা থেকে। কোত্থেকে দু নম্বরী করে একটা আই এস আই স্ট্যাম্প জোগাড় করে, কাঠের ওপর ইলেকট্রিক হিটে পুরিয়ে যে স্ট্যাম্প দেয়, সারা রাত ধরে হাজার হাজার তক্তায় সেই ছাপ দিয়ে গেল। না হলে শর্ট নোটিশে অত আই এস আই তক্তা পাবেই বা কোথায়? বুঝলেন দাদা, সবই দু নম্বরী। ঠিক আছে আপনাকে না হয় আঠারশোতেই দেবো। মাল দেখে দাম দেবেন।

সিতাংশু কি যেন ভাবলো। পাশে দাঁড়ানো অবনীর দিকে বার দুয়েক তাকালো, তারপর বলল, কাল খবর দিলে হবে? এই ধরুন সকাল দশটা এগারোটা নাগাদ। আপনি আমার ঘর চেনেন? ভদাই মিস্ত্রির আগের ঘর ছিল যেটা।

হীরু বর্মন বলল, মাল যদি নেন, কালকেই নিতে হবে। টাকাটা তা হলে রেডি রাখবেন। সামান্য তো টাকা।

হীরু চলে যাওয়ার পর একটা দশ টাকার নোট অবনীর দিকে এগিয়ে দিয়ে সিতাংশু বলল, তুই কোথাও একটু খেয়ে টেয়ে নিস। আমি একটু বেরবো। ফিরতে ফিরতে হয়তো বিকেল, সন্ধ্যে হয়ে যাবে। তুই একটু আমার কাজের ওখানে থাকতে পারবি? জাস্ট দেখবি মালটাল এদিক ওদিক হচ্ছে কিনা?

অবনী বলল, কেন পারবো না, আমি তো বলরাম ম্যানেজার তার ওপর দশ টাকার মজুরি পেয়েছি। এখন তো কাজ করবই।

তিন

সিতাংশুর এত খিদে পেয়ে গিয়েছিল যে, বাড়ি ঢুকে ও আর কোন দিকে না তাকিয়ে, হাতটাত না ধুয়েই খাবার টেবিলে বসে গেল সকালে রান্নাভাত, একেবারে ঠাণ্ডা কড়কড়ে হয়ে গেছে। ডালটায় কেমন একটা ঝাঁঝালো গন্ধ হয়েছে। আলুভাজাগুলো অর্ধেক কাঁচা, অর্ধেক ভাজা, মাছে আঁশটে গন্ধ। ভালো খাওয়া দাওয়ার পাট এবাড়ি থেকে উঠে গেল। এখন শুধু সাজগোজ আছে; আজ গোয়া, কাল কাশ্মীর বেড়াতে যাওয়া আছে। মেজদা তো আবার সপরিবারে কণ্টিনেণ্ট ট্যুর করে এলো। অনেকের জন্য অনেক কিছু জিনিস এনেছিল বিদেশ থেকে। এই ছোটখাটো টুকরো-টাকরা কিছু। সিতাংশুকে খুব লক্কর মার্কা একটা ডট পেন দিয়েছিল। তোর এটা কাজে লাগবে। তোকে তো অনেক চাকরির অ্যাপ্লিকেশন করতে হয়। ডট পেনটা যেমন কোয়ালিটিরই হোক, পেয়ে ভালো লেগেছিল, কিন্তু শেষের কথাটা ভালো লাগেনি। মেজদা চাকরিটা ভালো করে, মাস গেলে হাজার দু'আড়াই বোধহয় পায়। কিন্তু দেমাকটা বড় বেশি, সিতাংশুকে গ্রাহ্যই করে না। মেজবৌদি লোকটা খারাপ নয়। অন্যের ব্যাপারে টাকা পয়সা খরচের হাত একটু টাইট। না হলে এমনি আর সবদিকে ভালো। অসময়ে বাড়িতে ঢুকলেও চা-টা করে দেয়। মুড ভালো থাকলে সিতাংশুকে কিছু খাবে-টাবে কিনা জিগ্যেসও করে। বড়দা একসময় দিব্যি সাদাসিধে ছিল। অফিসে ঝটাঝট গোটা চারেক লিফট পাওয়ার পরই পাইপ ধরলো। তারপর থেকে পাইপ চিবুতে চিবুতে ইংরেজিতে সব সময় জ্ঞান দেয়। বড়দা বড়বৌদির দুটি ল্যাজকাটা বাঁদর আছে। বড়বৌদি তাদের সামলাতেই হিমসিম। মা-র একবার একটা মাইল্ড স্ট্রোক মত হয়েছিল। তারপর থেকে রোজগেরে দুই ছেলে মাকে তিনতলার ঘরে নজরবন্দী করে রেখেছে। মা-ও খুব অসুখ অসুখ মুখ করে জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে আর এন্তার বাংলা উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের প্রেমের ডায়লগ মুখস্থ করে। বাড়িতে কোন আত্মীয়-স্বজন এলে, বড় করে শ্বাস ফেলে বলে, আমার তো সিতুটাকে নিয়েই দুশ্চিন্তা। আমি আর দুই ছেলেকে বলেছি, ব্যাঙ্কে আমার নামে যে কটা টাকা আছে, মরলে একা সিতুকেই দিস। ওরও তো চালাতে হবে।'

'ফুঃ দয়া!' সিতু মনে মনে ধিক্কার দেয়। বিজনেস স্টার্ট করার সময় প্রত্যেকের হাতে-পায়ে ধরেছিল। হাজার পাঁচেক করে দিতে। কেউ একটা ঘষা পয়সা ঠেকায়নি। মা পর্যন্ত নয়। আমি মরলে আমারটা সবই তো তুই পাবি। অতএব ভাগাড়ের শকুনির মত হা-পিত্যেশ করে বসে থাকো।

সিতাংশু বন্ধু-বান্ধবের কাছে হাত পেতে হাজার দুয়েক জোগাড় করেছিল। আর টুইশানি করে হাজারখানেক টাকা তার নিজস্ব ছিল। তিন হাজার টাকায় কিছু হয়না। কিন্তু বুদ্ধি খাটিয়ে সে এই টাকাটাকেই দ্বিগুণের বেশি বাড়িয়ে ফেলেছিল। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দালালীর কাজটা করেছিল। ঘরে ঘরে ঘুরে জেনে নিত, কার কি মাল দরকার, আর কে কোন মালটা ছেড়ে দিতে চায়। তারপর এক পার্টির থেকে মাল তুলে আরেক পার্টিকে সাপ্লাই দেওয়া। একাজে বিরাট কম-পিটিশন। তার ওপর এ ব্যবসার অধিকাংশ মালিকই সাদাসিধে মিস্ত্রি, পয়সা জমিয়ে নিজে ব্যবসায় নেমেছে। তারা প্যান্ট-শার্টপরা 'পড়া লিখা' জানা বাবুকে চট করে পাত্তা দিতে চায়নি। সিতাংশুর ধারনা এখনো তাকে বিশেষ কেউ পাত্তা দেয় না। কোনরকমে কাজটা চালু রেখেছে মাত্র। তবে আর্থিক মূলধনের চেয়ে বেড়েছে অভিজ্ঞতা আর যোগাযোগ। তবু সিতাংশু যে এত তাড়াতাড়ি দালালীর লাইন ছেড়ে নিজেই বাক্স তৈরির লাইনে চলে আসতে পারবে, এটা সেও ভাবেনি। টাকা পয়সার চেয়ে প্রথম কথা জায়গা পাওয়া। বিজনেসের কেন্দ্র-বিন্দুতে থাকতে হলে এই নোংরা পচা পাড়াতেই থাকতে হবে। ঠিক সে সময় সফির সঙ্গে হঠাৎ আলাপ হয়েছিল। ও কার নামে একটা মানিঅর্ডার পাঠিয়েছিল। সেটা পৌঁছয়নি, তাই পোস্টমাস্টারকে চিঠি লেখার জন্য একটা লোক খুঁজছিল। সিতাংশু শুধু চিঠিই লিখে দেয়নি, একটু তদ্বির-তদারকও করেছিল, আর তাতেই টাকাটা জায়গামত পৌঁছে গিয়েছিল। সে থেকেই সফির সঙ্গে সিতাংশুর বেশ হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। আর সে সুবাদেই ঘরটা পেয়েছিল সে।

খাওয়া-দাওয়ার পর সিতাংশু ছাদে উঠল। শেষবেলায় ছাদের একটা দিক জুড়ে অনেকটা ছায়া। সিগারেট খাওয়ার পক্ষে জায়গাটা সবচেয়ে নিরাপদ। পঁচিশ বছর বয়স হল এখনো লুকিয়ে সিগারেট টানতে হয়। দেখে ফেললে কেউ যে বকাঝকা করবে তা নয়, তবু মা দুই দাদা, বড় বৌদির সামনে খেতে কেমন লজ্জা করে।

ছাদে উঠে দেখলো মেজো বৌদি তার গোলাপ গাছের যত্ন করছে। গোবরের সার-টার দিয়ে এমন একটা বোঁটকা গন্ধ করে রেখেছে, ছাদে দুদণ্ড টেঁকা দায়।

সিতাংশুকে দেখতে পেয়ে মেজো বৌদি মুচকি হাসলো, 'জ্যাঠা ছেলে বিড়ি খায় কান ধরে টানিও। আজ ফিরতে এত দেরী হল? লাঞ্চ করলে সাড়ে তিনটের সময়।'

সিতাংশু হেসে বলল, লাঞ্চ-টাঞ্চ খায় সায়েবরা, আমরা শুধু

মেজো বৌদি গোলাপের একটা চারা এনে ছাদের কারনিশে যত্ন করে রাখল

উদরপূর্তি করি।

বড় বিজনেসম্যানরাও লাঞ্চ খায়।

বড় হওয়ার পথে একটাই প্রবলেম, সেটা হল টাকা। না হলে দেখতে তোমার একমাত্র দেওর এতদিনে কি কাণ্ডটাই না বাধিয়ে ফেলত।

টাকাটাই তো সব, টাকা থাকলে তো অনেকেই অনেক কিছু করতো।

সিতাংশু মনে মনে বলল, ওসব জ্ঞান না দিয়ে হাজার দশেক ছাড়ো না। বড্ড আটকে গেছি। সামনে দু-দুটো ভালো অফার আছে। একটা সস্তায় মাল কেনা, আরেকটা সেই মাল থেকে বাক্স তৈরি করে হাওয়ার্ড জনসনে বেচে দেওয়া। ওরা অর্ডারের পরিমাণ বাড়াতে চাইছে। কিন্তু এসব কোন কিছুই তার বলা হল না। বিকেলের পড়ন্ত আলোতে ফুলগাছের মধ্যে বৌদিকে বেশ মোহিনী লাগছে। টাকা পয়সা সাহায্য করার কথা তুললেই মুড অফ হয়ে যাবে।

সিতাংশু একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, মেজদার কি নাকি প্রমোশন হয়েছে? মা বলছিল।

হ্যাঁ, ওয়ার্কস ম্যানেজার। ওকে তো অফিস থেকে ফ্ল্যাট নেওয়ার জন্য ঝুলোঝুলি করছে। সাউথ অব পার্ক স্ট্রিটে ফ্ল্যাট দিচ্ছে, তাও ও নেবে না। বলছে, মাকে এই অসুস্থ অবস্থায় ফেলে ড্যাং ড্যাং করে চলে গেলে সেটা খুব অন্যায় হবে।

কথাটা শুনে সিতাংশু মনে মনেই হাসতে চেয়েছিল. কিন্তু তারই কিছুটা চুঁইয়ে বেরিয়ে এসেছিল। মেজো বৌদি অভিমানভরা গলায় বলল, তুমি হাসছো কেন?

বাঃ আনন্দের কথা হাসবো না? তা বড়দা কোথাও ফ্ল্যাট পায় না?

বাব্বা, উনি ফ্ল্যাট কি, আলিপুরে বাংলো পেতে পারে, কতবড় চাকরি করছে এখন জানো? তুমি তো কোন খবরই রাখো না। হোলটাইম ডিরেক্টর হয়েছে কোম্পানীর। উনিও তো মা-র জন্য আটকে রইলেন। শেষ বয়সে মা শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে তো আর কোথাও যেতে রাজি হবেন না?

মেজো বৌদির একটু বাড়িয়ে বলার স্বভাব আছে, একথা সিতাংশু জানে। এক্ষুনি যেসব বলল. তার মধ্যে কতটা ভেজাল, কতটা খাঁটি কে জানে? তবে মাইনে আর পদের দিক থেকে ওরা যে এখন বিশেষ কেউকেটা হয়েছে সেটা বোঝা যায় ওদের মেজাজ দেখে।

সিতাংশু একটু ম্লান হেসে বলল, শুধু আমিই কিছু হলাম না। একদম বিনা ক্যাপিটালের বিজনেস তো। হাজার বিশ পঁচিশ আরো পেলে, তাও একটু ভদ্রলোকের মতো বাঁচতে পারি। কিন্তু আমাকে কে টাকা দেবে বল?

সিতাংশু টাকার কথাটা ইচ্ছে করেই বলেছে। তবে মেজো বৌদি সন্তর্পণে সেটা পাশ কাটিয়ে গেল। বরঞ্চ খানিক অনুযোগের সুরে বলল, তুমি যে কি না, আমাকে বাপের বাড়িতে যখন জিগ্যেস করে, তোর ছোট দেওরের কিছু হলো, আমার এত লজ্জা করে। তোমার মেজদা তোমাকে ডবলু বি সি এস দিতে বলছিল। মাইনেপত্র যা হোক. মোটামুটি সম্মানজনক একটা চাকরি পেতে পারতে। কী যে এক বাক্স বানাও, তাও এক খারাপ পাড়ার মধ্যে। বীথি তোমার কথা জিগ্যেস করছিল। মেজো বৌদি গোলাপের একটা চারা সিতাংশুর পায়ের কাছ থেকে সরিয়ে এনে ছাদের কারনিশে যত্ন করে রাখল।

বীথির কথায় গোলাপের একটা ছোট্ট কাঁটা যেন বুকের মাঝখানে বিঁধল সিতাংশুর। একটা চিনচিনে ব্যথা। বীথির গায়ের রংটা মেজো বৌদির চেয়ে একটু চাপা। কিন্তু মুখ চোখ, হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকানোর ভঙ্গি, কোনো কিছুর সঙ্গেই যেন এ পৃথিবীর যোগ নেই। অলোক সামান্য কথাটা মনে এলো সিতাংশুর।

বীথি নিজেকে ছোটবেলা থেকে বড় কোনো এক্সিকিউটিভের জন্য তৈরি করেছে। ওর লেখাপড়া, সাজ পোশাক, বিলেতি অ্যাকসেন্টের ইংরেজি, রুচিবোধ কোনো কিছুকেই নাগালে পাওয়ার মতো যোগ্যতা সিতাংশুর নেই।

তবু একদিন, শুধুই একদিন, মেজো বৌদিদের সোনারপুরের কান্ট্রি হাউসে পিকনিক করতে গিয়ে হঠাৎ খুব কাছাকাছি চলে এসেছিল দুজন। বাইশ বছরের সিতাংশু আর উনিশ বছরের বীথি। লেবু ঝোপের পেছনে দীঘির পাড়ে সিতাংশু বীথির ডালিম ঠোঁটে একবার খুব আলতো করে ডান হাতের অনামিকাটি বুলিয়ে দিয়েছিল। সিতাংশু সে মুহূর্তে না হলেও পরে বুঝতে পেরেছিল বীথি তার জন্য নয়। কিন্তু ডিমের কুসুমের লালচে সোনালী রঙের সেদিনের বিকেল, বীথির কুমারী হৃদয়ের মতো কাঁপা কাঁপা দীঘির জল, একটা স্থায়ী ছাপ ফেলে গেছে সিতাংশুর মনে। সিতাংশু দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে মনে গাইল, কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারই ঘায়ে।

সিতাংশু বলল, এ পৃথিবী জুড়ে অনেক কিছু ভালো ছিল। কোনোটাই আমার ঠিকভাবে পাওয়া হলো না। সব কাজে আমার বড় বেশি ভুল হয়ে গেছে।

বৌদি কি বুঝল কে জানে, শুধু বলল, তোমার মনটা বড় রোমান্টিক। তোমার অনেক ভালোভাবে বাঁচা উচিত ছিল। তুমি খেলার আগেই দান ছেড়ে দিয়ে বসে থাকো। তারপর হেরে গিয়ে

দুঃখ পাও। পুরুষ মানুষের অ্যাম্বিশন না থাকলে চলে না। ওটা তোমার একটুও নেই। সেজোমাসী তোমাকে যে অর্ডারটা পাইয়ে দিয়েছেন, সেটা মন দিয়ে করলে নাকি তোমার ভালোই হবে শুনলাম।

সিতাংশু হেসে বলল, তুমি নেহাতই খুকুমণি, জীবনের সব জটিলতা তোমাকে স্পর্শ করেনি এখনো। ব্যবসায় সফল হতে গেলে কত যে ফাঁক ফোকর ভরাট করে, কত খানা খাদ ডিঙিয়ে যে যেতে হয়, তা তুমি বুঝবে না। তোমার এই দেবরটি এখনো পর্যন্ত ততটা চতুর হয়ে ওঠেনি।

সিতাংশু দেখল মেজো বৌদি কিছু একটা বলব বলব করেও চেপে গেল। সিতাংশু বলল, লজ্জা পাচ্ছো কেন, বলেই ফেল না।

তোমার মাস গেলে কেমন রোজগার হয়? একটা বিয়ে-টিয়ে করতে পারো না? বৌদি ঢোক গিলে বলল, মানে তোমার তো যতরাজ্যের পরীচুরীদের সঙ্গে উঠতে বসতে হচ্ছে। শুনেছি প্রেম আর রোগ বিতরণের ব্যাপারে ওরা একেবারেই দরাজ দিল। তোমার যদি হঠাৎ নাকের হাড়টা বসে যায় কিম্বা ঠোঁটের কোণায় দগদগে ঘা হয়, তাহলে বুঝতেই পারছ, বাড়ির তো একটা প্রেসটিজ আছে।

সিতাংশু চুপ করে বৌদির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বোঝার চেষ্টা করে মহিলা পাগল না শয়তান। এমন একটা বিশ্রী সন্দেহের কথা ভদ্রলোক হয়ে কেউ কারোর মুখের ওপর বলতে পারে? ফ্যামিলি প্রেসটিজ নিয়ে বড় বেশি শঙ্কিত হয়ে পড়েছে এরা।

কালীপুজোর আর বেশি দেরী নেই। ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকটা বাঁশের খাঁচা দেখা যাচ্ছে। হেমন্তর শেষ বেলায় কমলা রঙের রোদ্দুরের একটা মোহিনী আঁচল সবকিছুকে ঢেকে রেখেছে। বাতাসের মধ্যে খুব গোপন এক শীতলতা হঠাৎ হঠাৎ ছুঁয়ে যাচ্ছে।

সিতাংশু মনে মনে তৈরি হয়ে নেবার জন্য একটা সিগারেট ধরালো। অনেক সহ্য করেছে সে, পাল্টা একটু কিছু বলা দরকার।

বৌদি আমি যদি বেশ বড় একসিকিউটিভ হতাম, তারপর উইক এণ্ডে গাড়ি করে স্টেনোগ্রাফারের সঙ্গে বিহারের রাস্তার ধারে ধারে আশ্চর্য সুন্দর ডাকবাংলোগুলোতে দুটো রাত কাটিয়ে ঘরে ফিরে আসতাম, তা হলে? ওই মেয়েদের মধ্যেও অনেকে প্রফেশনাল থাকে।

সিতাংশু মনে মনে হাততালি দেয় আর দুলে দুলে বলে, লেগেছে লেগেছে, ঠিক জানতাম লাগবে। এসব ঘটনা দু-একটা থাকেই, থাক বা না থাক সন্দেহ একটা থাকবেই। বানিয়ে বললেও লেগে যাবে। মেজো বৌদির ফর্সা টুকটুকে গাল দুটো যেন আরো একটু ফুলে গেছে।

মেজো বৌদি হাতের চেটোর উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছল। তোমাকে এসব মনগড়া স্ক্যাণ্ডালের কথা কে বলেছে? তুমি তোমার মেজদার নামে আমাকে কায়দা করে এসব শোনাতে এসেছ। শোনাও, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমার ধারণা ছিল তুমি একটু আলাদা হবে। রিনা দত্তের ব্যাপারটা যে মিথ্যে তা অন্তত তুমি বুঝবে। ও নতুন প্রমোশনটা পাওয়ার আগে কিছু হিংসুটে লোক ও ধরনের একটা বাজে স্ক্যাণ্ডাল ছড়িয়ে ওর ক্যারেক্টার নিয়ে প্রশ্ন তুলতে গিয়েছিল।

মেজো বৌদি শাড়ির আঁচলটা দ্রুত আঙুলে জড়াচ্ছে আর খুলছে। বুঝলে, টেকেনি সেসব ষড়যন্ত্র। কিন্তু তোমার বড়দা, আমার পূজনীয় ভাসুর, কোথা থেকে ওই গসিপটুকু জোগাড় করে বাড়ি নিয়ে এসেছে। তোমাকেও বলেছে দেখে প্রথমে অবাক হয়েছিলাম, এখন আর হচ্ছি না। তোমরা আসলে সকলেই সমান। দেখে নিও, এ নিয়ে আমি একটা হেস্তনেস্ত করবোই।

মেজো বৌদি কেঁদে কেঁদে মুখ চোখ লাল করে ফেলেছে। সিতাংশু মনে মনে বলল, কাঁদোগে, আমার ভারি বয়ে গেছে। তোমরা যে কথায় কথায় আমাকে ফ্যামিলি প্রেসটিজ দেখাও, তাতে আমাকে অপমান করা হয় না?

মেজো বৌদিকে ছাদে রেখে দ্রুত পায়ে নিচে নেমে এলো সিতাংশু। জামা কাপড় বদলে, পায়ে চটি গলিয়ে বেরোবার সময় গেটের মুখে বড়-বৌদির সঙ্গে দেখা হলো। দুই ক্লান্ত বিধ্বস্ত ছেলেকে প্রায় টানতে টানতে স্কুল থেকে ফিরছে।

তোমার তো আজকাল পাত্তাই পাওয়া যায় না। একটা জরুরী কাজ ছিল। টি ভি-টা ক'দিন ধরে খারাপ। সার্ভিসিং সেন্টারে খবর দিয়ে দিয়ে ফেড আপ হয়ে গেছি। তুমি একটু গিয়ে কথা বলে এসো তো। টেলিফোনে আর কাজ হবে না। পরশু বিকেলের মধ্যে ভালো হওয়া চাই, সত্যজিৎ রায়ের একটা ফিলম আছে।

সিতাংশু বলল, সে ফিলম তো তোমার দেখা, তবে অত ব্যস্ত হবার কি আছে?

তোমারই বা খবর দিতে অসুবিধেটা কোথায়?

সিতাংশু এইটুকুই আশা করেছিল। বড় বৌদির গলায় শ্লেষ, বিদ্রূপ ও নানাবিধ বিষের ছোবলগুলোর বেশ দাপট আছে। বড় বৌদির ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সামনে সিতাংশু দ্রুত বেরিয়ে এলো।

চার

সফি আজ সকাল থেকে খুবই উত্তেজিত। দু'দিনের চেষ্টায় ঘরের ভাঙাচোরা দেওয়াল সিমেন্টে বালিতে ঢেকে, লালচে গোলাপী রঙ লাগিয়ে, জিরো পাওয়ারের লাল বাতি জ্বালিয়ে সে এক বিরাট কাণ্ড করে ফেলেছে। সুলেমান মাস্টারকে বারবার তাগাদা দিয়ে লাল ফুল ফুল ম্যাক্সিটারও ডেলিভারি নিয়ে এসেছে। এসব ঘরে পর্দাটা খুব জরুরী। জানলা নেই, শুধুই একটা দরজা, তাতে লাল কালো নক্সা কাটা পর্দা লাগিয়েছে।

বিল্লুরে মাংস আনলাম, প্যাঁজ রসুন দিয়ে বেশ মাখো মাখো করে রাঁধতো। আমি আজ দেড় কেজি চালের ভাত খাবো। মোষের খাটালটার একধারে একটু শেড মত দেওয়া আছে, আজ রাত থেকে ওখানেই থাকবো। দেখিস বিল্লু তুই আমায় ডোবাস না। তোর জন্য এর মধ্যেই আমার অনেক খসে গেছে। ভালো করে ব্যবসা করতে পারলে, আমাদের দু'জনেরই লাভ, কি বল?

বিল্লু তক্তপোশের ওপর বসে একটা পা ভাঁজ করে আরেকটা পা নিচে ঝুলিয়ে দিয়েছে। ফলে ঝোলানো পা-টার অনেকখানি শাড়ির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। সফি বিল্লুর পায়ের কাছে একটা জল চৌকি পেতে বসেছিল। পায়ের ডিমটা লক্ষ্য করে দেখলো, তারপর আঙুল দিয়ে টিপে বলল, তুই টনিকটা ঠিকমত খাচ্ছিস তো?

বিল্লু এক ঝটকায় পা-টা সফির হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, ভাগলপুরী গাই কিনে দুধের ব্যবসা কল্লে পারতে।

সফি বিল্লুর ঠেস দেওয়া কথায় রেগে গেল খুব। ওরে আমার কে রে? ছিলি তো পড়ে কোন গত্তের মধ্যে। সেখানে বসে এই রাজপুরীর কথা ভাবতে পেরেছিলি?

হুঃ। রাজপুরী না স্বগ্গো। তোমার কতা শুনলে মরা মনিষ্যি পজ্জন্ত ফিক করে হেসে উঠবে।

সফি ততক্ষণে মাংস ধুয়ে তাতে হলুদ লঙ্কা মাখতে শুরু করেছে। সফির রাগ পড়েনি। তুই এমনভাবে কথা শোনাচ্ছিস যেন আমার নিকে করা ইস্ত্রি।

তবে বলি, তুমিও তো কম ঠ্যাকার ঠ্যাকার কতা বলো না। ঠিক যেন বিয়ে করা সোয়ামী।

সফি এক খাবলা লঙ্কা বাটা হাতে নিয়ে তেড়ে উঠলো, দোবো গালে একেবারে সোনো ঘষে। বেশি ফ্যাচ ফ্যাচ করবি তো সোজা থানায় নিয়ে গিয়ে তুলবো।

পুলুশের ভয় দেকিও না। তুমিও আমাকে ভাগিয়ে এনেছো। পুলুশ তোমাকেও ধরবে। একটা কতা ভুলো না, আমি ভদ্দ ঘরের মেয়ে, ভদ্দ ঘরের বউ।

ওরে আমার ভদ্দর রে। সফি হাত নাচিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে উষ্মা প্রকাশ করে।

সোয়ামী মরার পর তো কোথাও জ্যায়গা হলো না। দত্তদের বাড়ি দিন-রাত কাজের লোক হিসাবে ঢুকেছিল। কিন্তু কাজ যে কি করতি সবই আমার জানা আছে।

বিল্লু একইভাবে বসে আছে, এখন আবার পা দোলাতে শুরু করেছে।

ওখানে পোষাচ্ছিল না বলেই তো চলে এলাম। ভাবলাম ইজ্জত

যখন শুইয়েছিই, তখন আর বীরু দত্তের নাতি ব'্যাটা খেয়ে পড়ে থাকার মানে কি হয় ? জাতও দেব পেটও ভরবে না, সে তো হয় না।

তুই একটা দেখালি বটে ঝিল্লু। নতুন এ লাইনে এসে এত গলাবাজি কেউ করে না। আমি বুঝতে পারছি, তুই আমাকে ডোবাবি। তবে একটা কথা জেনে রাখিস, তুই এবার কিন্তু একেবারে সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে দাঁড়িয়েছিস, আর যদি এক পা নামিস তো একেবারে অথৈ জল। বেশ্যা হওয়ার চেয়ে একটা মেয়ের আর খারাপ কিছু হওয়া থাকতে পারে না।

ঝিল্লু সফির গায়ে ধাক্কা মেরে বলল, ওটো, মেয়েদের কাজ ব্যাটাছেলেরা করলে মানায় না।

সফি অমনি এ্যালুমিনিয়ামের ঘটির জলে হাত ধুয়ে বলল, তা সে তুই রাঁধ, আমি একটু ঘুরে আসি।

সফি চলে যাওয়ার পর ঝিল্লু নিজেকে নিয়ে পড়ল। যতই তেজ দেখাক, ভেতরটা তার কাঁপছে, সতী লক্ষ্মী সে বহুদিনই নয়। অধঃপতন বিধবা হওয়ার আগে থেকেই। আর সেটা জানাজানি হয়ে গেল বলেই বোকা বরটা মনের দুঃখে গলায় ফাঁস জড়ালো। তারপর তো দত্তদের বাড়িতে বছর খানেক প্রায় কাটলো। কিন্তু সে ছিল একরকম, আর এ অন্যরকম। সেটা একটা পেরাইভেট ব্যাপার-স্যাপার ছিল। কিন্তু এতো একেবারে বাজারে মেয়েছেলে হয়ে যাওয়া। কচি বয়সে একটা মেয়ে লাইনে আসে, বোধবুদ্ধি কম থাকে। চোখের জলে নাকের জলে সব কিছু মেনে নেয়। আর এতো শুরু থেকেই একেবারে জ্ঞানের নাড়ি টনটনে।

এসময় ঘরের দরজায় কার ছায়া পড়লো। ঝিল্লু মুখ তুলে তাকিয়ে একগাল হাসলো, বাসন্তীদি, এসো।

এখানে একে নতুন, তার বেশির ভাগ মেয়েই হয় নেপালী নয় বিহারী। হিন্দিটাই বেশি চলে। ঝিল্লুর চেনা জানার মধ্যে এক বাসন্তীর সঙ্গেই একটু বাংলা বলা যায়। তক্তপোশের ওপর থেকে ম্যাক্সিটা তুলে নিয়ে বাসন্তী বলল, কপাল করে লাইনে এসেছিলি, সফি তো তোর কাপ্তান বাবুরে। বেচারা বড় ন্যালাক্ষ্যাপা ধরনের, একটু দেখিস। পরে দেখেছিস ম্যাক্সিখানা ?

ধুর, ওসব আমার পরতে বয়ে গেছে। তুমি তো দিব্যি শাড়ি পরেই কারবার চালাচ্ছো।

শাড়ি চলবে না কেন। তবে সফি কাপ্তানের সখ। আর জাহাজী বাবুদের ওই সব ড্রেস মেরেসই ভালোলাগে।

আমার যেন কেমন ভয় ভয় করছে। কয়লার মত গায়ের রং, কোঁকড়ানো চুল হাফ প্যাণ্ট পরে, ওই যমের জাম্বাগুলোকে আমার ভারি ভয়।

ওরা তো ফরিনবাবু। জাহাজী লোক। হপ্তায় এক আধটা অমন ঘরে তুলতে পারলে আর চিন্তা থাকবে না। সব চেঁছে পুঁছে নিয়ে নিবি। হ্যাঁরে মেয়ে, তুই মাল টাল খাস ? না খেলে একটু কিন্তু শিখতে হবে।

বাসন্তী কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ খিল খিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল। ঝিল্লু ভারি অপ্রস্তুত হয়ে জিগ্যেস করল, কি হলো অত হাসছো কেন ?

গোপালীর কাছে যা একখানা গপ্পো শুনলাম, না ? থানায় তো ওর যাতায়াত অনেক। চিনে রাখিস গোপালীকে, একটু খাতির-টাতিরও করিস। তা গপ্পোটা শোন, তুই বিন্দুকে চিনিস তো, মোটা মত নেপালী মেয়েটা।

ঝিল্লু একটু ভ্রু কুঁচকে ভাবলো, ওই যে চায়ের গুদামটার পাশেই থাকে তো, থুতনিতে তিনটে ফুটকি উল্কি করা।

হ্যাঁ, ওর ঘরে একটা ফরিনবাবু এনে তুলেছিল গোপালী। সারা সন্ধ্যা হৈ হুল্লোড় করে মাল-টাল খেয়ে সে এক এলাহি ব্যাপার। মাল মানে কি বিলিতি নাকি ? বাংলা, সঙ্গে আবার গুঁড়ো করে ম্যানড্রেক্স মেশানো। রামসিংটা বহুত শয়তান—এসব আবোল-তাবোল নেশার জিনিস ওর পানের দোকানের পেছনের খোপটায় পাওয়া যায়। ফারনবাবু তো একটু খেয়েই বেহুঁশ। অমনি বিন্দু আর গোপালী মিলে ওর সব কিছু একেবারে চেঁছে পুঁছে নিয়েছে। শুধু একটা নীল জাঙ্গিয়া পরিয়ে ওই লাশকে খোঁচা মেরে তুলে কোনরকমে ধরাধরি করে এই পট্টি ছাড়িয়ে একেবারে বড় রাস্তার ফুটে শুইয়ে দিয়ে এসেছে।

তখন রাত কত গো ? কেউ দেখতে পায়নি ?

দেখতে পাবে না কেন ? গোপালীকে তো মহল্লার সবাই চেনে, অমন দু-দশটা ফরিনবাবুকে ও ফি হপ্তাতেই ফুটে শোয়ায়। তাপ্পর সেই ফরিন ব্যাটাকে তো মামা এসে খপ করে ধরেছে।

মামা আবার এলো কোত্থেকে সেখানে ?

মামারা ওর'মই আসে। ভাঙ্গা রাস্তায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকলে মামা ছুটে আসবে না ? হাঁ করে অমন দেখছিস কি ? পুলিশ রে পুলিশ।

ওঃ পুলুশ, তুমি এমনি কায়দায় বললে···ঝিল্লু হাতে তালি বাজিয়ে একগাল হাসি দিল। ও এখন গপ্পের গন্ধ পেয়েছে। তাড়া দিল বাসন্তীকে, তাপ্পর কি হলো ?

মামার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দিয়েছে লকাপে ঠেলে। এসব ফরিন বাবুদের নামে তো চট করে কেস লেখায় না। গোপালী বলেছে, সেসব কেসে নাকি অনেক ঝামেলা। অনেক পাতা ইংরিজি লিখতে হয়। অত ইংরিজি থানাবাবুরাও জানে না। তাই একরাত লকাপে আটকে রেখে নেশাটা কাটলে ছেড়ে দেবে, জাহাজের ছেলে জাহাজে ফিরে যাবে। লকাপে ঢোকানোর পরেই ফরিনবাবুর হুঁশ ফিরে এসেছে। ভালো করে চারদিক তাকিয়ে দেখেই রেগে টং।

লকাপ সেদিন ফাঁকা। জকের একটা চোর আছে গোলাম নাম, আমাদের মাতেশ্বরীর ঘরের বাঁধা খদ্দের। সে ব্যাটা সেদিন লকাপে রয়েছে। আর খান দুই ভদ্দরলোক নাকি ছিল। ফরিনবাবু হঠাৎ গোলাম চোরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। গোলাম এই রোগা প্যাকাটি আর ফরিনবাবুর চেহারা একেবারে রাস্তা পেলেন করার ঘট ঘটাং লোহা গাড়ির মত।

ঝিল্লু উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, গেল বুঝি সেই চোর ব্যাটা চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে ?

বাসন্তী ঝাঁঝিয়ে উঠল, দূর মাগী গোলাম চোর না ? অত সহজে কাবু হয়। গোলাম তো ঝটকা দিতে গেছে আর অমনি ফরিন ব্যাটা বগলের তলায় হাত ঢুকিয়ে কাতুকুতু দিতে শুরু করেছে। যামিনীকে চিনিস কি ? চোলাই বেচে। সে ব্যাটাও লকাপে ছিল। গোলামকে কাতুকুতু দিচ্ছে দেখে সে যেই এগিয়েছে, অমনি সেটাকেও পাকড়েছে। তারপর দুটোকে দু ঠ্যাঙের মধ্যে জোরসে চেপে ধরে কাতুকুতু দিয়ে চলেছে। হাসতে হাসতে ওদের প্রাণ যায় আর কি। ভদ্দরবাবুদের তো লকাপে এসে মন খারাপ, গালে হাত দিয়ে উকিলবাবুর মুখ ভাবছে, তারা এসব ঝামেলার মধ্যে আর এলো না। এদিকে হাসির আওয়াজ শুনে সিপাইরা সব ছুটে এসেছে, এসে দেখে এই কাণ্ড। দারোগা ছুটে এসে বলে শিগগির দোর খোলো। মাতাল ব্যাটাকে আর রেখে কাজ নেই। আর যেই দোর খুলেছে অমনি কাতুকুতু বাগিয়ে তেড়ে গেছে দারোগাবাবুর দিকে।

ঝিল্লু উরুতে চাপড় মেরে বলল, সাব্বাস। তাপ্পর ?

ওরে থাম, থাম। বলে লাঠি উঁচিয়েও বাগ মানাতে পারে না। কাতুকুতুর ভয়ে তখন সারা থানা কাঁপছে। ওপর তলায় ওসি বউয়ের সঙ্গে ঘুমিয়ে ছিল, হুটোপাটির আওয়াজ শুনে একেবারে বন্দুক তাগ করেই নিচে নেমেছে। ততক্ষণে আমাদের ফরিনবাবু কাতুকুতু দেওয়া বন্ধ করে একটা লম্বা বোতলে লেখার কালি ছিল, পুরুতঠাকুরদের মত সেটা ছিটিয়ে শান্তির জল দিতে শুরু করেছে। কালির বোতল খালি হওয়ার পর ঝাড়পোঁছের ন্যাকড়ায় হাত মুখে টেবিলের ওপর রাখা কার না কার প্যাকেট থেকে সিগারেট ধরিয়ে গান গাইতে গাইতে থানা থেকে বেরিয়ে এলো।

আচ্ছা হাঁহাবাজ তো। কি দিদি উঠলে কেন, বোসো।

নারে, কাল রাতে ঘুমুতে পাইনি। তাছাড়া ম্যাটিনিং-এ সিনেমা যাবো। এখন গিয়ে এট্টু ঘুমুবো।

রাঁধবে বাড়বে না ?

ধুর, আমার তো তোর মত পিরিতের মানুষ নেই যে রাঁধবো।

মুসলমান দোকান থেকে দুটো শিকের মাংস আর চারটে রুটি নিয়ে আসবো। চলিরে—

দিদি তুমি সত্যি চললে নাকি? তোমার সঙ্গে যে আমার অনেক কথা ছিল। পেছন থেকে ঝিল্লুর ডাকটা আর্তস্বরের মত শোনায়।

বাসন্তী ফিরে দাঁড়িয়ে ম্লান হাসে, ভয় পাচ্ছিস কেন, পুরুষ মানুষদের তো তোর চেনা আছে। সব পুরুষ মানুষই একরকম।

ঝিল্লু উঠে দাঁড়িয়েছিল, তক্তপোশের কোনটা ধরে ধপ করে বসে পড়ে মাটিতে।

কিরে তোর মাথা ঘুরছে নাকি?

ঝিল্লু কোন উত্তর করে না. মাথাটা শুধু অসহায়ভাবে নাড়ায়। দু চোখে অদ্ভুত এক বিহ্বল দৃষ্টি। বাসন্তী ঠোঁটের কোণ কামড়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। কোন এক অজ্ঞাত আবেগ যেন বাসন্তীকে দিশেহারা করে তোলে। বাসন্তী খুব অনভ্যস্ত প্রায় অজ্ঞাত এক রমনীর ভঙ্গিতে ঝিল্লুকে জড়িয়ে ধরে মাথায় চুমু খায়। ঝিল্লু আমার ঝিল্লু রে, তোর বড় দুঃখু তাই নারে?

খুব কষ্ট হয় দিদি?

কষ্টর কথা আমি বলতে পারবো না। ছেলেবেলায় উদোম হয়ে মাঠে ঘাটে টৈ টৈ করে ঘুরে বেড়াতাম। লজ্জা এলো অনেক পরে। প্রায় তখন থেকেই তো কলকাতায়। মেয়ে হয়ে ওঠার আগেই প্রথম কষ্ট পেলাম। সেটা এতদিন আগের কথা আমার আর কিছু মনে নেই।

এরপর একটু নিঃশব্দ মুহূর্ত। দুজনে দুজনের খুব কাছাকাছি। একজনের নিঃশ্বাস আরেকজনকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মুহূর্তটি বড়ই ক্ষণিক ও অবাস্তব। বাসন্তী এক অলীক রোমাঞ্চকর মানবিক সুখানুভূতির স্পর্শে বিহ্বল হয়ে তাকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করার আগেই নিজেকে পুনরায় বাসন্তী বেশ্যা হিসাবে সঠিকভাবে চিনে নেয়। মুখ বাড়িয়ে দাঁত ও জিভের অদ্ভুত যোগাযোগে বিচিত্র এক চিক শব্দ করে উঠোনে থুতু ছুঁড়ে দেয়, যেমন কোনো গহন অপরিচিত অরণ্যের সাপ শত্রুর দিকে বিষ ছোঁড়ে। বাসন্তী হিস হিস করে ওঠে, নিয়ে নিবি যা পাবি সব। ভুলিয়ে ভালিয়ে, চাপ দিয়ে জোর করে, যেভাবেই হোক। টাকা-পয়সা, ঘড়ি, আংটি, পকেটের পেন, গায়ের জামা, কোন কিছু ছাড়বি না। হাঁ করে দেখছিস কি? তোর আখের নেই, ভবিষ্যৎ নেই? ভাবছিস চিরটাকাল সফি কাপ্তান তোর সঙ্গে এমন সোয়ামি সোয়ামি ভাব করবে। গতর চলে গেলে পেছনে লাথি মারবে। লোকের বাড়ির ঝিয়ের কাজও তখন জুটবে না। দেওয়ালে ঘুঁটে দিয়ে কি ভিক্ষে করে চালাতে হবে। কোন দয়ামায়া নেই, নিজের হিসেব পাইপয়সা পজ্জন্ত বুঝে নিবি।

ঝিল্লুর বিহ্বল ভাবটা তখনো কাটেনি। বাসন্তীর দিকে তাকিয়ে এক সময় বলে, তুমি বুঝি অনেক জমিয়েছ দিদি?

বাসন্তী একটু থতমত খেল।' নাঃ, কিছুই থাকে না। ছাঁকনার ওপরে খাই ঢালো না কেন, 'সব বেরিয়ে যায়।

বাসন্তী চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বলে, সুখ নেইরে সুখ নেই। কেন এলি ভাগাড়ে? তুই তো শুনলাম নাকি নিজের ইচ্ছেয় এসেছিস।

কী করবো বলো শরীরটা নিয়ে বড্ড টানা হ্যাঁচড়া। পেটও ভরে না, আবার ওদিকটাও ঠিক রাখতে পারি না। এ সময় সফি কাপ্তান গেল। চলে এলাম ওর হাত ধরে।

বাসন্তী সহজ হয়ে ঝিল্লুর কাঁধে হাত রেখে আশ্বস্ত করার মত বলল, এসেই যখন পড়েছিস, তখন থেকে যা। অত ভেবেচিন্তে কি হবে? সকলের যা হচ্ছে তোরও তাই হবে। যে কদিন রোজগার করবি, দেখবি ভালো ভালো জামাকাপড় চড়াচ্ছিস গায়ে। রিক্সা গাড়িতে চেপে ঠুনুং ঠুনুং শব্দ করে সিনেমা দেখতে যাচ্ছিস। মাছটা মাংসটা খাচ্ছিস, পমেটম লিপস্টিক মাখছিস। এবার সত্যি সত্যি উঠছি, তুই রাঁধা বাড়া কর।

বাসন্তী চলে যেতেই ঝিল্লুকে একেবারে নিজের মুখোমুখি দাঁড়াতে হল। কোথাও এতটুকু আড়াল নেই। ঝিল্লু খুব অপ্রস্তুত হয়ে নিজেকে দেখলো। হাজারটা প্রশ্ন, দ্বিধা ভয় সংকোচ তাকে ব্যতিব্যস্ত করছে। সবকিছু ভোলার জন্য স্টোভের ওপর কড়া চাপিয়ে জোরে জোরে খুন্তি চালিয়ে মাংস কসতে লাগল।

উঠোনে দু-চারটে ল্যাংটো বাচ্চা খেলা করছে। একটা নেপালী মেয়ে উনুনে ফুঁ দিচ্ছে। বাক্স তৈরির মিস্ত্রিরা বিরাট শব্দ করে পেরেক ঠুকছে। খাটিয়ার ওপর খুব বিষণ্ন মুখে সিতুবাবু বসে জলের দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানছে। খাটিয়ার খানিকটা জুড়ে গাছের ছায়া লম্বা হয়ে পড়েছে। ঝিল্লু সবকিছুর উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলেও কোন কিছুই তার মনকে স্পর্শ করছিল না। ঝিল্লু আসলে এক অতলস্পর্শী চিন্তার গভীরতায় দ্রুত নিমজ্জিত হচ্ছিল, কিন্তু ঝিল্লুর বোধে এ বিষয়টা এতই নতুন ও অজ্ঞাত যে, একসময় একটা বিপদের শীতল স্রোত ওর শিরদাঁড়া বেয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের মত দ্রুত চলে গেল। আর অমনি শিহরিত হয়ে ঝিল্লু তক্ষুণি কসা মাংসের কড়াইতে বড় এক ঘটি জল ঢেলে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

তাড়া খাওয়া মার্জারীর মত সে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে একটা নিরাপদ রাস্তা খোঁজার চেষ্টা করল। তারপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে সিতাংশুর খাটিয়ার ওপর গিয়ে পড়ল। তখন সে বেশ হাঁপাচ্ছে। সিতাংশু তার দিকে একবার ফিরে তাকালো মাত্র, কিছু বলল না।

ঝিল্লু স্থির হয়ে বসে বার কয়েক বড় করে শ্বাস নিল। মুখে বসন্তের দাগ ধরা একটা মিস্ত্রি ঝিল্লুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সিতাংশুর চোখ বাঁচিয়ে, তার হাতুড়িটা বেশ অর্থপূর্ণভাবে সঞ্চালিত করল। ইঙ্গিতটা ঝিল্লুর না বোঝার নয়। কিন্তু সে যেন এখন সব বোধ বুদ্ধির ঊর্ধ্বে। তার নিষ্পাপ অর্থহীন চাহনি দেখে মিস্ত্রিটি মৃদু হাসলো। অন্য মিস্ত্রিরাও ঝিল্লুকে লক্ষ্য করছিল, মৃদু হাসিটা তাদের মধ্যেও সংক্রামিত হলো।

ঝিল্লুর দিকে সিতাংশু একবার ফিরে চাইতেই সে জিগ্যেস করল, এসব বাক্সো কোথায় যাবে?

সিতাংশু কোন কিছুই না ভেবে বলল, জাহাজে করে বিলেতে।

জাহাজে করে বিলেতে? আচ্ছা, বিলেতের লোকগুলো সব কালো মুস্কো জোয়ান তাই না?

বিলেত বলতে তো সাদা চামড়ার কথা মনে পড়ে, হঠাৎ কালো মুস্কো জোয়ানের কথা বলায়, সিতাংশু ভারি অবাক হয়ে ঝিল্লুর দিকে ভালো করে তাকালো। মেয়েটির মুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট। সিতাংশু মনে মনে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলো, পারলো না। সিগারেট বের করে নিজে একটা নিল, ঝিল্লুর দিকে একটা এগিয়ে দিয়ে বলল, বেশি কড়া না, খেয়ে দেখো। লজ্জা লজ্জা মুখে ঝিল্লু একবার সিতাংশুর দিকে তাকিয়ে ছোট করে হাত বাড়িয়ে সিগারেট আর দেশলাইটা নিল।

আর ওদুটো দিয়েই সিতাংশুর মনে হলো আদিখ্যেতাটা একটু বেশিই হয়ে গেল। এতটা না করলেও চলত। মিস্ত্রিরা আড়চোখে দেখছে। ঝিল্লু বিড়ি ধরার ভঙ্গিতে সিগারেটটা ধরে টান দিচ্ছে।

হাওয়ার্ড জনসনের মুখার্জিবাবু সিতাংশুর দিকে সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, মিস্টার সোমেশ চৌধুরী আপনার রিলেটিভ হন?

সিতাংশু একটু সতর্ক ভঙ্গিতে বলেছিল, ওই এক রকম।

সোমেশ চৌধুরীর সঙ্গে মিসেস নীহারবালা রায়ের সম্পর্কটা যে শুধুই বন্ধুত্বের কিনা সেটা সিতাংশুর জানা নেই। কানা-ঘুষোয় সে বিশ্বাস করে না, তবু গল্প উপন্যাস পড়ে মনটা এমন প্যাটার্নাইজড হয়ে গেছে যে বিধবা মাসীমার সঙ্গে সোমেশ চৌধুরীর একটা সম্পর্ক যে কোনো সময় প্রকাশ হয়ে পড়বে, এই লজ্জায় সিঁটিয়ে থাকতে হয়। মাসীই সোমেশ চৌধুরীকে বলে অর্ডারটা পাইয়ে দিয়েছে। সোমেশ চৌধুরীর সঙ্গে হাওয়ার্ড অ্যাণ্ড জনসনের যে ঠিক কি সম্পর্ক সিতাংশু জানে না, তবে ভদ্রলোকের হাত আছে।

মুখার্জি একগাল হেসে বললেন, আপনি তো খুব বড় ঘাটে নৌকো বেঁধেছেন। দেখবেন, আপনার বাণিজ্য মন্দ হবে না। তবে—, বলেই খুব অর্থপূর্ণভাবে হেসেছিল মুখার্জি।

সিতাংশু খুব শঙ্কিত হয়ে জানতে চেয়েছিল, তবে কি?

মিস্টার চৌধুরী আর মিস্টার নটরাজনের এ কোম্পানিতে সেম

পাওয়ার। বুঝতেই পারছেন, সে ক্ষেত্রে দুজনের ভাব ভালোবাসা খুব একটা হওয়ার কথা নয়। অন্য যারা রেগুলার অর্ডার পেয়ে থাকে. তাদের ডিঙ্গিয়ে আপনার মতো নতুন একজনকে অর্ডার দেওয়ায় মিস্টার নটরাজন খুবই চটেছেন। যদি পারেন একটু দেখা করে তুষ্ট করবার ব্যবস্থা করবেন। বাঙ্গালী এণ্টারপ্রিউনারদের এই এক দোষ. সব সময় একজন মুরুব্বি পাকড়ে থাকেন। একটা কথা জানবেন স্বয়ং ম্যানেজিং ডিরেকটরও যদি আপনার হাতের লোক হয়, তবু একটু সজাগ থাকবেন। একটা উলটো স্রোত সব সময়ই থাকে। ঠিকমতো বুঝতে না পারলে হাবুডুবু খেতে হয় সময় সময়।

মুখার্জিবাবুর রূপকের ছলে কথাবার্তা ভালো লাগছিল না সিতাংশুর। সে বলল, ওভাবে তেল দিয়ে বিজনেস আমার পোষাবে না।

আপনি নেহাতই বালক। তেল কিন্তু কম বেশি আপনি অলরেডি দিয়েছেন, না জেনে দিন বা জেনেই দিন। তবে একটা কথা কি, জলে নামবেন, সাঁতার কাটবেন কিন্তু বেণী ভেজাবেন না, এমন নায়িকাসুলভ আব্দার থাকলে তো মুশকিল। একটা কথা আপনাকে জানিয়ে দিই, উদ্যোগী হলে আরো হাজার তিনেক টি চেস্টের অর্ডার আপনি এক্ষুণি পেতে পারেন।

সিতাংশু অবাক হয়ে মুখার্জির দিকে তাকাল। মুখার্জি কাঁধটা ঝাঁকিয়ে বলল, এটা ফ্যাক্ট। ধরুন অর্ডারটা আমিই আপনাকে তদ্বির করে পাইয়ে দিতে পারি। না না আমি ঘুষটুস নিই না। আপনি বাঙ্গালীর ছেলে, ছোট ভাইয়ের মতো, আপনাকে আমি হেলপ করতে পারি। কিন্তু আপনি কি পুরো হ্যাপাটা সামলাতে পারবেন? টাকা পয়সারও তো দরকার। নাইনটি ডেজ বিল, ভেবে দেখুন, পারেন তো আমার সঙ্গে দেখা করবেন দুদিন বাদে। আর একটা কথা, নটরাজনকে ইগনোর করবেন না। ডিরেক্ট নটরাজনের কাছে যেতে না পারেন, তবে তার এজেন্টদের সঙ্গে একটু কথা বলুন।

মিস্ত্রিরা খুব দ্রুত হাতে কাজ করছে। পাঁচশো বাক্স সাপ্লাই দেওয়ার আজকেই শেষ দিন। মাত্র আড়াইশো গেছে। তিনটে থেকে ব্রেণ্ডিং শুরু। তার আগেই চায়ের পেটিগুলো গোডাউনে পৌঁছনো দরকার। আড়াইশো বাক্স পাঠাতে পাঁচটা ঠেলাগাড়ি দরকার। একটাও জোগাড় হয়নি। অবনীকে একজায়গায় একটু খোঁজ নিতে পাঠিয়েছে।

অবনী ফিরল আরো পরে, শিউপূজন কিস্তিওয়ালার সঙ্গে একচোট হয়ে গেল। বেটা বহুৎ টেঁটিয়া।

তোকে ঠেলা জোগাড়ে পাঠিয়েছিলাম। ম্যানেজারিটা একটু ঠিক করে কর।

কেরে তুই? মালিকদের মতো কথা বলছিস। তোর মুখলালের কাছে গিয়েছিলাম। দুটো ঠেলা পাঠিয়ে দিচ্ছে।

দুটোতে কি হবে রে? মিনিমাম তিনটে হলে দু-ক্ষেপে হয়ে যেত। অত সময় কোথায়?

দূর, আমি অত কি জানি. এই যে করে এসেছি. তাই বেশি। শিউ-পূজন লোকটা কিন্তু ভালো না।

সিতাংশু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে অবনীর দিকে তাকিয়ে বলল, কি ব্যাপার

মাসী ড্রেসিং টেবলের সামনে বসে পরিপাটি করে চুল ব্রাশ করছিল

বলতো ? তুইতো গোখরোর ল্যাজে পা দিয়েছিস। নিজেও মরবি, তার চেয়ে আমাকে বেশি মারবি। মাইরি, আমাকে তুই রেহাই দে। না হলে আমাকে একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

কি ব্যবস্থা করবি ? পুলিশে খবর দিবি ? অবনীর কথা বলার সময় চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে গেল। জেনে রাখ তেমন কিছু হলে অবনী তোকে ছেড়ে দেবে না।

নির্বোধ! নির্বোধ। আমি তোকে তেমন কিছু বলিনি। বলছিলাম ঝগড়া-ঝাটিগুলো অ্যাভয়েড করে চললে তোরই সুবিধে। তুই এখানে গা ঢাকা দিয়ে আছিস, এ কথাটা আমার চেয়ে তোরই বেশি মনে রাখার কথা।

এমন সময় হঠাৎ একটা তীব্র চিৎকারে সকলে একসঙ্গে মুখ তুলে তাকালো। সফি বেজায় চেঁচাচ্ছে, ওরে আমার ভাবুনি রে! ভাবতে ভাবতে মাংস পোড়া লাগিয়ে ফেলেছে। আজ তোর মাংস দিয়েই আমি ফিস্টি করব। দেখে নিস তখন।

পাঁচ

মাসী ড্রেসিং টেবলের সামনে বসে পরিপাটি করে চুল ব্রাশ করছিল। চমৎকার একটা লাল রঙের বিকেল। পড়ন্ত সূর্যের আলো এসে পড়েছে মাসীর চুলে, বাঁ দিকের গালে। পঞ্চাশের দোর গোড়ায় এসে মাসীর চেহারা আর রূপ এমন এক বিপজ্জনক বাঁক নিয়েছে যে, সিতাংশুর কেমন যেন বুক ঢিপ ঢিপ করে সে দিকে তাকালে।

সারা বাড়িতে মেসোর অজস্র স্মৃতি চিহ্ন। আর তারমধ্যে মাসী কেমন বদলে যাচ্ছে। নিঃসন্তান মাসী-মেসোর তো খুব ভাব ছিল। মেসো মারা যাবার পর, সিতাংশু তাই আশা করেছিল, মাসী প্রেমের স্মৃতি বুকে নিয়ে হয়তো একেবারে যোগিনী হয়ে যাবে। কেন যে এরকম আশা তা সে জানে না। মেয়েদের চেস্টিটি বা পবিত্রতার ব্যাপারটা সিতাংশুকে সবসময় পীড়িত করে। সিতাংশুর তাই ভালো লাগছিল না, মাসীর এই ড্রেসিং টেবলের সামনে বসে চুল পরিচর্যা। মাসী যে সব শাড়ি পরে তাতে লাল রঙটা বাদ দিয়ে অন্যান্য রঙের বেশ বাহার খোলে।

মাসী আয়নার মধ্য দিয়ে সিতাংশুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, অমন ভ্রূ কুঁচকে কি দেখছিস ? মেল শভিনিস্টিক পিগ! শেষের কথাটা বেশ শ্লেষের সঙ্গে বলা। হ্যাঁরে, আমার নাকি খুব নিন্দে-টিন্দে হচ্ছে ?

নিন্দে আবার কিসের ?

তার আমি কি জানি। তোরা যারা নিন্দে রটাচ্ছিস, তারাই জানিস। এখন আমার আত্মীয় স্বজনদের দেখলেই কেমন বমি পায়।

কিন্তু আমি তো তোমার আত্মীয়। আমার জন্য তুমি তাহলে তদ্বির করতে গেলে কেন ?

তুই ভিখিরির মত মুখ করে ঘোরাফেরা করতি, তাই তোকে ভিক্ষে দিয়েছিলাম। পুরুষ মানুষের বাইরে অত দীনতা থাকবে কেন ? তা তোর বিজনেস কেমন চলছে ?.

এখনো পর্যন্ত চলছে, তবে আর বোধহয় চলবে না। আমার পুঁজি বড় কম।

এখবরটা দিতে এলি ? তোর মেসোর গচ্ছিত টাকা বিশেষ ছিল না। যাও ছিল, সব খরচা হয়ে গেছে। এখন আমার কাছে সোমেশের কিছু গচ্ছিত টাকা আছে। ওর কালো টাকার কিছুটা আমার নামে ব্যাঙ্কে রেখেছে, কিছুটা সিন্দুকে। ব্যাঙ্কের সুদটা আমার খরচ করার অধিকার আছে। বলতে পারিস, নামটা ধার দিয়েছি বলে, ওটুকু আমার মজুরি। তুই যদি আমার কাছে সাহায্যের জন্য এসে থাকিস, তবে এই দেখ বুড়ো আঙুল।

সিতাংশু মাসীর কাছে সাহায্যের জন্যই এসেছিল। মাসীর এইসব কাটা কাটা কথায় সে ভারি বিরক্ত হচ্ছিল। তবু সে বলল আমি তোমার কাছে দয়া চাইতেই এসেছিলাম। হাজার বিশেক টাকা আমার এক্ষুণি দরকার।

তোকে আমি দয়া করতে যাব কেন ? তোর দাদাবা তো খুব উঠেছে আজকাল। তাদের কাছে হাত পাত না। একজন বিধবা মেয়েছেলের কাছে একটা দামড়া ছেলের হাত পাততে লজ্জা করে না ?

দাদাদের সব ওয়ান পাইস ফাদার মাদার। না দিলে বল চলে যাই, কিন্তু দিলে একমাত্র তুমিই দিতে পার।

বাকি কথাগুলো বল, যদি দিই তবে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। কত কৃতজ্ঞতাই দেখলাম।

সারা জীবনেব কথা বলতে পারি না, তবে এ মুহূর্তে খুব সুবিধে হবে। কৃতজ্ঞতাবোধ মানুষের খুব বড় গুণ, আমার তো কোনো গুণই নেই।

মাসী এবার হেসে ফেলে.' তোর বুদ্ধিটুদ্ধিগুলো বেশ। লম্বা কান জানোয়ারের মতো। তুই নাকি একটা খারাপ পাড়ায় ব্যবসা চালাস ? মেয়েগুলো কেমন রে ?

ওঃ খুব বিচ্ছু। প্রথম প্রথম বেজায় ঝামেলা করত। কেড়ে সিগারেট খেত। এখন বন্ধু হয়ে গেছে।

মাসী এগিয়ে এসে সিতাংশুর কপালে হাত রাখে, ধুলো ওড়া চুলে হাত বুলিয়ে একটু আরাম দিল। ছোটবেলা থেকেই তুই খুব নরম ছিলি। তোকে এরকম কষ্ট করতে হবে ভাবিনি। চাকরি বাকরির বাজার এত খারাপ, তোকে একটা বাঁধা মাইনের অল্প পরিশ্রমের কাজে ঢুকিয়ে দিতে পারলে ভালো হতো। কি আর করবি বল ?

এসব কথায় সিতাংশু একটু উৎসাহিত হলো। ভাবল মাসী নরম হয়েছে একটু এবার তাকে টাকা দেবে। সিতাংশু আসলে বাক্স তৈরির ব্যবসাতেও যে কি রকম দক্ষতা অর্জন করেছে, এটা বোঝাবার জন্য বেশ সপ্রতিভভাবে বলল, দেখ মাসী, ওসব সেন্টিমেন্ট আমাকে কাবু করে না। আমি এখন বিজনেসের ঘাঁতঘোঁৎ সব বুঝে গেছি। এখন একটু ক্যাপিটালটা বাড়াতে পারলেই ··

কিন্তু সিতু তোকে আমি টাকা দেব কি করে ? আমার নামে ব্যাঙ্কে যে টাকা আছে, তার সবটাই সোমেশের গচ্ছিত রাখা।

তুমি ধার দাও, আমি তো শোধ দিয়ে দেব।' হাজার কুড়ি টাকা শুধতে আমার সাত আট মাসের বেশি লাগবে না, বড় জোর একবছর।

কিন্তু ধর আজই দিলাম, কালই যদি এসে ও টাকা চায়। চাইবে না, তবে চাইতেও তো পারে।

ওঃ! তা তুমি মিস্টার চৌধুরিকে একটু বোঝাতে পারবে না। মানে তিনি তো তোমার খুবই ঘনিষ্ঠ।

ঘনিষ্ঠ কি না জানি না। একসঙ্গে কলেজে পড়েছি। তবে আলাপটা অবশ্য কলেজ থেকে হয়নি, হয়েছিল আরো পরে, তোর মেসোর মারফৎ। ওরও অনেক দুঃখ, ইচ্ছেয় অনিচ্ছেয় একগাদা কালো টাকা জমে গেছে, সেসব নিয়ে বিব্রত। আসে মাঝে মাঝে সুখ দুঃখের গল্প করতে। মাসী নাক দিয়ে অদ্ভুত এক অবজ্ঞার শব্দ করে বলল, লোকে আবার এই নিয়েই কথা রটায়। তাদের ধারণা আমি—আমি সোমেশের রক্ষিতা হয়ে গেছি।

একটু হোঁচট খেয়ে বলা কথা। সিতাংশুর পিঠে যেন চাবুক বসাল, মাসীর সম্বন্ধে এমন একটা ধারণা তারও আছে। কিন্তু মাসী যে প্রকাশ্যে সে নিয়ে আলোচনায় বসবে ভাবেনি। বিশেষ করে 'রক্ষিতা' শব্দটা কিছুতে সহ্য করা যাচ্ছে না।

তার ব্যবসাপাড়ার দেহব্যবসায়ী মেয়েরা বড় মুখ ফোঁড়। তাদের সরলতম কথার মধ্যেও নেহাতই ফোড়নের মতো উপস্থের দু একটি প্রতিশব্দ থেকেই যায়। তারা তাদের দেহ দিয়ে, কাজ নিয়ে সহজে আলাপ করে। মাসীর মুখে 'রক্ষিতা' কথাটা শুনে তার সে সব কথা মনে পড়ল।

সিতাংশু একটু সামলে উঠে বলল, ছাড়ো তো সব পাগলের কথা। সিতাংশু আসলে তখনো চেষ্টা করে যাচ্ছে। টাকা পাওয়ার আশা পুরোপুরি ছাড়েনি।

এরমধ্যে একবার ফোন এল মাসীর। মাসী শোবার ঘরে গিয়ে ভারি স্নিগ্ধ গলায় কার সঙ্গে একটু কথা বলে ফিরে এল।

মাসী দ্রুত হাতে সামান্য কিছু প্রসাধন সারল। একটা পাঁশুটে রঙের চমৎকার বুটিদার শাড়ি পরল। ঝিকে ডেকে কি সব যেন নির্দেশ দিল নিচু গলায়। আর এরই ফাঁকে ফাঁকে সিতাংশুর আব্দারকে নস্যাৎ করে

গেল।

সন্ধ্যে হতে সিতাংশু উঠল। আর বসে থাকার কোনো মানে হয় না। মনে মনে একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে কিছুতে এক আনন্দ পেল, মাসী আসলে বেশ্যা। ওই পাপের টাকা না নেওয়াই ভালো।

সিতাংশু যখন তার ব্যবসাপাড়ায় ফিরল, তখন সন্ধ্যে বেশ গাঢ় হয়েছে। একটা পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। লাইসেন্সী হরবালা দেব্যার দিশি মদের দোকানে জমজমাট অবস্থা। ভেতরের বাংলা মদ আর ভিড়ের গায়ের ঘেমো গন্ধ দোকান উপচে বাইরে পর্যন্ত চলে এসেছে। চাটের দোকানের ভিড় আর সাজুগুজু করা মেয়েগুলো একই সঙ্গে গরম মাংস ফিরি করছে। রাস্তায় বড় ভিড়।

ফুলন নামের ছুকরিটা একটা ছোট সাইজের পুজোর ঘন্টা বাজিয়ে তারস্বরে হাঁকছে, লে লে বাবু ছে আনা, হরেক মাল ছে আনা, যা লেবে তাই ছে আনা। বাকিরা হো হো করে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। খদ্দের-দের মুখে চোখে একটা বিব্রত ভাব।

কালী সিংয়ের মোষের খাটালের পাশ দিয়ে মোড় ঘুরে ভেতরে ঢোকার আগেই দশাসই চেহারার এক বয়স্কা মহিলা সিতাংশুর হাত টেনে ধরল। সিতাংশু বিরক্ত হয়ে রুখে দাঁড়াল। এ মৌসী ছোড়ো। কথাটা বলেই থতমত খেল সিতাংশু। মৌসী আর মাসী কথাটা পাশাপাশি উচ্চারণ করল মনে মনে।

মৌসী কালো কালো দাঁত বের করে একটা ভুবন ভোলান হাসি দিল। পাঁচ রুপিয়া—কালী মাঈয়ের পুজো হোবে, বলে কাছেই একটা বাঁশের খাঁচা দেখাল।

পুজো হবে তো তোমার কি? ওদের কাছ থেকে নাও না। বলে অনির্দিষ্টভাবে রাস্তার ভিড়ের দিকে হাত দেখালো। আর তোমাদেরই বা দেব কেন, ক্লাবের পুজো, ক্লাবের লোকদের দেব।

একটা নেপালী মেয়ে কাছেই দাঁড়িয়ে নিজের শরীর ডিসপ্লে করছিল। সে হঠাৎ বসে পড়ে সিতাংশুর পা জড়িয়ে ধরে বলল, গোর লাগি বাবু—পাঁচ রুপিয়া চান্দা—সির্ফ পাঁচ রুপিয়া—তারপর বাঁকা বাংলায় বলল, দেওয়ালীর দিন বাজি পোড়াব, মাল খাব ঢুকু ঢুকু। মেয়েটা বুড়ো আঙুল মুখে পুরে বোতলে মুখ দিয়ে মাল খাওয়ার একটা মুদ্রা দেখাল।

আশেপাশে পেত্নীর হাসির মতো অজস্র হাসির ঢেউ কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে। সিতাংশু ভারি বিরক্ত হয়ে পায়ের একটা ঝটকা মারল। নেপালী মেয়েটা মাটিতে গড়িয়ে পড়ে খিল খিল করে হেসে উঠল। সিতাংশু আর মেয়েটাকে ঘিরে তখন আরো দশ বারোটা মেয়ে এসে গোল করে ঘিরে ধরেছে। নেপালী মেয়েটা 'হে ভগওয়ান' বলে শুয়ে পড়ে কোমর থেকে শরীরটা উঁচু করে আকাশের দিকে তুলে ধরে পা দুটো সাইকেলের প্যাডেল করার মতো বার কতক নাচাতেই শাড়ি-টাড়ি সব আব্রু লোপ পাওয়ার জোগাড়। মেয়েটা কপট লজ্জায় অমনি ঠিক হয়ে উঠে বসল।

সিতাংশু রাগে গরগর করে উঠল, ডার্টি বিচ, বলেই দু কনুইয়ের ধাক্কায় ব্যূহ ভেদ করে ছিটকে বেরিয়ে এল। পেছনে নেপালী মেয়েটা সাহেবী উচ্চারণের ঢঙে বলল, ইয়াস, ইয়াস, নো নো, বিউটিফুল—সানা—বিচ।

মৌসী চেঁচিয়ে উঠল, আরে বাঙ্গালী বাবু কাঁহা ভাগতা? জরা তো শুনিয়ে—। সিতাংশু ফিরে দাঁড়াতেই বাঁ হাতের তর্জনীর উপর খাঁড়া দিয়ে কোপ মারার ভঙ্গিতে ডান হাতটা চালিয়ে বলল, কেটে দিয়ে শালা ল্যামপোস্টের ডগায় ঝুলিয়ে দোবো।

উঠোনে পৌঁছে দেখল খাটিয়ার উপর অবনী বসে আছে। ঝিল্লুর ঘর বন্ধ। অসাবধানে বন্ধ করায় পর্দাটা দরজার ফাঁকে আটকে রয়েছে।

সিতাংশু অবনীকে বলল, এমন ভূতের মতো বসে আছিস কেন?

ঝিল্লুর ঘরে শিউপূজন ঢুকেছে, লোকটা খুব বদমাইশ।

কেন শিউপূজন তোর কি করল? তোর সঙ্গে কি ঝামেলা হয়েছিল বলছিলি, শোনাই তো হলো না সে ব্যাপারটা।

শালা সুদখোরের বহুৎ দাপট। চায়ের দোকানে বসে উল্টো-পাল্টা তম্বি মারছিল।

ও ভাতও দেয়, কিলও মারে। ওর সে রাইট আছে। শিউপূজন না এলে অনেকেই অন্ধকার দেখবে এখানে।

এই তো বুর্জোয়ার মতো কথা বলছিস। সুদখোরটা শ্রেণীশত্রু নয়?

হবে হয়ত। কিন্তু ও ঝিল্লুর ঘরে ঢোকায় তোর এত রাগ কেন?

রাগ আবার কি। সফি আমাদের ফ্রেণ্ড……

ঝিল্লু কিন্তু সফির বউ নয়। সফি ওকে দিয়ে ব্যবসা করাবে বলেই এখানে এনেছে।

অবনী কোনো যুক্তি খুঁজে না পেয়ে দমে যায়। কিন্তু সিতাংশুর কথা ঠিক ঠিক মানতে পারে বলে মনে হয় না। সিতাংশু বেশ ধমকের সুরেই বলে, চুপচাপ থাকবি এখানে। হাঙ্গামা হুজ্জতের মধ্যে যাবি না। এখানে তোর জনযুদ্ধ কলকে পাবে না।

অবনী আকাশের দিকে তাকিয়ে তখন তারা গুনছিল। সিতাংশু একটার পর একটা সিগারেট শেষ করে গেছে। অবনী বারদুয়েক সিগারেট চেয়েও পায়নি। সিতাংশু বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলেছে, শুধু সিগারেট কেন, আজ রাতে তোর খাওয়াও বন্ধ। পেটে না টান ধরলে তুই এখান থেকে যাবি না।

উপোস করে থাকার অভ্যেস আমার আছে। না খেয়েও আমি এখানে থাকব। আর তুই আমাকে অত দূর দূর করছিস কেন বলতো?

অবনীর কথায় আর কোনো উত্তর না দিয়ে ব্যাজার মুখ করে বসে ছিল সিতাংশু। এমন সময় বরজান এল। এসে মাটিতে বসল। বসার আগে পকেট থেকে বোতলটা বের করে সামনে রাখল।

সিতাংশু আড়চোখে সেদিকে তাকিয়ে বলল, মিস্ত্রি হঠাৎ বিলিতি খাচ্ছ?

বরজান খুব সহজ গলায় বলল, সখ গো দাদা, সখ। সখের চোটে তো লোকে দেনা করেও বৌয়ের গয়না গড়ায়। আমি দিশি থেকে একটু বিলিতি হতে পারব না?

খুবই সাধারণ কথা, কিন্তু এর মধ্যেও ঝাঁঝ ছিল। শরতের নিরীহ মেঘের মধ্যেও যেমন কখনো কখনো বিদ্যুতের তেজ থাকে।

বরজান বলল, হাওয়ার্ড জনসনের অর্ডারটা আবার ধরলেন?

কোত্থেকে ধরব, পয়সা কোথায়? আমার এস্টিমেটে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তবে কাল থেকে অন্য কাজ আছে। গুদাই-এর কন্ট্রাক্ট আছে দুশো বাক্সের। পুরনো তিনটে, নতুন তিনটে তক্তা দিয়ে বাক্স হবে। জানকীর পঞ্চাশটা বাক্স হবে, রিপেয়ার তক্তা চলবে। তিনদিনের মধ্যে কাজটা তুলে দিতে হবে।

তবে আপনি আবার বাজারের অর্ডার ধরলেন?

বাজারের অর্ডার মানে, সাব-কন্ট্রাক্ট নিয়ে কাজ করা। ছোটখাটো ঘরে এমন কাজ হয়। সিতাংশু গম্ভীর গলায় বলল, তাছাড়া উপায় কি?

বরজান গলা খাকারি দিয়ে বলল, একটা কথা বলার ছিল। আপনার যদি আমাকে দিয়ে না পোষায়, আপনি অন্য কাউকে মিস্ত্রির কন্ট্রাক্টটা দিতে পারেন। একটা ভাঙা পেরেকের হিসেব মিলিয়েও কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

সিতাংশু তেড়ে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলালো. বেশ ঠাণ্ডা গলায় বলল, কিন্তু হিসেবের গোলমালটা কি শুধু ভাঙা পেরেক নিয়েই হয়েছে? প্লাইউড, বাটাম, প্যানেল, যে সব গোণাগুন্তি মাল সেগুলো ঠিক আছে মোটামুটি. আর অন্যসব মালে হঠাৎ হঠাৎ এমন টান পড়ল কেন?

বরজান একটু শব্দ করে হাসল. উঠোনটায় মোটামুটি অন্ধকার। তবে আশপাশ থেকে ট্যারচা হয়ে একটু আলো এসে পড়েছে। বরজান সামনে রাখা রামের বোতল থেকে একটু গলায় ঢালল। একটু বিকৃত শব্দ করল। ভালো কথা বলছি, আপনি পারবেন না। এ হল প্লে কাদাঘাটা বিজনেস। আপনারা শৌখিন মানুষ। কি করে পারবেন বলুন? সত্যি কথা. আপনি যাই ভাবুন, আমি আপনার মালপত্র সরাইনি। আপনার মাল যে কীভাবে কম পড়ছে, তা আপনি বুঝবেন না। সারাটাক্ষণ ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে থাকলেও বুঝবেন না। ওসব গুপ্ত বিদ্যে আছে। বরজান মিস্ত্রি খুক খুক করে হাসল খানিক আপন মনে। আপনি ঠিকই ধরেছেন, এই যে বিলিতি টানছি, তা আপনার পয়সাতেই। কিন্তু আপনি সন্দেহ করতে পারেন, হাতে নাতে ধরতে

পারবেন না। তবে ঘুঘু লোকের পাল্লায় পড়লে এটা পারতাম না।

বরজান আবার গলায় মদ ঢালল। আমি র-ই খাই। বরজানের যে একটু নেশা হয়েছে, সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। সিতাংশু অন্ধকারের মধ্যেই বরজানের মুখটা দেখার চেষ্টা করল। লোকটা এতটা শয়তান তা বুঝতে পেরে সিতাংশুর কষ্ট হচ্ছে। বরজান হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, আমি চলি। পরে ভালো করে সব কথা হবে।

এতক্ষণ অবনী কোনো কিছু বলেনি, বরজান চলে যেতেই ও লাফ মেরে উঠে বসে সিতাংশুর পিঠে দুম করে এক কিল বসাল। খুব রাগ হচ্ছে তোর, তাই না? মাতালটা তোর অহঙ্কারের শরীরটায় কেমন জল বিছুটি ঘষছিল! প্রথম কথা, মালিককে তার মাইনে করা লোক চোখ রাঙানোয় একটা অস্বস্তি। দ্বিতীয় কথা, নিজের অসহায় অবস্থার কথাটা আরেকজন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেল, সে কারণে অস্বস্তি। তুই একেবারে আনফিট। ব্যবসাপত্তর তোর দ্বারা হবে না।

সিতাংশু দেশলাই জ্বেলে ঘড়ি দেখল, তারপর বলল, দু গাড়ি চ্যাপটা বাক্স আসার কথা ছিল। এত দেরি হবার তো কথা নয়। আমি বলে এসেছিলাম সাতটার মধ্যে পাঠিয়ে দিতে। এতো দেখি আটটা বাজে। পুলিশ-টুলিশে ঠেলা ধরল কিনা কে জানে?

অবনী বলল, তুই বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম কর। এলে আমি ঠিকমত তুলে রাখার ব্যবস্থা করব। আজ একটা টাকা বেশি দিস ডিনারের জন্য। আজ একটু বোঁদে খাব। রোজ শালা দেখি পাশের দোকানে গরম গরম বোঁদে ওইসময় টাল দিয়ে রাখে।

সিতাংশুর বিকেল থেকে মনটা ভালো ছিল না। মাসীর বাড়ি, একটু আগে মৌসির সঙ্গে ঝামেলা ও রমজানের সঙ্গে কথোপকথন তার বিশ্বাস, আবেগ, সংস্কারকে বড় আঘাত করেছিল। একটু দিশেহারা হয়ে পড়েছিল সিতাংশু। ভালো লাগছিল না। সারা শরীরে মনে অদ্ভুত একটা ঘিনঘিনে ভাব। ঠিক এ সময় অবনীর কথাটা মনের টানটান ভাবটা কাটিয়ে দিল। অতবড় একটা ছেলে, কেমন অবোধ শিশুর মতো আব্দার করছে। সিতাংশু তার বিরাট শরীরটা নিয়ে অবনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, ওরে আমার খোকন সোনা রে! বড্ড জিভ তো দেখছি।

অবনীর কাতুকুতু লাগছিল ও হাসতে বলল, এই মাইরি মেরে ফেলবি নাকি রে!- এই ঘটোৎকচ ছাড়, স্রেফ পিষে মরে যাব।

সিতাংশু হাঁপাতে হাঁপাতে অবনীকে ছেড়ে উঠে বলল, চল, তোর সঙ্গে আজ আমিও খাব। চিকেনকারি, পরটা, রাবড়ি, তুই যদি বোঁদে খেতে চাস, তবে গরম বোঁদেও।

এইতো গুম মেরে ছিলি। হঠাৎ এত ফুর্তির কারণ?

তুই এমন লোভ লোভ ভাব করলি। আমার হঠাৎ কেমন যেন হাসি পেয়ে গেল। চল শালা, আজ অ্যায়সা খাব যে খেয়েই ফতুর হয়ে যাব।

অবনী বলল, সফি কাপ্তান কোথায় রে?

কোথায় আবার, দেখ গে কোনখানে দিশি বা চুল্লু টেনে উল্টে পড়ে আছে। কেন তাকে আবার কি দরকার?

না আমরা খেতে যাচ্ছিলাম তো, তাহলে ওকে নিয়ে যেতাম।

ওর আশায় থাকলে আজ রাতে হরিমটর। ঝিল্লুর ঘরে এখন জমজমাট ব্যবসা, প্রথম প্রথম কদিন সবারই হয়। সফি মহানিশ্চিন্তে কোথায় ফাইলের পর ফাইল ওড়াচ্ছে।

তবে ঝিল্লুর জন্য কিছু নিয়ে এলে হতো···বেচারা দোকান বন্ধ করে কখন আর রান্নাবান্না করবে?

সিতাংশু ভ্রূ কুঁচকে বলল, বড্ড দরদ দেখছি। ব্যাপারটা কি?

শিউপূজন কুমড়ো পটাশের মতো গড়িয়ে পড়ল

তুই এখন গল্প চাইছিস। তাহলে বলতে হয়, আমি প্রেমে পড়েছি ঝিল্লুর। তবে তা নয়, বলতে পারিস এও এক ধরনের ফেলো ফিলিং।

ফেলো ফিলিং বলতে ?

তুই আমি সফি ঝিল্লু সবাই যে যার ক্ষেত্রে আনফিট। স্কোয়ার পেগ ইন আ রাউণ্ড হোল। গোল ফুটোয় চৌকো পেরেক। তোর দ্বারা বিজনেস হবে না, সফি খুব বাজে ধরনের দালাল কাম ঘরওয়ালা। বিজনেস বোধ থাকলে ঝিল্লুর মতো একটা কানাকড়ি নিয়ে ব্যবসায় নামত না। আর আমি আমার পার্টিতে নেহাতই দুধভাত। অ্যাকশন স্কোয়াডে আছি, কিন্তু সত্যিকারের খুনখারাপিতে নেই। যদিও খুনের মামলায় নামটাম আছে।

ঝিল্লুর ঘরের দরজাটা হঠাৎ সশব্দে খুলে গেল। লাল আলোতে শিউপূজন একটু একটু দুলছে। তক্তপোশের ওপর ঝিল্লু, আধশোয়া অবস্থায়। জামাকাপড়ের ঠিক নেই। খিল খিল করে হাসছে। হাসছে কেবলই হাসছে। যেন থামার উপায় নেই।

অবনী সেদিকে দেখে বলল, নির্ঘাত সুদখোর শালাটা নিজে ভাঙ খেয়েছে, মেয়েটাকেও খাইয়েছে। ভাঙে এক এক জনের এক এক রকম এফেক্ট হয়। ঝিল্লু দেখবি, সারারাত হাসবে। প্রথম প্রথম এরকম একটু হয়।

শিউপূজনের হাতে পাকা বেতের লাঠিটা সব সময় থাকে। নেশাগ্রস্ত শিউপূজন লাঠি হাতে টলমল করছে। একসময় এগিয়ে এসে পা বাড়াল, চৌকাঠটা সামান্য উঁচু,অমনি লাঠিতেপা জড়িয়ে গিয়ে একেবারে কুমড়ো পটাশের মতো গড়িয়ে পড়ল, লাঠিটা ছিটকে গেল।

সিতাংশু তক্ষুণি ছুটে যায়নি, একটু দেখেছে দাঁড়িয়ে। শিউপূজন মাটি ছেড়ে আর উঠছেই না দেখে হাত ধরে তুলতে গেল। পেছন পেছন অবনী। কি করতে গিয়েছিল কে জানে, মজা দেখতেই হয়তো।

সিতাংশু টেনে তুলে হাতে লাঠিটা ধরিয়ে দিতেই, শিউপূজন হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে সিতাংশুর কাঁধের কাছে জোরে এক বাড়ি মারল। চোপ শালা, আসলি নেহি, সুদ মাংতা।

সিতাংশু কিছু বুঝে ওঠার আগেই শিউপূজন দ্বিতীয়বার তার দিকে লাঠিটা তুলেছে। আর অবনী অমনি সেটা ছিনিয়ে নিয়ে একেবারে তেড়ে উঠল, তবে রে!

কাঁধে চোট পেয়ে সিতাংশু একটু কাতর হয়ে পড়েছিল, তাই চট করে অবনীকে বাধা দিতে পারেনি। অবনীর ততক্ষণে চটপট তিন চার ঘা বসানো হয়ে গেছে।

শিউপূজন ব্যাপারটা নিয়ে ওই মত্ত অবস্থাতেই বিস্তর হৈ চৈ করল। সকলেই প্রায় শিউপূজনের দলে। শিউপূজন নিজে থেকেই ঠাণ্ডা না হয়ে গেলে, কি হতো বলা যায় না। সিতাংশু একটু পিঠে-টিঠে হাত বুলিয়ে বাবা বাছা করতেই শিউপূজন রণে ভঙ্গ দিল। মেয়ে, দালাল এদিক ওদিক লোকজন যারা বেশ একটা রগড় দেখার জন্য ভিড় করেছিল তারা হতাশ হলো এমন একটা পরিণতিতে।

অবনী চাপা গলায় হিস হিস করে বলল, তোমাকে খতম করতে আমার বেশি সময় লাগবে না।

কথাটা সকলের কানে যাওয়ার নয়, এমন কি যাকে বলল, সেই শিউপূজনের কানেও নয়। কিন্তু এই কথার পৃষ্ঠেই শিউপূজন একেবারে চারদিক কাঁপিয়ে অট্টহাস্য করল। একেবারেই নেশাগ্রস্তের আচরণ।

অবনীকে ভিড়ের মধ্য থেকে টেনে বের করে সিতাংশু বলল, সত্যি বলতো তুই কবে বিদায় হচ্ছিস ? আমি যে আর পারছি না!

দু একদিনের মধ্যে, খবর এসে গেছে।

ছয়

চিকেনকারি আর পরটাও যেন বিস্বাদ লাগছে। সিতাংশু আর অবনীর খেতে আসতে একটু দেরি হয়েছে। অবনীকে টেনে বাইরে আনার পর সিতাংশুর মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। শেষ পর্যন্ত তুই আমাকে ডুবিয়েই ছাড়লি অবনী। তুই আমার শনিগ্রহ।

সিতাংশুর ভয় পাওয়া দেখে অবনীও একটু বিব্রত হয়ে পড়েছে। তুই অত ভাবিস না, আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব। তোর কোনো ক্ষতি হোক, তা আমি চাই না। চল আগে একটু জাহাজ ঘাটায় গিয়ে বসি। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভালো লাগবে তোর।

অনেকক্ষণ বসে ছিল গঙ্গার ধারে। তারপর অবনীর আগ্রহেই খেতে যাওয়া। খাওয়া শেষে সিতাংশু অবনীকে বলল, চল তোকে পৌঁছে দিয়ে আসি। অবনী সিতাংশুর বাকস তৈরির কারখানায় টি চেসটের চৌকি বানিয়ে শোয়। ঘরে জানলা নেই কোনো, তাই দরজাটা খুলেই শুতে হয়।

অবনী বলল, তুই আবার আমার সঙ্গে ফিরবি কেন ? এখান থেকেই বাড়ি চলে যা।

তোকে আজ রাত্তিরে অন্য কোথাও রাখলে ভালো হতো। শিউপূজনটা রাম শয়তান। ও অত সহজে ব্যাপারটা মেনে নিল, এটা আমার ভালো লাগলো না। আচ্ছা, তোর শিউপূজনের ওপর এত রাগ কেন রে ?

অবনী বিশ্রী শব্দ করে হাসলো। রাগ থাকাটাই তো স্বাভাবিক। আমরা যে সব সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছি, সে বিবেচনায় শিউপূজন আমাদের পয়লা নম্বরের শত্রু। জোতদার সুদখোরদের গলা কাটা চলছে চলবে।

সিতাংশু আবার পুরনো কথায় ফিরে এলো, কিন্তু আজ রাতে তোর ওভাবে দরজা খুলে শোয়াটা ঠিক হবে না। আমাদের বাড়িতেও একটু অসুবিধে আছে, না হলে তোকে ওখানেই নিয়ে যেতাম। সিতাংশু একটু চোখ কুঁচকে ভেবে বললো, ঝিল্লুর ঘরে থাকতে পারিস। একবার চট করে ঢুকে পড়লে কেউ আর ঝামেলা করবে না, মানে ওখানে যে থাকতে পারিস তাই ভাববে না। অবনী প্রতিবাদ করলো, ভাগ, আমি হার্ডকোর বিপ্লবী, একটা প্রসটিটিউটের ঘরে রাত কাটাবো ?

বিপ্লবী বলেই তো বলতে পারলাম, বাজে সংস্থায় তোদের থাকার কথা নয়, জাসট একটু রাতটা কাটিয়ে আসবি।

কিন্তু ঝিল্লুর ঘরে ঢুকতে গেলে তো পয়সা লাগবে।

সে ভাবনা তোর কি ? কত আমার রোজগেরে লোক রে!

অবনী খেঁকিয়ে ওঠে, রোজগারের খোঁটা দিবি না। প্রেসিডেন্সি থেকে ফিজিকসে অনারস নিয়ে বি এস সি পাশ করে বেরিয়েছি, ইচ্ছে করলে এই বিদ্যেতে একটা চাকরি জুটিয়ে নেওয়াটা কোনো প্রবলেম হতো না।

সিতাংশু আর অবনী যখন পাড়ায় ঢুকল, তখন বেশ জমজমাট অবস্থা। কতগুলো পাঞ্জাবী ছেলে একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে, একে অপরের কাঁধে হাত দিয়ে অর্ধচন্দ্রাকার অবস্থায়। মুখে আঙুল পুরে সিটি দিচ্ছে। দু'এক কলি গান গাইছে। হাবভাব দেখলেই বোঝা যায় নেশাগ্রস্ত। পাঁচ ছ'টা মেয়ে ওদের সঙ্গে রঙ্গ রসিকতা করছে। সিতাংশু ওদিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, এর নাম র‍্যালা করা। এরা সব প্রসপেকটিভ খদ্দের এবং পয়সাওয়ালা। ওদের যে কাউকে হুক করতে পারলে একটা মেয়ের পুরো রাতের রোজগার হয়ে যাবে।

রাস্তার মধ্যে ছুটে এসে একটা মেয়ে সিতাংশুর হাতটা টেনে ধরল, সিতাংশুও চমকে ঘাড় ফেরাবার আগেই অবনী চেঁচিয়ে উঠল, এ্যাইও। সিতাংশু একটু হেসে বলল, কি রে বাসন্তী ?

শিউপূজন চটেছে, ওকে দেখলুম লাঠির বদলে একটা গুপ্তি নিয়ে ঘুরছে। কালিপুজোর প্যানডেল হচ্ছে যেখানে, সেখানে দাঁড়িয়েছিল।

সিতাংশু বলল, কিছু বলতে টলতে শুনলি ?

বলছিলতো কতকিছু। থানায় বোধহয় একটা ডাইরিও করেছে।

অবনী চোয়াল শক্ত করে বলল, শালার রোয়াব তো কম নয়। এ-ও করবে আবার চোখও রাঙাবে। তুই ভয় পাস না। ব্যাটাকে আমি টিট করব।

সিতাংশু অবনীর দিকে অদ্ভুতভাবে তাকালো। ওর দৃষ্টিতে স্নেহ আর কৌতুক মিলে মিশে রয়েছে। তুই আমাকে বাঁচালি অবনী, তুই যদি না আসতি তবে হয়তো যে ভাবেই হোক আমি এই বিজনেসে একদিন ফিট করে যেতাম। হয়তো একটু নড়বড় করতো, তবু টিকে থাকতাম। কিন্তু এই বাক্স বানানোর কাজ তো আমার ভালো লাগে না। এবার তোর দৌলতে একটু তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবো বলে মনে হচ্ছে।

অবনী গম্ভীর হয়ে বলল, আমি তোর খুব অসুবিধে করছি, না রে ? তুই এতটা ভয় পাবি জানলে আমি নিশ্চয় আসতাম না।

সিতাংশু একটা বড় করে শ্বাস ছাড়লো। ভয় কি আর সাধে পাই। আমার সব কাঁচাখেগো দেবতাদের নিয়ে কারবার। তবে তুই মন খারাপ করিস না। পয়সার অভাবে আমার ব্যবসা এমনিতেও লাটে উঠতো, অমনিতেও উঠবে।

সিতাংশু সিধে রাস্তাটা এড়িয়ে সরু একটা গলিতে ঢুকল। এখানেও মেয়েদের ঘরের সামনে একটা বড় মাপের র‍্যালা হচ্ছে। অবনী হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, দ্যাখ দ্যাখ মাইরি, মেয়েটাকে · অতজোর মারলে লাগবে না ?

মাসীগোছের একজন স্কার্টপরা একটা মেয়ের ওপর সপাসপ বেত চালাচ্ছে। বছর কুড়ির কালোকুলো চেহারার স্বাস্থ্যবান মেয়েটা রাস্তার ওপর পড়ে ছটফট করছে। বেতের ঘা পড়া মাত্র মেয়েটার শরীর কুঁকড়ে উঠছে। মেয়েটা গড়িয়ে নর্দমার কাছে চলে এল। খোলা চুলে কাদা লেগেছে। মেয়েটা জন্তুর মত গোঙাচ্ছে।

মেয়েটাকে ঘিরে ছোটখাটো জটলার সবাই বেশ হাসিমুখে সবকিছু দেখে যাচ্ছে। অবনী তেড়ে উঠল, মামদোবাজি নাকি ? এভাবে একটা মেয়েকে রাস্তায় ফেলে মারবে ? অবনী বোধহয় ছুটে গিয়ে বেত কেড়েই নিত যদি না সিতাংশু সময় মতো ওকে জাপটে ধরত, মেয়েটা স্বেচ্ছায় মার খাচ্ছে, সেটা দেখে বুঝছিস না ?

স্বেচ্ছায়। বলিস কিরে ? থাইয়ের কাছটা কেমন দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলে উঠেছে। মেয়েটা আলুথালুভাবে শুয়ে থাকায় খাটো স্কার্টের ভেতর থেকে ওর মসৃণ কালো উরু দুটো বেরিয়ে পড়েছে।

সিতাংশু বলল, তোরও তবে ঠিক জায়গা মতোই চোখ গেছে। আজ নিশ্চয় স্পেশাল কোন খদ্দের আছে। তাই স্পেশাল ট্রিটমেণ্ট। খদ্দেরটা ধরতে পারলে নিশ্চয় মাসী আর বোনঝির ট্যাঁক ভালোই ফুলবে। এখানে দাঁড়াস না, পা চালিয়ে চল।

অবনী বলল, কিন্তু ব্যাপারটাতো ঠিক বুঝলাম না। প্রকাশ্য রাস্তায় এভাবে একটা মেয়েকে·····

এটা একরকম পাবলিসিটি স্টাণ্ট। বড় রাস্তার ওপর হয় না। এ ধরনের গলি খুঁজিতে মাঝে মধ্যে দেখতে পাবি।

কিন্তু এরকম একটা বিভৎস দৃশ্য দেখে···অবনীর বিস্ময় আর কিছুতে কাটে না।

বিভৎস কি রে, দেখছিলি না, মার খেয়ে শরীরটা কেমন আহত সাপের মতন মোচড় খাচ্ছিল। তারপর শরীরের নরম জায়গায় বেতের দাগ···পুরোটাই অ্যাবনর্মাল সেক্সের ব্যাপার, কিন্তু সেটা ভাঙিয়েই তো এখানকার ব্যবসা।

কালীপুজোর প্যাণ্ডেলের সামনে শিউপূজন দাঁড়িয়ে আছে। তাকে এড়াবার জন্যই একটু ঘুরপথ ধরেছিল। উঠোনে ঢুকেই সফি কাপ্তানের সঙ্গে দেখা। সফি বাতাসের গায়ে ঠেস দিয়ে টাকা গুনছে। সিতাংশু দূর থেকে দেখেই বলল, কাপ্তান একেবারে বেদম খেয়েছে। সিতাংশু জাপটে ধরে বলল, কর কি কাপ্তান পড়ে যাবে যে। আমদানিটা ভালোই হয়েছে মনে হচ্ছে।

সফি একটা উচ্চাঙ্গের হাসি দিল, ঝিল্লু—ঝিল্লু—ঝিল্লু—কুচিলি—কুচিলি—কিট্টি—কিট্টি—। বাচ্চাদের গাল ধরে আদর করে যেমন

অর্থহীন শব্দ করে, সফি বাতাসকে সেভাবে আদর করলো। বেওসাটা বড় ভালো জমিয়েছো গো। ঝিল্লু রাণ্ডি কাণ্টার কর দেগা। হাম তুম এক কামরে বন্ধ হো অউর বৃপিয়া মিল যাব। সফি বেসুরো গানের সঙ্গে খিল খিল করে হেসে উঠল।

সিতাংশু দেখলো ঝিল্লুর ঘরের দরজাটা ভেজানো। দরজার সরু ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়েছে। ঝিল্লুর ঘরে লোক আছে ?

সফি বেশ ফূর্তির সঙ্গে বলল, মা দোকান বন্ধ করে দিয়েছি। ঝিল্লুকে আমি রেস্ট নিতে বলেছি।

কিন্তু বলরাম যে আজ রাতে ওর ঘরে থাকবে।

সফি অবনীর দিকে অবাক হয়ে তাকালো। যেন কোন পুরুষ মানুষের ঝিল্লুর ঘরে রাত কাটানোর ঘটনাটা খুবই আশ্চর্যজনক। সফি অবনীর গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, লাখ লাখ পেনিসিলিন নিতে হবে। ভদ্দর লোকের ছেলে কি পেনিসিলিন নেয় ?

সিতাংশু গম্ভীরভাবে বলল, খদ্দের লক্ষ্মী, তাকে পায়ে ঠেলতে নেই। ঝিল্লু খাটে শোবে, বলরাম মেঝেতে একটা বালিশ মাথায় দিয়ে পড়ে থাকবে।

সফি টলতে টলতে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, যা প্রাণ চায় করো। আমি শালা বাধা দেবার কে ?

ঝিল্লুর ঘরে দোর বন্ধ করার আগে অবনী একবার আর্তস্বরে বলে, তুইও আয় না। মেয়েটা কেমন পাগলের মত হাসছে।

সিতাংশু অবনীকে ভেতর দিকে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করার আগে বলে, সাবধানে থাকিস, কামড়ে দিতে পারে।— ওর হাসি দেখে ভয় পাস না, নেশা করেছে।

অবনী ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। ঘর থেকে ঝিল্লুর হাসির আওয়াজ আসছে। সিতাংশুর আওয়াজটা কেমন যেন ভুতুড়ে মনে হলো। একটা পেত্নী হাসছে। অবনীর রক্ত শুষে নেবে না তো ?

সিতাংশু আদি গঙ্গার দিকটায় গিয়ে দাঁড়াল। একটা সিগারেট ধরিয়ে বড় করে টান দিল। ব্যবসাটাকে কোনদিনই সে মুঠোর মধ্যে ধরতে পারেনি। কিন্তু যেটুকু লেগেছিল, এবার বোধহয় সে বাঁধনটুকুও কাটাতে হবে।

সিতাংশু হয়তো ওখানে আরো কিছুক্ষণ দাঁড়াতো, কিন্তু মশার বড় উপদ্রব। বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছিল না। তবু পায়ে পায়ে একসময় রাস্তায় এসে পড়ল, ঘড়িতে দেখলো এগারোটা বেজে গেছে, এ পাড়ার জমজমাট ভাবটা এখনো কাটেনি, আরো রাতে ঠাণ্ডা হবে। চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে ব'সে শিউপূজন, এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল সিতাংশু, কিন্তু তার আগেই শিউপূজন হাঁক দিল, আরে বাঙ্গালীবাবু একটুতো শুনেন।

সিতাংশু ভয়ে ভয়ে শিউপূজনের হাতের দিকে তাকালো। হাতে দেড়েক লম্বা সরু ছড়ির মতন একটা জিনিস. সিতাংশু ম্লান হাসলো বাড়ি যাচ্ছি, রাত হয়ে গেছে।

সিফ' পাঁচ মিনিটকে লিয়ে, একটু শুনেন। মগাই খাবেন ? মুখে দেবেন, ভেনিশ হয়ে যাবে, পান খেলেন বলে মালুমই হোবে না।

সিতাংশু গিয়ে পাশে বসলো। শিউপূজন পিঠে আদর করে একটা চাপড় মারল। বোলেন বাবু, বেওসা কেমন চলছে ? টাকা পয়সা লাগলে বোলবেন। ইনট্রেস্ট নিয়ে কুছু ভাবার নেই। আপনি ভদ্দর আদমি, বেঙ্কের রেট দিবেন।

সিতাংশু লোকটার মতলবটা বোঝার চেষ্টা করল। মুখে শুধু হেসে বলল, টাকার দরকার থাকলে জানাবো। আপনাদের ভরসাতেইতো কাজ করছি। শিউপূজন সুদখোর হলেও তোষামদে একটু কাজ হয়, সে কথাটা বুঝল সিতাংশু। শিউপূজন জোরে জোরে মাথা নেড়ে হাঁটুতে চাপড় দিয়ে খুশি খুশি ভাবটা প্রকাশ করল। আপনি বেশ ভালো। আপনার দোস্ত কে একটা এলো। ওর নামে আমি থানায় ডাইরি কোরে দিলাম। এক রোজ চা দোকান মে বোসেছিলাম ও হঠাৎ ছাতি ফুলিয়ে সামনে এসে বহুৎ গরম দেখালো। একদম ঝুটমুট। ও কে আছে ?

সিতাংশু বলল, আমার ব্যবসার ম্যানেজার। নতুন চাকরি।

সে সোব বোলতে হোবে না। নাম আছে বলরাম, আপনার

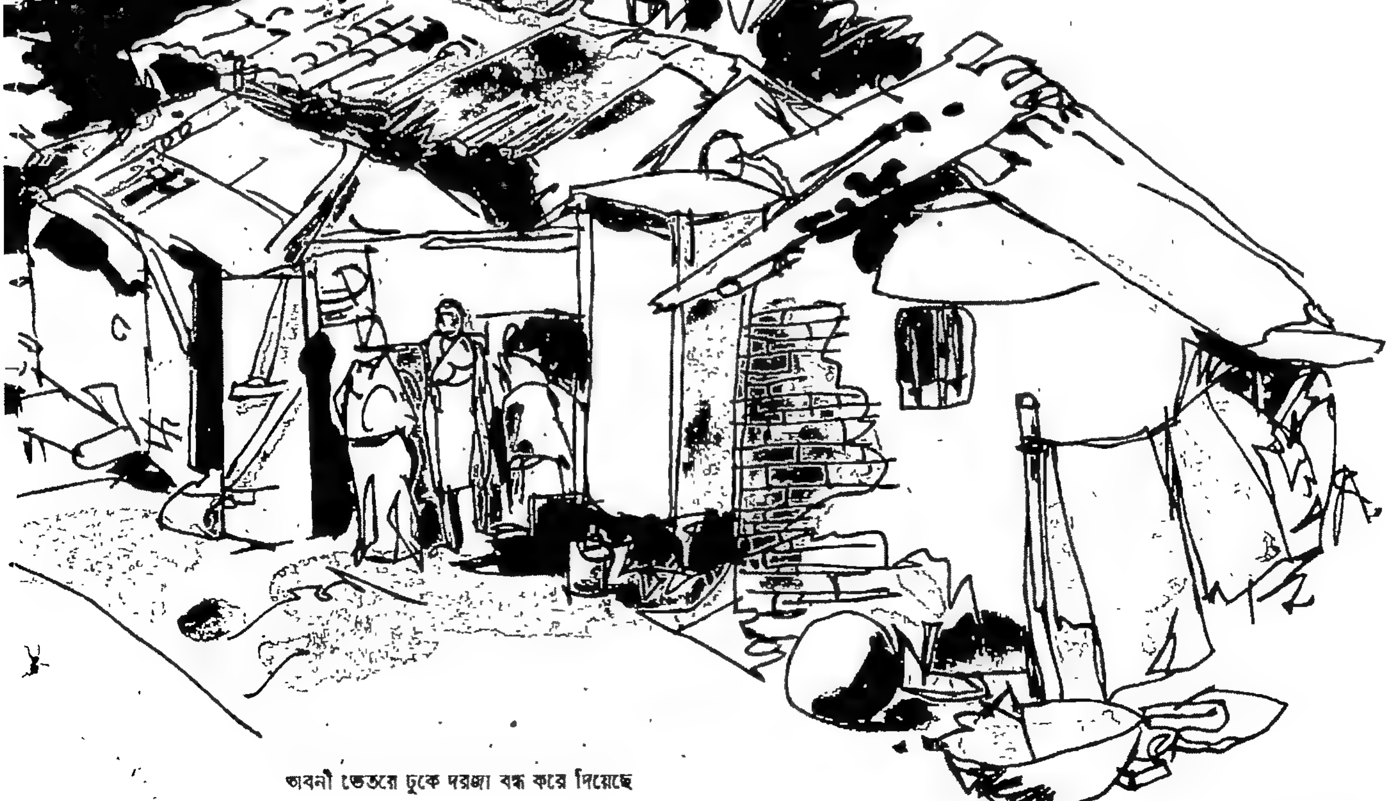

অবনী ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে

নোতুন সরকার। সোব কুছ জানি, লেকিন, ও কৌন?

সিতাংশু সতর্ক দৃষ্টিতে শিউপূজনকে একবার দেখে নিল। কে আবার? আমার বন্ধু।

বন্দুকআলা পলটিকসের বাবু নয় তো। যে ভাবে আমাকে ড'টলো।

সিতাংশু হাসির তোড়ে শিউপূজনের সন্দেহ উড়িয়ে দিতে চাইল। কি যে বলেন শেঠ, তেমন ছেলে হলে আমিই কি ভিড়তে দিতাম?

শিউপূজনকে শেঠ বলায়, সে আবার একটু খুশি হল, আপনি পড়া লিখা জানা লোক। আপনি ভালো কথা বোলেন, বলরায় শালা বহুৎ হারামি থানায় বোলে এসেছি বলরাম বাগী আছে।

শিউপূজন তার বিরাট ভুঁড়ি, ঝাঁকড়া গোঁফ নাচিয়ে হো হো করে হেসে উঠল। খিস্তিওয়ালা সিদ্ধি বা ভাঙের নেশা করেছে। চোখ দুটো কেমন স্বপ্নালু। কথায় খুব একটা জড়ানো ভাব নেই, তবু মনে হচ্ছে প্রতিটি শব্দ, অভিব্যক্তি অনেক গভীর থেকে উঠে আসছে। আজ রাতমে পুলিশ আসবে।

সিতাংশু ব্যস্ত হয়ে বলল, এই শেঠ জী, আপনি এ কী করলেন? বিপ্লবী শুনলেই পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে বেদম পেটাচ্ছে। বলরাম খুব ভালো ছেলে।

তা হোক, তো আমাকে ড'টলো কেনো। পিটলো কেনো?

আমি ওকে খুব বকে দেবো। আপনি পুলিশ আটকান। আপনার পুলিশের সঙ্গে অনেক দহরম মহরম।

ঠিক। পুলিশকে আমি মগাই খেতে ফি মাহিনা দোশো করে রুপিয়া দি। আমি পুলিশ আটকাবো. লেকিন আপনের দোস্ত আমার গোর পাকড়াবে তো?

সিতাংশু অবনীর কথা ভেবে একবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো। অবনীর বদলে সিতাংশু শিউপূজনের পা ধরতে রাজি আছে। কিন্তু তাতে কি কাজ হবে?

শিউপূজন উঠল, একটু টলমলে ভাব। সিতাংশু চায়ের দোকানের বেঞ্চের ওপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। লম্বা শরীরের পুরোটা বেঞ্চের ওপর আটেনা, পা দুটো অনেকটা করে বেরিয়ে রইল। কানের পাশে নানারকম শব্দ হচ্ছে। দু একটা রঙ্গ রসিকতা, হঠাৎ খিল খিল হাসিতে ফেটে পড়ছে। পর মুহূর্তেই খিস্তির ফোয়ারা' নিজেদের মধ্যে ঝগড়ার তীব্র আওয়াজ। হঠাৎ ঝড় এলে যেমন রাস্তার ধুলো পাক দিয়ে ওপরে ওঠে, সে ভাবে আওয়াজটা মাঝে মাঝে পাক দিয়ে ওপরে উঠছে যেন। যত রাত বাড়ে পাড়াটা পাগল হয়ে যায়। আবোল তাবোল লোকগুলোর ভিড় থাকে না তখন। শুধু যে খদ্দের, সে ছাড়া ফালতু ঝামেলা করার লোক নেই। মাইকে কোথায় উর্দুতে তীব্র স্বরে ভাষণ হচ্ছে। কোন মৌলবি ধর্মের কথা বলছেন। একটু আগে বেসুরো গলায় তিন চারটে অল্প বয়েসী ছেলে আল্লার মেহেরবানি নিয়ে গান করেছে। মিলাদ হচ্ছে আরো বেশি রাতে কাওয়ালি হবে হয়তো।

একটা ঘুগনিওয়ালা বিকট গলায় চিৎকার করছে, 'ল্লে-ল্লে-ল্লে খ্ খা—খ্ খা—এ্যাই ঘু'ইই'

একটা পাতলা স্টেপফ্রক পরা বেঁটেখাটো চেহারার খুকী সাজা যুবতী দুহাতে দুটো স্তন ধরে লাফাতে লাফাতে ঘুগনিওয়ালার ডাকের সঙ্গে তাল রেখে চেঁচাচ্ছে, 'ল্লে-ল্লে-ল্লে—খ্ খা—খ্ খা—খ্ খা—সিটটি। আর অমনি হাসির রোল উঠল। হাসির আওয়াজটা বাড়তে বাড়তে যেন সারা পাড়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। সিতাংশু কানের কাছে রক্ত হিম করা প্রেতিনীর অট্টহাসি শুনে ধড় করে উঠে পড়ল। আর অমনি মনে হল মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। সিতাংশুর বিনা মদেই নেশা হয়েছে।

সিতাংশুর পা টলছে। বার বার মুখে থুতু আসছে, বুক পেট জুড়ে কেমন একটা বমি-বমি অস্বস্তি। টালমাটাল পায়ে রাস্তা পেরোচ্ছিল সিতাংশু। আর ঠিক সে সময় তার কানে কানে কে যেন বলল, 'আপনিই সিতাংশু সরকার। আমরা অবনীর ফ্রেণ্ড, সে কোথায়?'

সিতাংশু কষ্ট করে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো, লুঙ্গি আর বুশশার্ট পরা দুটি ছেলে। সিতাংশু ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, কে অবনী, আমি চিনি না। দুজনের মধ্যে একজন বেশ লম্বা, ছিপছিপে চেহারা, সে ছেলেটি বলল, তবে বলরামকে চেনেন তো। তার সঙ্গে আমাদের খুব দরকার।

আমি জানি না সে কোথায়।

ফালতু ঝামেলা করবেন না। ব্যাপারটা খুব জরুরী।

আপনারা কি নকশাল?

চোপ শালা। ছেলে দুটো একসঙ্গে চাপা গলায় ধমক দিল।

স্যরি, স্যরি, আমার মাথাটা ঘুরছে। চোখে ঝাপসা দেখছি, বুদ্ধিটা ঘুঁটে গেছে। তা ওই অবনীকে আপনারা নিয়ে যান। ওর জন্য আমার বড় অশান্তি, আই হেট রেভ্যুলেশনারিজ। সবসময় মনে হয় একটা লাইভ ওয়্যার পাশে পাশে রয়েছে, একটু ছেঁকা লাগলেই অক্কা, একেবারে ফোরফরটি ভোল্ট।'

ফালতু বাত ছাড়ুন। ও এখন কোথায় শিগগির বলুন। ওর সঙ্গে দেখা করেই আমরা চলে যাব। বাজে বক বক করার সময় নেই।

সিতাংশু একটু কী ভাবল। ছেলে দুটোকে ভালো করে দেখার চেষ্টা করলো। তারপর কোন মীমাংসায় পৌঁছতে না পেরে, ভালোমন্দ না ভেবেই বলল, ও ঝিল্লুর ঘরে, ওই যে বন্ধ দরজাটা। ওকে আমি লুকিয়ে রেখেছি।

ছেলে দুটো নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া চাওয়ি করল, তারপর একসঙ্গে দুজন পাশাপাশি হেঁটে গিয়ে দরজায় গা লাগিয়ে দাঁড়ালো। তারপর কাঁধের কাছে দিয়ে অদ্ভুত ভাবে চাপ দিতেই হঠাৎ দরজাটা ঠাস করে খুলে গেল। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে দুটো টাল সামলাতে না পেরে একটু ভেতর দিকে ঝুঁকে পড়েছিল।

ঘরের মধ্যে লাল আলো জলছে, মৃদু লাল আলোয় কোন কিছু ঠিক ঠিক মতো বুঝে উঠতে সময় লাগলো। দুজনের মধ্যে একটি ছেলে চেঁচিয়ে উঠল, 'অবনী!' আর সে মুহূর্তে সিতাংশুকে খুব অবাক করে দিয়ে অবনী সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় ছিটকে বেরিয়ে এল। 'ধর শালাকে' বলে একটি ছেলে ঝাঁপিয়ে পড়ল অবনীর গায়ের ওপর। উলঙ্গ অবনী হাত জোড় করে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, ভাইরি তোরা আমার কথাটা শোন, আমাকে বিশ্বাস কর। আমি খারাপ কিছু করিনি। ঘরের ভেতরটা বড্ড গরম তাই—।

ঠিক আছে। তুই জামাপ্যান্ট পরে নে, তোকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। খুবই ঠাণ্ডা কঠিন গলা ছেলে দুটোর।

অবনীর হাত পা এত কাঁপছিল যে, জামাপ্যান্ট পরতে অনেকটা সময় লাগলো। যাওয়ার আগে অবনী সিতাংশুর দিকে একবার ফিরেও তাকালো না।

ঝিল্লুর ঘরের দরজাটা খোলা। ঝিল্লু তখনো খিল খিল করে হাসছে। নেশাটা একটু বেশি হয়ে গেছে ওর।

এই বাবু এটা কি রে? ঝিল্লু কি একটা কালো কালো জিনিস তুলে দেখালো।

সিতাংশু কৌতুহলী ঘরে ঢুকলো। এটা তো রিভলভার, কে রেখে গেল এখানে?

বলরাম। হি-হি-হি—ওর নাম বলরাম নয়, অবনী। ও নাকি দুটো লোককে খুন করেছে। আমি খুন করিনি, চুরি করেছি আগে যে বাবুর মেয়েছেলে ছিলাম তার বাড়ি থেকে। আশি টাকা আর একটা বিছে হার। ওকেও পুলুশ খুঁজছে, আমাকেও।

ঝিল্লুর হাত থেকে রিভলভারটা নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখল সিতাংশু। জিনিসটার কথা বহু শুনলেও হাতে নিয়ে দেখা এই প্রথম। মেড ইন ইউ এস এ, ঘোড়ার কাছটায় খুব ভয়ে ভয়ে হাত বোলালো। নলের ফাঁক দিয়ে গুলি আছে কিনা দেখার চেষ্টা করল। সিতাংশুর কেন জানি ধারণা ছিল গুলিগুলো নলের মধ্যে থাকে।

অবনী আমাকে অনেক পেয়ার করেছে, আমিও অবনীকে অনেক পেয়ার করেছি। অবনী আমার আবার বিয়ে দেবে বলেছে। হি-হি-হি। বেশ্যার আবার বিয়ে। গেতলের তামকুণ্ড, সোনার পাথর বাটি, কাঁঠালের আমসত্ত্ব।

সিতাংশু ভাবছিল এই রিভলভারটা ঝিল্লুর কাছে রাখা ঠিক হবে কি না। ঝিল্লু আমাকে একটু জল খাওয়া আর এটা আমার কাছে থাক। অবনী এলে আমি দিয়ে দেবো।

যা ইচ্ছে কর, ও দিয়ে আমি কি করবো। আমার খুব নেশা হয়েছে। কিস্তিওয়ালা আমাকে সবুজ সবুজ দুটো গুলি আর দানাদার খাইয়ে গেল। বড় নেশা হলো।

দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়। আমি বাড়ি যাচ্ছি।

আর ঠিক সে সময় ভারী জুতোর আওয়াজ উঠলো। দু-তিনজনের গলার আওয়াজ। কিস্তিওয়ালা চেঁচালো, আ বে ঝিল্লু, পেটিআলা বাঙালীবাবু কাঁহা রে? বুঝলেন বাবু ওকে পেলেই বাগীটার দেখা মিলবে।

সিতাংশু চট করে প্যান্টের পকেটে রিভলভারটা লুকোতে গেল। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে, কিস্তিওয়ালার সঙ্গে একটা গোঁফওয়ালা টেরিকটের পাঞ্জাবি পরা একটা লোক ঘরে ঢুকে পড়েছে। লোকটাকে দেখে পুলিশ বলে চিনে নিতে ভুল হয় না। সিতাংশুর হাতে রিভলভার দেখে লোকটা হঠাৎ দু পা পিছিয়ে গেল। মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা ভয়ের আওয়াজ করল। লোকটা ওর কোমরে হাত ছুঁইয়ে অসহায়ভাবে মাথা নাড়ল।

বাইরে থেকে আওয়াজ এলো, কি রে কি হলো?

চেয়ার আছে, সাবধান।

মুহূর্তমধ্যে সিতাংশু অনেক কিছু ভেবে নিল। ওরা অবনীর খোঁজে এলেও, সিতাংশুর হাতে যখন রিভলভার দেখেছে তখন ছেড়ে কথা কইবে না। প্রচণ্ড ডামাডোলের বাজার চলছে। পুলিশরা এখন নিজেদের ছায়াকেও ভয় পাচ্ছে। সিতাংশু দেখলো দরজার মুখ জুড়ে শিউপূজন আর পুলিশের ধুতি পাঞ্জাবী পরা লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। সিতাংশুর কর্তব্য স্থির করতে সময় লাগলো না। রিভলভারটা তাক করে ধরেও একবার বাঁদিকে তাকালো।

ঝিল্লু সন্ধ্যে থেকে হাসছিল। হাসিটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে। চুলের গুছি বুকের ওপর ঝোলানো। মেয়েটা অদ্ভুত এক থমথমে মুখে চেয়ে আছে। সিতাংশু বাঁ হাত বাড়িয়ে ঝিল্লুকে মৃদু আকর্ষণ করল। আর ঠিক সে মুহূর্তে একটা রিভলভার ধরা হাত বাইরে থেকে কিস্তিওয়ালার কাঁধের পাশ থেকে এগিয়ে এল। বাইরের পুলিশটা ঠিক মত তৈরি হয়েই এসেছে। সিতাংশু আর একটুও সময় না দিয়ে ট্রিগারে চাপ দিল। ঠিক কাকে বিদ্ধ করার জন্য ও গুলি চালিয়েছিল জানে না, কিন্তু গুলিটা গিয়ে লাগলো সবচেয়ে মোক্ষম জায়গায়। পুলিশের হাত থেকে রিভলভারটা ছিটকে পড়তেই অদ্ভুত দক্ষতায় ঝিল্লু সেটা কুড়িয়ে নিল।

গুলি লেগে একটা পুলিশ হাতের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। আর একটা পুলিশ একটু বিমূঢ় অবস্থায়। শিউপূজন ঝিল্লুর গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল। একেবারে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলিটা চালালো সিতাংশু।

খুব ভোরের ট্রেনে সিতাংশু আর ঝিল্লু পাশাপাশি বসে আছে। সিতাংশু খুব যত্ন করে বুকের মধ্যে রিভলভারটা রেখেছে। ঝিল্লু জিগ্যেস করল, কোথায় যাচ্ছি আমরা?

সিতাংশু বলল, জাহান্নমে।

ঝিল্লু খুব ব্যগ্র ভাবে বলল, আমায় একটা কিছু পার্মেন্ট ব্যবস্থা করে দেবে তো?

সিতাংশু হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল, সিকিউরিটি! মধ্যবিত্ত জীবনে তো কেবলই সিকিউরিটির হিসেব। এখন আমি সে সব কিছুর বাইরে এসে পড়েছি। একজনকে জখম করেছি, একটা খুন করেছি, বুকের মধ্যে রিভলভার। সিধে রাস্তার জীবনটাকে পেছনে ফেলে এসেছি। এখন আর ওসব সিকিউরিটির কথা ভাব না।

ঝিল্লু খুব অধীরভাবে বলল, কি সব বলছো, কিছু বুঝি না।

তোর বিয়ে হবে রে ঝিল্লু।

বিয়ে! কে করবে গো তুমি?

না হয় করলামই। একটা কিছু নিয়ে বাঁচতে হবে তো। ও জিনিসটা কোথায় রাখলি?

ঝিল্লু কোমরের কাছে হাত দিয়ে দেখালো। সিতাংশু হেসে বলল, আমার বুকের মধ্যে এখন অনেক সাহস। ঝিল্লুরে আমি এখন কাউকে ভয় পাই না। ঠিক একটা কাজকর্ম খুঁজে নিতে পারবো।

ঝিল্লু খুব দায়িত্বশীলভাবে বলল, গতর বেচে আমিও...

একটা ট্রেন সে সময় পাশ দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যাওয়ায় পুরো কথাটা সিতাংশু শুনতে পেলো না। তবে আন্দাজে বুঝে নিল। একটু ভাবলো, নিজের মধ্যে রি-অ্যাকশনটা যাচাই করার চেষ্টা করল। নাঃ তেমন কিছু মনে হচ্ছে না।

সমাপ্ত

সিতাংশু বাঁ হাত বাড়িয়ে ঝিল্লুকে মৃদু আকর্ষণ করল

দ্বিজেন্দ্রলালের 'আনন্দ-বিদায়' কি সত্যিই রবীন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করে লেখা ?

নীরদ হাজরা

বাংলা নাট্য-সাহিত্যের সবচেয়ে ধিক্কৃত প্রহসন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আনন্দ-বিদায়'। ঘরে পরে সকলেই তাকে ধিক্কার দিয়েছেন। সমকাল এবং একাল এ বিষয়ে একমত। যতই দিন যাচ্ছে, যতই বেশি করে আমরা রবীন্দ্র সাহিত্যের গূঢ় রসে পরিতৃপ্ত হচ্ছি, 'আনন্দ-বিদায়ে'র প্রতি ধিক্কারের তীব্রতা ততই বাড়ছে।

'কড়ি ও কোমলে'র কাল থেকেই রবীন্দ্রনাথকে তীব্র বিরোধিতার সামনে দাঁড়াতে হয়েছে। আসলে নতুন কাব্যরীতি নিয়ে আবির্ভূত হন যে কবি, কোনোদিনই তিনি সমকালে সামগ্রিক সমর্থন লাভ করেন না। তাই মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' কাব্যকে ব্যঙ্গ করে 'ছুছুন্দরী বধ' কাব্য রচিত হয়েছিল। এককালে বুদ্ধদেব বসুর নতুন কবিতাকে অশ্লীল বলে অস্পৃশ্য ঘোষণা করা হয়েছিল। জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে অশ্লীল ভেবে কলকাতার কোনো কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁকে চাকুরি-চ্যুত করেছিলেন। কিন্তু এসব কোনো কাব্যই যে ব্যঙ্গ করবার মত বা অস্পৃশ্য হবার মতো নয়, আজ আমরা তা জানি। আজ এ কথাও আমরা বুঝেছি যে, ঐসব কবি কথা-সাহিত্যিকেরা যে সমকালে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন, তার কারণ যতটা তাঁদের রচিত-সাহিত্য—তার চেয়ে বেশি সাহিত্যাদর্শ। প্রাচীন ও প্রতিষ্ঠিত আদর্শে অভ্যস্ত যে পাঠক নবীন আদর্শের মর্মভেদ করতে পারেননি, তার যাথার্থ্য বিচার করতে পারেননি, তাঁরাই বিরূপ সমালোচনা করেছেন, আক্রমণ করেছেন। এ জন্যও আমরা আক্রমণকারীকে দায়ী করব না। দায়ী তাঁদের অক্ষমতা - নতুনকে গ্রহণ করায় তাঁদের শক্তি-দীনতার—এককথায় তাঁদের মানসিক গোঁড়ামির।

প্রাচীন-কাব্য-রীতিতে অভ্যস্ত পাঠকের কাছে রবীন্দ্রনাথ সেকালে এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তাই তাঁকে বিরোধিতাও সইতে হয়েছে বিপুল। যে অনির্দেশ্য ভাব-ব্যাকুলতা এবং উচ্চ রোমান্টিকতার সঙ্গে সুগভীর দার্শনিকতার সম্মেলন রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশেষত্ব, যে সাহিত্যধারার তলায় তলায় আপাত দুর্লক্ষ্য এক বিকাশের ধারা বয়ে যায়, তা বাংলা সাহিত্যে ছিল অভূতপূর্ব, অনাস্বাদিত। একে বুঝবার সাধ্য কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের মতো মানুষের ছিল না। তাই তিনি রবীন্দ্রনাথকে শুধু 'পায়রা কবি' বলেই ক্ষান্ত হননি, প্রকারান্তরে 'বাঁদর' বলতেও তাঁর মুখে আটকায়নি।

কবি তুমি মানুষ বটে
হলে পায়রা, মাছ—
গেলে স্থলে, শূন্যে জলে
বাকি কেন গাছ ?

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল তো কালীপ্রসন্নের মতো সংস্কারান্ধ ছিলেন না। তিনি বিলেত-প্রত্যাগত আধুনিক মনের মানুষ। ইংরাজি সাহিত্যে তাঁর অধিকার কম ছিল না। তবু তিনিও রবীন্দ্রনাথকে ষোল আনা উপভোগ করতে পারলেন না। 'কাব্যের উপভোগ' প্রবন্ধে তিনি জানিয়েছেন, 'আমি…এইখানে বলিয়া রাখি যে, রবীন্দ্রবাবুর কাব্য আমি যেরূপ উপভোগ করি সেই চেলাগণ তাহার দশমাংশও করেন কিনা সন্দেহ।' একথা মিথ্যা নয় যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের সামান্যতম লেখাও সাগ্রহে পড়তেন এবং রবীন্দ্রপ্রতিভা যে তুলনারহিত এ বিশ্বাসও তাঁর অটল ছিল। তবু সেকালের রবীন্দ্র-বিরোধিতার প্রথম সারির মানুষ ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। সেকালের সুধীসমাজ রবিবাবু আর দ্বিজুবাবুর দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল।

এই রবীন্দ্র বিরোধিতার চূড়ান্ত পরিণতি 'আনন্দ-বিদায়'। রবীন্দ্রনাথকে বিদ্রূপ করেই প্রহসনটি রচিত হয়েছিল। কবিকে চূড়ান্তভাবে লাঞ্ছিত করতেই নাকি নাটক মঞ্চস্থ করবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একথা

জানিয়েছেন রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও রথীন্দ্রনাথ রায়। এমনকি দ্বিজেন্দ্র-বন্ধু ও জীবনীকার দেবকুমার রায়-চৌধুরী নাকি এই প্রহসন মঞ্চস্থ হতে দেখে স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলালকে বলেছিলেন, 'এতদিন পরে, এই আজ আপনি আত্মহত্যা করিলেন।'

কিন্তু খটকা বাধে যখন দেখি যে, এই নাটক প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভ্রাতা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। সাহিত্যিক ও দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গভীর বন্ধুত্বের কথা সুবিদিত। অমরেন্দ্রনাথ নিজেও একান্ত রবীন্দ্র স্নেহধন্য মানুষ ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের বহু নাটক সাধারণ মঞ্চে অভিনয় করবার অনুমতি গ্রহণ করেছিলেন। 'দালিয়া' গল্পটির নাট্যরূপ দিয়ে 'জীবনে-মরণে' নামে অভিনীত করেন। রবীন্দ্রনাথের অনুমতিক্রমে ঐ নাটকটি নিজের নামে মুদ্রিতও করেন অমরেন্দ্রনাথ। এই অমরেন্দ্রনাথ কি এত অকৃতজ্ঞ যে, সেই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হবে যে-প্রহসনে তা তিনিই পরিচালনা ও প্রযোজনা করবেন ?

ব্যাপারটা ধাঁধাঁ লাগাবার মতো। নাট্যশালার এই ইতিহাসের দিকে তাকাতে গিয়ে আর-এক গোলযোগ নজরে এল। হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত 'আনন্দ-বিদায়' মঞ্চস্থ হবার তারিখ জানিয়েছেন ১৬ ডিসেম্বর, ১৯১২। প্রভাত মুখোপাধ্যায় ইংরাজি তারিখের সঙ্গে বাংলা তারিখও জুড়ে দিয়েছেন, ১ পৌষ, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ। রথীন্দ্রনাথ রায় উল্লেখ করেছেন শুধু বঙ্গাব্দ, ১ পৌষ, ১৩১৯। শতবর্ষ পঞ্জিকা দেখতে গিয়ে বিপদ বাড়ল। ইংরাজী-বাংলা তারিখ দুটো একই দিনকে বোঝাচ্ছে বটে, কিন্তু দিনটা সোমবার। বাংলা সাধারণ মঞ্চে সোমবার অভিনয়ের দিন নয়। 'আর্ট-থিয়েটার' একসময় সপ্তাহে পাঁচদিন অভিনয়ের ,আয়োজন করেন। কিন্তু তাঁরাও বুধবার থেকে রবিবার পর্যন্ত অভিনয় আয়োজন করতেন। সোম-মঙ্গল থাকত বিরতি। বিধি-বিরুদ্ধ ভাবেই কি তবে 'আনন্দ-বিদায়' সোমবারে অভিনীত হয়েছিল ?

পুরানো পঞ্জিকার ফাইল ঘেঁটে রহস্যটি ধরা পড়ল। আসলে তারিখটা হবে ১৯১২ সালের ১৬ নভেম্বর, শনিবার। কোনো একজন গবেষক নভেম্বরের বদলে ডিসেম্বর লিখে ফেলেন। প্রভাতবাবু ঐ ইংরাজি তারিখকে

ধ্রুব বলে গ্রহণ করে ঐ অনুসারে বাংলা তারিখটাও যোগ করে দেন। রথীনবাবু আবার ইংরাজিটাকেও ত্যাগ করে সত্য থেকে আরও বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন। মূল উৎসের সন্ধান না করার ফলেই বার-তারিখের এ-গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। মনে হয় 'আনন্দ-বিদায়' প্রহসনটির প্রতি একটা বিতৃষ্ণার মনোভাবও এই অবহেলার অন্যতর কারণ।

এ 'প্রহসন'টি নিয়ে এমন বিচিত্র তথ্য-ঘটিত প্রহসনও কম নেই। যেমন দেখুন, দ্বিজেন্দ্র-জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরীর বর্ণনা পড়ে মনে হয় যে, ঐ তারিখে প্রহসনটি যথারীতি শেষ পর্যন্ত অভিনীত হয়েছিল। উনি দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে প্রহসনটি দেখে একই গাড়িতে বাড়ি ফিরেছিলেন। কিন্তু ১৩১৯ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য' পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় বীরবল (প্রমথ চৌধুরী) 'সাহিত্যে চাবুক' (৮০৭-৮১৫ পৃঃ) প্রবন্ধে লিখেছেন, 'সেদিন স্টার থিয়েটারে আনন্দ-বিদায়ের অভিনয় শেষে দক্ষযজ্ঞের অভিনয়ে পরিণত হয়েছিল শুনে দুঃখিত এবং লজ্জিত হলুম। ...স্টার থিয়েটারের বক্স হতে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র-লাল রায়কে গায়ের জোরে নামান সহজ, কিন্তু তিনি বঙ্গসাহিত্যে যে উচ্চ আসন লাভ করেছেন, বাহুবলে তাঁকে সেখান থেকে নামান অসম্ভব।'

বীরবলের এ বক্তব্য যদি সত্য হয় তবে দেবকুমার রায়চৌধুরীর বক্তব্যকে সত্য গোপনের দায়ে ফেলতে হয়। কাকে সত্য বলে গ্রহণ করব? আরও বেশি তথ্যের সন্ধানে প্রথমে 'সাহিত্যে'র পাতাই ওলটাতে লাগলাম। পরের মাসেই আর একটি প্রবন্ধের সন্ধান মিলল—'সাহিত্যে নৈতিক চাবুক' (১৩১৯ বঙ্গাব্দ, ফাল্গুন ৮৯৯—৯০৬ পৃ)। প্রবন্ধের লেখকও ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। রচনা-রীতি ও ভাষাভঙ্গি দেখলে স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা বলে সন্দেহ জাগে। স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলাল না হলেও তিনি যে একান্ত দ্বিজেন্দ্র-অনুগামী, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'সাহিত্যে চাবুক' প্রবন্ধে বীরবল দ্বিজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে যেসব কথা বলেছেন, আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক এক, দুই করে একে একে তার প্রত্যেক সূত্রের বিপক্ষে যুক্তি স্থাপন করে বক্তব্যকে খণ্ডন করেছেন। শুধু ঐ দ্বিজেন্দ্র-লাঞ্ছনার ব্যাপারে লেখক নীরব। কিন্তু কেন? তবে কি দ্বিজেন্দ্র-লাঞ্ছনার ব্যাপারটি সত্য? তবে কি দেবকুমারবাবু সত্যসত্যই সত্য-গোপনের চেষ্টা করেছেন? প্রবন্ধকারের পরিচয় জানা থাকলে আমাদের পক্ষে মঙ্গল হতো। কিন্তু প্রবন্ধকার প্রবন্ধ-শেষে নাম-গোপনের কারণ জানিয়েছেন, 'বীরবল মেঘের আড়াল হইতে বান মারিয়াছেন।

আমিই বা আত্মপ্রকাশ করিব কেন? অতএব তদুত্তরে আমার নাম রহিল—মেঘনাদ।'

যা হোক, মেঘনাদ প্রকারান্তরে বীরবলের দ্বিজেন্দ্র-লাঞ্ছনার সংবাদ মেনে নিয়েছেন। কিন্তু এ লাঞ্ছনার স্বরূপ কী? 'জ্যোতির্ময় রবি ও কালো মেঘের দল'-এর লেখক সুজিত-কুমার সেনগুপ্ত সূত্র উল্লেখ না করেই ঐ দিনের এক বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন।'...হলের মধ্যে সে কী হুজ্জুত! স্ক্রীন ছিঁড়লো, চেয়ারগুলো টুকরো টুকরো, 'আনন্দ-বিদায়' নাটকটিই সম্পূর্ণ পণ্ড হয়ে যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল দৌড়ে পালিয়ে যান...' (পৃ-১৫০)

আমার পরিধির মধ্যে যেসব দৈনিক পত্রিকা পেলাম, তারা এদিনের ঘটনাটি সম্পর্কে নীরব। কিন্তু স্টারের পরদিনের 'চন্দ্রশেখর' অভিনয়ের বিজ্ঞাপন যথারীতি প্রকাশ হতে দেখছি। তবে কি স্ক্রীন সত্যিই ছেঁড়েনি? চেয়ারগুলো সত্যিই টুকরো টুকরো হয়নি?

এ-রহস্যের ওপর হঠাৎ আলোর ঝলক ফেলল শিশিরকুমার বসুর 'ভগ্নদূত' পত্রিকা। পত্রিকার ১৩৬৬ সালের শারদীয়া সংখ্যায় মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'অতীত বন্ধুর বাস্তব রূপ' নামে এক প্রবন্ধে ঐ দিনের প্রায় একটি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন, 'থিয়েটারের কেউই ধারণাও করতে পারেননি যে, রবীন্দ্রনাথের ভক্তদের একটি বৃহৎ দল সুকৌশলে বিভিন্ন শ্রেণীর বহুসংখ্যক টিকিট আগে থেকেই কিনে নিয়ে প্রেক্ষাগৃহে এমনভাবে আসনগুলি দখল করে জাঁকিয়ে বসেছিলেন যে, একটা গোলযোগ উপস্থিত হলে, তাঁরাই সংখ্যাধিক্যে ও অবস্থিতির সুযোগ নিয়ে সমগ্র প্রেক্ষাগারকে নিয়ন্ত্রিত করতে সমর্থ হবেন। সে-সময় স্টার থিয়েটারের দ্বিতলে রয়েল বক্সের দুদিকে অর্ধচন্দ্রাকারে ড্রেস সার্কেল নামীয় উচ্চশ্রেণীর আসন, তারপরেই শ্রেণীবদ্ধ বক্স। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের সঙ্গে রয়েল বক্সে বসে অভিনয় দেখছিলেন। প্রথম অঙ্কটি নির্বিঘ্নে শেষ হলো, সমগ্র প্রেক্ষাগার স্তব্ধ। সে-স্তব্ধতা ভীষণ একটা ঝটিকার পূর্বে আকাশের নীরবতার মতই থমথমে অবস্থা। দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয় শুরু হবার কিছু পরে, সংগীতাচার্য কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় রূপক কৃষ্ণের ভূমিকায় মঞ্চে এসে রবীন্দ্রনাথের গানের একটি প্যারডি গীতিকণ্ঠে যেমন আরম্ভ করেছেন অমনি সমস্ত প্রেক্ষাগার আলোড়িত করে পূর্ব থেকে প্রস্তুত সংঘবদ্ধ দর্শকবৃন্দ মারমুখী হয়ে অভিনয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। বিশ্বকবি, জাতির গৌরব ও গর্ব রবীন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করে এই জঘন্য কুরুচিপূর্ণ কেতাবী ইতরামি করা হচ্ছে, বাঙালী ভাইবোনেরা তাই দেখবে। এত বড় অন্যায় আমরা সইবো না। বন্ধ কর, বন্ধ কর, নতুবা আমরা স্টেজে উঠে সব লণ্ড-ভণ্ড করে দেব—আগুন লাগাব মঞ্চে।'

'এইভাবে তর্জন তুলে শাসাতে লাগলেন পূর্ব থেকে প্রস্তুত দর্শকবৃন্দ এমন কৌশলে যে, মনে হলো—প্রেক্ষাগৃহের সমগ্র দর্শক একজোট হয়ে চিৎকার করছেন। বলাবাহুল্য, তখনি কর্তৃপক্ষ ড্রপ ফেলে দিলেন। সে-অবস্থায় অভিনয় চালানো সম্ভবপর নয়। হয়তো হাঙ্গামা এখানেই সমাপ্ত হতো—অভিনয় আরম্ভ করবার চেষ্টায় কর্তৃপক্ষ বিরত হলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রয়েল বক্স থেকে নাট্যকার স্বয়ং বক্সের রেলিং এ ভর দিয়ে তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ উত্তেজিত ভঙ্গিতে রুদ্ধ কণ্ঠে দর্শকদের অশিষ্টাচারের বিরুদ্ধে তিরস্কার করতেই আর এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হোল। ক্রুদ্ধ জনতা নাট্যকারের সুনাম-সম্মান উপেক্ষা করে তাঁর উদ্দেশ্যে নানারূপ অশিষ্ট মন্তব্য তো করলেনই, উপরন্তু ধৈর্য হারিয়ে অতি-উত্তেজিত একটি দল দোতলা অভিমুখে ধাওয়া করলেন শালীনতা ও শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করে। ব্যাপারটি উপলব্ধি করে অমরেন্দ্র-নাথই সেই অবস্থায় উপস্থিত-বুদ্ধি খাটিয়ে মঞ্চাধ্যক্ষ আশু পালিতের সহায়তায় একরকম জোর করে দ্বিজেন্দ্রলালকে মঞ্চের নিভৃত অংশে লুকিয়ে ফেললেন। কিন্তু উত্তেজিত দর্শকদের শান্ত করবার মতো (এই পর্যন্ত পত্রিকার ১৭ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে। পরবর্তী অংশ ১৮ পৃষ্ঠার ৪র্থ কলমে।) মনোবল কেউ দেখাতে সাহস পেলেন না। নট-নাট্যকার মনোমোহন গোস্বামী দ্বিজেন্দ্র-রচনার ভীষণ বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ এই অবস্থায় তাকেই বিপত্তারণ রূপে গ্রহণ করে মঞ্চে পাঠিয়ে দিলেন। গোস্বামীমশাই করলেন কী, অভিনেতার ভঙ্গীতে প্রথমেই তাঁর ভাষণ আরম্ভ করলেন—আপনারা শান্ত হয়ে আমার

কথা দয়া করে শুনুন। আমার প্রশ্ন এখন এই, যে কাণ্ড আজ ঘটল স্টারের মত প্রসিদ্ধ মঞ্চে—এর জন্য দায়ী অবশ্য নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল। কিন্তু এ-দ্বিজেন্দ্রলালকে আজ কারা নাট্যজগতের শীর্ষে তুলেছে বলুন তো? আপনারাই হ্যাঁ আপনারাই।……এইভাবে গৌরচন্দ্রিকা আরম্ভ করে গোস্বামীমশাই দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের দোষগুলিই অলংকৃত করে বলে যেতে লাগলেন একটার পর একটা করে। যেন জোঁকের মুখে নুন পড়লো। শুনতে শুনতে শান্ত হয়ে এলো ঝঞ্ঝার তাণ্ডব। দ্বিজেন্দ্রলালের নিন্দাবাদে তাঁরা আশ্বস্ত হলেন। কিন্তু 'আনন্দ-বিদায়' নাটিকাটির যবনিকা আর উঠল না।'

মণিলালবাবুর এই বক্তব্যের বর্ণনাকে না মানবার মত কোনো কারণ নেই। তবে তিনি রবীন্দ্রভক্তদের সংঘবদ্ধ ও সুপরিকল্পিত আক্রমণের যে-তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন তা খুব যৌক্তিক বলে মনে হয় না। ওটি মণিলাল-বাবুর অনুমান মাত্র। যদি তা না হয় তবে প্রশ্ন থেকে যায়ঃ হঠাৎ ঐদিনটিকেই বা রবীন্দ্র-ভক্তেরা বিদ্রোহ-প্রকাশের দিন বলে গ্রহণ করলেন কেন; আর সে-বিদ্রোহ এত সুপরি-কল্পিতই বা হলো কী করে?

আবার দেখুন, দেবকুমারবাবু 'দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থে লিখেছেন, 'আমাদের কাছেও কিছু না বলিয়া, আভাসে ও আমাকে কোন কিছু জানিতে না দিয়া, গোপনে এই সময় তিনি রবিবাবুর প্রতি প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচারণের জন্য যোগাড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়া দিলেন।……তিনি রবিবাবুকে ভীষণভাবে ও অতি অন্যায়রূপে আক্রমণ করিয়া 'আনন্দ-বিদায়' প্রহসনখানি সম্পূর্ণ করেন এবং বিন্দুমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র সেখানা একেবারে প্রকাশ্যে স্টার রঙ্গালয় নিয়ে অভিনয়ও করান হয়।' [পৃঃ ৪৪৪]

সত্যই যদি এত গোপনে এবং দ্রুত এই আয়োজন, তবে রবীন্দ্রভক্তেরা এত সংঘবদ্ধ আক্রমণের প্রস্তুতিই বা নিল কীভাবে? এক্ষেত্রেও দেবকুমারবাবুর বক্তব্যকে সত্যাশ্রয়ী বলা যাচ্ছে না। কারণ 'আনন্দ-বিদায়' প্রকৃতই এত গোপনে রচিত ও অভিনীত হয়নি। প্রহসনটি রচিত হয়েছিল অনেক আগে এবং সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী'তে তা প্রকাশিতও হয়েছিল। রবীন্দ্রজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় নিজেই একথা জানিয়েছেন।

এবার তাহলে আমাদের পুরানো প্রশ্নই জোরদার হলো। পূর্বেই যদি এ-প্রহসন প্রকাশিত হয়েছে তবে রবীন্দ্রভক্তেরা সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ না করে সেটা মঞ্চস্থ হওয়ার দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন কেন? তবে কি বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত 'আনন্দ-বিদায়' প্রহসনে রবীন্দ্র-বিরোধিতা ছিল না? রবীন্দ্র-বিরোধিতা কি মঞ্চে ব্যবহৃত সাঁটে ঢোকান হয়েছিল? তাই যদি হবে অমরেন্দ্র-নাথ এ-নাটক মঞ্চস্থ করতে গেলেন কেন? মঞ্চ-সংশ্লিষ্ট দ্বিজেন্দ্র বিরোধী মনোমোহন গোস্বামীই বা এ নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে আপত্তি করলেন না কেন? 'আনন্দ বিদায়' যদি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে 'কেতাবী ইতরামো'-ই হয় তবে এসব মানুষদের সব শুভবুদ্ধি কার প্রভাবে স্তব্ধ হয়েছিল? নাকি 'আনন্দ-বিদায়' বস্তুতই 'রবীন্দ্র-বিরোধী' প্রহসন নয়?

দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মূল বিরোধ কাব্যের স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা নিয়ে। দ্বিজেন্দ্রলাল স্পষ্টতাবাদী। ঐ দৃষ্টিভঙ্গিতে 'যেতে নাহি দিব' তিনি বোঝেন, আর তাই প্রশংসা করেন। কিন্তু 'সোনার তরী' তিনি বুঝতে পারেন না। 'কাব্যের অভিব্যক্তি' প্রবন্ধে স্পষ্টতাবাদী দৃষ্টিতে 'সোনার তরী' কবিতার যেসব বাস্তব বিচ্যুতির দৃষ্টান্ত তিনি তুলে ধরেছেন, তার জবাব দেওয়া মুস্কিল, বাস্তবের সঙ্গে চুলচেরা হিসাব মেলাতে গেলে এমন অসঙ্গতি দর্শান অসম্ভবও নয়, কিন্তু ওসব অসঙ্গতি যে সামগ্রিক কাব্য-ভাবনার ক্ষেত্রে নিতান্ত গৌণ ও অর্থহীন হয়ে যায়, এ-সাহিত্যাদর্শকে দ্বিজেন্দ্রলাল বুঝতে পারেননি। তাঁর মানসলোকে রোম্যানটিক কাব্যাদর্শ উজ্জ্বল ছিল। কোনো বাঙালী কবি যে তাকে অতিক্রম করে আরও এক মহত্তর কাব্যাদর্শ সৃষ্টি করতে পারে, এ-প্রত্যয় তাঁর ছিল না। শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থের মাপে রবীন্দ্রনাথকে বিচার করতে গিয়েই ভ্রমে পতিত হয়েছেন দ্বিজেন্দ্রলাল। এই কারণেই তাঁকে ক্ষোভের সঙ্গে বলতে হয়েছে 'পরের ভাষায় পরের দেশের প্রায় সর্বাপেক্ষা কবির দুর্বোধ্য প্রায় সর্বাপেক্ষা দুর্বোধ্য কবিতা বুঝিতে পারি, কিন্তু আমার মাতৃভাষায় আমার বাঙালী ভ্রাতার কবিতা বুঝিতে গলদঘর্ম হইতে হয়।'

তবু দ্বিজেন্দ্রলালের রবীন্দ্রবিরোধের মধ্যে একটা ভারসাম্য ছিল। তিনি যা সৎ ভেবে-ছেন, তারই প্রতিষ্ঠার জন্য এ-বিরোধিতা। তাই এ-বিরোধিতা সার্বিক নয়। তিনি রবীন্দ্রনাথের সেটুকুই আপত্তি করেন, যেটুকু তাঁর অনুভব-শক্তির কাছে দুর্বোধ্য। তাঁর আরও আক্রমণ অক্ষম রবীন্দ্র-অনুকারকদের প্রতি। দ্বিজেন্দ্রলাল সংহার-মূর্তিতে আক্রমণ করেছিলেন ঐ অনধিকারীদের। 'আনন্দ-বিদায়' প্রহসনে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রভক্তির নামে যেসব ব্যক্তি রবীন্দ্রানুকরণের ভণ্ডামি করে, তাদেরই বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছেন। 'জ্যোতির্ময় রবি ও কালো মেঘের দল' বইয়ের লেখক 'আনন্দ-বিদায়ে'র যে-চরিত্রকে রবীন্দ্রভক্ত বলে গ্রহণ করেছেন আসলে তিনি এমনই একজন ভক্ত। সেই ভক্ত রবীন্দ্রানুকরণের নামে যা করেন তা স্বভাবগুণেই ক্যারিকেচার হয়ে দাঁড়ায়। এমন ভণ্ডামিকে যদি অন্য কোন চরিত্র (দণ্ডধারী) নিম কি পেয়ারা কি হরি-তকির আছোলা ডাল দিয়ে পেটাতে যান তবে তাকে নিরপেক্ষ দর্শক নিশ্চয়ই অশোভন ভাববেন না।

আসলে 'রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র' বিরোধের পট-ভূমি থেকে সরিয়ে 'আনন্দ-বিদায়'কে আমরা কখনই বিচার করিনি। গ্রন্থ রচনায় সত্তর বছরেরও বেশি কাল পরেও কি আমরা প্রহসনটিকে একবার নির্মোহ দৃষ্টিতে বিচার করতে পারি না? সেকালে স্টার মনো-মোহন মিনার্ভা মঞ্চে যেসব প্রহসন অভিনীত হয়েছে 'আনন্দ-বিদায়'কে তাদের পাশে রেখে বিচার করাই কি যথার্থ বিচার নয়? 'বুঝলে কিনা' এবং 'কিছু কিছু বুঝি' থেকে 'দাদা ও আমি' 'গাধা ও তুমি', 'চোরের উপর বাট-পাড়ি', 'যেমন কর্ম তেমনি ফল', ভাগের মা গঙ্গা পায় না', 'ষণ্ড', 'ঘটক বিদায়', 'বক্কেশ্বর', 'ষোল কড়াই কানা', 'বুড়ো বাঁদর', 'যেমন রোগ তেমন রোজা', 'বেহদ্দ বেহায়া', 'কলির প্রহ্লাদ', 'লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র', 'ঘোষের পো', 'টাটকা-টোটকা', 'পয়জারে পাজী', 'ভোট-ভেল্কি', 'সম্মতি-সংকট', 'বাবু' 'তাজ্জব ব্যাপার', 'গ্রাম্য বিভ্রাট', 'শাবাশ আটাশ', 'কৃপণের ধন', 'বেজায় আওয়াজ', 'বেকুবের একজাই', যা স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত ও প্রযোজিত 'কাজের খতম', 'মজা', 'থিয়েটার', 'চাবুক', 'গুপ্ত কথা', 'ভক্ত বিটেল', 'ঘু ঘু' 'আহামরি' ইত্যাদি যেসব প্রহসন সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠারও আগে থেকে অভিনীত হয়ে আসছিল 'আনন্দ-বিদায়' কি তাদের থেকে ধারা-বিচ্যুত? দ্বিজেন্দ্রলালকে ষোল আনা প্লেরাইট বলা যায় না জানি, তবু তিনি মঞ্চ-সংশ্লিষ্ট ও প্রভাবিত নাট্যকার ছিলেন। তাই তাঁর প্রহসন 'আনন্দ-বিদায়' মঞ্চ-সফল প্রহসনগুলির ধারাবাহিক সন্তান হওয়াই স্বাভাবিক। আবার এটি অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'নন্দ বিদায়' (এমারেল্ডে ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে ২১ জুলাই, শনিবার প্রথম অভিনীত) গীতিনাট্যের প্যারডিও বটে।

এই প্রহসনের কোনো কাহিনী নেই বলে মন্তব্য করেছেন বেশিরভাগ সমালোচক। কিন্তু এ বক্তব্য সত্য নয়। এর কাহিনীকে দ্বিজেন্দ্রলাল অনেকটা পৌরাণিক কৃষ্ণকাহিনীর ছাঁচে ফেলেছেন। নন্দ-পুত্র কৃষ্ণ যেমন রাজধানী মথুরা থেকে অনেক দূরে ব্রজে রাধা-লীলা নিয়ে কালাতিপাত করছিলেন, আলোচ্য

প্রহসনের নায়ক আনন্দ-পুত্র নেপালও তেমন কাব্য-রচনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন চাটগাঁয়। কৃষ্ণের প্রণয়িনী ছিলেন তাঁর মাতুলানী রাধা. আর এ-প্রহসনে নেপালের কাব্যবিমুগ্ধা হলেন তারই দাদু মুন্সেফসাহেব দণ্ডধারীর দ্বিতীয় পক্ষের বৌ মল্লিকা। দ্বিজেন্দ্রলাল মল্লিকাকে নেপালের দিদিমা বানিয়ে এবং কাব্য-প্রেমিকা সাজিয়ে অসামাজিকতার দায় থেকে রক্ষা করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত একে দিদিমা-নাতির রসিকতা, যদিও মাত্রাতিরিক্ত রসিকতা, বলে মন্তব্য করেছেন। যা হোক, নেপাল রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে কাব্য-রচনা করে বিখ্যাত হতে চায়। সেই সঙ্গে সে গীতিনাট্য রচনা করেও অভিনয় করাবার আয়োজন করে ঠাকুরবাড়ির অনুকরণে। নেপালের বাবা আনন্দ এ ব্যাপারে অর্থব্যয়ে অকুণ্ঠ। কিন্তু ছেলের চাল-চলনের বদল চান। নেপালের অনেক কিছুতেই বিকৃতি আছে বটে, কিন্তু সে অসং-চরিত্র নয়। সব শুনে দাদু মুন্সেফসাহেব আছোলা ডাল দিয়ে পেটাবার পূর্বোক্ত ওষুধ বাতলে দেন। এদিকে নেপালের গীতাভিনয় কেউ ভাল বলেন, কেউ বলেন মন্দ। মুন্সেফসাহেব তাঁর স্ত্রীর খোঁজে এসে নারীবেশী নেপালকে মল্লিকাভ্রমে কয়েক ঘা বাড়ি কষান। যন্ত্রণায় নেপাল ন্যাকামি-ত্যাগের প্রতিজ্ঞা করে।

এদিকে হংসরাজ (রাজা কংসের কথা মনে পড়ে) নামের এক পত্রিকা-সম্পাদক নেপালের কাব্যশক্তিতে ভীত হয়ে তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে। বক্কেশ্বর (অক্রূর) সেই আহ্বান জানাতে আসে চাটগাঁয়। সকলকে কাঁদিয়ে নেপাল আসে কলকাতায়। কিন্তু বিরাট ভক্তদল নিয়ে নেপালকে প্রবেশ করতে দেখেই হংসরাজ পালান। নেপালের ভক্তদল তার জয়গাথা গাইতে থাকে।

চাটগাঁয় বিরহে মল্লিকার খিদে গেছে বেড়ে। এই খাচ্ছেন, আবার খিদে। সঙ্গে মূর্ছাও আছে। কোনো-কিছুতেই উপশম হচ্ছে না এ-রোগের। অতএব নেপালকে ফিরিয়ে আনতে স্বয়ং আনন্দ গেলেন কল-কাতায়। শেষ পর্যন্ত নেপাল ফিরে এল। সব ভুল বোঝাবুঝির অবসান হলো। সকলে মিলে নেপালকে চুন-কালি মাখিয়ে তার বিকৃতির সাজা দিল। এখানেই কাহিনী শেষ।

এ-নাটকে বহু গান ও কবিতাই নেপাল তাঁর অক্ষম শক্তি দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান ও কবিতার অনুকরণ করেছে! এই অক্ষম অনুকরণগুলি বিরোধ-বিমুক্ত পটভূমিতে বিচার করলে আনন্দ-দায়ক, যেমন আনন্দদায়ক মাইকেলী মেঘনাদবধের সত্যেন্দ্রনাথকৃত প্যারডি 'অম্বল-সম্বরাকাব্য'। আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথের 'দুই-পাখি'র প্যারডিটি তুলে দিলাম :

পথের লোক বলে চলিছি চলিছিই—
পথে যে ভয়নোক কাদা ;
বাড়ির লোক বলে ঘরেতে বসে থাক
কেমন আরামটি দাদা।
পথের লোক বলে উহুহু মরি মরি
গরমে গেল গেল প্রাণ ;
বাড়ির লোক বলে আহাহা কি আরাম
টানরে টানা পাখা টান।

নেপালের রঙ্গ দেখে বিক্ষুব্ধ মুন্সেফ দণ্ড-ধারী বলছেন, 'তোমার কবিগুরু যদি জানতেন —এঁ্যা এঁ্যা-যে চাটগাঁয় একটি ছাত্র তাঁর লেখা পড়ে এতদূর উচ্ছন্নে গিয়েছে তা হলে—এঁ্যা এঁ্যা—তিনি একটা খুব কঠিন রকমের প্রায়শ্চিত্ত করতেন। তুমি তোমার কবিগুরুর ভাল কবিতাগুলি মুখস্থ না করে যেগুলি ওঁচা পদ্য তাই মুখস্থ করে রেখেছো দাদা ?'

দ্বিজেন্দ্রলালের দুর্ভাগ্য এই যে, কোনো সমালোচকই গ্রন্থটিকে বিরোধের পটভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলেন না। দেখলেন না যে, কালের সংখ্যাতীত মঞ্চ-সফল প্রহসনের পরিপ্রেক্ষিতে। দণ্ডধারীর মন্তব্য এবং দ্বিজেন্দ্রলালের রবীন্দ্রবিরোধী প্রবন্ধগুলির মূল সুরে কোনো পার্থক্য নেই। এখানেও আক্রমণের লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথ নন, রবীন্দ্রনাথের অক্ষম অনুকারকেরা।

মনে হয়, সমস্ত ঘটনাকে ধীরভাবে বিচার করলে 'আনন্দ-বিদায়'-কে মহৎ রচনা না বলতে পারি, অন্তত অনন্তকাল ঘরে বাইরে এত ধিক্কারের হাত থেকে দ্বিজেন্দ্র-লালকে অব্যাহতি দিতে পারব।

□

নিয়মাবলী

যাঁরা লেখা পাঠাবেন

- সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ সাদরে গৃহীত হবে।
- হালকা নিবন্ধ দু'হাজার শব্দের মধ্যে এবং প্রবন্ধ সাড়ে তিনহাজার শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- সব রচনাই চলিত ভাষায় লিখতে হবে।
- তরুণ লেখকদের কবিতা, গল্প, হাসির গল্প ও রসরচনা সাদরে গৃহীত হবে।
- প্রয়োজনবোধে লেখা সংক্ষেপ করা কিংবা পরিমার্জনের অধিকার সম্পাদকীয় দফতরের থাকবে। কোনো লেখকের সে বিষয়ে আপত্তি থাকলে স্পষ্ট করে জানাবেন।
- লেখা ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় বামদিকে মার্জিন রেখে কালিতে লিখবেন।
- লেখার শেষ পৃষ্ঠায় পুরো নাম-ঠিকানা-দিতে ভুলবেন না। পুরো ঠিকানা দেওয়া না থাকলে লেখা বাতিল করা হবে।
- পোস্টকার্ডে অথবা ইনল্যান্ডে পাঠানো লেখা বা চিঠি ছাপা হয় না বা সে সম্পর্কে কোনো মতামত জানানো হয় না।
- লেখা কপি রেখে পাঠাবেন। আমাদের পক্ষে কোনো লেখা ফেরত দেওয়া বা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়।
- লেখা সম্পর্কে মতামত জানার জন্য জবাবী খাম, পোসটকারড বা ডাকটিকিট পাঠানোর দরকার নেই। লেখা মনোনীত হলে কিংবা বিবেচনাধীন থাকলে আমরাই চিঠি দেব এক মাসের মধ্যে। তবে অমনোনীত কবিতা এবং গল্প সম্পর্কে কোনো চিঠি দেওয়া হয় না।
- বিবেচনাধীন বা মনোনীত লেখা কবে কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হবে সে সম্পর্কে কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব নয়।
- একই লেখা 'শিলাদিত্য' এবং অন্যত্র পাঠালে দয়া করে সে কথাটা আমাদের জানিয়ে দেবেন।
- লেখা পাঠাবার ঠিকানা : সম্পাদক, শিলাদিত্য। ইত্যাদি প্রকাশনী (প্রাইভেট) লিমিটেড। ৪৭ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭২।

গ্রাহকদের প্রতি

- শিলাদিত্য প্রতি ইংরেজি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হচ্ছে।
- কাগজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য শিলাদিত্য অকটোবর সংখ্যা থেকে তিন টাকার পরিবর্তে সাড়ে তিন টাকা করা হয়েছে। তবে গ্রাহকদের কাছে সুখবর ষান্মাসিক এবং বার্ষিক চাঁদার হার বাড়ছে না। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৩০ টাকা, ষান্মাসিক ১৫ টাকা। বিশেষ সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে না।
- পত্রিকা আনডার সার্টিফিকেট অব পোস্টিং-এ পাঠান হবে। ডাক খরচ আমাদের। তবে ডাকের গোলমালে পত্রিকা না পেলে আমরা দায়ী থাকব না।
- নিশ্চিত প্রাপ্তির জন্য রেজেস্ট্রি ডাকে নিলে ভালো হয়। তার জন্য বার্ষিক ৩০ টাকা / ষান্মাসিক ১৫ টাকা অতিরিক্ত দিতে হবে।
- গ্রাহক হবার জন্য মনিঅর্ডার, ব্যাংকড্রাফট পাঠাবার ঠিকানা : সার্কুলেশন ম্যানেজার। ইত্যাদি প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড। ৭, ইনডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা-১৩, ফোন : ২৪-৮৬৮১।

দুষ্ট গান্ধর্ব

মতো বাছাবাছির কাজটা অনায়াসে করে নিতে পেরেছেন। সঙ্গিনীরা তাদের মর্জি মতো চলেছেন—কিন্তু চিত্রকর জর্জ রোমনির বরাতটা এত ভাল ছিল না।

১৭৮৩ সালে রোমনির বয়েস যখন ঊনপঞ্চাশ—এমার আঠারো, তখনই রোমনি হঠাৎ যেন শরীর সম্পর্কে সচেতন হলেন। একুশ বছর আগে, গ্রামের বাড়িতে বউ বাচ্চাদের রেখে রোমনি এসেছিলেন লণ্ডনে। উদ্দেশ্য ছিল ছবি এঁকে ভাগ্য পরিবর্তন। ইতালিতে কিছুদিন পড়াশোনার পর তিনি

শিল্প সমালোচক ও ঐতিহাসিকেরা এমাকে কোনদিন ভাল চোখে দেখেননি। ফলে, রোমনিকেও কড়া-পাক অনেক কথা হজম করতে হয়েছে। আর এইচ উইলনেস্কি রোমনি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন : 'কবিতায় ব্লেক যা করেছেন রোমনি লেডি হ্যামিলটনের সুন্দর শরীর ও লাল ঠোঁট এঁকে তাই করতে গিয়ে দুর্বল-মননের এক ন্যুরোটিকে পরিণত হয়েছেন।' আর সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এত করেও রোমনি কিন্তু এমাকে জয় করতে পারেননি। কেন না, এমা বিশ বছর বয়সেই

মৃত্যুর সময়েও যাদের হাতে আয়না

ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী

পৃথিবীবিখ্যাত অনেক শিল্পী বা ভাস্করের প্রেরণা ও উন্মেষে নেপথ্যনায়িকা ছিলেন একাধিক সুন্দরীতমা। গালা, ফ্রাঁসোয়া, ওলগা, মারি থেরেসে, এমা, পলিন নামের সেইসব শরীরিণীরা আজ নেই। কিন্তু রয়ে গেছে তাদের শিল্পিত প্রতিভাস মিউজিয়াম ও শিল্প সংগ্রহশালায়। পিকাসো ও সালভাদর ডালির তুলিতে, আন্তোনিও কালেভার ভাস্কর্যে, রোমনির বর্ণময় সৃষ্টির চমৎকারিতায়, নেলসনের বীরত্বের পশ্চাৎপটে কোন কোন মোহময়ী জাগিয়েছিল প্রেরণা? সম্পর্কের প্রারম্ভ যার কামে তার পরিণতি সুন্দরের শৈল্পিক বন্ধনে। সর্বাধুনিক তথ্যসম্বলিত, সৃজন ও যৌবনের করুণরঙিন উন্মোচন।

এই যুগের সর্বাধিক বিতর্কিত শিল্পী. সুররিয়ালিস্ট আন্দোলনের অন্যতম নেতা সালভাদর ডালির স্ত্রী গালা—প্রথমে ছিলেন কবি পল এলুয়ারের স্ত্রী। অথচ গালার শরীরী স্রোতে অবগাহন করে ডালি 'চিরকালের নারী'কে খুঁজে পেয়েছিলেন।

সালভাদর ডালির 'আধ্যাত্মিক পিতা' পিকাসো। সেই বিশ্বখ্যাত পিকাসো সম্বন্ধে জানা যায়।

'পিকাসোর একমাত্র শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে থাকলেও ফ্রাঁসোয়া হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করল ওলগা, মারি থেরেসে ও ডোরা মার প্রত্যেকেই পিকাসোকে ভাগ করে নিয়েছে।

'সাউথ অব ফ্রান্সের বসন্ত উত্তপ্ত জীবন্ত হয়ে উঠত ওলগার গালাগালের চোটে। ফ্রাঁসোয়া আর পিকাসোর প্রতিটি পদক্ষেপে বৃষ্টির মতো এই গালাগাল বর্ষিত হত।

'প্যারির প্রতিটি বৃহস্পতি আর রবিবার আলাদা থাকত মারি থেরেসে আর ডোরা মার জন্যে। অনেক সময় ডোরার সঙ্গে খানাপিনা করতে গেলে ফ্রাঁসোয়াকে তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতেন—যাতে দু জনের মধ্যে ভাব হয়।

এই বোধহয় একটি পথ যেখানে কার্ল মার্কস ও সিগমুণ্ড ফ্রয়েড নিজেদের মধ্যে বেশ খানিকটা হাতাহাতি করতে পারতেন! পিকাসো ও ডালি এ যুগের—কাজেই নিজস্ব ব্যাপারে খুব একটা অসুবিধে হয়নি, খুশি

যখন আবার লণ্ডনে এলেন—তখন যশুয়া রেনলডাসের মতোই চিত্রকর হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে ফেলেছেন। এমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরই তিনি তাকে মডেল করে আঁকলেন ডেনাস, সার্সি, ম্যারি ম্যাগডালেন, কাসান্দ্রা. জোন অব আর্ক। এমাই ছিল রোমনির প্রেরণা—যাবতীয় সৌন্দর্যের একমাত্র প্রতীক, অবচেতন মানসিকতার একান্ত নিরাপত্তা। মৃত্যুর তিন বছর আগে, বিষণ্ণ ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত গ্রামে তাঁর স্ত্রী পুত্রের কাছে ফিরে গিয়েছিলেন সাঁইত্রিশ বছর পর।

এমার অসাধারণ জনপ্রিয়তা থাকলেও

রোমনির আঁকা লেডি হ্যামিলটন

অন্য এক প্রান্তরে চোখ ফিরিয়েছিল। কারণটা রহস্যময় নয়।

এমা হ্যামিলটন, মারিয়া ওয়েকসকা ও পলিন বোনাপার্ট—তিন দেশের তিন কন্যা হলেও দুটি বিষয় ছিল চারিত্রিক। তিনজনেই ছিলেন ইতিহাসের একই যুগের যোগসাজস—বিশ্বাসহন্ত্রী স্ত্রী। আঠারো শতাব্দীর স্বেচ্ছাচারিনীদের মধ্যে তিনজনই ছিলেন বেশ বর্ণাঢ্য।

১৭৯৩ সালে লর্ড নেলসন এমা হ্যামিলটনের প্রেমে পড়েন ও বিশ্ব সংসার ভুলে যান। এমাকে ভালবাসেনি—অন্তত মনে মনে—এমন লোক সে যুগে কম। তার দীর্ঘ সমৃদ্ধ চেহারা, কালো চুল, ধূসর চোখ, এক জোড়া আমন্ত্রণে ভরা ঠোঁট দেখে গ্যেটে লিখেছেন : 'অপূর্ব সুন্দরী'। স্যার গিলবার্ট এলিঅট লিখেছেন : 'তুলনাহীন।' গেনসবরো, রেনলডস ও লরেন্স এমার ছবি ক্যানভাসে এঁকে তাঁকে অমর করে দিয়েছেন।

১৭৬৫ সালের মে মাসে এমার জন্ম চেশায়ারে। বাবা ছিলেন কামার। এমার বাচ্চা বয়েসেই বাবা মারা যান। তের বছর বয়েস থেকে একজন চিকিৎসকের পরিবারে কাজ করার পর এমা পর্যায়ক্রমে কেরানি, গৃহসেবিকা, একজন ধনী মহিলার সঙ্গিনী ও শেষে এক ব্যবসায়ীর কাছে চাকরি করে। এখানেই বোধহয় এমা সহসা নিজের শক্তি আবিষ্কার করে ফেলে।

এমার অসংখ্য তুতো ভাইদের একজনকে যুদ্ধ জাহাজে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। এমার সেই ভাইয়ের বউ এমাকে সাহায্য করতে বলল যাতে শ্রীমানকে আর জাহাজে কাজ করতে না হয়। এমা গেলেন জাহাজের ক্যাপটেন জন উইলেট পেইনের সঙ্গে দেখা করতে। ক্যাপটেন সাহেব এমাকে দেখেই সরাসরি প্রস্তাব দিলেন : তুমি যদি আমার কাছে থাকো—তাহলে তোমার ভাইকে ছেড়ে দিতে পারি।

এক সপ্তাহের মধ্যে সেই ভাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

শরীরটা দিয়ে কাজ করা যায়, করানো,

যায় এটা বুঝতে পেরেই এমা আর্লিংটন স্ট্রিটের এক শরীর বিপণিতে যোগ দিলেন, তারপরই ডাক্তার জেমস গ্রেহামের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। ডাক্তার গ্রেহাম ম্যাসাজ পার্লার চালাতেন লণ্ডনে —'নবযৌবনের ওষুধ' হিসেবে ম্যাসাজের শেষে এক 'নগ্ন ঈশ্বরী'কে উপহার দিতেন উপযুক্ত দক্ষিণার বিনিময়ে! এমাই এই নগ্ন ঈশ্বরীরূপে দেখা দিতেন। লণ্ডন শহরের কেতাদুরস্ত যুবারা ছুটত নগ্ন এই ঈশ্বরীর কৃপার জন্যে। এদের মধ্যেই একজন স্যার হ্যারি ফেদারস্টোন-হগ এমাকে গ্রেহামের শরীর বিপণি থেকে বের করে এনে, রেখে দিলেন তাঁর গ্রামের বাড়ি সাসেকসে।

ওই বাড়িতেই একদিন অতিথি হিসেবে এল চার্লস ফ্রান্সিস গ্রেভিল—অ্যান্টিক ও আর্টের একজন সমঝদার। কিছুদিন পরেই এমা এসে উঠলেন গ্রেভিলের লণ্ডনের বাড়িতে। গ্রেভিলের গ্যালাটিয়া—এমা শিল্প সাহিত্য সংগীতে রাজনীতিতে চোস্ত হয়ে উঠল। গ্রেভিল তাঁকে আমূল বদলে দিলেন অকর্ষিত রমনী থেকে রুচিশীল মার্জিত এক নারীতে। এখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা হল জর্জ রোমনির সঙ্গে।

রোমনির পরই এমার দেখা হল ইতিহাস-বিখ্যাত, যোদ্ধা লর্ড নেলসনের সঙ্গে। ১৮০১ সালে লেডি নেলসন নেলসনকে সোজাসুজি জানিয়ে দিলেন:

আর নয়—হয় এমা, নয় আমি—বেছে নাও!

লর্ড নেলসন বিকৃত হয়ে চুপ করে রইলেন। লেডি নেলসন বেরিয়ে গেলেন চিরকালের জন্যে। তখন এমা নয় মাসের অন্তসত্ত্বা। যথারীতি জন্ম হল, হোরাসিয়ার। লর্ড নেলসন তখন যুদ্ধে। নেলসনের অনুপস্থিতিতে স্যার উইলিয়াম হ্যামিলটনের সঙ্গে এমার ঘনিষ্ঠতা হতে আর একটি শিশুর জন্ম হল। নেলসন এসব কিছুই জানতেন না। ২১ অকটোবর, ১৮০৫ সালে—ট্রাফালগার যুদ্ধে ফ্রেঞ্চ স্নাইপারের ছুটন্ত বুলেট লর্ড নেলসনের কাঁধে এসে বিঁধল। মৃত্যুর আগে বিশ্বস্ত সঙ্গীকে বললেন:

লেডি হ্যামিলটনকে দেখো। ওর যেন কষ্ট না হয়।

পলিন বোনাপার্ট। নেপোলিয়ানের মূর্তির পাশে

হোরাসিয়াকে নিয়ে একা এমা। নেলসনের ৫০০ পাউণ্ড 'মাসোহারা'য় দিন চলে না। জুয়া আর মদে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এমার দেনা বেড়েই চলল। ১৮১৩ সালে দেনার দায়ে জেলে যেতে হল এক বছরের জন্যে। নেলসনের এক বন্ধু জামিন দিয়ে তাঁকে বের করে আনলেন। ১৫ জানুয়ারি, ১৮১৫, মধ্যবয়েসী এই মদ্যপ মহিলা মারা যান।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টের তিন বোনের মধ্যে পলিন বোনাপার্টই শেষ অবধি নেপোলিয়ানের পাশে ছিলেন এলবার নিঃসঙ্গ নির্বাসন-দ্বীপ অবধি। পলিন কিন্তু বিবাহ বন্ধনে আগ্রহী থেকেও—স্বামী ছাড়া অন্য সবার সঙ্গে নৈশ-জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন। আর, এজন্যে নিজেকে কোনদিন অপরাধী মনে করেননি।

পলিনের শরীরী সৌন্দর্য ইতালিয়ান ভাস্কর অ্যাণ্টনিও কানোভার ভাস্কর্যে এখনও উজ্জ্বল, অম্লান। বলতে গেলে, কানোভাকে অমরত্ব দিয়ে গেছেন পলিন। কানোভার বহু পাথর খোদাই ল্যুভর, ভ্যাটিকান, লেনিনগ্রাড হার্মিটেজ উজ্জ্বলন্ত করে রাখলেও পলিনের নগ্ন মূর্তিই তাঁর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম।

কানোভার পলিন স্বপ্নের মধ্যে হানা দেওয়া পুরুষকে ব্যঙ্গ করে ওঠা এক মূর্তিময়ী ভেনাস। তীক্ষ্ণ নাক, চোখে পড়ার মতো চিবুক, কাঁধ আর বুকের আশ্চর্য সমতা—পলিন যেন সিজারিয়ান যুগের কোন প্রমোদসঙ্গিনী।

স্কুলের মেয়েদের মতো চঞ্চল পলিন যৌনতা ছাড়া অন্য কোন আলোচনা কখনও করতেন না। ইতিহাস সঙ্গীত সাহিত্য শিল্পের আলোচনায় বিরক্ত হতেন। বিখ্যাত লোকেদের ভ্যাঙাতে আর ঘোড়ায় চড়তে দারুণ ভালবাসতেন। ভক্তদের সবাইকে একবার-না একবার তাঁর 'ভালবাসা' দিয়েছেন কোন সঙ্কোচ না রেখে। অকপটে। নেপোলিয়ানের অনুচরদের অনেকেই পলিন স্পর্শ অনুভব করেছে। জনৈক বেশি বয়েসের এক ভদ্র লোকের প্রেমে পড়েছে দেখে, নেপোলিয়ান বোনের বিয়ের বন্দোবস্ত করলেন তাঁরই এক জেনারেল ভিক্টর ঈম্যানুয়েল লোকলেকের সঙ্গে। পাঠিয়ে দিলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এক ফরাসি ঔপনিবেশে—পরে যার নাম হয় হাইতি। পলিন প্যারি ছেড়ে যেতে চাননি, কিন্তু নেপোলিয়ান জোর জবরদস্তি করে তাকে পাঠিয়ে ছাড়লেন।

আশ্চর্যের ব্যাপার পলিন হাইতি দ্বীপেও তাঁর জীবনযাত্রা প্রণালী এতটুকু বদলালেন না। হলুদ জ্বরে লোকলেক্ক মারা যাওয়ার পরই পলিন ফিরে এলেন প্যারিতে।

অগুনতি প্রেমিকের একটি তালিকা ছিল তাঁর। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়ভাজন ছিলেন ফ্র'াসোয়া টালমা—বিখ্যাত মঞ্চাভিনেতা।

নেপোলিয়ান আবার বোনের বিয়ের বন্দোবস্ত করলেন। বিয়ে হল প্রিন্স বর্গিস—নামে অতিশয় বুদ্ধিহীন এক ধনী যুবকের সঙ্গে। এখান থেকেই, অর্থাৎ এই বিয়ের পর থেকেই পলিনের স্বৈর ব্যবহার সীমা ছাড়ালো। শয্যাবদল সঙ্গীবদল করে চললেন ক্রমাগত।

পলিনের কামনা বাসনা ছিল সীমাহীন। বিলাস উপভোগও তিনি জানতেন। গরম জলে বিশ লিটার দুধ ঢেলে তিনি স্নান করতেন—একজন নিগ্রো পরিচারক তাঁকে টাবের মধ্যে নগ্ন অবস্থায় শুইয়ে দিত।

১৮০৬ সালে পলিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলেন চিত্রকর নিকোলাস অগস্ট দ্য ফরবিন। বয়েস তিরিশ। এক বছরের মধ্যেই পলিনের ভেতরটা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন ভীষণভাবে। চিকিৎসকদের পরামর্শে মঁসিয়ে ফরবিনের সংস্পর্শ ত্যাগ করলেন।

সেরে ওঠার পর নিস এ জনৈক বেহালা-বাদক, তারপর মার্শাল বার্থিয়ার—নেপোলিয়নের প্রধান দেহরক্ষী—সিসিলিয়ান সংগীতজ্ঞ জিওভানি প্যাসিনি—পলিন প্রত্যেকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার পর, ৯ জুন ১৮২৫ সালে ক্যানসারে মারা যান পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসে।

মৃত্যুর সময়েও তাঁর হাতে আয়না ছিল।

ইতালিয়ান ভাস্কর অ্যাণ্টনিও কানোভার ভাস্কর্যে পলিন

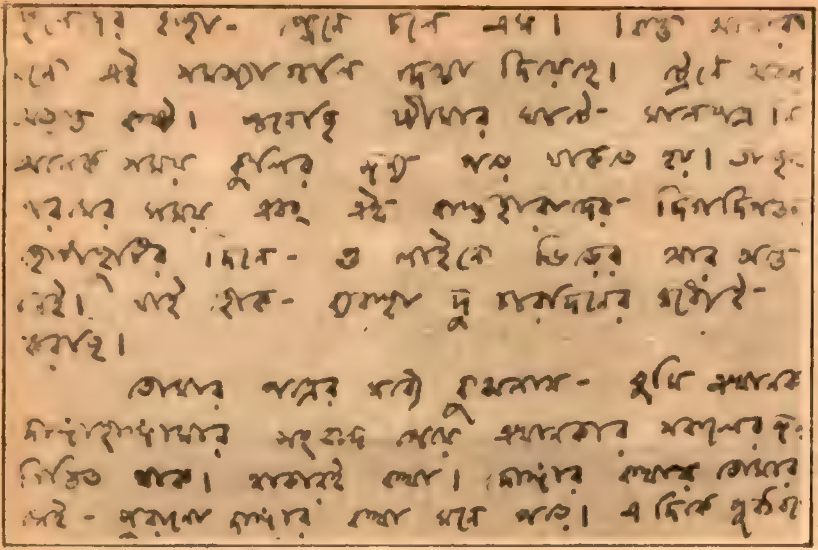

তারাশঙ্কর লিখ

লেখক হিসেবে তারাশঙ্কর ছিলেন সর্বদা অতৃপ্ত। প্রচুর কাটাকুটি থাকত তাঁর পাণ্ডুলিপিতে। পাণ্ডুলিপির এই আদিরূপ যখন ছাপাখানায় বই হয়ে বেরিয়ে আসত তখন আবার শুরু হয়ে যেত সংশোধনের পালা। এমনি করে তাঁর অনেক বইয়ের প্রথম মুদ্রণ বিভিন্ন সংস্করণে পরিমার্জিত হয়েছে এবং সেই পরিবর্ধিত পাঠান্তর গবেষকের কৌতূহলের সামগ্রী হয়ে উঠেছে- 'কবি', 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা', 'সপ্তপদী' বা 'মঞ্জরী অপেরা'র প্রথম মুদ্রণের সঙ্গে বিভিন্ন সংস্করণ মিলিয়ে পড়লে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তারাশঙ্করের এই সংশোধন- প্রয়াস তাঁর অত্যন্ত প্রিয় উপন্যাসগুলোতে লক্ষ করা যায়। কিন্তু গল্প বা নাটক বা প্রবন্ধাবলীর ক্ষেত্রে তিনি সংশোধনে আগ্রহান্বিত হননি। কথাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী হলেও বাংলাসাহিত্যে গীতিকার হিসেবে তাঁর আর একটি পরিচয় ছিল। তিনি অন্যান্য অনেক গদ্যশিল্পীর মতো কবিতার হাত ধরে সাহিত্যের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেন, তাঁর প্রথম গ্রন্থ কবিতার বই। পরবর্তী প্রায় চার দশকের সুদীর্ঘ সাহিত্য-জীবনে ওপথে তিনি আর না হাঁটলেও তাঁর সংগীতানুরাগ তাঁর সমগ্র উপন্যাস ও গল্পের অবয়বে পরিয়ে দিয়েছে এক সুরেলা সুষমা : তাঁর গল্প-উপন্যাসের পটভূমিতে বারবার ঘুরে এসেছে সংগীত-প্রবণতা ; সমস্ত আঞ্চলিক পটভূমি সংবলিত রচনাবলীতে স্থানিক সংস্কৃতিপুষ্ট দেশজ-আবহাওয়া- সংবলিত সংগীতভাণ্ডার তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন এবং এই গীতরচনায় যখন শব্দ সংযোজনা করেছেন তখন পাণ্ডুলিপিতে সুষম শব্দপ্রয়োগের ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছতে তাঁর ক্লান্তিহীন আগ্রহ তাঁকে প্রায় গবেষকের স্তরে পৌঁছে দেয়। তারাশঙ্করের প্রথমতম গ্রন্থ 'ত্রিপত্র' ছাপা হয়েছিলো লাল কালিতে কিন্তু পাণ্ডুলিপি রচিত হয়েছিলো পেন্সিলে। কিন্তু তাঁর আর কোনো রচনার খসড়া পেন্সিলে রচিত হয়নি—পরে নীল-কালো কালিতে লিখতেন। কয়েক বছর কাজল-কালি ব্যবহার করেছেন। প্রথম জীবনে তিনি ছোটখাতায় অনেক গল্প-উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন, 'মারাঠা তর্পনের' মতো নাটক ডায়েরির পাতায়ও কিছু কিছু লিখেছেন, খামের পিছনে বা হাতের কাছে কুড়িয়ে পাওয়া টুকরো কাগজে লিখেছেন বহু গান। জীবনের শেষ দুই দশক তিনি নামী দোকানের উৎকৃষ্ট রেডিওবণ্ড কাগজে পাণ্ডুলিপি তৈরি করতেন। কাগজ ও কলম ব্যবহারের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের মতো অতখানি শৌখিনতা না থাকলেও তাঁর যাবতীয় প্রধান রচনাগুলির খসড়া রচনার উপকরণ প্রয়োগে তাঁর সদাসতর্ক দৃষ্টি ছিল।

চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে যখন তিনি একটি একটি সোপান অতিক্রম করে খ্যাতির মধ্যগগনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁর লেখার কোনো নির্দিষ্ট সময় ধার্য ছিল না। সকালে, সারা দুপুরে এবং রাত্রেও দীর্ঘ সময় ধরে তিনি লিখতেন। সৃষ্টির অজস্র ফসলে তখন তাঁর সাহিত্যসম্ভার পূর্ণ হয়ে উঠছিল। পরে তাঁর পারিবারিক জীবনে বিপর্যয় ও ভগ্নস্বাস্থ্য তাঁর রচনার পরিমাণ আনুপাতিক হারে কমিয়ে দেয়. সাময়িকভাবে বেশ কয়েক বছর ধরে শুধু সকালে লিখতেন। ১৯৬৪ সাল থেকে সকালে ছাড়া বিকেলেও আবার কিছুক্ষণ ধরে লেখা শুরু করেন। চোখের অসুখের জন্য রাত্রে আর লিখতেন না। শারদীয় সংখ্যার জন্য মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্য রাত্রেও তাঁকে লিখতে হয়েছে। একবার 'জবানবন্দী' উপন্যাসটি লেখার সময় তিনি সারাদিন অভুক্ত অবস্থায় থেকে একটানা লিখেছিলেন এবং অপরাহ্ণে পাণ্ডুলিপি রচনা সমাপ্ত হলে তিনি সবাইকে ডেকে পড়ে শোনালেন। অতঃপর সারাদিনের উপবাস সাঙ্গ হলো সন্ধ্যাবেলায়, তাঁর চিরাচরিত রীতি ভঙ্গ করে। তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবনে প্রকাশক বা সম্পাদককে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা খেলাপ করার বিরল দৃষ্টান্তও নেই। কোনো প্রতিকূল প্রতিবন্ধকতা তাঁকে বিরত করতে পারেনি কোনোদিন।

রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত লেখককে জীবনের শেষ পর্বে অনেকে হয়তো দেখেছেন তাঁর নির্দিষ্ট জায়গায় ঋজু হয়ে একটি ব্যাঘ্রচর্মের উপর বসে সামনের মূল্যবান ডেস্কে কিছুটা আনত হয়ে সাহিত্যচর্চা করতে, পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি খাটে শুয়ে রাত জেগে নাটক লিখেছেন, অসহ্য গরমে টিনের ঘরের মেঝেয় বসে কোলের উপর টিনের স্যুটকেস রেখে তাঁর ধ্রুপদী উপন্যাস ও ছোটগল্পের সৃষ্টি করেছেন. কখনো বাসাবাড়ির স্বল্প পরিসরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ঘরের মেঝেয় মাদুরের উপরে বসে লিখেছেন। টালা পার্কে নিজের বাড়িতে এসে পাকাপাকিভাবে বাস করার সময় থেকেই সাহিত্যসাধনা করার জন্য একটি নির্দিষ্ট ও উপযুক্ত পরিমণ্ডল তিনি গড়ে তোলেন-

পর্যায়ক্রমে ঘরে
তার উপরে ব্য
ইচ্ছেয় ব্যাঘ্রচর্ম স
জন্য মাঝে মাঝে
ডেস্কও বদল ক
পাঁচবার নতুন ন
বই, লেখার সরঞ্জা
সুবিধে ছিল ওই

লেখার সময়
করতেন।
অন্য ঘরে তাঁর
থাকতেন। ঘনি
বন্ধুরা তাঁর ঘরে
নীরবে দীর্ঘক্ষণ
জরুরী কোনো
বন্ধ করে তিনি
কথা বলতেন।
যেত তিনি
অন্য ঘরে. বা
অন্যমনস্কভাবে প

পারিবারিক চিঠিতে সমসময়ের প্রতিফলন

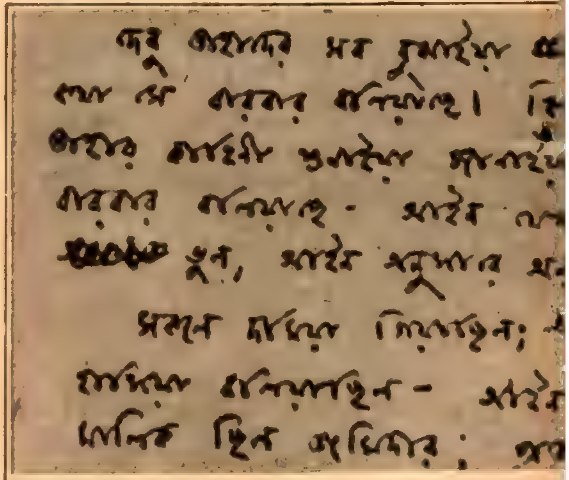

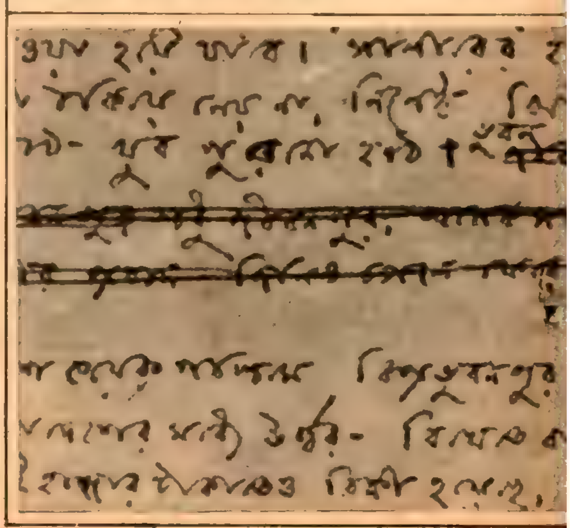

...ন ব্যাঘ্রচর্মে বসে

...হয় কার্পেট ও ... আবার তাঁরই ...য়া হয়। লেখার ...পরিবর্তন করেছেন. ...ছন্দ করে অন্তত ...তৈরি করিয়েছেন। ...রণ রাখায় প্রচুর ...গুলিতে ! ...নে লিখতে পছন্দ ...র সাক্ষাৎপ্রার্থীরা ...পেক্ষা করে বসে ...নেরা বা বিশিষ্ট ...র ডেস্কের সামনে ...কতেন। অত্যন্ত ...জ থাকলে লেখা ...র সঙ্গে কিছুক্ষণ ...মাঝে মাঝে দেখা ...লেখা বন্ধ করে ... বাগানে কিছুক্ষণ ...ছেন। কিন্তু এই

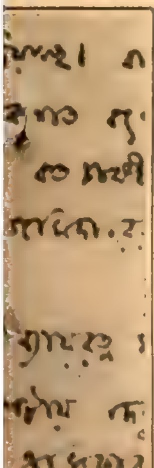

'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসের কিছু অংশ

শেষপর্বের রচনা 'ত্রিপত্রের' হাতের কিছু অংশ

সময় তিনি কারো সঙ্গে কথা বলতেন না। অবশ্য বিশাল একান্নবর্তী পরিবারের গৃহকর্তা-রূপে তিনি লেখার সময় সর্বদা নির্জনতার আরাম বা আনন্দ উপভোগ করতে পারেননি। কিন্তু স্বনির্মিত নির্জনতার দুর্গে স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে তিনি লেখার পরিমণ্ডল নিজেই রচনা করে নিতেন এবং এটা ছিল তাঁর দৈনন্দিন অভ্যাসের অন্তর্গত।

পাণ্ডুলিপি তৈরি করার সময় ফুলস্ক্যাপ কাগজে তিনি যখন লিখতেন তাতে মার্জিন থাকত খুবই কম এবং সেই কম মার্জিনেই তিনি সংশোধনীগুলো রাখতেন। প্রুফ দেখার সময় আবার ঘষামাজা চলতো, এমন কি, পুরো অনুচ্ছেদ বাদ দিয়ে নতুন করে লিখতেন। শেষের দিকে যখন ছবি আঁকায় মন দিয়েছিলেন, তখন নিজের বইয়ের জন্য নিজেই ছবি এঁকেছেন. যেমন 'ভূতপুরাণ'-এর ছবিগুলো। সাহিত্যজীবনের সূত্রপাতে তিনি যখন 'কামন্দক' ছদ্মনামে লিখতেন তখন তাঁর হাতের লেখা ছিল খুবই সাধারণ। কিন্তু ক্রমশ তাঁর লেখার হাত যতোই খুলতে লাগল হাতের লেখাও ততোই হয়ে উঠল মুক্তোর মতো উজ্জ্বল —'পঞ্চগ্রাম'-এর পাণ্ডুলিপি দেখলে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। শেষ বয়সে হাতের লেখার অক্ষরগুলো ঈষৎ বঙ্কিম, সামান্য অসমান এবং কিছুটা এলোমেলো হয়ে উঠেছিলো—তবু বীরভূমের এক কৃষ্ণবর্ণ কৃশতনু অখ্যাত তরুণকে ভারতবর্ষের সাহিত্য রাজ্যে স্বরাট করে গড়ে তোলার ক্ষমতা যিনি রাখেন তাঁর পক্ষে ঘষে-মেজে নিজের হাতের লেখার ছাঁদকে নিটোল মুক্তোর মতো করে গড়ে তোলা মোটেই অসম্ভব হয়নি।

তাঁর লেখার গতি ছিলো দু'রকম। যে বিষয়বস্তুতে বা বক্তব্যের উপস্থাপনায় তাঁর অধিকার দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, সেখানে তাঁর লেখার গতি ছিল অত্যন্ত দ্রুত। তখন তিনি অসম্ভব তাড়াতাড়ি লিখতেন. কলমে প্রচণ্ড চাপ পড়ত, কাগজের পিছন দিকে মোটা দাগে কালির রেখা ফুটে উঠত—একবার তো কলমের নিব-ই ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু যখন তিনি কোনো প্রবন্ধ বা ভাষণ বা গবেষণাধর্মী উপন্যাস লিখতেন, তখন বিলম্বিত লয়ে তাঁকে লিখতে দেখা 'গন্নাবেগম' লেখার সময় আচার্য যদুনাথ সরকারের 'ডাউন-ফল অফ দি মোগল এম্পায়ার', 'অরণ্যবহ্নি' লেখার সময় মেদিনীপুরের পুরনো গেজেট-সমূহ এবং 'কীর্তিহাটের কড়চা' লেখার সময় বিনয় ঘোষের বিভিন্ন রচনা নিয়ে তাঁকে দীর্ঘক্ষণ মনোযোগী থাকতে দেখা গেছে। গান লেখার সময় কখনো কখনো তিনি দ্রুত

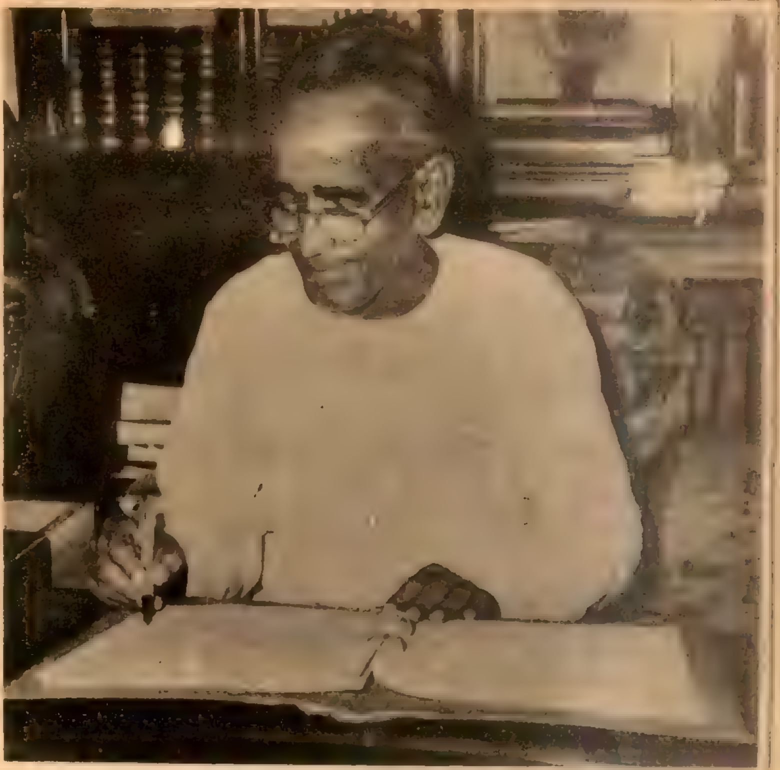

লিখতেন কিন্তু পরে কোনো একটি লাইন বা শব্দ পাল্টে দেওয়ার জন্য দীর্ঘক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করতেন তার প্রচুর নজির আছে। 'কবি' চলচ্চিত্রায়িত হওয়ার সময় একটি গান লিখে পরিচালক দেবকীকুমার বসুকে দেওয়ার পর রাত্রে টেলিফোন করে 'প্রদীপ' শব্দটিকে কেটে 'পিদিম' ব্যবহার করতে অনুরোধ করেছিলেন।

তারাশঙ্করের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'ত্রিপত্র' ব্যতীত ১৯৬৫ সালের পূর্বে রচিত তাঁর যাবতীয় রচনার পাণ্ডুলিপি [illegible] নিতান্ত দুর্লভ। [illegible] সযত্নপ্রয়াসে শেষ পর্বের [illegible] পত্রের পাণ্ডুলিপি [illegible] তাঁর কিছু কালজয়ী রচনা[illegible] কোনো কোনো গুণমুগ্ধ [illegible] রসিকের কাছে আছে। [illegible] তাঁর অনেক পাণ্ডুলিপি [illegible] বর্তমানে বিভিন্ন[illegible] করা সম্ভব তার [illegible]

নিতাই বসু

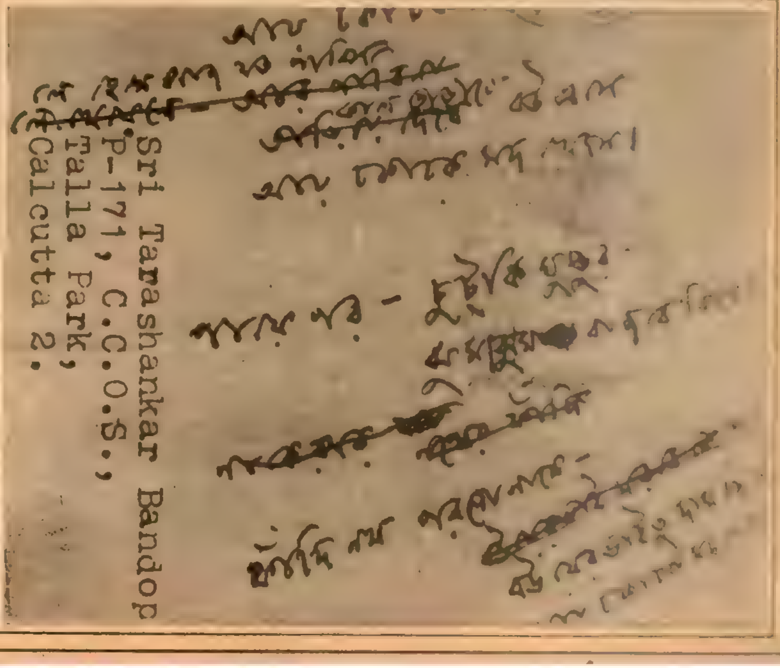

ছেঁড়া খামে লেখা 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'র বিখ্যাত গানটির অংশ

কাহিনী : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : দিলীপ রায়!
প্রযোজনা : আশুতোষ রায় ও দিলীপ রায়।
চিত্রগ্রহণ : গিরিশ পাধিয়ার।
সঙ্গীত : দেবাশিস দাশগুপ্ত।
দৈর্ঘ্য : ১২ রীল।
অভিনয় : সন্তু মুখার্জি, মমতা শংকর, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, সুনীল মুখার্জি, চিত্রা সেন, রমেশ মুখার্জি, বিপ্লব চ্যাটার্জি প্রমুখ।
কাহিনী : কৃষ্ণবর্ণ দারিদ্র্য, কুসংস্কার আর হতাশাগ্রস্ত একটি গ্রামকে ঘিরে ছবির গল্প। ধনীর শোষণ সেখানে কখনও বাঘের থাবা বা কখনও ভুতের আকার নিয়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। আধা-শিক্ষিত, শহরে কাজ-করা তরুণ সুরেন এসে ভুতধরার নাম করে গ্রামের প্রকৃত শ্রেণীভিত্তিক ঐ চেহারাটা চামড়া তুলে দেখিয়ে দেয়—ভুত আসলে কারা!
সম্মান : ইণ্ডিয়ান প্যানোরামায় নির্বাচিত হয়নি, অথচ গ্রীসের আন্তর্জাতিক দশম থাসোলিনিক উৎসবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছে।

বাংলা ছবির চিত্রনাট্য

গরম ভাত

দৃশ্য—৫০

শান্তির বাড়ির সামনে। বিকেলবেলা। বাড়ির দরজায় তালা ঝুলছে। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সুরেন। তার হাতে একটা টিফিন বাক্স। back to camera সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে সুরেন।

ঘর তালা বন্ধ দেখে সে বেরিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত out of frame হয়।

কাট টু

Solo to Composite Trolly shot

সুরেনকে দিয়ে shot open হয়। সে এগিয়ে আসে। তার এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা track করে। অল্প কিছু পর শান্তিকে দেখা যায়। সুরেনকে দেখতে পেয়ে সে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে আসে।

শান্তি : ঠাকুরপো, ঠাকুরপো।

সুরেন দাঁড়ায়, ঘুরে বলে—

সুরেন : তালা লাগিয়ে কোথায় গিয়েছিলে? কথা শেষ করে ব্যাগ থেকে বই বার করে দেয় শান্তিকে।

কাট টু

Compact composite shot।

সুরেনের হাতে-ধরা বইটার উপর ক্যামেরা। Off screenয়ে সুরেনের গলা বোঝা যায়।

সুরেন : (off) তোমার বই এনেছি।

কাট টু

Suggestionয়ে সুরেন ও preferenceয়ে শান্তিকে নিয়ে shot open হয়। শান্তি বলে—

শান্তি : আজ থেকে সন্তোষীমার পুজো শুরু করেছি। এখন থেকে প্রত্যেক শুককুরবার করব, খুব জাগ্রত কিনা!

কাট টু

Suggestionয়ে শান্তি preferenceয়ে সুরেনকে নিয়ে shot open হয়। সুরেন হাসতে হাসতে বলে—

সুরেন : ও হোঃ এই সিনেমা কোম্পানীগুলো আর কিছু পারুক না পারুক চাস্তি 'মা-বাবা' আমদানি করেছেন।...আচ্ছা বৌদি, সন্তোষের মা-না-কী বললে, এই মহিলার নাম আগে কখনো শুনেছ?

কাট টু

Preferenceয়ে শান্তি। সে বলে—

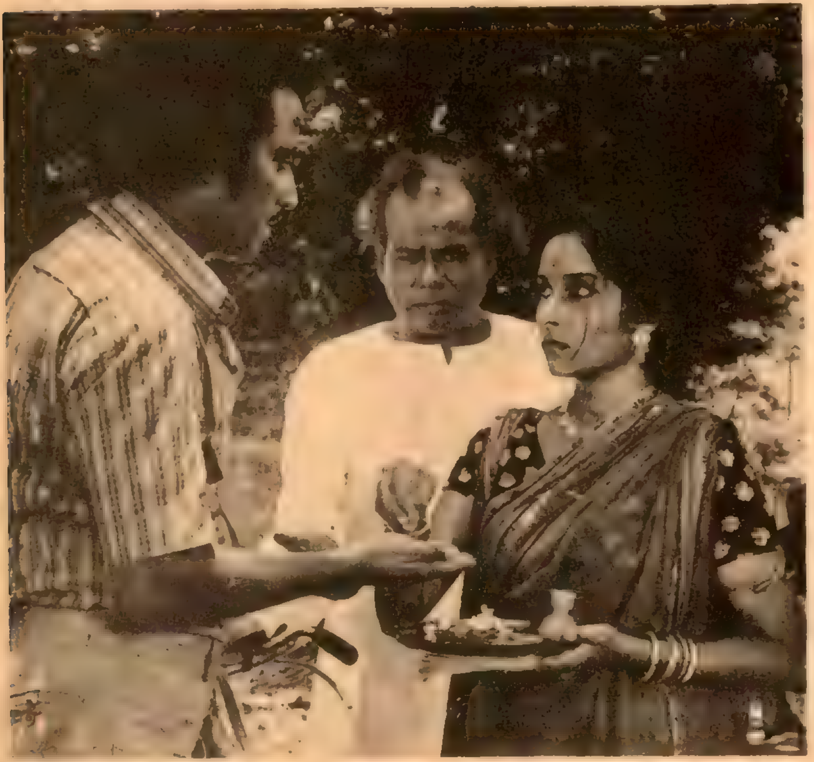

শান্তি : জানি না, হাত পাতো !

কাট টু

সুরেনের বিগ ক্লোজ শট। তাকে খুব গম্ভীর দেখায়, বলে—

সুরেন : আমি এসব বিশ্বাস করি না।

কাট টু

শান্তির বিগ ক্লোজ শট। শান্তি বলে—

শান্তি : না নিলে কিন্তু দুঃখ পাব। জানি না পুজো-আচ্চা করে কোনো ফল হয় কিনা, হয়তো আমি কোনোদিনও মা হব না, কিন্তু আশা ছাড় কী করে বলতো ? হতেও তো পারি।

কাট টু

বিগ ক্লোজে সুরেনকে ধরা। সে কথা বলে চলে। তার কথার সঙ্গে সঙ্গে track back করে ক্যামেরা Composite frameয়ে শান্তিকেও ধরে।

সুরেন : বৌদি, তুমি দুঃখ পাবে জেনেও তোমাকে কথাটা বলছি। সত্যিই মানুষ ছাড়া, আমি এসব ভগবান-টগবান বিশ্বাস করি না। আমার মা-বাবা বেঁচে থাকলেও তোমার মতোই···বৌদি ডাক্তার দেখাও, তুমি বিভূতিদা দুজনেই। পুজো দিয়ে মা হওয়া যায় না। শোনো, বইটা পড়ে আমায় বলবে কেমন লাগল, আর—আর প্রবাদ হিসাবে নয়, তুমি দুঃখ পাবে তাই···

সুরেন হাত বাড়ায় শান্তির দিকে।

কাট টু

ক্লোজ preferenceয়ে সুরেন আর শান্তির হাত। হঠাৎ আর-একটা হাত in করে। সঙ্গে সঙ্গে track back করে ক্যামেরা। frameয়ে সর্বানন্দকে (শান্তির শ্বশুর) পাওয়া যায়. সে বলে —

সর্বানন্দ : চাবিটা দাও, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে। শান্তির আর সুরেনকে প্রসাদ দেওয়া হয় না, সে বলে—

শান্তি : চলুন, আমি খুলে দিচ্ছি।

কথা না বাড়িয়ে ওরা বাড়ির দিকে রওনা দেয়। সুরেন ঘুরে দাঁড়ায়। এগিয়ে আসে ক্যামেরার দিকে, একেবারে লেন্সের ওপর।

কাট টু

দৃশ্য—৫১

রমনীর বৈঠকখানার অভ্যন্তর। সময় সকাল।

রমনীর ক্লোজ শট। তার কথার সঙ্গে সঙ্গে side-wise track করে ক্যামেরা সর্বানন্দ, জিতেন, জগন্নাথ ও যোগেন মাস্টারকে frameয়ে ধরে। রমনী বলে—.

রমনী : সর্বানন্দ, তোমার বৌমার সঙ্গে নাকি ঐ লোকটার খুব ভাব হয়েছে ?

সর্বানন্দকে গম্ভীর দেখায়।

কাট টু

কম্পোজিট শট। রমনীর ছেলে ঘরে আসে। বলে—

ছেলে : বাবা, ডাকছিলে ?

রমনী : হ্যাঁ, রোড কনস্ট্রাকশনের টেণ্ডারটা

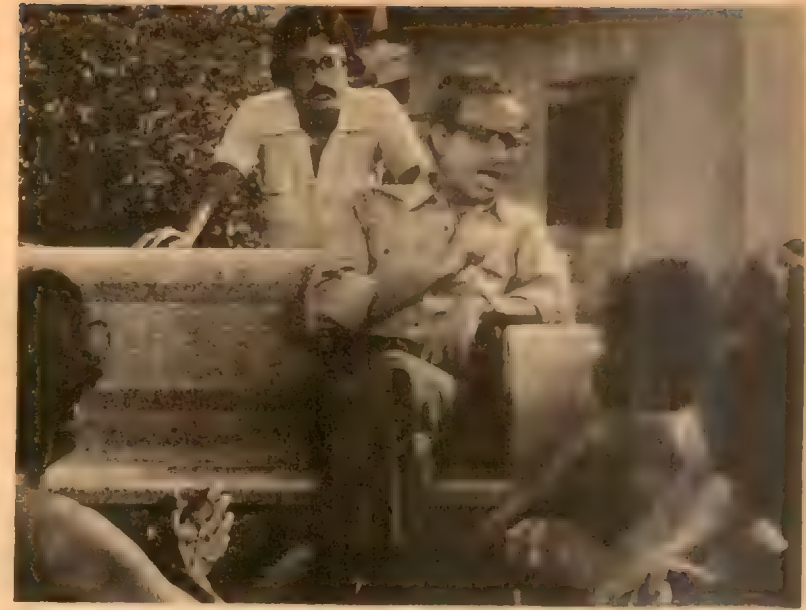

আমরাই পেয়েছি—ঐ জিতেনের বকলমে যেটা দিয়েছিলাম।

কাট টু

কম্পোজিট শট।

ছেলে : বাঃ খুব ভাল! মাঝখান থেকে ···লেগে থাকলে হবে।

কাট টু

জিতেনের ক্লোজ শট।

জিতেন হাসে—শব্দ না ক'রে। মাথা নাড়ায়।

কাট টু

কম্পোজিট শট। রমনী আর তার ছেলে। ছেলে বলে—

ছেলে : বাবা, আমি কোল্ড স্টোরেজে যাচ্ছি।

রমনীর ছেলে চলে যায়। জিতেন হাসে।

কাট টু

ক্লোজ শট। সর্বানন্দ। সে বলে ওঠে—

সর্বানন্দ : ছেলেটা খচ্চর!

কাট টু

ক্লোজ শট। জগন্নাথ। সে প্রশ্ন করে—

জগন্নাথ : কোন ছেলেটা?

কাট টু

ক্লোজ শট। সর্বানন্দ। সে বলে—

সর্বানন্দ : কেন, ঐ সুরেন!

কাট টু

যোগেন মাস্টার কাগজ পড়ছে। তার কথার সঙ্গে সঙ্গে track forward করে ক্যামেরা তাকে ক্লোজে ধরে। যোগেন বলে চলে—

যোগেন : ইস, কী কাণ্ড দেখুন! হুগলীতে এক গর্ভবতী কুমারীকে পিটিয়ে হত্যা!···

আমরা এখনও সেই প্রিমিটিভ যুগে বাস করছি!

কাট টু

ক্লোজ শট। জিতেন। গালে কালি দেখে রমনীর উদ্দেশ্যে সে বলে—

জিতেন : আমারটা তো কালী

কিছু নজরে পড়ে যাওয়ায় কথা থামিয়ে জিতেন কিছু ইঙ্গিত করে।

কাট টু

ক্লোজ শট। রমনী। গালে হাত দেয় সে। তারপর নিজের আঙুল দেখে নিয়ে বলে—

রমণী : লিক করেছে।

কাট টু

দৃশ্য—৫২

সুরেনের কারখানা। সময়—দুপুর।

মিড লং শটে দেখা যায় অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে সুরেনকে। সে কাজ করছে। সে এগিয়ে গিয়ে একজন কর্মচারীকে কিছু নির্দেশ দেয়।

তাদের কোন কথাই শোনা যায় না মেসিনের শব্দে। এরপর সুরেন এগিয়ে যায় —আর একটা মেসিনের কাছে।

কাট টু

ক্লোজ শট। সুরেন। একটা মেসিনের সামনে সে কাজে ব্যস্ত। মেসিনের শব্দ আগের মতই শোনা যাবে।

কাট টু

দৃশ্য—৫৩

সর্বানন্দর বাড়ির উঠোন। সময় বিকেল। নিজের বাড়িতে গাছতলায় দাঁড়িয়ে সর্বানন্দ বুকের লোমে আঙুল বোলাচ্ছে।

তার দৃষ্টি সামনের দিকে। চোখে বিশেষ ভাব।

বাড়ির বেড়ালটা পাঁচিলের ওপর বসে আছে।

কাট টু

শান্তির ঘর। মেঝেতে শীতলপাটি বিছিয়ে শান্তি শুয়ে বই পড়ছে তন্ময় হয়ে—মহাভারত।

পাশে ট্রানজিস্টারে নাটক হচ্ছে—'আলিবাবা'।

কাট টু

সর্বানন্দর বাড়ির পাঁচিল। পাঁচিলের ওপর বেড়ালটা লাফাল।

কাট টু

ক্লোজ শট, সর্বানন্দ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

কাট টু

শান্তি বই পড়ছে আগের মতই। ট্রানজিস্টারে নাটক চলছে—'আলিবাবা'। শান্তি বই থেকে মুখ তুলে একটু সময় রেডিওর নাটক শোনে। তারপর হঠাৎ দেয়ালের দিকে তাকায়।

কাট টু

দেয়ালে একটা টিকটিকি। যেন শান্তিকে দেখছে।

কাট টু

বেড়ালটা পাঁচিলের ওপর বসে বাঘের মত এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে।

কাট টু

ক্লোজ শট, সর্বানন্দ। শান্তির ঘরের দরজার ঠিক বাইরে সর্বানন্দ বুকের লোমে আঙুল বোলাতে থাকে।

কাট টু

দৃশ্য—৫৪

পুকুরপাড়। সময়—বিকেল।

ক্যামেরা low angleএ। দুটো গাছের মাঝখান দিয়ে গেনুকে দেখা যায়। গেনু হাঁটুর ওপর মুখ রেখে আপন মনে বসে আছে। আলতো হাতে সে একটা ঢিল তুলে নেয়। পুকুরে ছোঁড়ে।

কাট টু

ক্যামেরা পুকুরের ওপর—একটা ঢিল এসে পড়ে পুকুরে।

কাট টু

বেড়ালটা পাঁচিলের ওপর পায়চারি করতে করতে হঠাৎ লাফ দেয়।

কাট টু

শান্তির ঘর। সময়—বিকেল।

শান্তি বই পড়ছিল। একটা ছায়া ঘরে ঢোকে। হঠাৎ আলো কমে যায়।

আঁচমকা এই ঘটনায় শান্তি পাশ ফেরে। ওর মুখের ওপর overlap করে দরজা বন্ধ করার শব্দ।

শান্তির চোখে-মুখে ভয়ের আভাস। গরুর 'হাম্বা' রব শান্তির ওপর overlap করে।

কাট টু

দৃশ্য—৫৫

পুকুরপাড়। সময়—বিকেল।

গেনু পুকুরে এলোপাথাড়ি ঢিল ছুঁড়ছে।

কাট টু

ক্যামেরা পুকুরের ওপর। ঢিল পড়ছে পুকুরে। জলে তরঙ্গ ওঠে। শব্দ হয় ঝুপ—ঝুপ—ঝুপ।

কাট টু

দৃশ্য—৫৬

শান্তির ঘর। সময়—বিকেল।

মাটিতে শুয়ে শান্তি। ক্যামেরা দ্রুত change করছে শান্তির মুখের দিকে। শান্তির মুখ হঠাৎ বিকৃত হয়।

একটা লোমশ হাত frameয়ে in করে। এক ঝটকায় হাতটি শান্তিকে টেনে frame-এর বাইরে নিয়ে যায়। লোমশ হাতের ধাক্কায় ট্রানজিস্টারটি উল্টে যায়। নাটক বন্ধ হয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ বেরোতে থাকে ট্রানজিস্টার থেকে।

কাট টু

দেয়ালে টিকটিকি। একটু ভয় পেয়ে সরে যায়।

কাট টু

out frame থেকে 'মহাভারত' বইটি এসে পড়ে ট্রানজিস্টারের ওপর। ফলে একটা যান্ত্রিক শব্দ শুরু হয়।

off screen থেকে ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ ঐ যান্ত্রিক শব্দের ওপর overlap করে।

কাট টু

দেয়ালের টিকটিকিটা দারুণ ভয় পেয়ে frame-এর বাইরে পালায়।

কাট টু

দৃশ্য—৫৭

গ্রামের একটা জায়গা। সময়—বিকেল।

গ্রামের বাঁশবন হাওয়ায় দুলছে। শান্তি নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে। তার শব্দ overlap করে বাঁশগাছের ওপর। বাঁশগাছের শব্দের সঙ্গে শান্তির শব্দ শোনা যায়।

কাট টু

দৃশ্য—৫৮

সর্বানন্দর বাড়ি। সময়—বিকেল।

শান্তির ঘরের বন্ধ দরজার ওপর ক্যামেরা zoom charge করে। দরজার একটা কড়া একটু একটু কাঁপছে।

কাট টু

বেড়ালের ওপর ক্যামেরা। বেড়ালটা মাছ খাচ্ছে।

কাট টু

ওলটানো ট্রানজিস্টার। বিচিত্র শব্দ বের হচ্ছে তার থেকে।

কাট টু

বেড়াল মাছ খাচ্ছে। zoom back হয় ক্যামেরা।

কাট টু

পড়ে-থাকা ট্রানজিস্টার।

কাট টু

বেড়াল মাছের কাঁটা খাচ্ছে।

কাট টু

পুকুরপাড়। সময়—বিকেল।

পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে গেনু এলোপাথাড়ি ঢিল ছুঁড়ছে। জলে শব্দ হচ্ছে ঢিল পড়ার।

কাট টু

একটা টেলিগ্রাফ পোস্টের ওপর থেকে দ্রুত ক্যামেরা zoom back হয়। বিচিত্র শব্দ হচ্ছে টেলিগ্রাফের তারে।

কাট টু

দৃশ্য—৫৯

সর্বানন্দর বাড়ি। সময়—বিকেল।

বেড়ালটা মাছ খাওয়া শেষ করে back to ক্যামেরা frame-এর বাইরে চলে যাচ্ছে।

কাট টু

শান্তির ঘরের ভেতর ক্যামেরা। দরজা খোলা। ভেতর থেকে দেখা যায় উঠোনের গাছগাছালি। সব স্বাভাবিক।

কাট টু

Top shot.

ঘরের এক কোণে বিধ্বস্ত শান্তি। অবিন্যস্ত শাড়ি। চারদিক থমথমে, কোথাও কোন শব্দ নেই।

কাট টু

পুকুরপাড়। সময়—বিকেল।

পুকুরের ওপর ক্যামেরা। শান্ত পুকুর, কোন তরঙ্গ নেই সেখানে।

কাট টু

দৃশ্য—৬০

শান্তির ঘর। সময়—বিকেল।

ক্যামেরা mid close shot থেকে ধীরে ধীরে zoom charge

হতে থাকে।

শান্তির ঘর। ঘরের দরজা খোলা। খাটে হেলান দিয়ে শান্তি বসে আছে মেঝেতে। বিধ্বস্ত শান্তি। মাথার চুল এলোমেলো, সিঁথির সিঁদুর লেপটে আছে—পোশাক-আশাক অবিন্যস্ত।

off screen থেকে overlap করে শহরে-থাকা তার স্বামীর কথা—

বিভূতি : (off) এ বংশে আর কেউ আসবে না এটা মানতে পারছি না···তুমি এখানে থাকবে। বাবার বয়স হয়েছে—গুরুজন, তাঁর সেবা করবে···আমি একাই ভাল থাকব।

কথাগুলো শেষ হতে শান্তি কান্নায় ভেঙে পড়ে। একটা অস্বাভাবিক মানসিক যন্ত্রণায় শান্তি ভাঙতে থাকে। শান্তির সমস্ত মূল্যবোধ, বিশ্বাস ভেঙে খান খান হয়ে যায়।

শান্তির যন্ত্রণা কান্নার রূপ নেয়। বিছানার চাদরকে আশ্রয় করে শান্তি প্রচণ্ডভাবে কাঁদতে থাকে।

কাট টু

প্রচণ্ড হাওয়ায় বাঁশ গাছের ডগাগুলো দুলে দুলে এপাশ-ওপাশ হতে থাকে। তার ওপর শোনা যায় শান্তির ডুকরে ডুকরে কান্না।

★

দৃশ্য—৭৪-এ

পবনের বাড়ির সামনে। সময়—রাত্রি।

Composite shot। পবন আর নিবারণকে নিয়ে। তাদের বাড়ির দাওয়ায় বসে থাকতে দেখা যায়।

পবনকে অসুস্থ দেখায় খুবই। নিবারণ তার গায়ে, কপালে হাত দিয়ে তাপ পরীক্ষা করে, বলে—

নিবারণ : তোমার শরীরে যে অনেক তাপ, বাপ। পবন নীরব থাকে। নিবারণ আবার বলে—

নিবারণ : বাপ।

পবন এবার উত্তর দেয়—

পবন : বলো।

কাট টু

Composite shotয়ে পবন আর নিবারণকে ধরা। নিবারণ কথা বলে। তার কথার সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা charge করে তার ওপর।

নিবারণ : সুরেন ঠিক বলেছে—ভুত নাই—বাবুরাই ভুত হয়ে যায়।

কাট টু

নিবারণ আর পবনকে নিয়ে frame। পবন গোঙায়। তারপর কথা বলে সে। ক্যামেরা charge করে পবনের ওপর।

পবন : কেন, ডাক্তার ওষুধ দেয় না ?

কাট টু

নিবারণের big close shot।

নিজের জগতে যেন নিবারণ মগ্ন। বাবার কথার প্রত্যুত্তরে নিবারণ অন্য কথা বলে—

নিবারণ : আত্মা নাই, ভুত নাই, ভগমানও নাই।

কাট টু

Suggestionয়ে নিবারণ ও preferenceয়ে পবনকে নিয়ে shot। পবন এগিয়ে আসে, সজোরে এক চড় কষায়। নিবারণ ছিটকে পড়ে দাওয়া থেকে মেঝে, তারপর উঠে এসে কাঁদো কাঁদো গলায় বলে—

নিবারণ : মারতেছো কেন ?

কাট টু

এবার suggestionয়ে পবন ও preferenceয়ে নিবারণকে নিয়ে shot।

পবন উত্তর দেয়—

পবন : তুই পাপ কথা বলসি কেন ?

কাট টু

Suggestionয়ে পবন ও preferenceয়ে নিবারণকে নিয়ে shot। নিবারণ আস্তে আস্তে বলে—তার কথার মধ্যে দ্বন্দ্বের আভাস। করুণ লাগে নিবারণের অবস্থা। সে বলে—

নিবারণ : আমি যে ধন্দে পড়েছি বাপ। কোনটা ভুত, কোনটা ভগমান বুঝতে পারতেছি না—বাপ। আমার যে গভভো-যন্ত্রণার মত যন্ত্রণা হচ্ছে বাপ !

চিত্রনাট্য : নির্মল ধরের সৌজন্যে।

বাঙালী ব্যক্তিত্ব

‘এখন বাংলাকে বসানো হচ্ছে সর্বোচ্চ আসনে, অথচ তাতে দক্ষতার মান হলো সবার পিছে সবার নিচে’
—প্রবোধচন্দ্র সেন

‘আপনাকে দেখে আমার ঠিক অ্যান্ড্রুজ সাহেবের ছবিটা মনে পড়ছে’—বলতেই সেপ্টেম্বরের এক রৌদ্রোজ্জ্বল সকালের আলোয় স্মিত হাসির চাপা লাবণ্য আর আভায় ভরে উঠলো তাঁর শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখ। এই সাড়ে চুরাশি বছরের বয়স্ক মননে শিশুর নিশ্চিতি আর যুবকের কর্মোদ্যম নিয়ে শান্তিনিকেতন, পূর্বপল্লীতে তাঁর ভিতর-বাড়ির বারান্দায় আমার সামনে যিনি বসেছিলেন, সেই শুভ্র-কান্তি সৌম্যদর্শন প্রশান্ত মানুষটির নাম ‘দেশিকোত্তম’ (নাকি ‘নির্দেশিকোত্তম’—ঠাট্টা করে যেমন তিনি বলে থাকেন নিজেকে !) প্রবোধচন্দ্র সেন।

আমাদের এই অষ্ট্যাবিশ শতকের ক্রমশ বন্ধ্যা হয়ে আসা বাঙালী সাংস্কৃতিক জীবনের ক্রমবিলীয়মান ‘আচার্য’ পুরুষদেরই একজন তিনি, এক পরম স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। অথচ আজকের সংস্কৃতিজিজ্ঞাসু বাঙালিরা কি সত্যি সত্যিই তেমন করে জানেন—কে তিনি, কী তাঁর পরিচয়, আর এতাবৎকাল বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তাঁর অবদানের যথার্থ স্বরূপটি কী। সেই ১৯৩১ সালে প্রবোধচন্দ্রের কালিদাস সম্পর্কিত লেখা একটি চিঠিকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ‘বিচিত্রা’ পত্রিকায় সেটি ছাপিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী। তার মুখবন্ধে প্রবোধচন্দ্র সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন ‘শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন জনৈক তরুণ সাহিত্যিক। তিনি যে বাংলার সাহিত্য সমাজে আজও তাদৃশ সুপরিচিত নন, কারণ তিনি কবিতা কিংবা গল্প লেখেন না, লেখেন ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। বলাবাহুল্য সে—প্রবন্ধের পাঠক দেশে খুব বেশি নেই, কারণ সে প্রবন্ধ লেখাও যেমন কষ্টসাধ্য, পড়াও তদ্রূপ না হোক, কিঞ্চিৎ যত্নসাধ্য। তা, সেই ‘যত্নসাধ্য’ কাজ করেন কজন ? একথা আমরা জানি যে, গত ষাট বছর ধরে বাংলা কবিতার দেহ এবং মনের নানা জটিল রোগ ও রহস্যের অতন্দ্র সন্ধানী তিনি, বাংলা সাহিত্যের বহু-মানিত ছান্দসিক আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন। এ-ব্যাপারে তাঁর মতো প্রহরীর ভূমিকা কি আর কেউ পালন করেছেন ? প্রশ্ন এই, শুধু কি বাংলা ছন্দচর্চার অক্লান্ত এক তন্ত্রধার—এই-ই তাঁর পরিচয় ?

‘হ্যাঁ, সেরকমই তো ঘটেছে ব্যাপারটা’—শুনে বললেন তিনি। ‘ওই যে আমি বাংলা ছন্দচর্চার কলহকীর্ণ আর দ্বন্দ্বসংকুল পথ পেরোতে পেরোতে বাংলা ছন্দচর্চার একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এবং পরিভাষা গড়ে তোলার কাজে পুরোপুরিভাবে আত্মনিয়োগ করলাম, আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও আমাকে ‘ছান্দসিক’ বলে আখ্যা দিলেন তার ফলে লোকে তো শুধু আমাকে ছন্দের কারবারী ছান্দসিক বলেই জানে। আমার আর সব পরিচয় একেবারে গৌণ হয়েই গেছে। আমার অবস্থা কেমন জানো ?—ওই যে, ঠিক যেন ‘আপনা মাংসে হরিণা বৈরী’। কিংবা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে ‘আপনারে নিয়ে রচিলি রে কি এ আপনারি আচরণ’। হ্যাঁ, আমার ছান্দসিক নামটাই আমার বৈরী। আমার অন্যান্য লেখার কথা কেউ বলেই না।’

কিন্তু আমরা তো জানি, ইতিহাসের মনস্বী ছাত্র এবং গবেষক প্রবোধচন্দ্র কী একাগ্র নিষ্ঠায় লিখে গেছেন ‘ধর্মবিজয়ী অশোক’ ‘বাংলার ইতিহাস-সাধনা’ ‘রামায়ণ ও ভারত-সংস্কৃতি’ বা ‘ধম্মপদ পরিচয়’-এর মতো ইতিহাস পুরাণ এবং ভারতসংস্কৃতির উত্তরাধি-

কারভিত্তিক নানা গবেষণা-গ্রন্থ ! অথচ কেই বা তেমন করে মনে রেখেছি তাঁর ‘ভারতাত্মা কবি কালিদাস’-এর মতো অসামান্য সুখপাঠ্য গবেষণা গ্রন্থটির কথা। মাত্র ছ'বছর আগে

এই বইটির জন্যই তো প্রথম বঙ্কিম-স্মৃতি পুরস্কার দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সেকালের 'প্রবাসী' 'ক্যালকাটা রিভিউ', 'ফরওয়ার্ড', 'বেণু', 'দেবায়তন', 'পূর্বাশা', 'বিচিত্রা', 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি', থেকে শুরু করে দেশ. আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে তাঁর আরো কত না অসংখ্য অগ্রন্থিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলী! আর রবীন্দ্রতত্ত্ববিদ? রবীন্দ্রছন্দতত্ত্বের ভাষ্যকার হিসেবে তাঁর ১৯৩১-এ লেখা 'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান' (এই বইটির একটি পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছে সম্প্রতি, 'বাংলা ছন্দের রূপকার রবীন্দ্রনাথ' নামে) 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' (১৯৪৫) কিংবা যা নাকি তিনি তাঁর ছান্দসিক জীবনের খুব বড়ো কাজ বলে মনে করেন, তাঁর সম্পাদিত ও পুনর্বিন্যস্ত সেই রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' বইটির তৃতীয় সংস্করণের কথা কজনই বা জানেন? আর তাঁর 'ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত' (১৯৪৯) 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা' (১৯৬১), 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬২), 'ইণ্ডিয়াজ ন্যাশনাল অ্যানথেম' (২য় সংস্করণ ১৯৭২) এবং 'ইচ্ছামন্ত্রের দীক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ' (১৯৭৮) —এই বইগুলির মধ্য থেকে বাস্তবিকই রবীন্দ্রতত্ত্ববিদ প্রবোধচন্দ্রের আর এক সত্তার যে পরিচয় ফুটে ওঠে, নেহাতই পরীক্ষা পাশের খোরাক নয় বলে বাংলা সাহিত্যের ছাত্ররাই কি তেমন করে কোনো হালহদিশ রাখেন তার? এই তো বছর তিনেক আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া তাঁর নবীনচন্দ্র সেন স্মৃতি বক্তৃতা বই হয়ে বেরুলো 'আধুনিক বাংলা গীতিকবিতা' নামে বাংলা কবিতার নবজন্মের এই নান্দীপাঠ—এও তাঁর বিচিত্রধী চিন্তার আর এক পরিচায়িকা। আর গল্পভুক সাধারণ পাঠকেরা? তাঁদের কী দায় পড়েছে এইসব বই পড়ার?

'ছান্দসিক' প্রবোধচন্দ্র। তাঁর কথা দেশে বিদেশে সত্যিকারের ছন্দজিজ্ঞাসু মানুষদের আজ আর না জেনে উপায় নেই। সেই যে ১৯২২-২৩ সালে শুরু, আজ এই ১৯৮১-তে ব্রতনিষ্ঠ এই মানুষটি তাঁর ছন্দ চর্চায় একাগ্র, অক্লান্ত। ১৯৩১-এ বই হয়ে বেরোয় তাঁর 'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান', আজ ১৯৮১-তে তাঁর সেই ছন্দসংক্রান্ত বইয়ের সংখ্যা দশ পেরিয়ে গেছে আর প্রবন্ধের সংখ্যা তো একশোরও বেশি। রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' এবং রবীন্দ্রনাথের ছন্দসংক্রান্ত তার ওই আগের বইগুলির কথা বাদ দিলে তাঁর 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা' 'ছন্দ-পরিক্রমা' 'বাংলা ছন্দ চিন্তার ক্রমবিকাশ' এবং 'আধুনিক বাংলা ছন্দ সাহিত্য' নামক বইগুলির অসামান্য গুরুত্বের কথা তো ভোলবার নয়। বিশেষ করে এই 'আধুনিক বাংলা ছন্দ

সাহিত্য' বইটি। এর আগের পর্বটি, অর্থাৎ দ্বাদশ শতকের শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত বাংলা ছন্দ তথা ছন্দচিন্তার উন্মেষকালের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ আছে তাঁর 'বাংলা ছন্দচিন্তার ক্রমবিকাশ' বইটিতে, আর তাঁর মতে, 'উনবিংশ শতকও বস্তুতঃ এই উন্মেষকালের উত্তরার্ধ বলেই স্বীকৃত'। ফলে ইতিহাসের বিচারে বিংশ শতকই গণ্য হবে বাংলা ছন্দচিন্তার বিকাশকাল বলে। আর এর শেষ দুই দশকের ছন্দচিন্তার ইতিহাস-রচনার ইচ্ছা এখনও মনে মনে পোষণ করেন তিনি।

আচ্ছা, এই যে আপনি বারবার বাংলা ছন্দের পরিভাষা আর ছন্দোরীতির নাম বদল করেছেন, সে সম্পর্কে কিছু বলবেন?

'দেখ, এসব কথা তো আমি বারবার নানা প্রসঙ্গে নানা লেখায় বলেছি। আমার 'ছন্দপরিক্রমা' 'ছন্দজিজ্ঞাসা' বিশেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা পরিষদের উদ্যোগে প্রকাশিত 'বাংলা ছন্দ সমীক্ষা' বইতে এবং সম্প্রতি প্রকাশিত 'বাংলা ছন্দের রূপকার রবীন্দ্রনাথ' ও ইদানিং প্রকাশিত 'ছন্দ-সোপান' নামক পুস্তিকাটিতে তুমি তার যুক্তি ও কারণগুলি পাবে। সিলেবলকে 'দল' বলি কেন, মুক্তদল, রুদ্ধদল, মাত্রা, কলা—এসব পরিভাষাকে কেন আমি বৈজ্ঞানিক যুক্তিসিদ্ধ একটা ভিতের উপর দাঁড় করাতে চেয়েছি তার কথা পাবে সেখানে! হ্যাঁ, আমিও এক সময়ে, আমার ছন্দচর্চার সেই শুরুতে বহুপ্রচলিত অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত বাংলা ছন্দোরীতির (ভার্স স্টাইল) এই তিন ধরনকেই মেনে নিয়েছিলাম। অনেকদিন ধরে নির্বিচারে সবাই তা মেনেছিলেন। আমি কিন্তু তৃপ্তি পাইনি। আমার সংশয় ছিল, দ্বিধা ছিল। এই নামগুলি সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, বাস্তবিকই প্রকৃত নামগুলি হওয়া উচিত মিশ্রবৃত্ত (মিশ্রকলাবৃত্ত) কলাবৃত্ত এবং দলবৃত্ত'। এ বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত: 'আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার লক্ষ্য যথাসম্ভব কনোটেটিভ পরিভাষা রচনা করা। পারিভাষিক শব্দ হয় পুরোপুরি অর্থহীন হবে. না হয় হবে উদ্দিষ্ট অর্থসূচক। অনুদ্দিষ্ট অর্থসূচক পরিভাষা নিয়ে কাজ করতে গেলে বিভ্রান্তি অনিবার্য। যে ছন্দ আসলে অক্ষরগোনা নয়, তাকে অক্ষরবৃত্ত বলব কেন? যে ছন্দ আসলে দল সংখ্যাত, তাকে দলবৃত্ত না বলে স্বরবৃত্তই বা কেন? আর সব রীতির ছন্দই যখন মাত্রা সংখ্যাত, তখন একটা বিশেষ রীতিকে মাত্রাবৃত্ত বললে কি বিভ্রান্তি ঘটে না? বিশেষত প্রথম শিক্ষার্থীর? ছন্দশাস্ত্র তো ছন্দ-জানা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য লেখা হয় না, লেখা হয় নবীন জিজ্ঞাসুদের জন্য—তাঁরা অবশ্য বয়সে প্রবীণ হতে পারেন'।

'জানো; ছন্দ সম্পর্কে আমার একটা আক্ষেপ আছে, সেটা তোমাকে বলি, আমি সারাজীবন এই যে ছন্দচর্চা করেছি, সেটা হচ্ছে 'উজানে-চলা'। 'উজানে চলা'—বলছি কেন? আমি প্রথম যখন ছন্দচর্চা শুরু করি সেই ১৯২২-২৩-এ, তখন তো সবাই আমাকে একেবারে 'লুফে নিলো' এবং নির্বিচারে। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সুনীতিবাবু পর্যন্ত সকলেই বললেন বই বের করতে। তারপর চলতে চলতে যখন আমি আমার নিজের ত্রুটিগুলো সংশোধন করতে লাগলাম, চলতি হাওয়া আর পুরনো বিশ্বাসের পরিপন্থী মতামতগুলো প্রকাশ করতে লাগলাম, ঠিক সেই সময়েই শুরু হলো সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু—এঁদের নেতৃত্বে গদ্যপদ্যের বেড়া ভেঙে দেওয়ার একটা জোরালো 'ছন্দবিদ্রোহ'। ফলে বাংলা ছন্দচিন্তার একটা বৈজ্ঞানিক কাঠামোর কথা না ভেবে হাওয়াটাকে তাঁরা ঘুরিয়ে দিলেন অন্যদিকে। আমাকেও অপেক্ষা করতে হলো অনেকদিন। নিরন্তর ভাবতে ভাবতে আমার এতদিনের সেই সাধনাকে আমি যে একটা যুক্তিনির্ভর ভিতের উপর দাঁড় করাতে পেরেছি সেটাই আমার মস্ত বড় তৃপ্তি। আগেকার অক্ষরবৃত্তকে যে এখন মিশ্রকলাবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্ত বলি তার উদ্দেশ্য হলো ছন্দের ধ্বনিবিশ্লেষণগত বিশুদ্ধিরক্ষা। কিন্তু মাত্রাবৃত্ত স্বরবৃত্তকে যে এখন যথাক্রমে কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত বলি তার উদ্দেশ্য কিন্তু ধ্বনিবিশ্লেষণগত বিশুদ্ধিরক্ষা নয়. তার উদ্দেশ্য পারিভাষিক বিশুদ্ধি, সংগতি ও সৌষ্ঠব'।

'মজার কথা কী জানো. রবীন্দ্রনাথের 'দুঃসময়' কবিতাটি নিয়ে আমার প্রত্যক্ষ ছন্দচর্চার সূত্রপাত। তাঁর ছন্দ সৌন্দর্যের আকর্ষণে এবং তাঁর ব্যক্তিগত প্রেরণায় মনে মনে একটা সংকল্প করেছিলাম যে, বাংলা সাহিত্যে ছন্দো

বিদ্যাকে শিক্ষণযোগ্য ও গবেষণাযোগ্য একটি স্বতন্ত্র বিদ্যারূপে প্রতিষ্ঠিত করে যাব। কিন্তু পারিনি। প্রায় ষাট বছরের প্রচেষ্টাতেও কোনো ফল হয়নি। আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সাহিত্যজগৎ উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায় ছন্দো বিদ্যার প্রতি একটি দুর্ভেদ্য উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য, আর বড়জোর একটু করুণা!'

এবার একটু প্রসঙ্গান্তরে যাই : 'আচ্ছা, এই যে সব নানা বিষয় নিয়ে এত সব গবেষণাধর্মী কাজ করলেন আপনি, আপনার সেই সাহিত্যিক সংকল্প ও সিদ্ধি সম্পর্কে আপনার ধারণা কী, একটু জানান যদি। এইসব কাজকর্ম করে আপনি কি খুশী? আপনি কি তৃপ্ত? —'দেখ এ কথার উত্তর দিতে গেলে তো অনেক কথাই এসে যায়— আমি নিজে পুরোপুরি খুশী কিনা বলাটা একটু কঠিনই বটে! তোমাকে তো বলেইছি, ত্রিপুরা (বর্তমান কুমিল্লা)-র এক অখ্যাত 'মণিঅন্ধ' গ্রামে আমার জন্ম। সেখানে যে-পরিবেশে আমি জন্মেছিলাম মনের দিক থেকে সেটা ছিল একেবারে মধ্যযুগের ব্যাপার। আমাদের ছিল ধর্মের ছোঁয়া-লাগা সেকেলে একটা পরিবার। কলকাতায় তো তখন ঊনিশ শতক শেষ হয়ে বিশ শতক এসে গেছে, আর আমাদের সেই গ্রামে তখন চলছে বোধহয় সপ্তদশ শতাব্দী। এতই তফাত! তারি মধ্যে আমি কিন্তু হয়ে দাঁড়ালাম অদ্ভুত এক ব্যতিক্রম। সেই অন্ধকার ঘরের মধ্য দিয়ে অচলায়তনের পঞ্চকের মতো একটুখানি জানলা পেলাম আমি। আমার পাশের বাড়ির এক কাকার ছিল এক লাইব্রেরী। সেখানে পেলাম মধুসূদন, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। চেতনার নানা স্তরে যে রূপান্তর আর নবজন্ম ঘটলো তার অন্ত নেই। ক্রমে ক্রমে সঙ্গে পেলাম ম্যাক্সমুলারের লেখা 'সিক্স সিসটেমস অফ হিন্দু ফিলসফি', রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক নানা রচনা এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আশ্চর্য সব বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নিবন্ধ। এমনি করে লেখাপড়ার একেবারে গোড়াতেই ইতিহাস দর্শন আর বিজ্ঞানের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটেছিল আমার জীবনে। ক্লাস ফাইভ সিক্সে পড়বার সময় কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস, ভারতচন্দ্রের পাঠ্য অংশবিশেষ, মধুসূদন রবীন্দ্রনাথ আর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার বিচিত্র সব চলন ছন্দের প্রতি অমোঘ এক টান ধরিয়ে দিয়েছিলো আমার মনে: প্রসন্ন বিদ্যারত্নের 'সাহিত্য প্রবেশ বাঙলা ব্যাকরণের' ছন্দ প্রকরণও ছিল আমার সেই ক্রমশ বেড়ে ওঠা আগ্রহের যজ্ঞে আর-একটি উল্লেখযোগ্য তার। শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে বি. এ পাশ করলাম ইতিহাসে অনার্স নিয়ে। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে বেশ ভালোভাবেই পাশ করলাম এম. এ (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম)। উচ্চতর শিক্ষাজীবনে আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল নীহার— নীহার রঞ্জন রায়। তারপর ১৯৩২ থেকে ১৯৪২ ইতিহাস ও বাঙলা সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে কাটল খুলনা জেলার দৌলতপুর কলেজে। শেষ পর্যন্ত কবিগুরু রথীবাবুর ডাকে ১৯৪২-এ এলাম শান্তিনিকেতনে। বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনের বাঙলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এবং দুবারে মোট বারো বছর (৯+৩) রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষের গুরু দায়িত্ব পালন করলাম মোট তেইশ বছর ধরে। এমনি করতে করতে সেই সপ্তদশ শতাব্দীর মানসিক ভূগোল থেকে শান্তিনিকেতন পর্যন্ত আধুনিক বিংশতকী মাত্রায় পৌঁছে গেলাম। যখন ভাবি কোথা থেকে কোথায় এলাম, তখন মনে হয়, আমার কাজকর্ম নিয়ে সত্যিই আমি অখুশী নই। রবীন্দ্রনাথ তো জীর্ণ যুগে জন্মাননি, জানো। আমি কিন্তু বাস্তবিকই জীর্ণ যুগে জন্মেছিলাম। যেটুকু কাজ করেছি, তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমার সান্ত্বনার কথাটি এরকমভাবে বলতে পারি, 'তুমি জানো, ওগো, করি নাই হেলা পথে প্রান্তরে করি নাই খেলা / শুধু সাধিয়াছি বসি সারাবেলা / শতেকবার'।

: আচ্ছা, আমাদের এখনকার বাঙালী 'ইনটেলিজেনসিয়া' অর্থাৎ তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সম্পর্কে আপনার ধারণা একটু বলবেন?

একটু বিচলিত মনে হলো। কেঁপে গেল ওঁর অক্ষুব্ধ প্রশান্তির বৃত্তটি। বললেন, 'দেখ, যতই দিন যাচ্ছে, ততই আমার ধারণা : ওরা দিনদিন চুলোয় যাচ্ছে, রসাতলে যাচ্ছে। কেউ ওদের বাঁচাতে পারবে না। যতো সব স্বার্থসর্বস্ব আত্মকেন্দ্রিকের দল। কী, অসার অহংকার আর আত্মাভিমান! ওরা ভাবে, ওরা নিজেরাই বুঝি এই দেশ! এই দেশটা শুধু ওদেরই জন্যে। সেই মাঝাদের কৃত্তিবাসের কাল থেকে আজ পর্যন্ত সবাই তো বৃহৎ জাতীয় স্বার্থের ধারাকে বয়ে নিয়ে চলেছে। অথচ বলো তো, আমাদের সংস্কৃতি ও কীর্তির গভীরতা কতখানি? সে সংস্কৃতি আর কীর্তি তো সীমিত হয়ে আছে আমাদের সমাজের অতি অগভীর উপরে স্তরে! এই সংস্কৃতি যদি বিপুল সংখ্যক মানুষের সংস্কৃতি না হয়, তবে ঐ সংস্কৃতিকে বাঙালীর 'জাতীয়' সংস্কৃতি বলি কোন মুখে? অথচ বলতে আমাদের লজ্জাও হয় না! ছেলেবেলায় ইস্কুলে পড়ার সময়ই দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছি। সে-স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ আর স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু স্বাধীনতা বলতে তো শুধু ইংরেজ শাসনের অবসানই বুঝিনি। বুঝেছিলাম সর্বজনের জাগরণ, বুঝেছিলাম সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর মানুষের অভ্যুদয়। আমাদের 'বুদ্ধিজীবী'রা তো শুধু এ'দের নিয়ে বিচিত্র সব অনুষ্ঠান করতেই ব্যস্ত!'

: আমাদের এখনকার ছেলেমেয়েদের আচার আচরণ পোষাক আশাক, কথাবার্তা, বিদ্যা, বিনয়—এ সব কিছু সম্পর্কে ধারণা কী আপনার?—

: দেখ, ইদানীং আমাদের জীবন থেকে ভারতীয়ত্ব, বাঙালিয়ানা এসব ব্যাপারগুলো তো সব একে একে হারিয়ে যেতে বসেছে। এই যে আমরা সব আমাদের পুরনো অশন বসন বাতিল করতে বসেছি। 'পিঠেপার্বণ'কে বিদেয় দিয়ে এখন সব 'কেক পার্বণ' শুরু করেছি, না, আমি একটুও পছন্দ করি না এসব। যাদের কথা তুমি জিজ্ঞাসা করছো, একটু আগে যে-বুদ্ধিজীবীদের কথা বলেছি, এরা তো তাদেরই ছেলেমেয়ে, তা এদের মা-বাবারা যে-পথে যাবে, এরাও তো সব সে পথেই যাবে। আলাদা করে এদের আর দোষ দিয়ে কী লাভ? আবার এও জানি যে, আজকালকার ছেলেমেয়েরা সবাই কিন্তু এই পথেরই পথিক নয়। তবে একটা কথা আমাদের কিন্তু ভাবতে হবে, ভেবে দেখতে হবে কেন আমাদের উত্তর পুরুষেরা নানাদিক থেকে এমনিভাবে বদলে যাচ্ছে। কেন? আমার উত্তরটা কী জানো? ওদের সামর্থ্য বা স্বকীয়তা প্রকাশের কোনো আউটলেট নেই, কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছে না ওরা। ভারতভাগ, বিশেষ করে বেঙ্গল পার্টিশন। যতখানি গুরুত্ব এবং আন্তরিকতার সঙ্গে এই সমস্যার প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করা উচিত ছিল, ভারত সরকার তো তা করেনি। ফলে গত সাড়ে তিন দশকে (চৌত্রিশ বছরে) সমস্ত সমাজটা অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক নানাদিক থেকে একেবারে ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে। দেখ, আরো একটা গভীর কারণের কথা আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে, কিংবা ধর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পিঠোপিঠি দেশ বিভাগের পরে এক ঐ সত্যজিৎ রায়ের মতো বিরল একটি ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে এমন একজন লোকও কি আমাদের দেশে আমরা দেখতে পেলাম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যিনি ভারতবর্ষের গৌরব এবং খ্যাতির যোগ্য প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন? তেমন যোগ্য মানুষ তো কই চোখে পড়ল না! সেই স্বদেশী যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত রাজনৈতিক নেতারা শুধু তাঁদের উদ্দেশ্য আর দলগত স্বার্থ চরিতার্থতার ঘুঁটি হিসেবেই ব্যবহার করলেন দেশের তাজা তরুণদের!!

এবার একটু বিতর্কিত সমকালে ফিরে আসি। শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষাই একমাত্র

বাহন হওয়া উচিত কী ? – প্রশ্ন করি তাঁকে।

ঃ হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি, মাতৃভাষাই শিক্ষার সর্বস্তরে একমাত্র বাহন হওয়া উচিত।

ঃ আচ্ছা, আমাদের এই প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ইংরেজি ভাষা অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত কিনা ?

ঃ মোটেই উচিত নয়। আমি মনে করি তা একান্তই মনস্তত্ত্ববিরোধী একটি পদ্ধতি। আর তা ছাড়া আমাদের সংবিধানের এরকম নির্দেশের কথা তো আমরা সবাই জানি যে, আমাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হচ্ছে দেশের প্রত্যেকটি লোককে অন্তত পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া। কেননা গণতন্ত্রকে সার্থক করে তোলার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ই তো হচ্ছে দেশ থেকে নিরক্ষরতা ও অশিক্ষার সম্পূর্ণ অপসারণ। অথচ দেশের এই বিপুল জনসংখ্যার শতকরা ৬০ জনই তো এখনও নাম সই করতেই পর্যন্ত পারে না। যেখানে মাতৃভাষার আলোতেই এই দেশব্যাপী অন্ধকারের নিরসন দুঃসাধ্য, সেখানে বিদেশি ভাষায় বিজলিবাতির প্রস্তাব কি অলীক স্বপ্ন নয় ? আমি কিন্তু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকে ইংরেজি শেখাবার প্রস্তাব কার্যত সমগ্র ভারতভূমিকে একটা বৃহত্তর ইঙ্গভূমিতে পরিণত করারই প্রস্তাব। দেখ, আমার পরিবারেই, আমার প্রবাসী শিশু, নাতি নাতনীর মুখে যখন শুনি 'দেখ না কিরকম ভাবে Look আছে' (তাকাচ্ছে), কিংবা 'চিঠিটা ভেজে দিলো' (পাঠিয়ে)—তখন এই প্রাথমিক স্তরে দ্বিভাষা শেখানোর বিফলতা সম্পর্কে আমি আরও নিঃসংশয় হই।

ঃ আচ্ছা, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ডিগ্রি-স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থায় কমপালসারি অ্যাডি-শনাল বা ঐচ্ছিক আবশ্যিক হিসেবে ভাষাচর্চার, বিশেষ করে মাতৃভাষাচর্চার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, এ বিষয়ে আপনার মত কী ?

ঃ একটুও সমর্থন করিনা আমি। এ ব্যাপারে ঘোরতর আপত্তি আছে। আমি তো লিখিতভাবে আমার বক্তব্য জানিয়েছি যে, 'ইদানিং বি এ শিক্ষার পর্যায়ে বাঙলা অথবা ইংরাজীকে যে স্তরে নামানো হয়েছে তার মতো আত্মঘাতী ব্যবস্থা আর কী হতে পারে ? যে-বাঙলাকে সব শিক্ষার বাহন হবার মর্যাদা দেওয়া হলো, সে-ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা অর্জনের মানকেই টেনে ধুলোয় নামানো হলো ! এ যেন ধনুকের ছিলা কেটে তীর ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদের অলীক কল্পনা ! রবীন্দ্রনাথের ভাষা একটু বদলে নিয়ে বলা যায় 'আপনি গড়ে তুলি বাঙলা প্রাসাদ আপনি ভেঙে দেয় তাহা।' আর দেখ, মাতৃভাষা ব্যবহারে দক্ষতার নিম্নতম মান হয়েছে শতকরা কুড়ি। ইংরেজ আমলেও আমাদের ছাত্রাবস্থায় অবহেলিত বাঙলার পাশমার্ক ছিল ছত্রিশ। তখন সব বিষয়ে শিক্ষার বাহন ছিল ইংরেজি। এখন বাঙলাকে বসানো হচ্ছে সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে, অথচ সে-ভাষায় দক্ষতার মান হলো 'সবার পিছে সবার নিচে !'

ঃ আমাদের দেশের এখনকার রবীন্দ্রচর্চা সম্পর্কে আপনার ধারণা কী, একটু বলবেন।

ঃ দেখ, আমি কিন্তু মোটেই পেসিমিস-টিক লোক নই। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে খুব

পুরো নাম ঃ
প্রবোধচন্দ্র সেন।

স্ত্রীর নাম ঃ
রুচিরা সেন।

জন্মস্থান, সাল/তারিখ ঃ
২৭ এপ্রিল ১৮৯৭, পূর্বতন ত্রিপুরা (অধুনা কুমিল্লার) মণিঅন্ধ গ্রামে।

প্রধান জীবিকা ঃ
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণের পর এখন প্রধান কোনও জীবিকা নেই। লেখালেখির আয়ও যৎসামান্য।

লেখার ব্যাপারে কোনো সংস্কার ঃ
কোনো সংস্কার নেই।

অবসর বিনোদন ঃ
গান শোনা (রবীন্দ্রসংগীত, লোকসংগীত ইত্যাদি) আর বই পড়া।

নেশা ঃ
জীবন চা, কফি, পান, তামাক, সিগারেট খাই নি।

পছন্দ ঃ
নানা রকমের গাছ, ফুল, পাখি, সুস্থ শিশু আর মানুষের সরল হাসি। আর সবচেয়ে রবীন্দ্রনাথের গান।

অপছন্দ ঃ
কান্নাকাটি, ঝগড়াঝাটি, গোলমাল, রাজনৈতিক মিছিল আর স্লোগান।

কী ধরনের সঙ্গী পছন্দ ঃ
যারা সত্যিকারের হাসতে জানে এবং হাসাতেও জানে।

ঘনিষ্ঠ বন্ধু / সুহৃদ ঃ
আমার পত্নী। এখন তিনিই আমার সবচেয়ে বড়ো বন্ধু। আর আছেন আমার স্কুলজীবনের সহপাঠী বাল্যবন্ধু অধ্যাপক সন্তোষ কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং স্নেহভাজন বন্ধু বিনয়েন্দ্র মোহন চৌধুরী।

ভয় ঃ
গুণ্ডা আর পাগলা কুকুর।

প্রিয় খাবার / খাদ্য ঃ
দুধ, ফল আর মধু।

প্রিয় বই ঃ
কালিদাসের কাব্য, নাটক, রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় লেখা আর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা।

সবচেয়ে আনন্দদায়ক স্মৃতি ঃ
ডিসেম্বর ১৯২২ থেকে এপ্রিল ১৯২৩ পর্যন্ত প্রবাসী পত্রিকায় পাঁচ কিস্তিতে প্রথম ছন্দ-প্রবন্ধের ধারাবাহিক প্রকাশ এবং সে প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রসন্ন পত্রলাভ।

সবচেয়ে বিষাদজনক ঘটনা ঃ
১৯৪৭-এর ভারত, বিশেষত বাঙলা ভাগ।

সাহিত্যে অনুপ্রেরণা ঃ
সাহিত্য-চর্চায় অনুপ্রাণিত করেছেন কুমিল্লা জেলা স্কুলের মাস্টারমশাই গঙ্গাচরণ দাস এবং সংস্কৃত শিক্ষক শ্যামাচরণ পণ্ডিত মশাই।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা / আকাঙ্ক্ষা ঃ
মানুষের প্রীতিলাভ। তাকেই রক্ষা করে যাওয়া।

প্রিয় শখ ঃ
বাগান করা আর হোমিওপ্যাথি চর্চা।

স্মরণীয় অভিজ্ঞতা ঃ
এক সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনের 'উদয়ন'-ঘরের দোতলায় সাঙ্গীতিক অতুলপ্রসাদের সঙ্গে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ। সেটিই স্মরণীয়তম অভিজ্ঞতা।

প্রিয় কবি ঃ
ওয়ার্ডসওয়ার্থ, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং মহাকবি কালিদাস।

প্রিয় গদ্যলেখক ঃ
রবীন্দ্রনাথ, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়।

উচ্চাঙ্গের গবেষণা যে হচ্ছে তাও নয়, তবে যা হচ্ছে তা-ও কিছু অকিঞ্চিৎকর নয়। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর অসংখ্য বই লেখা হয়েছে তাঁর সম্পর্কে, তাঁর অসামান্য সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে। তবে রবীন্দ্রনাথ থেকে এখনও তো আমরা অনেক দূরে চলে আসিনি। তাঁর সম্পর্কে তেমন নিরপেক্ষ একটা দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার সময় এখনও আসেনি। ফলে অতিভক্তি আর অতিবিরূপতার দোটানা তাঁকে নিয়ে। এরই মধ্যে প্রবীণতম প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় থেকে তরুণতমা পম্পা মজুমদার, সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় বা সুগতা সেন পর্যন্ত রবীন্দ্রসাহিত্যের তথ্য, তত্ত্ব এবং উপাদান-উপকরণের নূতনতর বিচার বিশ্লেষণ এবং ভাষ্যরচনার যে ক্লান্তিহীন সাধনা এবং প্রযত্ন বর্তমানের সেই রবীন্দ্রচর্চাকে আমি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করি।

ঃ জীবনের প্রায় চল্লিশটা বছর ধরে আপনি তো আছেন এই শান্তিনিকেতনে—তা, বিশ্বভারতীর এখনকার রবীন্দ্রচর্চা সম্পর্কে আপনার ধারণা কী ?

ঃ দেখ, এই প্রশ্নের উত্তরে কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে চাইনা আমি। বিচ্ছিন্নভাবে যাঁরা কাজ করছেন অবশ্যই তাঁরা শ্রদ্ধার্হ ; কিন্তু বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রচর্চা সম্পর্কে আদৌ খুশী নই আমি। বল তো, শান্তিনিকেতনের বাইরে যেমন রবীন্দ্রচর্চা হয় এখানেও কি তাই হবে ? রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত তথ্য আর উপাদান-উপকরণ তো এখানে রয়েছে, কিন্তু সেগুলোর যথাযোগ্য ব্যবহার হচ্ছে কি ? সেইসব আকরিককে আমরা আরও অসংখ্য লোকের কাছে কাজের উপযোগী, ব্যবহারযোগ্য করে পৌঁছে দিচ্ছি কি ? রবীন্দ্রনাথের কতো পাণ্ডুলিপি আছে এখানকার রবীন্দ্রভবনে, কিন্তু বিদেশে যেমন হয়, তেমন কোনো 'ক্যাটালোগাস ক্যাটালোগাম' ধরনের রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি পরিচায়িকা কি তৈরি হয়েছে ? রবীন্দ্রনাথের কত লেখা ইতস্তত ছড়িয়ে আছে, সেগুলিকে কি আমরা সংকলিত করেছি ? এখানকার রিসার্চ যা হওয়া উচিত ছিল, আমার ধারনা, তেমনটি হয়নি। আর যা শুরু হয়েছিল, তার গতিও তো নানা কারণে, মন্থর। কারণগুলির বিচারে নাই বা গেলাম আর !

ঃ গত দশ বছরে তেমন উল্লেখযোগ্য বাঙলা উপন্যাস নাকি লেখা হয়নি, বিচারক-দের এই রায়ে, এবছর বঙ্কিম-পুরস্কার দেওয়া হলোনা,—এ সম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়া কী ?

ঃ দেখ, প্রসঙ্গটাই বিতর্কিত। যদিও আমিই প্রথম বছরের বঙ্কিম স্মৃতি পুরস্কারের প্রাপক, তবুও আমার মনেও প্রশ্ন জাগে যে, এরকম নানা ধরনের সাহিত্য-পুরস্কার দেওয়াটা বোধহয় ঠিক নয়। হ্যাঁ, লেখকরা উৎসাহ পান, নতুন নতুন সৃষ্টির প্রেরণা পান, ঠিক কথা ; তবে আজকাল তাঁরাও যেন একটু বেশী মাত্রায় লালায়িত হয়ে পড়েন এইসব পুরস্কারের জন্যে, তাই এইসব পুরস্কার-টুরস্কারের ব্যাপারে কেমন যেন অবিশ্বাসী হয়ে পড়েছি আমি। তবে এবার যে বঙ্কিম-পুরস্কার দেওয়া হলো না, সেটা আমি ঠিক বলে মনে করি না। বাঙলা সাহিত্যে গত দশ বছরে একটাও উল্লেখযোগ্য ভালো উপন্যাস লেখা হয়নি, এ কথা আমি যথার্থ বলে মনে করি না। যেটুকু নজর রাখি, আমি তো মনে করি বাঙলা উপন্যাস রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের পরে অনেকখানি ডেভেলপ করেছে এবং তা নিয়ে আমরা গর্বও করতে পারি। আমি কিন্তু বিচারকদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে মোটেই একমত নই।

চলে আসার আগে শেষ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাঁকে : 'এতদিন কেমন ছিলেন এবং কেমন আছেন এখন ?'

প্রসন্ন কৌতুকে আর একান্ত প্রত্যয়ে তাঁর উত্তর : 'আগেও ভালো ছিলাম। এখন ভালোতর আছি। আর কী বলব। প্রতি-নিয়ত নতুন নতুন লোকের সান্নিধ্য পাই, সেটাও কি কম কথা ! দেহে নানা উপসর্গ আছে, তবে প্রত্যয় আছে, আর হাতে ক্রিয়া আছে, কাজেই কাজকর্ম বন্ধ থাকেনি, চলছে।' □

সাক্ষাৎকার : সুশান্ত বসু

সাহিত্য-ধাঁধা

এবারকার নতুন ধাঁধা

এবারের সাহিত্য ধাঁধায় বিভিন্ন লেখকের গল্প, উপন্যাস এবং প্রহসন থেকে কয়েকটি বিশেষ অংশ বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অংশের নিচে লেখকের নাম দেওয়া আছে। তবে তা ওলট পালট করে সাজানো। বলুন তো, কোন অংশটি কার লেখা ? সঠিক লেখকদের নামগুলি পরপর সাজিয়ে লিখুন। প্রতিটি নামের পাশে লিখে দিন কোন গল্প বা উপন্যাস বা প্রহসন থেকে অংশগুলি নেওয়া হয়েছে।

১। 'কলকেতা সহর বড়ই গুলজার—গাড়ীর হররা, সহিসের পয়িস, কেঁদো কেঁদো ওয়েলার ও নরম্যাণ্ডির টাপেতে রাস্তা কেঁপে উঠচে—বিনা ব্যাঘাতে রাস্তায় চলা বড় সোজা কর্ম্ম নয়।' —প্যারীচাঁদ মিত্র

২। 'লোকটা অত্যন্ত রোগা এবং ফর্সা। বয়স অনুমান করা অতিশয় কঠিন, কারণ উপদ্রবে অত্যাচারে মুখখানা শুকাইয়া যেন একেবারে কাঠের মতো শক্ত হইয়া উঠিয়াছে ; সম্মুখে সুরাপূর্ণ গেলাস এবং তাহারই পার্শ্বে বিচিত্র আকারের একটা মদের বোতল প্রায় শেষ হইয়াছে।' —বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩। 'ক্রমে ক্রমে পাড়ার যত লক্ষ্মীছাড়া—উন পাঁজুরে-বয়াখুরে ছোঁড়ারা জুটিতে আরম্ভ হইল। দিবারাত্র হট্টগোল—বৈঠকখানায় কান পাতা ভার কেবল হো হো শব্দ হাসির গররা ও চরস-গাঁজার ছররা, ধোঁয়াতে অন্ধকার হইতে লাগিল।' —কালীপ্রসন্ন সিংহ

৪। 'কেন মহাশয়। আপনি জানেন না, আপনার সহধর্ম্মিনীকে আমরা সকলে কর্ত্রী ঠাকুরানী বলিয়া থাকি ? তিনি ভিন্ন আর কাহাকে কর্ত্রী ঠাকুরানী বলিব ? তিনিই আমায় আপনাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন।' —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫। 'এক পারে উদয়গিরি, অপর পারে ললিতগিরি, মধ্যে স্বচ্ছসলিলা কল্লোলিনী বিরূপা, নীলবারিরাশি লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে।' —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬। 'সে রাত্রে শৃগাল কুকুর নগরের পথে পথে বিচরণ করিতেছে, দুই-একটা চিতাবাঘ গৃহস্থের দ্বারের কাছে আসিয়া উঁকি মারিতেছে। মানুষের মধ্যে কেবল একজন আজ গৃহের বাহিরে আছে—আর মানুষ নাই।'
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

উত্তর নির্দেশিকা
সাহিত্য ধাঁধা (৪)

১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – কমলাকান্তের দপ্তর, 'কে গায় ওই'।
২। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—সীতার বনবাস, ১ম পরিচ্ছেদ।
৩। কালীপ্রসন্ন সিংহ—হুতোম প্যাঁচার নকশা—বারইয়ারি পূজা।
৪। টেকচাঁদ ঠাকুর—আলালের ঘরের দুলাল
৫। প্রমথ চৌধুরী—সাহিত্যে খেলা, প্রবন্ধ সংগ্রহ।

গতবারের সাহিত্য ধাঁধার প্রথম নির্ভুল উত্তর দিয়েছেন তরুণ চক্রবর্তী, সাহেবনগর, নদীয়া।

সাহিত্য ধাঁধা ৫

নাম..

ঠিকানা......................................

পাঠানোর তারিখ..........................

বিশিষ্ট বাঙ্গালী কবি : নির্বাচিত কবিতা

অরুণ মিত্র

কবির জন্ম ১৯০৯ নভেম্বর, যশোর সদরে। অদূর সুনিবিড় গ্রাম-সান্নিধ্য ও বাল্য-কৈশোরের সেই আকাশধরা গাছে-ওঠা সাঁতারের স্রোতে অবগাহন আজও স্মৃতিতে কাব্যে বহমান

পিতা : হীরালাল মিত্র, মাতা : যামিনীবালা, সহধর্মিনী শান্তি অভিনেত্রী তৃপ্তি (মিত্র)র বড়দি ('নবান্নে' এঁরও অভিনয় ঐতিহাসিক)। আকৈশোর সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছেন মাতুলালয়-পল্লী-শহর-মহানগর কলকাতার ত্রিস্রোতবাহে।

আনন্দবাজারে (১৯৩১) থাকাকালীন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের গৃহে দৈনিকী কাজকর্ম ও শারদীয়-সম্পাদনায় সহকারিত্ব যেমন সাংবাদিকতা-সাহিত্য-যোগ ঘটায় প্রয়োজনের চাপে যৌবনারম্ভেই জীবনসংগ্রাম ও জীবিকাসংগ্রহ সূচিত করে; বঙ্গবাসী ও রিপন কলেজে তাই তখনকার মতো উচ্চশিক্ষা অসমাপ্ত; কিন্তু ফরাসী ভাষা-সাহিত্যে গভীরাগ্রহ ও অনুরাগে আলিআঁস ফ্রাঁসেজ-এ সন্নিহিত হন; ক্রমে আনন্দবাজার ছেড়ে 'অরণি'-আন্দোলনের তুমুল সঙ্গম (১৯৪৩) ও স্বকীয় গতি-প্রগতি-পরিণতির আত্মপ্রকাশ। একালেই ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সাহিত্যিক-শিল্পী সঙ্ঘে সঙ্গ ও মার্কসবাদী মৈত্রী-কর্মসূত্র-সন্ধান।

আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজ-এ থাকাকালীন ফরাসী সরকারের বৃত্তি লাভ : শরবন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গবেষণার সুযোগ ১৯৪৮-৫১। সাহিত্য-শিল্পান্দোলনে দুই শতাব্দী সন্ধির একটি বড় মোড় ফেরাকে গবেষণায় কৃতিত্বসহ প্রতিফলন ও সসম্মানে ডক্টরেট; এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসী বিভাগীয় প্রধান ডঃ বানোয়ার আমন্ত্রণ, অধ্যাপনায় যোগদান (১৯৫১)। সত্তর দশকের গোড়ায় সেখান থেকে অবসর ও স্থায়ীভাবে কলকাতায় : এখন নিজের লেখাই জীবন-জীবিকা।

কালানুক্রমিক তাঁর কাব্যগ্রন্থ ও সংকলন : প্রান্তরেখা (১৯৪৩), উৎসের দিকে (১৯৫৪), ঘনিষ্ঠ তাপ (১৯৬৩), মঞ্চের বাইরে মাটিতে (১৯৭০), অরুণ মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৭২), শুধু রাতের শব্দ নয় (১৯৭৮), প্রথম পলি শেষ পাথর (১৯৮০)। পুরস্কৃত কাব্য : ঘনিষ্ঠ তাপ (উল্টোরথ ১৯৬৬); শুধু রাতের শব্দ নয় (রবীন্দ্র ১৯৭৯)।

জটিল নাগরিক জীবনবিন্যাস মননে স্বদেশ ও প্রবাসের অন্তর্লীন অভিজ্ঞতার রণনে, স্মৃতিসত্তা-ভবিষ্যৎ-ভাবিত চেতনার নিরন্তর পরিক্রমায় তিনি উৎস থেকে নদীর মতো, শিকড় থেকে গাছের মতো অক্লান্ত গতিশীল। বক্তব্য ও রূপের ভাঙাগড়ায় যুগপৎ প্রবীণ ও নবীন। গদ্যকবিতায় অনন্য। প্রথম দিকে ধ্রুপদী গদ্যের অন্বয়ে সংহত মুন্সিয়ানা, পরে উত্তরঙ্গ চেতনার টানাপোড়েনে ভাবনা-বাসনার পাল্টাস্রোত, দ্রুতি, বাঁক পাক এনেছে অন্য মর্জির বুনন, ঘূর্ণন, মার্জিত 'মাত্রা'।

বন্ধনী

শৌখীন ছায়া যবনিকা টানে দীর্ঘতর।
তপ্ত ভ্রমণ অচল তবে ?
দীর্ণ সময় পালক ছড়ায় প্রতিক্ষণে,
ফেনিল ছোঁয়া শয্যা ছেয়ে।
আঙুলে আঙুলে রক্তিম ছিল কী আগ্রহ—
সে আদি পর্ব লুপ্ত কবে !
শীতল শিরায় ঘুম আনা সোজা দু-চোখ যত
হবে অসহায় সামনে চেয়ে।

বক্সংসব কই ভোলা যায় অসঙ্কোচে ?
স্ফুলিঙ্গ তার উড়ছে কোনো
দক্ষিণা হাওয়া জানলার ধারে, হয়তো কোনো
ঝোড়ো কুন্তলে তারার মতো
লঘু আশ্রয়-বিলাসী প্রণয় নিরুদ্দেশে
হৃদয়কে চায়, জড়ায় মনও।
বিদ্রোহী স্মৃতি পটভূমিকায় আগুন আঁকে
লাল আভা কাঁপে ইতস্তত।

অপঘাত চাওয়া বিদ্যুতে সেই পাহাড়-পথে
সফল হলো কি আলিঙ্গনে ?
দুঃসহ পদশব্দ নেই বা এখন কানে,
চমকায় দীপ সঙ্গোপনে।

গলি

কুটিল দংশন কাটে ধানশীষ মাঠে মাঠে,
গেঁয়ো সন্ধ্যা ভয় পায় ;
পাকা বীজ টুং টাং মিঠে নাচে
বেজেছিল ক্ষেতের ডেলায়,
পাগল ঝাউয়ের ফাঁকে
এখন হিংস্র সেই বোল।
দু-একটা লণ্ঠন বুনো চোখ
ডুবে গেল অচেনা গলিতে
সবাইকে টেনে গেল রক্তাক্ত যাত্রায় ;
সে-গহনে অগণ্য প্রিয়ের চলা,
স্নায়ু ফুঁড়ে আয়ুর দুর্বল গ্রন্থি বাঁধা
উন্মুখ বিশ্বাস পোষা বুকে।

দাওয়ার ওপারে
সন্ত্রস্ত গলির কোনোখানে
ছায়া-আঁটা আঁধার ফটকে
অগ্রদূত হৃদয় ঘা দেয়।
তারপর কোন রাজ্য কোন রাজধানী ?
প্রিয়তম কোন ভবিষ্যৎ ?

দুজনকে দেখেছিলাম

গমের ক্ষেতে তাদের দু-জনকে দেখেছিলাম। পাকা শীষগুলো উঁচু করে তুলে ধরেছে যেন সামনের সমস্তটা পথ তাতে আলোকিত হয়ে যাবে। চড়ুই বুলবুলির ঝাঁক তাদের হাতের

নাড়া লেগে পালানোর পর সারা মাঠে তারা তাদের উজ্জ্বলতা ঢেলে দিয়েছে। যেটুকু কুয়াশা ধুতি আর শাড়িতে তারা জড়িয়ে এনেছিল তাও আর নেই। কাছে এবং দূরে বাড়ি ঘর পাথর পুরোনো গাছের গুঁড়ি তখনও ভয়ঙ্কর হয়ে আছে, কিন্তু সে-সবে ঘেরাও হয়েও তারা এক নিবিড় উৎসবের প্রবাহ ধরতে পেরেছে, আমার মনে হয়েছিল।

আমি আশা করেছিলাম আবার তাদের দেখা মিলবে। উদভ্রান্ত হাট থেকে বেরিয়ে এসে দুটো মুখের আদল দেখে থমকে দাঁড়ালাম। তারাই বুঝি গাঁয়ের আবছা কোণে দুখানা পোড়া রুটি সামনে নিয়ে বসে আছে। কিন্তু এতখানি ব্যর্থতা আমার বিশ্বাস হল না। তাই আবার এলাম ক্ষেতের ধারে। তারা নেই। সারা মাঠ খাঁ খাঁ করছে। গমের যে দানাগুলো ঝরে পড়েছিল সেগুলো খোঁজাখুঁজি ক'রে কয়েকজন ধুলোর রাস্তায় উঠে এসেছে। তাদের জিগ্যেস করতে তারা চিনল। উত্তর দিল: ওরা দু-জন তো সেই কোন্ কালে স্বপ্ন দেখতে চলে গিয়েছে।

এই প্রান্তে

এই প্রান্তে উচ্ছন্ন ঘর। আমাদের আওয়াজ ঝাউয়ের হাওয়ার সঙ্গে ফেরে আর নদীর ধ্বসে নামে। সে এক ভীষণ নির্জনতার স্বর, অথচ আমাদের সব ঘনিষ্ঠতা তার ভিতরে।

মেঘের মস্ত নিশান ওড়ে, তার উপর আমাদের তপ্ত মুখ আঁকা। সেই শোভাযাত্রা দেখে-দেখে-ক্লান্ত চোখ আমরা নামিয়ে নিই। তারপর মুখ দেখবার জন্যে আমাদের শুকনো ডাঙার তাত থেকে স্ফুলিঙ্গ বের করি।

আশা আর অনুশোচনার অসহ্য ভার আমরা ধু ধু মাঠের উপর ছুঁড়ে দিই। আমাদের ছিটোনো স্ফুলিঙ্গ লেগে তা পুড়ুক।

স্বর্গের দিকে যে হাত দুটো বাড়িয়েছিলাম আমি তা আবার তোমার কাঁধের উপর রাখি। আমার স্পর্শ নিয়ে তুমি পাথরমাটির সঙ্গে একাকার হয়ে যেতে চাও, যেখানে চিরকালের মতো আমি তোমায় ঢেকে থাকব। সব ভান আমরা খসিয়ে ফেলি। এই প্রান্তে আমরা উজাড় হয়ে যাই। এই প্রান্তে।

এর পর

বাগানে ফুলের আভায় চমৎকৃত মুখ
আর কথার ঝুমুর,
অনর্গল শরীরের ঢেউ
পরিষ্কার হাওয়ায় পল-কাটা,
মনের বাঁকা পথ আলোর তোড়ে ভেসে গিয়েছে
আলোয় ভাসছে মেয়েরা
তাদের গালে গলায় স্তনে উরুতে স্বচ্ছ দিন
তাদের ঘিরে নাচ
যেন পেখম মেলেছে আলো,
পাপড়ি আর পাতার ঝাড়
চোখের পদ্মপলাশ
চিকন বাহার কোণে কোণে ঠিকরোয়!
মাটির ভিতর থেকে ছিঁড়ে-যাওয়া দিন
সব ভাবনার বাইরে আলগোছে ধরা।

এর পর বাঁচবার সময়।

দিনের এই ভঙ্গুর পাত্রটা এখনি খানখান হবে
আর সে-ঝঞ্ঝনা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে
ছড়াবে
বিস্মরণের সীমা পার হয়ে ছড়াবে
একেবারে হৃদয়ের তল পর্যন্ত
তারই রেশ ধরে বুড়ী পৃথিবী কতকালের গান
ধরবে
ধুলোয় ধুলোয় শিকড়ে।

আবার আমাদের ঘর
আবার আমাদের রক্তে মাটির কল্লোল।

মনে আসবে

প্রজাপতি ওড়ার ছোট্ট জায়গা। হাল্কা আর গাঢ় কিছু রঙে হাওয়া বুঁদ হয়। গুটিকয় মাত্র কুঁড়ি, কিন্তু তারা বুঝি সারা আকাশ জুড়ে ফুটবে। নরম জমিতে কয়েকটা উল্লসিত পায়ের দাগ। কারা ছুটে গিয়ে সূর্যের আলোর মধ্যে উধাও হয়েছে।

অস্থির উত্তাল ক্ষেতটা আরও দূরে। তবু এখান থেকেই দেখা যায় কাস্তেগুলো হঠাৎ অবাক হয়ে থেমে গিয়েছে। এক প্রতিশ্রুত অপরূপ আকাশ যেন তাদের উপর। মাঠভাঙা দুরন্ত নিষ্ঠুর স্রোত থিতিয়ে সোনার দীঘির মতো হয়েছে।

কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থাকার সময় নেই। রোদের ভিতর নতুন নগর উঠেছে। বাড়ি ঘর রাস্তা যদি জ্যোৎস্নায় বা অন্ধকারে ডুবে যায় তাহলে প্রদীপ্ত উৎসব হবে কী ক'রে? ঝাড়বাতি সাজাবার আছে, তোরণ তুলবার আছে। তারপর আবার নতুন নগর।

বড় বড় স্তম্ভের পেছনে হয়তো বন্ধুদের মুখ: তারা অভ্যর্থনা অভিনন্দন উচ্ছ্বাসের দমকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে। আমরা কেউ কারো খোঁজ পাবো না। কিন্তু এ জায়গাটুকুর কথা আলাদা করে আমাদের সবারই মনে আসবে। অশ্রুর পথ পেরোতে গিয়ে এখানে সবাই এক মুহূর্ত দাঁড়িয়েছি। একা একা।

কথা এখনো ফোটেনি

কথা এখনো ফোটেনি, কেবল শব্দের আবেগ। তা থেকেই দৃশ্যের পর দৃশ্যে আমার সামনে খুলে যায়। সেতুর উপর হাজার হাজার পায়ের তাল, আলোর ঝলক, তোরণ, এক-বুক শস্য, নদীর পাড়ে হৈহৈ মেলা। আমি স্ফটিকের গোলকে পৃথিবীর ছায়া দেখি। আমার কানে পোড়ামাটি পার হওয়ার সুর।

আমি যেখানে আছি সে এক বিশ্বাসঘাতক এলাকা। একটা কথাও থিতোয় না, দিনরাত প্রতিধ্বনির তামাশা। যে-সব শব্দ আমি শিখেছি তাদের অর্থ আমার আয়ত্তে নেই। তাদের প্রতিশ্রুতি এক, ব্যবহার আর-এক। আমার মুখে ছাইয়ের আস্বাদ।

রোজ আমি টলটলে চোখদুটোর মধ্যে তাকাই। সেখানে যে-ভাষা আছে তা ঠোঁটে এসে পৌঁছবে কি? সে-ভাষা কি ফুল হবে, ফসল হবে? দোসরের ধমনীর রক্ত হবে? আমার ভয়, শব্দগুলো যদি শেষ পর্যন্ত আগুন থেকে আলাদা হতে না পারে। আমি প্রতীক্ষায় টানটান হয়ে আছি।

শুধু রাতের শব্দ নয়

প্রথম সমুদ্র আমার ভোরবেলার।
অন্ধকার তাঁবুটা ভেঙে দিয়ে
আমি তাকিয়েছিলাম যেখানে সূর্য ওঠে,
একমুঠো ঝিনুকে শুধু রঙ নয়
মাস্তুল হেলানো ছায়া।

ভিজে বালির উপর পায়ের দাগ অস্থির,
জলের উচ্ছ্বাসে কোটি গলার ডাক
আমাকে তোলপাড় করেছিল,
আমি পৃথিবীর আলোয় ঘুরে
অদৃশ্য তট আর আমার দোসরদের কথা
ভেবেছিলাম।

শেষ সমুদ্র সূর্যডোবার।
আদিগন্ত ঢেউ কি সমস্ত দুঃখকে নাচায়?
সন্তানসন্ততির মুখ
তুমুল জলের উপর ঝুঁকে থাকে,
আমি কি তাদের যন্ত্রণার ছাঁচে দেখি?
অগণ্য দোসরের পাশাপাশি
তারা আমার মমতায় সংলগ্ন,
সেখানে কোনো আশা কখনো মরে না।

শুধু কি রাতের শব্দ?
আমি নিশ্চিত শুনি ভোরবেলার যাত্রার
আয়োজন
আমার শেষ সমুদ্রে।

কথা

সহজ বলার ছিল যেমন নিঃশ্বাস।
ক্ষেতে মাঠে জল পড়তে অঙ্কুরেরা হেসে
মাথা নাড়ল একসঙ্গে, আমাকে আকাশ
দেখাল, দেখাল মেঘ, নীল পরিবেশে
যখন বাতাসে ডানা মেলে বুনো হাঁস
উড়ে গেল টুপটাপ শান্তিকণা শেষে
আমার মুখেও লাগল, ঘাসজমি জুড়ে
ঘণ্টা বাজল শিশুদের খেলার দুপুরে

তখনি আমার কথা উৎস থেকে জেগে
বৃষ্টি রোদ অপাপের সমান্তরালের
পথ ধরল। আমি যেই নদী স্রোতোবেগে
আমাকে ঢাললাম অমনি টের পেলাম বেড়
চোরা পাথরের। এক কুটিল প্রণালী
কথা ভাঙে, বুকে খেলে বাঁকা চতুরালি।

এর পর কোনো

ধুলোপড়া তুকতাক লাগিয়ে আম একদৃষ্টে ছিলাম এইবার মঞ্জরী এইবার তুমি তোমাকে ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার ভোজবাজিতে রেখে হওয়া খেলানো। ফুরফুর নয় ফুৎকার মাটি থর-থরাচ্ছিল খুব। ধুলোর বুজগুড়িতে এক একটা সাধের নাম ছুমন্তর কিন্তু মাটি থেকে কেউ আর ওঠে না কিছু আর ওঠে না। আমি দেখিনি আকাশে মেঘ নেই মাঠটা কুপোকাৎ হয়ে আছে। আমি হাঁটু মুড়ে আমার সামনে দাঁড়াবার জায়গা কোথায় গজানো কোথায় দেখব, আমি বর্ষণ ভাবিনি মঞ্জরী আমি পিপাসা ভাবিনি। দিন যায় কিছই হয় না এই সব খেলোয়াড়ি একলা কাঠের মধ্যে শেষমেশ একলা আমি, এরপর কোনো গুঁড়ি-গুঁড়ি জল কি তোমাকে দিতে পারব ভালোবাসা?

গণ্ডি

মাটি কাঠ জলের গাণ্ড মানুষের গণ্ডি বেঁকে জড়িয়ে ছড়িয়ে মুচড়ে আমাকে নিয়ে খুব নক্সা বানায়। আমি তাদের মধ্যে ঘুরেফিরে এসে ফিরোই আর আকাশ নামতে নামতে একেবারে মাথার উপর যেমন সমুদ্রের তলায় তেমন চাপে মনে হয় এবার হয়ে গেল ফয়সালা কিন্তু কোনো এক সুড়ঙ্গ দিয়ে শোষানির টানে ছিটকে বেরিয়ে আবার বাঁকা ঘেরের মধ্যে হাঁটা, মাতাল পা শ্যাওলায় ঘাসবনে পোড়া-বালিতে আঁস্তাকুড়ে লাঠিসোটা হুড়কোর সামনে।
ঠাউরে বুঝি পোকারা জন্তুরা সর্বক্ষণ সুখদুঃখের টানাপোড়েনে রয়েছে। আমি চেঁচিয়ে বলি আমি এক বড়ো পোকা এক জন্তু কিন্তু কে কার কথা অন্যের কথা শোনবার কান আমাদের কই হাওয়া টুকরো টুকরো করে যে যার কোণে টেনে নিয়েছে যাতে বেঁচে বর্তে থাকা যায় আর সর্বক্ষণ একোণ ওকোণ থেকে গোঙানি আদুরেপনা মারমার কাটকাট। বাঘবাঘিনীর জোড় শঙ্খলাগা সাপ প্রেমিক প্রেমিকা এদের দেখে ঠিক আছে বলতে না বলতেই দাঁত নখ বন্দুকের ধুন্দুমার। মাটি কাঠ জল কিছুই আর ছোঁয়া যায় না জন্তুতে পোকায় খেলোয়া হারজিৎ। আহা তোমার কথাটা শোনাও আমারটাও একটু শোনো কিন্তু সাড়া নেই সামনের পেছনের পাপের ঢিবিতে ঝোপে অনবরত শিউরোনি গরগর এই বুঝি সোহাগ ভাবতে না ভাবতেই হুঙ্কার কথার উপরে লাফ সবই ছিন্নভিন্ন।

মাটি কেবলই কাঁপছে

ছবি তোলা হবে আমি মুখ উঠিয়ে ধরাছি কতবার রাত্তিরে কতবার দিনে নরম পলির উপরে পা রেখেছি ছড়ানো ভালোবাসায় শিকড় গেড়ে শরীরটা যদি নাড়ার মধ্যে গাঁথা হয়ে যায়। পরিবেশ চমৎকার সাজানো হয়েছে গাছপালা ফুল চাষবাস জ্যোৎস্নার ঢল নামছে রোদ্দুরে ফসল পাকছে মাঠের উপর দিয়ে ছুটিয়ে দেবার জন্যে খুশির হাওয়া মজুত রয়েছে, ছবিটা একবার উঠলে ধন্য ধন্য তুমি আমাদের মুখ রাখলে তুমি যুগ যুগ কিন্তু আমি পারছি না ধনধান্যে বসুন্ধরা সবার সেরা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু আমি স্থির হতে পারছি না আমার পায়ের তলার মাটি কেবলই কাঁপছে।

মোড়ের ঘুরপাক

মোড়ের ঘুরপাক আমি পা ফেলে রেখেছি
আকণ্ঠ লাফিয়ে ওঠে,
মালার পরাগ পাঁপড়ি টুকরো কথা
মুখমণ্ডলের আলো থেকে খ'সে
দুকূল হারিয়ে ঘোরে।
পুরোনো রাস্তার কাদা ভেঙে
কিছুদূর যাই আমি ফের হ'টে আসি।
এদিকে সমস্তক্ষণ অন্য গ্রহ
চক্রবৎ মাথার উপরে অবিরত,
আমি দেখতে পাই জলের ওপারে
ঘাসফুল স্বচ্ছ পাখনা রঞ্জন আকাশ স্ফটিকের
কোণ,
সবুজ বন্দরে কয়েকশো মাইল শূন্য
অনুরাগে ভ'রে আছে।
আমি ঘরবার করি,
রাস্তায় উঠোনে বারান্দায়
শরীরের ভার রাখি টেনে তুলি,
আর ওই গ্রহ মাথার উপরে ফিরে ফিরে আসে।

অন্য এক হাত

অন্য এক হাত মুখগুলোকে ভাঙে
কত যত্নের যে পরিশ্রম ছিল ভাবো,
চালচিত্র সাজিয়ে কোনো অন্ধকারে
নিয়ে যেতে নয় কিংবা হিমঘরে
রাখতে নয়, সামনের উঠোনে
ফুলের দঙ্গলে ফুটবে
এবং আকাশ থেকে নানান জেল্লুস
টেনে নেবে এবং অনেক বুক
ভ'রে দেবে, এতসব, ইচ্ছের ছবি ছিল।

মানবিক চোখের মুগ্ধতা
সহজে কি আনতে পারা যায়?
রক্তের অদৃশ্য নড়াচড়া
সাধ আহ্লাদে জুড়ে দেওয়া
সেও বড় শক্ত জাদু।
আর রক্ষণাবেক্ষণ?
কাঁটাতারে ঘিরে নয়,
শিশির রোদ্দুর সাক্ষী ঘরের ওসার
কলমী নোটে ধানের বাতাসে ছু'কে দেওয়া
সেও এক কঠিন প্রযত্ন ছিল।

কিন্তু অন্য হাত
ছন্দছাঁদ ভাঙে, খালি ভাঙতেই থাকে।

শুকিয়ে যাওয়া

শুকিয়ে যাওয়ার বড়ো ভয় রয়েছে। কোথায় কোন ফাটল দিয়ে নেমে কোথায় পৌঁছোনো সে এক আঢুল রাত্তির যেখানে বিছিয়ে যাওয়া আর রস টানা যেখানে গোছা গোছা সবুজ শিরের চুনি-মুখ বাড়ানো এই জখম এই বাঁচন এই বাড়ন যেখানে আকাঁড়া চাং গ'লে ফল গজাবার পাকবার টগবগানি; তবেই তোমার কথা টইটম্বুর। নইলে ওই তো শব্দগুলো মরাকাঠ। তোমার আঙুল শুকনো গুঁড়োর মধ্যে খেলে আর ঝুরঝুর ক'রে উড়ে যায় অক্ষর বুকের আওয়াজ ভালোবাসার মানুষ। শুকিয়ে যাওয়ার এই ভয়।

অলঙ্কার

কবিতায় কথা বলি, তা নাকি তক্ষুণি হয়ে যায় অলঙ্কার। তবে এই অলঙ্কারই পরো। এ-সজ্জা বানাতে আমার তো দিন যায় রাত যায় বিন্দু-বিন্দু রক্ত যায়; একবার প'রে দেখতে পারো কোথায় তা ঠিকরোয় আলো, প্রসাধনে না তোমার হৃৎপিণ্ডে? হাজারটা কোণ চামড়াকে আদর করে, না রক্তাক্ত পথ ধ'রে হাড়ে বেঁধে? পরো, পরে দ্যাখো।

নির্বাচন ও সম্পাদনা :
নিখিলকুমার নন্দী

আলোকচিত্র : পংকজ ভট্টাচার্য

ধারাবাহিক উপন্যাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পাঁচ

যখন একা চুপচাপ বসে থাকেন নিজের বাড়িতে দোতলার করিডরে—ইজিচেয়ারে—তখন তার মনে এরকম দু-চারটে কথা নড়াচড়া করে বটে, কিন্তু তিনি নিজে তো চারশো টাকা মাইনে পাচ্ছেন—শীগগিরই পাঁচশো, হরিলালবাবুকে একটু তাঁবে রাখলে সাড়ে পাঁচশো হয়ে যাবার সম্ভাবনা—সোয়া পাঁচশো হয়ে যাবে এই মে মাসের গভর্নিং বডির বাসন্তী-নিদাঘ বৈঠকে। কথা দিয়েছেন হরিলালবাবু। বোকা হ্যাঁচকা ইশারাগুলোর গলা টিপে শেষ করে ফেলেন কালীশঙ্করবাবু। প্রিন্সিপাল তার নিজের নিরালা কোয়ার্টার্সও পাবেন—মস্তবড় কলেজ ময়দানের একটেরে—নিম ঝাউ আমলকী জামগাছের ছায়া রোদের ভিতর বেশ বড়সড় সুন্দর একটা কাঠের বাংলোবাড়িতে। অ্যাসবেসটসের ছাদ। একতলা বাড়ি—অনেক উঁচুতে মেঝের পাটাতন। চমৎকার চঙের মতো কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হয়—যেন সুখী স্বস্তিকাম শান্তিপ্রাণ শ্রমণ তার নির্জন আশ্রম মন্দিরে প্রবেশ করছে। আঃ আ-হ্-হ্—হা-হা-হা। চোতের বাতাসে পিঠ বুক জুড়িয়ে নিতে নিতে ভাবছিলেন। কালীবাবু তো এই পদ্মার পারের দেশের লোক নন। তিনি এসেছেন বেহার-বাংলার প্রত্যন্ত থেকে অথচ এ দেশের লোকের মন মজিয়ে তিনি এদেরই মামা-মেসোর চেয়েও গলায় গলায় আজ। সবসময়ই জলপাইহাটির নিঃশ্রেয়স (শব্দটি সম্প্রতি কলকাতার তাস-সিগারেট-বই-বুকনির দু-চারজন বৃত্তান্ত পণ্ডিতের কাছ থেকে শিখে এসেছেন) নিঃশ্রেয়সের চিন্তা মানে ঠিক কল্যাণ কামনা করেন। কিছু নয়—বোকা হরিলালকে হাতে রাখতে হয়। একটু তাইয়ে দিলেই টোপ গেলে হরিলাল। টাকা করে নিয়েছিস, এখন তোর বড় কথা হচ্ছে মান; মানী হবি? বেশ তো হ না, কে তোকে বাধা দিচ্ছে হরিলাল? আমি পথ ছেড়ে তোকে কলেজের সেক্রেটারি করে দিয়েছি। তুই যদি নামে প্রিন্সিপাল হতে চাস, বেশ তো হবি: আমার কোনো আপত্তি নেই, সপ্তাহে এক-আধ ঘণ্টা এসে হিন্দু-ল পড়িয়ে যাবি ফোর্থ ইয়ারের ছেলেদের: সে ঘণ্টায় আমার ইংরেজির ক্লাসটা আমি বাদ দিয়ে দেব: প্রিন্সিপালের কামরায় ইজিচেয়ারে বসে থাকব—ফ্যান টিপে দিয়ে: আমাকে পাঁচশো টাকা মাসোয়ারা দিলেই হবে।

মান! মানকচুপাতার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে কত মানের কাজই তুমি করেছ হরিলাল! কোন কোন সধবা-বিধবার কোন ছেলেটি মেয়েটি তোমার, জানা নেই বুঝি আমাদের?

হ্যাঁ, কালীশঙ্করবাবু—

আজ্ঞে বলুন।

কালীশঙ্কর ভেনেস্তার চেয়ারটা একটু কাছে টেনে নিয়ে, হরিলালের দিকে এগিয়ে, খুব বেশি ঘেঁষে নয়—চেয়ারটাকে পেতে নিয়ে বললেন, ‘আজ্ঞে—কেন ছোট ছেঁদো কাঠের চেয়ারে বসেছেন আপনি। প্রিন্সিপাল মানুষ—আপনার জন্যে একটা কেম্বিসের ডেকচেয়ার জুটল না। মতিলাল! ওরে এই মোতে হারামজাদা!’

না—না—কিছু দরকার নেই হরিলালবাবু—বেশ ভালো চেয়ার—বিলিতি ভেনেস্তা—

ভেনেস্তা আবার দিশি বিলিতি আছে নাকি—

আছে দিশিও একরকম! পাইন কাঠের মতন; তবে খুব খেলো জিনিস—জলপাইহাটি কোর্টের হাজার দেড় হাজার বাঁদির উকিল হিমাংশু চক্রবর্তী বললে। হিমাংশুর বয়স পঞ্চাশের নিচে। কলেজ কমিটির মেম্বার হিমাংশু। ‘আমার ডেকচেয়ারটা আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি স্যর’।—বললে হিমাংশু কালীশঙ্করবাবুকে।

না না—ঠিক আছে, ঠিক আছে—কালীশঙ্কর ডানহাতের পাঁচটি আঙুল উঁচিয়ে নামিয়ে দিলেন।

আমরা সবাই তো সোফাসেটিতে ইজিচেয়ারে বসেছি হরিলালদা—উকিল ব্রজমাধববাবু বললেন, ‘কালীবাবু কেন ভেনেস্তা বেছে নিলেন’—

ভেনেস্তা হবার জন্যে—হে-হে-হে—হরিলাল তার নাক ঠোঁটের কোণা খামচি, খিঁচিয়ে হেসে ফেলে বললেন, ‘মতিলাল! ওরে হারামজাদা হারামিকা—শিবনলাল এসে বললে—‘বাবা বাড়ি নেই, ইস্টিশনে গেছে দাদাবাবুর মাল খালাস করে দিতে’—

হারামিকা—শিগ্‌গির একটা সোফা নিয়ে আয়। শিবনলাল অন্দরের থেকে সোফা আনতে গেল।

সোফাসেটি তো ছিল চারদিকে: আপনি নিজে কেন উটকো চেয়ারে বসতে গেলেন কালীবাবু?

বড্ড ছারপোকা কামড়াচ্ছে হরিলালবাবু।—হিমাংশু চক্রবর্তী বললে।

সত্যি, ছারপোকা হরিলালদা—বসা দায়। ব্রজমাধব বললেন।

ঐ নতুন ভেনেস্তা চেয়ারটায় ছারপোকা নেই। কালীবাবু ঠিকই বলেছেন—হ্যা-হ্যা-হ্যা-হ্যা-হ্যা হাসতে লাগলেন।

যা ছারপোকা দাদা, কী হবে সোফায় বসে। বেশ আছেন আপনি যা হোক কালীবাবু।—ঘোষমল্লিক স্টেটের উকিল বঙ্কিম দত্ত বললে।

শিবলাল ও পূর্ণ ধরাধরি করে একটা চমৎকার নতুন সোফা হল ঘরে এনে বসাতেই সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে গটগট করে হেঁটে সোফাটার উপর ধপাস করে বসে পড়লেন বারের উকিল. কলেজ-কমিটির মেম্বার ওয়াজেদ আলি সাহেব। কালীশঙ্করবাবু নিজের চেয়ার থেকে উঠে বসতে যাচ্ছিলেন সোফায়।—হঠাৎ আলি মিঞাকে চোখে পড়ায় ভেনেস্তায় ফিরে এলেন। সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

কেন কী হলো—হাসবার কী হলো—জিজ্ঞেস করলেন ওয়াজেদ আলি।

কিছু হয়নি।

শিবলালকে একটা ডেক চেয়ার আনতে বললেন হরিলালবাবু. 'না কি সোফা আছে আরো অন্দরে ?' চলে গেল শিবলাল।

ভালো তো মিঃ ওয়াজেদ আলি ?

ভালো ওয়াজেদ আলি সাহেব ?

সেলাম ওয়াজেদ আলি সাহেব, তবিয়ৎ ভালো তো। আজ বার লাইব্রেরিতে দেখলুম না তো অপনাকে—

আদাব, মিঃ ওয়াজেদ আলি। মিঃ ইমাম হোসেন বেড়াতে বেড়াতে আসবেন কি এদিকে একবার ?

এই যে জনাব ওয়াজেদ আলি সাহেব : আপনার কথাই ভাবছিলাম। আমি গেছলুম কাল আপনার ওখানে। বাড়িতে পেলুম না ; শুনেছিলুম আপনার নিউরালজিক পেন হয়েছে—

ওয়াজেদ আলি অত্যন্ত আপ্যায়িত বোধ করছিলেন। আপ্যায়িত করে যদিও ব্যতিব্যস্ত করে ফেলছে তাঁকে সব কিছু তবুও খারাপ লাগছিল না তাঁর। তাঁর চারিদিককার এসব মানুষদের মৌখিক আন্তরিকতা তো খুব নিখুঁত—এই হলেই হলো যেন ওয়াজেদ আলি সাহেবের ; ভিতরের আন্তরিকতা অন্ধকারে ভুট্টার মতো পুড়িয়ে খায় ভুট্টার ক্ষেতের পাশে বসে সাদামাটা দেহাতী লোকেরা : উপরের স্তরে এ জিনিসটা খুব কম। উপমাটা প্রকৃতির থেকে নেওয়া—বেহার অঞ্চলের। ওয়াজেদ আলি সাহেব বাঙালী মুসলমান - পদ্মার ওপারের : কিন্তু সম্প্রতি কিছুদিন থেকে বেহারের কথা ভাবছিলেন—খুব বেশি। ভুট্টা নয়—জওয়াব জওয়ার—ওয়াজেদ আলি ভাবছিলেন।

জনাব ইমাম হোসেন সাহেব ? না তিনি আজ এদিকে আসবেন বলে মনে হয় না।

বার লাইব্রেরিতে আমাকে দেখেননি ? গেছলুম :--খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছি। পুলিশ সাহেবের মোটর লঞ্চে একটু ঘুরে বেড়ালুম। খানা পিনা খেয়ে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল।—বললেন আর একজনকে, 'নিউরালজিক পেন। হ্যাঁ, বড্ড কষ্ট পেয়েছি চার পাঁচদিন—দুটো মাড়ির দাঁত··· মাড়ির দাঁতে বদ রক্ত জমে টনটনিয়ে উঠেই পেনটা হয়েছিল মনে হয়। কনস্টিপেশনও আছে। ডাক্তার জোলাপ নিতে বলেছিলেন। কিন্তু আজ এ-বাড়িতে ম্যাজবান. কাল ও-বাড়িতে গিন্নী-পাগল চালের পোলাও আর মুর্গির কালিয়া রেঁধে বড় বিবিসাহেব যেতে লিখে পাঠিয়েছিল— কী করি, সামাজিক মানুষ হয়ে থাকতে হলে দুর্ভোগ ভুগতেই হয়'—

জোলাপ নেওয়া হলো না ?

না।

গিন্নীপাগল চাল কাকে বলে আলি সাহেব ?

খুব চমৎকার চাল।

বাসমতীর মতন ?

না না, খাবেন একদিন হরিলালবাবু ?—জিজ্ঞাসু ব্রজমাধবকে টপকে হরিলালবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ওয়াজেদ আলি।

শ্রদ্ধা ও আত্মমর্যাদায় হরিলাল আস্তে আস্তে বললেন, 'আমার আর খাওয়া-দাওয়া, দাঁত নেই কী খাব আমি। মাংস খেতে পারি না, কুচিয়ে কিমা রেঁধে দেয়, সেটাই খাই রোজ'—

রোজ ?—কে যেন জিজ্ঞেস করল। হরিলাল নিজের কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। তিনি যে রোজ মাংস খান একথা শুনে ওরকম দাঁত কেলিয়ে 'রোজ' বলে উঠল কে ? নিজে কথা বলছিলেন, নিজের কথার দিকেই কান পেতেছিলেন তিনি। অন্যদিকে মন ছিল না তাঁর। কে মানুষটা বলে উঠল 'রোজ'। হরিলালের কানের ভিতর দিয়ে মনে ঢুকে তাঁকে সচকিত করতে একটু দেরি করেছে বলেই হরিলাল বুঝতে পারছে না কে বলেছে। চোখ তুলে চারিদিকে তাকিয়ে সহাস্যে সমীচীনভাবে খতিয়ে দেখছিলেন, 'হ্যাঁ রোজ খাই' হরিলালবাবু দৃঢ়ভাবে বললেন।

কেউ কোনো কথা বলতে গেল না।

রোজই আমার মাংস না খেলে চলে না! রোজ! আমি মাংস খাই-কিমা-মাংস কুচিয়ে কিমা করে খাই। এবেলা-ওবেলা ঘিয়ে রসিয়ে। রোজ। কে জিজ্ঞেস করেছিল আমি রোজ মাংস খাই কি না ?

কেউ কোনো উত্তর দিল না।

কে জিজ্ঞেস করেছিল ? কেমন হাসিহাসি অমায়িক মুখে এর-ওর, ওর-তার, কালীশঙ্করের—সকলের দিকেই হরিলালবাবু চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিলেন কেমন একটা কঠিনতার আবহাওয়া সৃষ্টি করে তবুও। 'আমি রোজ মাংস খাই কি না, জিজ্ঞেস করল কে ?'

ক্ষ্যামা দিন হরিলালবাবু। যে জিজ্ঞেস করেছে সে যখন নাচার তখন একটা কথা নিয়ে এরকম বাঘা তেঁতুলের সিন্নি পাকিয়ে তো কোনো লাভ নেই—ওয়াজেদ আলি বললেন।

ঠিক বলেছেন আপনি আলি মিঞা,—হরিলাল বললেন 'রোজ মাংস খাওয়া যে কি হিন্দুর বাচ্চারা তা বুঝবে কি করে ?'

ওয়াজেদ আলি জিভ কেটে হাত জোড় করে হরিলালের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না-না, ওটা ঠিক হলো না। কোনো রকম কম্যুনাল কথা বলবেন না হরিলালবাবু। হিন্দু মুসলমান কি আলাদা কিছু ?'

তা নয়,—ব্রজমাধববাবু বললেন, 'আলাদা হতেই পারে না'।

মুসলমানদের একতা আছে : তারা জানে যে হিন্দু-মুসলমান মিলিয়ে কিরকম চমৎকার বিসমাল্লা বাদাম উড়িয়ে নেওয়া যায়। স্টিমার অফিসের উকিল অস্তিম দত্ত বললে।

ঠিক কথা। আমরা এক—আড় চোখে ওয়াজেদ আলির দিকে তাকিয়ে সংক্ষেপে বললেন নবকৃষ্ণবাবু। তাঁর অবশ্য অন্য নানারকম কথা বলবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এ জায়গায় নয়—এখন নয়।

আমাকে কাল ফকরুদ্দীন সাহেব বলছিলেন যে এ দেশটা যদি মুসলমানের দেশ হয়, তাহলে হিন্দুরও দেশ। মুসলমান, হিন্দু—সব আলাদা আলাদা নাম বটে, কিন্তু আসলে দেশটাকে ভালো-উন্নত করার চেষ্টা-চরিত্রের ভিতর দিয়ে মুসলমান আর হিন্দু তো এক।—হিমাংশু চক্রবর্তী বললে।

এক, এক।—একটু অসহিষ্ণুভাবে বললেন নবকৃষ্ণবাবু। কেন যে এই নিরেস ব্যাপারটা নিয়ে এরা এত কথা কপচাচ্ছে ভালোলাগছিল না তার। অন্য কত কাজের কথা পড়ে আছে। এত বেশি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন নবকৃষ্ণবাবু যে এক দমক হেসে উঠে ওয়াজেদ আলির দিকে তাকিয়ে নিলেন। ঢোঁক গিলে একটু কথা ভেবে নিলেন।

কথাবার্তা বড্ড কম্যুনাল হয়ে পড়ছে। হরিলালবাবু—বললেন ওয়াজেদ আলি।

তাই তো দেখছি. সেই জন্যেই এ ফাস্টনাস্টিতে যোগ দিইনি আমি। হরিলালবাবু পকেট থেকে একটা চুরুট বের করে বললেন।

কেন। কম্যুনাল হলো কী. করে ?—বিস্মিত হয়ে নবকৃষ্ণ হরিলালবাবুর দিকে তাকালেন।

নবকৃষ্ণের জিজ্ঞাসায় কোনো কান না দিয়ে হরিলালবাবু ওয়াজেদ মিঞার দিকে চোখ তুলে বললেন 'ওরাই কথা বলে যাচ্ছিল। ওদের কথায় আমি যোগ দিইনি। ব্যাপারটা কম্যুনাল বটেই তো : হিন্দু আর মুসলমান এক কি আলাদা, তারা দুই জাতি কিনা, তাদের ধর্মের মতো

তাদের কালচারও আলাদা কিনা—এ নিয়ে বড় বড় লোকেরা কথা ভাববেন। ওসব নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার তো কোনো কথা নেই।' চুরুটটা জ্বালিয়ে নিলেন হরিলালবাবু।

অবিশ্যি ওয়াজেদ আলি সাহেব বড় মানুষ। কিন্তু এসব বিষয়ে তাঁর কি মতামত সেটা তিনি পরিষ্কার করে বলে আসছেন অনেকদিন থেকে অন্য জায়গায়। কিন্তু আমার এ বাড়িটা তো কোনো পলিটিকসের হাট নয়; এখানে আমরা মিলেছি—মিশেছি, শিক্ষা-দীক্ষা, কলেজ-স্কুল, দু'চারটে ব্যাংক ফেল, জালিয়াতি, পার্টিশন সুট নিয়ে আলোচনা করতে। আমার সিগারেটের টিনটা ফুরিয়ে গেছে। আপনারা কেউ সিগারেট খাচ্ছেন না যে। —হরিলালবাবু চুরুটে দু-একটা টান মেরে সেটাকে দাঁত থেকে খসিয়ে ছাই ঝেড়ে নিয়ে বললেন।

পকেট থেকে এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট বের করে ব্রজমাধববাবু দেশলাই বার করলেন। 'এই যে ওয়াজেদ আলি সাহেব, সিগারেট নিন।' ব্রজমাধববাবুর কাঁচি সিগারেট একটা খসিয়ে নিয়ে জ্বালিয়ে দু-একটা টান দিয়ে ওয়াজেদ আলি পকেট থেকে নিকেলের সিগারেট কেস বের করে ব্রজমাধব হিমাংশু সকলের ভিতর বিলি করে দিতে দিতে বললেন: আপনি চুরুট খাচ্ছেন হরিলালবাবু তাই সাধলুম না, দেখবেন খেয়ে?

কি সিগারেট ওটা?

নেভি কাট।

পরে দেখব। চুরুটটা খেয়ে নিই।

ব্রজমাধববাবুও কাঁচি বিলি করছিলেন। এ দুজন মানুষের সিগারেট জ্বলে উঠল সকলের মুখেই—কালীশঙ্কর ছাড়া; সিগারেট খান না তিনি।

ফকরুদ্দীন সাহেবের কথা বলছিলেন আপনি হিমাংশুবাবু, কিন্তু তিনি তো লীগের মুসলমান নন।

ফকরুদ্দীন সাহেব লীগের নন?

আমি জানি তিনি লীগের নন।

তিনি কি লীগের নন?

তিনি কি কংগ্রেসের মুসলমান?

ফকরুদ্দীন সাহেব লীগে ঢুকেছেন শুনেছিলুম—

ফকরুদ্দীন সাহেব কংগ্রেসের নন, কৃষক প্রজার নন। আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে। আমার চেয়ে বেশি এ বিষয় কেউ জানে না।

কে বলেছে ফকরুদ্দীন সাহেব লীগের? লীগে তিনি নেই।

ফকরুদ্দীন সাহেব কি জমায়েৎ-উল-উলেমার?

খাকসার পার্টিতে তিনি আছেন বলে মনে হয় না। না না মোমিন নন।

না না, কংগ্রেসের নন ফকরুদ্দীন সাহেব, কি বলছেন আপনি?

ফকরুদ্দীন কি কম্যুনিস্ট?

কম্যুনিস্ট ঠিক নয়। সোস্যালিস্ট পার্টির, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট নয়। আরো অনেক সোস্যালিস্ট পার্টি বেরিয়েছে আজকাল।

ফকরুদ্দীন কম্যুনিস্ট আমি জানি।

ওয়াজেদ আলি বিক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, 'ফকরুদ্দীন সাহেবের নিয়ে এত কথা। একজন মানুষকে নিয়ে বড্ড কাটা-ছেঁড়া হচ্ছে কিন্তু হরিলালবাবু। জিনিসটা কম্যুনাল হয়ে যাচ্ছে হরিলালবাবু'—

আমিও তো তাই দেখছি। সেই জন্যই ওদের ডামা-ডোলে আমি যোগ দিইনি। আমি কোনো কথা বলিনি। ফকরুদ্দীন সাহেব এটা কি ওটা কি সেটা; একজন মানুষকে নিয়ে এত কথা হবে কেন? হেঁজি-পেঁজি কথা সব! —হরিলালবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন।

যদিও এটা পার্টিশন সুটের দেশ। —কে যেন শুরু করলে।

পলিটিকস থাক। —হরিলালবাবু থামিয়ে দিলেন।

মুসলিম লীগ বলছিল কিনা যে শরিয়ত অনুসারে দেশ-শাসন

আবার পলিটিকস! ধমক দিয়ে ফেলেই হরিলালবাবু একটু হকচকিয়ে উঠলেন। শরিয়তের কথা ওয়াজেদ আলিই আরম্ভ করেছিলেন চাপা গলায়—ওয়াজেদের গলা থেকে দু-তিন রকমের সুর বেরোয়। চোখ বুজে চুরুট টানছিলেন হরিলালবাবু, মনে হয়েছিল তাঁর, যেন ব্রজমাধববাবু শরিয়ত অনুসারে রাষ্ট্রশাসনের ব্যাপারটা নিয়ে উত্তেজিত হবার পূর্বাভাস দেখাচ্ছে। বেপরোয়া ব্রজমাধব। ব্রজমাধবকে কড়কে দেবার জন্য ধমক দিয়ে চোখ খুলেই দেখলেন, ওয়াজেদ আলি কথা বলতে বলতে হরিলালকে কঠিন, শাদা বরফের মতো দাঁত দেখিয়ে থেমে গেলেন।

ব্রজমাধববাবু, আপনি শরিয়তের কথা-টথা বলবেন না। এসব বিষয়ে মুসলিম লীগের নেতারাই ভালো বোঝেন, ঠিক বোঝেন। তাঁরা যদি কিছু বলতে চান, আমরা শুনব। ওয়াজেদ আলি সাহেব রাষ্ট্রশাসনের কথা বলুন, আমরা শুনি। খুব মন দিয়েই শুনি। কিন্তু ব্রজমাধববাবু, কালীশঙ্করবাবু এ'রা এসব শাসন-শরিয়তের জানেন কী? কেন ফোঁপরদালালি করতে যান। —বললেন হরিলালবাবু বেশ স্থির গলায়, ব্রজমাধববাবু ও কালীশঙ্করবাবুকে খুব ধমকে, কড়কে দিয়ে, ওয়াজেদ আলির দিকে আশ্রয়প্রার্থী জুনিয়র উকিলের মতন আস্তে চোখ মেরে।

হরিলালের এ দৃষ্টির নিস্তব্ধ মাহাত্ম্যকে—সাত পাঁচ না ভেবে—ভালো জিনিস বলে মনে করলেন ওয়াজেদ। জলের মতন গলে গেলেন তিনি। বললেন, 'না-না, ব্রজমাধববাবু কিছু বলেননি। শরিয়তের কথা আমিই পেড়েছিলাম।'

রাষ্ট্রশাসন-শরিয়তের কথা আমি তো কিছু বলতে যাইনি হরিলালবাবু। —কালীশঙ্কর বিচলিত হয়ে বললেন, 'আমাকে কেন'—

কিন্তু কালীশঙ্করের কথাগুলো চিলে খাচ্ছে—খেয়ে যাক—গ্রাহ্য না করে হরিলালবাবু তাজ্জব বনে গেলেন, যেন ওয়াজেদ আলির কথা শুনে 'ওঃ, আপনি! আপনি বলছিলেন শরিয়তের কথা। আমি ভেবেছিলুম ঠিক যেন ব্রজমাধববাবুর গলা; নাকি কালীশঙ্করবাবুর। ভাবলুম কলেজের প্রিন্সিপাল, তুমি ছেলেদের নিয়ে কেঁদো হে, এসব উজীর-বাদশার ব্যাপার নিয়ে তোমার কী? ওঃ, আপনি বলছিলেন ওয়াজেদ আলি সাহেব! আপনি বলছিলেন কোরান-শরিয়ত শাসন-টাসনের কথা! বলুন, বলুন শুনি, আমরা সকলে মিলে শুনি; কেমন একটা আবছা ভাব আছে আমাদের মনের ভিতর, জলের মতন পরিষ্কার হয়ে যাবে সব'—কথাগুলো হরিলালবাবু পেটের থেকে ওগরাচ্ছেন বলে মনে হলো না ওয়াজেদ আলির।

খুশিই হলেন ওয়াজেদ সাহেব। হাতজোড় করে বললেন হরিলালবাবুকে—'আজ থাক। আজ কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে সব, কম্যুনাল হয়ে যাচ্ছে। আর একদিন হবে। ইমাম হোসেন সাহেব, মুস্তাক সাহেব, রফিক সাহেব ও'দের সঙ্গে নিয়ে আসব।'

বেশ তাই হবে। আমাদের জানিয়ে দেবেন কবে আসবেন। আমরা সকলে মিলে শুনবো আপনাদের কথা। —হরিলালবাবু বললেন।

পকেট থেকে একটা ভালো চুরুট বের করে ওয়াজেদ আলির হাতে তুলে দিয়ে হরিলাল বললেন, 'আপনার কেসের সব সিগারেট তো বিলিয়ে দিয়েছেন। চুরুটটা জ্বালিয়ে নিন, ভালো জিনিস। আজ তো মঙ্গলবার, আগামী রোববার কলেজ কমিটির মিটিং, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাংলোতে দুটো ভারি কথা আপনাদের সকলকে জানিয়ে দিতে চাচ্ছি আমি। গভর্নিং বডির প্রায় সব মেম্বারই তো এখানে হাজির আছেন। মুসলিম মেম্বার অবশ্য চার পাঁচজন নেই এখানে, কিন্তু তাঁদের মুখপাত্র ওয়াজেদ আলি সাহেব নিজেই আছেন'

তারিফ জানিয়ে অনেকেই হাততালি দিয়ে উঠল।

আলি সাহেব কিছু খুশি হয়ে গোলাপছড়ির মতো পোড় খেয়ে মুখ কু'চকে বললেন, 'ও সম্মানটা জনাব ইমাম হোসেনের—জনাব সৈয়দ আলি—জনাব'—থেমে গেলেন আলি সাহেব।

আপনি যে খুব ইমানদার তা তো দেখলুম। খুব ভালো কথা। আমরা সকলে অবশ্যি জনাব ওয়াজেদ আলি সাহেবের কথাই সবচেয়ে আগে মনে করি।

হরিলালবাবু বললেন, 'আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল কালীশঙ্করবাবু চারশো টাকা মাইনে পাচ্ছেন। উকিলদের একজন জুনিয়র মুখ-ফোঁড়ও তো এর চেয়ে বেশি পায়। অথচ উনি দশ বছর ধরে কলেজে প্যাঁদাচ্ছেন। এত বড় একটা কলেজ, এত ছেলে, প্রিন্সিপাল সাহেবকে এত কম মাইনে দিলে চলে না তো—

তা তো ঠিকই—ওয়াজেদ আলি বললেন, 'আমিও ভেবেছি এসব কথা। আমার মনে হয়—আচ্ছা ওকে—সাতশো টাকা করে দিলে কেমন হয়।'

এরকম কথা আর কারু মুখ থেকে বেরুলে তার গালেই চড় মারতেন হরিলাল। সাতশো টাকা! বটে! সাতশো টাকা একসঙ্গে কোনো দিন দেখেছে কি কালীশঙ্করের মুক্তি পায়রার বাচ্চারা, ধনা আর জনা? ওদের ধাড়ি বাপ দেখুক গে; ওরা দেখেছে! আমার ছেলেরা নাতিরা তো হাজার হাজার টাকার গিলে চটকাচ্ছে রোজ। ওয়াজেদ আলি কথাটথা বলে বেশ, তর্কবিতর্ক করতে পারে। কিন্তু ফিনান্সের জ্ঞান নেই : না কি, আমাকে একটু জব্দ করতে যাচ্ছে? ফিচেল ওয়াজেদ আলি?

না আলি সাহেব। আমি ভেবেছি সাড়ে চারশো টাকা করে দেব।

মোটে!—আলি সাহেব উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, হাসতে হাসতে বসে পড়লেন।

আহা, আপনাদের খানদানী চাল দিয়ে কালীশঙ্করকে বিচার করলে চলবে কেন, ও তো মাস্টার।

মাস্টার, তাতে কি! খাবে না? পরবে না? একজন গোয়ানীজ বাবুর্চির মাইনে—

আরে ছেড়ে দিন আপনার বাবুর্চির কথা। কালীমাস্টারকে কোয়ার্টার্স দেওয়া হচ্ছে—

কোয়ার্টার্স?

হ্যাঁ। লিখবে, পড়বে, খাবে, আরামে থাকবে। ওঁদের অত বেশি টাকাও লাগে না। তিনশো আড়াইশো হলেও হয়। তবে এত বড় একটা কলেজ, এত ছেলে, কম মাইনে পেলে ছেলেদের কাছে মর্যাদা থাকে না। মর্যাদা না থাকলে কাজ খারাপ হয়। কলেজের ক্ষতি হয়। ছেলেরা আজকাল মাস্টারমশাইদের মাইনে খতিয়ে দেখে। বলে, একশো টাকার বকনা, একশো পঁচিশ টাকার বকরি। একশো ত্রিশের বইল যাচ্ছে ঐ, এক-একজন মাস্টারকে দেখিয়ে—

বইল! বইল বলে?

বইল। বইল বলে।

জনাব ওয়াজেদ আলি সাহেব হরিলালের দেওয়া চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়েছিলেন। বসে বসে টানছিলেন। রাতে আজ ফকরুদ্দীন সাহেবের ওখানে যেতে হবে। প্রায় বছর খানেক কলকাতায় থেকে চার পাঁচদিন হলো জলপাইহাটিতে ফিরে এসেছেন ফকরুদ্দীন। লীগে ঢুকছেন হয়তো।

আপনার চুরুটটা হরিলালবাবু, টেনে আরাম আছে। বাঃ। খাসা। কোথায় পেলেন আপনি?

কোথায় পেলেম। কলকাতায়, আবার কোথায়। কালোবাজার ধুনে খোনাদা করে তবে জুটল। আড়কাঠিদের কেষ্ট বিষ্টুর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে। খান চুরুট আপনি?

আলবৎ।

দেখি। কিছু আনিয়ে দেব। তাহলে কালীশঙ্করের সাড়ে চারশোই ঠিক।—ওয়াজেদের দিকে তাকিয়ে বললেন হরিলাল।

কালীবাবু কী মনে করেন?—সিকিটাক সহানুভূতি-সমবেদনায় কালীশঙ্করের দিকে ওয়াজেদ আলি সাহেব তাকালেন।

হেসে হাত কচলাতে কচলাতে কালীশঙ্কর বললেন, 'আপনারা ভালো বুঝে যা ঠিক করবেন, তাই তো মাথা পেতে নেব।'

আচ্ছা, সাড়ে চারশোই হোক। —ওয়াজেদ আলি রায় দিলেন। ওয়াজেদের চুরুটের পুরু ছাইয়ের মুখোমুখি হরিলালবাবু বসে আছেন। ছাইটা ঝেড়ে ফেললেন ওয়াজেদ। ছাইয়ের ফুলকি টুলকি কারু চোখে গেল নাকি?

সাড়ে চারশোই হলো তাহলে। —সকলের দিকে তাকিয়ে হরিলালবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

সাড়ে চারশো ডি এ নিয়ে? না, এমনি?

ওসব ছেঁদো কথা বলবেন না। চারশো ছিল, পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এক ডাকে। —বললেন সেক্রেটারি হরিলাল।

আমার একটা কথা আছে।

কী কথা আছে ব্রজমাধববাবু?

যে বেশি পাচ্ছে তাকেই কি আরো বেশি দেবেন আপনারা? চারশো পাচ্ছেন কালীবাবু, বেশ তো পাচ্ছেন। মাগ্‌গি বাজার বটে, কিন্তু সাদা-সিধে মাস্টার, খাঁই কম, একটা সিগারেটও তো খান না। এই দশ পনের বছর তিনশোয় চলেছে আজ আবার একদিনেই ডিলিক মেরে—

বাধা দিয়ে হরিলালবাবু বললেন, 'ব্রজমাধববাবু বড় বেশি বকেন। কত চারশো টাকা পাচ্ছেন আপনি আজকাল আর, ফৌজদারীর আধ মাড়াই মাড়িয়ে? নিজের পসার কমে যাচ্ছে বলে আর একজনের ভালো হচ্ছে দেখে আপনার চোখ টাটাবে ব্রজমাধববাবু?'

ব্রজমাধববাবু ওৎ পাতছেন মনে হচ্ছিল। এখুনি কথা বলবেন? সিগারেটের দু-একটা টান দিয়ে। ওয়াজেদ আলি সাহেব একটু লজ্জিত হয়ে বললেন, 'সহজ কথা আপনি বড় কঠিন করে বলেন হরিলালবাবু।'

আমি বলছিলাম ওঁকে পঞ্চাশ টাকা বেশি না দিয়ে নিচের দিকের যে সব প্রফেসররা কম টাকা পাচ্ছেন তাঁদের পাঁচ দশ পনের করে বাড়িয়ে দিতে—ব্রজমাধববাবু নাছোড়বান্দার মতো বললেন।

ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন প্রফেসর। তাদের ভিতর পঞ্চাশ টাকার একটা লাড্ডু ছেড়ে দিলে কে খাবে? খেতে গিয়ে কামড়াকামড়ি করবে নাকি ব্রজমাধববাবু? আর যদি না করে, মাথা পিছু কে কত পাবে? —খুব স্পষ্ট পুরুষ্টু ঠাণ্ডা গলায় বললেন হরিলালবাবু।

ব্রজমাধববাবু একটু ভেবে বললেন, 'কেন পঞ্চাশ টাকার চেয়ে বেশি বরাদ্দ হতে পারে না এদের জন্যে? পঁয়ত্রিশজন প্রফেসর, তিনশো পঞ্চাশ—সাতশো ধরুন চোদ্দশো টাকার ব্যবস্থা, করতে পারি না আমরা মাসে মাসে এ'দের জন্য ওয়াজেদ আলি সাহেব?'

সেরকম আয় নেই তো কলেজের, ডোনেশন নেই বাইরের থেকে, সরকার থেকেও বেশি কিছু সাহায্য নেই—ভালো ফাণ্ড নেই—

এসব খাতে থাকে তার ব্যবস্থা করা উচিত নয়?

কে করবে? এ নিয়ে কে মাথা ঘামাবে। সবদিকেই ঝামেলা হামলা। কারুর মনে শান্তি নেই—ঘর নেই—বাড়ি নেই—না খেয়ে মরছে, ভেসে যাচ্ছে সব—কে কাকে দেবে? কে আদায় করতে বেরোবে? কার কাছ থেকে আদায় করবে? কতগুলো কালো-বাজারের বজ্জাত ছাড়া টাকা আছে কারু কাছে? কালোবাজারের পাজিগুলো টাকা দেবে কলেজকে? কেন, কলেজে খুব সুন্দর মেয়ে-মানুষ পয়দা হয় নাকি?

জনাব ওয়াজেদ আলি সাহেব সকলের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে বললেন, 'সরকারের টাকা নেই?'

কাগজের টাকা নেই যে তা নয়। কোটি কোটি বেরোচ্ছে রোজ। আরো কোটি কোটি বেরোতে বেরোতে এমন হবে যে, এসব কাগজ জ্বালিয়ে চায়ের জল গরম করবে মানুষ। এগুলোর হিম্মতে কিছুই পাওয়া যাবে না খাওয়ার, পরবার।

বেশ রং চড়িয়ে তো বললেন ওয়াজেদ আলি সাহেব। সরকারের

অবস্থা এত খারাপ নয়, সরকারের কাগজের নোট এখনও দিব্যি কথ বলে। যারা মোটা রোজগার করে তারা কী রকম খাচ্ছে পরছে ফুর্তি লুটছে আমাদের চেয়ে ভালো জানেন আপনি। টাকার তেজ আছে তবে ঝোঁক নানা জিনিসের দিকে—ইস্কুল-কলেজের দিকে নয়। দিনকাল খারাপ হয়েছে—এরকম তো হবেই। পরকে লুটে খাওয়া, নিজের ঘর সামলানো—এই দুটো কাজেই নিজেকে খরচ করে ফেলছে মানুষ; কাজেই পুলিশ চাই, সৈন্য চাই। আত্মরক্ষা করবার জন্যেও—পরকে মারবার জন্যেও। কলেজে স্কুলে পড়ে, পড়িয়ে কি হবে? সেখানে কবিতা তারিফ করতে শেখায়; আকাশে নক্ষত্রদের জন্ম মৃত্যু আলোকবর্ষের ইতিহাস জানিয়ে দেয় মাস্টাররা। এসব শিখে জেনে যা পৃথিবীর সকলেই চাইছে সেই সবের উপরে আমিকে, সব দেশের উপরে আমার দেশকে, সকলের শক্তির চেয়ে বড়—আমার লৌহের শক্তিশেলকে পাওয়া যাবে কি? এসব পেতে হলে এনতার সোনা আর কুঁকড়ো আর ধোনা মুর্গি চাই—

মুর্গি চাই? কেন মুর্গি কী হবে?

খাবে, একটাকে আর একটা, লাখটাকে লাখটা। ভ্যালা চলছে মুর্গির লড়াই বটে, রাস্তা-ঘাটে, দেশ-বিদেশে, আকাশে বাতাসে।

চুপ করে বসেছিলেন হরিলালবাবু। কথা শুনছিলেন বটে মাঝে মাঝে চোখ বুজে বা মেলে, চুরুট টানতে টানতে—যারা বলছিল তাদের বুদ্ধি নির্বুদ্ধিতাকে ক্ষমা করে।

আপনাদের কথা শেষ হলো?—

হরিলালবাবুর প্রশ্নের উত্তর দিতে গেল না কেউ। যে কথা চলছিল এতক্ষণ তার জের টেনে কথা বা অন্য কোনো নতুন কথাও পাড়া হচ্ছিল না।

প্রিন্সিপালের মাইনে তো ঠিক হলো। এখন আর একটা ছোট জিনিস আছে। জলপাইহাটি কলেজে নিশীথ সেন বলে একজন প্রফেসর আছে, নাম শুনেছেন ওয়াজেদ আলি সাহেব?

নিশীথ সেন? নিশীথ সেন তো ব্যারিস্টার ছিল, না?

না, সে নিশীথ সেন নয়।

তা আর কে? কীসের প্রফেসর?

ইংরিজির। নাম শোনেননি তার। শুনবেন কী করে? আপনি তো নতুন এসেছেন এখানে। কলেজের মাস্টারদের নামের ফিরিস্তি তালিম করা ছাড়া ঢের দরকারী কাজ আছে আপনার—

নিশীথ সেন মানে এন এস?—ব্রজমাধববাবু জিজ্ঞেস করলেন।

হ্যাঁ এন এস।—বললেন হরিলাল।

এন এসকে চিনলেন কী করে আপনি ব্রজমাধববাবু?

এন এসকে আমি চিনি।—বঙ্কিম দত্ত বললে।

এন এসকে আমি চিনি।—বললে অক্তিম দত্ত।

নিশীথ সেন প্রফেসরকে আমি খুব ভালো করেই জানি—নবকৃষ্ণবাবু বললেন।

কে, নিশীথ প্রফেসর? ওতো কত তাস পিটেছে আমাদের বাড়িতে—বলে হিমাংশু আরো কিছু ফাঁদবে ভাবছিল।

আচ্ছা, নিশীথ সেন বলতে বুঝল না, এন এস বলতেই ধরে ফেলল সবাই, ব্যাপারটা কী রকম হলো?—হরিলালবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন ওয়াজেদ আলি একটু খটকায় পড়ে।

ও আছে এক কায়দা আলি সাহেব। একদিন কলেজে বেড়িয়ে আসুন না, বুঝতে পারবেন। করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শুনবেন টি-বি, টি-বি করে কান ঝালাপালা করছে। ব্যাপারটা টিউবার কিউলিসিস সম্পর্কে নয়, টি-বি মানে প্রফেসর তারিণী বাড়ুজ্জ্যের কথা হচ্ছে। দু'চার পা এগিয়ে আর এক ক্লাসের ছেলেরা বি-বি কে নিয়ে পড়েছে, কোনো বিবি সাহেবার দিকে লক্ষ্য নয়, ছেলেরা বিনোদ বোস প্রফেসরকে ঠুকছে। এমনি এ-এম, পি-এম, ডি-ডি-টি, এল-সি-এম। জি-সি-এ সবই আছে।

ভারি তামাসা বোধ করছিলেন ওয়াজেদ আলি সাহেব। হরিলাল তার কাছে আর একটা চুরুট নিলেন। জ্বালিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সাহেব, 'জি-এম আছে?'

সকলে হো হো করে হেসে উঠল ব্রজমাধব আর কালীশঙ্কর ছাড়া।

আলবৎ আছে। গৌরী মিত্তির তো।

হ্যাঁ হ্যাঁ, গুড মরো।

সকলে হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল আবার। ব্রজমাধব ছাড়া।

জনাব ওয়াজেদ আলি সাহেব এবারে তার স্ল্যাকসের পকেট থেকে একটা রুপোর সিগারেট কেস বের করে সকলকে সিগারেট বিলিয়ে দিলেন।

এন এসের কী হয়েছে?

নিশীথ সেন এ-কলেজের ইংরেজির প্রফেসর। দেড়শো টাকা মাইনে পাচ্ছে। বেশ তো আছে; এর চেয়ে বেশি আর কী পাবে মফস্বল কলেজে? এ তো কলকাতা নয় যে টাকার উপর পোকা পড়বার ফাঁক নেই। যা পাচ্ছে ওমনি রাবণের চিতেয় ঢালো। দেড়শো টাকার বেশি যে মাস্টার চায় মফস্বলে, তার বদখেয়াল আছে। এখানে টাকায় দু'তিন সের দুধ পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু চোদ্দ সের পাওয়া যেত। তিন টাকা ছিল চালের মণ—এখন পঁচিশ-ত্রিশ টাকা হয়েছে। কী যে দইবড়া বলছেন আপনি হরিলালবাবু? দেড়শো টাকায় কি হয় একটা পরিবারের?—ব্রজমাধববাবু বললেন।

হয়ে তো যাচ্ছে। সোয়াশো টাকায় তো হচ্ছে। একশো টাকায় হচ্ছে না? এ কলেজের যে-সব মাস্টার একশো টাকা পায় তারা কি আপনার কাছ থেকে বুদ্ধি ধার করে খাচ্ছে-দাচ্ছে? ছেলেদের পড়াচ্ছে?—হরিলালবাবু একটু বিরক্ত হয়ে বললেন।

খেয়ে দেয়ে সুস্থ হয়ে পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে ছেলেদের কাছে উপস্থিত হওয়া চাই তো। মনে একটা সুস্থিরতা থাকা চাই, না হলে কী করে ভালো করে পড়াবেন মাস্টারেরা? কী করে উপকার হবে কলেজের?—ব্রজমাধব বললেন।

কলেজের কোনো অপকার হচ্ছে না। স্টাফে যে টিচারেরা আছেন, তাঁরা ঠিকমতই পড়াচ্ছেন।—প্রিন্সিপাল কালীশঙ্করবাবু বললেন, 'একশো সোয়াশো টাকায় খাচ্ছেন-দাচ্ছেন, কলেজ গুঁতোচ্ছেন হাঁড়িচাচা পাখির মতো চেঁচিয়ে। বেশ, বেশ আছেন। কেন মাইনে বাড়িয়ে আমড়াগাছি শিখিয়ে মাথা খারাপ করে দেবেন তাঁদের?'

হরিলালবাবু হেসে মাথা নেড়ে ওয়াজেদ আলির দিকে তাকালেন, 'শুনলেন তো প্রিন্সিপালের নিজের মুখের কথা, কিন্তু ব্রজমাধববাবুকে কে বোঝাবে'। আক্ষেপ করে হাত ঘুরিয়ে, আঙুল নাড়িয়ে কয়েকটা রেখার আঁচড়ে পোচড়ে কেমন কিম্ভূত কিমাকার করে রাখলেন মুখটাকে।

ওয়াজেদ আলি চুরুটে একটা টান দিয়ে বললেন, 'কলেজ কমিটিতে ব্রজমাধববাবু একটা হেলদি অপোজিশনের মতো। এ না থাকলে চলে না'।

ব্রজমাধববাবুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে ওয়াজেদ আলি বললেন, 'আচ্ছা ব্রজমাধববাবু, মেঠো ইঁদুর কি সোনামুগের ডাল খায়?'

কথার ধার ধারিনা আমি। বোবা হয়ে থাকতে রাজি আছি যদি বুঝি—ব্রজমাধববাবুর মুখে যে কথাগুলো এসে পড়েছিল সেসব তোড় থামিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, 'মাস্টারদের হয়ে কথা বলবার লোক থাকা চাই তো। আছে বটে একজন স্টাফ রিপ্রেজেনটেটিভ কিন্তু ওরকম ন্যাতা জোবরা ভালোমানুষ দিয়ে কাজ হয় না'।

হয় না বুঝি তাকে দিয়ে?—ধোঁয়াটে দীনাত্মা চোখ তুলে হরিলালবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কাদের রিপ্রেজেনটেটিভ হয়ে কলেজ কমিটিতে ঢুকেছিলেন ব্রজমাধববাবু?'

কোনো উত্তর দিলেন না তিনি।

গার্জেনদের তো?

এরকম প্রশ্নের জবাব দেওয়ার কোনো প্রয়োজন স্বীকার করলেন না ব্রজমাধব। কিন্তু তবুও হরিলাল বড় বোয়ালমাছের মতো তাকিয়ে আছে যেন, পুকুরের নরম মাটির কিনারা ঘেঁষা কোনো কচি কেঁচো দেখে ফেলেছে যেন মনে হচ্ছিল ব্রজমাধবের। তাই বটে কি? তাই বটে হরিলাল?

হ্যাঁ গার্জেনদের রিপ্রেজেনটেটিভ হয়ে এসেছি আমি। কি হলো তাতে?

না, হয়নি কিছু—এর পরের কলেজ কমিটির ইলেকশনে—

ব্রজমাধববাবু, হরিলালের মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল দেখে গলা খাঁকরে নিয়ে বললেন, 'অভিভাবকদের প্রতিনিধি হয়ে আমি দাঁড়াব ইলেকশনে। কলেজ কমিটি আমি ছাড়ছি না, যতদিন আপনি আছেন আমিও আছি হরিলালবাবু'।

হরিলালবাবু হেসে ফেললেন। জানে না যে কার সঙ্গে কে দেয়ালা করতে চাচ্ছে। হাতের চুরুটটা নিভে গিয়েছিল, দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে চুরুটের মুখ লাল করে নিচ্ছিলেন, হাসছিলেন। কেউ কিছু বলছিল না কোনো দিক থেকে। হরিলালবাবুর হয়ে দুটো কথা বলা উচিত নয় কি কারো? কালীশঙ্করবাবুও ঘাপটি মেরে চুপ করে আছেন: যেন তার পঞ্চাশ টাকা এমনি এমনি আদর করে বাড়িয়ে দেওয়া হলো কালী-বাবু হরিলালের নাতজামাই বলে।

আপনি বড় তিরিক্ষে হয়ে উঠছেন ব্রজমাধববাবু—ওয়াজেদ আলি বললেন।

ব্রজমাধববাবুকে এখন একথা বলার জন্য যেন বায়না দিয়ে রাখা হয়েছিল ওয়াজেদ আলিকে—প্রিন্সিপাল সকলের অজান্তে বাইরে শূন্যের দিকে চোখ দিয়ে গাঁট্টা মেরে ভাবছিলেন।—'বড্ড বেঁকে আছেন ব্রজবাবু; ওটা হেলদি অপোজিশনের হতে হয়। নাহলে চুষিকাঠি কে দেবে? কোথায় পাবে?' চিপটেন কেটে বললে হিমাংশু চক্রবর্তী।

পথে এসো দাদারা—ভাবছিলেন হরিলাল, 'কৈ, অন্তিম দত্ত, বঙ্কিম দত্ত কিছু বলছে না যে।'

কেউ কিছু বলবার আগে ব্রজমাধববাবু বললেন, 'কলেজ ফাণ্ডে কত টাকা আছে?'

সেটা ফিনান্স কমিটি বুঝবে। এখানে সে কথা কে জানে—কে বলবে আপনাকে?

আপনি সেক্রেটারি—আপনিই তো জানেন সব।

ওয়াজেদ আলি সাহেব ব্রজমাধববাবুর কাঁধে হাত রেখে চেপে দিয়ে বললেন, 'এখানে হরিলালবাবুর বাড়িতে এসে ওসব কথা জিজ্ঞেস করা তো ঠিক নয়। যদি দরকার হয়—সাব কমিটিতে ফিনান্স কমিটিতে আলোচনা করবেন'।

ফিনান্স কমিটিতে একবারও আমি জায়গা পাই না!—ব্রজমাধববাবু খানিকটা তিক্ত, পীড়িত হয়ে বললেন।

কেন?

হরিলালবাবু জানেন—

সবই তো জানে হরিলাল। হাঁসের পেটে কেন ডিম আসে, ব্রজবাবুর পশার যত কমে যাচ্ছে মেজাজ তত কোঁড়াচ্ছে—পাছার কাপড় ছিঁড়ে যাচ্ছে—সবই হরিলালের কারসাজি—বলে হরিলালবাবু চুরুটটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে টানতে আরম্ভ করলেন।

এবারকার ফিনান্স কমিটিতে আপনাকে নেব ব্রজমাধববাবু।—ওয়াজেদ আলি আশ্বাস দিয়ে বললেন।

আমি একা গিয়ে করব কী—সবই তো আমার বিপক্ষে।

যাবেন আবার যাবেনও না সে কি করে হয়। চলে যান ফিনান্স কমিটিতে, গিয়ে লড়বেন, একা লড়বেন। নিজেকে, সকলকে, আব-হাওয়াকে বেশ পরিষ্কার ঝর্ঝরে করে দিয়ে আসবেন—

আপনি যাবেন আলি সাহেব ফিনান্স কমিটিতে?

আমি? না, আমি না—

কেন?

ওসবের বুঝি না কিছু আমি। হরিলালবাবু মনে করেন আমি কলেজ ফিনান্সের হদিশ পাই না। প্রিন্সিপালের মাইনে সাতশো টাকা করে দিতে বলেছিলুম প্রফেসরদের তো চারশো পাঁচশো দিতে চাই। ওতে হয় না। হরিলালবাবুর মতন একজন জানেওয়ালা মানুষ ব্রেক কষে একটা প্রতিধ্বনিকে না ধরে থাকলে তা টেঁকে না।

ঠিক কথা বলেছেন ওয়াজেদ আলি সাহেব।—অন্তিম দত্ত বললেন।

হরিলালবাবুকে বুকবার মতন আলি সাহেবের মতন একজন দরাজ, দরবারী মানুষ থাকা চাই। নাহলে কি করে জোর পাবেন হরিলালবাবু।—সহজভাবেই কথাটা বললেন বঙ্কিম দত্ত। ভাব গ্রহণ করে খুশিও হলেন হরিলাল। তবে বেশি নয়। কথাটাকে আরো গুছিয়ে বাড়িয়ে আস্ফোট করে বলা উচিত ছিল।

ব্রজমাধববাবু যেন সব ভেঙে ফেলতে চান। জানেন না একটা জিনিস গড়ে তোলা কী রকম শক্ত। ত্রিশটা বছর ধরে, প্রাণপাত করে এই কলেজটা সৃষ্টি করেছেন, হরিবাবু। ছাগল দিয়ে ধান মাড়িয়ে খানতো ব্রজবাবু, মানুষের পৃথিবীর খবর রাখেন না।—হিমাংশুবাবু বললেন।

চুপ করে বসে আছে কালীশঙ্কর, কোনো কথা বলছে না। আমার কলেজের নুন খেয়ে ওর পেট জাম্বুবানের মতো কিন্তু বাপের হাত তোলা তুমি শুধু খাবেই বুঝি কালীশঙ্কর; বাপের সমুখে বসে দুটো ভালো কথা শোনাতে পারবে না তাকে? হরিলালবাবু প্রিন্সিপালের দিকে তাকালেন। হরিলালবাবুর ওরকম চোখ চাউনির মানে জানা আছে কালীশঙ্করের। গলাটা খাকরে নিয়ে তিনি বললেন, 'ব্রজমাধববাবু গার্জেনদের নমিনেশন পেয়েছেন বলেই আমাদের মাথা কিছু কিনে ফেলেননি। ফিনান্সের কিছু বোঝেন না তিনি। আমি তাকে ও কমিটিতে ঢুকতে দিচ্ছি না। হরিলালবাবুর কোনো দোষ নেই। হরিবাবুর মতো উদার মানুষ জলপাইহাটিতে নেই। বাংলাদেশে খুব কমই আছে। অনেক দেশ তো ঘুরেছি, অনেক লোক দেখেছি আমি ওয়াজেদ আলি সাহেব। জেনে শুনেই কথা বলছি। আমাদের ভাগ্য আমাদের মধ্যে ছিলেন উনি, ওঁকে আমরা পেয়েছি, সেইজন্যই এতগুলো লেকচারার প্রফেসর করে খাচ্ছে। এ না হলে এদের গতি ছিল কী? কে পুছত এদের? তিনি যা করেন ভালোর জন্যেই করেন। বুদ্ধি প্রতিভা হরিবাবুর তো বাংলাদেশের সেরা মানুষদের মতো। কলকাতায় থাকলে তিনি বড় মেজো মন্ত্রী হতে পারতেন। আমাদের জন্যেই স্বার্থত্যাগ করে এখানে আছেন। ব্রজমাধববাবু উড়ে এসে জুড়ে বসে আজ অনেক বারফাটকা কথা বলেছেন। কিন্তু এরকম ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার বুদ্ধি নিয়ে তিনি নিজেরও উপকার করবেন না, কলেজেরও না। যিনি ত্রিশ বছর ধরে হিতব্রত নিয়ে এখানে আছেন। জলপাই-হাটির কলেজের মানবতার কীসে উপকার হয় তার মতন কেউ তো তা বুঝবে না। হরিলালবাবুর প্রতিভা ও মহানুভবতা যে কতদূর অপূরণীয় তিনি একদিন মরে গেলেই জলপাইহাটি আর বাংলাদেশ তা বুঝবে'।

কালীশঙ্করের এসব কথায় কালীশঙ্করের নিজের বা অন্য কারো আন্তরিক সায় ছিল না। কথাগুলো অর্ধসত্য, হয়ত দশ আনি মিথ্যে, ছয় আনি সত্য।

হরিলালবাবু কি ভাবছিলেন জানা নেই, কিন্তু ভাষণ আর কারো প্রাণেই বিশেষ কোনো সাড়া জাগাতে পারল না। প্রিন্সিপালের বাংলা ভাষাও যে বঙ্কিম বিদ্যাসাগর ছুঁয়ে আজকালকার 'ডি পি আইয়ী' স্কুল টেকস্টের প্রবন্ধের ভাষায় কলকে খুঁজছে। এরা কেউ ভাষা নিয়ে মাথা না ঘামালেও এদের ভিতর এক আধ জন অন্তত—নবকৃষ্ণ অন্তত—সেটা টের পাচ্ছিলেন। নবকৃষ্ণর মনে হচ্ছিল বাংলাটা কেমন জোলো মাঠো, কেমন বোকা পাদা পাং মাস্টারী বাংলা যেন।

আমি জানি কলেজের খুব মোটা ফাণ্ড আছে। প্রফেসরদের জন্যে মাসে মাসে চোদ্দশো টাকা বরাদ্দ অনায়াসেই করা যেতে পারে।

সেটা আপনি ফিনান্স কমিটিতে ঠিক করে নেবেন ব্রজমাধববাবু। ওয়াজেদ আলি সাহেব তো ঢোকাচ্ছেন আপনাকে সাব-কমিটিতে আপনার কোনো আফশোষ থাকবে না।—ধীর স্থির গলায় সুভাষিতের মতন হরিলালবাবু বললেন।

আমি আরো জানি যে কলেজের সেই ফাণ্ডের টাকা থেকে হরিলালবাবু নিজের খরচের জন্যে—, ওয়াজেদ আলি মুখ চেপে ধরলেন ব্রজমাধববাবুর।

কমিটিতে কমিটিতে—ওসব কমিটিতে হবে ব্রজবাবু। এখানে ভদ্রলোকের বাড়িতে কি এই করতে এসেছি—

কমিটিতে কী হবে ? কমিটিতে কি রাহাজানি হবে ?—হিমাংশু চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করলেন ওয়াজেদ আলিকে।

এই যে হন্যে কুকুরের মতন আঁচড়াচ্ছে কামড়াচ্ছে আমাদেরও। তাতে কাউন্সিলে না পাঠিয়ে ছাড়বে না ব্রজমাধববাবু। এসব পাগলামি আবার কমিটিতে সেধিয়ে লেলিয়ে দিতে হবে বুঝি।—বঙ্কিম দত্ত, অন্তিম দত্ত বললে।

হে হে হে, হাইড্রোফোবিয়ার ভয় ?—হাসতে হাসতে বললেন ওয়াজেদ আলি সাহেব।

নিন, রাত হয়েছে। ওঠা যাক।—হরিলালবাবু বললেন 'সেই নিশীথ সেনের কথা বলছিলুম, দেড়শো টাকা পাচ্ছে আমাদের কলেজে, বললে সোয়া দুশো, আড়াইশো, অন্তত দুশো না করে দিলে কাজ করতে পারবে না সে। কী করে আমি তাকে দুশো আড়াইশো করে দিই আলি সাহেব ?'

কেমন প্রফেসর ? কি রকম পড়ায় ?

আছে, পাঁচ-পাঁচীর মতন আর কি, তা যেমনই হোক না কেন, দেড়শো থেকে সোয়া দুশো আড়াইশো কী করে হয়। এতদিন পরে প্রিন্সিপালের টাকা, পঞ্চাশ টাকা বাড়ল মোটে—না, তা হয় কী করে; প্রিন্সিপালের ইনক্রিমেণ্টের অনুপাত ডিঙিয়ে বাড়তে পারে না।

সে অনুপাতের আধা-আধিও বাড়তে পারে না। সিকিটাও না। প্রিন্সিপালের পঞ্চাশ বাড়লে দশ বারো টাকার বেশি বাড়তে পারে না অধ্যাপকের।—হিমাংশু চক্রবর্তী বললে।

তা ছাড়া একজন মাস্টারের মাইনে যদি বাড়ানো যায় তাহলে অন্যেরা কী দোষ করল ?—বঙ্কিম দত্ত জিজ্ঞেস করলেন।

ব্রজমাধববাবু বললেন, 'এমন দশ পনেরোটা কেস আমার জানা আছে হরিলালবাবু যে আপনার পেটোয়া প্রফেসরদের মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছেন আপনি অন্যদের দাবি উপেক্ষা করে'।

তাই নাকি ?—ওয়াজেদ আলি সাহেব হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'লিস্ট আছে আপনার কাছে ?'

আছে। চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট টাকা করে বাড়িয়েছেন, যারা ওর পেটোয়া নয় তাদের গলা কেটে দিনদুপুরে রাহাজানি করে। অনুপাত কষছেন হিমাংশু চক্রবর্তী প্রিন্সিপালের ইনক্রিমেণ্টের সিকির ভাগ দেওয়া হবে বলে এক একজন প্রফেসরকে। কেন। হরিলালবাবুর জামাই কামাখ্যা ঘোষালকে ষাট টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হলো এক লাফে এক ডাকে। আপনার শালা ধরণী মজুমদারকে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হলো কেন হরিবাবুর এককথায়, সেটা আমাদের খুলে জানাবেন কি চক্কোত্তি মশাই। হরিলালবাবুর গোমূত্র পান করার জন্য আপনারা মানুষ খুন করতে পারেন দিনে দুপুরে—পোষমাস করে বেড়াতে পারেন কার্তিক মাসের কুকুরগুলোর মতো।

এক মিনিট দুমিনিট নিস্তব্ধ হয়ে রইল সব। 'অত কাছে ঘেঁষে বসবেন না ব্রজমাধববাবুর। ওর মুখের লালা কুকুরের লালা হয়ে গেছে আলিসাহেব। লাগিয়ে দিলে জলাতঙ্কে বিশ্বসংসার-ঘুরেও জল তেষ্টার এক ফোঁটা জল পাবেন না। এ কুকুর কি এখনও গভর্নিং বডির মেম্বার থাকবে ?'—হিমাংশু চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করল হরিলালবাবুকে।

সে জানে সরমার বাচ্ছাকে যারা পাঠিয়েছে তারা—

ওয়াজেদ আলি সাহেব একটু বিচলিত হয়ে বললেন, 'এরকম কথা বলছেন কেন আপনারা ? কথাগুলো ভালো হচ্ছে না। এত গালাগালিতেও মোক্ষম হাড়ে বাতাস লাগিয়ে বসে আছেন ব্রজমাধববাবু'—ওয়াজেদ আলি ব্রজমাধববাবুর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন—

নিশীথ সেন বলেছে যে সোয়া দুশো-আড়াইশো টাকা মাইনে না দিলে কলেজে কাজ করবে না সে। দেড়শো পাচ্ছে, দশ টাকা বাড়ানোও সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। নিশীথবাবু মাইনে বাড়বার কোনো সম্ভাবনা না দেখে একমাসের ছুটির দরখাস্ত করেছে। কীসের জন্যে ছুটি চাচ্ছে সেটা দরখাস্তে খুলে জানায়নি, কোনো ডাক্তারের সার্টিফিকেটও দেয়নি, ক্লাশ নিচ্ছে না, ঘুরে বেড়াচ্ছে—হরিলালবাবু বললেন।

দরখাস্ত কি মঞ্জুর হয়েছে ?

না।

মঞ্জুর যে হয়নি তা কি সে জানে ?

সে তো কলেজেই আসে না, কে জানাবে তাকে ?

কী মতলব নিশীথ সেনের ?—আলি সাহেব বললেন।

কে জানে। কলেজে কাজ করবে না হয়তো আর। আমরা তার দরখাস্ত ছিঁড়ে ফেলেছি—

কেন ?—ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ব্রজমাধববাবু।

ওরকমভাবে কে কবে দরখাস্ত দেয় ? সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার না করে বোকার মতো দরখাস্ত লিখলে—অন্তত ডাক্তারের সার্টিফিকেট না দিয়ে সেটা পেশ করবার মানে কি ?

তাই বলে দরখাস্ত ছিঁড়ে ফেলবেন আপনি ! মামুলি দরখাস্ত করেছে, কী তার মানে, সেটা আপনার বোধগম্য হয়েছে কিনা, কমিটিকে না দেখিয়ে কি করে ঠিক করবেন তা ? সেটা কমিটিতে পেশ করতে হবে। কমিটি বিচার করবে। আপনি কে ? নিজেকে কী ভাবছেন আপনি ?

কিছু মনে করিনি। ওটা ছিঁড়ে ফেলেছি আমি।

ছিঁড়ে ফেলেছেন ? কমিটির মিটিঙে পোঁচাথ বাবার খাসির মতো ছিঁড়ে ফেলা হবে।

কাকে ?

আপনার এই বেকুবিটাকে।

নিশীথবাবুকে ছুটি দেওয়া হবে না। ছুটি যে দেওয়া হবে না সে কথা সে নিজে এসে জানতে না চাইলে জানানো হবে না তাকে।—কালীশঙ্কর বললেন।

কী করে জানবে ? সে তো কলকাতায় চলে গেছে।

জানি না। আমাদের জিজ্ঞেস করে যায়নি।

দরখাস্ত তো দিয়ে গেছল।

কতবার বলব আপনাকে ব্রজমাধববাবু, যে সেটা কানকাটা দরখাস্ত—

কার কানকাটা—দরখাস্তের, না যাকে দরখাস্ত করা হয়েছে তার, সেটা কমিটি দেখেশুনে ঠিক করবে।—ব্রজমাধব বললেন।

নিশীথ সেনকে ছুটি দেওয়া হবে না ওয়াজেদ আলি সাহেব। ছুটি না পেয়েও যদি কলেজে না আসে তাহলে তার চাকরি থাকবে না।

চাকরি থাকবে না ? কুড়ি বাইশ বছর এ কলেজে কাজ করছেন তো নিশীথবাবু। চাকরির উপর হাত দেয়া—ওটা জবরদস্তি হলো,—ওয়াজেদ আলি বললেন, 'নিশীথবাবু যদি কলকাতায় গিয়ে থাকেন তাহলে তাকে ব্যাপারটা খুলে জানিয়ে দেওয়া হোক। লিখে নিন আপনি কালীশঙ্করবাবু। নিশীথবাবুর চিঠি না পেয়ে কিছু করতে যাবেন না'।

কমিটির মিটিং হলে তবে তো লিখব। নিশীথবাবুর দরখাস্ত দেখে কমিটি কি ঠিক করে কে জানে। হয়তো সাসপেণ্ড করবে। হয়তো বরখাস্ত করবে। ছুটি না নিয়ে কলকাতায় চলে গেল : জবরদস্তি কে করছে—নিশীথবাবু না আমরা —কালীশঙ্করবাবু বললেন।

ক্রমশ

প্রতিবেশী গল্প

বনিয়া চলে গেল

জয়বন্ত দলভী

মারাঠী ভাষায় লেখা 'চক্র' উপন্যাসটির হিন্দী চলচ্চিত্ররূপ লোকার্নো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত। উপন্যাসটির মারাঠা রচনাকার জয়বন্ত দালভী গোয়ার আরপোয়ায় জন্মগ্রহণ করেন ১৯২৫ সালের ১৪ আগস্ট। বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ শ্রীদালভী বোম্বে থেকে প্রকাশিত মারাঠী দৈনিক—'দৈনিক প্রভাত' এবং 'দৈনিক লোকমান্য'র সহ-সম্পাদক ১৯৪৮-৫১। ১৯৫১-১৯৭৬ বোম্বের ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসের প্রকাশন-বিভাগের প্রধান। ১৯৭৬ সালে স্বেচ্ছাবসর নেন শুধু লেখার জন্যই।

১৪টি উপন্যাস, ৮টি নাটক, ৯খানি ছোটগল্পের সংকলন, হাস্যরসের সংকলন ৬ খানি, একাঙ্ক নাটক-সংকলন ১ খানি এবং ১ খানি ভ্রমণ-কাহিনীর রচনাকার শ্রীদালভীর প্রায় প্রতি নাটকই মারাঠী মঞ্চে ২০০ রজনী অতিক্রান্ত হয়ে থাকে। 'মহাসাগর' নাটকটি ৪০০ রজনী অভিনীত হয়ে চলেছে।

তাঁর কিছু কিছু বই গুজরাতি ও হিন্দীতে অনূদিত হয়েছে। পাঁচখানি বই 'স্টেট অ্যাওয়ার্ডস' লাভ করেছে। তিনখানি নাটক বছরের শ্রেষ্ঠ রচনার সম্মান লাভ করেছে।

মারাঠী সাহিত্যের এই বিতর্কিত, বহু অভিনন্দিত রচনাকার শ্রীদালভীর 'বনিয়া চলে গেল' গল্পটি পাঠকের মনে গভীর রেখাপাত ঘটায়, সংস্কার আর মনের কামনা-বাসনার টানাপোড়েনে মানসিক যন্ত্রণায়, হৃদয়-ক্ষত প্রকাশের নিপুণ শিল্পিত কারুকার্যে।

মনে হয়েছিল, বনিয়া নিশ্চয়ই অসুস্থ। রোজ সকালে সে এখান দিয়েই বেড়াতে যেত অথচ আজ সকালে সে বেড়াতে গেল না। ঝুলবারান্দা থেকে তার পিছন দিক আমি দেখতে পেতাম। বয়েস হয়েছিল। ক্লান্ত দেখাত। অবশ্য ওর শরীরের গঠনটি খুব ভালো ছিল। হাতে লাঠি নিয়ে হনহনিয়ে হাঁটত।

আমি যে এখানে থাকি, জানত সে। তবু কখনো ভুলেও পিছন ফিরে তাকায়নি। ভারি জেদি। অবশ্য, জেদি স্বভাব ওর প্রথম থেকেই। এখন এত বয়সেও বেশ চেহারা। চিরকালই চেহারাটি তার দেখার মতো। আর ঐ চেহারা দেখেই তো আমি ভুলেছিলাম তখন।

ভুলেছিল সেও, আমাকে দেখে। আবোলি ফুলের মালা নিয়ে আসত। মৃদু শিসের মতো আওয়াজে কথা বলত! হাতে দিত খোঁপায় জড়ানোর মালা। মালা দেওয়ার সময় হাতে হাতে ছোঁয়া লাগত। আর তারপর, ছোঁয়াটা যেন হঠাৎ ভুল করে লেগে গেছে এমন করত। ভান করেও লজ্জা পেত। লজ্জা পেলে তাকে আরও সুন্দর দেখাত। ইচ্ছে করত ওর নাকটা ধরে টেনে দিই। হয়তো একালে তা সম্ভবও হতো। কিন্তু সেকালে? পঞ্চাশ বছর আগে? মাগো!

এঁর সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হলেও, আমার কাঁদার উপায় ছিল না। বনিয়ার কথা মনে পড়ে কান্না আমার আসতও না। অথচ বনিয়াকে আমি ভালোবাসি। আর বনিয়া আমাকে—। একথা কোনোদিনই বলা হলো না।

সেকাল ছিল মনকে মেরে বেঁচে থাকার কাল। সে যুগে বালগন্ধর্বের জন্যে মেয়েরা পাগল হতো। বালগন্ধর্বকে দেখার জন্যে ছটফটিয়ে মরত তারা। আমার কিন্তু সে-মোহ ছিল না। আমার গন্ধর্ব অনেক ভালো।

কিন্তু আমার কপালে সইল না।

এঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হলো। এঁর চাকরি বোম্বাইয়ে। তাই বোম্বাই চলে এলাম। দিনের পর দিন গেল। আমি আর-সব ভুলে গেলাম বাড়ন্ত সংসারের মধ্যে। তারপর এক সময় জানলাম, বনিয়াও বোম্বাইতে। কিন্তু কোনোদিন দেখা হয়নি। নিজে থেকে বনিয়া কখনো আসেনি। স্বভাব জেদি। চাকরি করত ভালো। এঁর মতো নয়, তবু ভালোই। একা-মানুষের আর কত চাই?

একলাই রয়ে গেল ও। বিয়েই করল না। বড় ভাই মনোহর খুব পিছনে লেগেছিল, কিন্তু কোনো কথা কানে তোলেনি বনিয়া। শুনবার পাত্রই ছিল না সে।

একলাই কোথায় যেন থাকত। তেমনই রয়ে গেল। বরাবরই জেদি, স্বভাব জেদি। অনেক পরে, বয়েস হয়ে গেলে, একলা সব-কিছু আর পেরে উঠত না বলে, বনিয়া মনোহরের সঙ্গে থাকত, ঐ পিছন দিকের পাড়াতে।

রোজ এই রাস্তা দিয়ে বেড়াতে যেত। রোজ সকালে। একলাই। ঝুলবারান্দা থেকে দেখা যেত। কিন্তু কোনোদিন তাকাত না পিছন ফিরে। আমি যে এখানে থাকি জানত সে। মনিয়ার ছেলে আর আমার আপ্পা দুই বন্ধু। দুজনের মধ্যে যাতায়াত ছিল। তবু কখনো জিজ্ঞেস পর্যন্ত করেনি। বনিয়া কখনো আপ্পার কাছ থেকে আমার কোনো খবর নেয়নি। কীসের এত অভিমান?

আমিও দেখা করতে যেতে পারতাম। কিন্তু ভালো থাকলে তবে তো! এ-দশায় আমি কোথায় যাব? উনি চলে গেলেন, আর আমার এই দশা হলো।

মামাশ্বশুর সেকেলে লোক। চুলগুলো কেটে ফেলতে হলো। মনে পড়লেই আমার মাথায় আগুন ধরে যায়। আমি কি বুড়ি হয়ে গিয়েছিলাম? একটা চুলেও পাক ধরেনি! কিন্তু কেউ শোনেনি। আমাকে ঠাট্টা করতে লাগল সবাই। এই শোভা নিয়ে এখন কোথায় যাব?

কিন্তু রোজ সকালে ও তো এখান দিয়েই যেত। একটুখানির জন্যে উপরে এলে কী এমন আসত-যেত? কিন্তু কখনো ও আসেনি।

গত পনের দিনের মধ্যে দেখাটুকুও পেলাম না। তাতেই আপ্পাকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, 'আপ্পা, মনোহরদের খবর কী রে? বনিয়া কেমন আছে? দেখা হয়েছিল নাকি?' এইটুকু জিজ্ঞেস করতেও,

আমার মনে হলো, আমি যেন চুরি করছি। —'আপ্পা, মনোহরদের খবর কী?'

যেন কিছুই, কোনো কিছুই হয়নি, এমনভাবে আপ্পা বলল, 'মা গো, বনিয়া কাকা তো চলে গেলেন।'

'আপ্পা—' বলে আমি ধপ করে মেঝেতে বসে পড়লাম। আমার পৃথিবীটা যেন নড়ে উঠল, আমি চোখ বুঁজলাম।

কী হলো মা?

ঝট করে হুঁশ হলো। ধপ করে বসে পড়া উচিত হয়নি। চোখ বোঁজা উচিত হয়নি। হঠাৎ কী করে ফেললাম?

কী হলো মা, কী হলো? বনিয়া চলে গেল তো কী হলো?

কিছু হয়নি বাবা, কিছু হয়নি! বনিয়া চলে গেল তো আমার কী হবে? কিছু হয়নি।

কত বছর হয়ে গেল! এই আপ্পা তখন পেটে। তখন একবার দেখা হয়েছিল। ভুল করে তেতো হাসি হেসেছিল। ব্যস, তারপর আর নয়। আর কখনো দেখা হয়নি।

আর কখনো হাসেনি। মুখ ফুটে কখনো খোঁজ নেয়নি। এখন তো চলেই গেল। দেখা না করেই চলে গেল। কী হয়েছিল? বয়স হয়েছিল, তাই! বয়স হয়েছিল—

আপ্পাকে কী বলি? তার চাইতে তো বনিয়া বড়ো। সে আছে। আমি তারই বয়সি, আমি আছি, আর বনিয়া চলে গেল।

ঝুলবারান্দায় হেলান দিয়ে বসি একটু। 'ববন, ওরে ববন—জপের মালাটা দে তো বাবা একটু। দে দে একটু মালা ফেরাই।' বুকটা ফেটে যাচ্ছে। বনিয়া চলে গেল। বুকের মধ্যে আমার হাতুড়ির ঘা পড়ছে। জল হয়ে যাচ্ছে। তিনি যখন গেলেন, তখনকার দুঃখ ছিল তরল। কাঁদার উপায় ছিল। কেঁদে কেঁদে মন হালকা হতো। কিন্তু এখন কাঁদার যো নেই। বনিয়ার জন্য কাঁদার যো নেই। বনিয়া কার কে! বনিয়ার জন্য কাঁদার কেউ নেই, তার জন্য কাঁদবে কে? আমি কী করে কাঁদি? 'আন রে মালাটা একটু আন। দে দে একটু মালা ফেরাই।' আর হাতে শক্তি নেই। কেন এ জগতে পড়ে আছি আমি? আমার আয়ু যদি বনিয়ার কাছে যেত—বনিয়া, বনিয়া—

স্বপ্ন, কল্পনা আমাকে পেয়ে বসেছিল। জেগে উঠে দেখলাম সব মিথ্যে। উঃ-উঃ-উঃ,—মুখ দিয়ে গরম ভাপ বেরোচ্ছে। কানের মধ্যে ধক ধক—চোখে জল নেই—সেই ভালো!

আপ্পা রে, আপ্পা—

কী মা?

বনিয়া কাকার কী অসুখ হয়েছিল রে?

কিছু না তো!

তবে! কী ভাবে গেল?

ঘুমের বড়ি খেয়েছিলেন।

ঘুমের বড়ি—!

ঘুম, বেচারি ঘুমিয়ে পড়ল! এটা কী করলে গো? কতদিন হলো? দিন দশেক—দশ? এই রাস্তা দিয়েই তো নিয়ে গেল। এখান দিয়ে? এই রাস্তা দিয়ে? এখান দিয়েই তো বেড়াতে যেত। একবারও ফিরে দেখেনি। জানতে পারলে একবার শেষ দেখা দেখতাম। আমার পোড়াকপাল! আমার তাকে ডাকা উচিত ছিল। আমাকে দিয়ে ডেকে পাঠাতে পারতাম। সে এক জেদি—। কিন্তু আমি কেন এমন করলাম? তাকে ডেকে পাঠানো উচিত ছিল। হয়তো আসত। আসত হয়তো। হয়তো মাথায় ঘোমটা দেখে, হেসে ফেলত। তবুও আমার ডাকা উচিত ছিল।

আপ্পা, তোকে কখনো ও কিছু জিজ্ঞেস করেনি—তোমার মা কেমন আছে?

নাতো, কখনো বলেননি। সব সময়ই তো বই পড়তেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ, বই পড়ার নেশা ছিল ওর। আগে থেকেই। খুব বই পড়ত। কিন্তু কখনও খোঁজ করেনি। করবে নাই তো। জেদি, ভীষণ জেদি। মতের বিরুদ্ধে কারো কি কখনো কিছু হয় না? তাই বলে এত রাগ? এত জেদ? ভারি জেদি, খোঁজটুকুও নেয়নি। ইচ্ছে করছে, আপ্পাকে জিজ্ঞেস করি : আপ্পা, বনিয়া যখন গেল, কেউ কি কেঁদেছিল? কিন্তু জিজ্ঞেস করব কী করে? আর কেই বা, কেনই বা কাঁদবে? আমিই বা কী করে কাঁদব। ইচ্ছে করছে দেয়ালে মাথা ঠুকি। বাড়ির লোকগুলো যদি এখন বেরিয়ে যেত, খুব ভালো হতো। একলা বসে কাঁদতে পারতাম। বিছানায় শুয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে পারতাম। এখন কাঁদতে হলেও নিরিবিলি চাই। হাতের মধ্যে জপের মালা ফিরছে; গুটিগুলো ফুরিয়ে গেল। 'আমাকে একটু একা থাকতে দাও ঠাকুর। এই আঘাতটা আমায় ভুলতে দাও।'

একটু ঠাকুর ঘরে গিয়ে বসলে হয়। মনে হচ্ছে অশৌচ হয়েছে। কাল এগার দিন। কাল এ-গা-র দিন!

কে রে ওখানে?

আমি—

ববন, ববন তোর হাতে কী?

আবোলি ফুলের মালা—

বনিয়া দিল? কে? কে দিল বললি?

সরমলকর—

ঠাকুরকে পরিয়ে দে।

এটা মার জন্যে।

হোক, হোক মার জন্যে। বউমা, মালা থেকে চারটে ফুল ঠাকুরকে দাও তো—

আবোলির ফুল! বনিয়ার উঠোনে কী বিশাল গাছ ছিল! কী রঙের বাহার! সব গেল, সব গেল। আবোলি ফুলের মালা হাতে দেওয়ার সময়—। সব গেল। 'ঠাকুর, ঠাকুর, নাও বাবা, একেবারে নিয়ে নাও বাবা।' সব দেখলাম। সব হলো—

> "তুকা কহে যত পাপ।
> যাবে যদি কর জপ॥"

জপ করছি, জপ করছি। 'ঠাকুর, ঠাকুর—'

কী বলছ বউমা? না, আজ কিছু না, ইচ্ছে নেই, খেতে ইচ্ছে নেই। তোমরা খেয়ে নাও। আমি বসে জপ করি। আমি পরে শোবো। খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো, আমি পরে ঘুমোবো।

কীসের ঘুম? ঘুম কোথায়? চোখ বুজলেই বা কী, খোলা থাকলেই বা কী? বনিয়াকে দেখতে পাচ্ছি—দেখতে পাচ্ছি হাসছে। ওর হাসিটা হয়তো ইদানীং হাসত না। ছুটি পেল বাবা, ছুটি পেল। দুই চোখ জ্বালা করছে। ঘুমের নামও নেই। আমাকে ঘুমের বড়ি কে দেবে? তুমি সুখী, ঘুমোলে। আমার ঘুম নেই। জপের মালা বুকের উপর পড়ে আছে। উঠোবার শক্তি নেই। হরিনাম করবার ক্ষমতা নেই। কখন যে ফর্সা হবে, উঠে পড়ব, তাই ভাবছি। কটা বাজে, কে জানে! অন্ধকার—বড় আঁধার। কাক পর্যন্ত ডাকছে না। কাক এখনও ডাকেনি। এত তাড়াতাড়ি কী করে উঠব? উঠে কী করব? কাক ডাকল নাকি? ফর্সা হলো? কাকের কাজ কাল সকালে। একবার ছুঁয়ে ছাড়া পাও না। বেলা করো না। ইচ্ছে চেপে রেখে করবে কী? কে মেটাবে ইচ্ছে? বিয়ে করলে না। পিছনে কেউ নেই। আমার কাঁদারও সাহস নেই। আমি কী করব? ইচ্ছে অপূর্ণ রেখ না। তুমি তো বুদ্ধিমান, মানে ছিলে। পড়াশুনা করেছিলে। তোমাকে কেন বলতে হবে?

ফর্সা হলো, কে গেল? কে যায় বেড়াতে? এই তো সবে ফর্সা হচ্ছে। এই তো সবে রূপ ফুটছে—

> "ব্রহ্মরূপ বিনা নাহি কোনো স্থান।
> আছে যদি রূপ তবে আছে ভগবান॥"

আপ্পা গেল। কখন আসবে কে জানে! সামনে পিণ্ড; কাক দেখতে পাচ্ছি। বনিয়া হাত জোড় করে বসে আছে। আমার হাত জোড় হয়ে আছে। নে—নে বাবা, বাধা কোথায়?

কে রে ওখানে, আপ্পা? পিণ্ড কি নিল?

না তো, মুখ খোলা রইল।

কেন?

আমি কী করে জানব?

ঠিক, তুই কী করে জানবি!

তারপর? তারপর আর কী? দণ্ডময় কাক, দণ্ডময় কাক। এখানেও জোর জবরদস্তি! কী ইচ্ছে ছিল তার? কী করে জানতে পারব, কী ইচ্ছে ছিল তার? কী বাসনা ছিল? কী ছিল—কীসে জানা যাবে? তার মন কি কখনও কেউ জানতে পেরেছে? তার কাছে কেই বা যেতে পেরেছে! কার কাছে সে মন খুলে কথা বলেছে? সারা জীবন অপরিচিতের মতো কাটিয়ে গেল। কে তার ইচ্ছা পূর্ণ করবে? আর জানবই বা কী করে? কী করে জানব কী ইচ্ছা ছিল? যখন বিয়ে ঠিক হলো, সেই বয়সে, আমাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল কি? আমাকে নিয়ে পালিয়ে যাবার—। আমাকে মানায় না। আমি তার-ই আছি। যা হবার তা হয়েছে। যেতে দাও। আমি স্ত্রী, আমি বিধবা। আমার মা। 'ববন, জপমালাটা দে রে।'

> "বাসনা আমায় হায় হেরিব তোমায়,
> কেমনে সম্ভব, তার জানি না উপায়।"

মূল অসমীয়া থেকে অনুবাদ ঃ মুকুতা কাকোতী / দীপেশ চক্রবর্তী

বাংলা বানান সংস্কার কি জরুরী ?

ছাপার জগতে প্রবেশ করার দিন থেকেই বাংলা বানানে ভুলের সমস্যা দেখা দিতে থাকে। বিশেষত, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শব্দেই ভুলের বহর বেশি দেখা যেতে থাকে। রবীন্দ্রনাথও এ বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁর রচনাবলিতে কী বানান হবে তাই নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এবং বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ বেশ সমস্যায় পড়েন। রবীন্দ্রনাথ তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সময়ের উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে অনুরোধ জানান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বেই একটি 'বাংলা বানানের নিয়ম'-এর বই প্রকাশের ব্যবস্থা করতে। রবীন্দ্রনাথের সেই অনুরোধ মতো শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে একটি বাংলা বানান সমিতি গঠিত হয় ১৯৩৫ সালের ২৯ নভেম্বর। ঐ সমিতিতে ছিলেন—রাজশেখর বসু (সভাপতি), চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য (সম্পাদক), প্রমথ চৌধুরী, বিধুশেখর শাস্ত্রী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, দুর্গামোহন ভট্টাচার্য, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। 'বাংলা বানানেব নিয়ম'-এর তিনটি সংস্করণেই (১৯৩৬, ৮ মে—১ ম সং, ১৯৩৬, ২ অক্টোবর—২য় সং, ১৯৩৭, ২০ মে — ৩য় সং) ঐ সমিতিই বহাল থাকে।

চুয়াল্লিশ বছর আগে নিঃশেষিত হয়ে যাওয়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'বাংলা বানানের নিয়ম' বইটি সম্প্রতি যখন আবার প্রকাশনের উদ্যোগ নেওয়া হতে থাকে তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিছু কিছু সংস্কার করতে চাইলেন। তারই ফলে ১৯৭৯ সালে অস্থায়ী উপাচার্য অরুণ রায় বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করে একটি বানান সংস্কার সমিতি গঠন করে দিলেন। এই সমিতিতে রইলেন : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রধান ও প্রস্তুয়মান 'জাতীয় অভিধান'-এর প্রধান সম্পাদক ডঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের প্রধান, খয়রা অধ্যাপক ডঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু (সদ্যপ্রয়াত), বাংলাবিভাগের অধ্যাপক ডঃ পরেশচন্দ্র মজুমদার এবং প্রকাশন বিভাগের সচিব ডঃ তুষারকান্তি মহাপাত্র। এটি 'বাংলা বানানের নিয়ম সমিতি' নামে পরিচিত।

এই সমিতি ১৯৩৭ সালের 'বাংলা বানানের নিয়ম' ৩য় সংস্করণের পাশাপাশি আরো ১৫টি নতুন প্রস্তাব সংযোজন করে এই বিষয়ে অভিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে এবং সংবাদপত্র-পত্রিকাগুলির সম্পাদকের কাছে একটি পুস্তিকা পাঠিয়ে দেন। বাংলা বানান সম্পর্কে ওয়াকিবহালদের মতামতগুলি পরবর্তী একটি বিশেষজ্ঞ-মণ্ডলীর কাছে পেশ করার কথা ছিল বাংলা বানানের ক্ষেত্রে একটা সমতা ও ঐকমত্যে পৌছাতে। বিশেষজ্ঞদের গ্রহণ-বর্জনের পরামর্শসহ সমস্ত প্রস্তাবগুলিই তারপর পাঠিয়ে দেওয়ার কথা ছিল উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যদের কাছে। তাঁরা প্রয়োজন মনে করলে একটি সম্প্রসারিত কর্মসমিতি গঠন করে বানানের নিয়মের চূড়ান্ত রূপ নির্ধারিত করে প্রকাশ করতেন।

বিশেষজ্ঞ সমিতির সদস্য ছিলেন : ডঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ প্রবোধচন্দ্র সেন, ডঃ সুকুমার সেন, মণীন্দ্রকুমার ঘোষ, ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ডঃদেবীপদ ভট্টাচার্য। কাজ এগিয়েছিল অনেক দূর। কিন্তু মাঝ পথে এসে হঠাৎ কেন থেমে থাকল এই সংস্কারের কাজ, তাই নিয়েই এই তথ্যানুসন্ধান ও সাক্ষাৎকার।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথমেই মুখোমুখি হওয়া গেল বর্তমান বানানের নিয়ম সমিতির সভাপতি ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

প্রশ্ন : বাংলা বানান সংস্কার করার প্রয়োজনীয়তা কেন অনুভব করলেন ?

উত্তর : বাংলার পুঁথির যুগে বানানের কোনো স্থিরতা ছিল না। বোধ হয় অর্ধ-শিক্ষিত নকল নবিশেরা পুঁথি নকল করতেন বলে বাংলা বানানে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা গেছে। পরে যখন বাংলাভাষা ছাপার অক্ষরে মুক্তি পেল তখন থেকেই বাংলা বানানের বিশৃঙ্খলার প্রতি অনেকের দৃষ্টি পড়ল। ১৯ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বাংলা বানানের অনেকটা বিশুদ্ধীকরণ চলেছিল। যেগুলি খাঁটি সংস্কৃত শব্দ তার বানান তো পূর্ব নির্ধারিত কিন্তু যা তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দ তার বানান কী হবে তাই নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের আগে পর্যন্ত বাংলা বানানে তৎসম শব্দের মোটামুটি বাঁধন থাকলেও তদ্ভব প্রভৃতিতে লেখকের খেয়ালখুশী অনেকটা কাজ করত রবীন্দ্রনাথ নিজে বানান সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে বাংলাভাষায় নৈরাজ্য দূর করার জন্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলা সাহিত্যের আরো অনেক পণ্ডিত চিন্তা করছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তার নেতৃত্ব গ্রহণ করল। এবং তাঁরা যে পুস্তিকা প্রকাশ করলেন তাতে বানানের মধ্যে সমতা আনার বিশেষ চেষ্টা হলো। তবুও কিছু কিছু অসুবিধা রয়ে গেল। ইতিমধ্যে লাইনো-টাইপ এল, বাংলা টাইপ রাইটার তৈরি হলো, সুতরাং ছাপাখানা বানান নিয়ে অত্যন্ত সমস্যায় পড়ল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানে মোটামুটি যুক্তি থাকলেও সকলেই যে সে বানান অনুসরণ করলেন তা মনে হয় না।

রবীন্দ্রনাথ গতায়ু হলেন, ক্রমে দেশে শিক্ষা-সংস্কৃতিতে নানা বিপর্যয় ঘনাল, বানানেও তার ছায়া পড়ল। সংবাদপত্রে একরকম বানান, মুদ্রিত গ্রন্থে লেখক ও প্রকাশক হিসেবে অন্য রকমের বানান। বানানের এই নৈরাজ্য দূর না হলে বাংলা ভাষা আত্মপ্রকাশের পক্ষে খুব দুর্বল হয়ে পড়বে। ইতিপূর্বে রাজশেখর বসু প্রমুখ সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও জ্ঞানীগুণীরা যে কারণে বাংলা বানানের একটা নীতিনিয়ম স্থির করতে চেয়েছিলেন ঠিক সেই কারণেই বানানের কালোপযোগি আরও সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। এই জন্যই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বানানের নিয়মাবলীর সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি করে আমরা আধুনিক বানানের পরিকল্পনা করেছি।

প্রশ্ন : কি কি সংস্কার করতে চেয়েছিলেন ? প্রস্তাবগুলি কি কি ?

উত্তর : আমরা বিকল্পগুলি তুলে দিতে চাই। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেবপ্রসাদ ঘোষের বাকবিতণ্ডা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আর প্রস্তাব, সে তো ১৫টি প্রস্তাব আমরা দিয়েছি, দেখবে পুস্তিকাটিতে আছে। আমরা প্রস্তাব করেছি মাত্র, নিয়ম করিনি।

প্রশ্ন : দৈনিক পত্রিকা মারফত জানলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এখন বাংলা বানান সংস্কারের কাজ বন্ধ রাখতে বলেছেন তো এ অবস্থায় এখন কী করবেন বা কী করছেন ?

উত্তর : আমিও সম্প্রতি কাগজে দেখলাম যে কাউন্সিল এবিষয়ে আমার একটি প্রতিবেদন সাপেক্ষে কাজ বন্ধ রাখতে বলেছেন। কিন্তু আমি এখনও লিখিতভাবে কোনো চিঠি কাউন্সিলের কাছ থেকে পাইনি। (১৬.১০.৮১ তারিখে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত-সাঃ)।

প্রশ্ন : বাংলা বানান সংস্কার কি খুবই প্রয়োজন বলে মনে করেন ?

উত্তর : মুদ্রণশিল্প, সংবাদপত্রের চাহিদা, বাংলাভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা এবং নৈরাজ্য ঠেকানর ক্ষেত্রে কালোপযোগি -সংস্কার খুবই প্রয়োজন বলে মনে করি এবং সেটা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল।

এবারকার বানান সংস্কারের যিনি একমাত্র বিরোধী, সদ্য-অবসরপ্রাপ্ত রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের কাছে আমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল।

ক্ষুদিরাম দাস

প্রশ্ন : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বাংলা বানানের নিয়ম ৩য় সংস্করণ (১৯৩৭) কি হুবহু ছাপান হোক বলে মনে করেন ?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : কোনো সংস্কার হোক চান না ?

উত্তর : না। কারণ, চাটুজ্যে কমিটি বিকল্পসহ যে-সব নিয়ম স্থির করে গেছেন তা থেকে কোনো গুরুতর বিচ্যুতি এখনও লক্ষিত হয়নি।

প্রশ্ন : বর্তমান প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে আপনি কী বলেন ? বাধা দিলেন কেন ?

উত্তর : প্রথমত, বর্তমান প্রস্তাবের দফাগুলি অবাস্তব, বিশৃঙ্খলাসূচক এবং সুস্থির অবস্থা থেকে ভয়ানক বিচ্যুতি, এমন কি ছেলেমানুষী ত্রুটিতেও পূর্ণ। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো নির্দেশ নেই। কমিটির সত্যতা কতদূর এবং সেই সঙ্গে আমি ও বাংলা বিভাগের অনেকে ব্যাপারটি জানতেই পারেননি—একারণেও সংস্কারের প্রয়াসকে উদ্দেশ্যমূলক বলে আমার ধারণা হয়েছে। এছাড়াও দেখা গেছে যে, প্রস্তাবিত নিয়মগুলি বানানে ঈ, ঊ কে যথাসাধ্য সংহার করতে চেয়েছে। তাছাড়া ঙ, ঞ, ণ প্রভৃতিকেও অপসারিত করতে চেয়েছে। সকলের উপরে দেখা যায় কয়েকটি তদ্ভব শব্দকে বিদেশী বলে গণ্য করা হয়েছে এবং ঐ সূত্রেই 'স'-কারের স্থানে বিকল্পে 'ছ' দিয়ে বানানের অনুমোদন করা হয়েছে। এটা বাংলা বানানের উপর ধৃষ্টতামূলক লজ্জাকর আক্রমণ। মুখ্যত এইসব কারণের জন্যেই আমি সংস্কারের কাজ ব্যাহত করার চেষ্টা করেছি।

প্রশ্ন : কয়েকটি দৈনিক কাগজে দেখলাম আপনি এই সংস্কারের প্রয়াসকে 'অশুভ লক্ষণ', 'ক্ষতিকর' বলতে চেয়েছেন। কেন ?

উত্তর : যেহেতু সংস্কারের নামে ঐরকম অদ্ভুত ও অবৈজ্ঞানিক পরিবর্তন শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং দেশের দিক দিয়ে ক্ষতিকর হবে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, সেইজন্যে আমি ঐ রকম প্রয়াসকে অশুভ ক্ষতিকর বলে অভিহিত করেছি।

প্রশ্ন : বর্তমান নিয়ম সমিতির সম্পর্কে কিছু বলবেন ?

উত্তর : নিয়ম সমিতি গোপনে হয়েছে। প্রারম্ভে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন আবশ্যক ছিল। বিশেষে, যখন বিশ্ববিদ্যালয়েরই নির্ধারিত ব্যাপারের পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন করণিককে ঐরকম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সচিব আখ্যায় অভিষিক্ত করে স্থাপন করা হয়েছেই বা কেন ? নিয়ম সমিতি (এই প্রসঙ্গে সমিতির সদস্যদের প্রতি তাঁর জিজ্ঞাসা, শব্দটির ব্যাসবাক্য কী ?) গণতান্ত্রিকও হয়নি এবং বিধিবদ্ধভাবেও করা হয়নি। খুশিমতো একটা কিছু করে নিয়ে উদ্দেশ্যসিদ্ধি করার প্রবণতাই এতে পরিস্ফুট হয়েছে। যদি যোগ্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর তাহলে অন্যসব বাদ দিয়েও কেবল ৩ ও ১১ নং প্রস্তাবের ব্যাপারগুলি বিবেচনা করলেই ভালোভাবে ধরতে পারবে।

প্রশ্ন : আপনি তো পারতেন সহযোগিতা করতে। করলেন না কেন ?

উত্তর : ঐরকম ভুলভ্রান্তি ও ডামাডোলের ব্যাপারের সঙ্গে সহযোগিতা করি কী করে বল ?

প্রশ্ন : এই বানান সংস্কার প্রচেষ্টার পিছনে বামফ্রন্ট সরকারের ভাষানীতির বিরুদ্ধে কোনো 'অশুভ লক্ষণ' দেখা দিচ্ছে বলে কি আপনি মনে করেন ?

উত্তর : বর্তমান বানান সমিতির প্রস্তাবের পিছনে ঠিক কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে বলে মনে করি না। তবে জনগণের লিখন ও উচ্চারণ প্রবণতাকে গুরুতর অবজ্ঞা করা হয়েছে বলে মনে করি।

মণীন্দ্রকুমার ঘোষ

এবারে মুখোমুখি হওয়া গেল প্রবীণ বানান বিশেষজ্ঞ মণীন্দ্রকুমার ঘোষের, যিনি সারাজীবন বাংলা বানান নিয়ে ভেবেছেন, বানান নিয়ে রাজশেখর বসুর সঙ্গে তর্ক করেছেন, লিখেছেন 'বাংলা বানান' নামক বিখ্যাত বই।

প্রশ্ন : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'বাংলা বানানের নিয়ম' ৩য় সংস্করণ হুবহু ছাপা হবে নাকি নতুন সংস্করণের প্রয়োজনীয়তা আছে ?

উত্তর : সংস্কারের প্রয়োজন একশোবার আছে। কারণ, বাংলা বানানের ক্ষেত্রে যে রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে বানান সমিতি বানান সংস্কার করেছিল, সেই রবীন্দ্রনাথই বানান মানতে পারেননি। বানান সংস্কার সমিতির অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য ভাষাচার্য সুনীতিকুমারও মেনে চলতে পারেননি। তাহলে আমরা সাধারণ মানুষরা কী করব ? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাংলা বানানের নিয়ম' ৩য় সংস্করণ মানব, না রবীন্দ্রনাথকে মানব নাকি সুনীতিকুমার মানব ? কাজেই এক্ষেত্রে সংস্কার আবশ্যক। তাছাড়া সংস্কৃতে কোনো কোনো বানানের ক্ষেত্রে বিকল্প থাকলেও বাংলায় বিকল্প ছিল না। সংস্কারের ফলেই বিকল্প এল বাংলা বানানে। আর এই বিকল্প এসেই বাংলা বানানে এত ভুলের ছড়াছড়ি। সংস্কারই যদি করতে হয় তবে আর বিকল্প রাখা কেন ?

প্রশ্ন : বর্তমান বানান সমিতি সম্পর্কে আপনার মত কী ?

উত্তর : এই সমিতি কীভাবে গঠিত হয়েছে আমি জানি না। তবে সমিতির সবাই যোগ্য লোক বলে মনে করি। যোগ্যতর আরও কেউ ছিলেন কিনা আমি বলতে পারছি না।

প্রশ্ন : প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে আপনার মতামত কী ?

উত্তর : মতামত দেওয়া কি এখুনি সঙ্গত হবে ? কারণ আমি তো বিশেষজ্ঞ সমিতিরই একজন। কাজেই সমস্ত প্রস্তাবগুলি না দেখে এখুনি কোনো মতামত দেওয়া উচিত নয়। তবে ও'দের ৩ নং প্রস্তাবটি বৈপ্লবিক হওয়া সত্ত্বেও আমি মনেপ্রাণে সমর্থন করি। কারণ সংস্কৃত নিয়ম অনুসারেই 'ইন্' ভাগান্ত শব্দকে বাংলায় হ্রস্ব কারান্ত করলে ব্যাকরণ ভুল কম হবে। 'ঈ' কারান্ত করলেই ব্যাকরণ ভুল বেশি হয়। কাজেই বাংলা বানানের সরলতা ও সঙ্গতি দুয়ের জন্যেই সংস্কৃত 'ইন্' প্রত্যয়কে বাংলায় 'ই' প্রত্যয় করাই সঙ্গত।

প্রশ্ন : ক্ষুদিরামবাবুর মন্তব্যগুলি (অশুভ লক্ষণ, ক্ষতিকর, অভিসন্ধিমূলক) সম্পর্কে আপনি কী বলেন ?

উত্তর : হতে পারে, বর্তমান বানান সমিতির একটি প্রস্তাবও গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু তাই বলে তাঁদের এই প্রচেষ্টার পিছনে কোনো কুমতলব বা অভিসন্ধি আছে, একথা কি বলা চলে ?

শুধু ভাষাতাত্ত্বিক, বানান বিশেষজ্ঞই যে আমাদের লক্ষ্য ছিল তা নয়, আমরা একালের প্রথিতযশা সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীরও

মুখোমুখি হয়েছিলাম আমাদের জিজ্ঞাসা নিয়ে।

প্রশ্ন : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত (১৯৩৭) 'বাংলা বানানের নিয়ম' ৩য় সংস্করণ হুবহু ছাপা হবে, না কি তার কোনো সংস্কারের প্রয়োজন আছে?

উত্তর : সংস্কারের প্রয়োজন আছে।

প্রশ্ন : কেন?

উত্তর : প্রাথমিক পর্যায়ে / মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে / স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সকল পর্যায়ে, প্রতি পাঠ্য বইয়ে একাধিক বানানে এক শব্দ দেখা যায়। ফলে সমাজের বহুস্তরীয় শিক্ষার্থীর মনে বাংলা বানান সম্পর্কে কোনো ধারণা জন্মায় না। আমি চাইছি, অভিধানে এক শব্দের একাধিক বানানরূপ থাকলেও শব্দটির প্রথম বানানরূপটি সকল পর্যায়ের বাংলা ভাষায় লেখা পাঠ্য বইয়ে বাধ্যতামূলক করে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা হোক। পাঠ্য বইয়ে একসঙ্গে একাধিক বানানে

মহাশ্বেতা দেবী

এক শব্দ বিরাজ করলে বানান সংস্কারের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। বানান সংস্কার সমাজের প্রয়োজন ভিত্তিক কাজ, বিদ্বজ্জনের একচেটিয়া ব্যাপার নয়।

প্রশ্ন : বর্তমান বানান সমিতির প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে আপনার মত কী?

উত্তর : কয়েকটির সঙ্গে অবশ্যই আমি একমত, যেমন, সন্ধিচিহ্নযুক্ত অক্ষরে ণ ও ট-বর্গের যোগ। ঞ এবং চ-বর্গে যুক্তাক্ষর রূপ। বস্তুত এগুলি ভেঙে লেখায় আমার সম্মতি নেই। এভাবে ভেঙে লেখার পিছনে যদি অন্য যুক্তি থাকে, তা আমি বলতে পারি না। এমন আরো আছে। তবে সঙ্গে / সঙ্গ / সঙ্গী / অঙ্ক—এসব ক্ষেত্রে অনুস্বার প্রয়োগে আমার আপত্তি আছে। কেননা ঙ স্থলে ং ব্যবহার তো আগেই চালু করা হয়েছিল এবং তা যুক্তির ভিত্তিতে। আজ কোন যুক্তিতে এসব শব্দে ঙ বর্জন করব? যুক্তিটা যদি হয় যে, উচ্চারণ ভিত্তিতে ঙ স্থলে ং বসাব, তাহলে বলতেই হয় পুরনো কথা, যে বানানে উচ্চারণ রীতিকে প্রথম জায়গা দেওয়া যায় না। ক্যানো, জ্যামোন, জখোন, জ্যানো লিখতে হয় তাহলে। সন্ধির যে নিয়মে আজ অঙ্ক হবে অংক, সঙ্গ হবে সংগ, তা বলা হয়নি। এমন আরো আছে।

সাম্প্রতিককালে বাংলা ভাষাতত্ত্ব ও বানান নিয়ে তরুণতরদের মধ্যে সবচেয়ে মনস্ক ও মেধাবী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রীডার ডঃ পবিত্র সরকার আমাদের জিজ্ঞাসার কিছু নতুন দিক খুলে দেন।

প্রশ্ন : 'বাংলা বানানের নিয়ম' তৃতীয় সংস্করণের আবার সংস্কারের প্রয়োজন আছে কি না? থাকলে কেন?

উত্তর : সংস্কার প্রয়োজন। তৃতীয় সংস্করণে কতকগুলি বিকল্প আছে। আমি এই বিকল্পের বিরোধী। যে কোনো একটা বানান রাখার প্রয়োজনেই সংস্কার আবশ্যক। সংস্কার করার পর নিয়মগুলি মানাতে কিছু কড়া ব্যবস্থা থাকা দরকার। বিকল্পের ভিত্তি কী হবে তা পরের ব্যাপার।

প্রশ্ন : বর্তমান সমিতি সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

উত্তর : কীভাবে এই কমিটি গঠিত হয়েছে আমি জানি না। তবে ও'দের কাছে আমার প্রস্তাব ছিল, ও'রা যে প্রস্তাবগুলি দিয়েছেন বানানের ক্ষেত্রে, তার যুক্তিগুলি কী? এবং মনে করি একটু আলোচনা করে নিলে ভালো হতো।

প্রশ্ন : যে ১৫টি প্রস্তাব ও'রা রেখেছেন সে সম্পর্কে আপনি কী বলেন?

উত্তর : ক) সাজানোটা আর একটু বৈজ্ঞানিকভাবে করা যেত। স্বরচিহ্ন বিষয়ক প্রস্তাবগুলি এক জায়গায় আনা যেত অর্থাৎ ১, ৩, ৬, ১০, ১৩—এগুলি পর পর সাজান যেত।

খ) আমাদের বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী অন্যান্য ব্যঞ্জন বিষয়ক প্রস্তাবগুলি আনা যেত। যেমন : ঙ, ং বিষয়ক প্রস্তাব প্রথমে, তারপর জ, য, তারপরে ঞ, ণ, ন, তারপরে শ, ষ, স —এইভাবে।

সাজানোর ব্যাপারটা যে প্রস্তাবের নিজস্ব মূল্যকে দুর্বল করে দিচ্ছে তা নয়। তবে সাধারণ মানুষের কাছে এবং অ্যাকাডেমিসিয়ানদের কাছেও সহজবোধ্য হতো।

গ) এই প্রস্তাবেও যে বিকল্পের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে আমি তার বিরোধী। ৪ নং প্রস্তাবে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে 'চলবে' আমি তারও বিরোধী। ৮নং প্রস্তাবেও যে লেখা 'চলবে', 'ব্যবহৃত হতে পারবে' ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে, এটাও আমি মানছি না। বিশেষ করে প্রস্তাবে একটা বিকল্প দিয়ে দেওয়া ভালো এবং লোককে এটা বোঝান দরকার যে বিকল্পহীন ইউনিফরম বানান গ্রহণ করলে লোকের কত সুবিধা হয়। শিশুদেরও শেখাতে সহজ হয়।

ঘ) কিছু কিছু ইনস্ট্রাকশনের মধ্যে কিছু গণ্ডগোল আছে। যেমন ১০ নং প্রস্তাবে যা বলা হয়েছে—ক্রিয়ার অনুজ্ঞায় ভবিষ্যৎকালে আদিতে 'ও'-কার হবে। তা না বলে, বলা ভালো, 'অ' আছে আদিস্বর হিসেবে এমন এক সিলেবল-এর ধাতুগুলিতেই 'ও' কার যোগ

পবিত্র সরকার

হোক। কিন্তু দুই সিলেবল ধাতুগুলিতে কী হবে এখানে তা বলা হয়নি। যেমন—করিও, বলিও (ণিজন্ত)।

ঙ) প্রস্তাবগুলির মধ্যে তুলনা করলে কিছু কিছু অসঙ্গতি দেখা যায়। যেমন—১ নং পৃষ্ঠাতে 'কিঙ্কিণী' দু-জায়গায় দু-রকম বানান আছে। 'সবুজ' (সবজির রং), যেখানে দন্ত্য-স নিয়ে সেখানে 'শবজি' কেন? উচ্চারণ অনুযায়ী বানান হলে 'খ্রিস্টান'-এ দন্ত্য-স কেন?

চ) ক্রিয়াপদে (১৫ নং প্রস্তাব) যদি ধরা যাক উচ্চারণ অনুযায়ী কোথাও 'ও' কার কোথাও 'ও' ছাড়া লেখা হয় তাহলেও বিকল্প হয়ে যাচ্ছে। একটি শিশু যখন শিখছে তখন সে কোথাও 'হ' পাচ্ছে, কোথাও 'হো' পাচ্ছে। এটাকে পরিহার করা যায় কি না? শিশুদের কথা এ'রা ভাবেননি। একটা ধাতুর একাধিক চেহারা বানানের ক্ষেত্রে, একটি শিশুর শিক্ষার পক্ষে কঠিন। এখানেও দু সিলেবল-এর ধাতুর বিষয়ে কোনো ইনস্ট্রাকশন নেই।

ছ) ৫ নং প্রস্তাবটি ভালো। তবে আর একটু বিস্তৃত করে দেখতে হবে।

আমার মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে, শিক্ষাপর্ষদ থেকে, সরকারি দপ্তর থেকে, মুদ্রণশিল্প, পত্র-পত্রিকা থেকে, সাহিত্যিকদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নিয়ে যদি একটি বানান সমিতি গঠন করা যেত তবে মনে হয় এই বানানের ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব আরও বাড়ত এবং নিয়মগুলোর স্বীকৃতি আরও সোজা হতো। অর্থাৎ সেই সমিতির একটি 'অথরিটি' যেমন তৈরি হতো (যা এ 'সমিতি'র তৈরি হতো বলে মনে হয় না), তেমনই সদস্যদের দায়ও বেড়ে যেত।

জ) সামগ্রিকভাবে প্রস্তাবটি অসম্পূর্ণ, এর ঝোঁকও অসমান। 'তৎসম' শব্দের বানান নিয়ে সমস্যা আছে ঠিকই, কিন্তু মূল সমস্যা অতৎসম শব্দের বানান—তাতে আরো অনেক কথা বলা যেত। ঙ / ং-এর একটি রাখার পক্ষপাতী আমি, সম্ভব হলে ঙ—কারণ, তার সঙ্গে স্বরচিহ্ন যোগ সম্ভব। তবে এর চেয়ে বিস্তারিত করে অন্য অবকাশে বলা যাবে। □

তাপসকুমার ভট্টাচার্য

আলোকচিত্র : সঞ্জীবকুমার বাগ

সাহিত্য বিতর্ক

সাহিত্য-বিতর্কে এ সংখ্যা থেকে সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের একগুচ্ছ করে চিঠি ছাপা শুরু হলো। নিরপেক্ষ ও সচেতনভাবে চিঠি নির্বাচন করা হয়েছে। বক্তব্যের সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব পত্র লেখক-লেখিকার। সেইজন্য তাঁদের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ছাপা হলো।

স্বীকার করতেই হবে চিঠিগুলি যুক্তি ও বুদ্ধিসম্পন্ন। আরও চিঠি পাঠান। স্বাদু, বিশ্লেষণযুক্ত ও মরমী। প্রতিটি মুদ্রিত চিঠির জন্য পনেরো টাকা সাম্মানিক দেওয়া হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র কি ইসলাম বিরোধী ছিলেন ?

বঙ্কিমচন্দ্র=প্রচণ্ড প্রতিভা+ উদগ্র ধর্মান্ধতা

'বঙ্কিমচন্দ্র মুসলিম বিদ্বেষী লেখক ছিলেন না'—এই কথাটিকে প্রতিষ্ঠা দিতে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র কলম ধরেছিলেন। 'রাজসিংহ'-এ আলাদাভাবে উপসংহার লিখেছিলেন এবং সচেতনভাবেই, খোলাখুলি। বাংলা তথা বিশ্ব সাহিত্যের আর কোনো লেখক-কে এমন কাজ করতে হয়েছে নাকি ? এটা স্পষ্ট, বঙ্কিম তাঁর জীবদ্দশায় আশঙ্কা করেছিলেন—তাঁর উপন্যাস পড়ে, বিশেষ করে রাজসিংহ-আনন্দমঠ-সীতারাম পড়ে কোনো কোনো পাঠকের মনে তাঁর সম্বন্ধে মুসলিম-বৈরিতার প্রশ্ন এসে যেতে পারে।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও পরবর্তীকালে বারবার প্রশ্নটি এসেছে এবং শুধু বঙ্কিম ভক্ত বা বিশেষজ্ঞদের কাছে ব্যাপারটি খানিকটা অস্বস্তির কারণ হয়েছে তাই নয় ; তাবৎ বাংলা-সাহিত্য-পাঠকের কাছেই তা' হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে হিন্দু এবং মুসলমান চরিত্র উভয়ই রয়েছে। তিনি সব হিন্দু চরিত্র ভালো আর সব মুসলমান চরিত্র খারাপভাবে এঁকেছেন তা নয়—এটা যাঁরা বঙ্কিম-উপন্যাস পড়েছেন, তাঁরাই জানেন। এর জন্যে শিলাদিত্যে প্রকাশিত বঙ্কিম-বিশেষজ্ঞদের সুনিপুণ পাশ-কাটানো ব্যাখ্যারও খুব প্রয়োজন পড়ে না। আসল ব্যাপার হলো—বঙ্কিমের কণ্ঠস্বর কেমন ছিল কিংবা বলার ধরনটি, অন্তত কিছু কিছু ক্ষেত্রে ? সবদিক বিচার করেও অত্যন্ত হতাশ কণ্ঠে শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদারকে তাই বলতে হয়—বঙ্কিমচন্দ্র মুসলিম-বিদ্বেষী ছিলেন বড় বেদনার সঙ্গেই স্বীকার করতে হয় (বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ ; পঃ বঃ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি ; ভূমিকা)।

বঙ্কিমচন্দ্র জন্মেছিলেন হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণের এক গোঁড়া পরিবারে। যেখানে কিছু কিছু কট্টর কু-সংস্কারও ছিল জীবন-চর্যার অঙ্গীভূত। বঙ্কিমচন্দ্র বড় হয়েও এগুলিকে মেনে নিয়েছিলেন। পুরনো এবং আদি যা কিছু, তার প্রতি বঙ্কিম অন্ধ আসক্তি বরাবরই অনুভব করে এসেছেন, উপন্যাসে এই মানসিকতা সব ক্ষেত্রে সক্রিয়ও ছিল। রামমোহন-ঈশ্বরচন্দ্রের উদার দৃষ্টি-সঞ্জাত সমাজ-সংস্কারের কাজগুলি তিনি কোনোদিন সুনজরে দেখেননি। 'মেসমেরিজম, যোগবল, ঝাড়া-ঝোড়া, মন্ত্রপড়া, তারকেশ্বর মানত প্রভৃতি পরিবার-পরিবেশগত অলৌকিকতায় বিশ্বাসও তাঁর ছিল' (ভূমিকা, বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ)। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসে যে সমস্ত কাল্পনিক মুসলিম চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্র এনেছেন সেগুলির কথা বাদ দিলেও খাঁটি ঐতিহাসিক চরিত্রচিত্রণে বঙ্কিম ইতিহাসের প্রতি বিশ্বস্ত থাকেননি অনেক ক্ষেত্রে। ঔরঙ্গ-জেবের আর যা-ই দোষ থাকুক না কেন তিনি যে খাঁটি গোড়া মুসলিম অন্তত ছিলেন এটা অনেকেই স্বীকার করলেও বঙ্কিমচন্দ্র করেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের ঔরঙ্গজেব উদার তো নয়ই অধিকন্তু ইসলামীয় আচার-আচরণও তিনি মেনে চলেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র যৌবনেই দুটো জিনিস সহজেই লাভ করেছিলেন—এক, প্রচণ্ড প্রতিভা, দুই, উদগ্র ধর্মান্ধতা। এই দুয়ের সংমিশ্রণ খুব সুসম এবং সৌষ্ঠবপূর্ণভাবে ঘটেছিল বলে বঙ্কিমচন্দ্র হতে পেরেছিলেন 'সাহিত্য-সম্রাট', 'বন্দে মাতরম'-এর উদগাতা, প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ। অনাথায়...

আবদুস শুকুর সরকার, কাছারী রোড, কাটোয়া, বর্ধমান।

বঙ্কিমচন্দ্র ও ধর্মতত্ত্ব

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস লিখতে গিয়ে উপকরণের জন্য ঐতিহাসিক ঘটনার আশ্রয় নিয়েছেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই মুসলমান চরিত্রও তাঁর উপন্যাসে এসে পড়েছে। এই চরিত্রগুলির মধ্যে দেখতে পাই ওসমান, আয়েষা, দলনী, মীরকাশিমের চরিত্র ; যে সমস্ত চরিত্র মুসলমান জাতির গুণের কথাই বলেছে, বীরত্বের কথাই বলেছে, বলেছে আত্মত্যাগ এবং প্রেমের কথা। আবার পাশাপাশি পাই কতলু খাঁ, তকি খাঁর মতো হীন চরিত্র। উপন্যাসের প্রয়োজনে যেমন কয়েকটি মুসলমান চরিত্রকে হীন করতে হয়েছে, তেমনিই আবার হিন্দু পাত্র-পাত্রীর চরিত্রকেও নিচু করেছেন। আমরা বঙ্কিম উপন্যাসে গঙ্গারাম, সন্ন্যাসী অভিরামস্বামী, শৈবলিনীর চরিত্রে দেখি কলঙ্কের ছাপ, দেখি শঠতা আর ভণ্ডামির কালো চিহ্ন। ভালো এবং মন্দ উভয় চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাতে উপন্যাস গড়ে ওঠে। সুতরাং উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র যে সমস্ত চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তা হতে তিনি যে ইসলাম বিরোধী একথা প্রমাণিত হয় না।

'বহু বিবাহ' প্রবন্ধে বঙ্কিম বলেছেন 'এ দেশের অর্ধেক হিন্দু, অর্ধেক মুসলমান। যদি বহু বিবাহ নিবারণের জন্য আইন হওয়া উচিত হয়, তবে হিন্দু মুসলমান উভয়ের জন্য সে আইন হওয়া উচিত।' বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু এবং মুসলমান উভয় শ্রেণীর মঙ্গল চাইতেন বলেই এই উক্তি করেছিলেন।

ধর্মতত্ত্ব প্রবন্ধে (২১তম অধ্যায়ে) গুরু-শিষ্য বাক্যালাপের মধ্য দিয়ে গুরুর মুখ দিয়ে বঙ্কিম বলেছেন, 'হিন্দুর কাছে হিন্দু-মুসলমান সমান।' ইসলাম বিরোধী হলে বঙ্কিমের পক্ষে এ ধারণা করা অত্যন্ত অসম্ভবই বলা যায়।

ধর্মতত্ত্ব প্রবন্ধেই শেষ পরিচ্ছেদে এই গুরুর মুখেই শুনতে পাই, 'সমগ্র ধর্ম কোন মনুষ্য ধ্যানে পায় না অন্যের কথা দূরে থাক, শাক্যসিংহ, যীশুখৃষ্ট মহম্মদ কি চৈতন্য,—তাঁহারাও ধর্মের সম্পূর্ণ অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, এমত স্বীকার করিতে পারি না।' এই উক্তি হতে আমরা এটুকু বুঝতে পারি যে, শুধু ইসলাম ধর্ম নয়, সব ধর্মকেই তিনি ধর্ম বলে মর্যাদা দিয়েছেন। বঙ্কিমের এই মানসিকতা আমরা আরও স্পষ্ট করে পাই যখন তিনি গুরুর মুখ দিয়ে বলেছেন (চতুর্থ অধ্যায়ে) 'যিনি একাধারে শাক্যসিংহ, যীশুখৃষ্ট মহম্মদ ও রামচন্দ্র ; যিনি সর্ববলাধার, সর্ব-গুণাধার, সর্বধর্মবেত্তা, সর্বত্র প্রেমময়, যিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।'

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু হিন্দুর উন্নতি চাননি, শুধু মুসলমানের উন্নতি চাননি, সমগ্র ভারতবাসীর উন্নতি চেয়েছেন। সমাজের সবচেয়ে শোষিত শ্রেণীর উন্নতি চেয়েছেন, পরাণ মণ্ডল, হাশিম শেখদের উন্নতি চেয়েছেন। তিনি শসশ্যামলা বীর ভারতবর্ষকে দেখতে চেয়েছিলেন।

দ্বিজেন্দ্র চক্রবর্তী, ৫/ডি, জুবিলি পার্ক, কলিকাতা-৩৩।

ইসলামবিরোধী নন; বিমুখী

বিরোধী নয়, মূলত বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ইসলাম বিমুখী। যে যাই বলুন, যে যুক্তি

দিন, সনাতন হিন্দু ভাবনার আভিজাত্যবোধ বঙ্কিমে অতিমাত্রায় সক্রিয় ছিল। তথাপি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিলুপ্ত হিন্দুশক্তির পুনরুত্থান কামনা তাঁর অপেক্ষ মস্তিষ্কের বিভেদ-ভাবনা বলেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে এ খুব সত্যি যে, যে কোনো কারণেই হোক ইসলামধর্মের আনুকূল্য প্রদর্শন তাঁর পক্ষে করে ওঠা সম্ভব হয়নি।

ফলত, সাহিত্য-সাধনে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে স্পষ্টতই বঙ্কিমের ভাবনা হিন্দুধর্মের সনাতন বৃক্ষটিকে ঘিরেই ডালপালা মেলেছিল। এ সাম্প্রদায়িকতা নয়, বরং স্বধর্মানুরতির স্বাভাবিক প্রক্ষেপ। পরবর্তী পর্যায়ে ক্রমশ জ্ঞানী বঙ্কিমকে দূরে সরিয়ে কবি বঙ্কিমের ঘটল প্রাধান্য। কবি অর্থে, যে সত্যদ্রষ্টা। সত্যদ্রষ্টার দৃষ্টি ঘুচিয়ে দিল এই ধর্মাধর্মের পাণ্ডিত্য বিভেদকে। জ্ঞানী বঙ্কিমের ইসলাম বিরূপতা (বিরোধিতা নয়) তখন স্বভাবতই যা ছিল কাম্য অর্থাৎ হিন্দু-ধর্মের আভিজাত্য প্রমাণে অকপট উদ্যোগ—লক্ষ্যনীয় বঙ্কিম সেদিকেই গেলেন না। বরং

বঙ্কিমের লেখনীতে তখন ফুটে উঠল এক চিরন্তন বাণী। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের দিকে তাকালে দেখি এখানে তাঁর মূল বক্তব্য শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল এই : 'বিদ্রোহী হতে হলে একদিকে যেমন নিজেকে গড়তে হবে শরীরে চরিত্রে—অন্যদিকে বিশ্বমানবমন থেকে নিজেকে বিমুক্ত রাখলেও চলবে না। এই নিখিলবিশ্বের সুরে তাকে সুর মেলাতেই হবে। লক্ষ্য করা যেতে পারে, এই যেখানে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের মূলের কথাটি, সেখানে হিন্দু-মুসলমান-ইংরেজ ভারতবাসীর প্রশ্নটি যে নিতান্ত নগণ্য হয়ে পড়বে তাতে আর সন্দেহ কী? তা যদি না হতো 'আনন্দমঠ' অনির্বাণ শাশ্বত দীপ্তিতে বাঙালীর হৃদয়ে চির-প্রজ্জ্বলিত থাকত না। অনুরূপ কথা প্রযোজ্য সাম্প্রদায়িকরূপে চিহ্নিত তাঁর 'সীতারাম', 'মৃণালিনী' 'দেবী চৌধুরাণী' ইত্যাদি উপন্যাসের ক্ষেত্রে।

প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো বিশেষ মত বা আদর্শের আশ্রয় অস্বাভাবিক বা অবাঞ্ছিত নয়। লক্ষ্য করতে হবে, যেখানে পরবর্তী পর্যায়ে এই মত বা আদর্শের ভূমিকাই প্রধান হয়ে পড়ে অনিবার্য-ভাবে তার সাহিত্য ধর্মচ্যুতি ঘটে। পক্ষান্তরে মতের ভূমিতে শিকড় চালিয়ে যাঁরা সার্বজনীন রসের উৎস আবিষ্কারে সমর্থ হন তারাই প্রকৃত সাহিত্য-সাধক। তারাই কবি। বঙ্কিমচন্দ্র হলেন শেষোক্ত দলের সামর্থ্য এক শিল্পী।

মানস ঘোষ, গোপাল ঘোষ লেন, সালকীয়া, হাওড়া-৭১১১০৬।

বঙ্কিম জাতিভেদের স্বপ্ন দেখেননি

বঙ্কিমচন্দ্রের পনেরটি উপন্যাসের মধ্যে মাত্র সাতটিতে মুসলমান সমন্বিত ঘটনা রয়েছে। এই সাতটি উপন্যাস পর্যালোচনা করলে আমরা কোথাও ইসলাম বিরোধী-গন্ধ পাই না। কোনো কোনো উপন্যাসে যেটুকু ছিটে ফোঁটা ছড়িয়ে আছে বলে কেউ কেউ মনে করে থাকেন—তা স্বাদেশিকতার মন্ত্রে যুবজগতকে উদ্বুদ্ধ করার প্রেরণা। জাতিভেদের স্বপ্ন কখনও তিনি দেখেননি। জাতিভেদের বীজ বপন করে কখনও 'বন্দেমাতরম'এর মতো সঙ্গীত রচনা করতে পারতেন না। অনেকদিন হাকিম থাকায় তিনি জেনেছিলেন ভারতের পঁচাত্তর থেকে আশি ভাগ লোকই মুসলমান গরীব কৃষক। সুতরাং এই অধিক জনসংখ্যাকে বাদ দিয়ে দেশের মুক্তি সম্ভব নয়। দেশের সমস্ত মানুষ যখন দেশমাতৃকার সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেছেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, বঙ্কিমের উদ্ধত কলম তখন 'আনন্দমঠ' রচনায় মগ্ন। 'আনন্দমঠ' রচনার কিছুদিন পরেই ১৮৮৫ খৃঃ কংগ্রেসের জন্ম। কংগ্রেসের জন্মদাতাগণ যে আনন্দমঠ থেকে কোনো প্রেরণা পাননি তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কারণ, 'আনন্দমঠ'-এর বক্তব্য দেশবাসির কাছে পৌঁছে দিতে সে যুগেও উর্দু ও হিন্দি ভাষায় এই গ্রন্থ অনুবাদ হয়েছিল। আমরা দেখেছি হিন্দুরা খিলাফৎ আন্দোলনে, মুসলমানরা কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে। তারা অসহযোগ অন্দোলনে জোট বেঁধে সহায়তাও করেছে, এরপরও বঙ্কিমকে কী ভাবে মুসলিম বিদ্বেষী বলা যায়!

'আনন্দমঠ'-এ বঙ্কিমচন্দ্র দার্শনিক দৃষ্টি ভঙ্গির পরিচয় রেখেছেন। 'মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়, ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেসপাচ লেখে। বাঙালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।' বঙ্কিমচন্দ্র মীরজাফরকে কোনো বিশেষ জাত হিসেবে ধরেননি। মীরজাফর ভারতবাসী—ভারতের ঐশ্বর্য বৃটিশ পদতলে অর্পণ করাকে বঙ্কিম সহ্য করেননি। আপাত দৃষ্টিতে 'এ বাবুয়ের বাসা—শূকরের খোয়াড় ভাঙ্গিয়া ফেল'—বক্তব্যে মুসলমান বিদ্বেষের গন্ধ পাওয়া গেলেও 'আনন্দমঠ' স্বদেশী আন্দোলনের মূলমন্ত্র।

আমাদের স্মরণে থাকা উচিত 'রাজসিংহ' উপন্যাসে বঙ্কিমের উক্তি—'হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না।·····অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম আছে হিন্দু হউক, মুসলমান হউক সেই শ্রেষ্ঠ।' বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুত্ব, মুসল-মানত্ব বা খৃস্টানত্বকে গুরুত্ব দেননি—দিয়েছেন 'ধর্ম'কে। ধর্ম কোনো নির্দিষ্ট দেবদেবী, আচার বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর আকার, বর্ণ বা জাত নেই। মনুষ্যত্বই হলো 'ধর্ম'।

বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েষা, ওসমান, দলনী এবং 'সীতারাম'-এর ফকির চরিত্র উচ্চ-মানবিকতার পরিচয় দেয়। সীতারাম ও ফকিরের কথোপকথনে ফকিরের উক্তিতে বঙ্কিম বলেছেন—'······সেই একজনই হিন্দু-মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়াছেন। উভয়েই তাঁহার সন্তান।' সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র ইসলাম বিরোধী হলে এই চিন্তা তাঁর সাহিত্যে আমরা পেতাম না।

মিনারা খাতুন, কাজিপাড়া, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১।

সাম্প্রদায়িকতার উদ্গাতা নন

অতি প্রগতিশীল পাঠক বঙ্কিমচন্দ্রকে সাম্প্রদায়িকতার উদ্গাতা হিসেবে অভিযুক্ত এবং/কিংবা বর্জন করেছেন। তাদের অভিযোগ —বঙ্কিম সাহিত্য বিশেষত 'আনন্দমঠ' সাম্প্রদায়িকতার আধার। বস্তুত, 'আনন্দমঠ'এ শত্রু চিহ্নিত করার অভিপ্রায়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন আপাতদৃষ্টিতে তা আপত্তিজনক মনে হলেও আসলে সেটা দীর্ঘকালীন অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে অনিবার্য প্রতিবাদ। একথা অনস্বীকার্য, 'আনন্দমঠ' পরাধীন ভারতবাসীকে স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র বরাবরই বাঙালীর গৌরব প্রকাশে সচেষ্ট ছিলেন। ১২৮৭ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় তিনি লিখেছিলেন, 'বাঙালীর ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙালী কখন মানুষ হইবে না।' 'বাঙালী' বলতে তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই বুঝিয়েছেন। সিরাজের পরাজয় ও তাঁর বিরুদ্ধে কাপুরুষতার অপবাদ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে বাঙালীর পরাজয় ও বাঙালীর বিরুদ্ধে অপবাদ। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর লুপ্ত ও গুপ্ত গৌরব-ইতিহাস উদ্ধার করেন। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে তারতম্য নির্দেশ করা তাঁর অভিপ্রেত ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্রকে কখনও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শক্ত হতে হয়েছে। যেমন 'রাজসিংহ' উপন্যাসে। নিষ্ঠাবান মুসলমান ঔরঙ্গজেব ছিলেন প্রচণ্ড হিন্দু বিদ্বেষী। হিন্দু'র দেবালয় ধ্বংস, হিন্দুর উপর জিজিয়া কর আরোপ, হিন্দুদের বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করণ এবং হিন্দু নারীর উপর তাঁর লোলুপ দৃষ্টি তৎকালীন হিন্দুর মনে প্রবল অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল। তাই ঔরঙ্গজেবের তসবীরে চঞ্চলকুমারীর লাথি মূলত দুরাত্মার বুকে ধর্মের লাথি। অথচ 'রাজসিংহ' উপন্যাসের আরেক চরিত্র মোবারক সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা অন্যরকম—'মবারক সে ইতর প্রকৃতির মনুষ্য ছিলেন না। তিনি রাজসিংহের ন্যায় যথার্থ বীরপুরুষ'। উক্তিটি প্রমাণ করে, বঙ্কিমচন্দ্র ইসলাম বিরোধী নন। তিনিই সর্বপ্রথম নানাবিধ ভেদ থাকা সত্ত্বেও ভারতবাসীকে 'একজাতি' হয়ে ওঠার পরিকল্পনা দিয়ে-ছিলেন। সম্যক মিলনের স্বপ্ন বোধ হয় তিনিই প্রথম দেখেছিলেন।

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, ৬০৫, সাহেব পাড়া, কাটিহার, বিহার-৮৫৪১০৫।

কুয়োতলার কাব্য

শ্রীশোক কুণ্ডু

বর্ষা এসেছে তিলুর উঠোনে। চোইত বোশেখের পোড়ামাটিতে আজই প্রথম বর্ষার একবাট। গন্ধ উঠেছিলো মাটির। আকাশটা তেমন জমেনি। প্রথম বর্ষা তো, কিছুটা কুমারী মেয়ের মন, দাঁড়ালো না। এসেছিলো, চলে গেল, উঁকি দিলো, সবটা দেখা গেল না।

তবুও দুকুঠরী ঘরের পশ্চিম মটকার কোণের আকাশ যেন ধানসিজোনো হাঁড়ির কালো মুখ, মিশকালো। যেন মরা বিকেলে আবার নামবে। এই এল, আবার. গোটাও পাততাড়ি, গোয়ালের গরু সামলাও, খামার থেকে তুলে আনো বন্দিনী তিলের শুঁটি, মাকাই ও সরষের বীজ, রোদ খেতে দেওয়া ঋতুমতী গমের বীজদের। হাওয়া বইলো দমকা মেরে। গাছের ডালে ডালে পাতায় পাতায় গা ঘষাঘষি, ঠেকাঠেকি, অনেকদিন পর যেন প্রাণখোলা প্রতিবেশী।

এই কদিন দেখতে দেখতে শেষ আষাঢ়ের আরও পাঁচটা দিন গেল। তিলুর ক্যালেণ্ডার বলতে একটি তালপাতা। সে তালপাতায় আছে গোয়ালার গুণ-ছুঁচের হিসাবের দাগ। পাঁচদিন হলো মনে মনে হিসেব করলো তিলু, কেমনা এই পাঁচদিন হয়েছে কালো গাইগরুটা ডাকছে। মাঠ দেখানোর সময়। এ সময় এই প্রথম ডাক পায় হলে বড় মুশকিল, অথচ এই গরুটা তিলুর বাপের বাড়ির সামিগ্রি। বিয়েব পরই দেওয়া,-তিলুর বাচ্চা দুধ খাবে।

এই পাঁচদিন তিলুর ভিতরে কোথাও মেঘ জমছে। কোথাও কি বর্ষার পায়চারি কিংবা কোথাও বেড়ার পাশে অযত্নে বেড়ে ওঠা আগাম মেহদী ফুলের গন্ধ? তিলু সামান্য নাড়া খেয়েছে, ঐ যে কথায় বলে 'আগুনের কাছে ঘি গলবেই গলবে।'

দুপুরে প্রথম জলের আগেই ছুটোপাটি করে সংসারের জিনিসপত্র তোলাতুলির সময় পেঞ্জালী বসেছিলো উঠোনে, ভাতঘুম থেকে ওঠার পর তিলু দেখলো সেইসব পেঞ্জালীগুলি মুছে গেছে প্রায়। গাই গরুটাকে দেখতে ভূষণ আসবে, আজকে চারদিনের ওষুধ শেষ হয়েছে। গরুটাও দাস্য, বলিহারি যাই! খোঁটার দড়ি ছিঁড়ে লড়াই করে ভাইনের শিং ভেঙে একবারে রক্তের বন্যা।' তারপব এই ডাক। বিপদের উপর আরও এক গেরো। এই সব ঘরগেরোস্তো, শ্বশুরবাড়ি কাঠ কয়লার গনগনে আগুনের মতন জা মায়া, আর তার বড় ছেলে তিলুর বড় ন্যাওটা, এই সব পাঁচমিশেলী ভাবনায় তিলুর মন আজ আনচান। ভূষণ আসবে বিকেলে। ভূষণ এসেছিলো ফিরে লক্ষ্মীবার। সেই মানুষটার কোনো খবর নাই বহুদিন।

খিড়কির পশ্চিমপাড়ে তালগাছ একপায়ে সব কথার সাক্ষী। পাশের যে পাতাটা ঝুলে পড়েছে সেটায় বাবুই পাখিদের দিনের শেষবেলাকাব আলোয় কিছু মজলিশি নালিশ। সেদিকে তাকাল তিলু। ভূষণ কবরেজ আসছে না কেন? শাশুড়ী গেছে পাড়া বেড়াতে। এখুনি এই নাগাদ সন্ধ্যেয় ফিরবে। ঐ মানুষটাব কথায় ভাবিয্য নাই। গাছপালার শিকড়বাকড় খুঁজতে খুঁজতে মাথায় মধ্যে সব কথা শিকড় হয়ে গেছে। না হলে আজ এত দেরি! জানে সব অথচ কী করছে কে জানে, হয়তো ভুলে মেরে দিয়েছে। নয়তো অন্য গাঁয়ে কোনো শ্বেত আকন্দের ফুলের সন্ধান পেয়েছে। দাছদুয়ারে এসে মুখ বাড়াল তিলু।

ভাঁড়ার ঘরের পাশে ঝিটচালের পাঁচিল অনেকটা পড়ে গেছে। ওখানে এই বর্ষায় গজ্জাবে কিছু লতাগুল্ম, বর্ষার স্পর্শে শিহরিত হবে। আর ওদিকে পুকুরের পাড়ে অযত্নে বেড়ে ওঠা বৈঁচি গাছে সবুজ ফল ধরেছে। একদিনে তিলুর মধ্যে বেড়ে উঠেছে একটি গাছ নিতান্তই অবহেলায়। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো শাশুড়ীর ঘোড় দৌড়। বেড়ার পাশে ঝিঙে ফুলের হলুদ রঙ। শাশুড়ী বেড়ার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললো, 'ঝিঙে ফুলে বেলা মরলো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাও দেখছো, জল আনতে আমি এই বুড়ো বযসে যাই, ঠ্যাঙ হাত ছড়িয়ে ভোগ করো তোমরা আমি মরে গেলে।' তিলু নীরব। সরব হয় অন্তরের অন্তরীক্ষে। মাটির দেওয়ালে লাগানো ভাঙা আয়নায় মুখ দ্যাখে তিলু।

জা বাপের ঘর গেছে সংসারেব ভার ছেড়ে দিযে, ভাঁড়ারের চাবি নিয়ে। তিলু এ-সংসারে বড় অবৈধ। ভাঁড়ারের চাবি নিয়ে যাওয়াটা এই প্রথম। মানুষকে অবিশ্বাস করলে মানুষ বড় কাঁদে। তিলুর বোধ হয় কান্না শুকিয়ে গেছে। বস্তুত আজকাল সে আর কাঁদে না। মুখে একটা মৃত হাসি জিইয়ে রেখে আজ দিন পাঁচেক সে কিছুটা আলাদা। গাঁয়ের বউদের যেখানটায খুঁটি সেখানটায় তিলু আশ্রয়হীন। অথচ দোষ তার কোথায়? এতোদিন এই তিন বছবের বিয়েব পর, সে হিসেব করে দেখল প্রথম বছর দেড়েকের জন্যে আলোকিত অধ্যায়। তারপর সামান্য কথা কাটাকাটি এবং বঙ্কুবিহারীর গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়া। চলে যাবার পর তিলু ভেবেছিলো ওটা সাবেকী ঢঙ, সব পুরুষ মানুষের যেমন। তারপর শাশুড়ীর তিলুকে বাপের বাড়ি পাঠানো। তারপর ঐ রকম সময়টুকুর জন্যে হঠাৎ আবির্ভাব। কোথাও ছিলো না এমন লেখা। তিলু যখন বাপের বাড়িতে পাঁচদিন কাটালো ভেবেছিলো বঙ্কুবিহারী লোক পাঠাবে কিংবা

নিজে আসবে। তখন সে বঙ্কুবিহারীর হাত ধরে আবার ফিরে আসবে এখানে। হয়নি তা। সেই মিথ্যে অভিমান প্রসব করেছে এক বঞ্চনা। লোকে বলে বঙ্কুবিহারী নাকি ফিরবে এ-ভিটেয়, তিলু মরার পর। অন্তত শাশুড়ীর তাই রটানো খবর। এক একবার শাশুড়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে কেঁদেছে তারপরে শাশুড়ীর মুখখানটায় সমস্ত দুঃখের খবরগুলো বাসি হয়ে গেছে।

না না বেলা যাচ্ছে। আষাঢ়ের অহর প্রহর দীর্ঘ বেলারও মৃত্যু হয়। গাছের মতন সহনশীলা তিলু চঞ্চল! সমস্ত ঘটনার কারণ হিসেবে প্রথম প্রথম সে নিজেকে দোষী করত, তারপর কপালকে মন্দ বলত। আজকাল তিলু অন্য কিছু ভাবছে।

কলসী আর দড়ি নিলো তিলু, জলকে যাবে। তার আগে মোড়ল পুকুরে গা ধোবে, সেখান থেকেই চলে যাবে কুয়োতলায়। তিনক্ষেপ জল আনা চাই। এখন ঘরের আর তেমন কোনো কাজ নাই। সন্ধ্যে দেখানোটা শাশুড়ী করে নেবে। ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখল জায়ের ছেলে খেলে ফিরছে। এই বাচ্চাটাই তিলুর বুকে শিকড় গেড়েছে। মামার বাড়ি যায়নি মার সঙ্গে। জ্যাঠাইমার ন্যাওটা হাতের রঙীন কাঁচের গুলি দেখিয়ে বললো, 'চারটে পেয়েছি আজকে। তাড়াতাড়ি ঘরে আয় জ্যাঠাই।'

তিলু হাসলো। এই বালক তাকে বন্দী করেছে। তিলু বলে, 'ঠাকমা রেগে গেছে, চুপচাপ খেয়ে নিয়ে পড়তে বসে যাবি, আমার আজ তিনখেপ। যাবো কি আসবো'।

ঘাটে মানুষ আসার সময় পার হয়ে গেছে। তিলুর দেরি হয়েছে আজ অকারণে। কোনো কারণ ছিল না দেরির। ঘাটের কানার উপর কলসী নামিয়ে কাপড় আছাড়ে গামছা পরার আগে কলসী মাজলো। জলে নামলো ধীর পায়ে। জলের আয়নায় তিলুর মুখ টলছে। সেই টলামুখ দেখে সামান্য মজা পেল। এই মরা বেলায় জিয়ল মাছ ফুট কাটছে। জলের ছড়ানো বাঁশের উপর এক শাদা বক শান্ত পূজারীর মতো নিথর। চুনো মাছ ভাসলেই ধারালো ঠোঁটে আক্রমণ।

দীর্ঘকায় পাকুড় গাছ ছায়া ফেলেছে। আজ কেমন থমথমে লাগছে। তবে কি সবাই গন্ধ পেয়েছে তিলুর মহোৎসবের? তিলু স্বপক্ষে কিছু যুক্তি খাড়া করলো। এতোদিনে নিজেকে দোষ দেওয়া তারপর কপাল ধিয়ানো। আজ তিলু এক বলিষ্ঠ যুক্তি খাড়া করেছে। মানুষ শুধু মরতে বলে, সব ত্যাগ করতে বলে, ভালো হতে বলে। বদলে কেউ দেবার জন্যে হাত বাড়ায় না। এই দু'বছর সে বঙ্কুবিহারীর অপেক্ষায়।

সাত গাঁয়ে রটে গেল তিলু সতীলক্ষ্মী। কেউ কই একদিনও সময় করে গেল না বঙ্কুবিহারীর খোঁজ আনতে। তিলুর এই সুনাম আজ পচা কাসুন্দীর মতো লাগছে। ও যেন ছিঁড়তে চাইছে, ভাঙতে চাইছে ভিতরে ভিতরে কিছু। জলে ঢেউ দিলো। গাছের ছায়া ভাঙলো, তিলুর মুখ হারালো; তিলু ডুব দিলো। জল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ভূত দেখল। জলে নামার সময় পূর্ব কোণায় কিছু গাছ নড়ছিলো, ভেবেছিলো ছাগল টাগল হবে। দেখল যা, তা অবাক হবার থেকেও বেশি কিছু। ভূষণ কবরেজ এই তিন সন্ধ্যেবেলায় কোন গাছের শিকড় তুলছে। হাতে ছোট কুড়ুল আর কোমরে বাঁধা তালপাতার থলি। মুখ তুলে ঘাটের দিকে তাকিয়ে ভূষণ-এর মাথা ঝিমঝিম করছিলো। ভূষণ ভুলে গেছে, ভুলে গেছে তিলুদের গরুর কথা। ভুলে গেছে আজ বাবার কথা। এই গাছ-পাগলা ভূষণ কবরেজ কিছুটা দোষীর মতন কুড়ুল আর গোটা গাছটা সমেত এগিয়ে আসছে ঘাটের দিকে। তিলু সাত তাড়াতাড়ি করে ভিজে গামছার কাপড় জড়ালো।

তিন সন্ধ্যে বেলায় মোড়লপাড়া থেকে শাঁখ বাজল। পাকুড় গাছের কোটর থেকে লক্ষ্মীপেঁচা বার হয়ে প্রথম সাঁঝে ডাক দিয়ে উড়ে গেল।

★

—'ভাত কি দেয় ভাতারে, ভাত দেয় গতরে'।

ঠক করে পিতলের কলসী কুয়োতলার চটা-ওঠা সিমেন্টের মেঝেতে নামিয়ে পারুল বললে। কে জানে কী কারণে ও আজ মুড়ি-ভাজা খোলার মতন তেতে আছে। কুয়োতলায় যারা ছিলো তারা বেশি গা করলো না পারুলের কথায়, জানে ওকে নষ্ট মেয়ে বলেই।

পারুল এ-গাঁয়ের ঠোঁটকাটা। বিয়ের দু'বছর ঘোরার পর চার মাসের ছেলে কোলে গাঁয়ে ফিরে এসেছিল। স্বামীর মারধোর, আইবুড়ো দেওরের হাত ধরে টানা পারুলের একদম পোষায়নি। ভাইরা খুশী হয়নি। বড়দার বৌ তো উঠতে বসতে খোঁটা দিতো। পারুল দাদাদের কাছে সামান্য ভিটে চেয়ে নেয়। তারপর ওর সঙ্গে জুটে যায় সহদেব। এধারের মাটি ওধার করে পারুল কপাল ফিরিয়েছে। ওর পিতলের কলসীতে বিকেলের আলো ঠিকরে পড়ছে। এখন পারুলের অবস্থা ফিরছে তরতর করে। ওসব কথা পারুলের সাজে, পারুলের মানায়। এখন ওর দাদারাই অভাবে পারুলের কাছে হাত পাতে।

বিকেলবেলায় গাঁয়ের কোনো কুয়োতলায় দাঁড়ালে এইরকম দৃশ্য। এই সময়টাই বৌ-ঝিদের সংসার জীবন থেকে কিছুটা মুক্তি, খবরের আদান-প্রদান। রটনা ঘটনা। এ গাঁয়ে কুয়ো বলতে একটাই। অন্যদুটোর জল তেমন ভালো নয়। একটায় পাট চুঁইয়ে পুকুরের জল আসে। অন্যটায় লক্ষ্মী ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল তাই সে জল আর কেউ নেয় না। এ কুয়োর বয়েস কেউ জানে না। যারা জানতো তারা মরে গেছে। যারা জানে তারা ঠিক-বেঠিক মিশিয়ে জানে। সেই কবে লালমুখো সাহেবের বন্দুক নিয়ে কাছার পাড়ে পাখিমারা, তারপর কি একটা কাগজে লিখে টিপসই। তারপর কুয়ো। কুয়োর কপিকল বার কয়েক বদলেছে। মাথার উপর পাতানো কাঠ দেখলে মালুম হবে কাঠটা কতো পুরোনো দিনের সাক্ষী। গায়ে তার অসংখ্য দড়ির দাগ। সবাই বলে এ-কুয়ো পীরের থানে বলেই এর জল এতো ভালো। কুয়োর থামের পাশে লেখা 'এলাহি ভরসা, মিস্ত্রী সেখ কাবাতুল্লা, সাকিম রসুলপুর।' সন কথাটার পর থেকে চটা উঠে গেছে। কুয়োর গোল মেঝের উপর সিমেনটের চিহ্ন নেই। বৌ-ঝিদের প্রতিদিনের সুখ-দুঃখের গল্প শুনতে শুনতে সেও অনেকটা দুঃখী মানুষের মতো সহনশীল ও নিথর।

সারি সারি কলসী বসেছে কুয়োতলায়, হরেকরকমের কলসী। কোনোটা ঝকঝকে, কোনোটার গায়ে পড়েছে সময়ের ময়লা, কোনোটার কানা বাঁকা। কোথাও কোনোটার গা তোবড়ানো, অতীত দিনের অসাবধানতায় পড়ে টাল খেয়ে যাওয়া, নয়তো কোনো অত্যাচারের কাহিনী। এরই মধ্যে বেমানান মাটির কলসী। কলসী দেখ আর কলসীর মালিককে দেখ ঠিক আটকাল করতে পারবে কলসীর সঙ্গে মানুষের কতো যোগ। কে কেমন, তার কলসী কেমন? যে যেমন, কলসী তার তেমনি। কুয়োতলায় কলসীই মানুষদের মুখের কথা বলে।

মনসারামের বৌ কলসী বালতি দড়ি নিয়ে হাজির হয়। সুখী সুখী মুখ। এখনও একবছর পুরো হয়নি বিয়ের। মনসা এই একটু আগে বেরিয়ে গেল কুয়োতলার রাস্তার পাশ দিয়ে। যাচ্ছে কালীপুর মোকামে। সাইকেলের ফ্রেমে বাঁধা কাপড়ের পাড়। বিয়ের যৌতুক। মনসারামের সাইকেলের বেল শোনা যাচ্ছে পথের বাঁকে।

হারুর পিসি ফুট কাটলো বালতিতে গিঁট মারতে মারতে মনসার বৌ-এর দিকে তাকিয়ে 'হ্যাঁ লো নাতবৌ আজকাল কি সাইকেলে চেপে জল আনতে এসিস? নাতি গেল এই দেখনু।' মনসার বৌ হাসি লুকোয়।

—'দিদিমা, আমার একটু তাড়া আছে। আমায় একটু আগে জল তুলতে দাও।'

—তাতো বটেই। নাতি কি এখুনি ফিরে পড়বে? সাঁঝ পহরেই শুয়ে পড়বি নাকি?

ফুলীমামী রশিতে টান দিতে দিতে যোগ করল কথার পিঠে কথা, 'ছেলো, ছেলো, আমাদেরও রঙের গা ছেলো বয়েসকালে।'

তিলু মার খেয়েছে বেদম, গেল মঙ্গলবারে শাশুড়ীর হাতে। এ আর নতুন খবর কী? কিন্তু মারের কারণ শুনে হাঁ হয়ে গেল।

তিলু নাকি ভুবনের সঙ্গে আছে। কুয়োতলার অনেকেই তিলুর হয়ে গাইলো। কেউ দজ্জাল শাশুড়ীর কথা উড়িয়ে দিল। কেননা তিলুর শাশুড়ী মিথ্যে খবর রটানোতে একবারে ড্যাহাবাজ।

মনসার বৌ কথাটা শুনে গেল। গাঁয়ের মধ্যে আপাতত ওরা সুখী-জোড়। রতির মার কথায় 'যেমন হাঁড়ি তেমনি সরা। ভগমানের মিলিয়ে রাখা'।

কথাটা কানে গেল মনসার বৌ-এর। পীরের থানের দিকে এক হাত তুলে গড় করলো। ঘরের পথটুকুতে তিলুর কথা ভাবতে ভাবতে ও ঘরে ফিরল। ও বিশ্বাস করতে পারছিল না। তিলু এ-গাঁয়ের মেয়েদের কাছে একটা বিশ্বাসের সিন্দুক।

বেলা চলে যাচ্ছে দ্রুত।

কপিকলের একদিকে রতির মার বালতি নামছে। অন্যদিকে কাঠ বেয়ে সন্ধ্যার বালতি। দুটো বালতি দুদিক থেকে। কির কির করে কপিকলে শব্দ উঠছে।

ঝনাক, একটা শব্দ হলো।

ছর ছর করে জল পড়ল। কুয়োর জল কুয়োতেই। কুয়োর পাট চুঁইয়ে জল পড়ছে। ব্যাস অমনি শুরু হয়ে গেল।

—তোর মাগী উদোম বাই। দেখতে পাসনু আমার বালতি উঠছে? অত যদি তাড়া তবে সন্দের পোঁদে বাতি দিয়ে ক্যানে? বেলাবেলি আসতে পারিসনি?

কথার পিঠে কথা পড়ছে। শুরু হয়েছে বচসা।

সাবিত্রী থামায় ওদের দুজনকে।

ছবি এল। ফ্রকের পিছনে সেফটিপিন আঁটা। সামনে দিকে বুকের উপর তেলচিটে ময়লা দাগ; সন্ধ্যের করুণ আলো। পিতলের কলসী বড়ো বিবর্ণ। মাজা হয়নি অনেকদিন। কলসী বাঁধা দিয়ে অভাবের দিন পার করেছে। এই কদিন হলো কলসী মহাজনের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

কলসীর দিকে তাকিয়ে সারি বলল 'সই, কলসী মাজুনি ক্যানে?'

'পরশু ছাড়িয়ে এনেছে পালেদের ঘর থেকে। একদম অপসোয় নাই। ধান সিজোনো হচ্ছে।

কুয়োতলায় লম্বা লাইন। মেয়েরা ভাগ ভাগ হয়ে গপ্প করছে।

দ্রুত পায়ে সেজোপিসি আসছে। যেন প্রেসমার্কা গাড়ি।

সবাই তাকায়। সবাই জানে সেজো পিসি এসে এমন একটা খবর দেবে সবাই সে-খবরে বেবাক বোকা বনে যাবে। এই খবর রবারের দড়ির মতো টানতে টানতে বাড়াবে সেজোপিসি। আর সেই ফাঁকে জল তুলে নিয়ে যাবে। আসবে সবার শেষে, আর যাবে সবার আগে। যাবার সময় গপ্প শেষে বলবে 'এই যা। উনুনে দুধ আছে।

আজকে কোনো গুরুতম সংবাদ হবে। সেজোপিসির শ্বাস দ্রুত।

একটা জটলা হয় সেজোপিসিকে ঘিরে। সারি বলে 'কী, দিদিমা ছুটে ছুটে এসচো, দাদু লাছে দাঁড়িয়ে আছে নাকি?'

—তোর মাগী রঙের গা। বর দেখা হচ্ছে তো!

সেজো পিসিকে কালোর মা একদম দেখতে পারে না। বলে, 'সেজোপিসি গোটা গাঁয়ের লেগে খপোর বিয়োয়।

তবুও যে বিয়োতে জানে সে মজা বোঝে। না হলে ঘর গোরস্থালীর কাজ ছেড়ে জল-তোলা ভুলে সবাই ঘিরে ধরে কেন সেজো পিসিকে!

খবরটা আর বাড়াতে হলো না আজ। খবরের পূর্বাভাস এসে গেছে কুয়োতলায়। তার এই সাঁঝের আগমনে খবরটা যেন ডাসালো পেয়ারা। আইবুড়ো মেয়েরা পিসির কাছে এগিয়ে এল। চৌকিদার গিন্নীর মুখ-ঝামটা 'তোরা আইবুড়ো মেয়ে তোদের এত কী'? জল নিয়ে সোজাপিসি খবরের শেষ চমক দিয়ে গেলো। গোটা কুয়োতলায় চরকীর আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো, সেজোপিসি আজ দেখেছে তিলু মোড়লপুকুরে ভুষণের সঙ্গে 'বাক্য' কয়ছে।

তবুও সামান্য সন্দেহ রয়ে গেল দু একজনের মনে। অন্তত মাটির কানাভাঙা কলসীর মালিক থামের গায়ে ঐ যে চুপচাপ ধন, যৌবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে পার্বতী। সবার অলক্ষ্যে পার্বতী চোখের 'লোয়া' মুছলো,—না না তিলু কখনও এমন হবে না।

জল তুলতে তুলতে মলিনা তাকালো কালোর মার দিকে। কালোর মা গালে হাত দিয়ে 'ও ভাগ্যি মা এত শত ব্যাপাব।'

মনিষ্যির মন তো নয়, নদী। এই দেখছো কাঠফাটা শুকনো বালি। কাল দেখবে ভরা বন্যের উথাল পাতাল। সেই ঘোলা জল, সেই স্রোত, সব কেমন ঝিমিয়ে পড়ে। শেষমেষ শান্ত নদী শিশুর মতো কাছে ডাকে। পরিষ্কার আয়নার মতো জল, 'তিয়াসে'র জল।

নদীর সনে মানুষের কত মিল। এইসব দার্শনিক ভাবনা নিয়ে আর কলসীভর্তি জল নিয়ে ফিরে গেলো পূব পাড়ার নমিতা। ও বাঁজা। লোকে বলে, ওর স্বামীর অসুখ আছে। নমিতা দেখছে জীবন তো চলছে এই ভাবেই। ও তিলুকে খুব ভালোবাসে। গাজনে ওর সঙ্গে ঝাঁপজল পাতিয়েছে। বুড়োশিবের চড়কের সিন্দুর তুলে বলেছে 'ঝাঁপজল তোমার অপিক্ষে মিথ্যে হবে নে দেখো, তোমার ভিতরে তো ময়লা নাই তুমি তোমার মানুষ পাবে। দেখবে না এ বছরেই ফিরে আসবে। প্রথম রাতে কি কথা হবে আমায় কিন্তু শোনাতে হবে।' তিলু সেদিন এই বন্ধ্যা রমণীর এক রমণীয় আশীর্বাদ মাথায় রেখে চোখ ছলছল করে বলেছিলে, 'আশায় আশায় আর কতকাল ঝাঁপজল?'

নমিতার ইচ্ছে আজই সাঁঝ প্রহরেই জিজ্ঞেস করে নেবে তিলুকে 'ঝাঁপজল এ কী শুনছি'—ঝাঁপজলের বিশ্বাস তিলু ওকে লুকোবে না।

কিন্তু নমিতার ভয় হয় এ পরান ডোবার বাঁকটায়, ওখানে অন্ধকার বড় ঘুরঘুটি। সেদিন পালেদের বড়-ছেলে ওখানে দাঁড়িয়ে হাত ধরেছিলো নমিতার। মানুষের বেঁচে থাকার কী জ্বালা! বাঁশ গাছের থেকে কেন লাউডগা সাপ নামে না? কেন ওকে সেই সাপ কাটে না?

★

শেষ কথাটাই ভুষণ কবরেজের কানে বাজছে। তিলু বলে গেল, 'মানুষ হয়তো বোঝে, চাল হয়তো সেজে।'

ভুষণ উত্তর দিয়েছিল, 'আমারও হাল নাই, তোমারও বলদ নাই। এসো তবে'। কিন্তু গলার ভিতর থেকে উত্তর আসেনি। ভুষণ শাদা আঁকোড়ের গাছটা ফেলে দিল জলে। এই শিকড়বাকড় দিয়ে জন্ম কাটাছে। গুরুর কথা মনে পড়ছে ভুষণের। গোঘাটের পঞ্চবটী থানের গুরু। কতোবার বলেছে ভুষণকে 'বাপ এবার বে কর। কাজে অনেক বল পাবি। অত দুঃখ রাখিবি কোথায়। পাগল হবি।'

ভুষণ বালাকুড়ুলের থেকে মাটি মোছে। গাই গরুটার ডাক শোনা যাচ্ছে এখনও। ভুষণ জানে ও ডাক কীসের। গরুটার একটা কঠিন অসুখ। মাঠ দেখানোর পর ওর পেটে বাচ্চা আসবে। দুধের মোড় ফুলে উঠবে। দুধ জমবে। কিন্তু ও বিয়োতে পারবে না। সেবার অনেক কষ্টে মরা বাচ্চা ভুষণের হাতেই নেমেছিল। এবার মারা যাবে গাইটা নিজেই। তাই ভুষণ এড়িয়ে চলছে।

কিন্তু—সব কথার পিঠে কিন্তু।

বনবাদাড়ের আনাচে কানাচে ব্যাঙ ডাকছে। মিটমিট করে জোনাকি জ্বলছে। অহেতুক কিছু শব্দ ভুষণকে নাড়ায়—পূর্বসূরীদের ডাকের মতন।

ভুষণ ঘরে আসে। দরমা থেকে শালপাতা বের করে চটা পাকায়। আরও একটু রাত বাড়বে। তারপর সে আজ জীবনের শেষ গাছ তুলবে। এ গাঁ ছেড়ে দেবে। চলে যাবে গুরুর কাছে দূরে। দূরে গোঘাট গাঁয়ে। গিয়ে বলবে 'এই দ্যাখো ওস্তাদ শ্বেত করবীর ফুল। এই লাও বনবৈঁচির শিকড়। এই দেখ পূর্ণিমায় লক্ষ্মীবারে তোলা প্রতিষ্ঠা করা আশুদ গাছের ছাল।'

ঘরের সমস্ত সঞ্চয় যা ছিল, একটা কুপীর আলো, মাটির হাঁড়ি, ঠ্যাং-ভাঙা কুকুর, সব ঠিক তেমনি আছে। ভুষণ মনে মনে ঠিক করল কিছুই নেবে না। এক কাপড়ে চলে যাবে শুধু নেবে ওর বয়সকালের আড়-বাঁশি। অনেকদিন ছোঁয়নি এটা।

বুকে বেশ বাতাস দিচ্ছে। এমনি বাতাস ভুষণের দিয়েছিল সেবার, যেবার ও তিলুকে মরার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। শাশুড়ীর

বঁটির মাবে তিলুর কোমর কেটে ঘা। তিলু মরতে চেয়েছিল। ভিতরে ভিতরে ঘা বেড়ে যাই-যাই। মাঝরাতে তিলুর দেওর শক্তি এসে ডেকেছিলো ভূষণকে।

তিলু ওষুধ খেতে চায়নি। ভূষণকে উত্তর দিয়েছিল শিকড়বাকড়ে আর বাঁচবো আমি চাই না। শুধু চাই এই ঘা সোরোশ করে কত ঢুকতে পাবে কলজেয়। ভূষণ মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল মনিষ্যি মরলেই তো মাটি হয়ে গেল। তালে কেনে আর এই জীবন?

সে তো গেল বছর। ভূষণ অনুভব করল এই যে, সব গাছের শিকড়বাকড় এই যে সব প্রতিদিন মাটি খুঁড়ে তুলে আনা এতে তো সব অসুখ সারে না। ভূষণের নিজের ভিতরেও তো ব্যথা আছে। বাড়লেই গুবুর কাছে চলে যায়। হাউ হাউ করে কাঁদে আর তখনই ভূষণকে গুরু বলে, 'এবার একটা বে কর ভূষণ।' মাটির কলসী থেকে ভূষণ কিছুটা জল খেল। খুব ভাসা ভাসা লাগছে। মনে হচ্ছে এতদিনে মানুষের যে সমস্ত উপকার করেছে তা কত কম, কত সামান্য।

কিছু আর খেতে ইচ্ছে করল না। খুঁটিতে হেলান দিয়ে আকাশ দেখল। সাঁঝতারা বেশ কিছুক্ষণ আগে উঠেছে। এখন সারা আকাশে একথালা সুপুরি—অগুনতি অসংখ্য তারা। সাতভাই উঠেছে। চাঁদের একটা রেশ বের হচ্ছে। আষাঢ়ের কালো মেঘ মাঝে মাঝে ছুটে এসে চাপা দিচ্ছে আলো। আবার অন্ধকার, আবার আলো। এই সমস্ত খেলাটাই চলছে ভূষণের ভিতর। ভূষণ মনে মনে তৈরি হয়ে নেয়। ওকে চলে যেতে হবে এই ঘর, এই গ্রাম, এই মনীষ্যিদের ছেড়ে।

তবে এটা বুঝেছে সে, যে মেয়েদের স্বামী নাই সে-মেয়েরা দশ হাত কাপড়েও ন্যাঙটো, কত অসহায়!

★

তিলু আজ যা কিছু চরম ঘটাব জন্যে ইচ্ছে করছে রুখে দাঁড়াতে। কুয়োতলার পার্বতী এখনও দাঁড়িয়ে। তিলুকে দেখে দখনো বাতাসের মতো বুক জুড়ে যায়। তিলু ওকে রশি বালতি দেয়।

পার্বতী শুধায়, 'তুমি আগে নিয়ে যাবে? তোমায় তো আরও দুখেপ এসতে হবে। তিলু অন্যদিনের থেকে একটু আলাদা 'না, তুমিই আগে নাও পিসি, আমি পরে নেব। আজ আমার এই এক খেপ জল।'

তিলু হাঁপাচ্ছে একটু, কলসীর মুখে ছোট একটা চাঁদ। কলসীর মুখের কানায় জলের শব্দ উঠছে। বালতীর জল আজ একটু বেশি চলকাচ্ছে। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো। 'কোন নাঙ কুয়োতলায় ছিল এত দেরি, কুয়ো কেটে কি জল আনচু তেয়োধাতালীর ঝি?' কলসী বালতি নামিয়ে রেখে তিলু জানত, এরপর কী। চুলের গুছি ধরে দুটো চড়। খুঁটিতে হাতটা লেগে শাঁখাটা ভাঙল তিলু। রবারের তিনটে চাড় ছিটকে বেরিয়ে গেল। উঠোনে গাছের ছায়ায় বোঝা গেল না। ঘর থেকে দেওর শক্তিপদ বেরিয়ে এসে মাকে সরিয়ে নিয়ে গেল। দেওরের ছেলে পরান টুকরো গুলো কুড়িয়ে নিল। এ-সমস্ত দৃশ্যে পরান অভ্যস্ত, এমন কি এই উঠোনে পোঁতা তুলসীগাছও।

তিলুর চোখের ভাষ্যি আজ সামান্য আলাদা। ও কলসী নিয়ে দ্বিতীয় বার বের হলো। খেয়াল করল না পরান ওর পিছে পিছে এসেছে কুয়োতলা অব্দি।

শেষ খেপ জল নিয়ে যখন ঘরে ফিরল, তখন শুনতে গেল প্রথম প্রহর শেষের চৌকিদারের ডাক 'হো—হো—হো ও'।

প্রতিদিনের মতো ঘরে ধুনো দিল তিলু। মশারী টাঙিয়ে পরানকে ঘুম পাড়াল। শেষ খেপ জল আনার সময় পরান বলেছিল, 'জেঠাই, বড় হয়ে আমি তোকে নিয়ে যাব মামাদের গাঁয়ে'। পরান, ছেলেটা বড় বেঁধে রেখেছে তিলুকে। বোধ হয় বেঁচে থাকা এর জন্যেই। আরও একটা ক্ষীণ স্রোত অন্তরীক্ষে, যদি সে মানুষটা ফেরে। কেউ বলে, সে সন্ন্যাস নিয়েছে। পালেদের জামাই তারকেশ্বরে পুজো দিতে গিয়ে দেখেছিল। কেউ রটায় সে চাঁপাডাঙ্গায় মেয়ে রেখেছে।

রাত বাড়ছে। সবার খাওয়া শেষে তিলু ঘাটে গেল। হাঁড়িতোলা রাত ভারি হবে এবার। তিলুর খাবার ইচ্ছে নেই। না খেলে শাশুড়ীর গালমন্দ, চোটপাট মারধোর। লুকিয়ে জামবাটির তলায় সমস্ত ভাত ফেলে দিলে জলে। হাঁসে খাবে, মাছে খাবে। সবাই তো বেঁচে থাকবে। ঘরে ফিরে থালা রাখল। রান্না ঘর মুছল তিলু। চুপিসাড়ে দরজার পাশে গিয়ে শুনতে চাইল দেওরের ঘুমের গভীরতা কতখানি।

শাশুড়ীর পানের ডিবের শব্দ আসছে। চৌকিদারের হাঁক 'হো-হো-হো-হোও' রাতের গভীরতায় ডুবে যাচ্ছে সবকিছু। উঠোনে জাম গাছের ছায়া কখনও পড়ছে, কখনও হারাচ্ছে, আগাম বর্ষার আলো-ছায়ার খেলা। শোবার ঘরে ধুনোর আগুন সামান্য উসকে দিয়ে মশারীর মধ্যে গেল। পরান ঘুমিয়ে কাদা।

কাল সকালে পরান কাঁদবে, কত কাঁদবে। শাশুড়ী এতদিন যা চাইত, যা খুলে মিলে বলত তাই ঘটেছে দেখে খুশী হবে। দেওর আর জায়ে কাল সকালে বা পরশু হাত-পা ছড়িয়ে সম্পত্তির হিসেব করবে। তারপর আবার সবাই ভুলে যাবে।

ধুনো চুরে আরও কিছুটা ধুনো দিল তিলু। চুপি সাড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। যেন গোয়াল দেখাতে যাচ্ছে। গরুটার শিঙের ব্যথাটা কমবে এতদিন। ওকে মাঠ দেখান হবে। ওর বাচ্চা হবে। সব ঠিক থাকবে, থাকবে না শুধু যার ধন সে।

লাছ দুয়ারে হুড়কো খুলল তিলু। বাইরে এল। ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করল। ঘুর পথে হাঁটতে শুরু করল। এত রাতে কেউ বের হবে না। যারা এত রাতে বের হয় তারা কেউ জানবে না। হাঁটবেও না এই ঘুর পথে।

এই পথ সোজা কুয়োতলা। সেখান থেকে মাঠ ভেঙ্গে, তারপর. . . । তিলু জানে না। সব পথ ভূষণের শিকড়ের থলিতে। ভয় লাগছে। আকাশে উড়ো মেঘেরা অন্ধকার সাজিয়েছে। এই অন্ধকার এখন বড় জরুরি, বড় দরকার।

তিলু হাঁটছে। কুয়োতলায় যখন এল শুনতে পেল পুকুর পাড় থেকে ভূষণ গলার শব্দ করল। আচ্ছা যদি কেউ ভূষণকে দেখে? পুরুষ মানুষের সাতখুন মাফ। আর মেয়েমানুষের বদনামটাই সম্বল। তাই নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। মেয়েমানুষ বড় কাঙাল। এইবার তিলুর মধ্যে সংসারের ঢেউ। তবুও গেল পুকুর পাড় ধরে। আকাশ থেকে মেঘ সরে যাচ্ছে। ভূষণের বুকের মধ্যে যা জন্ম জমছে তিলুর তার একশো গুণ।

ভূষণ বললে ফিস ফিস করে, 'খুব কাছেই তিলু, চলো এই মাঠ পথ অনেক সহজ।'

তিলু মুখ তুলল। ভূষণ গাছের শিকড়ের গন্ধ চেনে। মেয়েদের শরীরের এই গন্ধ সে কোনোদিন পায়নি। এখানে কোনো শিকড় আছে? শ্বেতকরবী না তেসিরে, মনসার আঠা, নাকি, রাঙা জবার ডাল। ভূষণ পাগলপারা। তিলুর হাত ধরেছে ভূষণ, 'চলো চলো চৌকিদারের ডাক শোনা যাচ্ছে।' তিলুর মাথা ঘুরছে। ঘরের ধুনোর গন্ধ, পরানের হাত পা ছড়ানো শরীর। উঠোনের উপর জামের গাছের ছায়া। আর গাঁয়ের সব মেয়েদের হাতে যে বিশ্বাস তুলে দিয়েছিল তিলু।

তিলু হাত ছাড়িয়ে নেয়। 'তুমি যাও।'

চৌকিদারের হাঁক কাছে আসছে। দ্রুত পায়ে তিলু কুয়োতলার কাছে ফিরে আসে। ভূষণকে দেখার চেষ্টা করল। আকাশে মেঘ ছেড়ে চাঁদ বেরিয়েছে। অনেকটা আলো। একি ভূষণ মাঠ পার হয়ে সোজা পথ ধরেছে। ধরুক। সামনে চৌকিদারকে দেখে তিলু ভূত দেখলে। 'কে গো?' উত্তর নেই। কাছে এল চৌকিদার। মুখের দিকে তাকিয়ে বলল 'কীগো মা, এত রাতে?' তিলু পীরের থান দেখিয়ে বলল 'মাটি আনতে।'

সোজা পথেই তিলু ফিরল। শুধু ভাবল, এক আঁধার কাটানোর জন্যে আর এক আঁধারে কেন ডোবা, ডুব দেওয়া। হাঁটতে হাঁটতে মনে হলো, এই জ্যোৎস্নায় আলোকিত পথে ওর ঝাঁপজল বলছে 'সয়ে থাকলে রয়ে পাবি ঝাঁপজল'। আর ওর বুকের মধ্যে পরানের হাত। মাথার মধ্যে ধুনোর গন্ধ। ও ঘরে এল। □

রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রথম প্রকাশক চিন্তামণি ঘোষ

বারিদবরণ ঘোষ

সেকালের হাওড়ার গণ্ডগ্রাম বালীর ছেলে চিন্তামণি ঘোষ প্রেস খুলেছিলেন এলাহাবাদে। নিজেই কমপোজিটার ও মেসিনম্যান। তাঁর 'দি ইনডিয়ান প্রেস' পরবর্তীকালে হয় অফসেট লিথোগ্রাফের আদর্শ সংস্থা। এখান থেকেই প্রথম প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী' আর 'মডারন রিভিউ'। আজকের কজন বাঙালী জানেন এই প্রবাসী সাহিত্যপ্রেমীর নাটকীয় জীবন বৃত্তান্ত? ১৯০৮ থেকে ১৯২৩ সাল যাবতীয় বই তাঁর প্রেসে ছেপে প্রকাশ করেছিলেন চিন্তামণি ঘোষ।

গ্যালি, প্রুফ, কেস, স্ট্যাণ্ডিং ম্যাটার, নিউজ, হুইল, কম্পোজ, এম, পয়েন্ট, পাইকা, বর্জেস—বিচিত্র এই শব্দাবলী সদ্য-পিতৃহীন এক যুবকের মনে এক অজানা রহস্যময় জগতের সৃষ্টি করত। বাংলাদেশের বালী গ্রামের চিন্তামণি ঘোষকে নিতান্ত ছেলেবেলায় যেতে হয়েছিল বাবার কর্মস্থল কাশীতে। বয়স মাত্র তেরো। হঠাৎ বাবা মারা গেলেন। মাথার উপর মা আর বোন। সংসার চলে না। স্থানীয় বিখ্যাত ইংরেজি পত্রিকা পাইওনিয়র অফিসে তাই চাকরি নিতে হলো। মাইনে মাত্র দশ টাকা। চাকরির গালভরা নাম : ডেসপ্যাচ ক্লার্ক। কাজের ফাঁকে ফাঁকে কিশোরের কানে আসে ঐসব নানা শব্দ, ছাপাখানার পরিভাষা। ইতিমধ্যে মাইনে বেড়ে হয়েছে পঁচিশ। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছাপাখানার মধ্যে ঘুরে বেড়ান আর কোন যন্ত্রটি কী ভাবে কাজ করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেন—মনের মধ্যে জেগে ওঠে এক আশ্চর্য স্বপ্ন, এক অলীক আকাঙ্ক্ষার হাতছানি : একটা ছাপাখানার যদি মালিক হতে পারতাম!

দিনে দিনে বেতন বাড়ে, বাড়ে কাজের দায়িত্বও। তার সঙ্গে এসে জোটে সহকর্মীদের ঈর্ষা। প্রেসের সুপারিনটেনডেন্ট অ্যালেন সাহেবের কাছে গিয়ে বলেন, সাত বছর কাজ করেছি কর্তা, এবার বিদায় দিন। কাজ ছেড়ে গেলেন আর এম এস-এর একটি পদে। মাসখানেক এখানে কাটিয়ে গেলেন অ্যালেন সাহেবের সুপারিশক্রমে এলাহাবাদের হাওয়া-অফিসের হেডক্লার্ক হয়ে। আশ্চর্য, সেখানকার হাওয়াতেও হিংসের বিষ! মেটিরিয়োলজিক্যাল অফিসের বড়কর্তা মিঃ ইলিয়টের কাছে গিয়ে অন্য কর্মচারীরা বলতে লাগলেন, এটা কি ভাল হল স্যার, মাত্র উনিশ বছরের এক ছোকরাকে আমাদের মাথার উপর বসিয়ে দিলেন।

কিন্তু দুনিয়াটা ভালোবাসার বশ। উনিশ বছরের নবাগত হেডক্লার্ক চোখের মণি হয়ে উঠলেন সকলের। মিঃ ইলিয়ট তো এতো খুশী হলেন তার কাজে যে, তাঁর গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য বইগুলি পাঠের অধিকার দিয়ে দিলেন ঐ তরুণ কর্মীটিকে, আর নিজে শেখাতে লাগলেন অন্তরীক্ষ আর আবহাওয়াবিদ্যার বিচিত্র বিষয়।

কিন্তু আবহাওয়া দপ্তরের হাওয়ার মধ্যে ভেসে আসে পূর্বশ্রুত মুদ্রাযন্ত্রের সেই যাদুকরী ঝংকার, যার স্পন্দনের সঙ্গে যুবকের বুকের হৃদস্পন্দন হতো দ্রুততর—কাগজের উপর কালি

চিন্তামণি ঘোষ

মাখানো হরফে ছাপা উঠতে দেখলেই যার মনে হতো সাধনায় সিদ্ধিলাভ। একদিন পাইওনিয়র কাগজের একটা বিজ্ঞাপন পড়ল চোখে—'এক রেজিমেন্টের একটি ক্রাউন হ্যাণ্ড প্রেস বিক্রয় হইবে, নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।' পাঁচশো টাকা চাই এই মেশিন কিনতে। এক বন্ধু এলেন সহযোগী হয়ে। প্রেস চালু হলো। এক সময়ে ঐ বন্ধুকে মিটিয়ে দিলেন তার প্রাপ্য টাকা। তাঁর প্রেসে কাজ দিলেন বন্ধুকে, তিনি অবসর নিলে মাসিক কুড়ি টাকার বৃত্তির ব্যবস্থা করলেন, বন্ধু মারা গেলে বন্ধুপত্নীর হাতে ঐ টাকা নিয়মিত দেবার ব্যবস্থা করলেন—এমনি আশ্চর্য কৃতজ্ঞতা, এমনিই অনুকরণীয় বন্ধুবৎসলতা। ঘরে নতুন মেশিন এসেছে। অফিসের সারাদিনের খাটুনির ক্লান্তি দূর করতেন তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করে টাইপের ঘরগুলিকে চিনে চিনে, টাইপ সাজিয়ে কম্পোজিং করে। প্রেসম্যান নেই তো কি কি হয়েছে—সেদিন তিনি প্রেসম্যান। ইংকম্যান নেই—কালি দিচ্ছেন নিজে। কম্পোজিটারের শরীর খারাপ, সে ভয়ে ভীত নন তিনি। একটা আনন্দের জগৎ তখন তাঁর কাছে উন্মুক্ত।

১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ। এক শুভদিনে তাঁর 'দি ইণ্ডিয়ান প্রেস' সরকার থেকে রেজিস্ট্রীকৃত হলো। কাজ আসে ক্রমাগত। মেটেরিয়োলজিক্যাল অফিসের একশো টাকার মাইনে আর তাঁকে বেঁধে রাখতে পারলো না। মাত্র পঁচিশ টাকার অবসরকালীন বৃত্তির উপর ভরসা করে চাকরি ছেড়ে দিলেন তিনি। স্বয়ংসৃষ্ট এই মানুষটি নিজের দুটি পা, দুটি হাত এবং এক আত্মপ্রত্যয়ী মস্তিষ্কের মূলধনে ব্যবসায় নামলেন।

কাজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ান প্রয়োজন যন্ত্রপাতির। একজন এসে তাঁর প্রেসটি চোদ্দশো টাকায় কিনে নিতে চাইলেন। ঝুঁকি না নিলে ব্যবসা জমে না, দিলেন বিক্রি করে। আর সঙ্গে সঙ্গে জন ডিকিনসন কোম্পানির কাছে অর্ডার দিলেন একটা ভালো প্রেসের। কিন্তু মুস্কিলেও পড়লেন। এই সময়ে একটা সরকারি কাজের বড় রকমের বরাত এসে গেল। ছাপাখানা নেই, আছে কতকগুলো টাইপ মাত্র। হাত দুটোর উপর আবার ভরসা। নিলেন সে অর্ডার। তারপর অক্ষর সাজিয়ে দুটি শিশুকাঠের তক্তার ফ্রেমে বেঁধে কালি মাখিয়ে কাগজের উপর মারলেন ছাপ। সরকারি ফর্ম-এর মুদ্রণ সম্ভব করলেন রাবার স্ট্যাম্পের কারসাজিতে। মানুষের অগোচরে এক আশ্চর্য অকল্পনীয় ঘটনা সম্ভাবিত হয়ে গেল। এর মধ্যে এসে গেল ডিকিনসন কোম্পানির মেশিন। নিশ্চিন্ত হলেন চিন্তামণি ঘোষ—'দি ইনডিয়ান প্রেস'-এর সেই প্রবাদকল্প স্থাপয়িতা।

ইণ্ডিয়ান প্রেসের ইতিহাস লিখতে গেলে বই লিখতে বসতে হয়। কারণ শুধুমাত্র উত্তর-ভারত নয়, দি ইণ্ডিয়ান প্রেস একদা সমগ্র ভারতের প্রসিদ্ধ ছাপাখানায় পরিণত হয়েছিল। এর মুদ্রণ বিভাগে বই ছাপানো ছাড়া ছাপানো হত রঙীন ছবি ; লিথোগ্রাফির সূক্ষ্ম কাজে এর দক্ষতা ছিল তর্কাতীত এবং অফসেট মুদ্রণের প্রথম যুগে এর সিদ্ধি ছিল বিস্ময়কর। ছাপাখানার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পাওয়ার হাউস। কেননা, এই প্রেস ছিল ভারতের প্রথম বিদ্যুৎ পরিচালিত যন্ত্র। অফসেট পদ্ধতি চালু করার জন্য চিন্তামণি ঘোষ বিপুল অর্থব্যয়ে জার্মানি থেকে যন্ত্র আনালেন এবং একজন সুইস মুদ্রাকর এই কাজের জন্য নিযুক্ত হন। ফটো এনগ্রেভিং বিভাগে স্ট্যাম্পিং, কপার-প্লেট এনগ্রেভিং, এচিং, প্লেট

ডেভেলপিং বিচিত্র কাজকর্ম সম্পাদিত হতো। প্রেসের মধ্যেই ছিল সুচারু বাঁধাই-এর আধুনিকতম ব্যবস্থা। লাইনো টাইপ, টাইপ ফাউন্ড্রী, মানচিত্র-মুদ্রণ সব কিছুই এই প্রেসের অঙ্গীভূত ছিল। এ হলো ১৯২০-২১ সালের কথা।

ইণ্ডিয়ান প্রেসের পুরনো বাড়িতে আর জায়গা হয় না। বই ছাপাবার জন্য এলাহাবাদে প্রথম তিনি এনেছেন 'সিলিণ্ডার মেশিন।' কর্মচারীর সংখ্যাও প্রায় দেড়শো। নতুন করে একটি হিন্দী পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থাও হচ্ছে, সুতরাং ৩ নং পায়োনিয়ার রোডের বাড়িটিতেও স্থান সংকুলান হয় না। অতএব নিজের প্ল্যানে তৈরি ৮ নং পার্ক রোডের বিশাল বাড়িটিতে অফিস কারখানা স্থানান্তরিত হলো। ইংল্যাণ্ড ও জার্মান থেকে এল মুদ্রণের আধুনিকতম যন্ত্রপাতি। পাঁচশো কর্মীর এক মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হলো 'দি ইণ্ডিয়ান প্রেস।'

২

পাঠক, হয়ত ভাবছেন, এলাহাবাদের একটি প্রেস নিয়ে এত ভূমিকা কেন! যদি বলি 'প্রবাসী' পত্রিকার প্রথম চার সংখ্যা বাদে পরবর্তী আট সংখ্যা এই প্রেসে ছেপেই বের হয়েছিল, 'মডার্ন রিভিউ'-এর মতো পত্রিকার সূতিকাগার এই প্রেস—তাহলে কেমন লাগে? শান্তা দেবী কৃতজ্ঞচিত্তে লিখেছেন 'তাঁহারই ইণ্ডিয়ান প্রেসে 'প্রবাসী'র প্রথম পাণ্ডুলিপি বিকশিত হইয়াছিল। এমন সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই বাংলা দেশেও তখন হইত কিনা সন্দেহ।' স্বয়ং প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কথায়—'প্রবাসীর জন্য ঐ প্রেসে বাংলা বিভাগ খোলা হয়। ...মডার্ন রিভিউ প্রথমে ইণ্ডিয়ান প্রেসে ছাপা হইত। চিন্তামণিবাবু প্রতি মাসে ঠিক পয়লা কাগজ বাহির করিয়া দিতেন এবং কাগজগুলি গাড়ি করিয়া আমার বাসায় পাঠাইয়া তাহার সঙ্গে কাগজ ছাপাই ও বাঁধাইয়ের একটি বিল পাঠাইয়া দিতেন ; বলিতেন, আমার কাজ আমি করিলাম, আপনার কাজ আপনার সুবিধা ও ইচ্ছামতো করিবেন। আমাকে টাকার জন্য কখনও তাগিদ দেন নাই। অনেক মাস কাগজ বাহির হইবার পর তবে আমি টাকা দিতে আরম্ভ করি। তাঁহার এইরূপ অনুকূলতার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।'

শুধু কি পত্রিকা? রামানন্দের 'আরব্য কি উপন্যাস'টি এমন সচিত্র করে ছাপান হত চিন্তামণি ঘোষ তার ভার না নিতেন? 'সচিত্র' বলাতে ছবির কথা মনে এল। তখন এদেশে সচিত্র বই মানেই বিদেশী কোনো ছবির নকলমাত্র। চিন্তামণিবাবুর তা ঘোর অপছন্দ। অতএব একজন এদেশী মুসলমান চিত্রকরকে দিয়ে আরব্য উপন্যাসের ছবিগুলি আঁকালেন। অবনীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই ছবিগুলির প্রশংসা করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের কথায় মনে পড়ল এই প্রেসের লিথোগ্রাফির কথা। ১৮৮৪ সালে প্রেসের পত্তনের পরে চিন্তামণিবাবু এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন এবং অবনীন্দ্রনাথ ও যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা একাধিক ছবি ছাপিয়ে অত্যন্ত কমদামে তিনি চিত্ররসিকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এছাড়া নানা বাংলা বইয়েও এই রঙীন ছবি এলাহাবাদে বসেই তিনি সংযুক্ত করার দুষ্কর তপস্যা গ্রহণ করেছিলেন।

'চরিত্র গঠন' এই প্রেসের প্রথম প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থ। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই বই দেখে লিখলেন 'এমন সুন্দর ছাপা বাঁধা বাঙ্গলা ছাপাখানার গৌরবের বস্তু। শতমুখে প্রশংসা করিলেও যথেষ্ট হয় না।' এছাড়া চিন্তামণি ঘোষ প্রকাশ করলেন দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের দু খণ্ডের 'বাংলা অভিধান', জগদানন্দ রায়ের 'বৈজ্ঞানিকী', প্রাকৃতিকী' 'গ্রহনক্ষত্র' প্রভৃতি পপুলার সায়েন্সের বই, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর'-এর চতুর্থ মুদ্রণ, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তর 'শিশু ভারতী', রবি বর্মার ইংরেজি ভাষায় জীবনী প্রভৃতি সংগ্রহযোগ্য পুস্তক-রাজি।

৩

রবীন্দ্রনাথের প্রথম সম্ভ্রান্ত প্রকাশকও এই চিন্তামণি ঘোষ। সম্ভবত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এছাড়া এলাহাবাদের প্রেসে তখন ম্যানেজার ছিলেন কবিভক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের পরামর্শে কলকাতার তৎকালীন কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে স্থাপিত হয়েছে এই প্রেসের প্রকাশন বিভাগ 'দি ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং' হাউস। ইতিপূর্বে কিছু বন্ধু আত্মীয়স্বজন ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং পরে কিছু প্রতিষ্ঠানও রবীন্দ্রনাথের বই প্রকাশের দায়িত্ব নেন। ১৯০৮ সাল থেকে বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগের প্রতিষ্ঠা অবধি রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব নেন চিন্তামণি ঘোষ। আসলে বাংলাদেশকে তিনি ভালোবাসতেন দূর এলাহাবাদে থেকেও। বাদুড় বাগানের বাড়ি কিনেছিলেন এখানে এসে বসবাস করবেন বলেই।

কবির বই ছাপিয়ে দিয়েই চিন্তামণিবাবু তুষ্ট ছিলেন না। আশ্চর্য মমত্ব ও দুর্লভ যত্ন নিয়ে প্রতিটি বই ছাপিয়ে তিনি কবিকে গভীর পরিতৃপ্ত করেছিলেন। বইয়ের মধ্যে সামান্যতম মুদ্রণ প্রমাদ প্রসঙ্গ তিনি সহ্য করতেন না—এজন্য বহু ক্ষতিও তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে। একবার কবি এলাহাবাদে গেলেন ২০০ পৃষ্ঠার 'গীতালির' পাণ্ডুলিপি নিয়ে। দুর্লভ তৎপরতার সঙ্গে চিন্তামণিবাবু মাত্র চারদিনের মধ্যে সেই পাণ্ডুলিপির রাজসংস্করণ প্রকাশ করে কবির হাতে তুলে দিলেন। এখান থেকে ছাপা 'চয়নিকা'র (১৯০৯) প্রথম সংস্করণ অথবা 'কাব্যগ্রন্থে'র (১৯১৫-১৬ খণ্ডগুলি সংগ্রহের লোভ এখনও কার না হয় 'বিদ্যাসাগর চরিত', 'গল্পসপ্তক' 'গান' 'শিশু ভোলানাথ' (১৯২২) অবধি প্রায় এ শোটি রবীন্দ্রগ্রন্থের মুদ্রাকর চিন্তামণি ঘোষ বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন 'মুদ্রণের পারিপাট্যে শু নয়, পৃষ্ঠা সজ্জায় ও কবিতার পংক্তি ও স্তব বিন্যাসে প্রকাশকের রুচি ও সাহিত্য বোধে পরিচয় কীরকম উজ্জ্বল ছিল।'

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে 'বিশ্বভারতী প্রকাশ বিভাগ' প্রতিষ্ঠিত হলো। এর জন্য প্রয়োজ ইণ্ডিয়ান প্রেসের বইগুলি ছাপাবার ব্যাপা চিন্তামণিবাবুর অনুমতি। রবীন্দ্রনাথ তাঁ লিখলেন—

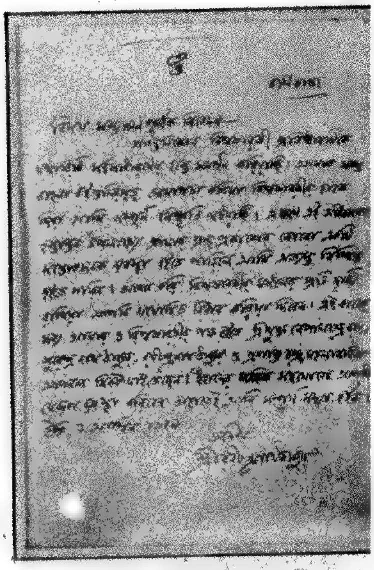

উল্লেখ করার মতো ব্যাপার যে, এই ব্যবহারের প্রয়োজন পর্যন্ত হয়নি। রবী নাথের মনোগত ইচ্ছা লোকমুখে জানতে তিনি সানন্দে সম্মত হন এবং এতাবৎ পর্যন্ত মুদ্রিত কবির একশোখানি বইয়ের মূল্য নির্ধারিত হয় আটাত্তর হাজার (এই যাবতীয় গ্রন্থের স্টক গ্রন্থ মুদ্রণের মাত্র ধরে চিন্তামণিবাবু মাত্র ছাব্বিশ হা টাকায় হস্তান্তরিত করে প্রকাশন জগতে অচিন্ত্যপূর্ব অধ্যায়ের সৃষ্টি করলেন। বাঙ কি এখন কৃতজ্ঞচিত্তে এই মানুষটিকে অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করবে না?)

ভুলে গেছি বলতে, চিন্তামণিবাবু জ ছিলেন ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ আগস্ট তাঁর কোষ্ঠীর বিধান মেনে ঠিক ৭৪ বছর করে জন্মদিনের পরের দিনটি—১১ আ ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদের পুণ্য জা তীরে প্রয়াত হলেন ইণ্ডিয়ান প্রে মেরুদণ্ড, বাংলার সংস্কৃতি জগতের প্র গৌরবস্তম্ভ। সারস্বত যজ্ঞের ঋত্বিক মানুষটির জীবনে যতিপাত ঘটল। □

চিন্তামণি ঘোষকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি লেখক কর্তৃক সং

পুরোনো বই :
নতুন পাঠক

‘এ হেন গ্যাসের আলো হেরিনু তব কৃপায়’

পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের সন্তান শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর জন্মেছিলেন ১৮৪০ সালে। উনিশ শতকের এই কৃতী সংগীত-নায়ক ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় লিখেছিলেন ২৫ খানি সংগীত সংক্রান্ত গ্রন্থ। মাত্র ৩৫ বছর বয়সে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেয়েছিলেন ‘ডকটর অফ মিউজিক’ খেতাব। প্যারিস থেকে প্রকাশিত সংগীতের কোষগ্রন্থে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল বিশ্বের বিশিষ্ট ৫০ জন সংগীতজ্ঞের বিরলসৌভাগ্য তালিকায়। এহেন শৌরীন্দ্রমোহনের নির্লজ্জ বৃটিশ তোষণ ও রানী ভিকটোরিয়ার স্তুতিগীতি রচনা এক অদ্ভুত বৈপরীত্য। ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত তাঁর ‘ভিকটোরিয়া গীতিমালা’ আমাদের সমাজ-ইতিহাসের এক মূল্যবান দলিল। এ-বই আমাদের কৌতূহল, বিস্ময়, সম্ভ্রম জাগায়, সেই সঙ্গে লজ্জাও।

ভারতীয় সংগীতের নবজাগরণপর্বে যে-সব অসামান্য গুণী ব্যক্তির জীবনসাধনা ইতিহাসে সসম্ভ্রমে লিখিত হয়ে আছে তাঁদেরই একজন হলেন পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর পরিবারের গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্র হরকুমারের কনিষ্ঠ পুত্র শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। জন্মেছিলেন ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে। একই বছর জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীত কলাবন্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য এবং জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সংগীতের ক্ষেত্রে বিশেষ করে স্বরলিপি পদ্ধতির উন্নতিকল্পে তাঁর প্রচেষ্টা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। শৌরীন্দ্রমোহনদের পরিবার সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতা এবং সংগীতচর্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। খুব অল্প বয়স থেকেই সংগীতের প্রতি তাঁর অনুরাগ এবং শিক্ষার শুরু। যে-সব গুণী কলাবন্তদের কাছে তিনি সংগীতের পাঠ গ্রহণ করেন তাঁর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম হলো ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। এ ছাড়াও তিনি বেনারসের প্রসিদ্ধ বীণাবাদক লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র এবং স্বনামধন্য সেতার ও সুরবাহার-বাদক সাজ্জাদ মহম্মদের কাছে তালিম নেন। একজন জার্মান সংগীতজ্ঞের কাছে দীর্ঘদিন ধরে পাশ্চাত্য সংগীতের পাঠ গ্রহণ করেন। এ ছাড়া সংগীতের উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। পদ্ধতিগত ভাবে সংগীত শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, গুরু ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রবর্তিত স্বরলিপি প্রচারে সহায়তা ও সক্রিয় সহযোগিতা, ভারতের বিভিন্ন গুণী সংগীত-শিল্পীদের নানাভাবে আনুকূল্য করা, সংগীত সম্মেলনের আয়োজন করা, ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের সংগ্রহশালা স্থাপন ইত্যাদি নানা কর্ম ছাড়াও বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় অন্তত পঁচিশখানি সংগীত বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর এই কর্মোদ্যোগ স্বদেশে-বিদেশে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তিনি ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘ডক্টর অব মিউজিক’ উপাধি পান। এ ছাড়াও মহারানী ভিক্টোরিয়া তাঁকে কে সি এস আই উপাধিতে ভূষিত করেন সংগীতের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য। ফ্লোরেন্সের অ্যাঞ্জেলো দ্য গিউবারনেতিস সংকলিত Biographical Directory with Portraits of three hundred eminent men of the World গ্রন্থে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। আর প্যারিসের এম এমিলি আর্তান্দ প্রকাশিত Pelfege Universal Dictionary-তে মুদ্রিত পৃথিবীর প্রখ্যাত পঞ্চাশজন সংগীতজ্ঞের মধ্যে শৌরীন্দ্রমোহনের নাম এবং একটি গৎ সংকলিত হয়েছিল। এছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য বহুদেশ থেকে তিনি সংগীতে অবদানের জন্য সম্মানিত হয়েছিলেন।

এমন গুণী পণ্ডিত শৌরীন্দ্রমোহনের রাজভক্তি ছিল কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত পরিবারে বিভিন্ন রাজকীয় সম্মানের ভূষণ অন্তত তাই

শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর

প্রতিপন্ন করে। শৌরীন্দ্রমোহন ছিলেন ‘রাজা’ ‘স্যার’ অর্থাৎ নাইট। রাজভক্তি প্রকাশের এই মাত্রাধিক্য প্রকটিত হয়েছিল তাঁর রচিত একটি সংগীতগ্রন্থে এবং তা এতদূর পৌঁছেছিল, যা না দেখলে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, দেখলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। গ্রন্থটির নাম ‘ভিক্টোরিয়া গীতিমালা’। প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ সালে যখন রচয়িতার বয়স সাঁইত্রিশ বছর। জানি না কিসের মোহে এমন একটি সংগীত গ্রন্থ রচনায় তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর নিজের এ বিষয়ে মন্তব্য পাওয়া যায় গ্রন্থের ভূমিকায়। সেখানে তিনি লিখছেন ‘বঙ্গদেশে ক্রমশই সংগীত বিদ্যার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, সম্প্রতি গবর্নমেণ্টের কৃপাদৃষ্টি ক্রমশঃ বঙ্গ-সংগীতের উপর পড়াতে বিদ্যালয়াদিতে শিক্ষা দিবার অনুমতিও প্রদত্ত হইতেছে। কিন্তু নীতিগর্ভ বিশুদ্ধ বাঙ্গালা গানের এত প্রাচুর্যও নাই, যাহা অবলম্বন করিয়া সুকুমারমতি ছাত্রগণকে অবলীলাক্রমে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। বর্তমানে বাঙ্গালা ভাষায়

যে সকল গান দেখা যায়, তন্মধ্যে অধিকাংশই অশ্লীল ও রসাভাসে পরিপূর্ণ···যাহাতে পিতামাতার প্রতি ভক্তি, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ও রাজার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করাও সর্বতোভাবে কর্তব্য ; এই সকল বিবেচনায় মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার 'রাজরাজেশ্বরী', এই উপাধি গ্রহণ উৎসব উপলক্ষে 'ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়া' নামক এই ঐতিহাসিক সংগীতগ্রন্থ প্রস্তুত হইল। এই গ্রন্থ দুই ভাগে বিভক্ত—প্রথম ভাগের নাম 'ভিক্টোরিয়া গীতিমালা', ইহার মধ্যে আমাদিগের দয়াময়ী জননী স্বরূপিনী মহারাজ্ঞী ভিকটোরিয়ার পূর্বতন ইংলণ্ডীয় রাজসিংহ উইলিয়ম দি কঙ্করার হইতে উক্ত মহোদয়া পর্যন্ত যে যে মহানুভব বা মহানুভাবা ইংলণ্ডের রাজকিরীট মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, তাহাদিগের চরিত সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত আছে'। বস্তুত দ্বিতীয় ভাগ 'ভারতীয় গীতিমালা' আদৌ মুদ্রিত হয়েছিল কি না এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। ১৪১ পৃষ্ঠার ভিকটোরিয়া গীতিমালা গ্রন্থের গানগুলিতে বেহাগ, বিভাষ, ঝিঁঝিটী, ভূপালী, সোহিনী-বাহার, বৃন্দাবনী সারেঙ্গ, গৌড় সারঙ্গ, ইমনকল্যাণ, কেদারা দেশ-জংলা, শঙ্করা, আলাহিয়া, খাম্বাজ, পুরবী জংলা, সুরঠ-জয়জয়ন্তী, জংলা লুম, পাহাড়ী, সিন্ধু, কালাংড়া, পিলু মেঘ, বসন্তবাহার, যোগিয়া, সিন্ধু-ভৈরবী, ললিত, বারঞা, গরজ, ভৈরবী প্রভৃতি রাগ-রাগিনীতে গানগুলি বাঁধা হয়েছে। তুলনায় তাল ব্যবহারে বৈচিত্র্য কম, কাওয়ালী, মধ্যমান, একতালা, খেমটা, শ্লথ ত্রিতালী, ঠুংরী, ঝাঁপতাল, মোটামুটি ভাবে এই কয়েকটি তালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এবার চোখ ফেরানো যাক গানগুলির দিকে। প্রথমেই প্রস্তাবিকা—

যাঁহা হতে জীবগণ জনম করি গ্রহণ,
আমরণ, মৃত্যু পর নিবসে যাঁহায় ;
দৃঢ়চিত জ্ঞানিগণ নিত্য সুখে নিমগন
যাঁহাতে, বিষয় সুখ করিয়া বিদায়।
যিনি বিশ্ব চরাচর ব্যাপি রণ নিরন্তর,
ত্রিভুবন নাথ তিনি শুদ্ধ জ্ঞানময়—
অজর অমর অজ, অভুজে অযুতভুজ,
বন্দিয়া মুকতি আশে প্রণমি তাঁহায়।
চিরশান্তি জ্ঞান-যোগে যোগী যাঁরে ভাবে যোগে,
অমল চেতস লোক চিন্তে চিতে যাঁয়—
তাঁহা হতে রক্ষ্যমানা রাজলক্ষ্মী পরায়ণা—
ভিক্টোরিয়া আমাদিগে রাখুন কৃপায় ॥

এরপর প্রথম উইলিয়ম, দি কঙ্করার থেকে শুরু করে দু-তিন জন সম্রাটের পরিচয় গীতির পর মহারানী ভিক্টোরিয়ার জন্য প্রার্থনা।

সৃজন-স্থাপন-প্রলয় কারণ,
কমল-আসন, কমলা রমণ,
তমো গুণশালী শূলী পঞ্চানন
এ তিন মূরতি ধরেন যিনি ;

এই পদগুলি পূর্ব্ববৎ গেয়।

চৌড়ী—চৌতাল।
ঠাকুর আখ্যাত দ্বিজকুলেতে জনম, দেবি,
শৌরীন্দ্রমোহন মম নাম ;
অয়ি মা ভারতেশ্বরি, দুর্লভ করুণা তব
করযোড়ে যাচি অবিরাম ॥ ২ ॥

আস্থায়ী।

নি ধ প ম প গ ম প গ | ম প ধ প
ঠা ০ কু র আ খ্যা ত দ্বি জ কু লে তে জ

ভিক্‌টোরিয়া-গীতিমালা
অর্থাৎ
পদ্যে গ্রথিত হিন্দু-সঙ্গীতানুগত ইংলণ্ডের
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

পরম মহিমান্বিতা শ্রীলশ্রীযুক্তা মহারাজ্ঞী
ভিক্টোরিয়ার "ভারত-রাজরাজেশ্বরী"
উপাধি গ্রহণোৎসবোপলক্ষে
বঙ্গসঙ্গীত-বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা ও সভাপতি
মিউজিক্ ডাক্তার
শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর,
মেম্বর অব্ দি রয়েল্ এসিয়াটিক্ সোসাইটী লণ্ডন্, এসোসিয়েট্ এবং করেস্-
পণ্ডিং মেম্বর বেলজিয়ম্, অ্যাকিয়ম্ অব্ দি একাডামি ফ্রান্স,
কর্তৃক প্রণীত।

প্রথম ভাগ।

কলিকাতা।
[illegible] বহু কোং-বহুবাজারস্থ ২৪১ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত
এবং শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায়কর্তৃক প্রকাশিত।

সম্বৎ ১৯৩৩।

যাঁহার আদেশে চন্দ্র, তপন
নিজ নিজ কাজ করিছে সাধন,
ভিক্টোরিয়া প্রতি দয়া বরিষণ
মেঘ-ধারা সম করুন তিনি।

তারপর আবার চলেছে বংশপরম্পরায় রাজন্যবর্গের স্তুতি। সঙ্গে প্রতিটি গানের পাদটীকায় দেওয়া আছে সম্রাটদের জন্ম, রাজ এবং মৃত্যুর বৎসর। ইতিহাস এবং ভূগোলে শৌরীন্দ্রমোহনের শিশু থেকেই ছিল প্রবল অনুরাগ, তারই ফলশ্রুতি মাত্র পনেরো বছর ব গ্রন্থ রচনা 'ভূগোল ও ইতিহাস ঘটিত বৃত্তান্ত'। এভাবে গ গানগুলিতে ক্রমানুসারে ইংরেজদের ভারতজয়ের যে ছবি এঁকেছেন তা যেমন কৌতুককর তেমন দুঃখবহ। গানটির শেষ চ ছত্র রাজভক্তির চরম নিদর্শন ;

ভারত-কমলা-স্বভাবচঞ্চল—
ক্লাইবের বলে হইলা নিশ্চল ;
পুরনারী যথা স্বামীর আদেশ
সতত করয়ে পালন ॥

পরবর্তী গানগুলিতেও চলল সেই একই ধারা। কেমন করে এ পর এক দেশে রণজয়ী হয়ে রাজ্য দখল করে মহারানীর সুযশ হলো তারই বিস্তারিত বিবরণ। শেষে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কী মহারানীর পতাকা উড্ডীন হলো তারই জয়গাথা। এমন একটি নমুনা

ওয়াজিদ আলি শা অযোধ্যার পতি,
সমরে তাঁহার করি দুরগতি
উড়ালে পতাকা অযোধ্যা দেশে।

শুধু রাজ্যজয়ের বিবরণ দিয়েই ক্ষান্ত নন তিনি। মহা কীর্তির বিশদ বিবরণ চলল গানের পর গানে, 'এ হেন গ্যাসের

কৃপায়' বাঁধলেন ভৈরবীর সুরে। এই গানেই 'বেগশালী কেমন করে 'ঘণ্টায় দিনের পথ ছুটে যায়' তার বিবরণ আছে মুনায়। শোণের বিশাল কায়ে। নির্মাইলে চারু সেতু। নাচে' তার জন্য বিস্মিত হয়েছে। এইভাবে বিবরণ দিতে অনুভূতির কথা লিখছেন একটি গানে

প্রতি লোমকূপ যদি
কথা কয় নিরবধি.
তথাপি করিতে শেষ
নারিবে নারিবে তায় ৷৷

হারে বিবরণ দিয়েছেন কেমন করে অতিশয় শান্তচিত বান মনুজ জ্ঞানবান সাগর লঙ্ঘন করে ইংলনডে গিয়েছেন। বলে, কেউবা বিভব ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে, কেউবা ং কেমন করে মহারানী ভিকটোরিয়ার পদশতদলে আপন চয়ের বলে কী না সুখে তাদের জীবন কাটছে তার বর্ণনা। ীর্ঘ গানটির প্রথমাংশের পরই তাঁর দুঃখ 'কিন্তু আমি অতি উপায়হীন, তব পাশে কে লবে আমায়?' 'পূর্বোক্ত উপায়--- য কারণে ভারতীয়রা ইংলনডে গিয়ে মহারানীর পদতলে নেবার সুযোগ করে নিয়েছিলেন তাঁর আক্ষেপ, তাঁর সেই ? কিন্তু সকলেই জানেন প্রাচীনপন্থী মনোভাবের জন্যই না বিদেশ যাওয়া হয়নি অথচ তিনি বারবার আমন্ত্রিত । রোমের পোপ ত্রয়োদশ লিও সংগীত সম্পর্কীয় উপাধি ন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, অকসফোরড বিশ্ববিদ্যালয় টর অব মিউজিক' উপাধি পেয়েছিলেন ১৮৯৬ সালে। তাও

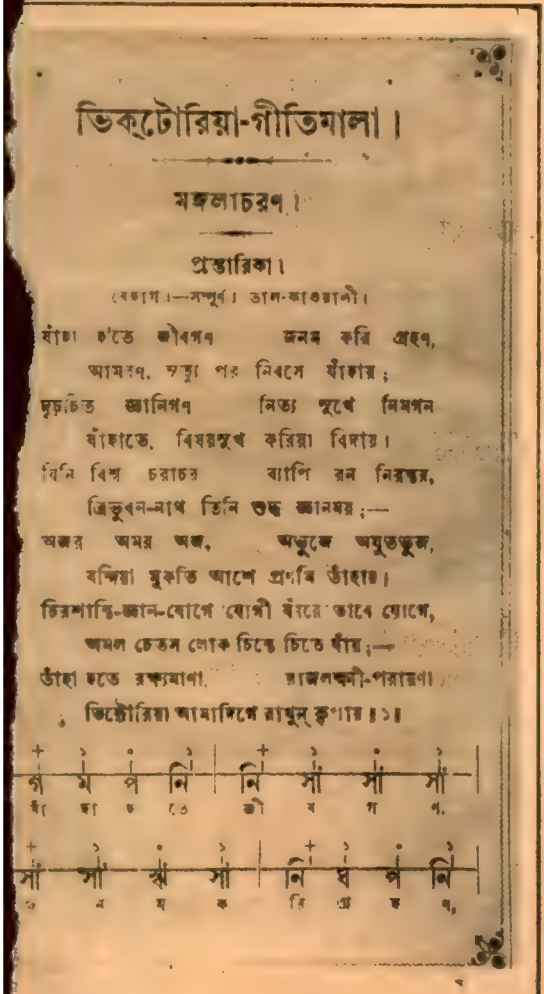

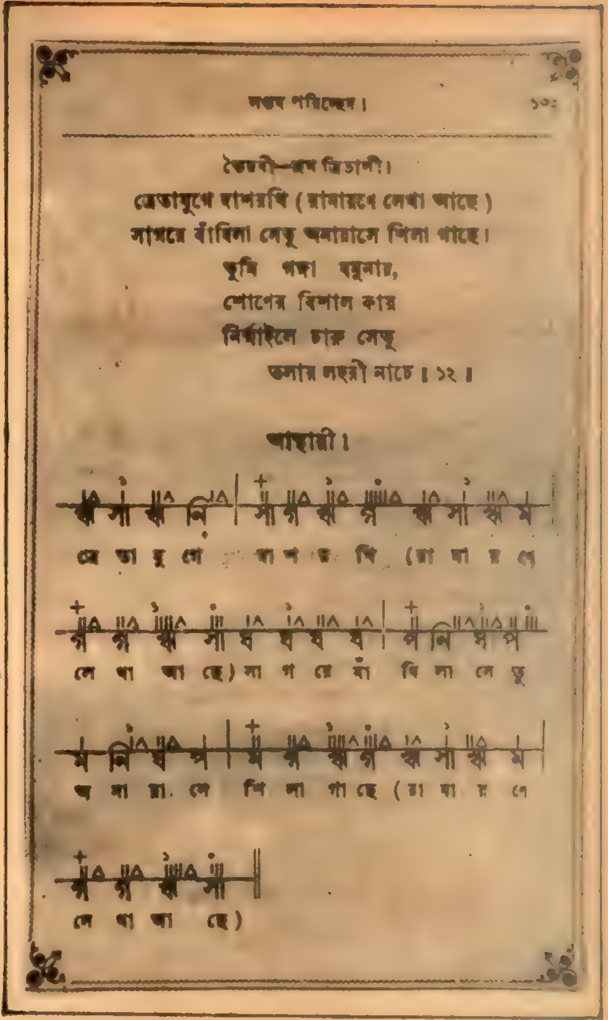

তিনি বিদেশে গিয়ে গ্রহণ করেননি। আসলে তাঁর গোঁড়ামিই ছিল বিদেশে না যাবার প্রধান কারণ—বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ, সবই তাঁর ছিল উপরন্তু ছিল অসীম রাজভক্তি। এই গানের শেষ অংশে তিনি স্বপ্নে বীণাপানির আদেশ পেয়েই যে এই গীত-গ্রন্থ রচনা করেছেন সে কথা জানিয়েছেন আবার বিনয়ও করেছেন 'যদিও এ কাব্য মম সুকবির কাব্যসম, রস-গুণ-ভাব-পূর্ণ নয়' তবে এজন্য তিনি চিন্তিতও নন কারণ 'সন্তানের কৃত যাহা/মায়ের নয়নে তাহা/অবশ্যই দর্শনীয় হয়'। আবার শেষ চারটি ছত্রে তাঁর আশঙ্কাও আছে 'সামান্য এ কাব্য দেখি, ভাসাইনু ভেলা ভাবি,/পরসিতে তব পদতলে; কিন্তু নাহি জানি মনে, বিধির ঘটনাক্রমে/ভাগ্যে মোর ঘটিবে কি ফল'।

শেষ গানটি টোড়ী-চৌতালে তাঁর চরম আত্মসমপণ।

ঠাকুর অখ্যাত দ্বিজ কুলেতি জনম দেখি
শৌরীন্দ্রমোহন মম নাম;
আয় মা ভারতেশ্বরি, দুর্লভ করুণা তব
করযোড়ে যাচি অবিরাম ৷৷

রাজভক্তির নিদর্শনস্বরূপ সে-সময়ে রচিত দু-দশটি বিচ্ছিন্ন গানের নমুনার নিদর্শন মিললেও একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ হিসাবে 'ভিকটোরিয়া গীতিমালা' অদ্বিতীয়। সাংগীতিক অবদানের জন্য নয়—শৌরীন্দ্রমোহনের কীর্তির কলঙ্কস্বরূপ গ্রন্থখানি বাংলা সংগীতের ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে।

সুভাষ চৌধুরী

সাম্প্রতিক লিটল ম্যাগাজিন ঃ একটি সমীক্ষা

সুব্রত রাহা

লিটল ম্যাগাজিন হচ্ছে দিন-মজুরের পোড়-খাওয়া বউটির মতো, যার নিজেকে ও সংসারকে বাঁচাবার সংগ্রাম প্রতি-নিয়ত। অবশ্য এই দিন মজুর বউটির চেহারা চরিত্র শহর-গ্রামে, কলকাতা-মফঃস্বলে কতই না ফারাক। সংসারকে বাঁচাবার সংগ্রামেও তারতম্য অনেক। লিটল ম্যাগাজিনের সংসার তার তরুণ তরতাজা লেখকরা, যাদের লেখা হয় প্রায়ই হৃদয়-রুধিরে। সংসদীয় রাজ-নীতিতে আস্থাবান স্থাণু রাজনীতিকের চোখে সন্ত্রাবাদীদের মতো নিন্দিত, এই সব তরতাজা লেখকদের লেখা, প্রতিষ্ঠান সফল বাণিজ্যিক লেখকদের কাছেও হটকারিতা। পাঠক দারুণ উদাসীন। চরম ট্র্যাজেডী হলো এক গোষ্ঠীর লিটল ম্যাগাজিন অন্য গোষ্ঠীর সম্পর্কে বিধর্মীর উন্নাসিকতা পোষণ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

তবুও লিটল ম্যাগাজিন সময় সময় দুঃসাহসিকরকম দর্পিত হতে জানে। মুদ্রণপ্রমাদপূর্ণ পারিপাট্যহীন গ্রন্থনার মধ্যে দু-একটা লেখা সেই গরিবঘরের বউয়ের দুর্লভ লাবণ্যর মতোই নিখাদ পালিশহীন সৎ সাহিত্য। সত্যিকারের সক্ষমের সাক্ষর।

গরিবঘরের বউয়ের শরীরে যেমন মাঝে মাঝে সিনথেটিক শাড়ি জোটে তেমন দু-একটা লিটল ম্যাগের শরীরেও মাঝে মধ্যে বিজ্ঞাপন যোগসূত্রের আনু-কূল্যে একটা বনেদী হাবভাব ফুটে ওঠে বড় কাগজের প্রতিষ্ঠিত লেখকদের বাঁ হাতে লেখার পাশে নিজের গোষ্ঠীর লেখকরা সাহিত্যিক কৌলীন্য লাভের প্রত্যাশী হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে লিটল ম্যাগের পরিশীলিত পরিচ্ছন্নতা দেখে মনে হয় বস্তিবাড়ির টালির ছাদে টি ভি-র এ্যানটেনার মতোই আভিজাত্য

প্রদর্শনের প্রয়াস। অথচ দারিদ্র্য তার ললাটে লিখন। লিটল ম্যাগের রাগী একরোখা আপোষহীন তরুণরা আজ কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে? বড় পত্রিকার প্রভাবশালী কবিদের সঙ্গে যোগসূত্রের জন্যই কী তারা লিটল ম্যাগ আন্দোলন করবেন? লিটল ম্যাগ কী বড় পত্রিকার খিড়কি দরজা দিয়ে প্রতিষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রবেশের চেষ্টা, না জাগ্রত জীবন-বোধের দীপ্ত আত্মপ্রকাশ হবে? অবশ্য আমাদের মতো দরিদ্র দেশের দারিদ্র্যতাড়িত মানুষের কাছে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি ইত্যাকার বস্তুগুলি সম্পদশালী মানুষের অবকাশ বিনোদন হিসাবেই গণ্য হয়; তবুও একটা 'কিন্তু' থেকে যায় যে মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত ঘরের কিছু যুবক-যুবতী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে যেমন শহীদ হয়ে যায় কোনো এক উন্মদনায় ঠিক তেমনভাবেই সাহিত্য-শিল্পে জড়িয়ে পড়ে আরেক দল হয়ে যায় লিটল ম্যাগাজিনের লেখক। সমাজের প্রতিষ্ঠিত প্রভাবশালীদের চোখে ব্যর্থ লেখক কিংবা বিদ্রূপাত্মক বিশেষণ —'আঁতেল'।

কিন্তু কোথায় তারা সব হারিয়ে যাচ্ছে? বড় পত্রিকার জঠরে, না হতাশার আঁধারে? গ্রুপ থিয়েটারের

অভিনেতা যেমন যাত্রার জৌলুসে মিলিয়ে যায়। লিটল ম্যাগের তাজা লেখক সংবাদপত্রের কলম লেখক হয়ে শেষ পর্যন্ত কী বেঁচে থাকে? না, কেউ কেউ জীবনে সিদ্ধির চাবি-কাঠি পেয়ে যায়। টি ভি, ফ্রিজ, সুন্দরী ঘরণী, সুন্দর ঘর সবই তারা পায় এবং বিদেশী দূতাবাসের ঠাণ্ডা ঘরে বসে বাংলার বিপ্লবী সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় মাতে। এই মুহূর্তে যদি জিগ্যেস করা হয় আমাদের পশ্চিম-বাংলায় লিটল ম্যাগের এত প্রাচুর্য কিন্তু সত্যিকারের কে সেই লিটল ম্যাগের আপোষহীন লেখক? নিঃসন্দেহে কোনো তরুণের নাম উচ্চারিত হবে না।

একসময় 'প্রগতি', 'কালি-কলম' পরবর্তীকালে 'কল্লোল', 'পরিচয়', 'পূর্বাশা', 'কবিতা' পত্রিকাই ছিল লেখক-কবির সৃতিকাগার। এমনকী পঞ্চাশ দশকেও 'কৃত্তিবাস' দারুণ হৈ চৈ করে যে যার নিজের নিজের জায়গাটি দখল করে নিলেন। কিন্তু ষাট বা সত্তর দশকে লিটল ম্যাগের সংখ্যাধিক্য হলেও, পঞ্চাশের দাদাদের সাক্ষাৎকার, তাদের জীবনচর্চা ও সাহিত্যবোধের মূল্যা-য়নেই কী শেষ হবে সব কিছু? রবীন্দ্র-নাথের আগ্রাসী সাহিত্য প্রতিভাকে কিন্তু 'প্রগতি' 'কালি কলম' 'কল্লোল' গোষ্ঠী অতিক্রম করতে চেয়েছিল তাঁদের সাহিত্য সৃজন প্রতিভাকে অবলম্বন করে।

পশ্চিম দেশগুলিতেও লিটল ম্যাগা-জিনের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। বিংশ শতাব্দীতে লিটল ম্যাগাজিনের প্রচার ঘটলে উনবিংশ শতাব্দীতেই এর সূচনা। সাহিত্যের ইতিহাসে 'দি ডায়াল' (১৮৪০) পত্রিকাটিকেই লিটল ম্যাগাজিনের আদিম রূপ হিসাবে সনাক্ত করা যায়। সম্পাদক ছিলেন র‍্যালফ ওয়ালডো এমরশন এবং মার্গারেট ফুলার। সিম্বলইজম-এর প্রবক্তা হিসাবে সংগ্রাম চালিয়ে যান রেমি দ্য গুরমো;

ফ্রানসে একটি লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনা করতেন যার নাম 'মেরকুর দ্য ফ্রাঁস'। এ ছাড়াও এলিয়টের 'ক্রাইটেরিয়ান' লিটল ম্যাগাজিনের উজ্জ্বলতম একটি নাম।

লিটল ম্যাগাজিনের প্রকাশস্থান আজ শুধু সীমাবদ্ধ শহর কলকাতাতেই নয়, প্রায় সারা পশ্চিমবাংলা ও পশ্চিম-বাংলার বাইরে কিছু কিছু ভিন রাজ্যে যেখানেই বাঙালী গেছে জীবিকার সন্ধানে। শুধু কলকাতার 'এক্ষণ' 'বিভাব' 'সমতট' 'পরশুরাম' 'অলীক' পত্রিকাই নয়, কাছাড় থেকে মধ্যপ্রদেশ, মেদিনীপুর থেকে কাকদ্বীপ, বহরমপুর বনগ্রাম থেকে বৈচা কত জায়গা থেকেই কত না পত্রিকা প্রকাশ হয় অনিয়মিত শরৎ শিউলির মতো বড় ক্ষণস্থায়ী।

লিটল ম্যাগাজিন শারদ :
দেখে সেই গরিবঘরের
মনে পড়ে। পুজোর
কাপড়ে দিনমজুরের দু
রূপটিও কত না মাধুর্যম
ম্যাগাজিনের নামের বৈচিত্র্য
—'গোধূলি মন' 'কোরাস
অনুভূতির সেতু' 'রোদ
'কলঘাস' 'আশির দশক
'একজোট' 'উৎকণ্ঠা' '
'অশ্বমেধ' 'অক্ষরবৃত্ত' '
'আনন্দ হাট' 'কাম্পনি
সত্তরের যীশু' 'সকাল'
'কোমল দূর্বা' 'ইলিয়ড'
'উপসংহার' 'প্রতিলিপি'
স্বদেশ প্রিয়শব্দ' 'হীনযান'

কাছাড়ের একটি লিটল
প্রকাশিত হয়েছে, 'কাছ
সাহিত্য : বর্তমান ও ভ
একটি আলোচনা। লেখা
হলো :

'কলকাতার বাইরে থে
ভাদুড়ী যদি সতীনাথ
পারেন, কাছাড়ের লেখক
হতে বাধা কোথায়। কলকাতা
প্রভাব থেকে বহুদূরে ঢাকা
সাহিত্যের দ্বিতীয় কেন্দ্র গড়ে
যেথারকার সাহিত্যকর্ম মাটির
এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল
ভাবে হলেও জামসেদপুর
করছে, যেখানে গদ্যে-পদ্যে
মাদলের হাতছানি। কাছাড়ে
লিক দূরত্ব তার পক্ষে ক
কারণ দূরই মধুর হয়ে উঠে
লেখকের চেতনায় অস্তি
মাত্রা বিস্ফোরণ ঘটায়।
বাংলায় বাংলা সাহিত্যে
তৃতীয় কেন্দ্র গড়ে তোলার

ভালোভাবেই তো সমাধা হয়ে
(অরূপবীণা শারদ
বনগ্রামের 'শিস' ত্রৈমাসি
পত্রিকা লিখছে : 'শিস'

স্তু মফঃস্বলীয় নয়। নগর
আওতার বাইরে, তবু
নগর বাজারকে সচকিত
ভূমির মানুষেরা এই

দিয়েছেন বহুতর প্রশ্রয়।
টান পায়ে হাঁটতে হাঁটতে
ু। বলিষ্ঠ শরীর গঠন
কারণ প্রোটিন স্নেহ দুয়ো-
ানের মতন দূর দূর করে।
শ্বাস বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ীদের
কৃপাদৃষ্টি এসব পত্রিকার
না। যেহেতু প্রকাশ স্থান
য়, অথবা মফঃস্বলীয় ধানের
অরুচি বিজ্ঞাপনী মহা-
'—এই 'শিস' পত্রিকাতেই
ভট্টাচার্যের 'ঐতিহাসিক
কবিতাটির উল্লেখযোগ্য একটি
ত করলাম ঃ পৃথিবীর চারদিকে
পরিকল্পিত হিমযুগ/পারমাণ-
লা এবং দেবদারুপাতায় সাজান
দলখোলা নরমাংসের দোকান/
জালে ধড়গুলো ঝুলিয়ে দেবার
শাইয়া দিগন্ত-খোলা বরফের
িয়া শিস/১৯৮১)
পুরের কুলীন লিটল
কৌরব' পত্রিকার গায়ে কেমন
কাতার গন্ধ লেগে আছে।
ারেশান-এর পত্রিকার গায়ে
সময় চমক দেওয়া শ্লোগান
অনেক সময় পত্রিকার প্রধান
হতো ঐসব উচ্চাকিত
কৌরব এ পথের কিছুটা
যেমন ঃ [বর্তমান লেখাটি
র ভিন্ন অন্য সকলে

সেদপুর বড় এবং আলাদা
ত, যেমন মদ্যপের জামসেদ-
টের জামসেদপুর, নোটংকির
র, নাটুয়ার জামসেদপুর,
জামসেদপুর, সবজান্তার
র, গাড়লের জামসেদপুর,
আরও দেখলে পাওয়া যাবে
, ইডিয়ট, গেঁজুড়ে, রেসুড়ে
। ফক্কিকারির শহর। সৃজন-
যের জামসেদপুর আধাবিত্তায়
যায়।

আমাদের শহর বড় নিস্তরঙ্গ। কখনও একবার সমরেশ বসু এলেন, অথবা পুরুলিয়ার তরুণ কবি অশোক দত্ত এলো কিংবা কলকাতা থেকে কবি অপু মুখোপাধ্যায় এলো, কিংবা শক্তি চট্টোপাধ্যায় ভিলাই-এর পথে এখানে নেমে পড়লেন, অথবা আশা করে বসে আছি এই শীতেই হয়তো প্রকাশ কর্মকার বা যোগেন চৌধুরী বা রবীন মণ্ডল আসবেন। পূর্ণেন্দু পত্রীর আসার কথা।……'

এই পত্রিকায় অমিয়ভূষণের 'অন্তরীক্ষ' নামে একটি গল্প ছাপা হয়েছে। হাংরি জেনারেশন ঃ ফোড়া বিষফোড়া রচনাটিতে হাংরি জেনারেশন-এর বিবলিওগ্রাফি ভবিষ্যত গবেষকদের কাজে লাগবে মনে হয়। তবে বিদ্রোহী

কংগ্রেসের মতই অবলুপ্তপ্রায় হাংরি জেনারেশন। হাংরি জেনারেশন এখন ডি-জেনারেটেড। সাহিত্যের ইতিহাসে গবেষণার বিষয়বস্তু।

লিটল ম্যাগাজিন চিরদিন ছোটগল্প ও কবিতার উর্বর আবাদ। কিন্তু এখন আর কেউ লিটল ম্যাগাজিনের গল্প কবিতা নিয়ে আলোচনা করে না। বাণিজ্য-সফল পত্রিকার গল্প লেখকদের গল্প কবিতাই লিটল ম্যাগাজিনের আলোচ্য বিষয়। লিটল ম্যাগাজিনের আন্দোলন হলো পূর্বসূরীর সাহিত্য ভাবনাকে অতিক্রম করার চেষ্টা, কিন্তু একালের তেমন তেজী চ্যালেঞ্জ-এর কব্জি বাড়িয়ে দেওয়া লেখকগোষ্ঠী কোথায়? বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও কোথাও প্রতিশ্রুতির ফুলকি দেখা যায় কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত 'অশ্বারোহী' পত্রিকায় অনিল ঘড়াই-এর 'কালকেতু' গল্পটি যেমন। অবশ্য ছোটগল্প নিয়ে যত কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা তা লিটল ম্যাগাজিনেই হয়েছে, যেমন পঞ্চাশের 'স্বরান্তর' পত্রিকা। একদা শাস্ত্রবিরোধী গল্পকারদের আন্দোলনের অনেক শরিক এখন কম্যারশিয়াল পত্রিকার লেখার কৌলিন্য অর্জন করেছেন। যেন শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের লক্ষ্যস্থল ছিল এইটাই, তাদের লেখাও আজ খুকুমণি বিমোহিনী গপ্প। চেক-লেখক পিটার বিক্কেলস গল্পও কিন্তু শাস্ত্রবিরোধী গল্প। আমাদের দেশের নির্মম নিয়তি কী যে কোন বিপ্লব-বিরোধ শেষ পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্রামে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে!

প্রবন্ধ সাহিত্যের অনুর্বরতা আজ প্রায় বন্ধ্যাত্বের মতোই আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছে অনেকের কাছে। ভালো প্রবন্ধ নাকি লেখা হচ্ছে না। আমাদের প্রবন্ধ সাহিত্য একাডেমিক উৎকর্ষ লাভ করলেও সাহিত্যিক সৌরভ লাভ করেছে কিছু কিছু লিটল ম্যাগাজিনে। কিন্তু অধিকাংশ প্রবন্ধের একাডেমিক পাঠ্যসূচীর দিকেই ঝোঁক বেশি। দু-একটি পত্রিকায় নতুন কিছু চিন্তা-ভাবনার মূল্যায়নের প্রচেষ্টা থাকে।

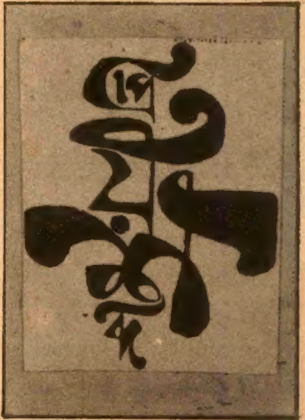

'হীনযান' পত্রিকায় 'দারিদ্র্যের রূপকার ঃ প্রেমচন্দ ও বিভূতিভূষণ' স্বাতী সমাজদারের লেখাটি যেমন। তিনি লিখেছেন ঃ প্রেমচন্দ ও বিভূতিভূষণ দুজনেই নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে চিনেছিলেন দারিদ্র্যকে, কিন্তু দুজনের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ভিন্ন। প্রেমচন্দ দারিদ্র্যকে দেখেছিলেন ইতিহাসের পটভূমিতে—শোষক ও শোষিতের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। তিনি বুঝেছিলেন কীভাবে যুগযুগান্তলালিত সামাজিক প্রথা মানুষের সর্বনাশ করছে—কীভাবে একদল লোকের দারিদ্র্য ও অসহায়তার সুযোগে স্বার্থসিদ্ধি করছে আরেকদল। তিনি তাই তাঁর 'মহাজনী সভ্যতা' প্রবন্ধে বলেছেন ঃ 'মানুষের সমাজকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বৃহত্তর অংশে রয়েছে তারা যারা পরিশ্রম করে এবং একটি অতিক্ষুদ্র অংশে রয়েছে তারা যারা তাদের ক্ষমতা ও প্রভাবের ফলে এই বৃহৎ জনসমষ্টিকে ক্রীতদাস বানিয়ে রেখেছে। এই বৃহত্তর অংশের প্রতি তাদের কোনও সহানুভূতি বা মমতা নেই। এদের অস্তিত্ব কেবল এদের প্রভুদের জন্য, ঘাম ঝরাবার জন্য, রক্ত ঝরাবার জন্য এবং পরিশেষে এ পৃথিবী থেকে নিঃশব্দে বিদায় নেবার জন্য। বক্তব্যের এই তীব্রতা বিভূতিভূষণের ছিল না, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল এক প্রশান্ত দার্শনিকের, যিনি এই জীবনকে এক বৃহত্তর জীবনের অংশ বলে মনে করেন—যিনি জীবনকে

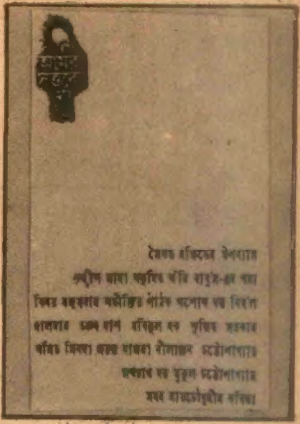

মেনে নেন তার সুখ-দুঃখ ভালো-মন্দ সমস্ত কিছু নিয়েই—দারিদ্র্য তাই তাঁর কাছে জীবনধারণের একটা শর্তমাত্র। তার কাছে মাথা নীচু করলে জীবনের আনন্দের শরিক হওয়া যায় না। তাঁর প্রতিটি চরিত্রই তা সে পথের পাঁচালীর অপুই হোক' 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'-এর হাজারী বা 'অশনি সংকেত'-এর গঙ্গাচরণই হোক ভীষণ ভাবে জীবনরসের রসিক। আর তাই এরা প্রত্যেকেই আশাবাদী, তারা সবাই স্বপ্ন দেখে ভবিষ্যতের—নাই বা এলো কখনো সেই ভবিষ্যত তবু তারই জোরে তারা অস্বীকার করতে পারে দারিদ্র্যের করালরূপকে। তাই চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও হরিহর সর্বজয়াকে ভবিষ্যতের সুখ স্বপ্নের গল্প শোনাতে পারে। তার কল্পনার অংশীদার হয়ে সর্বজয়া ভুলে যায় দারিদ্র্যের ছায়াঘেরা নিষ্ঠুর বর্তমানকে। বিভূতিভূষণ কাউকে ব্যঙ্গ করেননি—কাউকে তিনি দায়ীও করেনি। দারিদ্র্য তাঁর মতে ততটুকুই মানুষের সৃষ্টি মানুষের অপরিণত বুদ্ধি।

প্রেমচন্দের মতে বাংলা উপন্যাস 'মেয়েলী অনুভূতিতে' ভরা। তাই বোধহয় তিনি তাঁর উপন্যাসের জন্য বেছে নিয়েছিলেন কৃষকদের রুক্ষ জীবন। তাদের কৃষক থেকে মজুরে পরিণত হবার কাহিনী। অন্যদিকে বিভূতিভূষণ মূলত দরিদ্র নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন-চিত্রই এঁকেছেন। এদের জীবনে পরিবর্তন কম, কয়েকটি যুগসঞ্চিত বিশেষ মূল্যবোধ এদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে, প্রেমচন্দের নায়কদের মতো কোন অর্থনৈতিক নির্দেশিকা তাদের জীবন-যাপনের রীতি বদলে বাধ্য করে না। গ্রাম ছেড়ে অর্থোপার্জনের চেষ্টায় বার হলেও কাজের ধরণ বদলায় না তাদের।

লোক-সংস্কৃতি চর্চায় একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা 'কৌশিকী'। পত্রিকাটি চেহারা ও চরিত্রে লিটল ম্যাগাজিনের

মতই অনিয়মিত ও নতুনের সন্ধানী। এই পত্রিকার বিনয় ঘোষ সংখ্যাটির অধিকাংশ রচনার উদ্দেশ্য নিশ্চয় বিনয় ঘোষের স্মৃতিতর্পণ করা কিন্তু অনেক লেখকই লোকসংস্কৃতিতে তার নিষ্ঠা ও বৈশিষ্ট্য দেখাতে গিয়ে বিনয় ঘোষের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পেরেছন কী শেষ পর্যন্ত? যেমন শঙ্কর সেনগুপ্ত তাঁর লেখাতে : বিনয়বাবুর মৃত্যুর বছর তিনেক আগে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের

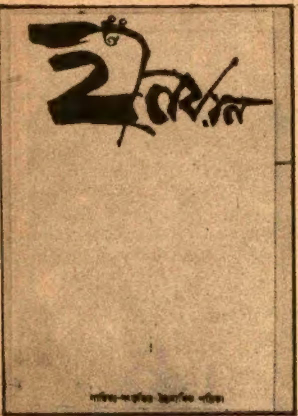

অধ্যাপক শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় বললেন —বিনয়বাবু folklore পত্রিকাটিকে নোংরা পত্রিকা মনে করেন। এই পত্রিকাটিকে নাকি তিনি প্রস্রাব দিয়ে ভাসিয়ে দিতে পারেন। তখন একথা বিনয়বাবু বলেছেন শান্তিনিকেতনে বসে। সেখানে তিনি গিয়েছিলেন কোন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে। বিনয়বাবুর কাছে একথা যাচাই করার চেষ্টা করিনি। তবে তাঁর বাসায় গিয়েছি : কথা প্রসঙ্গে অনেক ক.. শুনেছি. তিনি ঘটনা ও রটনা সম্পর্কেও অনেক কথা বলেছেন। বলেছেন 'যা করছেন করে যান, কারুর কথায় কান দিবেন না।' ভাবলাম সুখময়বাবুর কথাটি তুলি। ফিরে শেষ অবধি আমার সংস্কার,

আমার বোধ তা জিজ্ঞেস করতে দিল না। এখনও মনে করি এ ধরনের কথা অন্তত folklore সম্পর্কে বিনয়বাবু বলতে পারেন না। যদি বলেও থাকেন, তবে তখন তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় মানুষ কি না বলে। তা নিয়ে কোন সুস্থ মানুষ মাথা ঘামায় না। আমিও বা ঘামাব কেন?'—

লোক-সংস্কৃতি আঞ্চলিক ইতিহাস ও অর্থনীতিক মূল্যায়ন সমৃদ্ধ 'প্রতিলিপি' পত্রিকা পশ্চিমদিনাজপুর জেলা সংখ্যা। এই সংখ্যায় কয়েকটি লেখা বিষয় গুরুত্বে লক্ষনীয়। কৈবর্ত বিদ্রোহ ও কবি সন্ধ্যাকর নন্দী/অরুণকুমার মজুমদার, কোটিবর্ষীয় লোকভাষা ও তার স্বরূপ

প্রকৃতি/রাধামোহন মোহান্ত, এছাড়া পশ্চিমদিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চা : কিছু প্রশ্ন, কয়েকটি ভাবনা হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমদিনাজপুর জেলার সাহিত্যচর্চা/অজিতেশ ভট্টাচার্য। ও বিশেষভাবে উল্লেখ্য তে-ভা... কেন্দ্র : খাঁপুর/পীযূষ ভট্টাচ... —'পশ্চিমদিনাজপুরের ৩... মধ্যে খাঁপুর একটি। পরগ... —২০৭ মৌজা, তৌজি... মোট জমির পরিমাণ ৬৫০... শতক বাস্তু ও চাষ সহ (১... রেকর্ড)। ভারতবর্ষের গ্র... তা হলো উঁচু জায়গায় বাস্তু... কিছু পুকুর, বাদবাকি চ... খাঁপুরে তার থেকে কিছু ব... ব্যতিক্রম একটি শহীদ... অথমী কৃষক। তে-ভাগা।... শুধু কি শব্দ। তে-ভা... কইর‍্যা মেলা চিল্লাবেন... খ্যাগ হোবে। দাওয়াই... হে—এই হতাশা ও... বিদ্যমান। কিন্তু তে... ভোলেনি।'

লিটল ম্যাগাজিন আজ... লাভ করেছে তা সত্তর দ... পাড়ায় শহীদ বেদীর সমত... প্রকাশের আত্মমর্যাদা পা... তার আছে। লিটল ম্যাগ... সংগ্রাম, লিটল ম্যার অস্বীক... সাহিত্যের বেসাতি, পাটে... বসে যারা সাহিত্য করে ত... নিদারুণ ঘৃণা সাহিত্যের ব... আচ্ছুৎ আগন্তুক।

পাঠকের চিঠি

ভূপেন হাজরিকা-সম্পর্কিত বক্তব্যগুলি কি সত্য?

ইতোমধ্যেই জনপ্রিয় 'শিলাদিত্য' কাগজের সেপটেমবর ১৯৮১ সংখ্যায় ভূপেন হাজরিকা-সম্পর্কিত যে সচিত্র সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন পরিবেশিত হয়েছে, সে-সম্পর্কে আমার মনে সঙ্গত কারণেই যথেষ্ট সন্দেহ ও প্রশ্ন জেগেছে। আশা করছি স্বয়ং ভূপেন হাজরিকা ও সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী এসব প্রশ্নের সঠিক ও সত্য জবাব দিয়ে বাধিত করবেন।

(১) পল রোবসনের সঙ্গে আমেরিকায় তাঁর যে যোগাযোগ ঘটেছিল তার প্রমাণ কী? পল রোবসনের জীবিতাবস্থায় এসব কথা তিনি কাউকেই কোথাও বলেননি। তাঁর নিজের প্রচার ছাড়া রোবসনের সঙ্গে এই যোগাযোগের আর কোনও প্রকার সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে কি?

(২) আমেরিকায় তিনি 'জেল খেটেছেন' —মানেটা কী? কী অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি? কতদিনের জেল হয়েছিল? কোন জেলে ছিলেন?

আমেরিকায় সাময়িক হাজতবাস করাটা অনেক কারণেই ঘটতে পারে। ভিসার কাগজপত্রে গণ্ডগোল, বা বিশেষ রোগের প্রতিষেধক না নিয়ে যাওয়া বা মদ খেয়ে প্রকাশ্যে মাতলামি করা ইত্যাদির জন্যও এসব ঘটে। কিন্তু—তাকে কি 'জেল খাটা' বলে প্রচার করা যুক্তিযুক্ত?

(৩) ছাপা হয়েছে,…'তখন একের পর এক প্রগতিশীল গান লিখে 'মুক্ত দেউল' রচনা করেছেন।'

আমার প্রশ্ন, ভূপেন হাজরিকাকে : কে 'মুক্ত দেউল' রচনা করেছেন? ঐ বইখানি অর্থাৎ গীতিপুস্তকখানি কি তিনি রচনা করেছেন? 'মুক্ত দেউল' নামক গানের বইটির রচয়িতা তো প্রয়াত বিষ্ণু রাভা।—তাহলে?

(৪) ভূপেন হাজরিকার 'ডক্টরেট' প্রাপ্তিও সেই ১৯৫২/৫৩ সন থেকে একটি ধাঁধাঁর বিষয় হয়ে রয়েছে। তাঁর ডক্টরেট প্রাপ্তি সম্বন্ধে অসমীয়া পত্র-পত্রিকায় তাঁরই এককালের বন্ধু শ্রীক্ষীরদা বিষয়া কিছু বিরুদ্ধ প্রমাণপত্র সহ প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন একসময় এবং কালক্রমে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর ব্যাপার স্যাপার থেকে তড়িঘড়ি অব্যাহতি নেন (বা, বাধ্যতামূলকভাবে অব্যাহতি নিতে বলা হয়?)।

যাই হোক, ডক্টরেট অনেকেই পান, তার ভূপেন হাজরিকাও পেয়ে থাকতে পারেন। তবে নিম্নলিখিত প্রশ্ন কটির উত্তর তাঁর কাছ থেকে আমাদের আশা করা নিশ্চয়ই সমীচীন :

(ক) কোন সনে, আমেরিকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে, কোন প্রফেসরের অধীনে তিনি রিসার্চ করেছিলেন?

(খ) যে-বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি রিসার্চ করেছিলেন—(যদি আদৌ করে থাকেন) সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় গ্রন্থাগার, বা অন্য কোথাও তাঁর সেই ডক্টর‍্যাল থিসিসটির সন্ধান মিলবে কি?

(৫) সঠিক নয় 'আমার প্রতিনিধি' পত্রিকা-সম্পর্কীয় সংবাদ। তাতেও ভেজাল মেশানো হয়েছে। তাঁর সম্পাদনার কাল ২০ বছর নয়। এবং পত্রিকাটি যেহেতু আর বেঁচে নেই, অর্থাৎ ১৯৮০ সনের মাঝামাঝি থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে—সেহেতু 'বিশ বছর ধরে সম্পাদনা করছেন' উক্তিটি মর্মান্তিক মিথ্যা।

(৬) 'গানে গানে অ আ ক খ' নামক বইটির ক্ষেত্রেও একটি নোংরা চালাকি আছে। অন্যান্য বইগুলির নাম সঠিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই বইটির নাম (ক) অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে, (খ) বেঠিকভাবে দেওয়া হয়েছে : (গ) বইটির 'রাষ্ট্রপতি পুরস্কার' প্রাপ্তির বিষয়ে কিঞ্চিৎ প্রতারণা করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, বইটির... 'আমার গীতে-মাতে অ... লেখক ভূপেন হাজরিকা।... রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পান... জন্য রাষ্ট্রপতির পুরস্কার... বইটির মুদ্রাকর শ্রীহীরালা...

অথচ ইচ্ছাকৃতভাবে... খাটিয়ে জনমনে এই বিশ্ব... হয়েছে যে—তাঁর লেখার... পুরস্কার পেয়েছে! এই... দ্বারা ৺বিষ্ণু রাভা রচি... নিজের বলে প্রচার কর... 'মুক্ত দেউল'-এর কথাটি... করা হয়েছে—তাতে ব... করবেন যে ঐ বইটি... লেখা!

আমার এসব অভিযো... সাহস কি ভূপেন হাজরি... তা করুন।

আর...
'বিদ্যাভূষণ বাটী'...

মুদ্রাকর ও প্রকাশক অরুণকুমার পাল কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩ (...
থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৭, বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২ (ফোন ২৭-৩৩১৬, ২৭-২১৬...

new edition

INDIA SOCCER ANNUAL 1981

...cinating feature articles :
...JIT SENGUPTA salutes Habib, the
... principle : A.T.P. SARATHY follows
...er of AIFF president Ziauddin :
...OSWAMI's intimate portrait of
...ingh : SUKUMAR SAMAJPATI
...ne Calcutta League : BRIAN
...'s picture of Italian club rivalries
... else
...eviews – Championship rolls—
...ographs, in colour and black

...ice Rs. 6.00

... Biplabi Anukul Chandra Street, Calcutta 700 072.

Declaration No. 146 81 dt. 26.6.81, Siladitya/ November 1981, Postal Registration No. WB/CC70/81

ইত্যাদি প্রকাশনীর দুটি অসাধারণ সাপ্তাহিক

পরিবর্তন

বের হয় প্রতি বুধবার

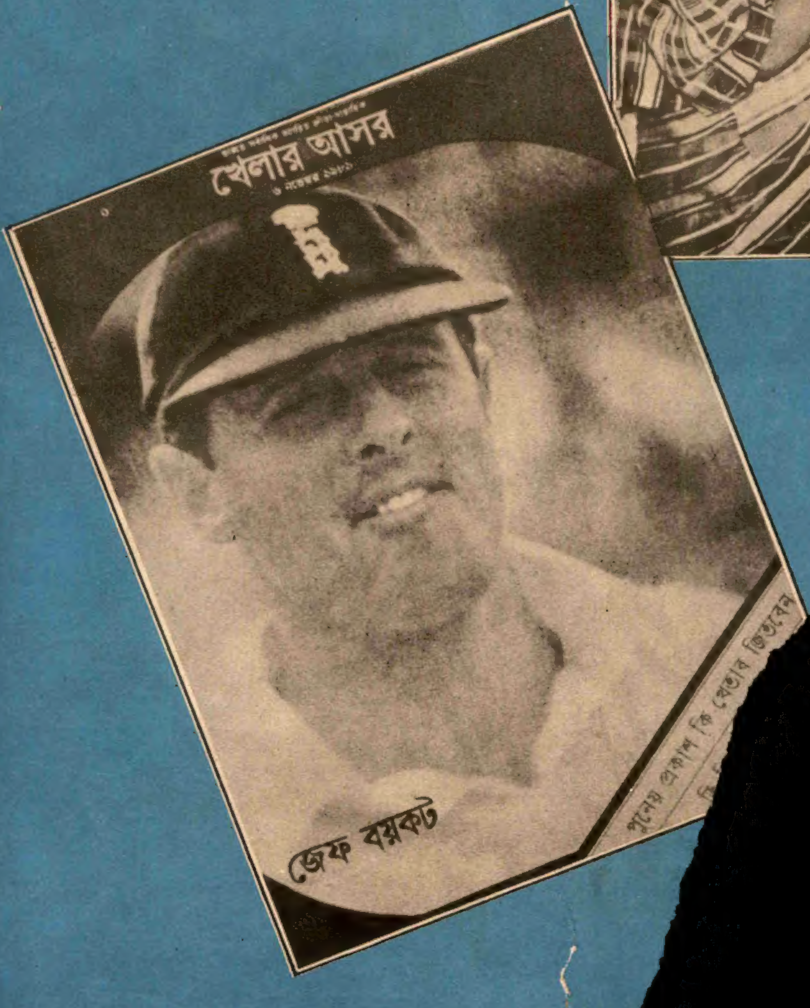

ইত্যাদি প্রকাশনী প্রাইভেট লিঃ, ৪৭ .বিপ্লবী অনুকূ